আদিমধ্য ও মধ্যযুগে ভারত

৬৫০-১৫৫৬

সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়

RAWAT PUBLICATIONS
JAIPUR

শ্রী বলাইলাল চট্টোপাধ্যায়

ও

শ্রীমতী শোভারাণী চট্টোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সূচিপত্র

প্রথম পর্ব

আদি মধ্যযুগ ৬৫০-১২০০

দ্বিতীয় পর্ব

তুর্ক-আফগান যুগ ১২০০-১৫৫৬

প্রথম পর্ব

আদি মধ্যযুগ (৬৫০-১২০০)

প্রথম অধ্যায়

আদি মধ্যযুগ সম্পর্কিত ইতিহাস-চিন্তা

প্রথাগতভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক এই তিনভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হয়। আগে একে হিন্দু, মুসলিম ও ব্রিটিশ যুগ রূপে চিহ্নিত করা হতো। ঐতিহাসিকরা যুগ বিভাজন নিয়ে নতুন করে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছেন। অধ্যাপক নীহার রঞ্জন রায় ইতিহাসের কালপর্ব এভাবে চিহ্নিত করার বিরোধিতা করেছেন। একটি বিশেষ যুগের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ইতিহাসের কাল বিভাজন হওয়া উচিত বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁর পর থেকে এভাবে ইতিহাসের কাল বিভাজনের প্রয়াস শুরু হয়েছে। রোমিলা থাপার প্রাচীন ভারতের ইতিহাস আলোচনাকে ত্রয়োদশ শতকের সূচনা পর্যন্ত সম্প্রসারিত করে এর নাম দিয়েছেন আদিপর্বে ভারত (Early India)। রোমিলা থাপার ভারত ইতিহাসকে চারভাগে ভাগ করেছেন—আদি ঐতিহাসিক পর্ব (৮০০ খ্রি. পর্যন্ত), আদি মধ্যযুগ (৮০০-১৩০০), মধ্য যুগ (১৭৫০ পর্যন্ত) ও আধুনিক যুগ (The first period is described as *Early Historical* and terminates in about the eighth century A.D. Subsequent to this is the *Early Medieval* from the eighth to the thirteenth century. The *Medieval* begins with Turkish rule or the Sultanates and ends with the decline of the Mughals. The fourth and last period is the *Modern*, marking the establishment of British rule in the eighteenth century.)। ইতিহাসের কাল বিভাজন সংক্রান্ত আলোচনা একটি ঐতিহাসিক সত্যকে নির্ভুলভাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। তা হলো ভারত ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে পরিবর্তন ঘটে চলেছে, পরিবর্তনহীন ভারতের যে রূপকল্প ইউরোপীয়রা উপস্থাপন করেছেন তা আজ আর গ্রাহ্য হয় না (the course of history is seen in terms of stages of change)।

৬৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে নানা নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই পর্বকে ঐতিহাসিকরা বলেছেন পরবর্তী গুপ্তযুগ, পরবর্তী প্রাচীন যুগ, প্রাক্-মধ্যযুগ, পরবর্তী ধ্রুপদী যুগ ও বিকাশোন্মুখ মধ্যযুগ। বর্তমানে একে আদি মধ্যযুগ হিসেবে গ্রহণ করার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। আদি মধ্যযুগকে সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন : (ক) ভারত ইতিহাসের আদিপর্ব কোন্‌টি, আদিপর্ব থেকে আদি মধ্যযুগে কীভাবে উত্তরণ ঘটেছিল। (খ) আদি মধ্য-যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিহ্নিত করে তাকে প্রতিষ্ঠা করা এবং (গ) কীভাবে আদি মধ্যযুগের পরিবর্তনগুলি ঘটেছিল তার ব্যাখ্যা করা। ভারত ইতিহাসের আদিপর্ব নিয়ে

ঐতিহাসিকরা একমত নন। কেউ বলেছেন আর্যদের ভারতে আগমনের সঙ্গে আদিপর্বের সূচনা হয়েছিল, অন্যরা বলছেন মেহরগড় ও হরপ্পা থেকে ভারত ইতিহাসের সূচনা হয়েছে। তারও আগে রয়েছে প্রাগৈতিহাসিক যুগ, প্রস্তর যুগ, তাম্র-প্রস্তর যুগ ও লৌহ যুগ। তুর্কিদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আদিপর্বের শেষ হয়েছে, শুরু হয়েছে আদি মধ্যযুগের। এমন মতের চলন ছিল। তুর্কিদের আগমনের অনেক আগে থেকে আদি মধ্যযুগের যে সূচনা হয়েছে তা নিয়ে আজ আর কেউ প্রশ্ন তোলেন না। বহু তথ্য, বিশেষ করে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের আবিষ্কারের ফলে, ভারতের আদি পর্বের সীমা নির্দেশ করা আরো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকরা মনে করেন উৎখননের ফলে এমন সব তথ্য পাওয়া গেছে যার ফলে ভারতের আদিপর্ব অত্যন্ত জীবন্ত ও সজীব হয়ে ধরা দিয়েছে (Living Prehistory is very much a live concept.)। এসব চিন্তা-ভাবনার আলোকে ঐতিহাসিকরা প্রাচীন ভারতের সীমা নির্ধারণ করেছেন এমন সব আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে যাতে পরিবর্তন সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। আদিপর্বকে সুচিহ্নিত করার জন্য ঐতিহাসিকরা সেজন্য ব্যবহার করেছেন নতুন শব্দ 'আদি ঐতিহাসিক পর্ব' (early historical)।

আদি ঐতিহাসিক পর্বের শুরু খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে। এভাবে যদি পর্ব চিহ্নিত করা হয় প্রশ্ন ওঠে এই পর্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কি এবং এই পর্ব কবে শেষ হয়েছিল? শেষ পর্বকে চিহ্নিত করা আরো দুরূহ কাজ কারণ দ্বাদশ শতকের শেষদিকে চালুক্য ও চোলরা ছিল দক্ষিণ ভারতে, পূর্ব ভারতে ছিল সেন রাজারা। ঐতিহাসিকরা আদি ঐতিহাসিক পর্বের শেষ এবং আদি মধ্যযুগের সূচনা পর্ব ব্যাখ্যার জন্য একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। আদি মধ্যযুগের তারা কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন যেগুলি আদি ঐতিহাসিক পর্বে দেখা যায় না। যুগ সন্ধিক্ষণকে চিহ্নিত করার জন্য তারা আদি ঐতিহাসিক পর্বের কতকগুলি সাধারণ লক্ষণের কথা বলেছেন। তৃতীয় ও চতুর্থ শতক নাগাদ এই লক্ষণগুলি পূর্ণ বিকশিত রূপ ধারণ করেছিল। আদি ঐতিহাসিক পর্বের প্রধান লক্ষণ তিনটি : (ক) আঞ্চলিক রাষ্ট্রের উদ্ভব ও বিকাশ। রাজন্য ও ক্ষত্রিয়রা হলো শাসকগোষ্ঠী, রাষ্ট্র হলো অতিকেন্দ্রীভূত ও আমলাতান্ত্রিক, ভূস্বামীদের অস্তিত্ব ছিল না, আমলারা রাজকোষ থেকে বেতন পেত। অর্থনৈতিক জীবন ছিল মুদ্রা-নির্ভর, দূরপাল্লার বাণিজ্য ছিল, শিল্প উৎপাদনের ব্যবস্থা ছিল, নগর গড়ে উঠেছিল। গ্রামে গ্রাম সম্প্রদায় কৃষি উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত ছিল, ভূমিতে পরিবার নয়, সম্প্রদায়ের যৌথ অধিকার ছিল।

আদি ঐতিহাসিক পর্বে বর্ণপ্রথার সম্প্রসারণ ঘটেনি, কঠোর হয়েছিল। রাজা ও পুরোহিত সম্প্রদায় সামাজিক উদ্বৃত্তের বেশিরভাগ আত্মসাৎ করত (appropriators

of the social surplus), বৈশ্যরা ব্যবসা ও কৃষিকর্মে নিযুক্ত ছিল, করের বেশিরভাগটা এরাই দিত। শূদ্ররা দিত শ্রম, বেশিরভাগ ছিল দাস, সমাজে বিভিন্ন ধরনের দাস প্রথা ছিল। উপবর্ণের সৃষ্টি হয়নি (the proliferation of castes was largely absent)। দাসদের অবস্থার অবনমন ঘটেছিল, এদের অবস্থা ছিল প্রায় ইউরোপের ভূমিদাসদের মতো। আদি ঐতিহাসিক পর্ব থেকে আদি মধ্যযুগে উত্তরণের তিনটি বিশদ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। প্রথমটি হলো অধ্যাপক নীহার রঞ্জন রায়ের, দ্বিতীয়টি রামশরণ শর্মার এবং তৃতীয়টি অধ্যাপক ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়ের। উত্তরণ ব্যাখ্যা প্রথম দিয়েছেন নীহার রঞ্জন রায়। অধ্যাপক রায় মধ্যযুগের একটি বহুমাত্রিক ব্যাখা দিয়েছেন। তাঁর মতে, সপ্তম শতকে মধ্যযুগের শুরু হয়েছিল, অষ্টম শতক থেকে পরিবর্তনের চিহ্নগুলি স্পষ্ট রূপ নিয়েছিল। সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক হলো মধ্যযুগের প্রথম পর্ব, দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত সময়কাল হলো দ্বিতীয় পর্ব এবং ষোড়শ শতকের প্রথম পাদ থেকে অষ্টাদশ শতকের শেষপর্যন্ত হলো তৃতীয় ও শেষ পর্ব। অধ্যাপক রায় প্রত্যেক পর্বের বৈশিষ্ট্যগুলি পৃথকভাবে আলোচনা করেননি, সামগ্রিকভাবে তিনি মধ্যযুগের চারিত্রিক লক্ষণগুলির কথা উল্লেখ করেছেন।

অধ্যাপক রায় বলেছেন যে মধ্যযুগে রাজবংশগুলি আঞ্চলিক আধিপত্য স্থাপন করেছিল। এই দিক থেকে তাদের উৎপত্তির সঙ্গে ইউরোপের জাতিরাষ্ট্রগুলির সাদৃশ্য আছে। অর্থনীতির পরিবর্তন ঘটেছিল, মুদ্রা-নির্ভর অর্থনীতি স্বাভাবিক অর্থনীতিতে পরিণতি লাভ করে (natural economy)। এধরনের অর্থনীতিতে লেনদেন, মুদ্রার ব্যবহার কমে যায়। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলি লিপি, ভাষা ও সাহিত্য আঞ্চলিক চরিত্রলাভ করেছিল। ইউরোপেও এধরনের পরিবর্তন ঘটে চলেছিল। ধর্মের ক্ষেত্রে অসংখ্য সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল। শিল্পের ক্ষেত্রেও আঞ্চলিক শৈলীর প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। পূর্ব ভারত, ওড়িশা, মধ্য ভারত, পশ্চিম ভারত, মধ্য দাক্ষিণাত্যে আঞ্চলিক রীতি গড়ে উঠেছিল। চোল ও পল্লবদের নিজস্ব শিল্পরীতি ছিল। রায় সামন্ত প্রক্রিয়ার কথা বললেও তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেননি। সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশের মধ্যে দিয়ে আদি মধ্যযুগে উত্তরণ ঘটেছিল বলে মনে করেন একাধিক ভারতীয় ঐতিহাসিক। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রথম প্রাচীন ভারতে সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেন। পরে ডি. ডি. কোসাম্বি মনে করেন দুভাবে ভারতে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে। রাজারা নানাকারণে ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, দেবালয়, মঠ ইত্যাদিকে ভূমিদান করেন। এধরনের ভূমি হস্তান্তর থেকে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে (feudalism from above)। আবার সম্পন্ন কৃষক দরিদ্র ও প্রান্তিক চাষির অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তার ভূ-সম্পদের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে ভূস্বামী হয়ে বসেছে (feudalism from below), সামন্ততন্ত্র বিস্তার লাভ করেছে।

কোসাম্বির সামন্ততন্ত্রের ধারণা জনপ্রিয় হয়নি কারণ তিনি বিস্তৃতভাবে এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেননি। অধ্যাপক রামশরণ শর্মা ও তাঁর অনুগামী ডি. এন. ঝা ও বি. এন. এস. যাদব ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের ধারণাটিকে আদি মধ্যযুগের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শর্মার মতে, ৩০০-৬০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই ব্যবস্থার উন্মেষ ঘটেছিল, ৬০০-৯০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এর বিকাশ ঘটে এবং এর পরিণত রূপটি পাওয়া যায় ৯০০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। মহাকাব্য, পুরাণ ও ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য থেকে শর্মা দেখিয়েছেন যে কলিযুগ হলো সার্বিক সংকটের কাল। তিনি কলিযুগে যেসব সংকট দেখা দিয়েছিল সেগুলির উল্লেখ করেছেন। এগুলি হলো শাসনের অভাব, বর্ণাশ্রম ধর্মের বিপর্যয়, বহিরাক্রমণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজস্ব সংগ্রহের অসুবিধা এবং রাজকর্তৃত্বের হ্রাস। শর্মা মনে করেন যে কলিযুগের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এই সার্বিক অবক্ষয়ের পটভূমিকায় তিনি সামন্ততন্ত্রের ধারণাটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

শর্মা প্রচারিত সামন্ততন্ত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, রাজনীতিতে বিকেন্দ্রীকরণ হয়েছিল, আঞ্চলিক শক্তিগুলি স্বতন্ত্রভাবে বিকাশের পথে চলেছিল। অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব হয়, বহু আধা-স্বাধীন সামন্ত রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সামন্ত ও মহাসামন্তদের কথা সাহিত্যে ছড়িয়ে আছে, এরা পুরোপুরি স্বাধীন ছিল না, কিন্তু স্বশাসনের অধিকার ভোগ করত। রাজা ও সামন্তদের দরবার ছিল, অনেক কর্মচারী ছিল, বিভিন্ন সরকারি বিভাগ ছিল। এদের বেতনের পরিবর্তে ভূসম্পত্তি দান করা হতো। সারাদেশে বহু মধ্যস্বত্বভোগীর উদ্ভব হয়েছিল। এরা রাজা ও সামন্তদের কাছ থেকে ভূমির অধিকার লাভ করে ভূস্বামী হয়ে বসেছিল, এরাই কৃষকের ওপর কর্তৃত্ব করত। কৃষক ও রাজার মাঝখানে অবস্থিত এই সামাজিক গোষ্ঠী হলো মধ্যস্বত্বভোগী। অগ্রহার ব্যবস্থার ফলে সামন্ততন্ত্রের উত্তর ও দক্ষিণে সম্প্রসারণ ঘটেছিল। মধ্যস্বত্বভোগীরা চাষবাসের সম্প্রসারণ ঘটিয়েছিল আবার কৃষকের ওপর নানাধরনের বেআইনী কর, বেগার শ্রম ইত্যাদি চাপিয়ে ছিল। ভারতীয় ঐতিহাসিকদের অনেকে এধরনের ভূস্বামীকে ইউরোপের ভূস্বামীদের (লর্ড, ভ্যাসাল) সঙ্গে তুলনা করেছেন। এদের অধীনস্থ ভূমিকে 'ফিফ' বলতে দ্বিধা করেননি।

দ্বিতীয়ত, শর্মা ও তার অনুগামীরা মনে করেন যে সামন্ত ব্যবস্থার উদ্ভবের ফলে শিল্প-বাণিজ্য নির্ভর নগর জীবনে অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল, মুদ্রার ব্যবহার কমেছিল। গ্রামকেন্দ্রিক স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ ঘটেছিল। বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মানুষ জীবিকার প্রয়োজনে গ্রামে চলে যায়, গ্রামে এক ধরনের স্বয়ম্ভর অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল। গ্রামে যজমানি ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। গ্রামের কর্মকার, কুম্ভকার, চর্মকার সারাবছর ধরে কৃষকের প্রয়োজনীয় পণ্য ও পরিষেবা সরবরাহ

করত, ফসল উঠলে উৎপন্ন ফসলের একটি অংশ পারিশ্রমিক হিসেবে পেত। সামন্তব্যবস্থায় কৃষকের অবস্থার অবনমন ঘটেছিল, কৃষক হল 'বদ্ধ হল' বা আশ্রিত হালিক। তার স্বাধীনতা ছিল না, দেয় খাজনার হার ছিল বেশ উঁচু, তাছাড়া তাকে বেগার শ্রম দিতে হতো। আদি ঐতিহাসিক পর্বের কৃষকরা এই তুলনায় অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করত, বৈশ্যরা ছিল স্বাধীন কৃষক এবং শূদ্ররা কৃষি শ্রমিক হিসেবে কাজ করত।

তৃতীয়ত, আদি মধ্যযুগের সমাজে বর্ণপ্রথার বিস্তার ঘটেছিল, বর্ণসংকরের কথা জানা যায়। বিভিন্ন বর্ণের নর-নারীর মিলনে বর্ণসংকরের উদ্ভব হয়। কায়স্থরা শুধু নয়, চণ্ডাল ও অন্ত্যজদের মত অস্পৃশ্যদের কথা জানা যায়। সামন্তযুগে মানুষের চিন্তা-ভাবনা ছিল সামন্ততান্ত্রিক। ভক্তিবাদের প্রসার-নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ, অবিচল আনুগত্য, ভক্তি ইত্যাদি হলো সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবের সম্প্রসারণ। ভক্তিবাদের মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক আছে, সামন্ততন্ত্র এই সম্পর্কের ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল (Patron-client relationship)। শর্মার মতে, আদি ঐতিহাসিক পর্ব সামন্ততন্ত্রের মধ্যদিয়ে ধীরে ধীরে আদি মধ্যযুগে পরিণত হয়। শর্মার কাঠামোটি অনেকে গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে আছেন ডি. এন. ঝা, লালনজি গোপাল, বি. এন. এস. যাদব প্রভৃতি ঐতিহাসিকরা। হরবন্স মুখিয়া, দীনেশচন্দ্র সরকার ও ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় এই সামন্ততন্ত্রের ধারণা গ্রহণ করেননি। হরবন্স মুখিয়া মনে করেন সামন্ততন্ত্রের কাঠামোটিকে গ্রহণ করা যায় না কারণ সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের সব উপাদানের ওপর সামন্তপ্রভুর নিরঙ্কুশ আধিপত্য থাকে। ভারতের আদি মধ্যযুগে কৃষক উৎপাদনের উপকরণগুলির ওপর অধিকার বজায় রেখেছিল। সম্ভবত উৎপন্ন ফসলের ওপর ভূস্বামীর একচেটিয়া অধিকার ছিল না। সামন্তব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো চুক্তি ব্যবস্থা। সামন্তপ্রভু ও অধীনস্থ ভূস্বামীর মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে সম্পর্ক নির্দিষ্ট হতো। ভারতে এই চুক্তির অস্তিত্বের কথা জানা যায় না। শর্মা জানিয়েছেন যে আদি মধ্যযুগে ভারতের নগরগুলির অবক্ষয়ের পথে চলেছিল কারণ শিল্প ও বাণিজ্য ছিল না। অধ্যাপক ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন শিল্পপণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা ছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নানাধরনের পণ্য উৎপন্ন হতো, এর মধ্যে ছিল বস্ত্রবয়ন শিল্প, রেশম শিল্প, তেল ও চিনি শিল্প। সারাদেশে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল, ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে যাতায়াতের কোন অসুবিধা ছিল না।

সারা দেশ জুড়ে ছিল হট্ট, হট্টিকা, মণ্ডপিকা, সন্থে ও নগরম্। এসব স্থানে পণ্য বিনিময় হতো। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ছিল সজীব ও প্রাণবন্ত। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় আরো দেখিয়েছেন যে সারা দেশজুড়ে অসংখ্য শহর ছিল। অহিচ্ছত্র, অত্রঞ্জিখেরা চিরন্দ, রাজঘাট, গোপাদ্রি, সিয়াডোনি, তত্ত্বানন্দপুর প্রভৃতি নগরের কথা নিশ্চিতভাবে

জানা যায়। চট্টোপাধ্যায় এবং চম্পকলক্ষ্মী উভয়ে জানিয়েছেন যে অর্থনৈতিক জীবন ছিল গতিশীল। বৈদেশিক বাণিজ্য চলেছিল, পশ্চিম এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ভারতীয় বণিকরা বাণিজ্য করত। ভারত মহাসাগরে ভারতীয়দের বাণিজ্যের প্রমাণ আছে। অগ্রহার ব্যবস্থার ফলে কৃষির সম্প্রসারণ ঘটেছিল। কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি, জনসংখ্যাবৃদ্ধি, বাণিজ্য বৃদ্ধি ও শিল্প উৎপাদন নগরায়ণের প্রক্রিয়াকে সচল রেখেছিল। অধ্যাপক শর্মা সামন্ততন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে আদি মধ্যযুগে মুদ্রার ব্যবহার কমেছিল, স্বাভাবিক অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তাঁর এই ধারণাও গৃহীত হয়নি। অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে বাংলাদেশে প্রচুর রৌপ্যমুদ্রার চলন ছিল। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে রৌপ্যমুদ্রা পুরাণ, ধরণ, কার্ষাপণ ও দ্রম্ম লেনদেনে ব্যবহৃত হতো। সমকালীন লেখমালায় এইসব মুদ্রার উল্লেখ আছে। তাছাড়া বিভিন্ন স্থানে কড়ি খুচরো লেনদেনে ব্যবহৃত হতো। এসব কারণে আদি ঐতিহাসিক যুগ থেকে আদি মধ্যযুগে উত্তরণের মাধ্যম হিসেবে সামন্ততন্ত্রের ধারণাটি বিতর্কিত হয়ে আছে। এর সর্বজনগ্রাহ্যতা নেই, বিতর্ক চলেছে।

ভারতীয় ঐতিহাসিকরা আদি ঐতিহাসিক যুগটিকে নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করার পর সমস্যা হয়েছে আদি মধ্যযুগে উত্তরণের মাধ্যম নিয়ে। সকলেই উপলব্ধি করেছেন যে আদি ঐতিহাসিক যুগের সঙ্গে আদি মধ্যযুগের মৌলিক পার্থক্য আছে। আদি ঐতিহাসিক যুগ ভেঙে গিয়ে কীভাবে আদি মধ্যযুগ নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসহ গড়ে উঠলো তা নিয়ে আজও বিতর্ক চলেছে। বলা হয়েছে হূণ আক্রমণের সময় থেকে আদি মধ্যযুগের সূচনা হয়েছে বলে ধরা যেতে পারে। আবার অনেকে মনে করেন যে অগ্রহার ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে যে নতুন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তা হলো আদি মধ্যযুগের সূচনা। দ্বিতীয় পর্বের নগরায়ণের অবক্ষয়কে অনেকে আদি মধ্যযুগের সূচনাকাল হিসেবে গণ্য করতে চান। শহরের পতন ঘটলে পুরনো আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থারও পতন ঘটেছিল। রাষ্ট্রব্যবস্থার বিস্তার, জনপদের বিকাশ ও বর্ণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ সূচনাপর্ব হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের ধারা বিকল্প পরিবর্তন মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে।

অধ্যাপক ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় তার *দ্য মেকিং অব আরলি মিডাইভ্যাল ইন্ডিয়া* গ্রন্থে এই পরিবর্তনের চিত্রটি তুলে ধরেছেন। তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় হল তিনটি : (ক) স্থানীয় ও আঞ্চলিক রাষ্ট্র ও সমাজের বিকাশ ; (খ) উপজাতিরা কৃষিবৃত্তি গ্রহণ করেছিল নতুন জাতি তৈরি হয়েছিল এবং (গ) বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও প্রসার ঘটেছিল। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলো নতুন নতুন আঞ্চলিক ও স্থানীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব (an increasing scale of local state formation)।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেকগুলি রাজবংশ স্থাপিত হয়েছিল। ইতিহাসের আদিপর্বে মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ অঞ্চলে সাতবাহনদের রাজ্য মধ্যে বিদর্ভের স্থানীয় রাষ্ট্র হিসেবে বিকাশ লক্ষ করা যায়। তৃতীয় শতকে বকাটকদের অধীনে এই কৃষিভিত্তিক অঞ্চলে রাজ্য স্থাপিত হয়। দাক্ষিণাত্যে ইক্ষ্বাকু, পল্লব ও কদম্বরা স্থানীয় রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ে তুলেছিল। সপ্তম শতক থেকে আঞ্চলিক রাষ্ট্রের উদ্ভব ও বিকাশ হলো ঐতিহাসিক ঘটনা, এ নিয়ে কারো দ্বিমত নেই। ভারতের উত্তর ও পশ্চিমে প্রতিহার, পূর্বে পাল ও দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূটরা শক্তিশালী আঞ্চলিক রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন। সপ্তম থেকে দশম শতক হলো এদের প্রতিষ্ঠা কাল। এদের নেতৃত্বে আঞ্চলিক রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। এই রাষ্ট্র-সমাজ গঠনের প্রবণতা আদি ঐতিহাসিক পর্বের থেকে পৃথক ছিল। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় মনে করেন এ ধরনের রাষ্ট্র-সমাজ আদি মধ্যযুগে উত্তরণের মাধ্যম ছিল। রাজতন্ত্র ছিল প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থা (Monarchy became the norm of polity), এযুগে গণ-প্রজাতন্ত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না।

আদি মধ্যযুগের বর্ণ ও জাতি ব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন ঘটেছিল। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে বর্ণসংকরের কথা আছে। নিম্নবর্ণের মানুষ উচ্চতর বর্ণে আরোহণের সুযোগ পেয়েছিল (channels were available for the processes of social mobility)। বহু বিদেশী জাতি ভারতের জাতিব্যবস্থার মধ্যে গৃহীত হয়। উপজাতির লোকেরা কৃষিবৃত্তি গ্রহণ করে কৃষক হয়ে যায়। রাষ্ট্র উদ্বৃত্ত আহরণের ব্যবস্থা করেছিল, প্রভু ও অধীনস্থের সম্পর্ক (domination and subordination) তৈরি করেছিল। সমস্ত আঞ্চলিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার এটা হল বৈশিষ্ট্য। ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় রাজস্থানের রাষ্ট্র ও সমাজ গঠন প্রক্রিয়ার উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন রাজস্থানে স্থানীয় গুহিল ও চালুক্য এবং বিদেশী হূণদের নিয়ে রাজপুতদের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। গুহিলদের অহর শাখা মেবার রাজ্য স্থাপন করেছিল। রাজস্থানে ভূমিদান ও অন্যান্য অনুদান এবং জলসেচের উন্নতি কৃষির উন্নতি ঘটিয়ে রাষ্ট্র-সমাজের পত্তন করেছিল। উপজাতি ও পশুপালক সমাজের লোকেরা কৃষিকে আশ্রয় করে কৃষক হয়ে যায়। গুর্জরদের মধ্যে থেকে পশ্চিম ভারতের কয়েকটি রাজবংশের উদ্ভব হয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে একই সময়ে সব রাজ্য গড়ে ওঠেনি। ওড়িশাতে চোড়-গঙ্গ রাজারা একাদশ শতকে রাষ্ট্র স্থাপন করেন। দক্ষিণে পল্লব, পাণ্ড্য ও চোল রাজারা কৃষির উন্নতি হলে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। চোল রাজারা রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে স্বতন্ত্র ধরনের শাসনব্যবস্থা ও সমাজ গঠন করেছিল। তামিলনাড়ু অঞ্চলে জলসেচের সম্প্রসারণ ঘটলে জনবসতির সম্প্রসারণ ঘটে, রাষ্ট্র স্থাপিত হয়। পল্লব ও চোল আমলে জলসেচের সম্প্রসারণ ও নাড়ুর বিস্তারের মধ্যে সম্পর্ক লক্ষ করা যায়।

সমাজব্যবস্থার বিবর্তনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে আদি মধ্যযুগে বৈশ্য বর্ণের অবনতি হয়েছিল কারণ দূরপাল্লার বাণিজ্য কমেছিল, অপরদিকে শূদ্রদের অবস্থার উন্নতি হয়। এযুগে শূদ্র দাস বা দিনমজুর নয়, তারা কৃষির নতুন পদ্ধতি আয়ত্ত করেছিল, জমিদারকে খাজনা দিয়ে জমি চাষ করত (the new Sudras do not seem to have been recruited as slaves and hired labourers like their older counterparts)। গুপ্ত-উত্তর যুগে বিভিন্ন অঞ্চলের ভূস্বামী হলো ব্রাহ্মণ, মন্দির, কুটুম্বিন, মহত্তর, মহামহত্তর, প্রভুগোবুন্দা প্রভৃতি। কৃষকরা হলো কৈবর্ত, গুর্জর, প্রজা গোবুন্দা, রেড্ডি, কলিতা প্রভৃতি। সারাদেশে কৃষি অর্থনীতি ভিত্তিক রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ে উঠেছিল।

আদি মধ্যযুগের ধর্মীয় জীবনে বহু ধর্মমতের সহাবস্থান লক্ষ করা যায়। বৈদিক ধর্মের পাশাপাশি অবৈদিক বৌদ্ধ ও জৈনরা ছিল, সারাদেশ জুড়ে ভক্তি ধর্মের প্রসার ঘটেছিল। ভক্তিবাদে শিব ও বিষ্ণু হলেন উপাস্য দেবতা। দক্ষিণ ভারতে শৈব নয়নার ও বৈষ্ণব আলবার সাধুরা ভক্তি ধর্ম প্রচার করেন। ভক্তি ধর্মের মধ্যে পণ্ডিতরা সামন্ততান্ত্রিক প্রভু ও অধীনস্থের সম্পর্ক লক্ষ করেছেন (the relationship between god and his devote was seen as parallel to an all-pervasive feudal ideology.)। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে তন্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। অনেকে মনে করেন এটি হলো সামন্ততান্ত্রিক অবক্ষয়ের পরিচয়বাহক। বহু ধর্ম সম্প্রদায় ও মতবাদের মধ্যে মিশ্রণ ঘটেছিল। ওড়িশার পুরুযোত্তম জগন্নাথ হলেন এই ধর্ম সমন্বয়ের এক দৃষ্টান্ত। পূর্ব ভারতে শক্তি ধর্মের বিস্তার ঘটেছিল। শক্তি মতবাদের মধ্যে তন্ত্রের অনুপ্রবেশ লক্ষ করা যায়। তান্ত্রিক মতবাদের সম্প্রসারণের দৃষ্টান্ত দিয়ে যাদব দেখিয়েছেন যে সামন্ততন্ত্রের প্রসারের জন্য তা সম্ভব হয়। বর্ণাশ্রম ধর্ম তার বিশিষ্টতা হারিয়েছিল। বাংলা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বর্ণাশ্রম যে প্রভাব হারিয়েছিল তার প্রমাণ আছে। নতুন নতুন দেবদেবীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। পূর্ব ভারতে মাতৃপূজার প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। শিব, বিষ্ণু ও উমা পূজা পান। রাজস্থানে অরণ্যবাসিনী, ওড়িশায় বিরজা এবং আসামে কামাক্ষ্যা হলেন নতুন দেবী। আদি ঐতিহাসিক পর্বে এসব দেব-দেবীর কথা জানা ছিল না। ৬০০-১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রাষ্ট্র, অর্থনীতি ও সমাজে লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেছিল। আঞ্চলিক রাষ্ট্র-সমাজের প্রতিষ্ঠা হয় (the shaping of regional societies)। নতুন রাষ্ট্র ও সমাজ সম্প্রসারিত হয়েছিল, স্থানীয় ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিল্পের উদ্ভব ও বিকাশ হয়। আঞ্চলিক রাষ্ট্র-সমাজ ছিল এদের বিকাশের কেন্দ্র। সামন্ততন্ত্রের ধারণা অনেকটা ইউরোপ কেন্দ্রিক, এর মধ্যে স্ববিরোধিতা রয়েছে। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় যুগান্তরের যে ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন তা অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য কারণ তা তথ্যপূর্ণ এবং যুক্তিসম্মত। সামাজিক পরিবর্তনের বিকল্প ব্যাখ্যা হিসেবে এটিকে গ্রহণ

করা যায়। ইতিহাস-চিন্তায় ও ইতিহাসচর্চায় শেষ কথা বলে কিছু নেই। বহুমাত্রিক ইতিহাসের সন্ধান চলেছে, সেইদিকে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যাটি হলো একটি দৃঢ় পদক্ষেপ।

উপরিউক্ত তিনটি ব্যাখ্যার প্রত্যেকটির মধ্যে কিছু কিছু সত্য অবশ্যই আছে। এগুলিকে মিলিয়ে নিলে আদিপর্ব থেকে আদি মধ্যযুগে উত্তরণের প্রক্রিয়া বুঝতে অসুবিধা হয় না।

কাশ্মীরের ঐতিহাসিক কলহণ

ঐতিহাসিক কলহণ ১১৪৮-৪৯ খ্রিস্টাব্দে কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণী লিখেছিলেন। তার পিতা চম্পক ছিলেন রাজা হর্ষের মন্ত্রী (১০৮৯-১১০১)। এই সূত্রে তিনি সরকারি দলিলপত্র দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন, এর ওপর ভিত্তি করে তিনি কাশ্মীরের আদি মধ্যযুগের ইতিহাস রচনা করেন। রাজতরঙ্গিণী হলো কাব্যে লেখা ইতিহাস, কলহণ শুধু সাহিত্য সৃষ্টি করতে চাননি, তিনি কাব্যের রীতিতে ইতিহাস লিখেছেন। রাজতরঙ্গিণীতে আছে প্রাচীনকাল থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ঐ রাজ্যের ইতিহাস। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে কলহণ চার ধরনের উপাদান ব্যবহার করেছেন—ঐতিহ্য, প্রবাদ, জনশ্রুতি, লিখিত দলিল ও লেখ। কলহণ বলেছেন যে উপাদান সংগ্রহের জন্য তিনি ঐতিহাসিক স্থানগুলি পরিদর্শন করে জনশ্রুতি সংগ্রহ করেছেন। আঞ্চলিক ইতিহাস পাঠ করে তিনি তথ্য সংগ্রহ করেছেন। আঞ্চলিক ইতিহাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নীলমাতাপুরাণ, ক্ষেমেন্দ্রের নৃপাবলী, হেলরাজের পার্থিবাবলী, চবিল্লাকর প্রভৃতি। কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান হলো নীলমাতাপুরাণ। তবে অন্যান্য পুরাণের মতো এটিও ত্রুটি মুক্ত নয়। কাশ্মীরের ইতিহাসের আর একটি নির্ভরযোগ্য উপাদন হল মাহাত্ম্যগুলি, তীর্থক্ষেত্রে পুরোহিতরা ঐসব নথি রক্ষা করতেন। বিতস্তা মাহাত্ম্যে ঐ নদী বরাবর কাশ্মীরের তীর্থক্ষেত্রগুলি এবং সেখানকার ঘটনাবলীর উল্লেখ আছে।

কলহণের ইতিহাস-চিন্তার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো তিনি লেখের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনুধাবন করে ইতিহাসে তার ব্যবহার করেন। তিনি মন্দিরের লেখ, রাজাদের প্রশস্তি ও ভূমিদান সংক্রান্ত লেখের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লেখগুলিকে ইতিহাস রচনার নির্ভরযোগ্য উপাদান বলে উল্লেখ করেছেন। সেই যুগে এই বোধ ছিল অবশ্য ব্যতিক্রমী ঘটনা (he uses the information inscriptions contain as a legitimate source of history)। কলহণ তাঁর ইতিহাস রচনার তিনটি লক্ষ্যের কথা ঘোষণা করেছেন ঃ (ক) কাশ্মীরের রাজাদের ধারাবাহিক কালানুক্রম প্রতিষ্ঠা করা (to try and establish the true chronology and succession of

the kings of Kashmir)। (খ) অতীতের ওপর সুখপাঠ্য একখানি ইতিহাস তিনি লিখতে চেয়েছিলেন (to write a readable narrative on the past) এবং (গ) অতীতের ওপর কিছু মতামত প্রকাশ করে তিনি জীবনের প্রকৃতি ও অনিত্যতা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করতে চান (to reflect on the nature and impermanence of life)। এই শেষ উদ্দেশ্যের মধ্যে কলহণের ইতিহাস দর্শন ধরা পড়েছে।

ঐতিহাসিক কলহণ 'ধর্ম' ধারণার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। ইতিহাসের মধ্য দিয়ে ধর্মের বিভিন্ন রূপ যেমন ধর্মীয় জীবন, সমাজ ও আইনবিধির প্রকাশ ঘটে। ধর্মের অর্থ শুধু প্রথাগত ধর্ম পালন নয়, ধর্ম হলো সমগ্র সমাজব্যবস্থাকে রক্ষা করা। উল্লেখ করা প্রয়োজন কলহণ ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হলেও গোঁড়ামি মুক্ত ছিলেন। ধর্মের মতো ইতিহাসে কর্মেরও ভূমিকা তিনি লক্ষ করেছিলেন। শাসকের বর্তমান সমস্যাবলীর ব্যাখ্যা হিসেবে কর্মকে উপস্থাপন করা হয়েছে। রাজা ও রাষ্ট্রনেতাদের কার্যাবলীর ব্যাখ্যা হিসেবে কর্মের প্রসঙ্গ তুলেছেন সমকালীন অনেক লেখক। কর্মের ধারণার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নিয়তি তত্ত্ব (Linked to the idea of Karma was the importance given to the role of Fate in human events.)। সব সময় নিয়তি দিয়ে কলহণ পার্থিব ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করেননি, তবে মাঝে মাঝে নিয়তির প্রসঙ্গ তুলেছেন। রাজা হর্ষের ব্যর্থতা আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি নানা কারণের উল্লেখ করেছেন, এদের মধ্যে একটি কারণ হলো নিয়তি। অসৎ রাজাদের ক্ষেত্রে কলহণ দৈব প্রতিশোধ তত্ত্বের অবতারণা করেছেন (Divine Retribution)। জনগণ অত্যাচারী রাজাকে পদচ্যুত করতে পারছে, এই অবস্থায় দৈব প্রতিশোধ তত্ত্বকে তিনি উপস্থাপন করেছেন। দৈব প্রতিশোধের পরিপূরক হলো দৈব সহায়তা (Divine Pleasure)। দৈব সহায়তা পেতে হলে পুণ্যকাজের প্রয়োজন, পুণ্য কাজের একটি হলো ব্রাহ্মণদের দান-ধ্যান। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা হিসেবে কলহণ ডাকিনীবিদ্যাকেও বাদ দেননি (the use of witchcraft is not excluded amongst the many possible historical explanation of events.)।

কলহণ অতীত থেকে নৈতিক শিক্ষা আহরণে দ্বিধা করেননি (Kalhana does not hesitate to draw moral lesson from the past.)। রাজনৈতিক অস্থিরতা, গৃহযুদ্ধ ও দুর্বিপাকের মধ্যে বসে কলহণ তাঁর ইতিহাস লিখেছিলেন। সেজন্য তিনি এসব অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন, অনেকক্ষেত্রে তিনি নৈতিক, শিক্ষামূলক উপদেশ দিয়েছেন। কাশ্মীরের ভবিষ্যতের কথা ভেবে কলহণ অতিপ্রাকৃত শক্তির ওপর আস্থা স্থাপন করেছেন। কাশ্মীরের গৃহযুদ্ধের মতো পরিস্থিতি হলো কারণ অশুভ শক্তির প্রভাব পড়েছিল। কলহণের ইতিহাসচিন্তার ওপর ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ঐতিহ্যের প্রভাব পড়েছিল। এই দুই ধারায় প্রাচীন ভারতের ইতিহাস লেখা

হয়। ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের ভিত্তি হলো মহাকাব্য, পুরাণ ও ঐতিহাসিক জীবনীগ্রন্থগুলি (যেমন বাণের হর্ষচরিত)। এসব রচনার দুর্বলতা হলো সময়ের ধারণা মহাকালের প্রেক্ষিতে স্থাপন করা হয়েছে, আধুনিক সময়ের ধারণার সঙ্গে এর মিল নেই। পুরাণে ইতিহাসের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা ঐতিহাসিকের বিচারে গ্রাহ্য হয় না। ধর্ম হলো সমাজ ও দর্শনের ভিত্তি, বর্ণাশ্রম ধর্ম দিয়ে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সমাজ ও ধর্মের ব্যাখ্যায় জোর দেওয়া হয়েছে পরিবার, জাতি ও উপজাতির ওপর, ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্য থেকে বৌদ্ধ ঐতিহ্য অবশ্যই স্বতন্ত্র ছিল। বৌদ্ধ ঐতিহ্যে সময়ের ধারণা পরিষ্কার, বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণকে কেন্দ্র করে ইতিহাসের ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সিংহলী ইতিবৃত্ত *দীপবংশ* ও *মহাবংশে* এই ধারা অনুসৃত হয়েছে। বৌদ্ধ ঐতিহ্যে কর্মকে স্বীকার করে নিয়ে ব্যক্তির ভূমিকার কথা বলা হয়। বৌদ্ধ ঐতিহ্য অনুযায়ী অতীত থেকে নৈতিক ও সামাজিক শিক্ষা লাভ করা যায়। বৌদ্ধধর্ম প্রচার করা হয়, দেশে-বিদেশে ধর্ম প্রচারক পাঠানো হয়েছিল, এদের ইতিহাস লেখা হয়েছিল। এগুলিকে কেন্দ্র করে ইতিহাস-চিন্তা গড়ে ওঠে, ইতিহাস লেখা হয়।

কলহণের ইতিহাস চিন্তার ওপর এই দুই ঐতিহ্যের প্রভাব পড়েছিল। কলহণের ইতিহাসের প্রথম অংশ ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের ওপর নির্ভর করে লেখা হয়েছিল। প্রথম তিন পরিচ্ছেদ নীলমাতাপুরাণের তথ্যের ওপর নির্ভরশীল। চতুর্থ পরিচ্ছেদে আছে কারকোতা রাজবংশের ইতিহাস, বর্ণনা অষ্টম শতক পর্যন্ত চলে এসেছে। এই সময় থেকে কলহণ উত্তরের বৌদ্ধ ঐতিহ্যকে ব্যবহার করে তার ইতিহাসকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়েছেন। চীনের তাঙ্ (Tang) রাজবংশের ইতিহাস থেকে কাশ্মীরের ইতিহাসের কিছু উপাদান পাওয়া যায়। সম্ভবত রাজা চন্দ্রপীড় আরবদের বিরুদ্ধে চীনের সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন কারণ তিনি কাশ্মীরের ওপর আরব আক্রমণের আশঙ্কা করেছিলেন। চীনের প্রভাবে কাশ্মীরের রাজারা রাজবংশের ইতিহাস ও দলিল-দস্তাবেজ সংরক্ষণের কথা ভেবেছিলেন এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম পরিচ্ছেদে ধর্ম ও কর্মের বাইরে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর কার্যকারণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আছে। কলহণ ইতিহাসের মধ্যে কারণ খুঁজেছেন, শুধু তথ্য সরবরাহ করে তাঁর কর্তব্য শেষ করেননি। গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে অষ্টম পরিচ্ছেদে কলহণ তাঁর ঐতিহাসিক চিন্তার পরিণত রূপটিকে তুলে ধরেছেন। এই পরিচ্ছেদটি হলো সবচেয়ে দীর্ঘ, তার সমকাল এবং এর ঘটনাবলীর সঙ্গে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। এই পরিচ্ছেদে ঘটনাবলী বিশ্লেষণের ধরনটিও পাল্টে গেছে।

প্রাচীনকালে কাশ্মীরের ভূপ্রকৃতির বর্ণনা দিয়ে কলহণ তার ইতিহাস শুরু করেছেন। কাশ্মীর ছিল একটি স্থলমধ্যস্থ হ্রদ (inland lake), দৈবশক্তি এই জল বার করে দিয়ে

কাশ্মীরের পত্তন করেছিল। কাশ্মীরের প্রথম দিককার রাজারা হলেন পৌরাণিক চরিত্র, মহাকাব্যের যুগের সমসাময়িক। কাশ্মীরের রাজা প্রথম গোনাড়া ছিলেন মহাভারতের বীর জরাসন্ধের আত্মীয় এবং এই যুদ্ধে তিনি যোগ দেন। নীলমাতাপুরাণে এই কাহিনী আছে, প্রধান পুরাণ কাহিনীগুলির সঙ্গে তাকে যুক্ত করা হয়েছে। মৌর্য শাসক অশোক কাশ্মীরের অধীশ্বর ছিলেন, ভারতের ইতিহাসের সঙ্গে কাশ্মীর যুক্ত হয়েছে। তিনি অনেকগুলি স্তূপ নির্মাণ করেন, শ্রীনগরের তিনি প্রতিষ্ঠাতা, বৌদ্ধ সূত্র থেকে এই উপাদান সংগ্রহ করা হয়। রাজতরঙ্গিণীর আগের পরিচ্ছেদগুলিতে অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রাধান্য আছে। কাশ্মীরে দুর্ভিক্ষ হয়েছে ঈশ্বরের অভিশাপে। রানি প্রার্থনা করেছেন, ধীরে ধীরে দুর্ভিক্ষের কালোছায়া অপসারিত হয়েছে। সন্ধিমতার কাহিনীটি প্রকৃতই রোমাঞ্চকর, রাজা তাকে বন্দী করে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। ডাকিনীরা তার হাড়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে, তিনি রাজা জয়েন্দ্রর উত্তরাধিকারী হয়েছেন। ভাগ্য তার প্রতি সুপ্রসন্ন, ভাগ্যগুণে তিনি রাজা হন এবং কাশ্মীরকে নাগ দুর্দৈব থেকে রক্ষা করেন। রাজা হর্ষের শত্রু বিজয়মল্ল তাকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, তুষার ঝড়ে তিনি নিহত হন। কাশ্মীরে বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়তা লক্ষ করে নাগ ও ব্রাহ্মণরা তাদের ধ্বংসের জন্য তুষারের সাহায্য নিয়েছেন। কলহণ রাজা ললিতাদিত্যের সময়কার একটি কাহিনী শুনিয়েছেন। মধ্য এশিয়ার অধিবাসী কানকুনা (Cankuna) নদীকে বশ করতে জানতেন। পাঞ্জাবের নদীর মধ্যে রাস্তা তৈরি করে দিয়ে তিনি তার ক্ষমতা দেখিয়েছিলেন। মোজেস ও তার লোহিত সাগরের কাহিনী কাশ্মীরে প্রবেশ করেছে।

ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাখ্যায় মানুষের কর্ম ও পুণ্যকে ব্যবহার করেছেন কলহণ। রাজার যদি পুণ্য না থাকে, প্রজারা যদি পাপী হয় তাহলে সদিচ্ছা থাকলেও রাজা কোনো ভাল কাজ করতে পারবেন না। এর অর্থ এই নয় যে রাজা নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকবেন, এর অর্থ হলো রাজার কর্মের পথে কী ধরনের বাধা আসতে পারে তার ব্যাখ্যা। সপ্তম ও অষ্টম পরিচ্ছেদে কলহণের ইতিহাস ভাবনার পরিবর্তন ঘটেছে। অতিপ্রাকৃত শক্তি, নিয়তি সবই আছে, কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনার কার্য-কারণ এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে এসব শক্তি প্রাধান্য হারিয়েছে। ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাখ্যা করা হয়েছে ব্যক্তি, ব্যক্তির উচ্চাকাঙ্ক্ষা, দুর্বলতা, সামন্তপ্রভুদের উত্থান ইত্যাদি দিয়ে। কাশ্মীরে ডমর (সামন্ত প্রভু) ও ব্রাহ্মণরা রাজনীতিতে প্রাধান্য স্থাপন করেছিল। অর্থনৈতিক পরিস্থিতির জন্য পরিবর্তন ঘটে বলে কলহণ স্বীকার করে নেন। একাদশ ও দ্বাদশ শতকের ইতিহাসের জন্য কলহণ নিজের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করেছেন। তিনি ঐতিহাসিক ঘটনার জন্য একাধিক কারণকে দায়ী করেছেন (He recognised the multiplicity of causes.)।

রাজা হর্ষের দুর্ভাগ্যের জন্য তিনি তার জন্মক্ষণে গ্রহের অবস্থান ও নিয়তিকে দায়ী করেছেন। হর্ষ দুর্বল হয়ে পড়েন কারণ তিনি যুদ্ধ পরিহার করে চলেন। সেযুগে যুদ্ধের মাধ্যমে অনেক সমস্যার সমাধান করা হতো। তাঁর বিচারবুদ্ধি তেমন তীক্ষ্ণ ছিল না, তিনি অযোগ্য ব্যক্তিদের মন্ত্রীপদে বসিয়ে তাদের পরামর্শের ওপর নির্ভর করেছিলেন। কোনো কুচক্রী মহিলার পরামর্শ গ্রহণ করাকে তিনি রাজার পক্ষে দুর্ভাগ্যজনক বলে মনে করেন। মধ্যযুগের কাশ্মীরে দুটি রাজনৈতিক-সামরিক গোষ্ঠী ছিল—তন্ত্রী ও একাঙ্গ (Tantrins and Ekangas), দশম শতকের প্রথমার্ধে তারাই রাজাকে সিংহাসনে বসাত, আবার পদচ্যুত করত (they made and unmade rulers)। কলহণ এদের দরবারি রাজনীতির পরিচয় দিয়েছেন। পরের শতকে ক্ষমতা শুধু রাজা ও মন্ত্রীদের হাতে ছিল না, সামন্ত ডমররাও এর অংশীদার হয়েছিল। ডমররা হলো ভূমি-নির্ভর সামন্ত, সরকারি কর্মচারী হিসেবে তারা জমি পেয়েছিল, উর্বর উপত্যকা অঞ্চলে এরা ছিল শক্তিশালী। রাজপরিবার ও রাজপুত পরিবারে এরা বিয়ে করত, সামাজিক মর্যাদার অধিকারী হয়ে উঠেছিল। এই সামন্তরা ছিল রাজতন্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী, এরা অনেক ঘটনা ঘটিয়েছিল।

শাসনকাঠামো আলোচনা প্রসঙ্গে কলহণ কায়স্থদের নিন্দা করেছেন, তারা ছিল রাষ্ট্রের অনেক দুর্ভাগ্যের কারণ। শাসনব্যবস্থার তারা ছিল মেরুদণ্ড, তবে তারা ষড়যন্ত্র করত, রাজাকে অত্যাচার করতে উৎসাহ দিতো। রাজা এদের পরামর্শ অনুযায়ী চলে জনগণের আস্থা হারিয়েছিলেন। নবম শতকে রাজা শংকরবর্মন এদের কথামত মন্দির ও প্রজাদের লুণ্ঠন করে অর্থ সংগ্রহ করেন। ডমর ও কায়স্থরা কাশ্মীরকে শোষণ করেছে। পেশাদারি প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সম্ভবত কলহণের মনে কায়স্থদের সম্পর্কে বিরাগ তৈরি হয়েছিল। কায়স্থদের প্রশাসনের উচ্চপদে নিয়োগ ব্রাহ্মণরা পছন্দ করত না। কলহণ যে নিরপেক্ষ ছিলেন তার উদাহরণ হলো তিনি ব্রাহ্মণদের প্রতিষ্ঠান পুরোহিত পরিষদের সমালোচনা করেছিলেন। মন্দির ও তীর্থস্থানে পুরোহিতদের এধরনের সংগঠন ছিল, মন্দিরের সব স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির এরা হন অধিকারী। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুরোহিত পরিষদের সদস্যরা ছিলেন প্রভাবশালী। কলহণ মনে করেন এরাই রাষ্ট্রের শাসনে হস্তক্ষেপ করে। তবে তিনি একথাও বলেছেন যে একজন ভাল রাজা ব্রাহ্মণদের উদারভাবে অনুদান দেবেন। ব্রাহ্মণদের ঐতিহ্যগত অধিকারকে তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন। সামন্ত প্রভু ডমররা, রাজপুত্র, মন্ত্রী ও ব্রাহ্মণরা রাষ্ট্রের ষড়যন্ত্রের জন্য দায়ী বলে তিনি মনে করেন। প্রথম তিনটি হল বিভেদকামী শক্তি ; ব্রাহ্মণরা উৎপীড়ক রাজা বা মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনশন করলে দোষের হয় না। এসব সামাজিক গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অবস্থা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার মধ্যে যোগসূত্র কলহণ লক্ষ করেছেন। তার ইতিহাসের দ্বিতীয়ার্ধে তিনি ডমরদের

ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অর্জনের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন। রাজকর্তৃত্বের দুর্বলতার কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ হলো গ্রামের স্বাচ্ছন্দ্য, দুর্গগুলির দুরবস্থা, রাজকর্মচারীদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক ইত্যাদি। রাজা যদি জনগণকে উৎপীড়ন করেন, মন্দির লুণ্ঠন করেন দেশে দুর্ভাগ্য নেমে আসে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে অত্যাচারী রাজাকে বাধা দিতে হবে। শংকরবর্মন মন্দির লুঠ করেন, অনুদান অধিগ্রহণ করেন, বেগার শ্রম আদায় করেন। হর্ষ ক্ষমতা হারিয়েছিলেন কারণ তিনি মন্দির লুঠ করেন, তাঁর এক অফিসার দেবমূর্তি ভেঙেছিল। শাস্ত্রে রাজাকে জনগণের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে (the King's primary duty is to protect his people and attend to their welfare.)। একজন অত্যাচারী শাসক তার দুর্ভাগ্যের জন্য নিজেই দায়ী।

রাজতরঙ্গিণীর শেষ দিকে কলহণ একজন আধুনিক ঐতিহাসিকের মতো আচরণ করেছেন। এজন্য কলহণের রচনা সংস্কৃত সাহিত্যে অনন্য বলে গণ্য হয়। বিভিন্ন প্রদেশের ইতিহাস লেখা হয়েছে, জীবনীমূলক ইতিহাস রচনার সম্প্রসারণ ঘটেছে, বিশেষ করে গুপ্ত-উত্তর যুগে, বংশাবলী, বংশ তালিকার সংখ্যাও কম নয়। এসবের মধ্যে রাজতরঙ্গিণী স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর হয়ে আছে (the Rajtarangini holds a position of pre eminence.)। প্রশ্ন উঠেছে কাশ্মীরের এমন উন্নতমানের ইতিহাস রচনা কীভাবে সম্ভব হয়। ভৌগোলিক দিক থেকে কাশ্মীর ছিল বিচ্ছিন্ন, সেজন্য সেখানে জাতীয়তাবাদ ছিল অনেক বেশি শক্তিশালী। কাশ্মীরে বৌদ্ধ ঐতিহ্যের প্রভাব ছিল বেশি, আর বৌদ্ধ ঐতিহ্য ইতিহাসচর্চায় ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের চেয়ে এগিয়েছিল। কাশ্মীরের ওপর গ্রীক, চীনা ও তুর্কি শাসকদের প্রভাব পড়েছিল, এদের প্রত্যেকের সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক ঐতিহ্য ছিল। বিচ্ছিন্ন হলেও কাশ্মীর একেবারে বিচ্ছিন্ন ছিল না, কাশ্মীরের ওপর গান্ধার, উত্তর ভারত, মধ্য এশিয়া ও চীনের প্রভাব ছিল। সারা ভারতে আঞ্চলিকতার প্রসার ঘটেছিল, ছোট ছোট রাজারা স্থানীয় সংস্কৃতি, স্থানীয় সমস্যা ও স্থানীয় ঘটনাকে বেশি গুরুত্ব দেন। আঞ্চলিক সংকীর্ণতা দেখা দিয়েছিল। এর ফলে স্থানীয় বুদ্ধিজীবী স্থানীয় বিষয়ের ওপর দৃষ্টিনিবদ্ধ করেন, কলহণ সেই কাজই করেছেন। তিনি কাশ্মীরের ডমরদের কথা বলেছেন, ভারতের সামন্তদের কথা বলেননি।

কলহণ বৌদ্ধধর্মের সমর্থক ছিলেন না, কিন্তু তাঁর চিন্তা-ভাবনার ওপর এর প্রভাব পড়েছিল। বৌদ্ধ আকর থেকে তিনি অনেক উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। গ্রীক, চীনা ও ইসলামী ঐতিহ্যের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল। এসব ভাষা তিনি জানতেন না, তবে সংস্কৃতির সমন্বয় হয়েছিল এই অঞ্চলে (cultural osmosis), কলহণ তা থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন। রাজতরঙ্গিণীতে কলহণ যে ইতিহাস-চিন্তা ও পদ্ধতির প্রয়োগ করেছেন তা তার আগে বা পরে ছিল না। এজন্য কলহণের কৃতিত্ব অবশ্যই

প্রাপ্য। তার পরের ঐতিহাসিকরা জনরাজ, শ্রীভর, প্রজ্ঞাভট্ট এবং শুক এই উন্নতমানের ইতিহাস-চিন্তার পরিচয় দিতে পারেননি। কলহণের বিশ্লেষণী ক্ষমতা এদের চেয়ে বেশি ছিল। রাষ্ট্র অবক্ষয়ের মধ্য দিয়ে চলেছিল, কলহণ গভীরভাবে তার কারণ অনুসন্ধান করেছিলেন। তিনি ছিলেন মন্ত্রী চম্পকের পুত্র। কীভাবে ইতিহাস তৈরি হয় সেই প্রক্রিয়ার সম্যক জ্ঞান তার ছিল যদিও তিনি নিজে এর অংশীদার ছিলেন না। ভেতর ও বাইরের থেকে তিনি পরিস্থিতি দেখেছিলেন, তিনি তোষামোদী ইতিহাস রচনার কথা ভাবেননি (sycophant's history)। পরিস্থিতি অনুধাবন করে তিনি ইতিহাস লিখেছেন, বিদেশী প্রভাবে প্রভাবিত কলহণ প্রথাগত ইতিহাস লেখেননি, লিখেছেন নতুন ধরনের তথ্যভিত্তিক, বিশ্লেষণ নির্ভর, নিরপেক্ষ ইতিহাস। রক্ষণশীল ঐতিহ্য তিনি বাতিল করেননি, নিজের মনকে মুক্ত ও স্বাধীন রেখেছিলেন (Kalhana was not a man with a closed mind.)। একজন সৎ ঐতিহাসিকের পক্ষে তা হলো একান্তভাবে আবশ্যিক (an essential qualification for a good historian)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইতিহাসের উপাদান ঃ সাহিত্য, মুদ্রা, লেখ, বিদেশী পর্যটক

ঐতিহাসিকরা মনে করেন ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ভারতের ইতিহাসে আদি মধ্যযুগের সূচনা হয়েছে। হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের পতন থেকে ভারতে নতুন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার শুরু হয়। সাম্রাজ্যিক ঐক্য নষ্ট হয়েছিল। উত্তর ও পশ্চিম ভারতে প্রতিহাররা, পূর্ব ভারতে পাল রাজারা, দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূটরা এবং সুদূর দক্ষিণে চোলরা শক্তিশালী রাষ্ট্রব্যবস্থা স্থাপন করেছিল। প্রতিহার, পাল ও রাষ্ট্রকূটদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলেছিল প্রায় দুশো বছর ধরে। অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন যে ১০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ভারতে মধ্যযুগের শুরু হয়েছে।[১] পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত ভারতে মধ্যযুগ চলেছিল বলে স্যার যদুনাথ সরকার অভিমত প্রকাশ করেছেন।[২] মধ্যযুগের ইতিহাসচর্চা নিয়ে নানা ধরনের বিতর্ক আছে। ভারত ইতিহাসচর্চার সঙ্গে যেসব ঐতিহাসিক যুক্ত হয়েছেন তাঁদের তিনভাগে ভাগ করা যায়—জাতীয়তাবাদী, মার্কসবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী। মধ্যযুগের ইতিহাস রচনায় জাতীয়তাবাদী অবস্থান নিয়েছেন দীনেশচন্দ্র সরকার, কিশোরীশরণ লাল, পরমাত্মা শরণ, আর. পি. ত্রিপাঠী ও এ. এল. শ্রীবাস্তব। সামগ্রিকভাবে জাতীয় জীবনের উত্থান ও পতনের ইতিহাসকে এঁরা তুলে ধরার প্রয়াস চালিয়েছেন। দ্বিতীয় ধারাটি হলো মার্কসবাদী। মার্কসের ইতিহাসের ব্যাখ্যাকে কাঠামো হিসেবে ধরে নিয়ে এঁরা ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। মার্কসের ব্যাখ্যায় মধ্যযুগের সমাজ হলো সামন্তসমাজ। ভারতে এঁরা সামন্তব্যবস্থার উদ্ভব ও পতন লক্ষ করেছেন। এই পর্বের মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের মধ্যে আছেন রোমিলা থাপার, রামশরণ শর্মা, মুহম্মদ হাবিব, ইরফান হাবিব, শিরীন মুসবি, সতীশচন্দ্র ও অন্যান্য ঐতিহাসিকরা। রামশরণ শর্মা ও তাঁর অনুগামী ডি. এন. ঝা এবং বি. এন. এস. যাদব আদি মধ্যযুগের ভারতে সামন্তব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশের কথা বলেছেন। হরবন্‌স মুখিয়া ও দীনেশচন্দ্র সরকার এই তত্ত্বের বিরোধিতা করেছেন।

মধ্যযুগের ইতিহাসের একটি ধারা আলিগড়ের বিশিষ্ট ঐতিহাসিকদের কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এইসব ঐতিহাসিকদের বেশিরভাগ মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। এরা সযত্নে মধ্যযুগের ইতিহাসের যুক্তিপূর্ণ, বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। এঁদের বক্তব্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে ঃ (ক) মুসলমান আক্রমণকারীরা সাম্রাজ্য

১. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *দ্য ভেডিক এজ*, পৃ. ২৪।
২. স্যার যদুনাথ সরকার, *হিস্ট্রি অব বেঙ্গল*, দ্বিতীয় খণ্ড।

ও সম্পদের লোভে ভারতে এসেছিল। পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষা দ্বারা তারা প্ররোচিত হয়েছিল, কখনো কখনো তারা ধর্মকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছে। (খ) মুসলমান শাসকেরা রাষ্ট্রস্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়েছে, রাষ্ট্রীয় কারণে তাদের নীতির মূলসূত্রগুলি রচিত হয়েছে। (গ) এঁদের মতে, পৃথিবীর সব দেশে, সব শাসকগোষ্ঠী হলো স্বার্থপর, দুর্নীতিপরায়ণ, ভারত এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। ভারতের শাসকগোষ্ঠী সমানভাবে স্বার্থপর ও দুর্নীতিপরায়ণ। (ঘ) এঁরা মনে করেন মধ্যযুগের ইতিহাস পাঠের সময় সমকালীন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের অগ্রগতির অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। অন্যত্র যে পরিবর্তন ঘটেছে তার পটভূমিতে স্থাপন করে ভারতের ইতিহাসচর্চা করা প্রয়োজন। ভারত ইতিহাসচর্চার তৃতীয় ধারাটি হলো সাম্রাজ্যবাদী। সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নামগুলি হলো ভিনসেন্ট স্মিথ, ডডওয়েল, ওয়েসলি হেগ ও মোরল্যান্ড। এঁরা ভারতের মধ্যযুগকে বিশৃঙ্খল ও শোষণমূলক বলে চিহ্নিত করেছেন। এঁদের মতে সম্রাট হর্যবর্ধনের মৃত্যুর পর ভারতের ওপর দুর্ভাগ্য নেমে এসেছিল, অরাজকতা ও অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহ চলেছিল। ভিনসেন্ট স্মিথ সবসময় এই সত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালিয়েছেন যে, ব্রিটিশ শাসনের আগে ভারতে কখনো অব্যাহত শান্তি ও নিরবচ্ছিন্ন প্রগতি দেখা যায়নি (V. A. Smith never concealed his anxiety to prove the beneficence of the British Raj by holding before his readers the picture of anarchy and confusion which, in his view, has been the normal condition in India with rare intervals.)।

ঐতিহাসিকদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য, আদর্শবাদ বা অবস্থানের স্বাতন্ত্র্য ইতিহাস-চর্চার ক্ষতি করে না। বরং ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একই ঘটনাকে দেখার সুযোগ হয়। ইতিহাস বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে বর্ণময় ও উজ্জ্বল। উন্নতমানের ইতিহাস রচনা সম্ভব হয়েছে। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস পদ্ধতির চলন হয়েছে। ঐতিহাসিক পক্ষপাতশূন্যভাবে, ভয়লেশহীন হয়ে ইতিহাস লিখবেন এটাই কাম্য। সত্যকে প্রকাশ করা হলো ঐতিহাসিকের ধর্ম। ঐতিহাসিক তাঁর বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী যাকে সত্য বলে মনে করবেন সেটাই ঐতিহাসিক সত্য। তবে তাঁকে নির্মোহ ও নৈর্ব্যক্তিক হতে হবে (Our aim should be the discovery of the truth, and nothing but the truth, and in order to attain this goal we must apply our minds fearlessly and without prejudice and preconceptions to the study of available evidence.)।

আদি মধ্যযুগের ইতিহাসের রাজনৈতিক দিকটি কিছুটা অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত। তবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে তথ্যের অভাব নেই। সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অনেক উপাদান লেখগুলিতে ছড়িয়ে আছে। তবে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পঠনপাঠনের সময় রাজনৈতিক কাঠামোটি মনে রাখা দরকার।

পৃথিবীর বিশিষ্ট ঐতিহাসিকরা রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে ধর্ম, দর্শন, শাসন, আইন ইত্যাদির পঠন-পাঠনের কথা বলেছেন। আদি মধ্যযুগের ইতিহাসের উপাদানগুলিকে তিনভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায় ঃ (ক) সাহিত্য, (খ) লেখ ও (গ) মুদ্রা। এযুগের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় উপাদান হলো সাহিত্য। এযুগে অনেকগুলি ঐতিহাসিক গ্রন্থ লেখা হয়েছে। প্রথমে উল্লেখ করতে হয় হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্টের লেখা *হর্ষচরিত*। বাণভট্ট গদ্যে ও পদ্যে এই গ্রন্থটি লেখেন। ইতিহাসের উপাদান হিসেবে এই গ্রন্থখানি খুব নির্ভরযোগ্য নয় কারণ বাণভট্ট তাঁর পৃষ্ঠপোষকের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। বাণভট্ট হর্ষের কৃতিত্বকে বেশি করে দেখিয়েছেন, প্রতিদ্বন্দ্বীদের কালিমালিপ্ত করেছেন। তিনি বাংলার রাজা শশাঙ্ককে 'গৌড় ভুজঙ্গ' বলে উল্লেখ করেছেন। বাণভট্ট ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষতা বজার রাখতে পারেননি। বিলহন শেষদিককার চালুক্য বংশীয় রাজা ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের জীবনী লিখেছেন। গ্রন্থখানির নাম হলো *বিক্রমাঙ্কদেবচরিত*। বাক্‌পতি লিখেছেন *গৌড়বহ* কাব্য। প্রাকৃত ভাষায় লেখা *গৌড়বহ* (গৌড়বধ) হলো কনৌজ রাজ যশোবর্মনের বঙ্গবিজয়ের এক কল্পনা মিশ্রিত ঐতিহাসিক কাব্য। সন্ধ্যাকর নন্দী লিখেছেন *রামচরিত*। এই গ্রন্থখানি হলো পালরাজা রামপালের ইতিহাস। এই গ্রন্থে রামপালের সময়কার কৈবর্ত বিদ্রোহের উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থখানি দ্ব্যর্থবোধক, অর্থাৎ এই গ্রন্থে রামপালের ইতিহাস আবার অন্যভাবে দেখলে অযোধ্যার রামচন্দ্রের ইতিহাস পাওয়া যায়। সন্ধ্যাকর নন্দী পালরাজা রামপালের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন, এজন্য তাঁর রচনা সর্বাংশে নির্ভরযোগ্য নয়।

জৈনগুরু জয়সিংহ লেখেন *কুমারপালচরিত*, পালি ভাষায় রচিত এই গ্রন্থে দ্বাদশ শতকের চালুক্য বংশীয় শাসক কুমারপালের ইতিহাস পাওয়া যায়। পদ্মগুপ্ত লিখেছিলেন *নবশশাঙ্কচরিত* (১০০৫), গুর্জর বংশীয় সিন্ধুরাজ নবশশাঙ্কের জীবনী হলো এই গ্রন্থ। এই জীবনী গ্রন্থগুলি কখনো ইতিহাস বলে বিবেচিত হতে পারে না। পৃষ্ঠপোষক রাজাদের মনোরঞ্জনের জন্য এইসব ইতিহাস লেখা হয়। কাব্য হিসেবে হয়তো এগুলির কিছুটা মূল্য আছে, নিরপেক্ষ ইতিহাস হিসেবে এগুলিকে গণ্য করা যায় না। সাহিত্যে নৈপুণ্য দেখানোর জন্য তাঁরা এগুলি লিখেছিলেন (Their object was the glorification of the King rather than to give a true picture of his life and times, and they were mostly conceived by their authors not as historical texts, but primarily as mediums for showing their literary skill and ingenuity.)। প্রাদেশিক ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ রচনা হলো কলহণের *রাজতরঙ্গিণী* (১১৪৯-৫০)। আদি মধ্যযুগের ভারতে কাব্যে রচিত এই গ্রন্থখানি হলো বিজ্ঞানসম্মতভাবে লেখা ইতিহাস। কলহণ বহু উৎস থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তাঁর ইতিহাস লেখেন। তিনি ইতিহাস রচনার যে পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন তা এককথায় বিস্ময়কর। কলহণ

ঐতিহাসিক হিসেবে যুগকে অতিক্রম করেছেন। আধুনিক কালের বিশ্লেষণমূলক ইতিহাস রচনা পদ্ধতির ধারণা কলহণ আয়ত্ত করেছিলেন। ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে কলহণ লিখেছেন যে, ঐতিহাসিক প্রীতি ও বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হয়ে সত্যকে শুধু প্রকাশ করবেন। তিনি শুধু ইতিহাস পড়ে ইতিহাস লেখেননি, রাজাদের অনুশাসন, লেখ, লিখিত ইতিহাস সব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুশীলন করে তবেই তিনি ইতিহাস লেখায় হাত দেন। তথ্যের অভাবে তিনি কাশ্মীরের আদিপর্বের ইতিহাস লিখতে পারেননি, সপ্তম শতক থেকে তিনি কাশ্মীরের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস উপহার দিয়েছেন। নিরপেক্ষভাবে তিনি ঘটনা ও চরিত্রের মূল্যায়ন করেছেন, নির্মোহভাবে তিনি কাশ্মীরের দুঃখ-দুর্দশা এবং উত্থান-পতনের ইতিহাস লিখে রেখেছেন। পরবর্তীকালে অন্যান্য ঐতিহাসিকরা তাঁকে অনুসরণ করেছেন। কাশ্মীরের মতো গুজরাটের লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায়। সোমেশ্বর লিখেছেন *রসমালা* ও *কীর্তিকৌমুদী*, মেরুতুঙ্গ লেখেন *প্রবন্ধ চিন্তামণি*, বালচন্দ্র লিখেছিলেন *বসন্তবিলাস*। এসব গ্রন্থে জনশ্রুতি ও ইতিহাস মিশে গেছে। এসব থেকে উপাদান সংগ্রহ করে গুজরাটের ইতিহাস লেখা যায়। চালুক্যদের ইতিহাস পাওয়া যায় লেখ ও সাহিত্যে। *বংশাবলীতে* নেপালের ইতিহাস পাওয়া যায়, তবে খুব সাবধানে এই গ্রন্থ থেকে ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করতে হয়।

আদি মধ্যযুগের ইতিহাসের একটি বড় উপাদান হলো পুরাণ। পুরাণের সংখ্যা হলো আঠারো কিন্তু সব পুরাণে ঐতিহাসিক উপাদান নেই। রামশরণ শর্মা পুরাণকে ব্যবহার করে তাঁর সামন্ততন্ত্রের তত্ত্ব খাড়া করেছেন। *ভাগবৎ পুরাণ* ও *বৃহদ্ধর্ম পুরাণ* থেকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বহু তথ্য আহরণ করা হয়েছে। রাজনৈতিক ইতিহাস নির্মাণে পুরাণ বিশেষ কাজে লাগে না, তবে আর্থ-সামাজিক ইতিহাস রচনায় পুরাণকে অগ্রাহ্য করা হয় না। চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ সপ্তম শতকের মধ্যভাগে ভারতে এসেছিলেন, ৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি দেশে ফিরে যান। তিনি বৌদ্ধ সম্রাট হর্ষবর্ধনের আতিথেয়তা লাভ করেন, বিস্তৃত অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। বৌদ্ধধর্ম, তীর্থস্থান, দর্শন নিয়ে আলোচনা করলেও তাঁর গ্রন্থে সম্রাট হর্ষবর্ধন এবং সমসাময়িক অন্যান্য রাজাদের কথা আছে। যেসব অঞ্চল তিনি পরিভ্রমণ করেন তাদের কথা তাঁর গ্রন্থে পাওয়া যায়। সাধারণভাবে তিনি ভারতবর্ষের কথাও উল্লেখ করেছেন। হিউয়েন সাঙের গ্রন্থের নাম *সি-উ-কি* (SiYuKi), তাঁর জীবনী লিখেছেন হুই-লি। *সি-উ-কি* (পশ্চিমী দেশগুলির স্মৃতি)-তে ঐতিহাসিক উপাদান আছে, তবে সম্রাটের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব ঐতিহাসিকদের চোখে পড়েছে। তিনি ধর্মীয় আবেগ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, সুতরাং তাঁর লেখা পুরোপুরি ঐতিহাসিক নয়। সপ্তম শতাব্দীর শেষে ই-সিং ভারতে এসেছিলেন এবং বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস লেখেন, তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের পরিচয় দিয়েছেন।

অষ্টম শতক থেকে আরব লেখকরা ভারতের কথা লিখেছেন। আরব বণিক, ভূগোলবিদ এবং পর্যটকরা ভারত সম্পর্কে লিখেছেন। এঁদের মধ্যে তিনজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আরব বণিক সুলেমান ৮৫১ খ্রিস্টাব্দে ভারতে এসেছিলেন। তিনি দেবপালের সাম্রাজ্যে পরিভ্রমণ করে এর একটি বিররণী লেখেন। তিনি পালরাজ্যকে বলেছেন রুহ্‌মা (Ruhma)। পালরাজা প্রতিবেশী প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিলেন। তবে তাঁর সৈন্যবাহিনী প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিল। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, পালরাজাদের পঞ্চাশ হাজার হাতি ছিল। সৈন্যবাহিনীর পোশাক তত্ত্বাবধানের জন্য ছিল দশ থেকে পনেরো হাজার লোক। এই উক্তি থেকে পালরাজাদের সৈন্যবাহিনীর বিশাল আয়তন সম্পর্কে খানিকটা ধারণা করা যায়। বাগদাদের অধিবাসী আল মাসুদি ৯১৫-১৬ খ্রিস্টাব্দে গুজরাটে এসেছিলেন। তিনি প্রতিহার রাজাদের পরাক্রম এবং সাম্রাজ্যের বিশালতার কথা উল্লেখ করেছেন। আল-মাসুদি প্রতিহার সাম্রাজ্যের বিস্তৃত বর্ণনা রেখেছেন। এই রাজ্যকে তিনি বলেছেন 'অল-জুজর' (al-Juzr)। তিনি বলেছেন যে, এই সাম্রাজ্যের মধ্যে ছিল আঠারো লক্ষ গ্রাম ও শহর, রাজ্যটি ২০০০ কিমি লম্বা এবং ২০০০ কিমি চওড়া। রাজার সৈন্যবাহিনীতে ছিল চারটি ডিভিশন, প্রত্যেক ডিভিশনে ছিল সাত থেকে নয় লক্ষ সৈন্য। এই সৈন্য নিয়ে রাজা দক্ষিণে রাষ্ট্রকূট এবং পূর্বে পালরাজাদের সঙ্গে লড়াই করেন। এই সময় প্রতিহারদের রাজা ছিলেন মহীপাল।

একাদশ শতকের গোড়াতে আলবেরুনি সুলতান মামুদের সঙ্গে ভারতে এসেছিলেন। তাঁর আসল নাম হলো আবু রায়হান। এই আরব পণ্ডিত ভারতবর্ষের সংস্কৃতির অনুধ্যানে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি সংস্কৃত শিখে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করেন। *তাহকিক-ই-হিন্দ* (১০৩০, হিন্দুস্তান অনুসন্ধান) গ্রন্থে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন। আলবেরুনি ধর্মীয় সংকীর্ণতাকে জয় করে মুক্ত মন নিয়ে হিন্দুধর্ম ও দর্শনকে বোঝার চেষ্টা করেন। হিন্দুদের সামাজিক অবস্থার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। তাঁর মধ্যে বিজয়ী জাতির আত্মম্ভরিতা ছিল না। আলবেরুনি সেযুগের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ লিখেছেন, তবে এই গ্রন্থ একেবারে ত্রুটিমুক্ত ছিল না। এই গ্রন্থের দুটি ত্রুটির কথা ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন। তিনি ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার কথা উল্লেখ করেননি। তাছাড়া, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর না করে তিনি গ্রন্থলব্ধ অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে তাঁর ভারত বিষয়ক গ্রন্থখানি রচনা করেন। গ্রন্থে তিনি যেসব বিষয় পেয়েছেন তাদের উল্লেখ করেছেন। এগুলির মধ্যে আছে গণিতশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূবিদ্যা, দর্শন, ধর্মীয় আচার, রীতিনীতি ও সামাজিক চিন্তাভাবনা। ভারতের প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যায় তাঁর লেখায়, জীবন্ত মানুষের দেখা পাওয়া যায় না (draws little or no inspiration from the living India of his age.)।

আদি মধ্যযুগের ইতিহাসের একটি বড় উপাদান হলো অসংখ্য লেখ। ভারতের বিভিন্ন স্থানে এইসব লেখ পাওয়া গেছে। প্রতিহার রাজ ভোজের গোয়ালিয়র লেখ, পালরাজাদের খালিমপুর ও মুঙ্গের লেখ, উমাপতি ধর রচিত বিজয়সেনের দেওপাড়া লেখ এযুগের ইতিহাসের অবয়ব নির্মাণে সাহায্য করে থাকে। চোল রাজারা অনেক লেখ রেখে গেছেন। এইসব লেখ থেকে তাদের গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার (উর) পরিচয় পাওয়া যায়। লেখ দুরকমের—সরকারি ও বেসরকারি। সরকারি লেখগুলির বেশিরভাগ ভূমিদান সম্পর্কিত। লেখের প্রথম অংশ হলো প্রশস্তি, এই অংশে দাতা রাজার অতিরঞ্জিত প্রশস্তি থাকে, তবে এই অংশে রাজার নাম, বংশ, রাজ্যের আয়তন ইত্যাদি তথ্যও পাওয়া যায়। ভূমিদান অংশে ভূমির পরিমাপ, মূল্য এবং ভূমিব্যবস্থার কথাও জানা যায়। সরকারি লেখের সংখ্যা বেসরকারি লেখের তুলনায় অনেক কম। বেসরকারি স্তরে হাজার হাজার লেখ রচিত হয়েছে। ব্যক্তি বা বংশের গুণকীর্তন করে এইসব লেখ রচিত হয়। এসব লেখ থেকে প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ করা যায় না। এগুলির বেশকিছু ব্রহ্মদেয় (ব্রাহ্মণকে দান) এবং দেবদান (মন্দিরকে দান) সম্পর্কিত। ধর্মবিশ্বাস, মূর্তি ও মন্দিরের কথাও থাকে। শিল্প ও ধর্মের ইতিহাসে এসব লেখের গুরুত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। সাহিত্যের ইতিহাসে এসব রচনার গুরুত্ব আছে, ভাষা ও শৈলীর বিবর্তনে এসব লেখ সাক্ষ্য হয়ে আছে। এমনসব পরিবারের লেখ পাওয়া গেছে যারা পুরুষানুক্রমে রাজকর্মচারী হিসেবে কাজ করেছে। এসব লেখ থেকে কিছু রাজনৈতিক তথ্য সংগ্রহ করা যায়। লেখ শুধু রাজনৈতিক তথ্য নয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক তথ্যও সরবরাহ করে থাকে।

গুপ্ত সম্রাটদের পর ভারতীয় রাজাদের খুব অল্পসংখ্যক মুদ্রা পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিকরা এজন্য ধরে নিয়েছেন যে আদি মধ্যযুগে মুদ্রার ব্যবহার কমেছিল। পাল, প্রতিহার, চালুক্য ও রাষ্ট্রকূটদের প্রবর্তিত মুদ্রার নজির খুবই কম। কোনো কোনো অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু মুদ্রা পাওয়া গেছে। এসব মুদ্রা সাহিত্যিক ও পৌরাণিক উপাদানের সত্যতা নির্ধারণে সহায়তা করে। মুদ্রা ছাড়া অন্যান্য উৎস হলো প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানসমূহ—পোড়ামাটির জিনিসপত্র, মাটির পাত্র, মূর্তি, প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ, মন্দির ইত্যাদি। এসব উপাদান থেকে আদি মধ্যযুগের ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হয়েছে। মাটির পাত্রের প্রাপ্তিস্থান ও তার নির্মাণশৈলী থেকে সভ্যতার স্তর নির্ণয় করা হয়ে থাকে। প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায় প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান থেকে। কৃষি যন্ত্রপাতি বা কারিগরি যন্ত্রপাতির ভগ্নাবশেষ থেকে উৎপাদন পদ্ধতির কথা জানা যায়। বেড়াচাঁপার চন্দ্রকেতুগড়ের ধ্বংসাবশেষ, অজয় নদের তীরে 'পাণ্ডুরাজার ঢিবি' এবং নদীয়ায় সেন রাজাদের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ থেকে ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করা হয়। এরকম অসংখ্য প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান সারাদেশে ছড়িয়ে আছে।

তৃতীয় অধ্যায়	রাষ্ট্রব্যবস্থা

আরব আক্রমণ

সপ্তম শতকে শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তি হিসেবে ইসলামের আবির্ভাব বিশ্বইতিহাসের এক বিস্ময়কর ঘটনা (The sudden rise of the Arabs in the seventh century A.D. as the greatest military power is one of the most remarkable events in the history of the world.)। আরবের মরুভূমিতে ইসলামের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এখান থেকে ইসলাম রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে বিস্তারলাভ করেছিল। অস্বীকার করা যায় না ইসলাম ধর্ম আরবদের মধ্যে নতুন শক্তি ও জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিল। পয়গম্বর হজরত মহম্মদের মৃত্যুর একশো বছরের মধ্যে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের এক বিস্তৃত অঞ্চল দখল করে নিয়ে ইসলামী সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল। ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল সিরিয়া, ইরাক, ইরান, প্যালেস্টাইন, উত্তর আফ্রিকা, স্পেন ও পর্তুগাল। ঐতিহাসিক আর্নল্ড মনে করেন যে নতুন ধর্মীয় আবেগ নয়, সম্পদশালী প্রতিবেশীদের ভূমি ও সম্পদের লোভে আরবরা পার্শ্ববর্তী দেশগুলি অধিকার করেছিল (This wonderful expansion of the hitherto insignificant desert race was due not so much to their new born religious spirit as to their desire to possess the lands and goods of their neighbours who were richer and more fortunate than themselves.)। পারস্য অধিকৃত হলে ভারতের সঙ্গে আরব সাম্রাজ্যের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ভারত সম্পর্কে আরবদের কৌতূহল ছিল স্বাভাবিক, দীর্ঘকাল ধরে আরব বণিকরা ভারতের উপকূলের বন্দরগুলিতে বাণিজ্য করত। এদেশের সম্পদ, রাজনৈতিক অবস্থা, সামরিক পদ্ধতি ও শক্তি সামর্থ্য সম্পর্কে আরব শাসকদের স্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠেছিল।

সম্রাট হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর (৬৪৭ খ্রিস্টাব্দ) উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য নষ্ট হয়ে যায়। শুধু উত্তর ভারতে নয়, দক্ষিণ ভারতেও এসময় রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। সমগ্র ভারত কতকগুলি স্বাধীন, ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এই সময়কার ভারতবর্ষের রাজ্যগুলিকে চারভাগে ভাগ করা যায় ঃ (ক) হিমালয় অঞ্চলে অবস্থিত আফগানিস্তান, কাশ্মীর, নেপাল ও আসাম, (খ) সিন্ধু ও গাঙ্গেয় অববাহিকায় ছিল কনৌজ, সিন্ধু, বাংলা ও মালব, (গ) দাক্ষিণাত্যে ছিল বাকাটক, পল্লব ও

রাজ্য এবং (ঘ) সুদূর দক্ষিণে ছিল পাণ্ড্য, চোল ও কেরালার চেরদের রাজ্য। এই রাজ্যগুলির মধ্যে সদ্ভাব ছিল না, এরা সর্বদা পরস্পরের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হতো। ভারতের সীমান্ত রক্ষা করা বা বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করার মতো মানসিকতা তখন গড়ে ওঠেনি। শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক ক্ষেত্রেও ভারত ছিল বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন। সমাজে জাতিভেদ প্রথা ছিল, নারীজাতি পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করত না। যদিও হিন্দুধর্ম ছিল বেশিরভাগ ভারতীয়ের ধর্ম, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাবলম্বীরাও ভারতীয় জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ভারত ছিল সমৃদ্ধিশালী, ভারতের প্রাকৃতিক ও কৃষিজ সম্পদ উন্নত জীবনধারার সৃষ্টি করেছিল। উপকূলের বন্দরগুলি দিয়ে ভারতের পণ্য বস্ত্র, মশলা, রেশম ইত্যাদি বিদেশে রপ্তানি করা হতো।

ইসলামের আবির্ভাবের বহু আগে থেকে আরব বণিকরা ভারতের বন্দরগুলিতে নিয়মিতভাবে বাণিজ্য করত। এই বণিকরা ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলের ভারতীয় রাজাদের আশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতা পেত। তারা ভারতের অপর্যাপ্ত ধন-সম্পদের কথা দেশে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল। ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হওয়ার পর নববলে বলীয়ান আরবরা ভারতের বন্দর এবং সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলি দখল করার জন্য আগ্রহ দেখিয়েছিল। খাইবার ও বোলান গিরিপথ ও মাকরান উপকূল দিয়ে ভারতের দিকে তারা এগিয়েছিল। সপ্তম শতকের তিরিশের দশকে আরব সেনাপতি আবদুল্লাহ্ সিন্ধু ও মাকরানের যৌথ বাহিনীকে পরাস্ত করেন। খলিফা ওমর সাবধানী নীতি অনুসরণ করতেন, এইজন্য এই আরব সেনাপতি সিন্ধুদেশে প্রবেশ করেননি।[১] খলিফার মৃত্যুর পর আরব সেনাপতিরা পূর্বদিকে সাম্রাজ্য বিস্তারে আগ্রহ দেখান, খলিফার সাবধানী নীতি আর বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। পরবর্তী খলিফা এই অঞ্চলে সামরিক অভিযান পাঠানোর অনুমতি দেন। শুধু মাকরান ও সিন্ধু নয়, উত্তর-পশ্চিমের কাবুল ও জাবুলের ওপর আরবরা অন্তত তিনবার অভিযান চালিয়েছিল কিন্তু সফল হতে পারেনি। পশ্চিম উপকূলের থানা, ব্রোচ ও দেবল বন্দরের ওপর আরবদের আক্রমণ চলেছিল।

ভারতের সম্পদের প্রতি লোভ ছাড়াও সিন্ধুদেশে আরব আক্রমণের রাজনৈতিক কারণ ছিল। সপ্তম শতকের গোড়া থেকে আরবরা বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছিল। পয়গম্বর হজরত মহম্মদের মৃত্যুর একশো বছরের মধ্যে আরবরা পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপের বিস্তৃত অঞ্চল দখল করে নিয়েছিল। বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল, আরবরা ফ্রান্সের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছিল। এই বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য গঠন পরিকল্পনার অঙ্গ

১. আবদুল করিম, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন*, পৃ. ২।

হলো সিন্ধুদেশে আরব অভিযান। সিন্ধুদেশে আরব অভিযান পাঠানোর অপর কারণ হলো নতুন ধর্মমত। সন্দেহ নেই নতুন ধর্মমত আরবদের উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছিল, বিধর্মীদের মধ্যে নিজ ধর্মমত প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল। আরবরা মনে করত তারা হলো ঈশ্বরের মনোনীত অনুপ্রাণিত জাতি, আরবরা যেসব অঞ্চল জয় করেছিল সেখানে নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করেছিল। অস্বীকার করা যায় না ভারতে ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের মধ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল। অনেকে মনে করেন যে, সিন্ধু অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য ঐ অঞ্চল আক্রমণ করা হয়েছিল।

সিন্ধুদেশে আরব আক্রমণের একটি তাৎক্ষণিক কারণ আছে। এই কারণটির আবার চারটি রূপান্তর পাওয়া যায়। ঘটনাটি হলো সিংহলের শাসক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজের[২] কাছে কিছু উপঢৌকন পাঠান। সিন্ধুর দেবল বন্দরের জলদস্যুরা সেগুলি লুঠ করেছিল। কেম্ব্রিজ হিস্ট্রিতে উলস্‌লি হেগ এই ঘটনাটির কথা উল্লেখ করেছেন। হাজ্জাজ সিন্ধুর শাসকের কাছে এজন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। সিন্ধুর ব্রাহ্মণ রাজা দাহির ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করলে হাজ্জাজ সিন্ধুদেশে সামরিক অভিযান পাঠান। অন্য একটি মতে, সিংহলে কয়েকজন মুসলমান বণিকের মৃত্যু হলে সিংহলের শাসক কয়েকজন মুসলমান মহিলাকে ইরাকের গভর্নরের কাছে পাঠিয়ে দেন। দেবল বন্দরে এরা অপহৃতা হন। তৃতীয় মত হলো খলিফা ভারত থেকে ক্রীতদাস ও দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহের জন্য তাঁর অনুচরদের পাঠিয়েছিলেন। দেবল বন্দরের জলদস্যুরা এদের আক্রমণ করে সবকিছু লুঠ করে নিয়েছিল। এই ঘটনার চতুর্থ রূপটি হলো সিংহলের রাজা ইরাকের গভর্নরকে কিছু উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন, সেগুলি লুঠ হলে ইরাকের গভর্নর ক্ষতিপূরণ দাবি করেছিলেন। এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে সিন্ধুদেশে আরব অভিযান পাঠানো হয়েছিল।

খলিফার অনুমতি নিয়ে ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজ ৭১১ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধুদেশে অভিযান পাঠিয়েছিলেন। তাঁর প্রেরিত প্রথম দুটি অভিযান ব্যর্থ হয়ে যায়। এই দুই অভিযানের নেতৃত্ব দেন ওবায়দুল্লাহ্‌ ও বুদাইল।[৩] এরপর হাজ্জাজ সিন্ধু আক্রমণের জন্য বিশাল প্রস্তুতি নেন (Hajjaj then made elaborate preparations for the invasion of Sindh.)। *চাচনামা* এই অভিযানের বিস্তৃত বর্ণনা রেখে গেছে। হাজ্জাজ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা মহম্মদ বিন কাশিমকে নতুন অভিযানের নেতৃত্বের ভার দেন। জল ও স্থলপথে সৈন্যবাহিনী পাঠানো হয়। দাহিরের রাজ্যটি খুব ঐক্যবদ্ধ ছিল না, তিনি বৌদ্ধদের সরিয়ে ক্ষমতা দখল করেছিলেন, এই বৌদ্ধদের অনেকে মহম্মদ বিন কাশিমের সঙ্গে যোগ দেন। দাহিরের সামন্তদের মধ্যে মোকা ও তাঁর ভ্রাতা

২. এঁর পুরো নাম হাজ্জাজ বিন ইউসুফ।
৩. আর. সি. মজুমদার সম্পাদিত, *ক্ল্যাসিকাল এজ*, পৃ. ১৭০।

কাশিমের সঙ্গে যোগ দেন। দাহিরের সৈন্যবাহিনী রাওরের (Raor) যুদ্ধে কাশিমকে প্রচণ্ডভাবে বাধা দিয়েছিল। দাহির নিহত হলে তাঁর বিধবা স্ত্রী এবং পুত্র জয়সিংহ বীরত্বের সাথে আরবদের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। ব্রাহ্মণাবাদ দুর্গের সামনে ছয়মাস ধরে লড়াই চলেছিল, এরপর কাশিম রাজধানী আলোর (Alor) দখল করেন। আলোর জয়ের পর কাশিম মুলতান অধিকার করেন। কাশিম নিঃসন্দেহে উচ্চস্তরের সেনাপতি ছিলেন, তাঁর দক্ষতা ও কৌশলের জন্য ভারতে প্রথম মুসলমান রাজত্ব স্থাপিত হয়। এই তরুণ মুসলমান সেনাপতি তাঁর নেতৃত্ব, বীরত্ব ও অভিজাতসুলভ গুণাবলীর জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যুর জন্য তিনি এই দেশের ইতিহাসে শহীদের মর্যাদা লাভ করেছেন (The story of Muhammad bin Qasim's invasion of Sindh is one of the romances of history. His blooming youth, his dash and heroism, his noble deportment throughout the expedition and his tragic fall have invested his career with halo of martyrdom.)।

ভারতের উত্তর-পশ্চিমে সিন্ধু ও মুলতান জয় করে আরবরা তাদের বিজয় অভিযান শেষ করতে বাধ্য হয়েছিল। পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে তুলনায় ভারতে আরবদের সাফল্য ছিল অত্যন্ত সীমিত। আরবরা উত্তর ও দক্ষিণে সম্প্রসারণের প্রয়াস চালালে উত্তরে কাশ্মীর ও কনৌজ এবং দক্ষিণে প্রতিহার ও চালুক্যরা তাদের বাধা দিয়েছিল। এই প্রতিরোধ ভেঙে আরবরা ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারেনি। প্রায় তিনশো বছর ধরে আরব রাজ্যের সম্প্রসারণ ঘটেনি। এর একটি প্রধান কারণ হলো খিলাফৎ নিয়ে আরবদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হলে ভারতে তাদের অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে যায়। সিন্ধু (মানসুরা) ও মুলতানের সদ্যোজাত শিশু মসলিম রাষ্ট্রদুটি কার্যত স্বাধীন হয়ে যায়। সিন্ধুদেশে আরবদের সাফল্যের নানা কারণ ছিল। প্রথমত, আরবরা সিন্ধুদেশ জয়ের জন্য বিশাল প্রস্তুতি নিয়েছিল, সুদূর সিরিয়া থেকে সৈন্য পাঠানো হয়েছিল। অপরদিকে এই সময়ে সিন্ধুদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থা ভালো ছিল না। অর্ধশতাব্দীকাল ধরে এই রাজ্যের ওপর বৈদেশিক আক্রমণ চলেছিল, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ছিল। ঊষর সিন্ধুদেশের বিশাল সৈন্যবাহিনী গঠনের সামর্থ্যও ছিল না। দ্বিতীয়ত, সৈন্যাধ্যক্ষ হিসেবে দাহির মহম্মদ বিন কাশিমের সমকক্ষ ছিলেন না। মহম্মদ বিন কাশিম তাঁর চেয়ে অনেকবেশি রণনৈপুণ্যের অধিকারী ছিলেন। আরবরা অভিযান নিয়ে বেরিয়েছে জেনেও তিনি তাদের প্রতিরোধ করার জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। তৃতীয়ত, অধ্যাপক আবদুল করিম লিখেছেন যে, অধিকৃত অঞ্চলে আরবদের অনুসৃত নীতি মহম্মদ বিন কাশিমের সহায়ক হয়। তিনি তাঁর নীতির দ্বারা শত্রুদের মিত্রতে পরিণত করেন।

চতুর্থত, দাহিরের নৌবহরের অভাব ছিল। আরবরা মাকরান উপকূল বরাবর সিন্ধুদেশে পৌছতে পারে জেনেও দাহির কোনো ব্যবস্থা নেননি। এ ব্যাপারে তিনি

অদূরদর্শিতার পরিচয় দেন। সিন্ধুদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের ওপর দাহিরের তেমন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। আরব আক্রমণের অল্প কয়েকবছর আগে এই অঞ্চল তাঁর রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। এই অঞ্চলের নেহরুণ ও শিবিস্তান প্রায় বিনা বাধায় আরবদের আধিপত্য গ্রহণ করেছিল। পঞ্চমত, দাহিরের পিতা ছলে-বলে-কৌশলে বৌদ্ধ রাজ্যটি অধিকার করেছিলেন। এজন্য এ অঞ্চলের বৌদ্ধরা ব্রাহ্মণ রাজপরিবারের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিল। তারা আরব সেনাপতিকে নানা ধরনের সাহায্য দিয়েছিল, অনেকে আরবদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। বেশিরভাগ মানুষ দাহিরের প্রতি অনুগত ছিল না। এই অঞ্চলে জনশ্রুতি ছিল দেশটি শীঘ্রই মুসলমানদের হস্তগত হবে, সম্ভবত এই জনশ্রুতি প্রতিরোধ মানসিকতা গঠনের বিরোধী শক্তি হিসেবে কাজ করেছিল।

পরিণতি ও তাৎপর্য

আরবরা সিন্ধুদেশ জয় করে সেখানে এক নতুন ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এই শাসনব্যবস্থা ছিল আরবদের শাসনব্যবস্থার ভারতীয় সংস্করণ। সিন্ধু ও মুলতানের শাসনকর্তারা খলিফাকে তাঁদের প্রধান বলে স্বীকার করতেন, তবে কার্যত তাঁরা স্বাধীনভাবে চলতেন। এই দেশদুটি কয়েকটি ইক্‌তা বা জেলায় ভাগ করে অভিজাতদের শাসনের দায়িত্ব দেওয়া হয়, এরা শাসন ও সামরিক কার্য পরিচালনা করত। প্রজাদের ক্ষমতা অনুযায়ী রাজস্ব ধার্য করা হতো এবং অত্যাচার ও অপশাসন থেকে প্রজাদের রক্ষা করা হতো। ব্রাহ্মণরা রাজস্বের ক্ষেত্রে আগে থেকে যেসব সুযোগ-সুবিধা পেত তা বজায় ছিল। আরব শাসকেরা ধার্মিক ও বিদ্বান ব্যক্তিদের ওয়াকফ বা নিষ্কর ভূ-সম্পত্তি দান করতেন। আরবরা এদেশে স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করেন, সিন্ধু ও মুলতান অঞ্চলে কয়েকটি মুসলমান উপনিবেশ স্থাপিত হয়। এগুলি বাণিজ্য ও বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র হয়। সিন্ধুদেশের আরবরা মুসলিম রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখত। জল ও স্থলপথে আরব বণিকরা পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্য করত। সিন্ধু দেশে আরব রাষ্ট্রের আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভূমিকর খারাজ এবং অমুসলমানদের দেয় কর জিজিয়া, মুসলমানরা জাকাত দিত। ইজারাদাররা আরও কয়েকটি কর আদায় করত। আরবদের শাসনব্যবস্থায় স্বতন্ত্র ও সুগঠিত বিচারব্যবস্থা ছিল। খলিফার অধীনস্থ আমীর ছিলেন প্রধান বিচারক। সাধারণত অভিজাত সামরিক ও প্রশাসনিক অফিসাররা বিচারকার্য সমাধা করতেন, অপরাধের জন্য কঠোর দণ্ডদানের ব্যবস্থা ছিল। কাজীরা কোরানের নীতি ও নির্দেশ অনুযায়ী বিচার করতেন। বিচারব্যবস্থায় হিন্দুদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হতো। তবে রাজনৈতিক অপরাধ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে হিন্দুরা নিজেদের পঞ্চায়েতে বিরোধের নিষ্পত্তি করে নিত। আরব শাসনের শুরুতে হিন্দুধর্ম, মন্দির ও ধর্মাবলম্বীদের উপর নির্যাতন হয়। পরে আনুগত্য ও করদানের বিনিময়ে আরব শাসকেরা হিন্দুদের ধর্মাচরণের স্বাধীনতা মেনে নেন।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্ট্যানলি লেনপুল ভারতে আরব অভিযানের মূল্যায়ন করেছেন। তাঁর মতে, আরবদের সিন্ধু জয় হলো ইসলাম ও ভারতের ইতিহাসে একটি ঘটনামাত্র, ভারতের ইতিহাসের ওপর এর স্থায়ী প্রভাব পড়েনি। অনেক পণ্ডিত লেনপুলের এই অভিমতকে মেনে নিয়েছেন। আরবরা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। ভারতের উত্তর-পশ্চিমে তাদের অভিযান তিনশো বছর ধরে সীমিত থেকে যায়। দুটি কারণে ভারতে মুসলমান শাসনের সম্প্রসারণ ঘটেনি। অষ্টম শতকের মধ্যভাগে উন্মীয়দের পরাস্ত করে আব্বাসীয়রা ক্ষমতা দখল করেছিল। আব্বাসীয় খলিফারা রাজ্য জয়ের চেয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির দিকে বেশি নজর দেন। খিলাফৎ নিয়ে দ্বন্দ্ব খলিফাদের রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি অনেকখানি কমিয়েছিল। এই দ্বন্দ্ব সিন্ধুদেশেও সম্প্রসারিত হয়েছিল, ভারতে ইসলামের অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছিল। আব্বাসীয় খলিফারা শান্তিপূর্ণ শাসনের নীতি অনুসরণ করেন। আরবদের ব্যর্থতার দ্বিতীয় কারণ হলো ভারতের শক্তিশালী হিন্দু রাজাদের প্রতিরোধ। প্রতিহার, চালুক্য ও রাষ্ট্রকূটরা আরবদের সম্প্রসারণে বাধা দিয়েছিল। তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, হিন্দু রাজারা আরবদের বিরুদ্ধে যৌথ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি। আরব অভিযান থেকে হিন্দু রাজারা কোনো শিক্ষালাভ করেননি, আগের মতো ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অরক্ষিত রয়ে যায়।

ভারতের রাজনৈতিক জীবনের ওপর আরবদের সিন্ধু জয়ের স্থায়ী প্রভাব পড়েনি। প্রচলিত রাজনীতি, শাসনব্যবস্থা ও সামরিক পদ্ধতির ওপর আরবদের প্রভাব পড়েনি। ভারতের ভাষা, শিল্প, সাহিত্য, ঐতিহ্য ও জীবনযাত্রার ওপর আরব আক্রমণের স্থায়ী প্রভাব ছিল না। এই অঞ্চলে আরবরা মসজিদ বানিয়েছিল, নতুন স্থাপত্যের আমদানি হয়েছিল তবে ভারতীয় স্থাপত্যের ওপর এর প্রভাব পড়েনি। ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনের ওপর আরব আক্রমণের প্রভাব ছিল সীমিত (It was a mere episode in the history of India and affected only a small fringe of that vast country.)। অধ্যাপক এ. বি. এম. হবিবুল্লাহ্ মনে করেন যে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আরব আক্রমণের তাৎপর্য গভীর ছিল না। অধ্যাপক এ. এল. শ্রীবাস্তব অবশ্য মনে করেন যে, সিন্ধুদেশে আরব আক্রমণ ভারতে ইসলামের বীজ বপন করেছিল (The Arab conquest of Sindh was destined to sow the seed of Islam in this land.)। এই পথ ধরেই পরবর্তীকালে মুসলমান অভিযাত্রীরা ভারতে প্রবেশ করেছিল। ঈশ্বরীপ্রসাদ জানাচ্ছেন যে সিন্ধুদেশে আরব আক্রমণ রাজনৈতিক দিক থেকে ফলপ্রসূ না হলেও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে স্থায়ী অবদান রেখেছিল (Arabs derived much benefit from the culture and learning of the Hindus.)।

হিন্দু ও আরব সভ্যতার মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। ভারতীয় জীবন ও মননের ওপর আরব প্রভাব তেমন দেখা যায় না কারণ এদের ওপর পুরোহিততন্ত্রের প্রভাব ছিল বেশি। সিন্ধুদেশের হিন্দুদের অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল, এরা সিন্ধী, আরবি ও সংস্কৃত ভাষা শিখেছিল। আবু মাশার সিন্ধী হাদিসে দক্ষতা অর্জন করেন, ইমাম আউজা ফিকাহ্ শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। আবুল আতা সিন্ধী ও আরবি ভাষায় কবিতা লেখেন। সিন্ধু অঞ্চলে কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি হয়েছিল। আরব ভূগোলবিদরা সিন্ধুর কৃষিব্যবস্থার প্রশংসা করেছেন। আলোরে বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। আব্বাসীয়দের শাসনকালে আরব জগতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার উন্নতি হয়েছিল। শুধু গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে আরব পণ্ডিতরা আর সন্তুষ্ট ছিলেন না। ভারত ও পারস্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হবার বাসনা তৈরি হয়েছিল। আরবদের সিন্ধু জয় সেই সুযোগ সৃষ্টি করেছিল। ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ায় আরবরা নানাদিক থেকে লাভবান হয়। ভারতের কারিগররা আরব দেশে সমাদর পেয়েছিল। ভারতের সভ্যতা, বিজ্ঞান ও দর্শন আরবদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। এদেশের শাসনব্যবস্থা, জ্যোতিষ, সঙ্গীত, চিত্রকলা, স্থাপত্য, চিকিৎসা বিজ্ঞান আরবদের কাছে সাদরে গৃহীত হয়। হিন্দু পণ্ডিতদের সাহায্য নিয়ে ব্রহ্মগুপ্তের *ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত* ও *খণ্ড খাদ্যক* আরবি ভাষায় অনুবাদ করা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রের আরও অনেক গ্রন্থ আরবি ভাষায় অনূদিত হয়। ভারতীয় শিল্পী ও কারিগররা আরব শাসকদের প্রাসাদ ও মসজিদ নির্মাণের কাজে নিযুক্ত হয়। আরব পণ্ডিতরা ভারতের সংখ্যাতত্ত্ব, জ্যোতিষবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র ইউরোপে নিয়ে যান। আরব জগৎ ভারত ও ইউরোপের মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করেছিল। অষ্টম ও নবম শতকে ইউরোপ আরবদের মাধ্যমে ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হয়। কোনো কোনো ঐতিহাসিক এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, সিন্ধু ও ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে আরবদের মধ্যে এক নবজাগরণ ঘটে যায়।

রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে আরবদের সিন্ধু জয় তেমন লাভজনক হয়নি। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে তাদের আগ্রাসন দীর্ঘকাল সীমিত হয়ে ছিল। তবে সিন্ধু জয়ের মধ্য দিয়ে ভারত ও ইসলাম পরস্পরের কাছে এসেছিল, ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। আরব ঐতিহাসিক তব্‌রি লিখেছেন যে, আরবদের আমন্ত্রণে ভারতীয় কারিগর ও চিকিৎসকরা বাগদাদে গিয়েছিলেন। খলিফা মনসুর ও খলিফা হারুন ভারতবর্ষ থেকে হিন্দু পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে যান। ভারতীয় চিকিৎসক মনাকা ও ধনা বাগদাদে গিয়েছিলেন। হ্যাভেল মনে করেন যে, গ্রীস নয়, ভারত ছিল ইসলামের আদি পর্বে তার শিক্ষক। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য ও শিল্পে ভারত তাকে পথ দেখিয়েছিল (It was India not Greece, that taught Islam in the impressionable years of its youth.)।

সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ফলে ভারত একেবারে লাভবান হয়নি তা নয়। ইসলামের একেশ্বরবাদ ও শিল্পের সঙ্গে ভারতীয়দের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়। ড. দশরথ শর্মা জানিয়েছেন যে, আরব আক্রমণ ভারতের ইতিহাসে একটি নিষ্ফল ঘটনা নয়। আরব আক্রমণের পর প্রতিহার, চৌহান, পরমার ও সোলাঙ্কিরা পুরনো শাসকদের সরিয়ে দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি রক্ষার দায়িত্ব নেয়। একাজ তারা যথেষ্ট যোগ্যতার সঙ্গে পালন করে, এ ঘটনার গুরুত্ব কম নয়। আরব আক্রমণের পর থেকে পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান শুরু হয়েছিল। ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা উৎসাহিত হয়, আরব দেশে একধরনের নবজাগরণ ঘটে যায়। রাজনৈতিক ইতিহাসে ঘটনাটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ না হলেও সংস্কৃতির ইতিহাসে, ভাবের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে আরবদের সিন্ধু জয় এক অনন্য অসাধারণ ঘটনা।

রাজপুতদের উৎপত্তি

সপ্তম শতকের মধ্যভাগ থেকে ভারতের রাজনীতিতে রাজপুতদের বিশিষ্ট ভূমিকা লক্ষ করা যায়। মোগল যুগেও রাজপুতরা সাম্রাজ্যের অচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে কাজ করেছিল। সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত সময়কাল হলো ভারতের ইতিহাসে রাজপুত আধিপত্যের যুগ। কুমারপাল চরিত, বর্ণরত্নাকর ও রাজতরঙ্গিণীতে ছত্রিশটি রাজপুত গোষ্ঠীর কথা জানা যায়। এদের মধ্যে প্রধান গোষ্ঠীগুলি হলো গুর্জর-প্রতিহার, চৌহান (চহমন), পরমার, গুহিল (শিশোদিয়া), সোলাঙ্কি, চান্দেল্ল, তোমর, কলচুরি, গহড়বল প্রভৃতি। ভারতের ইতিহাসে রাজপুতদের পরিচয় হলো বীরযোদ্ধা, স্বাধীনতাপ্রিয়, দেশপ্রেমিক, হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির রক্ষাকর্তা। তাদের চরিত্রের অনুজ্জ্বল দিকটি হলো তাদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, ঐক্যবদ্ধভাবে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার মানসিকতা তাদের ছিল না। এই বীর রাজপুতদের উৎপত্তি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছে। অধ্যাপক অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় *লেকচারস অন রাজপুত হিস্ট্রি* গ্রন্থে রাজপুতদের উৎপত্তি সম্পর্কিত মতগুলি তুলে ধরেছেন। রাজপুত ইতিহাসের বিশেষজ্ঞ সি. ভি. বৈদ্য জানিয়েছেন যে বৈদিক যুগের ক্ষত্রিয়দের থেকে রাজপুতদের উৎপত্তি হয়েছে। বৈদিক যুগের রাজপুত্র শব্দ থেকে রাজপুত শব্দের উৎপত্তি হয়েছে (The Rajputs who now came to the front and who by their heroism diffuse such glory on the period of medieval Indian history cannot but have been the descendants of Vedic Aryans. None but Vedic Aryans could have fought so valiantly in defence of the ancestral faith.)।

রাজপুতদের ঐতিহ্যে, চারণ কবিদের রচনায় এবং জনশ্রুতিতে রাজপুতদের ক্ষত্রিয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রামায়ণ ও মহাভারতে যেসব সূর্যবংশীয় ও চন্দ্রবংশীয়

ক্ষত্রিয় রাজাদের কথা জানা যায় তাদের সঙ্গে রাজপুতদের সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে। মেবারের শিশোদিয়ারা রামের বংশধর বলে নিজেদের পরিচয় দেন। কিন্তু এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন একজন ব্রাহ্মণ। গুর্জর-প্রতিহারদের ইতিহাসে দাবি করা হয়েছে যে রামের ভ্রাতা লক্ষ্মণ থেকে এই রাজবংশের উৎপত্তি হয়েছে। রাজপুতদের উৎপত্তি নিয়ে রাজপুতনায় অনেক লোককাহিনীর চলন আছে। পৃথ্বিরাজ চৌহানের সভাকবি চাঁদ বরদাই তাঁর *পৃথ্বিরাজ রসো* কাব্যে জানিয়েছেন যে চৌহান, পরমার, গুহিল ও প্রতিহারদের উৎপত্তি হয়েছে আবু পাহাড়ে অবস্থিত বশিষ্ঠের যজ্ঞাগ্নি থেকে। এই তত্ত্বটির নাম হলো *অগ্নিকুল তত্ত্ব*। অধ্যাপক ভাণ্ডারকর এই অগ্নিকুল তত্ত্বের সমালোচনা করে লিখেছেন যে এই তত্ত্ব অনুসরণ করলে স্বীকার করতে হয় রাজপুতরা ছিল বিদেশী। যজ্ঞাগ্নির মাধ্যমে বিদেশীদের শুদ্ধিকরণ হয়। চাঁদ বরদাই প্রচলিত লোককাহিনীকে তত্ত্বের রূপ দিয়েছেন, তাঁর ইতিহাসে জনশ্রুতি ও ইতিহাস মিশে গেছে।

জেমস টড মনে করেন বিদেশী শক, হূণ ও গুর্জররা ভারতে প্রবেশ করে ভারতীয় হয়ে যায়। রাজপাট স্থাপন করে এরা শাসন ও যুদ্ধকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে রাজপুত হয়ে যায়। ভিনসেন্ট স্মিথ একই অভিমত প্রকাশ করেছেন। বিদেশীরা ভারতে প্রবেশ করে হিন্দুধর্ম ও আচার-আচরণ গ্রহণ করে ক্ষত্রিয় বলে নিজেদের পরিচয় দিয়েছিল। ব্রাহ্মণরা তাদের বংশলতিকা তৈরি করে তাদের চন্দ্র ও সূর্যবংশীয় বলে পরিচয় দিয়েছিল।

রাজস্থানের ঐতিহাসিক গৌরীশংকর হীরাচাঁদ ওঝা ও দশরথ শর্মা মনে করেন রাজপুতরা বিদেশি নয়। নৃতত্ত্ব, ঐতিহ্য ও লেখ থেকে তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে রাজপুতরা ছিল আর্য জাতির লোক। যদিও রাজপুতদের অনেক আচার-আচরণের সঙ্গে বিদেশী হূণ, শক ও গুর্জরদের মিল দেখা যায় তাতে তাদের বিদেশী উৎপত্তি প্রমাণিত হয় না। রাজপুত রাজারা অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছেন, তাঁদের মধ্যে সতীপ্রথা ছিল, তাঁরা সূর্যের পূজা করতেন—এসব বিদেশীদের মধ্যে পাওয়া যায় না।

অধ্যাপক ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় রাজপুতদের উৎপত্তির সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর প্রথম বক্তব্য হলো রাজপুতরা হলো একটি মিশ্র জাতি (they represented a mixed caste)। রাজপুত বর্ণের মাধ্যমে দেশের উপজাতি সমাজ রাজ্য স্থাপন করে ক্ষত্রিয় মর্যাদা পেয়েছিল। বিদেশী হূণরা যেমন ক্ষত্রিয় হয়েছিল, দেশী মেডাসরাও রাজপুত গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল (Rajput is known to have been a recognizable channel of transition from tribal to state polity)। রাজ্য স্থাপন করে উপজাতির মানুষ রাজপুত অভিধা গ্রহণ করেছিল। রাজপুত অভিধা হলো উপজাতি জীবন থেকে রাষ্ট্রব্যবস্থায় উত্তরণের একটি স্বীকৃত মাধ্যম। অধ্যাপক

চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে রাজস্থানে কৃষির সম্প্রসারণ ঘটেছিল, উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল. স্থানীয় সামন্ত দুর্গ নির্মাণ করে নিজেকে সুরক্ষিত করেছিল, শাসন স্থাপন করেছিল (Rajputs constituted a fairly large section of petty chiefs holding estates)। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জাতিব্যবস্থায় গতিশীলতা ছিল, নিম্নবর্গের মানুষ উচ্চবর্গে আরোহণের প্রয়াস চালিয়েছিল। রাজস্থানে সেই একই প্রক্রিয়া সচল ছিল (The fact that the mobility to Ksatriya status was in operation elsewhere in the same period prompts one to took for its incidence also in Rajasthan)। আধুনিক মত হলো রাজপুতদের অনেকে ছিলেন গুর্জর ও হূণদের বংশধর, আবার অনেক বিদেশী গোষ্ঠী স্থানীয় গোণ্ড, ভর ও কোলদের সঙ্গে মিশে রাজপুত রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেছিল।

অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় রাজপুতদের উৎপত্তির সবচেয়ে বিজ্ঞানসম্মত, যুক্তিনির্ভর আবেগমুক্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। দেশী ও বিদেশী উপজাতির লোকেরা হিন্দুদের আচার-আচরণ গ্রহণ করে রাজপুত হয়ে যান, এরা শাসন ও যুদ্ধবিগ্রহের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্থানীয় উপজাতি শাসক রাজপুতদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে নিজেদের বংশগত অবস্থানকে শক্ত করে নেন। ব্রাহ্মণরা তাদের ক্ষত্রিয় বলে স্বীকৃতি দিয়েছিল, বংশলতিকা বানিয়ে দিয়েছিল। চারণ কবিরা তাদের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছিল। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় মনে করেন রাজপুতকরণ হলো একটি সামাজিক গতিশীলতার প্রক্রিয়া। একটি কাঠামো ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল যার মধ্যে স্থান পেয়েছিল বহু বিচিত্র ধরনের জনগোষ্ঠী, মেডাস ও হূণরাও ছিল (Rajputization was a process of social mobility which, in the wake of its formation into a structure, drew in such disparate groups as the Medas and the Hunas)।[৪] রাজপুতদের উপগোষ্ঠীগুলি স্থানীয় অভিজাতদের মধ্যে থেকে গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে এরা ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজেদের বংশের সম্পর্ক স্থাপন করেছিল।

প্রতিহার

সর্দার কে. এম. পানিক্করের মতো ঐতিহাসিকরা এই ধারণা পোষণ করতেন সম্রাট হর্ষবর্ধন হলেন প্রাচীন ভারতের শেষ সাম্রাজ্য স্থাপয়িতা। এই মত আজ আর গ্রাহ্য হয় না। হর্ষের মৃত্যুর একশো বছরের মধ্যে ভারতের তিন প্রান্তে তিনটি সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। প্রতিহাররা উত্তর ও পশ্চিম ভারতে, পালরা পূর্বভারতে এবং রাষ্ট্রকূটরা দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল। এদের স্থাপিত সাম্রাজ্যগুলি দেড়শো বছরের অধিককাল টিকেছিল। অষ্টম শতকের গোড়ার দিকে প্রতিহাররা সাম্রাজ্য

৪. চট্টোপাধ্যায়, *দ্য মেকিং অব আরলি মিডাইভ্যাল ইন্ডিয়া*, পৃ. ৫৭-৮৮।

স্থাপন করেছিল। এরা গুর্জর-প্রতিহার নামে পরিচিতি লাভ করে; সম্ভবত দক্ষিণ-পশ্চিম রাজস্থানের গুর্জরত্র (Gurjaratra) নাম থেকে এই নামের উৎপত্তি হয়েছে। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন হরিচন্দ্র। মধ্য ও পূর্ব রাজস্থানে এই রাজবংশ নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল, মালব ও গুজরাট তাদের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। দ্বিতীয় নাগভট্টের সময় থেকে কনৌজ ছিল প্রতিহারদের রাজধানী, এর আগে উজ্জয়িনী তাদের রাজধানী ছিল। প্রতিহার রাজবংশের একটি শাখা ছিল যোধপুরে। রাজস্থানে আরব অনুপ্রবেশের প্রতিরোধ করে প্রতিহার শাসকগণ খ্যাতিলাভ করেন। এই রাজবংশের চারজন শ্রেষ্ঠ রাজা হলেন বৎসরাজ, দ্বিতীয় নাগভট্ট, ভোজ ও মহেন্দ্রপাল। এঁরা প্রায় দেড়শো বছর ধরে রাজত্ব করেন। সাম্রাজ্যিক কাঠামো গঠন করে গৌরব ও সম্পদের অধিকারী হন। প্রতিহারদের সভাকবি রাজশেখর তাঁর পৃষ্ঠপোষক প্রতিহাররাজকে 'আর্যাবর্তের মহারাজাধিরাজ' বলে উল্লেখ করেছেন। আরব পর্যটকরা তাঁদের সম্পদ ও সামর্থ্যের প্রশংসা করেছেন।

প্রথমদিককার প্রতিহার রাজা হলেন বৎসরাজ ও দ্বিতীয় নাগভট্ট। পাল ও রাষ্ট্রকূট রাজাদের কাছে পরাস্ত হলেও প্রতিহার সাম্রাজ্যের কোনো ক্ষতি হয়নি। প্রতিহার সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রাজা হলেন ভোজ, তিনি মিহিরভোজ নামেও পরিচিত। ভোজের প্রথম জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ভোজ প্রতিহার সাম্রাজ্যকে নতুন করে গঠন করেন। ৮৩৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ভোজ কনৌজ অধিকার করেন, সাম্রাজ্যের শেষ অবধি কনৌজ (মহোদয়) প্রতিহার সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। ভোজের 'গোয়ালিয়র প্রশস্তি' থেকে তাঁর রাজত্বকালের অনেক ঘটনা জানা যায়। ভোজ মধ্য ও পূর্ব রাজস্থানের ওপর প্রতিহারদের অধিকার পুনঃস্থাপন করতে সক্ষম হন। তবে পাল ও রাষ্ট্রকূটদের সঙ্গে প্রতিহারদের দ্বন্দ্ব চলেছিল। পালরাজা দেবপাল ভোজকে পরাস্ত করেন তবে তিনি কনৌজের ওপর অধিকার হারাননি। ভোজ গুজরাট ও মালব জয়ের প্রয়াস চালালে রাষ্ট্রকূটদের সঙ্গে তাঁর সংঘাত বেধেছিল। পূর্বদিকে পালদের কাছে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে তিনি পশ্চিমে সম্প্রসারণ চেয়েছিলেন। নর্মদা তীরে রাষ্ট্রকূটদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়েছিল, এই যুদ্ধের পর মালব ও গুজরাটের কতকাংশের ওপর প্রতিহারদের অধিকার বজায় ছিল।

৮৪৫-৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রাষ্ট্রকূট রাজা ধ্রুব তাঁকে পরাস্ত করেন, কলচুরি রাজা কোক্কালার সঙ্গে দ্বন্দ্বে তিনি পরাস্ত হন। রাষ্ট্রকূটদের কাছে পরাস্ত হলেও তাদের লেখতে ভোজকে দিগ্বিজয়ী বলে উল্লেখ করা হয়েছে (conquered all the regions of the world)। প্রতিহারদের উত্থান অল্পকালের জন্য বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল, কিন্তু ভোজ এতে ক্ষান্ত হননি। ৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ভোজ আবার আগ্রাসী আক্রমণ চালিয়েছিলেন (to conquer the three worlds)। শতদ্রু নদীর পূর্বদিকে কিছু অঞ্চল

তিনি অধিকার করে নেন। রাষ্ট্রকূটদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব শেষ হয়নি। দেবপালের মৃত্যুর পর ভোজ পূর্বদিক সম্পর্কে খানিকটা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলেন। ভোজের সময়ে প্রতিহার রাজ্যের সঙ্গে মধ্য এশিয়ার বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল, ঐ অঞ্চল থেকে ভারতে ঘোড়া আমদানি করা হতো। আরব পর্যটকরা জানিয়েছেন যে, প্রতিহার রাজাদের দেশের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী অশ্বারোহী বাহিনী ছিল। ভারতের জনশ্রুতিতে প্রতিহাররাজ ভোজ বেঁচে আছেন। সম্ভবত তাঁর প্রথমদিককার অভিযাত্রী জীবন, সাম্রাজ্যের পুনঃস্থাপন এবং কনৌজের পুনরুদ্ধার সমকালীন মানুষের কাছে তাঁকে বীরের আসন দিয়েছিল। ভোজ বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন, তাঁর উপাধি ছিল 'আদিবরাহ'।

সম্ভবত ৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ রাজা ভোজের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর প্রতিহার সিংহাসন লাভ করেন তাঁর পুত্র প্রথম মহেন্দ্রপাল। মহেন্দ্রপাল যোগ্য ও দক্ষ শাসক ছিলেন, তিনি পিতা ভোজের সাম্রাজ্য অটুট রেখেছিলেন। শুধু তাই নয়, মগধ ও উত্তরবঙ্গ জয় করে তিনি প্রতিহার সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ঘটিয়েছিলেন। তিনি সম্ভবত ৯০৮-০৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কাথিয়াবাড়, পূর্ব পাঞ্জাব ও অযোধ্যায় তাঁর লেখ পাওয়া গেছে। অত্যুক্তি না করে বলা যায় হিমালয় থেকে বিন্ধ্য এবং আরব সাগর থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। প্রতিহাররা প্রায় দেড়শো বছর ধরে উত্তর ভারতের রাজনীতিতে প্রাধান্য বজায় রেখেছিলেন। মুসলমান আক্রমণের বিরুদ্ধে তাঁরা ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা করেন, দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি ছিল। রাষ্ট্রকূট আক্রমণে এই সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়েছিল, এর ওপর চান্দেল্ল ও চহমানরা আঘাত হেনেছিল। অধীনস্থ সামন্ত রাজারা একে একে স্বাধীন হয়ে যায়। ১০২৭ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মাহমুদ কনৌজ আক্রমণ করলে প্রতিহার সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত পতন ঘটে।

৮৫১ খ্রিস্টাব্দে আরব পর্যটক সুলেমান প্রতিহার রাজ্যে এসেছিলেন, তিনি ভোজের সমসাময়িক ছিলেন। সুলেমান প্রতিহার রাজার ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের বর্ণনা রেখে গেছেন। গুর্জর দেশকে তিনি বলেছেন 'জুজর' (Juzr)। সুলেমান জানাচ্ছেন যে, রাজা এক বিশাল সৈন্যবাহিনী পোষণ করেন, দেশের সবচেয়ে ভালো অশ্বারোহী বাহিনী আছে তাঁর। তিনি আরবদের বন্ধু নন, তা সত্ত্বেও সুলেমান জানিয়েছেন যে, রাজা আরব দেশের রাজাকে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করেন। ভারতীয় রাজাদের মধ্যে তিনি আরবদের প্রতি সবচেয়ে শত্রুভাবাপন্ন। তাঁর রাজ্যটি বেশ বড়, তাঁর অনেক ধনসম্পদ আছে, তাঁর ঘোড়া ও উটের সংখ্যা অসংখ্য। তাঁর রাজ্যে বিনিময়ের মাধ্যম হলো রুপো ও সোনা, এসব ধাতুর খনি আছে এই রাজ্যে। ভারতের আর কোনো রাজ্যে এত শান্তি নেই, দেশে দস্যু-তস্করের উৎপাত নেই। সন্দেহ নেই আরব পর্যটকের দৃষ্টিতে ভোজ ছিলেন (৮৩৬-৮২) একজন শক্তিশালী শাসক, তিনি দেশের অভ্যন্তরে শান্তি বজায় রেখেছিলেন, বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন। ৯১৫-১৬ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদের অধিবাসী

আল মাসুদি গুজরাটে এসেছিলেন। তিনি প্রতিহার রাজাদের বিশাল রাজ্য, শক্তি ও সম্পদের বর্ণনা রেখে গেছেন। তিনি রাজ্যের নাম বলেছেন জুজর, রাজার নাম বরা (Baura), সম্ভবত ভোজের 'আদিবরাহ' উপাধিকে 'বরা' বলে উল্লেখ করেছেন। রাজ্যের আয়তন বোঝাতে গিয়ে মাসুদি লিখেছেন যে, এই রাজ্যের দক্ষিণে ছিল রাষ্ট্রকূটদের রাজ্য, পশ্চিমে মুসলমানদের মুলতান রাজ্য। এই দুই রাজ্যের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ছিল। এই রাজ্যের মধ্যে ছিল ১৮ লক্ষ গ্রাম ও শহর। রাজ্যটি দুহাজার কিলোমিটার লম্বা এবং দুহাজার কিলোমিটার চওড়া। রাজার উট ও ঘোড়ার সংখ্যা অসংখ্য। রাজ্যের চারদিকে রাজা চারটি বাহিনী মোতায়েন করে রেখেছিলেন, প্রত্যেক বাহিনীতে সাত থেকে নয় লক্ষ সৈন্য ছিল। এই সৈন্যবাহিনী পূর্বদিকে পালরাজা এবং দক্ষিণে রাষ্ট্রকূটদের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত ছিল। রাজার দুহাজার শিক্ষিত হস্তিবাহিনী ছিল।

প্রতিহার রাজারা শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সংস্কৃত কবি ও নাট্যকার রাজশেখর প্রথম মহেন্দ্রপাল ও মহীপালের রাজসভায় ছিলেন। রাজধানী কনৌজে তাঁরা মনোরম সুদৃশ্য প্রাসাদ ও মন্দির বানিয়েছিলেন। অষ্টম ও নবম শতকে ভারতীয় পণ্ডিতদের অনেকে বাগদাদে আব্বাসীয় খলিফাদের দরবারে গিয়েছিলেন। এই পণ্ডিতরা আরবদেশে ভাবতের বিজ্ঞান, গণিত, বীজগণিত, চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে যান। প্রতিহারদের সঙ্গে সিন্ধুর আরবদের সম্পর্ক ভালো ছিল না, তবে আরবদের সঙ্গে প্রতিহারদের ব্যবসা-বাণিজ্য চলেছিল। অনুমান করা যায় এইসব পণ্ডিত প্রতিহারদের রাজসভা থেকে হয়তো গিয়েছিলেন। দশম শতকের গোড়ার দিকে রাষ্ট্রকূটরাজা তৃতীয় ইন্দ্র প্রতিহারদের রাজধানী কনৌজ অধিকার করে ধ্বংস করেন। এরপর প্রতিহার সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়েছিল, সম্ভবত এই আক্রমণের পর গুজরাট তাঁদের হাতছাড়া হয়ে যায়। আল মাসুদি জানিয়েছেন যে, এই রাজ্যের সঙ্গে সমুদ্রের যোগাযোগ ছিল না। সেযুগে গুজরাটের মধ্যে দিয়ে ভারতের বহির্বাণিজ্য পরিচালিত হতো। মহীপালের মৃত্যুর পর প্রতিহার সাম্রাজ্য দ্রুত ভাঙতে থাকে। ৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আর একজন রাষ্ট্রকূট রাজা তৃতীয় কৃষ্ণ প্রতিহার রাজাকে পরাস্ত করেন। এরপর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে প্রতিহার সাম্রাজ্য ভেঙে পড়েছিল। কনৌজের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল নিয়ে এই রাজ্যটি আরও কিছুকাল টিকে ছিল।

পাল-পূর্ব যুগে বাংলায় মাৎস্যন্যায় (৬৩৭-৭৫০ খ্রিস্টাব্দ)

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর থেকে (৬৩৭) ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে গোপালের অধিরাজ হিসেবে নির্বাচন পর্যন্ত সময়কাল হল বাংলার ইতিহাসে এক দুর্যোগপূর্ণ অন্ধকারময় যুগ। ধর্মপালের খালিমপুর লেখতে, সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিতে*, বৌদ্ধগ্রন্থ *মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে* এবং হিউয়েন সাঙের বর্ণনায় এই অন্ধকারময় যুগের ইঙ্গিত আছে। শশাঙ্কের মৃত্যুর

পর বাংলার রাজনৈতিক দুর্দশা শুরু হয়েছিল। শশাঙ্ক যে সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন তা অল্পদিনের মধ্যে অন্তর্হিত হয়, বাংলার প্রতিবেশী দেশগুলি বাংলার দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে গৌড়বঙ্গের ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল। কামরূপরাজ ভাস্কর বর্মা ছিলেন শশাঙ্কের শত্রু, শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তিনি গৌড় রাজ্য আক্রমণ করে শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ অধিকার করে নেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হিউয়েন সাঙ্ বাংলাদেশে এসেছিলেন (৬৩৮ খ্রিস্টাব্দ), তিনি লিখেছেন যে বাংলাদেশে সেসময় পাঁচটি রাজ্য ছিল—কজঙ্গল, পুণ্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, সমতট এবং তাম্রলিপ্ত। এদের পৃথক পৃথক রাজধানী ছিল কিন্তু রাজারা স্বাধীন না পরাধীন ছিলেন সেসম্পর্কে তিনি কিছু বলেননি। অনেকে মনে করেন এগুলি হর্ষবর্ধনের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে কেউ কেউ এর বিরোধিতা করেছেন, কারণ হর্ষ ৬৪২ খ্রিস্টাব্দের আগে বাংলার কোনো অঞ্চল জয় করতে পারেননি। শশাঙ্কের দুই প্রধান শত্রু ভাস্কর বর্মা ও হর্ষ তার রাজ্যের ধ্বংসসাধন করেন এই মতটি সাধারণভাবে গৃহীত।

আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে বলা হয়েছে যে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড় রাজ্য ধ্বংস হয়েছিল দুটি কারণে—অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বৈদেশিক আক্রমণ। বাংলায় একাধিক রাজার উদ্ভব হয়, এদের কেউ কেউ একসপ্তাহ বা একমাস রাজত্ব করেন। শশাঙ্কের পুত্র মানব মাত্র আট মাস পাঁচদিন রাজত্ব করেন। এধরনের রাজনৈতিক অস্থিরতা অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা নষ্ট করেছিল, বৈদেশিক আক্রমণের পথ প্রশস্ত করেছিল। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য ভেঙে পড়েছিল, তিব্বতের রাজা কামরূপ ও পূর্ব ভারতের কিছু অংশ অধিকার করে নেন। সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময়ে জয়নাগ নামক এক রাজা বাংলাদেশে রাজত্ব করেছিলেন, তাঁর একখানি তাম্রশাসন ও বেশ কয়েকটি মুদ্রা পাওয়া গেছে। অন্ধকারময় যুগে বাংলা বৈদেশিক আক্রমণের শিকার হয়েছিল। অনেকে মনে করেন তিব্বত রাজ ও শেষদিককার গুপ্ত রাজারা বাংলার ওপর আক্রমণ চালিয়েছিলেন। এর কোনো অকাট্য প্রমাণ নেই তবে শৈলবংশীয় একজন রাজা পুণ্ড্রদেশ জয় করেছিলেন। এই শৈল রাজা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। এর কিছুকাল পরে কনৌজের রাজা যশোবর্মন গৌড়রাজকে পরাস্ত ও নিহত করেন। কনৌজের রাজকবি বাক্‌পতিরাজ এই ঘটনা উপলক্ষ্য করে প্রাকৃত ভাষায় গৌড়বহো বা গৌড়বধ কাব্য রচনা করেন। এই সময় মগধ গৌড়ের অধীন ছিল, কারণ ঐ কাব্যে গৌড়রাজকে মগধরাজ হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে। যশোবর্মন বেশিদিন বিজয় অভিযানের সুফল ভোগ করতে পারেননি, কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য তাকে পরাস্ত করেন। ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড় সম্ভবত পৌণ্ড্রদেশ অধিকার করেন। এই কাহিনীর সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। নেপালরাজের শ্বশুর কামরূপরাজ হর্ষ সম্ভবত গৌড় জয় করেছিলেন, তিনি ভগদত্ত বংশীয় ছিলেন। হিউয়েন সাঙ্

লিখেছেন যে বঙ্গ বা সমতট একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। এই অঞ্চল সম্ভবত শশাঙ্কের রাজ্যভুক্ত হয়নি। চীন দেশীয় পরিব্রাজক সেংচি সপ্তম শতকের শেষে বাংলাদেশে এসেছিলেন। তিনি সমতটের রাজা রাজভটের নাম উল্লেখ করেছেন যিনি বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী ছিলেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর অনেক সামন্তরাজা স্বাধীনভাবে চলতে থাকেন, এদের আবার অনেক উপসামন্ত ছিল। বাংলার রাজনৈতিক ঐক্য নষ্ট হয়ে যায়। তিব্বতী লামা তারনাথ ঐ যুগের বাংলার রাজনৈতিক অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন, তিনি চন্দ্রবংশীয় রাজাদের কথা বলেছেন।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলার রাজনৈতিক ঐক্য ও স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়েছিল। তারনাথ লিখেছেন যে এই সময়ে বাংলায় কোনো রাজা ছিল না। প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিজ নিজ এলাকা স্বাধীনভাবে শাসন করতেন। সাধারণ মানুষের দুর্দশার শেষ ছিল না। খালিমপুর লিপি (মালদা) ও রামচরিতে একে মাৎস্যন্যায় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 'রাষ্ট্র ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, ক্ষত্রিয়, বণিক, ব্রাহ্মণ, নাগরিক স্ব-স্ব গৃহে সকলেই রাজা। আজ একজন রাজা হইতেছেন, রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব দাবি করিতেছেন, কাল তার ছিন্ন মস্তক ধূলায় লুটাইতেছে', এরই নাম নৈরাজ্য বা মাৎস্যন্যায়। মৎস্যরাজ্যে বড় মাছ ছোট মাছকে গ্রাস করে, মনুষ্য সমাজে সবল দুর্বলের ওপর অত্যাচার করে, বাহুবল ছিল একমাত্র বল, দেশময় উচ্ছৃঙ্খল শক্তির উন্মত্ততা। বহুবছর বাংলাদেশ এই মাৎস্যন্যায়ের শিকার হয়েছিল। এই চরম দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তিলাভের জন্য বাঙালি জাতি যে রাজনৈতিক বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছিল ইতিহাসে তার তুলনা মেলা ভার। দেশের প্রবীণ নেতারা বিবাদবিসম্বাদ ভুলে গোপালকে রাজা হিসেবে নির্বাচিত করেছিল। মাৎস্যন্যায় থেকে মুক্তি লাভের আশায় গোপালকে অধিরাজ হিসেবে মেনে নিয়েছিল। শুধু দেশের মঙ্গলের কথা ভেবে ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে জনগণ ও সামন্তপ্রভুরা যে নজির স্থাপন করলেন বাংলার দীর্ঘ ইতিহাসে তার তুলনা নেই। রমেশচন্দ্র মজুমদার ঘটনাটিকে জাপানের মেজি প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

অধ্যাপক মজুমদার আরো লিখেছেন যে এই ঘটনার ফলে বাংলা গৌরবের শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করেছিল। পাল রাজারা বাংলাকে রাজনৈতিক গৌরব এনে দেন। তবে মাৎস্যন্যায় পর্বে যে বাংলার অর্থনৈতিক জীবন ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল নীহাররঞ্জন রায় তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। মাৎস্যন্যায়ের ফলে বাণিজ্য নষ্ট হয়ে যায়, বাংলা কৃষি ও গৃহশিল্পের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছিল। কারিগর বা বণিক শ্রেণীর সামাজির মর্যাদা কমেছিল, ভূমির চাহিদা বেড়েছিল। এযুগে সামন্ততন্ত্র শক্তিশালী হয়েছিল, সামন্তরা বা তাদের উপসামন্তরা সকলে স্বাধীনভাবে শাসন করত। এই সামন্তরা সংঘবদ্ধ হয়ে গোপালকে রাজপদে বসিয়েছিলেন। মাৎস্যন্যায় পর্বে দেশের ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি যে খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তা বলা যায় না। ই-সিং ও সেংচি বাংলাদেশে

বৌদ্ধধর্মের সমৃদ্ধি দেখেছিলেন, পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের যথেষ্ট উন্নতি হয়, সামন্তরাজারা অনেকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। *আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে* বলা হয়েছে মাৎস্যন্যায় পর্বে বাংলাদেশে তীর্থিকদের (ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী) উন্নতি ঘটেছিল। বৌদ্ধ মঠগুলি দুর্দশার মধ্যে পড়েছিল। রাজা গোপাল ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। এই পর্বে সংস্কৃত ভাষার উন্নতি হয়, এই ভাষায় কাব্য রচিত হয়। এই পর্বে বৌদ্ধ মহাবিহারগুলিকে কেন্দ্র করে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তার ঘটেছিল। মাৎস্যন্যায়ের দুর্যোগপর্ব একেবারে নিষ্ফলা ছিল না। দুর্যোগের মধ্যে ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা ও শিক্ষার পরিবর্তন ঘটে চলেছিল। সামন্ত ও উপসামন্তরা নিজ নিজ অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করে বঙ্গ সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছেন। অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়[৫] লিখছেন ঃ "একশত বৎসরের রাষ্ট্রীয় দুর্যোগের কোন ফাঁকে কে বা কাহারা কোন সংস্কৃতির ধারায় কোন নতুন স্রোত বহাইয়া দিয়া গিয়াছেন, ইতিহাস তার হিসাব, এমনকি ইঙ্গিতও রাখে নাই। অথচ, বৃহৎ সামাজিক আবর্তন-বিবর্তন তো এইরকম দুর্যোগের মধ্যেই ঘটিয়া থাকে। বাঙলাদেশেও তাহাই হইয়াছিল, নাহলে পাল আমলের সূচনা হইতেই বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতির, সংস্কৃত ভাষার এমন সুসমৃদ্ধ রূপ আমরা দেখিতে পাইতাম না।" রায়ের মতে, পাল যুগের সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির সূচনা হয়েছিল মাৎস্যন্যায় পর্বে।

পাল

খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের মধ্যভাগে পূর্বভারতে পাল সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। এই সাম্রাজ্য উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত টিকে ছিল। বাংলার রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে একশো বছর ধরে অরাজকতা চলেছিল। এই পর্বকে 'মাৎস্যন্যায়' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলার সামন্তরা এই নৈরাজ্যের অবসান ঘটানোর জন্য গোপালকে বাংলার রাজা হিসেবে নির্বাচিত করেছিলেন (৭৫০ খ্রিস্টাব্দে)। রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন যে 'রক্তপাতহীন এই বিপ্লব' বাংলার ইতিহাসে এক সমৃদ্ধি ও গৌরবের যুগের সূচনা করেছিল। বাংলা এর আগে বা পরে এত গৌরব কখনো লাভ করেনি (Glorious and the great bloodless revolution ushered in an era of glory and prosperity such as Bengal has never enjoyed before or since.)। ক্ষত্রিয় বংশজাত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী গোপাল যে রাজবংশের সূচনা করে যান তার নেতৃত্বে বাংলা সাম্রাজ্যিক গৌরব লাভ করেছিল।

পাল রাজবংশের শাসনকালে (৭৫০-১১৫০) উত্তর ভারতের সাম্রাজ্য নিয়ে তিনটি শক্তির মধ্যে দুশো বছর ধরে দ্বন্দ্ব চলেছিল। উত্তর ভারতের সমৃদ্ধ গাঙ্গেয়

৫. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস*, পৃ. ৩৮৩।

অববাহিকায় অবস্থিত কনৌজকে গণ্য করা হতো সাম্রাজ্যের প্রতীক হিসেবে। যিনি উত্তর ভারতের সার্বভৌম অধীশ্বর হবেন তিনি অবশ্যই কনৌজ তাঁর অধীনে রাখবেন। পাল রাজারা উত্তর ভারতের প্রতিহার ও দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটদের সঙ্গে সাম্রাজ্য নিয়ে বিরোধে লিপ্ত হয়েছিলেন। পালবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা হলেন গোপালের পুত্র ধর্মপাল (৭৭০-৮১০)। সেই সময় ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা আদৌ ভালো ছিল না। রাজপুতনা ও মালব দখল করে প্রতিহাররা পূর্বদিকে সম্প্রসারণের প্রয়াস চালিয়েছিল। দাক্ষিণাত্যে সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকূট শক্তি উত্তর ভারতের সমৃদ্ধ গাঙ্গেয় উপত্যকার দিকে নজর দিয়েছিল। ধর্মপাল এঁদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিলেন। প্রতিহাররাজ বৎসরাজ তাঁকে পরাস্ত করে কনৌজ অধিকার করেন। রাষ্ট্রকূট রাজাদের সঙ্গে প্রতিহারদের মালব ও গুজরাট নিয়ে বিরোধ ছিল। রাষ্ট্রকূট রাজা ধ্রুব পাল-প্রতিহার দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে প্রতিহার রাজাকে ঝাঁসির কাছে এক যুদ্ধে পরাস্ত করেন। ধ্রুব দোয়াবের দিকে এগিয়ে গিয়ে ধর্মপালকেও পরাস্ত করেন। তবে এই যুদ্ধের পর তিনি দাক্ষিণাত্যে ফিরে যান, ধর্মপালের কোনো ক্ষতি হয়নি। বরং এই যুদ্ধের ফলে ধর্মপালের কিছু লাভ হয়েছিল। পালদের উত্তর ভারতের প্রতিপক্ষ দুর্বল হয়ে পড়েছিল, পাল রাজার পক্ষে এরপর সাম্রাজ্য বিস্তারের সুযোগ এসেছিল। ধর্মপাল উত্তর ভারতের সাময়িক রাজনৈতিক শূন্যতার সুযোগ নিয়ে কয়েকটি সামরিক অভিযান পরিচালনা করে সমগ্র উত্তর ভারতের অধীশ্বর হয়ে বসেছিলেন।

ধর্মপাল কনৌজ জয় করে তাঁর মনোনীত প্রার্থী চক্রায়ুধকে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। কনৌজের রাজা ইন্দ্রায়ুধ বিতাড়িত হন। বিজয় লাভের পর ধর্মপাল কনৌজে একটি বিশাল সভার আয়োজন করেন। এই সভায় যোগ দেয় ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তী, গান্ধার ও কীরা। এইসব দেশের রাজারা তাঁকে আনুগত্য ও কর দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। এই রাজ্যগুলি ছিল উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, মালব ও কাথিয়াবাড় অঞ্চলে। গুজরাটি কবি সোদধালা *উদয়সুন্দরী কথায়* ধর্মপালকে 'উত্তরাপথস্বামী' বলে উল্লেখ করেছেন। এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই ধর্মপাল অন্তত কিছুকালের জন্য সমগ্র উত্তর ভারতের অধীশ্বর ছিলেন। সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল কনৌজ দখল করে ধর্মপাল সম্রাট হন। ধর্মপালের সাম্রাজ্য তিনটি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। বাংলা ও বিহার তিনি সরাসরি শাসন করতেন, কনৌজ ছিল তাঁর অধীনস্থ শাসিত রাজ্য। এই রাজ্যের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে পাঞ্জাব, হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চল, রাজপুতনা, মালব ও বেরারে ছিল তাঁর সামন্তরাজারা।

ধর্মপালের 'খালিমপুর তাম্রশাসনে' তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তারের কাহিনী পাওয়া যায়। প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট্টের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বেধেছিল। নাগভট্ট কনৌজ থেকে ধর্মপালের প্রতিনিধি চক্রায়ুধকে সরিয়ে তা দখল করে নেন। মুঙ্গেরের কাছে এক যুদ্ধে

তিনি ধর্মপালকে পরাস্ত করেন। এক্ষেত্রেও ভাগ্য তাঁর প্রতি সুপ্রসন্ন ছিল না। রাষ্ট্রকূট রাজা তৃতীয় গোবিন্দ উত্তর ভারতে প্রবেশ করে তাঁকে পরাস্ত করেন, নাগভট্টের সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন ভেঙে যায়। রাষ্ট্রকূটদের দলিলে বলা হয়েছে ধর্মপাল এবং কনৌজের শাসক চক্রায়ুধ তৃতীয় গোবিন্দের কাছে নতি স্বীকার করেন। গোবিন্দ দাক্ষিণাত্যে ফিরে গেলে ধর্মপাল তাঁর রাজ্য বিস্তারের কাজ চালিয়ে যান। তাঁর মৃত্যুর সময় (৮১০ খ্রিস্টাব্দ) পাল সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁর নেতৃত্বে বাংলা উত্তর ভারতের রাজনীতিতে প্রাধান্য স্থাপন করেছিল। তাঁর নেতৃত্বে বাংলা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, অভ্যন্তরীণ বিরোধ দূর করা সম্ভব হয়েছিল। শশাঙ্ক যে সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন ধর্মপাল তা বাস্তবায়িত করেন। সম্রাট হিসেবে তিনি উপাধি নেন পরমেশ্বর, পরমভর্তারক, মহারাজাধিরাজ। তাঁর লেখতে পাটলিপুত্রের জাঁকজমকপূর্ণ রাজসভার বর্ণনা আছে। তারনাথ লিখেছেন যে ধর্মপাল বৌদ্ধধর্মের অনুগামী ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র বিক্রমশীলা স্থাপন করেন। রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে তিনি সোমপুর বিহার এবং বিহারে গড়ে তোলেন ওদন্তপুরি বিহার। বৌদ্ধ লেখক হরিভদ্র তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন এবং তারনাথের মতে তিনি পঞ্চাশটি ধর্মীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

দেবপাল ছিলেন (৮১০-৫০) যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র। তিনি শুধু পিতার সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখেননি, এর সম্প্রসারণ ঘটিয়েছিলেন। হিমালয় থেকে বিন্ধ্য এবং পশ্চিমসাগর থেকে পূর্বসাগর পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। 'মুঙ্গের তাম্রশাসনে' দেবপালের সামরিক অভিযানগুলির পরিচয় আছে। পশ্চিমে কম্বোজ, দক্ষিণে বিন্ধ্য এবং উৎকল, প্রাগ্‌জ্যোতিষ (আসাম), হূণ, দ্রাবিড় ও গুর্জর শাসকদের তিনি পরাস্ত করেন। এইসব অভিযানে তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন মন্ত্রী দর্ভপাণি এবং কেদারমিশ্র, নেতৃত্ব দেন সেনাপতি জয়পাল। তিনি আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করেন এবং জীবনের বেশিরভাগ সময় তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে কাটিয়েছিলেন। মুঙ্গের লেখতে বলা হয়েছে যে উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে রামেশ্বরম পর্যন্ত দেবপালের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। সম্ভবত দক্ষিণে তিনি পাণ্ড্য রাজা শ্রীমর শ্রীবল্লভকে পরাস্ত করেছিলেন। উত্তর ভারতে তিনি আধিপত্য স্থাপন করেছিলেন, প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটরা তাঁর সাম্রাজ্যের কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। পিতার মতো দেবপাল বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী ছিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজা বালপুত্রদেব তাঁর কাছে দূত পাঠিয়ে নালন্দায় একটি বিহারের জন্য পাঁচটি গ্রাম প্রার্থনা করেন। দেবপাল এই প্রার্থনা মঞ্জুর করেন।

ধর্মপাল ও দেবপালের নেতৃত্বে পাল সাম্রাজ্য ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছেছিল। আরব বণিক সুলেমান পাল সাম্রাজ্যের পরিচয় রেখে গেছেন। ৮৫১ খ্রিস্টাব্দে সুলেমান লিখছেন যে, পালদের রাজ্য (রুমি) পার্শ্ববর্তী গুর্জর ও রাষ্ট্রকূটদের সঙ্গে সংঘর্ষে

লিপ্ত ছিল তবে পালরাজার সৈন্যবাহিনী তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে আয়তনে বড় ছিল। পাল রাজা যুদ্ধে ৫০,০০০ রণহস্তী ব্যবহার করতেন, দশ থেকে পনেরো হাজার লোক তাঁর সৈন্যবাহিনীর সেবার কাজ করত। তারনাথ পাল রাজাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগের কথা উল্লেখ করেছেন। ধর্মপাল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ২০০টি গ্রাম দান করেন। তিব্বতের সঙ্গে পাল রাজাদের যোগাযোগ ছিল, বৌদ্ধ পণ্ডিত শান্তরক্ষিত ও অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতে গিয়েছিলেন। তিব্বত থেকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা নালন্দায় শিক্ষালাভের জন্য আসতেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে পাল রাজাদের সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল, এই বাণিজ্য থেকে পাল সাম্রাজ্য লাভবান হয়েছিল। নবম শতকের মধ্যভাগে পাল সাম্রাজ্যে ভাঙন দেখা দিয়েছিল। কলচুরি ও চান্দেল্লদের আক্রমণ ছিল এর একটি কারণ। প্রথম মহীপাল (৯৮৮-১০৩৮) পাল সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধারে মন দেন। ১০৭৫ খ্রিস্টাব্দে দিব্যর নেতৃত্বে কৈবর্তরা বিদ্রোহ করে উত্তরবঙ্গে ক্ষমতা দখল করেছিল। দিব্য, তাঁর ভ্রাতা রুদক ও ভীম তিন প্রজন্মকাল ধরে বরেন্দ্রী শাসন করেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত*-এ এই বিদ্রোহের বর্ণনা আছে। পালরাজা রামপাল এই বিদ্রোহ দমন করে পাল সাম্রাজ্যের গৌরব পুনরুদ্ধার করেন, দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত পাল সাম্রাজ্য টিকে ছিল।

পাল রাজবংশের শাসনকালে কৈবর্ত বিদ্রোহ

পালবংশীয় রাজা দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে (১০৭০-৭১) বাংলাদেশে কৈবর্ত বিদ্রোহ হয়। এই বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন কৈবর্ত নেতা দিব্যক (দিব্য)। সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত*-এ এই বিদ্রোহের বর্ণনা পাওয়া যায়। রামচরিত ছাড়া সমকালীন আরও তিনখানি লেখতে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। কুমারপালের মন্ত্রী বৈদ্যদেবের কামাউলি পট্টে, মদনপালের মানাহালি দানপত্রে এবং পূর্ববঙ্গের বর্মনবংশীয় ভোজবর্মনের বেলবা দানপত্রে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী *রামচরিত*-এর পাণ্ডুলিপিটি আবিষ্কার করেন। তিনি মনে করেন যে বাংলার কৈবর্তরা দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে নির্যাতিত হয়েছিল (The Kaivarta community were smarting under Mahipala's oppression.)। শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তব্য হলো দিব্য মহীপালকে হত্যা করে তার স্বজাতীয়দের অপশাসন থেকে মুক্ত করেন। এমন কথাও বলা হয়েছে যে এই মহৎ কাজের জন্য জনসাধারণ তাকে রাজা নির্বাচিত করেছিল। সন্ধ্যাকর নন্দী ও তার পিতা প্রজাপতি নন্দী পাল রাজাদের কর্মচারী ছিলেন। বাংলার পাল বংশের প্রতি তাদের আনুগত্য ও পক্ষপাতিত্ব স্বাভাবিক। সেজন্য রামচরিতের বর্ণনাকে সকলে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতে পারেননি। সন্ধ্যাকর নন্দী দিব্যকে দস্যু ও 'উপাধিব্রতী' বলেছেন। রামচরিতে এই ইঙ্গিতও পাওয়া যায় যে দিব্য মহীপালের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন।

রামচরিতকারের মতে দিব্য দস্যু ছিলেন, দেশহিতের ভান করে তিনি রাজাকে হত্যা করেন। মহীপালের শাসনকালে বাংলায় এক সামন্ত বিদ্রোহ হয়েছিল (মিলিতান্তক সামন্তচক্র)। এই বিদ্রোহে দিব্য মহীপালের সঙ্গে ছিলেন, যুদ্ধে রাজা পরাস্ত হলে তিনি তাকে হত্যা করে বরেন্দ্রভূমি বা উত্তরবঙ্গ অধিকার করে নেন।

রামচরিতে চোদ্দজন সামন্ত রাজার নাম পাওয়া যায়। এরা হলেন ভীমযশ, কোটাটবীর রাজা বীরগুণ, দণ্ডভুক্তির রাজা জয়সিংহ, বিক্রম, হুগলির লক্ষ্মীশূর, কুজ্জবটীর রাজা শূরপাল, মানভূমের রাজা রুদ্রশিখর, উচ্ছালের রাজা ভাস্কর, ঢেকুরীরাজ প্রতাপসিংহ, সংকটগ্রামের রাজা চণ্ডার্জুন, কয়ংগল মণ্ডলের অধিপতি নরসিংহার্জুন, নিদ্রাবলীর রাজা বিজয়রাজ, কৌশাম্বীর রাজা দ্বোরপবর্ধন এবং পদুবন্বার রাজা সোম।

এই চোদ্দজন সামন্তরাজা মহীপালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। তাঁর সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত ছিল না, অমাত্যদের উপদেশ অগ্রাহ্য করে তিনি যুদ্ধ করেন, পরাস্ত ও নিহত হন। এই তালিকার ওপর নির্ভর করে অধ্যাপক রামশরণ শর্মা তার সামন্ততত্ত্বের ভিত্তিকে জোরদার করেছেন। কৈবর্ত বিদ্রোহ তাঁর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার উপযোগী অনেক উপকরণ সরবরাহ করেছে। তাঁর অনুগামীদের অনেকে এই বিদ্রোহকে কৃষক বিদ্রোহ বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মতে, এই কৈবর্তরা ছিল কৃষক, কৃষকের ওপর অত্যাচার হলে সামন্তপ্রভুদের নেতৃত্বে তারা রাজশক্তির বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল। রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন রামচরিত একখানি কাব্য, ইতিহাস নহে। দিব্যর বিদ্রোহের মধ্যে বিশেষত্ব কিছু নেই। এই বিদ্রোহ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে আর পাঁচটি বিদ্রোহের মতো। কেন্দ্রীয় রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল, রাজবংশের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল, মহীপাল তার দুই ভ্রাতা শূরপাল ও রামপাল-কে কারাগারে বন্দী করে রেখেছিলেন। সামন্তরাজারা বিদ্রোহপ্রবণ হয়ে উঠেছিল। দিব্য এদের নেতৃত্ব দেন, দ্বিতীয় মহীপালকে হত্যা করে বরেন্দ্রভূমি অধিকার করেন। বাংলার কৈবর্তরা বহুকাল ধরে রাজকার্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। রাজ্যপালের সময় থেকে এই ধারা চলে আসছিল। রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখছেন ঃ "মহীপাল যে প্রজাপীড়ক বা অত্যাচারী রাজা ছিলেন এবং এই জন্যই তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হইয়াছিল এরূপ মনে করিবার কোনো কারণ নাই। আর এই বিদ্রোহকে কৈবর্ত জাতির বিদ্রোহ বলিয়া চিহ্নিত করাও সঙ্গত নহে। দিব্য কৈবর্ত জাতীয় ছিলেন, কিন্তু তিনি যে এই জাতির উপর রাজার অত্যাচারের জন্য মহীপালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন রামচরিতে ইহার সমর্থক কোনো উক্তি বা প্রমাণ পাওয়া যায় না। এইরূপ বিদ্রোহ সেযুগে প্রায়ই ঘটিত।"

উত্তরবঙ্গের কৈবর্ত বিদ্রোহ নিয়ে পণ্ডিত মহলে অনেক বিতর্ক তৈরি হয়েছে। অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় মনে করেন উত্তরবঙ্গের কৈবর্তরা ছিল জেলে, মৎস্যজীবী। অন্যমতে, এরা হলো চাষি কৈবর্ত, জেলেদের একাংশ বৃত্তি পরিবর্তন করে চাষি

কৈবর্ত হয়ে যায়। অধ্যাপক বি. সি. সেন মনে করেন মৎস্যজীবী কৈবর্তদের ওপর পালরাজাদের উৎপীড়ন হলো এই বিদ্রোহের একটি কারণ। পালরাজারা বৌদ্ধ ছিলেন, প্রাণীহত্যা পছন্দ করতেন না, তা নিয়ে বিরোধ। অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী এইমতের বিরোধিতা করে বলেছেন যে পাল রাজারা বৌদ্ধ হলেও খুব সহিষ্ণু ছিলেন। তাছাড়া, পালযুগে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের মধ্যে ব্যবধান কমে এসেছিল, দুই ধর্মের মধ্যে বিরোধ ছিল না। তিনি আরো জানিয়েছেন যে পাল আমলে কৈবর্তদের ওপর অত্যাচার হয়েছিল এর কোনো প্রমাণ নেই। অক্ষয় কুমার মৈত্র বলেছেন যে পালবংশের রাজপুত্রদের মধ্যে রামপাল ছিলেন যোগ্যতম কিন্তু মহীপাল বয়সে বড় হওয়ায় সিংহাসন লাভ করেন। সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত বাতিল হওয়ায় এই বিদ্রোহ হয়। অধ্যাপক এ. এম. চৌধুরী এই মতও বাতিল করে দিয়ে বলেছেন যে বিদ্রোহ সফল হলে রামপাল রাজ্যের কেন্দ্রস্থল থেকে বিতাড়িত হন। রামচরিতে বলা হয়েছে যে এই বিদ্রোহ রামপালের বিশেষ মনোকষ্টের কারণ হয়েছিল। রামপালের সমর্থনে এই বিদ্রোহ হয়েছিল এর কোনো প্রমাণ নেই।

রামচরিতে এই বিদ্রোহকে অপবিত্র ধর্মবিপ্লব বলে উল্লেখ করা হয়েছে (অনিকম ধর্ম বিপ্লবম্)। ধর্মের অর্থ যদি হয় ন্যায়নীতি তবে অবশ্যই তা লঙ্ঘন করা হয়েছিল। দিব্য সামন্ত বিদ্রোহের সময় রাজার পক্ষে ছিলেন। রাজার পরাজয়ের পর তিনি বিদ্রোহীদের পক্ষে যোগ দিয়ে ক্ষমতা দখল করেন। ক্ষমতা দখলের এই কাজকে সন্ধ্যাকর নন্দী কর্তব্যচ্যুতি বা ধর্মবিপ্লব বলে উল্লেখ করেছেন। ক্ষমতা দখল করে দিব্য তার ভ্রাতা রুদক ও রুদকের পুত্র ভীম তিন প্রজন্ম ধরে ক্ষমতা ভোগ করেন। উত্তরবঙ্গের কৈবর্তরা ছিল শক্তিশালী ও যুদ্ধপ্রিয়। দিব্যর রাজ্যের ওপর পাল ও পূর্ববঙ্গের বর্মনরাজা জাঠবর্মনের আক্রমণ হয়েছিল। তিনি এসব প্রতিহত করে নিজের ক্ষমতা বজায় রাখেন। তাঁর ভ্রাতা রুদকের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে রামচরিতে এই কৈবর্ত বংশের তৃতীয় শাসক ভীম সম্পর্কে প্রশংসাসূচক উক্তি আছে। তার শক্তি ও সমৃদ্ধির বর্ণনা আছে। ভীম যোগ্যশাসক ছিলেন, তাঁর সময়ে, তাঁর শাসনকালে উত্তরবঙ্গের উন্নতি হয়েছিল। ভীমের দক্ষ অশ্বারোহী ও হস্তিবাহিনী ছিল। তাঁর সম্পদ কম ছিল না, তিনি ছিলেন শিক্ষানুরাগী, ধার্মিক ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। শিব ছিল তাঁর উপাস্য দেবতা, সমকালের লোককাহিনীতে তিনি বেঁচে আছেন। বগুড়ার 'ভীমের জাঙ্গাল' সম্ভবত তাঁর তৈরি ছিল। তিনি ডমর নামে একটি নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। রামপালের সঙ্গে সংঘর্ষে তিনি নিহত হন। রামপাল সামন্তরাজাদের অর্থ ও ভূসম্পত্তি দিয়ে তার দলে টেনেছিলেন। সামন্ত বিদ্রোহের ফলে মহীপাল ক্ষমতা হারিয়েছিলেন, আবার সামন্তদের সহায়তা নিয়ে রামপাল (১০৭২-১১২৬) ক্ষমতা ফিরে পান।

বরেন্দ্রভূমির কৈবর্ত বিদ্রোহ প্রমাণ করেছিল যে বাংলার সামন্ততন্ত্র রাজতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। সামন্ততন্ত্র সাময়িকভাবে জয়ী হয়েছিল। সামন্ততন্ত্র নিজেদের ঐক্য রক্ষা করতে পারেনি, রামপাল এদের একাংশের সহায়তা নিয়ে ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করেন। এই বিদ্রোহের অন্য তাৎপর্য হলো নিম্নবর্গের মানুষ সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। নিম্নবর্গের মানুষদের সহায়তা নিয়ে দিব্য ক্ষমতা দখল করেন। পণ্ডিতদের অভিমত হলো তিনি কোনো কৃষক বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেননি। 'দিব্য কোনো প্রজা বিদ্রোহের নায়কত্ব করেছিলেন, তার কোনো প্রমাণ নেই'। তিনি তার সম্প্রদায়ের মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন কিনা তা নিয়েও মতভেদ আছে। সামন্ততন্ত্রের কয়েকজন তাকে সমর্থন করেছিলেন ঠিকই কিন্তু তিনি তাদের মনোনীত প্রার্থী ছিলেন কিনা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। রাজনৈতিক অস্থিরতার যুগে কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে তিনি ক্ষমতা দখল করেছিলেন। তিনি দস্যু ছিলেন না, তার পেছনে অবশ্যই কিছু জনসমর্থন ছিল। তা না হলে তাঁর বংশ তিন প্রজন্ম ধরে ক্ষমতাভোগ করতে পারত না। তিনি অবশ্যই জনসমর্থন পেয়েছিলেন, তবে পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের মতো তিনি নির্বাচিত রাজা ছিলেন না। রাজপরিবারের উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব তাঁর সহায়ক হয়েছিল। একাদশ ও দ্বাদশ শতকের অন্যান্য বিদ্রোহের মতো এটি ছিল একটি পরিচিত ঘটনা।

পাল ও সেন যুগে বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন (৭৫০-১২৪৫)

সমাজ ঃ খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে গুপ্তযুগে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা হয়, ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত তা ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করতে থাকে। ভবদেব ভট্ট ও জীমূতবাহনের স্মৃতিগ্রন্থে, বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে, বল্লালচরিতে ও কুলজি গ্রন্থমালায় বর্ণ বিন্যাসের চিত্রটি পাওয়া যায়। চর্যাগীতি থেকে নিম্নবর্গের মানুষের সামাজিক অবস্থানের কথা জানা যায়। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার সমাজের উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে আর্য রীতিনীতি প্রাধান্য পেলেও নিম্নস্তরের মানুষের মধ্যে প্রাক-আর্য উপাদানগুলি বজায় ছিল। আর্য ও প্রাক-আর্য উপাদানগুলির মধ্যে সমন্বয় ও সংঘাত চলেছিল। পাল যুগের সামাজিক বর্ণবিন্যাসে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রদের শুধু পাওয়া যায়, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের উল্লেখ নেই। সম্ভবত ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতির জন্য বৈশ্যদের তেমন উল্লেখ পাওয়া যায় না। পাল রাজারা ও সামন্ত রাজন্যবর্গ ক্ষত্রিয় বলে নিজেদের দাবি করলেও, এসম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। পাল যুগে করণ-কায়স্থদের কথা জানা যায়, সন্ধ্যাকর নন্দীর পিতা ছিলেন করণকুল শ্রেষ্ঠ। একাদশ শতকের আগে বাংলার সমাজে বৈদ্য উপবর্ণের উল্লেখ দেখা যায় না। দিব্যর বিদ্রোহ থেকে

কৈবর্ত উপবর্ণের কথা জানা যায়, উত্তরবঙ্গে এরা প্রভাবশালী ছিল। পাল যুগের লেখতে বর্ণ সমাজের নিম্নস্তর হিসেবে মেদ, অন্ধ্র ও চণ্ডালদের উল্লেখ আছে, চর্যাগীতিতে ডোম, চণ্ডাল, শবর ও কাপালিকের উল্লেখ পাওয়া যায়।

পাল ও সেন যুগে বর্ণাশ্রম সমাজের কেন্দ্রস্থলে ছিল ব্রাহ্মণরা। বৌদ্ধরা ব্রাহ্মণ্য সমাজকে স্বীকার করে নিয়েছিল, পাল আমলের লেখগুলিতে ব্রাহ্মণদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। দেবপাল তার মুঙ্গের লেখতে জানাচ্ছেন যে ধর্মপাল বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছেন। বৌদ্ধরাও সামাজিক আচার-আচরণে ব্রাহ্মণ্য অনুশাসন মেনে চলত। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পালযুগে বর্ণাশ্রম ধর্মের কঠোরতা ছিল না, অনুশাসন ছিল অনেকখানি নমনীয়। দুটি কারণে তা সম্ভব হয়েছিল, রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, আর বেশিরভাগ মানুষ বর্ণাশ্রম ধর্ম বহির্ভূত জীবনযাপন করত। সেন যুগে অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। সেন রাজারা ছিলেন দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণ্য পরিমণ্ডলের লোক। পাল আমলে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে যে সমন্বয় চলেছিল সেন রাজারা তা পছন্দ করেননি। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য সমাজ বিন্যাসের দ্রুত বিস্তার ঘটেছিল। ব্রাহ্মণ্য শাসিত সমাজব্যবস্থার প্রধানকেন্দ্র ছিল রাঢ় ও বিক্রমপুর অঞ্চল। ভবদেব ভট্ট, জীমূতবাহন, শূলপাণি ও রঘুনন্দন এই সমাজ বিন্যাসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেন আমলে বাংলাদেশে সমাজব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত হয়। বাংলাদেশে বৌদ্ধরা ছিলেন কিন্তু রাজানুদান ও অনুগ্রহ থেকে তারা বঞ্চিত হন। পাল রাজাদের মতো সেন রাজারা উদার ও সহিষ্ণু ছিলেন না, তাঁরা পাল যুগের ঐক্য ও সমন্বয়ের আদর্শ বিসর্জন দিয়ে বৈদিক, স্মার্ত ও পৌরাণিক যুগের পুনঃপ্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও আদর্শকে তাঁরা প্রাধান্য দেন।

সমাজের শীর্ষে ছিলেন সুবিধাভোগী ব্রাহ্মণরা, তাঁরা ভূসম্পত্তি ও ঐশ্বর্যের মালিক হন, কিন্তু সমাজের অন্যান্য গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। ব্রাহ্মণদের একটি ঐক্যবদ্ধ সামাজিক গোষ্ঠী ছিল না, তাদের মধ্যে অন্তত তিনটি প্রধান স্তর ছিল—রাঢ়ী, বরেন্দ্র ও বৈদিক। বৈদিকরা আবার পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য বৈদিক এই দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। বৃহদ্ধর্ম পুরাণে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদের কথা আছে, ব্রাহ্মণ সমাজে এরা মর্যাদা পেত না। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও পূজার্চনা ছিল ব্রাহ্মণদের প্রধান কাঁজ। পাল ও সেন যুগে ব্রাহ্মণরা এসব কাজ ছাড়াও রাজকার্য পরিচালনা, যুদ্ধে নেতৃত্বদান ও অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত হত, কৃষিকাজও নিষিদ্ধ ছিল না। শূদ্ররা পূজার্চনা, অধ্যাপনা, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যা ও শিল্পচর্চা করতে পারত না। বৃহদ্ধর্ম পুরাণে ব্রাহ্মণেতর সব বর্ণকে শূদ্র ও সংকর বলা হয়েছে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উল্লেখ নেই। শূদ্রদের উত্তম সংকর, মধ্যম সংকর ও অধম সংকর বলা হয়েছে। উত্তম সংকরের মধ্যে পাওয়া যায় কুড়িটি উপবর্ণের নাম। এদের মধ্যে আছে করণ, বৈদ্য, উগ্র ক্ষত্রিয়, তন্তুবায়, গন্ধবণিক

ও অন্যান্যরা। মধ্য সংকরের মধ্যে আছে বারোটি উপবর্ণের লোক—খোদাইকর, রজক, স্বর্ণকার, সুবর্ণবণিক, গোয়ালা, তাম্বুলি প্রভৃতি। অধম সংকরদের মধ্যে পাওয়া যায় ন'টি উপবর্ণ, এরা বর্ণাশ্রম বহির্ভূত, অস্পৃশ্য, চণ্ডাল, বাউরি, চর্মকার, মাঝি ও অন্যারা ছিল এই স্তরে। এগুলি ছাড়াও আরও কিছু উপজাতির নাম পাওয়া যায়—পুককাশ, পুলিন্দ, খস, থর, শবর, যবন ইত্যাদি।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে শূদ্রদের সৎ ও অসৎ এভাবে ভাগ করা হয়েছে। অসৎদের একাংশ হলো অস্পৃশ্য। বাংলার সমাজ তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল—সর্বোচ্চস্থানে ছিল ব্রাহ্মণরা, মধ্যস্থলে শূদ্ররা এবং একেবারে নীচে ছিল অন্তেবাসী অন্ত্যজ ম্লেচ্ছরা। এই সমাজে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের প্রভাব বেশি ছিল, বৈশ্যদের প্রভাব ধীরে ধীরে হ্রাস পেয়েছিল। কৈবর্তরা একসময় প্রভাবশালী হলেও পরে তাদের তেমন প্রভাব ছিল না। অন্য কোনো বর্ণের প্রভাব রাজনীতির ক্ষেত্রে দেখা যায় না। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ভাগবতধর্মী ও সহজযানীদের প্রতিষ্ঠা লক্ষ করা যায়। সমকালীন সাহিত্যে, চর্যাগীতিতে, *রামচরিত* ও *পবনদূত* কাব্যে সমকালীন সমাজজীবনের অনেক উপাদান ছড়িয়ে আছে। বাঙালির প্রিয় খাদ্য ছিল ভাত ও মাছ, সমকালীন সাহিত্যে ডালের উল্লেখ নেই, নিম্নজাতির লোকেরা শিকার করে মাংসের ব্যবস্থা করত। বাঙালির আর একটি প্রিয় খাদ্যবস্তু হলো গুড়, ব্রাহ্মণেতর সকলে মদ্যপান করত। চর্যাগীতির একাধিক গীতিতে শুঁড়িখানার কথা আছে, বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ মদ্যপান দোষাবহ মনে করতেন না। পাশা ও দাবা খেলা, নৃত্য, গীত ও বাদ্য ছিল বিনোদনের উপকরণ। চর্যাগীতিতে কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত ও নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র কাঁসর, করতাল, বীণা ও মৃদঙ্গের উল্লেখ আছে। পরিবহনের কাজে ঘোড়া ও হাতি ব্যবহার করা হতো, নৌকার সঙ্গে বাঙালির পরিচয় ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। রাজপ্রাসাদ ও অভিজাতদের গৃহগুলি ইট ও কাঠ দিয়ে তৈরি হতো, সাধারণ মানুষের বাড়ি হতো কাঠের। বিত্তবানরা সোনা ও রুপোর তৈজসপত্র ব্যবহার করত, গরিবদের বাসনপত্র কাঁসা ও মাটি দিয়ে তৈরি হতো। সেযুগের মানুষ খাট, ফুলদানি, দোয়াত, কলম, পানপাত্র, জলচৌকি, দীপাধার, পুস্তকাধার ইত্যাদি ব্যবহার করতে শিখেছিল। উচ্চবর্গের মানুষ জুতো পরত। বাঙালির প্রধান পরিচ্ছদ হলো ধুতি ও শাড়ি, তার সঙ্গে ছিল উত্তরীয় ও ওড়না, উৎসব ও অনুষ্ঠানে পোশাক ভিন্ন ধরনের হতো। বাঙালির কেশাভরণ বিশেষ কিছু ছিল না। বিবাহিতা নারীর কপালে সিঁদুরের টিপ থাকত, সীমন্তেও সিঁদুর ব্যবহার করা হত। উচ্চকোটির মহিলারা প্রসাধন ও অলংকারে উত্তর ভারতীয় রীতি অনুসরণ করত। এরা সুদৃশ্য, মূল্যবান অলংকার পরত, পল্লীবাসীরা অবশ্য এসব বিলাসিতা থেকে দূরে ছিল। রাজসভায় এবং অভিজাতদের গৃহে নাচগানের আসর বসত, নর্তকীরা নাচ-গান করত, দেশে দেবদাসী প্রথা ছিল, সেন আমলে এই প্রথার বিস্তার ঘটেছিল।

সাধারণ মানুষ দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন কাটাত। সমকালীন সাহিত্যে এর অজস্র উদাহরণ ছড়িয়ে আছে (হাঁড়িতে ভাত নেই, নিত্য উপবাস)। দরিদ্র মানুষরা ধনীদের গৃহে অনুষ্ঠিত আমোদ-প্রমোদে যোগ দিত। নৃত্য ও গীতের মাধ্যমে নিজেদের দারিদ্র্য লাঞ্ছিত জীবন ভুলে থাকার চেষ্টা করত। দেশে চুরি, ডাকাতির ভয় ছিল, প্রহরীর প্রয়োজন হতো। বিবাহে উচ্চবর্ণের মানুষ যৌতুক নিত। অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষরা গ্রামের বাইরে বাস করত, উচ্চকোটির মানুষের সঙ্গে তাদের মেলামেশা ছিল না। বাৎস্যায়ন গৌড়ের রমণীদের শান্ত, সুভাষিণী ও সুন্দরী বলে উল্লেখ করেছেন। বাস্তব চিত্র সব সময় বোধহয় এরকম ছিল না। সম্ভবত উচ্চবর্গের মধ্যে পর্দাপ্রথা ছিল, মেয়েরা লেখাপড়াও শিখত। মহিলাদের প্রেমপত্র রচনার কথাও জানা যায়। আইনের চোখে মহিলাদের স্বাধীনতা ছিল না, পাতিব্রত্যের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো স্মৃতিকার মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার স্বীকার করে নিয়েছেন। সাধারণভাবে পুরুষরা এক পত্নী গ্রহণ করত, তবে অভিজাত ও ব্রাহ্মণরা একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করত। সবর্ণ বিবাহ ছিল নিয়ম, অসবর্ণ বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ ছিল না। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে পতিতা রমণীকেও প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে সমাজে পুনর্বাসন দিতে বলা হয়েছে। বিবাহিতা রমণী স্বামীকে নানাভাবে আর্থিক সহায়তা দেবে এমন ছিল স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান। বিধবাকে কৃচ্ছ্রসাধন করতে হতো, তার পক্ষে সহমরণ ছিল কাম্য। সমাজের নিম্নস্তরে ব্রাহ্মণ্য বিধি-বিধান তেমন মানা হতো না।

অর্থনীতি ঃ পাল ও সেন যুগের অর্থনীতির তিনটি অঙ্গ হলো কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য, তিনটি ক্ষেত্রেই উন্নতি হয়েছিল। এযুগের লেখ, সাহিত্য ও মুদ্রা থেকে অর্থনৈতিক জীবনের কথা জানা যায়। বরেন্দ্রভূমিতে উৎকৃষ্ট নানারকমের ধান উৎপন্ন হতো। জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে কৃষককে জানানো হতো, কৃষক খুব অবহেলিত ছিল না। ধান ছাড়া কৃষিজ পণ্যের মধ্যে ছিল আখ, কার্পাস, সরিষা, আম, কাঁঠাল, লবণ, বাঁশ, কাঠ, সুপারি ও নারিকেল। বরেন্দ্রভূমিতে উত্তম এলাচের চাষ ছিল। নদীবহুল বাংলাদেশে মাছের অভাব ছিল না। দেশের প্রাণীদের মধ্যে ছিল গরু, মোষ, হরিণ, শূকর, ঘোড়া ও উট। শিল্পদ্রব্যের মধ্যে বস্ত্র ছিল প্রধান, আরব পর্যটক সুলেমান বাংলার অতিসূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। বাংলায় তুঁত গাছের চাষ ছিল, গুটিপোকা পালন করা হতো রেশমের জন্য। কারুশিল্পের মধ্যে কাঠ শিল্পের প্রাধান্য ছিল, বাড়ি, মন্দির, পালকি, গরুর গাড়ি, নৌকা সব হতো কাঠের। শিল্পীদের গোষ্ঠী ছিল, স্থানীয় শাসন ও জমির দান-বিক্রয়ের সময়ে প্রথম কায়স্থ ও কুলিকের (শিল্পী) অনুমোদনের প্রয়োজন হতো। নৌশিল্পের উন্নতি হয়েছিল ; হট্টপতি ও শুল্ক অফিসারের উল্লেখ থেকে অনুমান করা যায় অন্তর্বাণিজ্যের অবস্থা ভালো ছিল। পাল ও সেন যুগের অর্থনীতির আলোচনায় একটি প্রধান অসুবিধা হলো একটিও স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া

যায়নি, রৌপ্যমুদ্রারও অবনতি দেখা দিয়েছিল। লেনদেনের জন্য ছিল পুরাণ বা কপর্দক পুরাণ। মিনহাজ বাংলার রৌপ্যমুদ্রা দেখেননি, তিনি কড়ির কথা উল্লেখ করেছেন। অনেকে এজন্য মনে করেন পাল-সেন যুগে বাণিজ্য কমেছিল। অষ্টম শতকের পর তাম্রলিপ্ত বন্দরের কথা আর জানা যায় না। সমাজে বণিক ও মহাজনদের প্রভাব কমেছিল, সমাজ ক্রমশ কৃষি-নির্ভর হতে থাকে।

পাল ও সেন যুগে রাজারা প্রচুর ভূমিদান করেছেন, বহু জমি বিক্রিও করেছেন। তাদের লেখগুলির বেশিরভাগ এই ভূমিদান সংক্রান্ত। পুস্তপাল নামক কর্মচারী জমির সব হিসেবপত্র রাখত। সেন আমলে সম্ভবত জমি জরিপের ব্যবস্থা হয়েছিল। রাজা ও অভিজাতরা দান গ্রহীতাদের জমিতে সব স্বত্ব দান করে দিতেন। ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ মঠ ও মন্দির এধরনের দান পেয়েছিল, রাজার সব অধিকার দান গ্রহীতার হাতে চলে গিয়েছিল। এযুগে রাজারা জমি থেকে ভাগ ভোগ কর ও হিরণ্য আদায় করত। ভাগ ভোগ কর দ্রব্যের মাধ্যমে দেওয়া যেত, হিরণ্য দিতে হতো নগদে। পতিত জমির জন্য কৃষককে কর দিতে হতো না। জমির সঙ্গে দান গ্রহীতা খনি, বন, বৃক্ষ, লবণ ইত্যাদির ওপরও অধিকার লাভ করত। জমি ছিল তিনভাগে বিভক্ত—বাসযোগ্য বাস্তুজমি, কর্ষণযোগ্য জমি ও পতিত জমি, তাছাড়া ছিল গোচারণ ভূমি। গ্রামের সীমান্তে থাকত জঙ্গল জমি যা থেকে গ্রামের মানুষ জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করত। রাজারা ভূমির সীমা নির্দিষ্ট করে তবেই দান করতেন, নল দিয়ে ভূমি মাপা হতো। সম্ভবত এককগুলি হলো কুল্যবাপ, দ্রোণবাপ ও পাটক। সমকালীন উপাদান থেকে জানা যায় যে জমির চাহিদা বেড়েছিল। এযুগে ভাগভোগ ও হিরণ্য ছাড়াও অন্য করের কথা জানা যায়। বাণিজ্য লাভের ওপর রাষ্ট্রকে কর দিতে হত, আপৎকালেও রাষ্ট্র বাড়তি কর দাবি করত। খেয়াঘাট, হাট ও গ্রামের ওপর কর ধার্য করা হত। গ্রামের ওপর স্থাপিত করের নাম ছিল পিণ্ডক, উপরিকর নামে অতিরিক্ত কর ছিল।

পাল ও সেন যুগে জমির মালিকানা ছিল রাষ্ট্রের। ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তি ছিল তবে তা ছিল মধ্যস্বত্বের অধিকার, রাজার ও মধ্যস্বত্বাধিকারীর অধিকারের মধ্যে তারতম্য ছিল। রাজা কোনো জমিকে নিষ্কর ঘোষণা করতে পারতেন, ব্যক্তিগত মালিক তা পারতেন না। অর্থনীতি ছিল গ্রামীণ কৃষি ভিত্তিক, গ্রাম ছিল একক। জনসংখ্যা বেড়েছিল, বাস্তু ও কৃষি জমির পরিমাণও বেড়েছিল। অরণ্য পরিষ্কার করে নতুন নতুন গ্রামের পত্তন করা হয়। গ্রামে চাষবাস প্রধান হলেও শিল্পীরা ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত ছিল। গ্রামে কাঠ, লোহা, বাঁশ দিয়ে পণ্য উৎপাদন করা হতো, কার্পাস দিয়ে বস্ত্র তৈরির ব্যবস্থা ছিল। কাঁসারি, মৃৎশিল্পী ও হাতির দাঁতের শিল্পীরাও গ্রামে উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত ছিল। এযুগে বাংলাদেশে শহরের সংখ্যা কম নয়। উল্লেখযোগ্য শহরগুলি হল পুণ্ড্রবর্ধন, তাম্রলিপ্ত, বাণগড়, রামপাল, রামাবতী, লক্ষ্মণাবতী, সোমপুর,

ত্রিবেণী, বর্ধমান, কর্ণসুবর্ণ ও নবদ্বীপ। তীর্থস্থান, রাজধানী, প্রশাসনিক কেন্দ্র ও বাণিজ্য কেন্দ্রকে ঘিরে শহর গড়ে উঠেছিল। প্রত্যেকটি শহর জল ও স্থলপথের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। সোমপুর ও ত্রিবেণী ছিল ধর্ম ও সংস্কৃতি কেন্দ্র, তাম্রলিপ্ত বাণিজ্য কেন্দ্র, রামপাল, রামাবতী ও লক্ষ্মণাবতী ছিল শাসন কেন্দ্র। শিল্প ও বাণিজ্যের অবনতি হলে শহরের জাঁকজমক কমেছিল, সমাজ হয়ে উঠেছিল ভূমি নির্ভর, সামন্ততান্ত্রিক। এই সমাজের একদিকে ছিল ভূমির মালিক সামন্তরা, অন্যদিকে ভূমিহীন কৃষক, এই দুই বিপরীত মেরুর মধ্যস্থলে ছিল অসংখ্য মধ্যস্বত্বভোগীর দল। শিল্পী, বণিক ও মহাজনরাও ছিলেন, কিন্তু সমাজে তাদের বিশেষ প্রভাব ছিল না। সামন্ত, মহাসামন্ত ও মহামাণ্ডলিকরা প্রাধান্য স্থাপন করেছিল। রাষ্ট্রের বেতনভোগী কর্মচারীরা ছিল একটি স্বতন্ত্র সামাজিক গোষ্ঠী। বুদ্ধিজীবীরাও ছিলেন, এদের মধ্যেও স্তরভেদ ছিল—রাজপুরোহিত থেকে দরিদ্র পুরোহিত। কামার, কুমোর, চর্মকার, তৈলকার প্রভৃতি শ্রেণীর মানুষ শ্রমদানের পরিবর্তে উৎপন্ন ফসলের ভাগ পেত (যজমানি প্রথা)। সকলের নীচে ছিল চণ্ডাল ও অস্পৃশ্যরা, সেন যুগের ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি এদের সমাজের বাইরে নির্বাসন দিয়েছিল।

সংস্কৃতি—ধর্ম, শিল্প, দর্শন ও সাহিত্য

ধর্ম ঃ পাল ও সেন আমলে বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির সহাবস্থান লক্ষ করা যায়। পাল রাজারা সকলে বৌদ্ধ ছিলেন, মহাযান মতবাদের চলন ছিল। পাল রাজাদের আমলে বাংলাদেশে জৈন ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রচলিত ছিল। তবে সেন রাজারা পাল রাজাদের মতো সহনশীল ছিলেন না। তাদের আমলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রাধান্যলাভ করেছিল, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের প্রভাব কমেছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দুটি দিল হলো বৈদিক ও পৌরাণিক। বৈদিক ধর্মের পাশাপাশি পৌরাণিক শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্ত ধর্মের প্রসার ঘটে। বহু দেব-দেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে। পাল রাজারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হলেও বৈদিক ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করতেন। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণরা বাংলাদেশে এসে স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন। সেন আমলে বাংলাদেশে বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান হতো, শাস্ত্র গ্রন্থগুলি এযুগে রচিত হয়। এযুগের শ্রেষ্ঠ স্মৃতিকাররা হলেন ভবদেবভট্ট, জীমূতবাহন ও অনিরুদ্ধ। এযুগে বৈদিক ধর্মের পাশাপাশি পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসার ঘটে ; বিষ্ণু, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা ও লক্ষ্মীর মতো দেবদেবীরা পূজা পেতেন। শিবলিঙ্গের পূজার চলন হয়, পাল রাজারাও শিবমন্দির নির্মাণ করে দেন।

এযুগে বাংলাদেশ শক্তি পূজার প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তান্ত্রিক ধর্ম ও সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছিল বাংলাদেশে, সেন রাজারা শিব ও বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। বাংলাদেশে সূর্য পূজারও চলন ছিল, পাল ও সেন যুগে এই পূজার ব্যাপক চলন হয়েছিল। বাংলাদেশের অনেক জায়গায় অসংখ্য সূর্যমূর্তি পাওয়া গেছে। এযুগে

বাংলাদেশে জৈনধর্মের অবস্থা কেমন ছিল সঠিক জানা যায় না। তবে অনেক জৈনমূর্তি পাওয়া গেছে, তা থেকে অনুমান করা হয় জৈনধর্ম টিকে ছিল। সেন রাজাদের শাসনকালে জৈনদের অস্তিত্ব প্রায় লোপ পেয়েছিল। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ গুহ্য সাধনায় মগ্ন ছিলেন, বৈদিক যাগযজ্ঞ ও পৌরাণিক হিন্দুধর্মের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। হিউয়েন সাঙ্ বাংলাদেশে সত্তরটি বৌদ্ধবিহার ও তিনশো দেবমন্দির দেখেছিলেন। বিক্রমশীলা, নালন্দা, ওদন্তপুরী ও সোমপুর ছিল বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র। সেন যুগে বৌদ্ধধর্ম ও দেব-দেবীর প্রভাব কমেছিল। সেন রাজারা বৌদ্ধদের ওপর উৎপীড়ন করেননি, তবে বৌদ্ধদের সম্পর্কে তাদের অশ্রদ্ধা ছিল। বৌদ্ধদের তারা নাস্তিক বলে গণ্য করতেন। এদেশে মহাযান মতবাদের চলন ছিল, তার মধ্যে বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযানের উদ্ভব হয়। বৌদ্ধধর্মের মধ্যে তন্ত্রের প্রবেশ ঘটেছিল, হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে ব্যবধান কমে এসেছিল। বাংলার সহজিয়া মতবাদ বৌদ্ধ সহজযান থেকে উদ্ভূত বলে অনেকে মনে করেন। বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযানের একমাত্র কাম্য হলো মহাসুখ। এই মহাসুখের জন্য তারা নানা ক্রিয়া-কর্ম, আচার-অনুষ্ঠান ও নরনারীর প্রেমকে প্রাধান্য দিয়েছিল। শাক্ত ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ সহজযানের মিশ্রণের ফলে নতুন শাক্ত ধর্মের উদ্ভব হয়, অনেকগুলি লোকায়ত ধর্মের আবির্ভাব ঘটে। ব্রাহ্মণ্য শাক্তধর্ম অবশ্য বর্ণাশ্রমকে স্বীকার করেছিল। নাথ, সহজিয়া ও বাউল সম্প্রদায়গুলির এযুগে আবির্ভাব ঘটেছিল, এদের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব টিকে ছিল।

শিল্প ঃ পাল ও সেন যুগে বাংলায় শিল্পের উন্নতি হয় ; শিল্পের তিনটি বিভাগ স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছিল। এযুগে অনেক স্তূপ, বিহার, মন্দির ও অট্টালিকা নির্মিত হয়। বাংলায় স্তূপের সঙ্গে তোরণ, বেষ্টনী ও অলঙ্করণ যুক্ত হয়। রাজশাহীর পাহাড়পুরে ও চট্টগ্রামের কেওয়ারি গ্রামে এধরনের স্তূপ পাওয়া গেছে। বিহার হলো বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বাসস্থান, পরে সেগুলি জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়। পাহাড়পুরে পাওয়া গেছে সোমপুর মহাবিহার, পাল আমলে এটি নির্মিত হয়। কুমিল্লার কাছে ময়নামতীতে অনুরূপ বিহারের সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলি ছিল বিশাল আয়তনের, সোমপুর বিহারে একশো আশিটির বেশি কক্ষ ছিল। প্রাচীন বাংলায় অনেক মন্দির ছিল, রামচরিতে রামাবতীকে দেবতাদের নগর বলা হয়েছে। সোমপুর বিহারের মধ্যস্থলে একটি বড় মন্দির ছিল। পাহাড়পুরের স্থাপত্য রীতি অসাধারণ ও অনন্য বললে অত্যুক্তি হয় না। দ্বাদশ শতকের যেসব মন্দির পাওয়া গেছে তাদের স্থাপত্য রীতিকে শিখর দেউল বলা হয়। উত্তর ভারতীয় ও ওড়িশার রীতির সঙ্গে এর মিল আছে। বাংলার বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও বর্ধমান জেলায় এযুগে অনেক মন্দির নির্মিত হয়। বাংলার মন্দিরগুলি ছিল আয়তনে ছোট, কিন্তু এর স্থাপত্য পরিশীলিত ও সংযত রুচির পরিচায়ক।

পাল ও সেন যুগে বাংলার নিজস্ব শিল্পরীতি গড়ে উঠতে থাকে, বাংলার স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ ঘটে। পাহাড়পুরের ভাস্কর্যে বাঙালির ভাস্কর্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, এর মধ্যে মৌলিকতার স্বাক্ষর রয়েছে। এই মূর্তিগুলিতে দেবদেবী ও সাধারণ নরনারীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ময়নামতীর ভাস্কর্যেও একই ধারা লক্ষ করা যায়। অনেকে মনে করেন পাল আমলের ভাস্কর্য ছিল উচ্চকোটির মানুষের, সাধারণ মানুষের জীবনের প্রতিফলন এতে তেমন নেই। শিল্প ছিল অনেকখানি ধর্ম-নির্ভর, লোকায়ত জীবনের কথা এতে স্থান পায়নি। এযুগের অনেকমূর্তি কষ্টিপাথরে তৈরি, পিতল ও অষ্টধাতুর মূর্তি তৈরি হয়েছিল, দু-একটি সোনা-রুপোর মূর্তিও পাওয়া গেছে। পণ্ডিতদের অনুমান এযুগের ভাস্কর্যে দেবদেবীর মানবিক রূপের প্রকাশ ঘটেছে, পার্থিব ও দৈবী ভাবের সমন্বিত রূপ হলো এযুগের ভাস্কর্যগুলি। এগুলির মুখশ্রী স্নিগ্ধ, দেহ নমনীয়, অলংকরণ বর্জিত। সেন যুগে অবশ্য অলংকরণের আতিশয্য লক্ষ করা যায়। ভাস্কর্যের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ হলো পোড়ামাটির নানা ফলক। এই অঙ্গটি হলো বাঙালির একেবারে নিজস্ব, স্থানীয় রীতি-অনুসারী। বাংলার সমাজ ও ধর্মীয় জীবনের অনেক তথ্য এই পোড়ামাটির মূর্তি থেকে পাওয়া যায়। দৈনন্দিন জীবন, সাজপোশাক, সুখ-দুঃখপূর্ণ জীবন, ধর্ম বিশ্বাস ইত্যাদিব বিশ্বস্ত প্রতিফলন ঘটেছে এসব উপাদানে।

পাল ও সেন যুগের চিত্রকলা প্রধানত বৌদ্ধ পাণ্ডুলিপি অলংকরণের জন্য রচিত হয়। এই চিত্রগুলি আয়তনে ক্ষুদ্র, কিন্তু এতে আছে গভীর ভাব-কল্পনা, রেখার টান, রঙের বিন্যাস ও সুষমায় এগুলি অবশ্যই মনোগ্রাহী। সমকালীন ভাস্কর্য রীতির সঙ্গে চিত্রকলা যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ। পাখি, লতা, পাতা, ফুল দিয়ে মূল চিত্রকে শোভিত করা হয়েছে। মূল প্রতিমা অবশ্য সমৃদ্ধতর, পণ্ডিতদের অনুমান যে রীতিতে বাগ-অজন্তা-ইলোরা চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এখানেও তার নিদর্শন মেলে। তবে স্বীকার করতে হয় এই চিত্রগুলিতে অজন্তা-ইলোরার সূক্ষ্মতার অভাব ঘটেছে, দাগ মোটা টানের। এই চিত্রগুলি পুরনো ঐতিহ্য বহন করেছিল, নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে পারেনি। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের তাম্রপটে ক্ল্যাসিকাল ও স্থানীয় মধ্যযুগীয় রীতির মিশ্রণ ঘটেছে।

দর্শন, ভাষা ও সাহিত্য ঃ পাল যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, ধর্ম ও দর্শনের চর্চা হতো সংস্কৃত ভাষায়। এই ভাষায় ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সাহিত্য রচিত হয়েছিল। বাংলায় প্রাকৃত ভাষার চলন ছিল না, শৌরসেনী ও মাগধী অপভ্রংশের চলন ছিল। এই মাগধী অপভ্রংশ থেকে গৌড়ীয় প্রাকৃত রূপটি গড়ে ওঠে, যার পরিণতি হলো বাংলা ভাষা। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ এই ভাষায় চর্যাপদ লিখে বাংলা ভাষার সূচনা করেন। বাংলাদেশে বৈদিক কর্মকাণ্ডের চলন ছিল, এবিষয়ে নারায়ণ কেশব মিশ্রের ছান্দোগ্য-পরিশিষ্টের টীকার কথা জানা যায়। দর্শন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হলো গৌড়পাদের *গৌড়পাদকারিকা*। এই গ্রন্থে লেখক মাধ্যমিক দর্শনের নেতিবাচক ন্যায়ের সঙ্গে উপনিষদের ইতিবাচক

আদর্শের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। আধ্যাত্মিকতা ও দর্শন বিষয়ে পাল যুগে লেখা হয় শ্রীধর ভট্টের *ন্যায়কন্দলী*। চিকিৎসাশাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ লেখক হলেন চক্রপাণি দত্ত। তিনি চরক ও সুশ্রুতের গ্রন্থের ওপর টীকা লেখেন, *চিকিৎসাসংগ্রহ, শব্দচন্দ্রিকা* এবং *দ্রব্যগুণ সংগ্রহ* হলো তাঁর রচনা। সুরেশ্বর ও বঙ্গসেন এযুগে চিকিৎসাশাস্ত্র সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেন। সুরেশ্বর লেখেন *শব্দপ্রদীপ, বৃক্ষায়ুর্বেদ* ও *লৌহপদ্ধতি*, বঙ্গসেনের গ্রন্থের নাম হল *চিকিৎসাসারসংগ্রহ*। এযুগের একমাত্র জ্যোতিষ গ্রন্থ *সারাবলী* রচনা করেন কল্যাণবর্মা, আলবেরুনি এই গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন।

এযুগে অনেকে কাব্য রচনা করেছেন, গৌড় অভিনন্দ লিখেছেন *কাদম্বরী কথাসার*। পাল আমলের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন সন্ধ্যাকর নন্দী। তাঁর রচিত *রামচরিত* হলো দ্ব্যর্থবোধক কাব্য, এতে রামচন্দ্রের জীবন এবং পাল রাজা রামপালের জীবন কাহিনী দুই-ই পাওয়া যায়। এই কাব্যের ঐতিহাসিক মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না, এতে বাংলার চোদ্দজন সামন্তের কথা আছে, কৈবর্ত বিদ্রোহের উল্লেখ আছে। এযুগে রচিত আরও তিনখানি কাব্য-সাহিত্যের কথা জানা যায়। এই তিনখানি রচনা হল ক্ষেমীশ্বরের *চণ্ডকৌশিক* নাটক, নীতিবর্মার অলঙ্কারবহুল কাব্য *কীচকবধ* এবং *কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়* নামক একখানি কবিতা সংকলন। বৌদ্ধরা এযুগে তাদের মহাযান ধর্মের বিভিন্ন শাখা বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযান নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। সংস্কৃত ভাষায় লেখা হলেও এদের ভাষা ও ভাব দুর্বোধ্য, রহস্যময় সাধন-ভজনের কথা এতে বলা হয়েছে। বৌদ্ধ তান্ত্রিক লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নামগুলি হল শীলভদ্র, শান্তিদেব, শান্তরক্ষিত, জেতারি ও মহাজেতারি। বিক্রমশীলা বিহারের পণ্ডিত জ্ঞানশ্রীমিত্র বৌদ্ধ ন্যায়গ্রন্থ *কার্য-কারণ-ভবসিদ্ধি* রচনা করেন।

পালযুগে বাংলা ভাষা সৃষ্টি হয়েছিল, প্রাকৃত গৌড়ীয় রূপের সঙ্গে অপভ্রংশের মিশ্রণে এর সৃষ্টি হয়। ভাষার উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হয়, তার স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত হয়ে যায়। সহজযানী বৌদ্ধরা এই ভাষাতে তাদের পদগুলি রচনা করেছিল। এই পদগুলি শাক্ত, বৈষ্ণব কবি ও বাউল গায়কদের অনুপ্রাণিত করেছিল। সেন আমলে সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতি হয় কারণ সেন রাজারা বৈদিক ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই সাহিত্য ছিল ধর্মনির্ভর, চিন্তা-মনন, দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এর অবদান হলো সীমিত। কিছু কাব্য রচিত হয় কিন্তু তার গভীরতা ও ব্যাপ্তি ছিল সীমিত। জয়দেবের *গীতগোবিন্দ* হলো এযুগের শ্রেষ্ঠ কাব্য। মীমাংসা শাস্ত্রের ওপর লেখা হয় *তৌতাতিতমতিলক*, গ্রন্থকার হলেন ভবদেব ভট্ট। এযুগে স্মৃতিকাররা অনেকগুলি স্মৃতিগ্রন্থ লিখেছেন, স্মৃতিশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ লেখক ছিলেন ভবদেব ভট্ট, তিনি বহুবিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। গ্রহ-নক্ষত্র বিজ্ঞানে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য তাকে 'দ্বিতীয় বরাহ' বলা হয়। তিনি লিখেছেন *দশকর্মদীপিকা* ও

প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ নামক গ্রন্থ। জীমূতবাহন রচনা করেন বিখ্যাত হিন্দু আইনের আকর *দায়ভাগ* নামক গ্রন্থ। ব্যবহার শাস্ত্রের ওপর তিনি লেখেন *ব্যবহার মাতৃকা* এবং কালনির্ণয় বিষয়ক গ্রন্থ *কালবিবেক*। অনিরুদ্ধ ও তাঁর শিষ্য বল্লাল সেন অনেকগুলি স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেন, বল্লাল সেনের *দানসাগর* ও *অদ্ভুতসাগর* গ্রন্থ দুখানি খুবই বিখ্যাত।

সেন যুগের একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হলেন হলায়ুধ। রাজপণ্ডিত হলায়ুধ ছান্দ্যোগ্যমন্ত্র ভাষ্য রচনা করেন, এটি হলো বৈদিক মন্ত্রের ওপর টীকা। তাছাড়া তিনি লেখেন *ব্রাহ্মণ সর্বস্ব, বৈষ্ণব সর্বস্ব, শৈব সর্বস্ব* ও *মীমাংসা সর্বস্ব* নামক চারখানি গ্রন্থ। এযুগের বিখ্যাত অভিধান প্রণেতা হলেন সর্বানন্দ, তিনি অমরকোষের টীকা লেখেন। শ্রীনিবাস রচনা করেন বিজ্ঞান বিষয়ক শুদ্ধি দীপিকা ও গণিত চূড়ামণি। গোবর্ধন, শরণ, জয়দেব ও উমাপতি ধরের মতো কবি-সাহিত্যিকরা লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় ছিলেন। রাজকবিদের লেখায় সহজ সৌন্দর্য আছে, প্রাণের স্পন্দন বা ভাবের গভীরতা নেই। জয়দেবের গীতগোবিন্দ এযুগে খুব জনপ্রিয় ছিল, রাধাকৃষ্ণের বিরহ-মিলন কাহিনী নিয়ে এই কাব্যটি লেখা হয়েছে। জয়দেব সংস্কৃত সাহিত্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেন, লোকায়ত জীবনের নানাদিক এতে প্রতিফলিত হয়েছে। নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, 'গীত গোবিন্দে মাধুর্য আছে, শক্তি নেই, সুর আছে, তেজ নেই, দাহ আছে, দীপ্তি নেই।' কালিদাসের মেঘদূতের অনুকরণে ধোয়ী লেখেন *পবনদূত* কাব্য। শ্রীধর দাস *সদুক্তিকর্ণামৃতে* ৪৮৫ জন লেখকের প্রায় আড়াই হাজার রচনার সংকলন করেছেন। শ্রীধর দাসের আগে বিদ্যাকর *সুভাষিতরত্নকোষে* এই ধরনের সংকলন প্রকাশ করেছিলেন।

দক্ষিণের পল্লব রাজাদের সাংস্কৃতিক অবদান

দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে পল্লব রাজাদের শাসনকাল (৩০০-৯০০ খ্রিস্টাব্দ) নানাদিক দিয়ে স্মরণীয় হয়ে আছে। গুপ্তরাজাদের সমসাময়িক পল্লব রাজারা অনেককাল ধরে শাসন ক্ষমতায় টিকে ছিলেন। চালুক্য, চোল, পাণ্ড্য ও কলভ্রদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাঁরা গৌরবের সঙ্গে দীর্ঘকাল শাসন করেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে তাঁরা বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বজায় রেখেছিলেন, চোল রাজাদের নৌসাম্রাজ্যের সূচনা তাঁরাই করে যান। দক্ষিণ ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তাঁরা নবযুগের সূচনা করেছিলেন। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্রে তাঁরা এক ধরনের নবজাগরণ ঘটিয়েছিলেন। দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে তাঁরা সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির পরিবেশ রচনা করেন। তাঁদের রাজধানী কাঞ্চী দক্ষিণ ভারতে সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। এক অতামিল সংস্কৃতির উত্তরাধিকার থাকা সত্ত্বেও

তাঁরা অল্পকালের মধ্যে তামিল সংস্কৃতিকে আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। ষষ্ঠ শতকের শেষদিক থেকে তাঁরা সরকারি কাজে তামিল ভাষা ব্যবহার করতে থাকেন, একটি স্বতন্ত্র তামিল সত্তার বিকাশ ঘটতে থাকে। আর্য ও দ্রাবিড় সংস্কৃতির মিশ্রণে এই তামিল সত্তা তৈরি হয়েছিল।

ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে অসাধারণ উন্নতির যুগ হলো পল্লব রাজাদের শাসনকাল। এই সময়কালে উত্তর ভারত থেকে বৈদিক আচার-আচরণ, যাগযজ্ঞ দক্ষিণ ভারতে প্রবেশ করেছিল। বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পল্লবদের লেখতে অশ্বমেধ যজ্ঞের উল্লেখ দেখা যায়। সমাজে যে ব্রাহ্মণদের প্রতিষ্ঠা ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই কারণ ব্রাহ্মণদের ব্যাপকভাবে ভূমিদান করা হয়। রাজারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন, তবে বৈদিক ধর্ম বিনা প্রতিবাদে দক্ষিণ ভারতে গৃহীত হয়নি। বৈদিক আচার-আচরণের মধ্যে যে অসঙ্গতি ছিল তা দেখিয়ে দেন অদ্বৈত দর্শনের প্রবক্তা শংকরাচার্য। তিনি আড়ম্বরপূর্ণ বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে, একমাত্র ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মায়াময়। ব্রহ্মকে লাভ করতে হলে উপাসনার প্রয়োজন, যাগযজ্ঞের প্রয়োজন নেই। তিনি উপনিষদের ওপর ভিত্তি করে তাঁর অদ্বৈত দর্শন গড়ে তোলেন। তিনি বৌদ্ধ সংঘের আদর্শে হিন্দু সন্ন্যাসীদের পুনর্গঠিত করেন। ভারতের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে তিনি চারটি মঠ (বদ্রীনাথ, পুরী, কাঞ্চী ও দ্বারকা) স্থাপন করেন।

পল্লবরাজা প্রথম নরসিংহবর্মনের শাসনকালে চিনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ (৬৪০ খ্রিস্টাব্দ) কাঞ্চীতে আসেন। তিনি তোণ্ডমণ্ডলম বলে এই রাজ্যের উল্লেখ করে মূল্যবান আকর রেখে গেছেন। তিনি লিখেছেন যে কাঞ্চী শহরটির পরিধি ছিল প্রায় ছয় মাইল, তিনি এখানে একশোর বেশি বৌদ্ধবিহার দেখেছিলেন। এগুলিতে বসবাস করত প্রায় দশহাজার থেরাবদি বৌদ্ধ ভিক্ষু ; দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের প্রায় আশিটি মন্দির ছিল। পল্লব রাজা মহেন্দ্রবর্মন জৈন ছিলেন, পরে অপ্পরের প্রভাবে তিনি শৈব ধর্ম গ্রহণ করেন এবং পল্লব রাজ্যে শৈব ধর্ম জনপ্রিয়তা অর্জন করে। পল্লব রাজারা অনেকগুলি শৈব মন্দির নির্মাণ করে দেন। এই সময়কালে পল্লব রাজ্যে ভক্তি ধর্ম প্রসার লাভ করে। ভক্তি ধর্মের মূল কথা হলো ঈশ্বর ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে শুধু ভক্তির ভিত্তিতে সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। ভক্তিধর্মের প্রচারকরা দুটি বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছিলেন—সব জাতি ও বর্ণের মানুষ শুধু ভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরের করুণালাভ করতে পারে। ঈশ্বর সাধনার জন্য কোনো আচার-অনুষ্ঠান বা পুরোহিতের প্রয়োজন নেই। স্থানীয় তামিল ভাষায় শৈব নয়নার ও বৈষ্ণব আলবার সন্তরা সাধারণ মানুষের কাছে তাদের ভক্তিধর্ম প্রচার করেন। সম্ভবত উত্তর ভারত থেকে এই অবৈদিক, একান্তভাবে ভক্তি-নির্ভর ভক্তিধর্ম দক্ষিণ ভারতে প্রবেশ করেছিল।

অস্বীকার করা যায় না পল্লব রাজ্যে ধর্মীয় বৈচিত্র্য ছিল, রাজারা সহনশীল ছিলেন। তবে সমকালীন লেখ ও সাহিত্য থেকে অনুমান করা যায় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম জনপ্রিয়তা হারিয়েছিল।

শিক্ষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে পল্লব যুগে একধরনের নবজাগরণ ঘটে যায়। পল্লবদের রাজধানী কাঞ্চীপুরম ছিল সে যুগে দক্ষিণ ভারতের সবচেয়ে বড় শিক্ষাকেন্দ্র। বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত ধর্মপাল কাঞ্চীতে ছিলেন। কাঞ্চীতে একটি বড় শিক্ষায়তন ছিল যার সঙ্গে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনা করা হয়েছে। দূর-দূরান্ত থেকে ছাত্ররা এখানে শিক্ষালাভের জন্য আসত। সংস্কৃত ও তামিল ছিল সাহিত্যের ভাষা। সংস্কৃতের বিখ্যাত লেখক দণ্ডিন পল্লব রাজসভায় কিছুকাল কাটিয়েছিলেন, তিনি হলেন কাব্যাদর্শ ও দশকুমার চরিতের লেখক। কালিদাস, বরাহমিহির ও ভারবি এযুগে খুব জনপ্রিয় ছিলেন। পল্লবরাজা প্রথম মহেন্দ্রবর্মন *মত্তবিলাস প্রহসন* নামে একখানি প্রহসন লিখে কাপালিক, বৌদ্ধ ও শৈবদের ব্যঙ্গ করেছিলেন। বলা হয়েছে যে এই মহেন্দ্রবর্মন নৃত্য ও সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। কাঞ্চীতে সেযুগের বহু বিখ্যাত ব্যক্তি, কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক ও মনীষীদের সমাবেশ ঘটেছিল। বৌদ্ধ তর্কশাস্ত্রবিদ্ দিঙ্নাগ কাঞ্চীতে দীর্ঘকাল অবস্থান করে শাস্ত্রচর্চা করেন। কদম্ব বংশের প্রতিষ্ঠাতা ব্রাহ্মণ ময়ূর শর্মণ কাঞ্চীতে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। রাজা, ধনী ব্যক্তি ও বণিকদের দানে কাঞ্চীতে বহু মন্দির স্থাপিত হয়, এগুলি ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র। বৌদ্ধবিহার ও জৈনদের মন্দিরেও শাস্ত্রচর্চা হতো। বিখ্যাত সংস্কৃত সাহিত্যিক ভারবি তাঁর *কীরতার্জুনীয়ম* নাটক লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি পল্লব রাজা সিংহবিষ্ণুর রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন। দণ্ডিন তাঁর কাব্যাদর্শে যে রচনাশৈলী ও রসবিচারের কথা বলেন তাকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ ভারতে সমালোচনা সাহিত্য গড়ে ওঠে।

তামিল ভাষার আনুকূল্য করে পল্লব রাজারা এর উন্নতি ঘটিয়েছিলেন। তামিল ভাষায় অনেক লেখ পাওয়া গেছে, এদের মধ্যে অনেকগুলি পল্লব রাজাদের। এগুলি ভূমিদান সংক্রান্ত ও প্রশস্তিমূলক। তামিল ভাষায় রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ হয়। পল্লব যুগে শৈব নয়নার ও বৈষ্ণব আলবার সন্তরা অসংখ্য স্তোত্র ও ভক্তিগীতি রচনা করেছেন, এগুলি সব তামিল ভাষায় লেখা। বিখ্যাত শৈব সন্ত অপ্পর, সম্বন্দর ও সুন্দরর অপূর্ব কাব্যময়ী ভাষায় তাদের গানগুলি লিখেছেন। বৈষ্ণব সন্তদের মধ্যে চারটি নাম খুবই উল্লেখযোগ্য, এরা হলেন পয়কাই, পেয়ালভর, তিরুমালিসাই ও ভুতত্তর। এদের কাব্যের অনুভূতি, আবেগ ও ব্যাকুলতা জনসাধারণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। এই তামিল সন্তরা তাদের স্তোত্রের সঙ্গে সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠানকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। অনেকে মনে করেন মন্দির কেন্দ্রিক এই নৃত্য ও সঙ্গীত পরবর্তীকালে ভরত নাট্যমের সূচনা করেছিল।

পল্লব রাজারা হলেন শ্রেষ্ঠ নির্মাতা। বিখ্যাত শিল্প সমালোচক পার্সি ব্রাউনের মতে, পল্লব রাজারা হলেন দক্ষিণের দ্রাবিড় শৈলীর প্রতিষ্ঠাতা (of all the great powers that together made the history of Southern India none had more marked effect on the architecture of this region than the earliest of all, that of the Pallavas, whose productions provided the foundations of the Dravidian style.)। পল্লব শাসনকালে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় অসাধারণ উন্নতি ঘটেছিল। প্রথম পর্বে পল্লব স্থাপত্য গড়ে উঠেছিল পাথর কেটে, দ্বিতীয় পর্বে ইট, পাথর দিয়ে নতুন ধরনের স্থাপত্য তৈরি করা হয়। পল্লব স্থাপত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো মন্দিরগুলির উচ্চতা, শীর্ষদেশে গম্বুজ, বিশাল আয়তন, তোরণ (গোপুরম) ও মণ্ডপ। মন্দিরগুলিতে বহু স্তম্ভ নির্মাণ করে মজবুত করা হয়। আর্কট, তিরুচিরাপল্লী, মহাবলীপুরম (মামল্লপুরম) ও রাজধানী কাঞ্চীতে এসব মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে। গ্রসেট লিখেছেন যে গোড়া থেকে পল্লব শিল্পীরা একটি স্বতন্ত্র ধারা গড়ে তুলেছিল যা পরবর্তীকালে অন্যরা অনুসরণ করেছিল। এমনকি এই শিল্পরীতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল।

শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা দেন প্রথম মহেন্দ্রবর্মন, প্রথম নরসিংহবর্মন, পরমেশ্বরবর্মন এবং দ্বিতীয় নরসিংহবর্মন রাজসিংহ। মহবলীপুরমে অনেকগুলি রথাকৃতি মন্দির নির্মিত হয়। এগুলি আয়তনে ছোট কিন্তু এখানে তীর মন্দিরটি বেশ বড় এবং শৈলীও নতুন ধরনের (From an early date they created an architecture of their own which was to be the basis of all the styles of the South and at the time of Yuan Chwang's visit their metropolis, Mahavalipuram, began to be filled with admirable works of art that have made it one of the chief centres of Indian art.)। পণ্ডিতদের অনুমান পল্লবরাজা প্রথম নরসিংহবর্মন মহাবলীপুরমের সাতটি রথ মন্দিরের নির্মাতা। মহাবলীপুরমের তীর মন্দিরের মতো কাঞ্চীর কৈলাসনাথ এবং বৈকুণ্ঠ পেরুমল মন্দির পল্লব স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। পাহাড় কেটে মন্দির বানানোর রীতির মধ্যে পাওয়া যায় মণ্ডপ রীতির মন্দির, পাহাড়ের গুহার মধ্যে এই ধরনের মণ্ডপ মন্দির বানানো হয়।

পল্লব শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান হলো ভাস্কর্য ও চিত্রকলা। পাহাড়ের গায়ে পুরাণ ও মহাকাব্যের কাহিনী নিয়ে বিচিত্র ভাস্কর্য তৈরি হয়েছে। মহাবলীপুরমে মন্দির গাত্রে *কীরাতার্জুনীয়ম* নাটকের কাহিনী নিয়ে অপূর্ব ভাস্কর্য তৈরি হয়েছে। এধরনের ভাস্কর্য আছে কৃষ্ণ মণ্ডপে ও মহিষমর্দিনী প্যানেলে। নর, দেবতা, পশু-পাখি সকলকে নিয়ে সমগ্র জীবনকে তুলে ধরা হয়েছে। বেঙ্গির ভাস্কর্যের তুলনায় এগুলি অনেক বেশি সংযত। পল্লবদের মন্দির গাত্রে, বৌদ্ধ বিহারে এবং জৈনদের মন্দিরে দেওয়াল

চিত্র অঙ্কনের রীতি ছিল। কাঞ্চী ও পানমালার মন্দির গাত্রে অসংখ্য চিত্র পাওয়া যায়। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের পাশাপাশি পল্লব শিল্পীরা চিত্রকলায় পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। পল্লবদের মন্দিরগুলিতে শুধু দেব-দেবীর মূর্তি নয়, রাজাদের মূর্তি ও ছবিও পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক পরিবেশকে শিল্পের পটভূমি হিসেবে শিল্পীরা ব্যবহার করেছেন, প্রেক্ষিতের ধারণা একেবারে অজানা ছিল না। প্রকৃতি, প্রাণীজগৎ ও মানুষজনকে নিয়ে সামগ্রিক জীবনের পরিচয় তুলে ধরেছেন পল্লব শিল্পীরা। পানমালায় মন্দির গাত্রে শিব ও পার্বতীর চিত্রটি নয়ন মনোরম, অবশ্যই শিল্প-সুষমামণ্ডিত।

ধর্ম, দর্শন, শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্রে পল্লব রাজারা স্থায়ী অবদান রেখে গেছেন। তাঁরাই স্বতন্ত্র দ্রাবিড় রীতির সূত্রপাত করেছেন, দক্ষিণের অন্যান্য রাজবংশ তাদের অনুসরণ করেছেন। তাঁদের শাসনকালে সংস্কৃত সাহিত্যের যেমন উন্নতি হয় তেমনি তামিল সাহিত্যও উন্নতি করেছিল। ধর্মীয় জীবনে প্রায় বিপ্লব ঘটে যায়, ভক্তিধর্ম জনজীবনের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। সাধারণ মানুষ এই ধর্মের মধ্যে মানসিক আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিল। অদ্বৈতবাদের প্রবক্তা শংকরাচার্য বৈদিক যাগ-যজ্ঞ নির্ভর ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরোধিতা করে উপনিষদ নির্ভর মঠকেন্দ্রিক ধর্মীয় জীবন ধারার সূত্রপাত করেন। গড়ে উঠেছিল অদ্বৈতবাদী দর্শন। শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রসারে পল্লব রাজারা নেতৃত্ব দেন, মঠ ও মন্দিরকে কেন্দ্র করে শিক্ষার বিস্তার ঘটে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো তামিল সাহিত্যের উন্নতি, শৈব ও বৈষ্ণব সন্তদের অবদান এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় পল্লব যুগ হলো দক্ষিণ ভারতের সুবর্ণযুগ। তারা যে শৈলী ও আঙ্গিকের প্রবর্তন করেন তা দ্রাবিড় রীতি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। দক্ষিণ ভারতের সাংস্কৃতিক উন্নতি হলো পল্লব রাজাদের শ্রেষ্ঠ স্থায়ী অবদান।

রাষ্ট্রকূট

উত্তর ভারতে যখন পাল ও প্রতিহাররা রাজত্ব করছিল ঠিক সেই সময়ে দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূটরা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। রাষ্ট্রকূটরা দুশো বছরের অধিককাল (৭৫৩-৯৭৫) দাক্ষিণাত্য শাসন করেছিল। মারাঠাদের উত্থানের আগে দাক্ষিণাত্যে আর কোনো রাজশক্তি এত দীর্ঘকাল শাসন ক্ষমতা ভোগ করেনি। এই রাজবংশের তিনজন শাসক (ধ্রুব, তৃতীয় গোবিন্দ ও তৃতীয় ইন্দ্র) উত্তর ভারতে অভিযান চালিয়ে সেযুগে ক্ষমতার কেন্দ্র কনৌজ অধিকার করেন, প্রতিহার ও পাল রাজাদের তাঁরা পরাস্ত করেন। দক্ষিণে তাঁদের সাফল্য কম চমকপ্রদ ছিল না। দক্ষিণে চালুক্য, গঙ্গা ও চোল শাসকদের তাঁরা পরাস্ত করেন। তৃতীয় কৃষ্ণ দক্ষিণে রামেশ্বরম পর্যন্ত পৌঁছে বিজয় স্তম্ভ ও মন্দির নির্মাণ করেন। এই রাজবংশে শুধু যোগ্য সেনানায়ক নন, বেশ

কয়েকজন দক্ষ শাসকও ছিলেন। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন দন্তিদুর্গ। ৭৫৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ চালুক্যদের এই প্রাক্তন প্রাদেশিক শাসক রাষ্ট্রকূট রাজবংশ স্থাপন করেন। এই রাজবংশের রাজধানী ছিল মান্যক্ষেত (মালখেদ, মহারাষ্ট্রের শোলাপুরের কাছে)। দন্তিদুর্গের উত্তরাধিকারী প্রথম কৃষ্ণ বেঙ্গির পূর্ব চালুক্য এবং মহীশূরের গঙ্গারাজাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালিয়ে তাঁর সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটান। এই বংশের পরবর্তী শাসক দ্বিতীয় গোবিন্দ যোগ্য ছিলেন না। তাঁর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাঁর ভ্রাতা ধ্রুব নিরূপম ক্ষমতা দখল করেন (৭৮০ খ্রিস্টাব্দ)। ধ্রুব ক্ষমতা গ্রহণ করে গঙ্গাদের রাজ্য অধিকার করে তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেন। তিনি পল্লব রাজা দন্তিবর্মন এবং বেঙ্গির চালুক্য শাসক বিষ্ণুবর্ধনকে পরাস্ত করেন। ধ্রুব দাক্ষিণাত্যের ওপর আধিপত্য স্থাপন করে উত্তর ভারতের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করেন। উত্তর ভারতে সাম্রাজ্যের প্রতীক ছিল কনৌজ, কনৌজ নিয়ে প্রতিহাররাজ বৎসরাজ ও পাল রাজা ধর্মপালের মধ্যে বিরোধ চলেছিল। ধ্রুব উভয়কে পরাস্ত করেন। কিন্তু এই যুদ্ধজয়ের পর তিনি দাক্ষিণাত্যে ফিরে আসেন। তাঁর রাজত্বকালে রাষ্ট্রকূট শক্তি ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছেছিল (The Rashtrakuta power had reached its zenith.)। গঙ্গা ও পল্লব রাজাদের তিনি পরাস্ত করেন, উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ শক্তি পাল ও প্রতিহাররা তাঁর কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল।

ধ্রুব নিরূপমের উত্তরাধিকারী হলেন তৃতীয় গোবিন্দ (৭৯৩-৮১৪)। তিনি হলেন এই রাজবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা, বীরত্বে, সৈন্য পরিচালনায় এবং রাজনৈতিক বুদ্ধিতে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। তাঁর অজেয় সৈন্যবাহিনী কনৌজ থেকে কন্যাকুমারিকা এবং কাশী থেকে ব্রোচ সব অঞ্চল জয় করেছিল। দক্ষিণের দ্রাবিড় রাজ্যগুলি তাঁর আধিপত্য মানতে বাধ্য হয়েছিল, এমনকি সিংহলের রাজাও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। সিংহাসন লাভের দুবছরের মধ্যে তিনি গঙ্গা ও বেঙ্গির পূর্ব চালুক্যদের ওপর আধিপত্য স্থাপন করতে সক্ষম হন। পল্লব রাজা দন্তিগ তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন, তিনি হন দাক্ষিণাত্যের প্রতিদ্বন্দ্বীহীন শাসক। দক্ষিণে আধিপত্য স্থাপন করে তিনি প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট্টের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। নাগভট্টকে পরাস্ত করে তিনি কনৌজ অধিকার করেন, কনৌজের শাসক তাঁর আধিপত্য মেনে নেন। পালরাজা ধর্মপাল তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নেন। তাঁর পুত্র অমোঘবর্ষের 'সনজান' লেখতে (Sanjan) তাঁর সামরিক অভিযানের বর্ণনা পাওয়া যায়। সম্ভবত তিনি মালব, কোশল, কলিঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতি দেশের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। গোবিন্দর দাক্ষিণাত্যে অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে দক্ষিণের পল্লব, পাণ্ড্য, কেরল ও গঙ্গা রাজারা তাঁর বিরুদ্ধে জোট বেঁধেছিলেন। গোবিন্দ বিদ্যুৎ গতিতে তাঁদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে

পল্লবদের রাজধানী কাঞ্চী অধিকার করে নেন, অন্য শাসকেরা ভয় পেয়ে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

রাষ্ট্রকূট রাজবংশের আরও দুজন উল্লেখযোগ্য রাজা হলেন তৃতীয় ইন্দ্র (৯১৫-২৭) এবং তৃতীয় কৃষ্ণ (৯৩৯-৬৫)। তৃতীয় ইন্দ্র তৃতীয় গোবিন্দের মতো দুঃসাহসী সেনাপতি ছিলেন। ক্ষমতালাভের পর তিনি প্রতিহাররাজ মহীপালের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। তিনি নর্মদা অতিক্রম করে কনৌজ অধিকার করেন। কনৌজ দখল করে তিনি রাষ্ট্রকূট সামরিক শক্তির গৌরব বৃদ্ধি করেন। তিনি বেঙ্গির চালুক্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান তবে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছিলেন বলে জানা যায় না। তৃতীয় কৃষ্ণ হলেন এই রাজবংশের শেষপর্বের শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি চোলদের গুরুত্বপূর্ণ শহর কাঞ্চী ও তাঞ্জোর অধিকার করেন। ৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে তাক্কোলামের যুদ্ধে চোল রাজপুত্র রাজাদিত্য নিহত হন, তিনি এই জয়ের পরে দক্ষিণে রামেশ্বরম পর্যন্ত অগ্রসর হন। চোল রাজ্যের একাংশ তিনি তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেন। তিনি দ্বিতীয়বার উত্তর ভারতে অভিযান পরিচালনা করেন, এই অভিযানে তাঁর উদ্দেশ্য সঠিক জানা যায় না। তিনি মালবের পরমারদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে উজ্জয়িনী অধিকার করেন। আর কোনো রাষ্ট্রকূট রাজা তাঁর মতো সুদূর দক্ষিণে আধিপত্য স্থাপন করতে পারেননি। ধ্রুব, তৃতীয় গোবিন্দ ও তৃতীয় ইন্দ্রের মতো তিনি উত্তরে ততটা সাফল্য পাননি, কিন্তু দক্ষিণে তাঁর সাফল্য ছিল সন্দেহাতীত। সর্বার্থে তিনি ছিলেন 'সকলোদক্ষিণদিক অধিপতি'। সম্ভবত তৃতীয় কৃষ্ণ খুব দূরদর্শী রাষ্ট্রনেতা ছিলেন না, অবিরাম যুদ্ধ করে তিনি দক্ষিণের সব রাজশক্তিকে শত্রুতে পরিণত করেন। তৃতীয় কৃষ্ণের মৃত্যুর পর রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে উঠেছিল, উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব ছিল। পরমার শাসকেরা রাষ্ট্রকূটদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে তাদের রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন। পরমার শাসক সিয়ক (Siyak) রাষ্ট্রকূটদের রাজধানী মালখেদ অধিকার করে লুঠপাট চালিয়েছিলেন। রাষ্ট্রকূটদের কেন্দ্রীয় শক্তির পতন হলে সামন্ত শাসকেরা বিদ্রোহ করে স্বাধীন হয়ে যায়, রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

রাষ্ট্রকূট শাসকেরা দুশো বছরের অধিককাল ধরে দাক্ষিণাত্য শাসন করেছিলেন। তাঁরা ধর্মের ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত সহনশীল, শৈব, বৈষ্ণব ও জৈন ধর্মের তাঁরা পৃষ্ঠপোষকতা করেন। প্রথম কৃষ্ণ ইলোরার সুবিখ্যাত কৈলাস মন্দিরটি নির্মাণ করেন, এটি হলো উচ্চস্তরের স্থাপত্য শিল্পের এক নিদর্শন। রাষ্ট্রকূট রাজা অমোঘবর্ষ শিল্প ও সাহিত্যের সমাদর করতেন, তাঁর রাজসভায় কয়েকজন বিখ্যাত লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা স্থান পেয়েছিলেন। *আদিপুরাণ*-এর লেখক জীনসেন, *গণিতসারসংগ্রহ*-এর লেখক মহাবীরাচার্য এবং *অমোঘবৃত্তি*-র লেখক সকতায়ন তাঁর রাজসভা অলংকৃত করেন। রাজা অমোঘবর্ষ কানাড়ি ভাষায় রচনা করেন বিখ্যাত কাব্যতত্ত্ব *কবিরাজমার্গ*। রাষ্ট্রকূট

রাজারা দক্ষ শাসক ছিলেন, তাঁরা দেশে শান্তি বজায় রাখেন, দেশের বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাণিজ্যসূত্রে যেসব আরব পশ্চিম ভারতে এসেছিলেন তাঁরা রাষ্ট্রকূট-রাজাদের ধর্মীয় সহনশীলতার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁরা জানিয়েছেন 'বলহরা' (বল্লভরাজা) হলেন ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজা, দেশের আর সব রাজারা তাঁকে সম্মান করেন। তিনি সৈনিকদের নিয়মিত বেতন দেন, তাঁর অনেক হাতি ও ঘোড়া আছে, আছে অঢেল সম্পদ (He gives regular pay to his troops and has many horses and elephants and immense wealth.)। তাঁর সৈন্য ও হাতির সংখ্যা অনেক, কিন্তু তাঁর সৈন্যদের বেশিরভাগ হলো পদাতিক কারণ তাঁর রাজ্যটি অবস্থিত পাহাড়ের মধ্যে। রাজা ও জনগণ মুসলমানদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন, কয়েকজন মুসলমান গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত হন। মাসুদি লিখেছেন যে সমগ্র ভারতবর্ষে রাজা 'বলহরার' মতো মুসলমানদের কেউ সম্মান করেন না, তাঁর রাজ্যে ইসলাম সুরক্ষিত ও সম্মানিত (In his kingdom Islam is protected and honoured.)। এখানে মুসলমানদের প্রার্থনার জন্য মসজিদ আছে, সেখানে বহু মুসলমান সমবেত হয়ে দিনে পাঁচবার প্রার্থনা করে। সন্দেহ নেই সেই যুগে রাষ্ট্রকূটদের দৃষ্টিভঙ্গি অবিশ্বাস্যভাবে উদার ও প্রগতিশীল ছিল (All these undoubtedly testify to the liberal and progressive views of the Rashtrakuta kings.)।

ত্রিপক্ষীয় দ্বন্দ্ব ঃ পাল, প্রতিহার, রাষ্ট্রকূট

সম্রাট হর্ষবর্ধনের সময় থেকে কনৌজ ভারতের রাজনৈতিক আধিপত্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। মালবরাজ দেবগুপ্ত এবং বাংলার শাসক শশাঙ্ক কনৌজ অধিকার করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। সমৃদ্ধ গাঙ্গেয় উপত্যকায় অবস্থানের জন্য কনৌজ ভারতীয় রাজাদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর প্রায় একশো বছর উত্তর ভারতে সাম্রাজ্যিক ঐক্য ছিল না। কাশ্মীর ও কামরূপের রাজারা পার্শ্ববর্তী অঞ্চল জয় করে শক্তিশালী রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস চালিয়েছিলেন। মালবের রাজা যশোবর্মন অল্প কিছুকাল কনৌজে রাজত্ব করেন, কিন্তু কনৌজ তার পূর্ব গৌরব হারিয়েছিল। তা সত্ত্বেও অষ্টম শতকে ভারতীয় রাজাদের মধ্যে এই ধারণা গড়ে উঠেছিল যে, কনৌজ হলো সার্বভৌম সাম্রাজ্যের প্রতীক। যে কনৌজ অধিকার করবে সে সার্বভৌম সম্রাটের স্বীকৃতি পাবে। অষ্টম শতকে ভারতের তিনদিকে তিন রাজশক্তির উদ্ভব হয়। অষ্টম শতকের মধ্যে রাষ্ট্রকূট রাজা দন্তিদুর্গ চালুক্য সাম্রাজ্য ধ্বংস করে সমগ্র দাক্ষিণাত্য অধিকার করেন। তাঁর নেতৃত্বে রাষ্ট্রকূটরা অত্যন্ত পরাক্রমশালী হয়ে উঠেছিল। দন্তিদুর্গের বংশধররা ধ্রুব, তৃতীয় গোবিন্দ ও তৃতীয় ইন্দ্র কনৌজ জয় করে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। অধ্যাপিকা রোমিলা থাপার মনে করেন যে, ভারতের মধ্যবর্তীস্থলে অবস্থানের জন্য রাষ্ট্রকূটরা দুই অঞ্চলের

ওপর আধিপত্য স্থাপন করে সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে চেয়েছিল। রাষ্ট্রকূটদের সময়ে দুই অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক সহজ হয়ে এসেছিল।

ত্রিপক্ষীয় দ্বন্দ্বে লিপ্ত দ্বিতীয় পক্ষটি ছিল বাংলার পালরাজারা। অষ্টম শতকে বাংলা ও বিহার অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ ছিল, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে বাংলার বাণিজ্য ছিল। পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের পুত্র ধর্মপাল বাংলাকে উত্তর ভারতের রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি কনৌজকে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা নেন। পূর্বভারতে পালরাজারা বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। তিব্বতের সঙ্গে পালরাজাদের সুসম্পর্ক ছিল, এজন্য উত্তর সীমান্ত নিয়ে তাঁদের কোনো চিন্তা ছিল না। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল। ধর্মপাল ও তাঁর পুত্র দেবপাল বাংলার নেতৃত্বে সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ত্রিপক্ষীয় দ্বন্দ্বের তৃতীয় পক্ষটি ছিল রাজপুতনার প্রতিহাররা। সম্ভবত এরা ছিল গুর্জর জাতির লোক, এজন্য এদের গুর্জর-প্রতিহার বলা হতো। প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রকূট রাজারা এদের 'দ্বাররক্ষক' নিম্নবর্গের মানুষ বলে গণ্য করতেন। হয়তো প্রতিহাররা ছিল রাজপ্রাসাদের কর্মচারী, পরে তারা রাজা হয়ে বসেছিল। পশ্চিমে আরবদের প্রতিহত করে প্রতিহাররা পূর্বদিকে সম্প্রসারণের কাজে মনোনিবেশ করেছিল। অষ্টম শতকের শেষদিকে রাজস্থান, কনৌজ, মালব ও গুজরাট জুড়ে ছিল এদের বিস্তৃত রাজ্য।

ভারতের তিনদিকের এই তিনশক্তি কনৌজ দখল করে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালিয়েছিল। প্রায় দুশো বছর ধরে এই তিন শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব চলেছিল (৭৫০-৯৫০)। এই ত্রিপক্ষীয় দ্বন্দ্বে কোনো পক্ষ চূড়ান্ত জয়লাভ করতে পারেনি। প্রথমদিকে প্রতিহাররা জয়ী হলেও আরব, পাল ও রাষ্ট্রকূটদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে তাদের শক্তিক্ষয় হয়েছিল। তারা কখনো দাক্ষিণাত্য জয়ের চেষ্টা করেনি। অধীনস্থ সামন্ত রাজারা স্বাধীন হয়ে যায়, তাদের জয়ও শেষপর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। একাদশ শতকের গোড়ার দিকে তুর্কিদের আক্রমণে কনৌজ ধ্বংস হয়ে যায়। এই ত্রিপক্ষীয় সংগ্রামের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। এই দ্বন্দ্বে জড়িত তিনপক্ষ এসেছিল পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি থেকে, কেউই মধ্যদেশের রাজশক্তি ছিল না। উত্তর, পূর্ব ও দাক্ষিণাত্যের তিনশক্তি গাঙ্গেয় উপত্যকায় অবস্থিত কনৌজ (মহোদয়) অধিকার করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এই তিনশক্তি মনে করেছিল কনৌজ হলো সাম্রাজ্যের প্রতীক, সার্বভৌমত্বের আসন। একসময় পশ্চিম এশিয়ার জাতিগুলি ব্যাবিলনকে সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল বলে গণ্য করত। জার্মানির জাতিগুলি রোম দখল করাকে সাম্রাজ্য দখল করার সমান বলে ধরে নিয়েছিল। ঠিক তেমনি ভারতের তিন উদীয়মান আঞ্চলিক শক্তি কনৌজকে সাম্রাজ্যের 'হৃৎপিণ্ড' বলে গণ্য করেছিল। এরা কনৌজ অধিকার করার জন্য শক্তিক্ষয়

করেছিল। শেষপর্যন্ত প্রতিহাররা জয়ী হয়, তবে এই সংগ্রামে কোনো শক্তি নিরবচ্ছিন্ন জয়লাভ করেনি, পাল ও রাষ্ট্রকূটরা কয়েকটি যুদ্ধে জয়ী হয়েছিল। ত্রিপক্ষীয় সংগ্রামে উত্থান-পতন লক্ষ করা যায়।

বাংলার পালরাজাদের তাম্র অনুশাসনগুলিতে (খালিমপুর, মুঙ্গের) এবং বাদল স্তম্ভ লেখতে এই ত্রিপক্ষীয় সংগ্রামের উল্লেখ আছে। প্রতিহার রাজাদের দৌলতপুর ও বরা লেখ এবং রাষ্ট্রকূটদের সনজান ও সিরপুর লেখগুলি এই সংঘর্ষের উল্লেখ করেছে। গুজরাতি কবি সোদধালা এবং বাঙালি কবি সন্ধ্যাকর নন্দী এই ত্রিপক্ষীয় সংগ্রামের কথা উল্লেখ করেছেন। ত্রিপক্ষীয় সংগ্রামের দুই প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল বাংলার পালরাজা ধর্মপাল ও দেবপাল এবং প্রতিহাররাজ বৎসরাজ, দ্বিতীয় নাগভট্ট ও ভোজ। বাংলার রাজা ধর্মপাল কনৌজ দখলের অভিপ্রায় নিয়ে পশ্চিমদিকে অগ্রসর হলে প্রতিহাররাজ বৎসরাজ তাঁকে বাধা দিতে এগিয়ে আসেন। দোয়াবের কাছে যে যুদ্ধ হয় তাতে ধর্মপাল পরাস্ত হন, বৎসরাজ কনৌজে তাঁর প্রতিনিধি ইন্দ্রায়ুধকে স্থাপন করেন। এই সময় দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট রাজা ধ্রুব শক্তিসাম্য বজায় রাখার জন্য হস্তক্ষেপ করেন, প্রতিহারদের সঙ্গে মালব ও গুজরাট নিয়ে তাঁদের বিরোধ ছিল। তিনি বৎসরাজকে পরাস্ত করে বিতাড়িত করেন, ধর্মপালকে প্রতিহত করে ধ্রুব দাক্ষিণাত্যে ফিরে যান। উত্তর ভারতে তাঁর সাময়িক জয় স্থায়ী হয়নি। ধর্মপাল উত্তর ভারতের রাজনৈতিক শূন্যতার সুযোগ নিয়ে কনৌজ অধিকার করেন। ভাগলপুর তাম্রশাসনে বলা হয়েছে যে ধর্মপাল বৎসরাজের প্রতিনিধি ইন্দ্রায়ুধকে বিতাড়িত করে তাঁর প্রতিনিধি চক্রায়ুধকে কনৌজে স্থাপন করেন। মুঙ্গের লেখতে বলা হয়েছে ধর্মপাল এইসময় উত্তর ভারতের অনেক স্থান অধিকার করেন, হিমালয়ের গাড়োয়াল ও কুমায়ুন পর্যন্ত তিনি অগ্রসর হন। খালিমপুর লেখের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি কনৌজে এক বিরাট সভার আয়োজন করেন। ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তী, গান্ধার ও কীরের শাসকেরা তাঁর সভায় উপস্থিত ছিলেন। পাঞ্জাব, পূর্ব রাজপুতনা, মালব ও বেরারে ধর্মপালের আধিপত্য সম্প্রসারিত হয়।

কিন্তু ধর্মপালের এই সাফল্য ছিল ক্ষণস্থায়ী। প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট্ট কনৌজ আক্রমণ করে তা অধিকার করে নেন। যোধপুর লেখতে বলা হয়েছে দ্বিতীয় নাগভট্টের সঙ্গে তাঁর সামন্তরাজারা যোগ দিয়েছিল। তিনি চক্রায়ুধকে পরাস্ত করে কনৌজ অধিকার করেছিলেন, সম্ভবত তিনি পাল রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন। পাল-প্রতিহার দ্বন্দ্ব চলাকালীন রাষ্ট্রকূট রাজা তৃতীয় গোবিন্দ উত্তর ভারতে চলে আসেন। তৃতীয় গোবিন্দর হস্তক্ষেপের দুটি সম্ভাব্য কারণ অনুমান করা যায়। একটি হলো ধর্মপালের রানী ছিলেন রাষ্ট্রকূট রাজকন্যা; দ্বিতীয় কারণ হলো প্রতিহারদের জয়ের ফলে রাজনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। তৃতীয় গোবিন্দ

বুন্দেলখণ্ডের যুদ্ধে প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট্টকে পরাস্ত করেন। তৃতীয় গোবিন্দ প্রতিহার রাজাকে পরাস্ত করে ক্ষান্ত হননি, তিনি ধর্মপাল ও তাঁর কনৌজের প্রতিনিধি চক্রায়ুধকে পরাস্ত করেন। এই যুদ্ধের পর তিনি দাক্ষিণাত্যে ফিরে গেলে ধর্মপাল পুনরায় কনৌজ অধিকার করেন। ধর্মপালের পুত্র দেবপাল এই ত্রিপক্ষীয় সংগ্রাম চালিয়ে যান, নাগভট্টের উত্তরাধিকারী রামভদ্র তাঁর হাতে পরাস্ত হন। রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্ষের একটি লেখতে বলা হয়েছে যে, তিনি বঙ্গ জয় করেছিলেন। দেবপাল কোনো রাষ্ট্রকূট রাজার কাছে পরাস্ত হননি, বরং তিনি প্রতিহাররাজ ভোজকে পরাস্ত করেছিলেন। ভোজ রাষ্ট্রকূটদের সঙ্গে সংঘাতেও পরাজয় বরণ করেন। দেবপালের পর পালশক্তির অবনতি ঘটেছিল, এর সুযোগ নিয়ে ভোজ কনৌজ অধিকার করেছিলেন। কনৌজ অধিকার করে তিনি মগধে গিয়ে হাজির হন। সম্ভবত তিনি বঙ্গ জয় করেন, রাষ্ট্রকূটদের পরাস্ত করে তিনি মালব ও গুজরাট অধিকার করেছিলেন। ভোজ প্রকৃতপক্ষে 'উত্তরাপথস্বামী' হয়েছিলেন। ভোজের পুত্র মহীপাল বাংলা জয় করেন, তবে তিনি রাষ্ট্রকূট রাজা তৃতীয় ইন্দ্রের কাছে পরাস্ত হন। দশম শতকের গোড়ার দিকে এই ঘটনা ঘটে, এর ফলে প্রতিহার শক্তি হীনবল হয়ে পড়েছিল।

দুশো বছর স্থায়ী ত্রিপক্ষীয় দ্বন্দ্বের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী, এর রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল গভীর। ভারতের তিনটি আঞ্চলিক শক্তি পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকার জন্য শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল। ঠিক একই সময়ে এই তিনশক্তির পতন ঘটেছিল। এই তিনশক্তি ছিল প্রায় সমশক্তিসম্পন্ন। এইসব রাজাদের বিশাল সৈন্যবাহিনী ছিল, এজন্য প্রচুর ব্যয় হতো। সামরিক ব্যয় নির্বাহের জন্য তাঁদের রাজস্ব বাড়াতে হয়, সাধারণ মানুষের ওপর এজন্য অতিরিক্ত চাপ পড়েছিল। অনুমান করা যায় এজন্য কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল। পালরাজাদের আমলের কৈবর্ত বিদ্রোহকে কৃষক বিদ্রোহ বলা হয়েছে। ত্রিপক্ষীয় দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে প্রাদেশিক শাসক ও সামন্তরাজারা বিদ্রোহ করে স্বাধীন হয়ে যায়। এই তিনশক্তির সীমান্তে নেপাল, কামরূপ, কাশ্মীর, উৎকল প্রভৃতি স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয়। পূর্ব উপকূলে চালুক্য ও গঙ্গাবংশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল, গুজরাটে সোলাঙ্কিরা রাজ্য স্থাপন করেছিল।

ত্রিপক্ষীয় দ্বন্দ্বে তিনশক্তি এত শক্তিক্ষয় করেছিল যে কেউই সাম্রাজ্য স্থাপন করতে পারেনি। ভারতে সাম্রাজ্য গড়ে ওঠেনি। ভারতের এই তিন উদীয়মান শক্তি আরব অনুপ্রবেশের তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেনি। দশম শতকে ভারতে তুর্কি আক্রমণ শুরু হলে তাদের প্রতিহত করার ক্ষমতা এদের উত্তরাধিকারী রাজ্যগুলির ছিল না। রাষ্ট্রকূটরা নিজেদের উচ্চাশাকে সংযত রেখে দাক্ষিণাত্যে আরও শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারত। প্রতিহাররা পশ্চিমে আরব এবং পূর্বে পালদের প্রতিহত করতে গিয়ে নিজেদের দুর্বল করে ফেলেছিল। তারা দাক্ষিণাত্য জয় করে সাম্রাজ্য

স্থাপন করতে পারেনি। পালরা পূর্বভারত নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলে হয়তো তাদের রাজ্যে কৈবর্ত বিদ্রোহ হতো না, পাল রাজ্য ভেঙে পড়ত না।

ত্রিপক্ষীয় দ্বন্দ্বের দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি হলো অনাবশ্যক শক্তিক্ষয়। আরব পরিব্রাজক মাসুদি দশম শতকের গোড়ার দিকে কনৌজে এসেছিলেন। তিনি জানিয়েছেন যে, কনৌজের প্রতিহার রাজা ছিলেন রাষ্ট্রকূটদের শত্রু। দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরপতিরা দুইপক্ষে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করেন, উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য নষ্ট হয়েছিল। বিদেশী অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। ১০১৮ খ্রিস্টাব্দে তুর্কিরা কনৌজ অধিকার করে ধ্বংস করে দিয়েছিল। সারাদেশে অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্য স্থাপিত হয়, এরা আঞ্চলিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে উৎসাহ দিয়েছিল। শুধু ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য নয়, সাংস্কৃতিক ঐক্যও নষ্ট হয়ে যায়। ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্থানীয় রীতিনীতি, আচার-আচরণ গড়ে উঠেছিল। ত্রিপক্ষীয় সংগ্রামের সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য হলো ভারতের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা, সামরিক শক্তিক্ষয় এবং আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ।

প্রতিহার, পাল ও রাষ্ট্রকূটদের শাসন

প্রতিহার, পাল ও রাষ্ট্রকূটরা যে শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন তার মডেল ছিল গুপ্ত, হর্ষবর্ধন ও চালুক্যদের শাসন। রাজা ছিলেন শাসনব্যবস্থার স্তম্ভ, মেধাতিথি 'রাজধর্মের' কথা উল্লেখ করেছেন (The whole duty of the king), রাজধর্ম হলো রাজার নীতি। রাজা শুধু শাসনব্যবস্থার প্রধান নন, তিনি সৈন্যবাহিনীরও প্রধান। রাজাদের জাঁকজমকপূর্ণ রাজসভা ছিল। প্রাসাদের প্রাঙ্গণে পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী মোতায়েন করা হতো, যুদ্ধে ধৃত অশ্ব ও হস্তীগুলি রাজাকে দেখানো হতো। রাজার সঙ্গে থাকতেন প্রতিহার (প্রাসাদের প্রধান), দণ্ডপাশিক (পুলিশ অফিসার), দণ্ডনায়ক (সেনাপতি) ও অন্যান্য বিভাগীয় প্রধানরা। সামন্তরাজা, উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও বিদেশী দূতরা রাজসভায় উপস্থিত থাকতেন। রাজা প্রধান বিচারক হিসেবে কাজ করতেন। রাজসভায় নৃত্যশিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞরা থাকতেন। উৎসবের সময় রাজপরিবারের মহিলারা রাজসভায় আসতেন। আরব লেখকরা জানাচ্ছেন যে, মহিলারা বোরখা পরতেন না। রাজতন্ত্র ছিল বংশানুক্রমিক, তবে পালরাজা গোপাল সামন্তদের দ্বারা নির্বাচিত হয়েছিলেন। সাধারণত জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ হতেন, পিতাকে শাসন ব্যাপারে সহায়তা দিতেন, পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসতেন। তবে সিংহাসন নিয়ে রাজপরিবারে বিরোধ দেখা দিত, রাষ্ট্রকূট রাজা ধ্রুব নিরূপম জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে সরিয়ে সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। রাজাকে দেবতার অংশ বলে গণ্য করা হতো। পুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী ব্রহ্মা ইন্দ্রের তেজ, অগ্নির শক্তি, যমের নিষ্ঠুরতা এবং চন্দ্রের ভাগ্য নিয়ে

রাজাকে নির্মাণ করেছেন। এর অর্থ হলো রাজার দৈবী সত্তার প্রতিষ্ঠা করা। সম্ভবত সেযুগের অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতার জন্য চিন্তাবিদরা রাজাকে শক্তিধর করে নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন, রাজার প্রতি অবিচল আনুগত্য প্রচার করা হয়েছিল। রাজা আইন ও শৃঙ্খলার রক্ষক ছিলেন, তবে সর্বক্ষেত্রে তিনি হস্তক্ষেপ করার অধিকার লাভ করেননি। সমকালীন মেধাতিথি জানিয়েছেন যে তস্কর ও দুর্বৃত্তের হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য ব্যক্তির অস্ত্রবহনের অধিকার ছিল। মেধাতিথি আরও জানিয়েছেন যে, জনগণের অত্যাচারী রাজার প্রতিরোধের অধিকার ছিল (it was right to oppose an unjust king)। একথা ঠিক পুরাণগুলি রাজার অধিকারের ওপর জোর দিয়েছিল, কিন্তু সেযুগে সকলে তা মেনে নেয়নি।

রাজাকে পরামর্শদানের জন্য মন্ত্রীরা ছিলেন, অভিজাত পরিবারগুলি থেকে সাধারণত রাজারা মন্ত্রীদের নিয়োগ করতেন। তাঁরাও রাজাদের মতো বংশানুক্রমিকভাবে শাসন করতেন। পালদের শাসনকালে একটি পরিবারের চারজন মন্ত্রীত্ব করেন, এসব ক্ষেত্রে মন্ত্রীরা খুব প্রভাবশালী হয়ে উঠতেন। কেন্দ্রীয় সরকার কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত ছিল। প্রধান বিভাগগুলি হলো অর্থ, পুলিশ, বিচার, সৈন্যবাহিনী, নগর ও গ্রাম শাসন। বিভিন্ন বিভাগের অধ্যক্ষদের কথাও জানা যায়। সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান থেকে জানা যায় যে, প্রত্যেক রাষ্ট্রে পররাষ্ট্র, অর্থ, সৈন্যবাহিনী, বিচার ও ধর্মসংক্রান্ত মন্ত্রীরা ছিলেন। মন্ত্রীদের মধ্যে একজনের ওপর রাজা বেশি নির্ভর করতেন, একাধিক বিষয়ের তিনি ভারপ্রাপ্ত হতেন। পুরোহিত ছাড়া আর সব মন্ত্রী সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করতেন। অন্তঃপুরের ভারপ্রাপ্ত একজন কর্মচারী ছিলেন, এরা রাজার ওপর প্রভাব বিস্তার করতেন।

শাসনব্যবস্থার একটি বড় অঙ্গ ছিল সৈন্যবাহিনী, রাজ্য রক্ষা ও বিস্তারের কাজে সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন হতো। আরব পর্যটকরা পাল, প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটদের সামরিক শক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। সৈন্যবাহিনীর তিনটি বিভাগ হলো পদাতিক, অশ্বারোহী ও হস্তী। সৈন্যবাহিনী ছিল সুগঠিত, রাজারা সৈন্যবাহিনীর গঠন ও পোষণের ব্যাপারে নজর দিতেন। যুদ্ধে হস্তীবাহিনীর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হতো। পালরাজাদের সবচেয়ে বড় হস্তীবাহিনী ছিল। মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া থেকে সৈন্যবাহিনীর জন্য ঘোড়া আমদানি করা হতো। প্রতিহার রাজাদের সবচেয়ে উন্নত অশ্বারোহী বাহিনী ছিল। আরব পর্যটকরা এদের উন্নত অশ্বারোহী বাহিনীর কথা উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত এযুগের যুদ্ধে রথের ব্যবহার ছিল না কারণ এর উল্লেখ নেই। রাষ্ট্রকূট রাজারা অনেক দুর্গ বানিয়েছিলেন, দুর্গগুলি ছিল তাঁদের ক্ষমতার উৎস। এই দুর্গগুলিতে সেরা সৈনিকদের মোতায়েন করা হতো এবং দুর্গাধিপতিরা স্বতন্ত্রভাবে নিযুক্ত হতেন। পদাতিক বাহিনীর মধ্যে ছিল নিয়মিত ও অনিয়মিত সৈনিকরা এবং সামন্তরাজাদের পাঠানো সৈন্য।

নিয়মিত সৈনিকরা অনেকে বংশানুক্রমিকভাবে সৈনিকের কাজ করত। সারা ভারতবর্ষ থেকে সৈন্য সংগ্রহ করা হতো, পালদের সৈন্যবাহিনীতে মালব, আসাম, দক্ষিণ গুজরাট (লট) এবং কর্ণাটকের সৈনিকরা ছিল। পাল ও রাষ্ট্রকূট রাজাদের নৌবহর ছিল, তবে এদের নৌবহরের গঠন ও শক্তি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

এইসব রাজাদের রাজ্যগুলি দুভাগে বিভক্ত ছিল—কিছু অঞ্চল কেন্দ্র থেকে সরাসরি শাসন করা হতো, বাকি অঞ্চল সামন্তরাজারা শাসন করতেন। সামন্তরাজারা স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ভোগ করতেন, রাজার প্রতি তাঁরা অনুগত থাকতেন, যুদ্ধের সময় সৈন্যবাহিনী দিয়ে সাহায্য করতেন এবং বার্ষিক নির্দিষ্ট পরিমাণে রাজস্ব দিতেন। সামন্তরাজাদের প্রতিনিধিরা (সাধারণত পুত্র) রাজসভায় উপস্থিত থাকতেন, এজন্য বিদ্রোহের সম্ভাবনা কমে যেত। বিশেষ সময়ে, বিশেষ করে উৎসবের সময়ে, সামন্তরাজারা রাজসভায় যেতেন। সামন্ত পরিবারের সঙ্গে রাজারা বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হতেন। এসব সত্ত্বেও সামন্তরাজারা সুযোগ খুঁজতেন, বিদ্রোহ করে স্বাধীন হবার চেষ্টা করতেন, এজন্য যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। রাষ্ট্রকূট রাজারা বেঙ্গি ও কর্ণাটকের সামন্তরাজাদের সঙ্গে অবিরাম সংঘর্ষে লিপ্ত ছিলেন। প্রতিহাররাজারা বুন্দেলখণ্ডের চান্দেল্ল ও মালবের পরমারদের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়তেন। পাল ও প্রতিহারদের রাষ্ট্রের যে অংশ সরাসরি শাসিত হতো সেগুলি ভুক্তি (প্রদেশ) ও বিষয়ে (মণ্ডল) ভাগ করা হতো। ভুক্তির শাসককে বলা হতো উপরিক, বিষয়ের প্রধান বিষয়পতি। সৈন্যবাহিনীর সহায়তা নিয়ে উপরিক রাজস্ব সংগ্রহ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ করত। বিষয়পতি তার জেলায় ঐ একই কাজ করত। এদের মধ্যেকার সম্পর্কের কথা সঠিক জানা যায় না, বিষয়পতি কেন্দ্রীয় সরকারের না উপরিকের কর্মচারী ছিল নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। কয়েকজন বিষয়পতি বংশানুক্রমিক ক্ষমতা ভোগ করত বলে জানা যায়। এযুগে ভোগপতি বা সামন্ত নামে ক্ষুদ্র সামন্তরাও ছিল, এরা কয়েকটি গ্রামের ওপর অধিকার ভোগ করত। সাধারণত বড় সামন্তরা ৮৪টি গ্রামের ওপর অধিকার ভোগ করত, এদের নিজস্ব দরবার ছিল এবং রাজা ও বড় সামন্তদের এরা অনুকরণ করত। পরবর্তীকালে বিষয়পতি এবং ক্ষুদ্র সামন্তদের মধ্যে পার্থক্য মুছে গিয়েছিল, এরা শুধু সামন্ত নামে পরিচিত হতো।

রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যে প্রত্যক্ষ শাসনাধীন অঞ্চল রাষ্ট্র (প্রদেশ), বিষয় ও ভুক্তিতে বিভক্ত ছিল। রাষ্ট্রের প্রধান হতো রাষ্ট্রপতি, পাল ও প্রতিহার রাষ্ট্রে উপরিক যে কাজ করত রাষ্ট্রপতিও তাই করত। বিষয় হলো আধুনিক জেলা, ভুক্তি ছিল শাসনের ক্ষুদ্রতর একক। পাল ও প্রতিহার রাজ্যে বিষয়ের নীচের একক ছিল পট্টল (Pattala)। এইসব এককের কাজ কী ছিল সঠিকভাবে জানা যায় না, সম্ভবত তারা রাজস্ব সংগ্রহ ও শান্তিরক্ষার কাজ করত। রাজকর্মচারীরা নগদ বেতন পেত না, এদের নিষ্কর

ভূমিদান করা হতো, এজন্য কর্মচারী ও সামন্তদের মধ্যে পার্থক্য ক্রমশ মুছে যেতে থাকে। প্রাদেশিক শাসক প্রায় সামন্তপ্রভুর মতো মর্যাদা ভোগ করত। এসব প্রশাসনিক এককের নীচে ছিল গ্রাম, গ্রাম ছিল শাসনের নিম্নতম একক। গ্রামের শাসন পরিচালনা করত গ্রামিক (গ্রামপতি) এবং হিসেবরক্ষক। এসব কর্মচারী পুরুষানুক্রমে পদগুলি দখল করে থাকত, গ্রামের শান্তিরক্ষার দায় ছিল গ্রামিকের। গ্রামের সৈন্য (militia) তাকে একাজে সাহায্য করত। গ্রাম কর্মচারীর কাজ খুব সহজ ছিল না, দস্যু-তস্কর ছাড়াও সামন্তপ্রভুদের অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহ ছিল। এরা পরস্পরের অধীনস্থ অঞ্চলে লুঠপাট চালাত। এজন্য অনেক গ্রামে দুর্গ বানানো হতো। গ্রাম কর্মচারী শস্য বা নগদে রাজস্ব সংগ্রহ করে রাজকোষে জমা দিত। হিসেবরক্ষক গ্রামের জমির হিসেব রাখত, এরাও নিষ্কর ভূমি পেত বেতনের পরিবর্তে।

গ্রাম শাসনের কাজে সহায়তা দিত *গ্রাম মহাজন* বা *গ্রাম মহত্তর* নামে সভা। রাষ্ট্রকূট শাসনাধীন কর্ণাটকে গ্রাম কমিটি বিদ্যালয়, পুষ্করিণী, মন্দির, রাস্তাঘাট ইত্যাদির তত্ত্বাবধান করত। *কোনো ব্যক্তি এই কমিটির হাতে সম্পত্তি দেখাশোনার ভার দিলে* তার তত্ত্বাবধান করা হতো। এইসব কমিটির অধীনে আবার উপসমিতি থাকত, তারা সংগৃহীত রাজস্বের একাংশ পেত। গ্রামের ছোটখাটো বিরোধের এরা বিচার করত। শহরে গ্রামের মতো পরিচালক সমিতি ছিল, বাণিজ্য গিল্ডের প্রধান (শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ) এসব সমিতির সঙ্গে যুক্ত হতো। শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শান্তি রক্ষার দায়িত্ব ছিল কোতোয়ালের। এইপর্বে দাক্ষিণাত্যে পুরুষানুক্রমিক রাজস্ব-কর্মচারীদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এদের বলা হতো 'নাদ গোবিন্দ' বা 'দেশ-গ্রামকূট' (nad-gavunda or desh-gramakuta)। মহারাষ্ট্রে পরবর্তীকালে জমিদার দেশমুখ ও দেশপাণ্ডেদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, নাদ গোবিন্দ বা দেশ-গ্রামকূট ছিল এদের পূর্বসূরি। উত্তর ও দাক্ষিণাত্যের এসব গ্রামীণ কর্মচারী ও সামন্তরা সমকালীন সমাজ ও রাজনীতিকে অবশ্যই প্রভাবিত করেছিল। বংশানুক্রমিকতা বৃদ্ধি পেলে গ্রামসমিতিগুলি দুর্বল হয়ে পড়েছিল, কেন্দ্রীয় সরকারের এদের ওপর নিয়ন্ত্রণ ক্রমশ শিথিল হতে থাকে। সরকার ক্রমশ সামন্ততান্ত্রিক হয়ে উঠতে থাকে (The government was becoming feudalised.)।

রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক সহজ ও স্বাভাবিক ছিল, রাজারা শিব ও বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন অথবা বুদ্ধ ও মহাবীরের ধর্মমত অনুসরণ করতেন। ব্রাহ্মণ, মন্দির, বৌদ্ধবিহার ও জৈন মন্দিরের জন্য তাঁরা অকাতরে দান করতেন। রাজারা সব ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, ধর্মের কারণে কাউকে নিগ্রহ করা হতো না, রাষ্ট্রকূট রাজারা মুসলমানদের স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণের অধিকার দেন। তারা রাষ্ট্রকূট রাজ্যে ধর্মপ্রচারের অধিকার পেয়েছিল। ধর্মশাস্ত্র অনুমোদিত রীতিনীতি, আচার-আচরণের ক্ষেত্রে রাজারা সাধারণত হস্তক্ষেপ করতেন না, এব্যাপারে পুরোহিত রাজাকে পরামর্শ দিতেন। তবে

পুরোহিত রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারতেন না, রাজাকে প্রভাবিত করা সহজ হতো না। এযুগে ধর্মশাস্ত্রের অন্যতম ভাষ্যকার মেধাতিথি জানাচ্ছেন যে রাজার কর্তৃত্বের উৎস ছিল দুটি—বেদসহ ধর্মশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্র (রাজনীতি)। অর্থশাস্ত্র অনুযায়ী তাঁর রাজধর্ম পরিচালিত হতো (science of polity)। ধর্ম ও রাজনীতি পৃথক ছিল, ধর্ম ছিল রাজার ব্যক্তিগত কর্তব্য (personal duty of the king)। পুরোহিততন্ত্র এবং তাঁদের শাস্ত্র ব্যাখ্যানুযায়ী রাজা চলতেন না, এইদিক থেকে বিচার করে বলা যায় চরিত্রগতভাবে রাষ্ট্র ছিল ধর্মনিরপেক্ষ।

চোল

দক্ষিণ ভারতে চোল রাজবংশ নবম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে অত্যন্ত গৌরব ও মর্যাদার সঙ্গে রাজত্ব করেছিল। দক্ষিণ ভারতের বিস্তৃত অঞ্চল তাঁদের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। তাঁরা সিংহল ও মালদ্বীপ জয় করেন, ওড়িশা ও তুঙ্গভদ্রা দোয়াবের অনেক অঞ্চল তাঁদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। চোল রাজাদের শক্তিশালী নৌবহর ছিল, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে তাঁরা প্রভাব বিস্তার করেন। চোলদের রাজত্বকালে দক্ষিণ ভারত মর্যাদার শিখরে পৌঁছেছিল। চোল রাজারা সুশাসক ছিলেন, দেশে স্বায়ত্তশাসনের সম্প্রসারণ ঘটেছিল। তাঁরা শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। কয়েকজন ঐতিহাসিক এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, চোলদের শাসনকাল হলো দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসের সুবর্ণযুগ (the Chola rule was the golden age of south India.)। চোলদের আবির্ভাব লগ্নে দক্ষিণ ভারতে অনেকগুলি রাজ্য ছিল। কাঞ্চীতে ছিল পল্লবদের রাজধানী, বাদামি ছিল চালুক্যদের রাজধানী, মাদুরাই ছিল পাণ্ড্যদের রাজধানী। কেরালায় ছিল চেরদের রাজ্য, কর্ণাটক অঞ্চলে ছিল কদম্ব ও গঙ্গাদের রাজ্য। গঙ্গাদের সঙ্গে মহারাষ্ট্রের রাষ্ট্রকূটদের বন্ধুত্ব ছিল। পল্লব, পাণ্ড্য ও চেরদের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না, এরা পরস্পরের সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত ছিল, এদের সঙ্গে রাষ্ট্রকূটদেরও বিরোধ ছিল। পল্লবদের নৌবহর ছিল, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে এদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। চীনের সঙ্গে পল্লবদের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল।

চোল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন বিজয়ালয়। পল্লব রাজাদের সামন্ত হিসেবে জীবন শুরু করে তিনি চোল রাজ্য স্থাপন করেন। ৮৫০ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাঞ্জোর অধিকার করেন, তাঞ্জোর ছিল চোলদের রাজধানী। ৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে চোলরা পল্লবদের পরাস্ত করে তাদের রাজ্য তোণ্ডামণ্ডল অধিকার করেছিল। উত্তরে রাষ্ট্রকূটদের সঙ্গে তারা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিল। ৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রকূট রাজা তৃতীয় কৃষ্ণ চোলদের পরাস্ত করে চোল রাজ্যের উত্তরাংশ অধিকার করে নিয়েছিলেন। এই

ঘটনার পর চোল শক্তির উত্থান সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়, কিন্তু এই রাজ্যের স্থায়ী কোনো ক্ষতি হয়নি। তৃতীয় কৃষ্ণের মৃত্যুর পর (৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ) চোলদের দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটেছিল। চোল রাজবংশের দুজন শ্রেষ্ঠ রাজা হলেন *প্রথম রাজরাজ* (৯৮৫-১০১৪) এবং *প্রথম রাজেন্দ্র* (১০১৪-৪৪)। রাজরাজ তাঁর পিতার শাসনকালে শাসন ও যুদ্ধবিদ্যায় প্রভূত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। তাঞ্জোর লেখতে রাজরাজের সামরিক অভিযানের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। রাজরাজ শাসনের গোড়ার দিকে দক্ষিণের পাণ্ড্য, চের এবং তাদের বন্ধু সিংহলের রাজার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। ত্রিবান্দ্রমে চেরদের নৌবহর তিনি ধ্বংস করেন এবং কুইলন আক্রমণ করেন। রাজরাজ মাদুরা আক্রমণ করে পাণ্ড্যদের রাজা অমরভুজঙ্গকে বন্দী করেন। সিংহল আক্রমণ করে তিনি সেখানকার রাজা পঞ্চম মহেন্দ্রকে পরাস্ত করেন। সিংহলের পোলন্নারুভাতে তিনি রাজধানী স্থাপন করে শিবমন্দির নির্মাণ করেন। সিংহলের উত্তরাঞ্চল তাঁর অধিকারে আসে। এই সামুদ্রিক অভিযানের একটি উদ্দেশ্য হলো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যপথের ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন। মালাবার ও করমণ্ডল উপকূল দিয়ে এই অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্য চলত। তিনি মালদ্বীপ অধিকার করে সমুদ্র পথের ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ আরও দৃঢ় করেছিলেন।

উত্তরে তিনি গঙ্গা রাজ্য এবং পূর্ব চালুক্যদের বেঙ্গি রাজ্য আক্রমণ করেন, গঙ্গারাজ্য চোল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। চোলবাহিনী পশ্চিমী চালুক্যদের আক্রমণ করে নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছিল। চালুক্যদের লেখতে চোলদের বর্বরতার উল্লেখ আছে, শিশু ও ব্রাহ্মণদের হত্যা করা হয়, মহিলারা অসম্মানিতা হন। রাজরাজ পূর্ব চালুক্য রাজ্য জয় করে নিজের আধিপত্য স্থাপন করেন, রাজপরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন। রাজরাজ পূর্ব ও পশ্চিমের চালুক্যদের মধ্যে ঐক্যের বিরোধী ছিলেন। পূর্ব ও পশ্চিমের চালুক্যরা জোট বেঁধে চোলদের বিরোধিতায় নামতে পারে এমন সম্ভাবনা ছিল (to frustrate the scheme of Satyasraya to combine the resources of the Western and Eastern Chalukyas against the Cholas.)। রাজরাজ কলিঙ্গ রাজ্যের আগ্রাসন প্রতিহত করে ঐ দেশটি জয় করেছিলেন। চোলদের লেখতে বলা হয়েছে যে রাজরাজ মালদ্বীপ সংলগ্ন বারো হাজার দ্বীপ জয় করেছিলেন (12,000 ancient islands)। এতে হয়তো অতিশয়োক্তি আছে, তবে তাঁর সাম্রাজ্যের মধ্যে উত্তরে তুঙ্গভদ্রা পর্যন্ত সমগ্র দক্ষিণ ভারত ছিল, ছিল মালদ্বীপ, সিংহলের উত্তরাংশ। পূর্ব চালুক্য রাজ্যটি তাঁর সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। 'চোলমার্তণ্ড' প্রথম রাজরাজ হলেন দক্ষিণ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি শুধু সুদক্ষ যোদ্ধা ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না, ছিলেন সুশাসক, ধর্মপ্রাণ, সহনশীল মানুষ, শিল্প ও সাহিত্যের অনুরাগী অমায়িক ব্যক্তিত্ব। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের সুশাসনের

ব্যবস্থা করেন, ১০০০ খ্রিস্টাব্দে তিনি তার শাসনাধীন অঞ্চলে জমি জরিপের ব্যবস্থা করেন, কেন্দ্রীয় শাসনকে শক্তিশালী করে তিনি সেইসঙ্গে স্বায়ত্ত শাসনব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটিয়েছিলেন। তাঞ্জোরের রাজরাজেশ্বর শিব মন্দিরটি তিনি নির্মাণ করেন।

প্রথম রাজেন্দ্র (১০১৪-৪৪) যুবরাজ হিসেবে তাঁর পিতার শাসনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন (১০১২-১৪)। পিতার স্থাপিত ভিত্তির ওপর তিনি সাম্রাজ্য সৌধটি নির্মাণ করেন। *তিরুবলাঙ্গাড়ু* লেখতে (১০১৭) প্রথম রাজেন্দ্রের সাম্রাজ্য বিস্তারের কথা আছে। চোলদের লেখগুলিতে তাদের রাজত্বকালের দীর্ঘ বর্ণনা পাওয়া যায়। তিরুমালাই লেখতে (১০২৪) তাঁর বিজয় অভিযানের বিস্তৃত তথ্য মেলে। রাজেন্দ্র প্রথম জীবনে পাণ্ড্য ও চের রাজাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালিয়ে তাদের রাজ্য অধিকার করেন। রাজেন্দ্র সিংহল বিজয়ের কাজ সম্পূর্ণ করেছিলেন, পরবর্তী পঞ্চাশ বছর ধরে সিংহল চোল রাজাদের শাসনাধীনে ছিল। তিনি পূর্ব ভারতে একটি সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর সৈন্যবাহিনী ওড়িশার মধ্য দিয়ে বাংলায় প্রবেশ করেছিল, গঙ্গা অতিক্রম করে দুজন স্থানীয় রাজাকে পরাস্ত করেছিল। এই জয়ের পর তিনি *'গঙ্গাইকোণ্ডচোল' উপাধি নেন এবং গঙ্গাইকোণ্ডচোলপুরম* নামে নগরী স্থাপন করেন। রাজেন্দ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজাদের বিরুদ্ধে নৌ-অভিযান পরিচালনা করেন। মালয়, সুমাত্রা, জাভা ও অন্যান্য দ্বীপ নিয়ে এই রাজ্যটি গঠিত হয়েছিল, এর রাজধানী ছিল মাজাপাহিত। ভারত ও চীনের মধ্যে বাণিজ্যের অন্তর্বর্তী ঘাঁটি হিসেবে এই রাজ্যটি কাজ করত। এই রাজ্যের রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, চোল রাজাদের সঙ্গে তাঁদের সুসম্পর্ক ছিল। শৈলেন্দ্র বংশের রাজা মারবিজয়তুঙ্গবর্মন চোলরাজ রাজরাজের অনুমতি নিয়ে নেগাপত্তমে চূড়ামণি বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করেন। রাজেন্দ্র এই বিহারের ব্যয় নির্বাহের জন্য একটি গ্রাম দান করেন। এই দুই রাজ্যের মধ্যে বিরোধের সম্ভাব্য কারণ হলো বাণিজ্য স্বার্থের সংঘাত, ভারত ও চীনের মধ্যে বাণিজ্য বাধা দূর করার জন্য রাজেন্দ্র এই রাজ্য আক্রমণ করেন। মালয় ও সুমাত্রায় কদরম সহ অনেকগুলি স্থান রাজেন্দ্র অধিকার করেন। বঙ্গোপসাগরে চোল নৌবহর ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী, এজন্য এই উপসাগরকে 'চোল হ্রদ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। চোল শাসকরা চীনে দূত পাঠিয়েছিলেন।

চোলদের সঙ্গে চালুক্যদের দ্বন্দ্ব চলেছিল। পরবর্তীকালের চালুক্যদের রাজধানী ছিল কল্যাণী। তিনটি অঞ্চল নিয়ে এদের মধ্যে বিরোধ চলেছিল—বেঙ্গি, তুঙ্গভদ্রা এবং কর্ণাটকের গঙ্গাদের রাজ্য। এই দ্বন্দ্বে কোনো পক্ষ চূড়ান্ত জয় লাভ করতে পারেনি, উভয়পক্ষের শক্তিক্ষয় হয়েছিল। চোল বাহিনী চালুক্য রাজ্যে নিষ্ঠুর অভিযান চালিয়েছিল, পাণ্ড্যরাজ্যে তারা উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। সিংহলের রাজধানী অনুরাধাপুর তারা ধ্বংস করেছিল, বন্দী রাজা ও রানীর সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করা হয়।

রাজেন্দ্র ছিলেন যোগ্য পিতার যোগ্যতর পুত্র (The greater son of a great father)। তিনি চোল সাম্রাজ্যের গৌরব আরো বৃদ্ধি করেছিলেন। প্রথম কুলোতুঙ্গ (১০৭০-১১২০) ছিলেন শেষপর্বের উল্লেখযোগ্য চোল রাজা। তাঁর ক্ষমতালাভের আগে চোল রাজ্যে কিছুটা অবনতি দেখা দিয়েছিল, কুলোতুঙ্গ শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। তিনি সিংহলে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন, চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব ছিল। বিক্রমাদিত্য পূর্ব চালুক্য ও চোলরাজ্যের মধ্যে মৈত্রীর বিরোধী ছিলেন। পাণ্ড্য ও চের রাজ্যের বিদ্রোহ কুলোতুঙ্গ দমন করেন, তিনি দুবার ওড়িশা আক্রমণ করেন। কুলোতুঙ্গ কনৌজের গহড়বলদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। রামেশ্বরম পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল তিনি জয় করেন। কুলোতুঙ্গ বেঙ্গি ও গঙ্গাবদি রাজ্যের কতকাংশ তাঁর অধীনে রেখেছিলেন। তিনি সুশাসক ছিলেন। এই পর্বে গঙ্গাইকোণ্ড-চোলপুরম ছিল চোলদের রাজধানী। চোল সাম্রাজ্য দ্বাদশ শতকে অক্ষত ছিল, ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে এই সাম্রাজ্য ভাঙতে থাকে, চোল সাম্রাজ্য পাণ্ড্য ও হৈসল রাজারা নিজেদের রাজ্যভুক্ত করেন।

চোলদের নৌসাম্রাজ্য

দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে চোলদের শাসনকাল নানাদিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এরা হলো এই অঞ্চলের একটি প্রাচীন রাজবংশ। অশোকের লেখ এবং প্রাচীন সঙ্গম সাহিত্যে চোলদের উল্লেখ আছে। দশম শতকে চোল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে চোলরা দক্ষিণ ভারতের পল্লব, চালুক্য ও রাষ্ট্রকূটদের অধীনে সামন্তরাজা হিসেবে কাজ করত। খ্রিস্টীয় নবম শতকের মধ্যভাগ থেকে তারা ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। পরবর্তীকালে সমগ্র দক্ষিণ ভারত নিয়ে তারা একটি স্বাধীন সার্বভৌম সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। উত্তরে কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা থেকে দক্ষিণে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাদের সাম্রাজ্য। চোল সাম্রাজ্যের এক বড় বৈশিষ্ট্য হলো তারা তিনদিকের সমুদ্রের ওপর আধিপত্য স্থাপন করেছিল। ভারতের ইতিহাসে এ এক অনন্য দৃষ্টান্ত। ভারত মহাসাগরে মালদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ, সিংহল এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মালয়, সুমাত্রা, জাভা এবং ইন্দোচীনে চোলরাজারা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। চীনের সঙ্গে তাঁরা বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। নৌ ও ঔপনিবেশিক প্রাধান্য স্থাপন ও রক্ষা করার জন্য চোলরাজারা ভিন্ন ধরনের সামরিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। দক্ষিণ ভারতের রাজশক্তি গঙ্গা, চালুক্য, পাণ্ড্য ও কেরলের চের রাজাদের বিরুদ্ধে তাঁরা স্থলবাহিনী রেখেছিলেন। সমুদ্র পেরিয়ে ঔপনিবেশ স্থাপন ও রক্ষার জন্য তাঁরা বিশাল নৌবহর গঠন করেন। ভারত ইতিহাসে আর কোনো রাজশক্তির এতবড় নৌবহর ছিল না।

৯৮৫-১০৪৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রাজরাজ ও রাজেন্দ্র চোলের সময়ে চোলদের নৌসাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। এই সময় হলো চোল সাম্রাজ্যের গৌরবের যুগ। এই সময়কালে চোল সাম্রাজ্য আয়তনে, সম্পদে, মর্যাদায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছিল। মহান রাজরাজ চোল রাজবংশের গৌরবময় যুগের সূচনা করে যান। ক্ষুদ্র চোল রাজ্যকে তিনি একটি সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। সাম্রাজ্যের সুশাসন, সৈন্য ও নৌবহর গঠন ইত্যাদি ছিল রাজরাজের কাজ। রাজরাজ গঙ্গা ও চালুক্যদের পরাস্ত করেন, পূর্ব চালুক্যদের বেঙ্গি রাজ্য চোলদের কাছে নতি স্বীকার করেছিল। সুদূর দক্ষিণে পাণ্ড্য ও কেরল রাজ্য দুটি জয় করে তিনি সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেন। এই সময় দক্ষিণ ভারত ও তার তিনদিকের সামুদ্রিক পরিবেশ চোল সাম্রাজ্যের পক্ষে নিরাপদ ছিল না। আরব বণিকরা মালাবার অঞ্চলে বাণিজ্য করত, সমুদ্র পথে এদের বাণিজ্য ঘাঁটি ছিল মালদ্বীপ ও সিংহল। আরব বণিকরা পশ্চিম উপকূল থেকে পূর্ব উপকূল এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয়, সুমাত্রা ও জাভার সঙ্গে বাণিজ্য করত। দশম শতকে ভারতের পশ্চিম ও পূর্বের উপকূল বাণিজ্যে আরব বণিকদের প্রাধান্য ছিল। চোল সম্রাটরা আরব বণিকদের এই নৌ ও বাণিজ্যিক প্রাধান্য খর্ব করতে চেয়েছিলেন। অধ্যাপিকা রোমিলা থাপার জানাচ্ছেন যে, রাজরাজের পাণ্ড্য ও কেরল রাজ্য আক্রমণের পিছনে বৃহত্তর সামুদ্রিক ও ঔপনিবেশিক স্বার্থ ছিল। কেরল রাজ্য জয় করে তিনি এই অঞ্চলে আরব বণিকদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করে দেন।

দক্ষিণ ভারতের উপকূল এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে সাম্রাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে রাজরাজ নৌঅভিযান পরিচালনা করেন। বারোশো দ্বীপ নিয়ে গঠিত (লেখতে আছে ১২,০০০) মালদ্বীপ তিনি দখল করেন, পার্শ্ববর্তী লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ অধিকৃত হয়। এইসব দ্বীপ দখল করার পর রাজরাজ সরাসরি সিংহল আক্রমণ করেন। তাঁর আক্রমণের ফলে সিংহলরাজ পঞ্চম মহেন্দ্র পরাস্ত হয়ে পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নেন। চোল আক্রমণে সিংহলের রাজধানী অনুরাধাপুর ধ্বংস হয়ে যায়। সিংহলে রাজরাজ নতুন রাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করেন। উত্তর সিংহল জয় করে তিনি চোল সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেন। পরাজিত সিংহলরাজের আনুগত্য পেয়ে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। সিংহলে তিনি নতুন রাজধানী ও একটি শিবমন্দির স্থাপন করেন। মৃত্যুর আগে রাজরাজ মালদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ ও সিংহল নিয়ে নৌসাম্রাজ্য গঠন করেন, পুত্রের জন্য রেখে যান দুঃসাহসী নৌসাম্রাজ্যের ঐতিহ্য।

প্রথম রাজেন্দ্র তাঁর পিতার মতো দক্ষ ও দুঃসাহসী ছিলেন। সিংহলী ইতিবৃত্ত *মহাবংশ*-এ রাজেন্দ্র চোলের সিংহল অভিযানের বর্ণনা আছে। এই ইতিহাস থেকে জানা যায় যে রাজরাজ সিংহল বিজয় শুরু করেন, রাজেন্দ্র তা শেষ করেন। সিংহলের রাজা মহেন্দ্র ও রানী বন্দী হন, সমগ্র সিংহল চোল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

তবে রাজেন্দ্র সিংহলের ওপর তাঁর অধিকার দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেননি। *মহাবংশ*-এ বলা হয়েছে যে রাজা মহেন্দ্রের পুত্রের নেতৃত্বে দক্ষিণ সিংহলে চোল শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রথম রাজেন্দ্র পাণ্ড্য ও কেরল রাজ্যের ওপর আধিপত্য বজায় রাখেন, এই অঞ্চলে আরব বণিকদের আধিপত্য তিনি ধ্বংস করেন। পাণ্ড্য ও কেরল শাসনের জন্য তিনি মাদুরায় একজন প্রাদেশিক শাসক নিযুক্ত করেন। রাজেন্দ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 'শ্রীবিজয়' রাজ্যের বিরুদ্ধে একটি বৃহৎ নৌঅভিযান পরিচালনা করেন। মালয়, সুমাত্রা, জাভা ও অন্যান্য দ্বীপ নিয়ে গঠিত এই রাজ্যে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন। চোল রাজাদের সঙ্গে এঁদের সদ্ভাব ছিল। দক্ষিণ ভারত ও চীন সাম্রাজ্যের মধ্যে এই রাজ্যটি ছিল একটি অন্তর্বর্তী বাণিজ্যঘাঁটি। চোলরাজাদের অনুমতি নিয়ে শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজা নেগাপত্তমে চূড়ামণি বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করেন। শ্রীবিজয়ের সঙ্গে চোলদের সংঘাতের কারণ হলো চীন বাণিজ্য। এই বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল আরব, ভারতীয় ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বণিকরা। চীনের সম্রাটরা দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। একাদশ শতকে চোল রাজ্য থেকে বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক মিশন চীনে গিয়েছিল। চীনের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের বাণিজ্যের সুরক্ষার জন্য রাজেন্দ্র শ্রীবিজয় আক্রমণ করেন। অনেকে অবশ্য এরকম অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে উচ্চাকাঙ্ক্ষী, সাম্রাজ্যবাদী, গৌরবলিপ্সু প্রথম রাজেন্দ্র শুধু সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্য নিয়ে শ্রীবিজয় আক্রমণ করেছিলেন। রোমিলা থাপার জানিয়েছেন যে, সাম্রাজ্য বিস্তার নয়, ভারতের চীন বাণিজ্যে শ্রীবিজয়ের মধ্যস্থের ভূমিকা খর্ব করার জন্য রাজেন্দ্র ঐ রাজ্যটি আক্রমণ করেন।

সম্ভবত রাজেন্দ্র সমুদ্রপারে দিগ্বিজয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর বিশাল নৌবহর ছিল, এই নৌবহর নিয়ে তিনি শ্রীবিজয় আক্রমণ করেন। শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজারা চোল অভিযান প্রতিহত করতে পারেননি। শ্রীবিজয়ের রাজধানী মাজাপাহিত অগ্নিদগ্ধ হয়, রাজা বন্দী হন। রাজেন্দ্র দূরদর্শী শাসক ছিলেন। তিনি শ্রীবিজয় তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত করেননি, বশ্যতা স্বীকারের বিনিময়ে পরাজিত রাজাকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেন। এসব ছাড়াও রাজেন্দ্রের লেখতে অন্য একটি সমুদ্রপারের রাজ্যের নাম আছে। রাজ্যটি হলো বর্তমান ইন্দোচীনের কম্বোজ রাজ্য। সম্ভবত এই অঞ্চলে রাজেন্দ্র তাঁর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। রাজরাজ ও রাজেন্দ্র ভারত মহাসাগরে চোল প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন, চোলদের নৌসাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। এই নৌসাম্রাজ্য চোলদের গৌরব ও সম্পদ বৃদ্ধি করেছিল। কিন্তু এই ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যে শান্তি ছিল না, বিদ্রোহ ও অস্থিরতা ছিল। রাজরাজের সময়ে সিংহলের দক্ষিণ অঞ্চলে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, রাজেন্দ্র এই প্রতিরোধ আন্দোলন

দমন করতে পারেননি। পরবর্তীকালে এই অঞ্চল কার্যত স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল। দক্ষিণের পাণ্ড্য ও কেরল রাজ্য দুটি সিংহলের রাজার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে চোল সাম্রাজ্যে সংকট সৃষ্টির চেষ্টায় ছিল। এই সংকট চোল সাম্রাজ্যকে অবশ্যই দুর্বল করে দিয়েছিল। রাজেন্দ্রের উত্তরাধিকারী রাজাধিরাজ ও বীররাজেন্দ্রকে পুনরায় সিংহল ও শ্রীবিজয়ের বিরুদ্ধে নৌ-অভিযান পরিচালনা করতে হয়। শ্রীবিজয় কার্যত স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল। শ্রীবিজয়ে প্রাপ্ত তামিল লেখ থেকে জানা যায় যে, রাজনৈতিক আধিপত্যের অবসান ঘটলেও এই অঞ্চলের সঙ্গে চোল সাম্রাজ্যের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। তামিল বণিকরা এখানে উপনিবেশ স্থাপন করে বাণিজ্য করত।

চোল সম্রাটদের নৌবহর ও নৌসাম্রাজ্য ভারত ইতিহাসের এক চমকপ্রদ ঘটনা। রাজনৈতিক দিক থেকে এর প্রভাব ছিল দীর্ঘস্থায়ী ও সুদূরপ্রসারী। ভারত মহাসাগরে নৌসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা চোল সাম্রাজ্যকে রাজনৈতিক ও সামরিক নিরাপত্তা দিয়েছিল। মালাবার, সিংহল ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আরব বণিকদের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল। চোলদের নৌসাম্রাজ্য এই প্রভাব প্রতিহত করেছিল, ভারত মহাসাগর বস্তুত 'চোল হ্রদে' পরিণত হয়। চোলদের নৌসাম্রাজ্যের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য কম নয়। আরব বণিকদের প্রভাবমুক্ত হবার পর এইসব অঞ্চলে তামিল বণিকদের কর্মকাণ্ড বেড়ে যায়। মালদ্বীপ, সিংহল, মালয়, সুমাত্রা ও জাভা হয়ে তামিল বণিকরা ইন্দোচীন ও চীনে নিয়মিতভাবে বাণিজ্য করতে যেত। চোল সাম্রাজ্যের পতনের পরও তামিল বণিকদের বাণিজ্যিক কাজকর্ম চলতে থাকে। বাণিজ্যের পথ ধরে সিংহল, শ্রীবিজয় ও ইন্দোচীনের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ভারতের ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য ও শিল্প এই অঞ্চলের জীবন ও সংস্কৃতির ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই অঞ্চলের জীবন ও সংস্কৃতিতে ভারতীয় প্রভাব আজও অক্ষুণ্ণ আছে। জাভার বরবুদুর এবং কম্বোডিয়ার আঙ্করভাট আজও ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব বহন করে চলেছে। সর্দার কে. এম. পানিক্কর মনে করেন যে চোলদের স্বর্ণযুগে দক্ষিণ ভারত সমুদ্র পেরিয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়েছিল। একশ বছর ধরে নৌযুদ্ধ ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করে চোলরা যে নজির স্থাপন করেছিল উত্তরের সাম্রাজ্যিক ঐতিহ্যে তার তুলনা মেলে না (During the period of Chola greatness, South India looked across the sea for its political activities. A hundred years of overseas expansion and naval warfare by the Cholas are striking features of South Indian history which has no parallel even in the imperial traditions of North India.)।

চোল শাসন

দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে চোল রাজাদের শাসন ছিল একটি গৌরবময় অধ্যায়। দশম শতকের শেষদিকে চোল রাজারা ক্ষমতালাভ করেন এবং ত্রয়োদশ শতকের শেষপর্যন্ত তাঁদের শাসন চলেছিল। দক্ষিণ ভারতের জীবনধারা ও শাসনের ওপর চোল রাজাদের প্রভাব পড়েছিল। চোল রাজারা বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন, সাগর পেরিয়ে সিংহল, মালদ্বীপ, জাভা, মালয় ইত্যাদি জয় করে তাঁদের সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেন। চোল রাজারা শুধু সাম্রাজ্য স্থাপন করেননি, দক্ষ শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। পূর্ববর্তী ভারতীয় শাসকদের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য হলো দৃষ্টিভঙ্গি ও মেজাজের। আগেকার রাজারা ছিলেন সহজ, সরল, সাধারণ। বাইজান্টাইন শাসকদের মতো চোল রাজারা বিশাল প্রাসাদ, জাঁকজমকপূর্ণ রাজসভা, অগণিত কর্মচারী ও প্রথা-প্রকরণ নিয়ে গঠিত শাসনের প্রধান ছিলেন। শাসনের মধ্যে দিয়ে তাঁদের ঐশ্বর্য, ক্ষমতা ও সাম্রাজ্যের বিশালতার প্রকাশ ঘটেছিল। তাঞ্জোর, গঙ্গাইকোণ্ডচোলপুরম, মুণ্ডিকোণ্ডন ও কাঞ্চী ছিল তাঁদের রাজধানী শহর।

সঙ্গম যুগের মতো চোল রাজারা স্বৈরাচারী বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র স্থাপন করেন। প্রচণ্ড জাঁকজমকের মধ্যে রাজাদের অভিষেক হতো। সাধারণত রাজবংশের জ্যেষ্ঠপুত্র সিংহাসন লাভ করতেন, তবে সিংহাসন নিয়ে বিরোধ হতো, উত্তম চোল সিংহাসন লাভের আশায় দ্বিতীয় আদিত্যকে হত্যা করেন। রাজা ছিলেন চোল শাসনব্যবস্থার প্রধান। স্বৈরাচারী হলেও চোল রাজারা ছিলেন জনকল্যাণকামী। শাসন ব্যাপারে রাজা ছিলেন সর্বেসর্বা, রাজার আদেশ ছিল আইন। বিচারব্যবস্থার প্রধান ছিলেন রাজা, রাজার রাজসভা শেষ আপিল আদালত হিসেবে কাজ করত। গুরুত্বপূর্ণ বিচারের ক্ষেত্রে রাজার অনুমোদনের প্রয়োজন হতো। রাজা যুবরাজ মনোনীত করতেন, এর ফলে সিংহাসন নিয়ে সংঘর্ষের সম্ভাবনা কমে যেত। বিদেশে যুবরাজের নেতৃত্বে সামরিক অভিযান পাঠানো হত। রাজার অনুপস্থিতিতে যুবরাজ তাঁর হয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন, রাজা প্রয়োজনবোধ করলে যুবরাজকে শাসনের সঙ্গে যুক্ত করে নিতেন। চোল রাজারা তাঁদের লেখগুলিতে তাঁদের রাজত্বকালের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন। রাজার বিশাল প্রাসাদ ও আড়ম্বরপূর্ণ রাজসভা জনমনে সম্ভ্রম, ভয় ও বিস্ময় উদ্রেক করত। রাজা ও রানীদের মূর্তি মন্দিরে স্থাপন করা হতো, জনগণ দেবতাদের সঙ্গে তাঁদের সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করত।

অধ্যাপক নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী লিখেছেন যে, চোলরাজাদের শাসন চালুক্যদের চেয়ে অনেক বেশি কঠোর ও কেন্দ্রীভূত ছিল। রাজপুত্ররা বিভিন্ন প্রদেশের শাসক হিসেবে কাজ করতেন, সামন্ত শাসকদের ওপর রাজারা কঠোর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিলেন।

দ্বাদশ শতকের ভারত

সূত্র ঃ সতীশচন্দ্র, *মিডাইভ্যাল ইন্ডিয়া*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৪
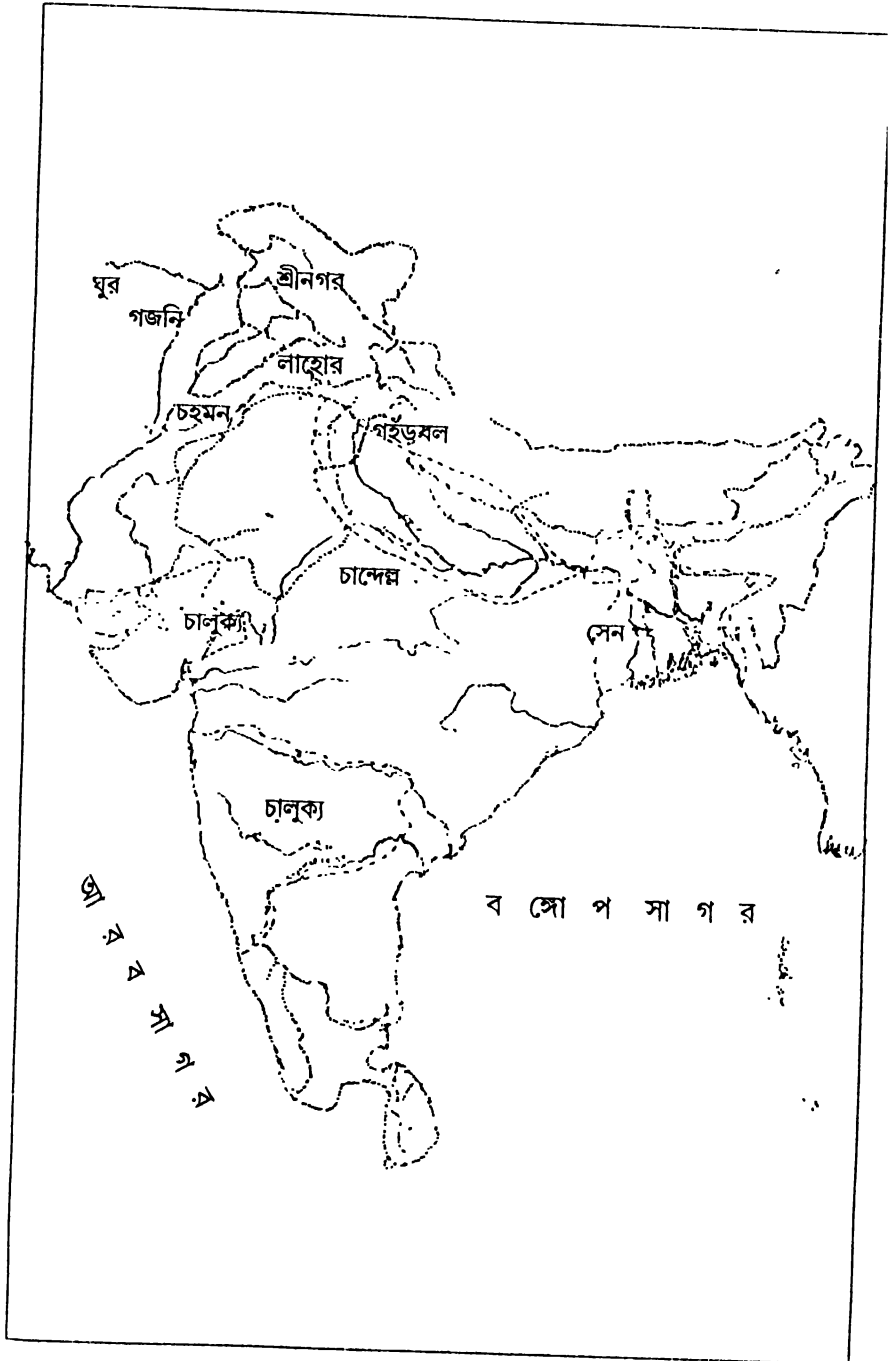
চোলদের উদান কুট্টম (Udan Kuttam) নামে কয়েকজন মন্ত্রী ছিলেন, বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধানরা ছিলেন, এরা শাসন ব্যাপারে রাজাকে পরামর্শ দিত। রাজধানীতে চোলদের একটি সচিবালয় (olai) ছিল। রাজার প্রাসাদ কর্মচারীরা ছিল একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী। রাজার অভিষেক গৃহ ও রন্ধনশালায় অধিকাংশ ছিল মহিলা কর্মচারী। চীনা লেখক চাওজুকুয়া চোল রাজাদের রাজসভার বিস্তৃত বর্ণনা রেখে গেছেন। নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী জানিয়েছেন যে, চোলদের একটি বিশাল জটিল আমলাতান্ত্রিক শাসন ছিল (The Chola administrative machinery was an elaborate and complicated bureaucracy comprising officials of various grades.)। রাজকর্মচারীরা সমাজে ছিল একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী, এরা দুভাগে বিভক্ত ছিল, উচ্চপদস্থ (Perudanam) এবং নিম্নপদস্থ (Sirudanam)।[৬] কর্মচারীরা ছিল বংশানুক্রমিক এবং সামরিক এবং বেসামরিক সব কাজ তাদের করতে হতো। কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের নিয়োগবিধি, পদোন্নতি ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না, বেতনের পরিবর্তে কর্মচারীদের ভূমিদান করা হতো।[৭] কর্মচারীদের কাজে সন্তুষ্ট হলে রাজা তাদের রাজকীয় উপাধিতে ভূষিত করতেন। লুণ্ঠিত দ্রব্যের একাংশ তাদের মধ্যে বণ্টন করা হতো।

শাসনের সুবিধার জন্য সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করা হয় (মণ্ডলম), প্রদেশগুলি বলনাডু, নাডু ও কুররমে বিভক্ত ছিল। কয়েকটি স্বয়ংশাসিত গ্রাম নিয়ে একটি কুররম গঠিত হতো। বড় বড় শহরগুলির স্বতন্ত্র প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল। রাজপুত্ররা বা সামন্তরাজারা প্রাদেশিক শাসক হিসেবে কাজ করতেন। এঁরা রাজার আদেশ যথাযথভাবে পালন করতেন, শাসন ব্যাপারে রাজাকে অবহিত রাখতেন। প্রাদেশিক শাসকের অধীনে অনেক রাজকর্মচারী থাকত। চোল রাজাদের আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভূমিরাজস্ব, জমি জরিপ করে রাজস্ব নির্ধারণ করা হতো। প্রথম রাজরাজ ও প্রথম কুলোতুঙ্গ জমি জরিপ করিয়েছিলেন। ব্যক্তি, সম্প্রদায় ও প্রতিষ্ঠান জমির মালিকানা ভোগ করত। প্রত্যেক গ্রামের রাজস্ব প্রদানকারী ও নিষ্কর জমির হিসেব তৈরি করা হতো। বাসগৃহ, মন্দির, সেচের খাল, পুষ্করিণী, কারিগর ও অন্ত্যজদের অঞ্চলে রাজস্ব ধার্য হতো না। জমির উর্বরতা ও উৎপন্ন শস্যের প্রকৃতি অনুযায়ী রাজস্ব ধার্যের ব্যবস্থা ছিল। উৎপন্ন শস্য ও প্রকৃতি অনুযায়ী জমির শ্রেণী বিভাজন হতো। সাধারণত উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব ধার্য হতো, নগদে বা শস্যে রাজস্ব দেওয়া যেত। সামন্তরাজারা রাজাকে কর এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যের একাংশ দিত। বাণিজ্য শুল্ক, ফেরি, পেশা, খনি, বন ও লবণের ওপর স্থাপিত কর থেকে

৬. এর অন্য দুটি রূপ হলো পেরুন্দরম ও সিরুতরম (Perundaram and Sirutaram)। রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত *স্ট্রাগল ফর এম্পায়ার,* পৃ. ২৫০।

৭. সমকালীন নথিপত্রে একে বলা হয়েছে 'জীবিত'।

রাজাদের আয় হতো। বেগার শ্রম প্রথা ছিল। মাঝে মাঝে দেশে দুর্ভিক্ষ হতো। ১১৫২ খ্রিস্টাব্দে একবার দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। রাজার প্রাসাদ, রাজসভা, সৈন্যবাহিনী, প্রশাসন, জনহিতকর কাজ, মন্দির ও ধর্মজ্ঞদের জন্য রাজার ব্যয় হতো। কর আদায়ের ক্ষেত্রে উৎপীড়ন ছিল, এসব ক্ষেত্রে জনগণ সংঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদ জানাত। কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হলে এধরনের ঘটনা বেশি ঘটতে থাকে।

নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর মতে চোল রাজাদের তিন ধরনের আদালত ছিল—রাজার আদালত, গ্রামীণ আদালত ও জাতি পঞ্চায়েত। বিচারব্যবস্থায় প্রথা, দলিল ও সাক্ষ্যের ওপর জোর দেওয়া হতো। পরীক্ষার মাধ্যমে (ordeal) অপরাধ ও অধিকার নির্ণয়ের ব্যবস্থা ছিল। রাজদ্রোহের মতো গুরুতর অপরাধের বিচার করতেন রাজা স্বয়ং। রাজদ্রোহীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো, তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হতো। সাধারণ অপরাধের শাস্তি ছিল জরিমানা ও জেল। চাওজুকুয়া জানাচ্ছেন যে অপরাধীকে বেত্রাঘাত করার প্রথা ছিল। গুরুতর অপরাধের জন্য ছিল মৃত্যুদণ্ড এবং হাতির পায়ের নীচে ফেলে মারার প্রথা। চোল রাজাদের বিশাল স্থলবাহিনী ও নৌবহর ছিল। সৈন্যবাহিনীতে ছিল তিনটি বিভাগ—হস্তী, অশ্বারোহী ও পদাতিক। স্থলবাহিনীতে মোট সত্তরটি রেজিমেন্ট ছিল, সৈন্যসংখ্যা হলো এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার, ষাট হাজার হাতি ছিল। সৈন্যবাহিনীতে শিক্ষাদান ও শৃঙ্খলারক্ষার ব্যবস্থা ছিল। নিয়মিত সৈন্য ছাড়া যুদ্ধের সময় সামন্তরা সৈন্যবাহিনী দিয়ে সাহায্য করত, প্রয়োজন হলে রাজার দেহরক্ষীরা সামরিক অভিযানে যোগ দিত। সৈন্যবাহিনীর প্রধান ছিলেন প্রধান সেনাপতি (মহাদণ্ডনায়ক), নায়করা তাঁকে সাহায্য করতেন। রাজা ছিলেন সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক, অনেকসময় রাজপুত্ররা সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দিতেন। চোলদের শক্তিশালী, দক্ষ নৌবহর ছিল। এই নৌবহর নিয়ে তাঁরা সমুদ্রপারে সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। মালাবার, করমণ্ডল ও বঙ্গোপসাগরে চোলদের অপ্রতিহত প্রাধান্য স্থাপিত হয়, ভারত মহাসাগর ছিল 'চোল হ্রদ'।

চোলদের স্বায়ত্তশাসন

চোল রাজাদের শাসনের সবচেয়ে উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য হল তাদের গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা। গ্রামগুলি ছিল স্বয়ংশাসিত, গ্রামের মনোনীত সদস্যরা গ্রাম শাসন করতেন, রাজ কর্মচারী শুধু উপদেষ্টা হিসেবে থাকতেন, পরামর্শ দিতেন, গ্রামীণ শাসনের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতেন না। চোল রাজাদের শাসনকালে তামিল অঞ্চলের মানুষজন যে ধরনের স্বায়ত্তশাসন ভোগ করত ভারতের ইতিহাসে তার নজির নেই। একমাত্র গুপ্তদের গ্রাম শাসনের সঙ্গে এর অনেকটা মিল আছে, তবে চোল আমলের স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা ছিল অনেকবেশি পরিণত। ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্রের মতো (little republic) গ্রামীণ

স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা শান্তি, স্থিতি ও সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছিল। স্বায়ত্তশাসনের ঐতিহ্য চোলদের আগে থেকে শুরু হয়েছিল, পাণ্ড্য ও পল্লবদের লেখগুলিতে স্বায়ত্তশাসনের কথা আছে। তবে সে শাসন চোলদের মতো এত বিস্তৃত ও পরিণত ছিল না (The most striking feature of the Chola period was the unusual vigour and efficiency that characterised the functioning of the autonomous rural institutions.)।

চোল রাজারা কেন্দ্রে আমলাতান্ত্রিক নিরঙ্কুশ স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ছিল প্রতিরক্ষা, অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি, বাকি সব কাজ করত গ্রামসভাগুলি। চোল রাজাদের কেন্দ্রীয় শাসন এই গ্রামভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের কোনো ক্ষতি করেনি। চোল রাজাদের কেন্দ্রীয় কর্মচারীরা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে নিয়ন্ত্রণ করত, হিসেব পরীক্ষা করত কিন্তু স্থানীয় স্বাধীনতা ও উদ্যোগের কোনো ক্ষতি করত না। স্বশাসিত গ্রাম হল স্বায়ত্ত শাসনব্যবস্থার ভিত্তি, কতকগুলি গ্রামের সমষ্টি হল কুররম, নাড়ু বা কোট্টম। বড় গ্রাম একাই একটি কুররম, কয়েকটি কুররম নিয়ে একটি বলনাড়ু গঠিত হত, বলনাড়ুর ওপরে ছিল মণ্ডলম বা প্রদেশ। চোলদের সাম্রাজ্যে চার ধরনের গ্রাম ছিল—সাধারণ মানুষজন নিয়ে ছিল পুরনো গ্রাম। সব জাতি ও শ্রেণীর মানুষ এসব গ্রামে বাস করত, এদের স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হল উর। চোল আমলে ব্রাহ্মণরা গ্রাম দান হিসেবে পেতেন, এই অগ্রহার গ্রামগুলিতে গঠন করা হত সভা বা মহাসভা। এই গ্রামগুলির অন্য নাম হল চতুর্বেদি মঙ্গলম অর্থাৎ বেদাঙ্গ ব্রাহ্মণরা হলেন এসব গ্রামের মালিক। এই দুই ধরনের গ্রাম ছাড়া আরো দু'ধরনের গ্রাম ছিল—একটি হল ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণদের নিয়ে গঠিত মিশ্র গ্রাম। এধরনের মিশ্র গ্রামে পাশাপাশি উর ও সভা থাকত। সত্তম মঙ্গলম গ্রামে দুটি উর ছিল, একটি হিন্দু বাসিন্দারের জন্য, অন্যটি জৈনদের। চতুর্থ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হল নগরম, গ্রামের বণিক ও ব্যবসায়ী অধ্যুষিত অংশে নগরম গঠিত হত, শহরেও নগরম ছিল। এরা বাণিজ্য সংস্থা ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করত। গ্রামে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে বাস করত, তাদের জন্য নির্দিষ্ট কুড়ুম্বু বা পাড়া ছিল, সূত্রধর, কর্মকার, স্বর্ণকার ইত্যাদি বৃত্তিজীবী মানুষরা এধরনের পাড়া ও গোষ্ঠী গঠন করত।

উত্তরমেরুর গ্রামের দুখানি লেখ থেকে উর ও সভার গঠন ও কার্যপদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রামের প্রাপ্তবয়স্করা উর বা সভা গঠন করত কিন্তু এগুলি পরিচালনা করত অনেকগুলি সমিতি। সমিতির সদস্য হতে হলে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির মালিকানা ও কর প্রদানের যোগ্যতা ছিল আবশ্যক। তিনি সেই গ্রামের বাসিন্দা হবেন এবং ৩৫-৭০ বৎসর বয়স্ক হবেন, জ্ঞানী ও চরিত্রবান হবেন। যিনি গত তিন বছরের মধ্যে সদস্য

ছিলেন এবং হিসেব দিতে পারেননি তিনি পরের সমিতিতে যোগ দিতে পারবেন না। অসৎ, ব্যভিচারী ও চৌর্যাপরাধে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি সমিতির সদস্যপদ পেতেন না। পাড়া বা কুড়ুম্বু থেকে ত্রিশজনকে গ্রামসভায় মনোনীত করা হতো, এদের মধ্য থেকে অনেকগুলি সমিতি গঠন করে সারাবছরের গ্রামের সব কাজ তদারকির দায়িত্ব দেওয়া হতো। লেখগুলি থেকে এই সমিতিগুলির নাম জানা যায়। এই সমিতিগুলির নাম হল বরিয়ম। বারো জন সদস্য নিয়ে সারাবছরের প্রশাসনিক কাজকর্ম দেখার জন্য সমিতি গঠিত হত। এরকম আরো সমিতি হল তোট্ট বরিয়ম বা উদ্যান সমিতি, এরি বরিয়ম বা পুষ্করিণী সমিতি, স্বর্ণ সমিতি ও স্থায়ী সমিতি। সমিতিগুলি ঠিক কীভাবে গঠিত হতো, এদের কার্যপদ্ধতি কেমন ছিল সব বিস্তৃতভাবে জানা যায় না। সমিতিগুলি ঢোল বাজিয়ে কোনো জলাশয়ের ধারে, মণ্ডপে বা মন্দির চত্বরে সমিতির অধিবেশন ডাকত, আলোচনার মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো, কোনো বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা হলে তাদের প্রতিনিধির বক্তব্য শোনা হতো। এই সমিতিগুলি জনকল্যাণমূলক অনেক কাজের সঙ্গে যুক্ত হতো। সরকারি রাজস্ব স্থাপন ও সংগ্রহের জন্য সমিতি দায়ী থাকত। গ্রামসভা রাজস্ব সংগ্রহ করে রাজকীয় কোষাগারে জমা দিত। গ্রামের সেচব্যবস্থা তদারকি করা ছিল সমিতির প্রধান কাজ। চাষের জলের ব্যবস্থা করা এবং সেই জলের বণ্টনের ব্যবস্থাও ছিল সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। গ্রামের জমির কোনো পরিবর্তন ঘটাতে হলে সমিতির সম্মতির প্রয়োজন হতো। সমিতি গ্রামের পতিত ও অরণ্য জমি উদ্ধারের সঙ্গে যুক্ত হতো। জমি জরিপ, উৎপন্ন ফসলের হিসেব বা রাজস্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে সভা রাজকর্মচারীদের সঙ্গে সহযোগিতা করত। জমি বা সেচ নিয়ে কোনো বিরোধ বাধলে সভা তার নিষ্পত্তি করত। এসবের বাইরেও পারিবারিক বিরোধে বিচারের অধিকার উর বা সভার ছিল। পথঘাট নির্মাণ, পুষ্করিণী খনন, মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষার বিস্তার, চিকিৎসা ব্যবস্থা পরিচালনা ইত্যাদির সঙ্গে সভা যুক্ত ছিল। স্থানীয় প্রয়োজন দেখা দিলে সভার কর ধার্যের অধিকার ছিল। বণিকদের সভা নগরম উর বা সভার মতো ছিল, কোনো কোনো স্থানে উর ও নগরম পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করত। নগরম পণ্য বেচা-কেনার কাজ করত, আবার স্বায়ত্তশাসনের কাজও চালাত।

চোলদের লেখগুলিতে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যপদ্ধতির পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় না। কোনো অধিবেশনে ন্যূনতম সদস্যের উপস্থিতি দাবি করা হতো না। কোনো বিষয়ে ভোট গ্রহণের রীতি ছিল না, সাধারণত সদস্যদের মনোনীত করা হতো। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তাদের সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী আলোচনায় অংশ নিতেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতার অভাব ছিল না। ব্রহ্মদেয় ও দেবদান কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতার প্রয়োজন হতো। চোলদের

লেখগুলি থেকে পণ্ডিতরা অনুমান করেছেন যে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ওপরে আরো একটি স্তর ছিল। এটি ছিল নাড়ু কেন্দ্রিক, এর নাম হল *নাত্তার*। গ্রামের উর, মহাসভা ও নগরমের প্রতিনিধিদের নিয়ে নাত্তার গঠিত হতো। এই নাত্তারগুলি বিচারের ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং রাজকর্মচারীদের সঙ্গে সহযোগিতা করত। জমির শ্রেণীবিন্যাস, ভূমিরাজস্ব নির্ধারণ, চিকিৎসালয়, দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপনে নাত্তার বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করত। চোলদের কোনো কোনো লেখতে লটারির উল্লেখ আছে, সম্ভাবত গ্রাম সমিতির পরিচালনায় লটারির সাহায্য নেওয়া হতো।

চোলদের লেখে দু'ধরনের গ্রামীণ কর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায়, এরা হলেন মধ্যস্থ ও করণত্তার। মধ্যস্থরা যে গ্রাম্য বিবাদের মীমাংসা করতেন তা নয়, সম্ভবত এরা গ্রামীণ রাজনীতিতে নিরপেক্ষ থাকতেন, এজন্য এদের মধ্যস্থ বলা হয়েছে। এরা সভা বা উরের অধিবেশনে উপস্থিত থাকতেন কিন্তু আলোচনায় অংশ নিতেন না। এদের কাজ ও বেতন সভাগুলি স্থির করে দিত। করণত্তার হলেন হিসেব পরীক্ষক, সম্ভবত তিনি গ্রামের জমি ও রাজস্বেরও হিসেব রাখতেন। গ্রামসভাগুলি দাতাদের যোগ্য স্বীকৃতি দিতেন, দানকার্যে উৎসাহ জোগাতেন। গ্রামসভাগুলি কাউকে হেয় বা অপাংক্তেয় মনে করতেন না। একজন বারাঙ্গনা মন্দির সংস্কারের প্রস্তাব দিলে তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করা হয়। একজন ব্রাহ্মণ দুর্গত ত্রাণের জন্য অর্থ দান করলে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তা লিপিবদ্ধ করা হয়।

তোণ্ডমণ্ডলম ও চোল মণ্ডলমের তামিল ভাষাভাষী অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত লেখগুলি পাওয়া গেছে। পণ্ডিতদের অনুমান এসব অঞ্চলের মানুষ সর্বাধিক স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ভোগ করত, ভারত ইতিহাসের আর কোনো পর্বে তা দেখা যায় না। এই ব্যবস্থার একটি ত্রুটির কথা পণ্ডিতরা উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত এই ব্যবস্থায় উচ্চবর্ণের শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মানুষরা বেশি উপকৃত হন, নিম্নবর্ণের মানুষজন এব্যবস্থায় প্রাধান্য স্থাপন করতে পারেনি যদিও তারা ছিল জনসংখ্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। অস্বীকার করা যায় না নিম্নবর্ণের মানুষরা ছিল কিছুটা অবহেলিত। চোলদের কেন্দ্রীভূত কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্র সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করে চলত, সামাজিক দ্বন্দ্ব ও হানাহানি তেমন ছিল না, ধনীরা অকাতরে দরিদ্রদের জন্য দান-ধ্যান করতেন। ধনীদের দানে দেবালয়, আশ্রম, মঠ, জলাশয়, শিক্ষায়তন, হাসপাতাল, দাতব্য প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি গড়ে উঠত। জনগণের শ্রমের ফসলের একাংশ যেত রাজা, অভিজাত ও মন্দিরের হাতে, সেবামূলক প্রকল্পের মাধ্যমে এর একাংশ জনগণের কাছে ফিরে যেত। নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী মনে করেন, 'এক বিস্ময়কর সামাজিক ঐক্যের' (wonderful social harmony) ওপর এ শাসন স্থাপিত হয়েছিল। সেখানে সাম্য ছিল বলা যাবে না, ধনী

ও নির্ধনের মধ্যে দেওয়া-নেওয়া ছিল, আদান-প্রদান ছিল, ছিল পারস্পরিক শুভেচ্ছা যা শিকড় পর্যন্ত পৌঁছেছিল।

চোল শিল্প—স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা

স্থাপত্য

চোল রাজাদের প্রায় চারশো বছরের শাসনকালে চোল স্থাপত্য দ্রাবিড় শৈলীকে সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল। প্রথম পর্বের চোল রাজাদের নির্মিত মন্দিরগুলি ছিল আয়তনে ছোট কিন্তু গঠন রীতিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই পর্বের চোল স্থাপত্যের ওপর পল্লব রীতির প্রভাব ছিল, তবে ধীরে ধীরে চোল শিল্পীরা এই প্রভাবমুক্ত হয়ে নিজস্ব ধারা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। পল্লবরীতির প্রভাব পড়েছিল স্তম্ভের গড়নে, গর্ভগৃহ ও বিমানের পরিকল্পনায়। পল্লবদের কাঞ্চীপুরমের মন্দিরগুলি থেকে চোল শিল্পীরা শৈলী ও আঙ্গিক পেলেও নিজেদের সৃজনশীলতায় এগুলিকে অনন্যতা দেন। এগুলি শুধু পল্লব শিল্পের অন্ধ অনুকরণ নয়, বিমান, গর্ভগৃহ ও বিমানের পরিকল্পনায় নতুনত্ব এসেছে। চোল শিল্পীরা সজীব ও প্রাণবন্ত শিল্প সৃষ্টিতে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। প্রথম চোল সম্রাট বিজয়ালয় নির্মাণ করেন চোলেশ্বর মন্দির, করঙ্গনাথের মন্দিরটির নির্মাতা হলেন প্রথম পরন্তক। এদুটি ছাড়াও কোরকৈর শিবমন্দির, কুম্ভকোনমের নাগেশ্বর মন্দির, কন্ননুরের বাল সুব্রাহ্মণ্য মন্দির এবং তিরকট্টলের সুন্দরেশ্বর মন্দির হলো চোল স্থাপত্য শিল্পের প্রথম পর্বের বিশিষ্ট অবদান। বিজয়ালয় যে মন্দিরটি নির্মাণ করেন তা বৃত্তাকার, এর স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ, তলযুক্ত বিমান শিখর এবং শীর্ষস্থ স্তূপিকা নেওয়া হয়েছে পল্লব ঐতিহ্য থেকে। এই মন্দিরে রয়েছে একটি উপাসনা গৃহ এবং তৎসংলগ্ন মণ্ডপ। আধিক্য বর্জিত এই মন্দিরটি আয়তনে বেশ ছোট, পল্লব ঐতিহ্যের অনুকরণ। কোরকৈর শিবমন্দির নির্মিত হয় প্রথম কুলোতুঙ্গের রাজত্বকালে, এটি খুবই ছোট, গর্ভগৃহ ও ছোট মণ্ডপ নিয়ে মন্দির। প্রথম আদিত্য নির্মাণ করেন কন্ননুরের বাল সুব্রাহ্মণ্য মন্দির, এর গর্ভগৃহ বর্গক্ষেত্রাকার। মন্দিরের শীর্ষদেশে স্তূপিকা হয়েছে, রয়েছে দেবতাদের মূর্তি। তিরুকট্টলের সুন্দরেশ্বর মন্দিরের বৈশিষ্ট্য হল এখানে চোল শিল্পীরা পল্লব প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে নিজস্ব ধারা গড়ে তুলেছেন। তাদের মনস্বিতা ও মৌলিকতার স্বাক্ষর ধরা পড়েছে। প্রথম পরন্তকের আমলে নির্মিত কোরঙ্গনাথ মন্দির এই পর্বের চোল স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে গণ্য হতে পারে। পল্লব শৈলীর প্রভাব থাকলেও এই মন্দিরের পরিকল্পনায় চোল শিল্পীরা মৌলিক প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। এর গর্ভগৃহ ও মণ্ডপের বিন্যাসেও অলংকরণে চোল স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য বিধৃত হয়ে আছে।

চোল রাজবংশের দুজন শ্রেষ্ঠ শাসক হলেন রাজরাজ ও তার পুত্র রাজেন্দ্র। এই পর্বে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটে, নৌসাম্রাজ্য গড়ে ওঠে, সম্পদের অভাব ছিল না। চোল রাজাদের শিল্পপ্রীতির অভাব ছিল না, নান্দনিকবোধ ছিল, শিল্পের জন্য সম্পদের ব্যবহারে কুণ্ঠা ছিল না। প্রথর রাজরাজ রাজধানী তাঞ্জোরে স্থাপন করেন রাজরাজেশ্বর মন্দির, এই মন্দিরটির অন্য নাম হল বৃহদীশ্বর। এই মন্দিরটিকে বলা হয় চোলদের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি, এর আয়তন হল বিশাল, এটি দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলির মধ্যে বৃহত্তম ও উচ্চতম। এই মন্দিরে রয়েছে একটি বিমান, অর্ধমণ্ডপ, মহামণ্ডপ এবং বৃহৎ নন্দী চত্বর, সবটাই প্রাচীরবেষ্টিত। মন্দির প্রাঙ্গণে অনেক ক্ষুদ্র মন্দির রয়েছে, রয়েছে গোপুরম। রাজপ্রাসাদের আদলে মন্দিরের পরিকল্পনা করা হয়। মন্দিরের শিখর বা বিমান ২০০ ফুট উঁচু, এত উচ্চ শিখর আর কোনো মন্দিরে নেই। মন্দিরটির গঠন শৈলীতে রয়েছে সামঞ্জস্য, কোথাও কোনো বিচ্যুতি নেই, অলংকরণও রুচিসম্মত। ছন্দোময়, সমভার, দীর্ঘতম এই মন্দিরটিকে বলা হয় দ্রাবিড় স্থাপত্য রীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

পুত্র রাজেন্দ্র পিতার অনুকরণে তার নতুন রাজধানী গঙ্গাইকোণ্ডচোলপুরমে একটি বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করেন। এটিও বৃহদীশ্বর নামে পরিচিত লাভ করে। এটি আয়তনে বিশাল, গঠনশৈলীতে জটিল, সম্ভবত পুত্র পিতাকে অতিক্রম করে মহান কীর্তি স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। প্রাচীরবেষ্টিত এক বৃহৎ প্রাঙ্গণের মধ্যে এটি স্থাপিত। এই মন্দিরে রয়েছে প্রকাণ্ড বিমান ও মণ্ডপ। এই দুই বিশাল মন্দিরের বিশালতা ও মেজাজে পার্থক্য রয়েছে, প্রথমটায় রয়েছে পুরষোচিত বলিষ্ঠতা, দ্বিতীয়টিতে রয়েছে নারীসুলভ কমনীয়তা। গঠন পরিকল্পনা ও শৈলীতে এই বৈসাদৃশ্য ধরা পড়েছে। প্রথমটিতে রয়েছে মহাকাব্যসুলভ গাম্ভীর্য, দ্বিতীয়টিতে পাওয়া যায় গীতিকবিতার লালিত্য, প্রথমটি হল শক্তির প্রকাশ, দ্বিতীয়টি প্রকাশ করছে এর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য। বিমান, গর্ভগৃহ ও অলংকরণে এই পার্থক্য ধরা পড়েছে।

রাজেন্দ্র চোলের মৃত্যুর পর চোল সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগের অবসান ঘটে, তার সাম্রাজ্যিক গৌরব আগের মতো ছিল না, স্থাপত্য শিল্পেও তার প্রভাব পড়েছিল। পরবর্তীকালের চোল রাজারা অনেকগুলি মন্দির নির্মাণ করেন, কিন্তু এদের বেশিরভাগ ছিল সাধারণ মানের। তাঞ্জোরের ঐরাবতেশ্বর বা রাজরাজেশ্বর মন্দির এই স্থাপত্যের এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই পর্বের স্থাপত্য শিল্পে দুটি প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। একটি হল মন্দিরের অলংকরণে আতিশয্য লক্ষ করা যায়, অপরটি হল গোপুরমের আতিশয্যে মূল মন্দির আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। মন্দিরগুলির বিমান বা শিখর খুব উচ্চ নয়, কিন্তু ভাস্কর্যের আতিশয্য পরিলক্ষিত হয়। ছোট মন্দিরে বেশি ভাস্কর্য ও অলংকরণ শিল্পের দাবিকে ক্ষুণ্ণ করে। তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গ এধরনের একটি মন্দির নির্মাণ করেন। মন্দিরটির নাম হল ত্রিভুবন বীরেশ্বর। গোপুরমের প্রতি বেশি দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে, তাদের

সংখ্যা ও আয়তন বেড়েছে, বেড়েছে অলংকরণ। মূল মন্দিরকে ছাড়িয়ে গোপুরম প্রাধান্য লাভ করেছে।

ভাস্কর্য

চোল রাজাদের শাসনকালে ভাস্কর্যের প্রভূত উন্নতি ঘটে। স্থাপত্য শিল্পের মতো ভাস্কর্য ও দ্রাবিড় রীতির চরমোৎকর্ষের যুগের সূচনা করে। মন্দির গাত্রে, হলঘরে, বড় অট্টালিকায় পাথরে ও ধাতুতে নির্মিত অসংখ্য ভাস্কর্য ছড়িয়ে আছে। করঙ্গনাথ মন্দির, তাঞ্জোর ও গঙ্গাইকোণ্ডচোলপুরম মন্দির, দরশুরমের ঐরাবতেশ্বর মন্দির ও অন্যান্য অট্টালিকায় এইসব ভাস্কর্যের সাক্ষাৎ মেলে। চোল রাজারা স্থপতিদের মতো ভাস্করদেরও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। চোল ভাস্কর্যের ওপর পল্লব ঐতিহ্যের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু চোল শিল্পীরা তা অল্প সময়ে অতিক্রম করে নিজেদের ধ্যানধারণা অনুযায়ী উন্নতমানের শিল্প সৃষ্টি করেছিলেন। চোল ভাস্কররা গড়েছেন পাথরের দেব-দেবী মূর্তি, পুরুষ ও নারী মূর্তি, শৈব নয়নার ও বৈষ্ণব সন্তদের মূর্তি। রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী নিয়ে ভাস্কর্য তৈরি হয়েছে। পশু, পাখি, প্রকৃতিকে ও ভাস্কর্যে স্থান করে দেওয়া হয়েছে। চোলযুগের দেবদেবীর মূর্তি, রাজা-রানীর মূর্তি বা সাধারণ মানুষের মূর্তিগুলি বেশ স্বাভাবিক। নরনারীর পোশাক ও অলংকরণে বাহুল্য নেই, সর্বত্র পরিমিতিবোধ ও সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয়েছে। কুম্ভকোণমের নাগেশ্বর মন্দিরে যেসব নর-নারীর মূর্তি আছে সেগুলি উন্নতমানের। এই মন্দিরে শিবের একটি অর্ধ-নারীশ্বর মূর্তি পাওয়া যায়। চোল রাজারা শুধু শৈব ছিলেন বলে শিবের মূর্তি বেশি একথা বলা ঠিক নয়। এযুগে দক্ষিণ ভারতে শৈবধর্ম প্রভাব বিস্তার করেছিল। জৈন ও বৌদ্ধ কিছু মূর্তিও এযুগে শিল্পরূপ পেয়েছিল। বিষ্ণু, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মূর্তিও মন্দির গাত্রে স্থান পেয়েছিল। দেব-দেবীর মূর্তির উপস্থাপনে চোল শিল্পী নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, তারা রস সৃষ্টি করেছেন, দর্শক আনন্দ পেয়েছে।

চোল আমলের ভাস্কর্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান হল ধাতু মূর্তিগুলি। বেশিরভাগ অষ্টধাতুর মূর্তি, ব্রোঞ্জের মূর্তিগুলিতে শিল্পী তার নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। ধাতু গলিয়ে বিভিন্ন ধাতু মিশিয়ে (সোনা, রুপো, তামা, সীসা, লোহা ইত্যাদি) ধাতু মূর্তি তৈরির ঐতিহ্য তৈরি হয়েছিল। এই মূর্তিগুলি কোনোটি পূর্ণগর্ভ, কোনোটি শূন্যগর্ভ, অর্ধশূন্যগর্ভ মূর্তিও তৈরি হয়। এপর্বে যেসব মূর্তি তৈরি হয়েছে তাদের বেশিরভাগ শিবমূর্তি। দক্ষিণ ভারতে নানাকাজে এই মূর্তিগুলি ব্যবহার করা হতো, মন্দিরে মূর্তি স্থাপন করা হতো। মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা হত অথবা অনুষ্ঠানে মূর্তি স্থাপন করে পুজো করা হতো। এইসব মূর্তিতে শিবের বিশেষ রূপগুলিকে মূর্ত করে তোলা হয়েছে। শিব কখনো কল্যাণসুন্দর বৃষবাহন, আবার কখনো নটরাজ। সবচেয়ে বিখ্যাত হলো শিবের নটরাজ মূর্তিটি, সারা

বিশ্বের শিল্পরসিকরা এই মূর্তির প্রশংসা করেছেন। এই মূর্তির গড়নে ভারতীয় ঐতিহ্য ও দর্শনের প্রতিফলন ঘটেছে। শিব সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার নিয়ে ব্যস্ত, নৃত্যের তালে তালে শিব তার কাজ করে চলেছেন, বাইরে অস্থিরতা, ভিতরে প্রশান্তি। ভারতীয় দর্শনের মূল বিষয়টি এই মূর্তিতে ধরা পড়েছে। এছাড়া পাওয়া গেছে স্কন্দমূর্তি, বিষ্ণুমূর্তি ও লক্ষ্মীমূর্তি, রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার ধাতু মূর্তিও তৈরি হয়েছিল। ধাতু দিয়ে মূর্তিগুলি তৈরি হলেও এদের শিল্প সুষমা ও লাবণ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

চিত্রকলা

চোল যুগে চিত্রকররা অনেক মূল্যবান চিত্র এঁকেছেন। এগুলি আছে বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে, মন্দিরের ছাদে ও অট্টালিকার গায়ে। বৃহদীশ্বর মন্দিরগাত্রে এধরনের অনেক ছবি আছে। মন্দিরগাত্রে রঙ চড়িয়ে ছবি আঁকা হতো, চিত্রকর বহু ধরনের রঙ ব্যবহার করেছেন, সেযুগে পরিচিত সব রঙ এই চিত্রগুলিতে পাওয়া যায়। চিত্রের বিষয় হলো আধ্যাত্মিকতা—শিবের চিত্র আঁকা হয়েছে, রয়েছে অপ্সর ও অপ্সরা। ছবির প্রয়োজনে মহিলাদের চিত্র আঁকা হয়েছে। নটরাজের একটি বিশাল প্রতিমূর্তি আঁকা হয়, সেখানে মহিলাদের পাওয়া যায়। রাজা রাজরাজের একটি প্রতিমূর্তি দেওয়ালগাত্রে পাওয়া যায়, রাজার সঙ্গে তাঁর রানীরাও রয়েছেন। চিত্রগুলি সজীব, প্রাণবন্ত, গতিময়। তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে চোল শাসনের শেষ পর্বে চিত্রশিল্পের সজীবতা নষ্ট হয়েছে, এসেছে গতিহীনতা ও নির্জীবতা।

চোল যুগ দক্ষিণ ভারতের শিল্প ও সংস্কৃতির ইতিহাসে গৌরবময় যুগ সৃষ্টি করেছে। দ্রাবিড় শিল্পরীতি তার শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করেছে। চোল রাজারা বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন, তাঁদের শিল্পরীতির প্রভাব পড়েছে তাঁদের অধীনস্থ সাম্রাজ্যের ওপর। এই প্রভাব হল দীর্ঘস্থায়ী ও সুদূরপ্রসারী। এযুগের স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা আশ্চর্য সব শিল্প সৃষ্টি করেছে যা আজও বিস্ময়ের উদ্রেক করে থাকে। ভারতীয় শিল্পের ওপর এর গভীর ও স্থায়ী প্রভাব পড়ে।

চান্দেল্ল ও সেন রাজবংশ

চান্দেল্ল

একাদশ শতকের গোড়ার দিকে বর্তমান মধ্যপ্রদেশে শক্তিশালী চান্দেল্ল রাজারা রাজত্ব করতেন, এঁদের রাজধানী ছিল কালিঞ্জর। এঁদের রাজ্যের মধ্যে ছিল ভীলসা, মাও (ঝাঁসি জেলার একাংশ), অজয়গড়, খাজুরাহো, ছাত্তারপুর, মাহোবা ও কালিঞ্জর। চান্দেল্ল বংশীয় রাজা ধঙ্গ এই রাজবংশের সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধি করেন। সেই যুগের রাজবংশগুলির মধ্যে চান্দেল্ল বংশ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

ধঙ্গের পৌত্র বিদ্যাধর ছিলেন এই বংশের একজন শক্তিশালী শাসক। তাঁর সঙ্গে প্রতিহারদের বিরোধ ছিল, চান্দেল্লদের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রতিহারদের রাজা রাজ্যপাল নিহত হন। এই পর্বে ভারতে তুর্কি আক্রমণ শুরু হয়েছিল। তুর্কিদের বাধাদানের মতো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভারতীয় রাজারা গড়ে তুলতে পারেননি। গজনির মামুদ দুবার (১০১৯, ১০২২) কালিঞ্জর আক্রমণ করেন কিন্তু শহর লুঠ করতে পারেননি। চান্দেল্ল রাজা বিদ্যাধরের কাছ থেকে তিনি বেশ কিছু অর্থ আদায় করে সন্তুষ্ট থাকেন। সম্ভবত তিনি বিদ্যাধরের সঙ্গে কূটনৈতিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন।

মধ্য ভারতের কলচুরি ও পরমাররা ছিল চান্দেল্লদের প্রতিদ্বন্দ্বী, এদের মধ্যে সম্প্রসারণের প্রশ্ন নিয়ে প্রায়ই বিরোধ দেখা দিত। বিদ্যাধর পরমার শাসক ভোজ ও কলচুরি শাসক চন্দ্রের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হন। কলচুরিরা সেই সময় ত্রিপুরিতে রাজত্ব করত। বিদ্যাধর এদের সঙ্গে সংঘর্ষে জয়ী হন। বিদ্যাধরের পুত্র বিজয়পাল কলচুরিদের সঙ্গে বিরোধ চালিয়ে যান। কলচুরি শাসক গাঙ্গেয়দেবকে যুদ্ধে পরাস্ত করে চান্দেল্লদের তিনি মধ্যপ্রদেশে প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলেছিলেন। বিজয়পালের পুত্র দেবেন্দ্রবর্মন একাদশ শতকের মধ্যভাগে রাজত্ব করতেন। তাঁর ভ্রাতা কীর্তিবর্মনের রাজত্বকালে কলচুরিদের সঙ্গে সংঘর্ষ আবার শুরু হয়েছিল। চান্দেল্ল রাজাকে পরাস্ত করে কলচুরিরা চান্দেল্লদের রাজ্য অধিকার করে নিয়েছিল। কলচুরিদের এই বিজয় অভিযানের নেতৃত্ব দেন কলচুরিরাজ কর্ণ। চান্দেল্লদের সামন্তরাজা গোপাল কলচুরিদের হাত থেকে চান্দেল্লদের রাজ্য উদ্ধার করেন। একাদশ শতকের শেষদিকে পাঞ্জাব প্রদেশের গজনির শাসনকর্তা কালিঞ্জর আক্রমণ করেছিলেন। কীর্তিবর্মন এই আক্রমণ প্রতিহত করে তাঁর রাজ্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। কীর্তিবর্মনকে সমকালীন লেখতে পিট শৈলের অধিশ্বর বলা হয়েছে। এখানে তিনি অল্প কিছুকাল ছিলেন, কলচুরিদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়েছিল, কলচুরি সেনাপতি ভাপুল্লককে তিনি পরাস্ত করেন। তাঁর মন্ত্রী বৎসরাজ কলচুরিদের কাছ থেকে মণ্ডল দখল করে নিয়ে কীর্তিগিরি নামে দুর্গ নির্মাণ করেন। এটি হলো ঝাঁসি জেলার দেওগড় অঞ্চলে, এখানে কীর্তিবর্মনের লেখ পাওয়া গেছে। কীর্তিবর্মন বেশ শক্তিশালী ও সম্পদশালী রাজা ছিলেন কারণ তাঁর প্রবর্তিত অনেকগুলি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে।

কীর্তিবর্মনের পরবর্তী রাজা হলেন তাঁর পুত্র শল্যক্ষণবর্মন। তাঁর শাসনকালে পরমারদের সঙ্গে চান্দেল্লদের বিরোধ চলেছিল, পরমার নরবর্মণকে পরাস্ত করে তিনি মালব লুঠ করেন। তিনি সম্ভবত কলচুরি রাজা যশোবর্মনকে পরাস্ত করেন। শল্যক্ষণবর্মনের রাজত্বকালে চান্দেল্ল রাজ্যে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ চলেছিল। সামন্তরাজারা গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী অন্তর্বেদি অঞ্চলে বিদ্রোহ করেছিল। এই সামন্তরাজারা গহড়বলদের উৎসাহ পেয়েছিল, সম্ভবত এদের ওপর গহড়বলদের প্রভাব ছিল। শল্যক্ষণবর্মন এদের পরাস্ত

করে চান্দেল্লদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। শল্যক্ষণবর্মনের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য চান্দেল্ল শাসক হলেন পৃথ্বিবর্মন। পৃথ্বিবর্মন ও মদনবর্মন দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে কালিঞ্জরে রাজত্ব করতেন। মদনবর্মনের লেখ থেকে জানা যায় যে তিনি পরমার যশোবর্মনকে পরাস্ত করে ভীলসা অধিকার করে নেন। গহড়বলদের রাজা গোবিন্দচন্দ্র সম্ভবত ভীলসা অঞ্চল পুনরায় জয় করেছিলেন। তিনি একটি লেখতে দশার্ণ (ভীলসা) জয় করেছিলেন বলে দাবি করেছেন। মদনবর্মন একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে কলচুরি রাজা গয়াকর্ণকে পরাস্ত করেন। গুজরাটের চালুক্য রাজা জয়সিংহ ধর জয় করে মাহোবা আক্রমণ করেছিলেন। মদনবর্মন এই আক্রমণ প্রতিহত করেন। চালুক্যরাজা রাজধানী অধিকার করতে পারেননি, তবে তিনি ভীলসা অধিকার করে নেন।

মদনবর্মনের পরবর্তী চান্দেল্ল শাসক হলেন পরমারদি। দ্বাদশ শতকের শেষদিকে তিনি শাসন ক্ষমতায় ছিলেন, তিনি তাঁর রাজ্য সীমা বহুবছর যাবৎ অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। তিনি 'দশার্ণের অধীশ্বর' (the Lord of Dasarna) বলে নিজেকে দাবি করেছেন। সম্ভবত তিনি গুজরাটের চালুক্যদের হাত থেকে ভীলসা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। চান্দেল্ল রাজংবশের বিপর্যয় দেখা দিল যখন আজমীরের তৃতীয় পৃথ্বিরাজ চৌহান (চহমন) এই রাজ্যটি আক্রমণ করেন। তিনি চান্দেল্ল রাজা পরমারদিকে পরাস্ত করে জেজকভুক্তি-মণ্ডল জয় করেছিলেন। এটি ছিল চান্দেল্ল রাজ্যের কেন্দ্রস্থিত অঞ্চল। ১২০২ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ ঘুরির অনুচর কুতুবুদ্দিন আইবক কালিঞ্জর অবরোধ করেন। কয়েকদিন লড়াইয়ের পর কুতুবুদ্দিনের সঙ্গে চান্দেল্ল রাজা পরমারদির একটি চুক্তি হয়। চান্দেল্ল রাজা বার্ষিক কর ও হাতি উপঢৌকন দিতে রাজী হন। পরমারদির মন্ত্রী অজয়দেব রাজার নীতির সঙ্গে একমত হতে পারেননি, তিনি পরমারদিকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করেন এবং তুর্কিদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করেন। বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেও জলাভাবে তিনি দুর্গ রক্ষা করতে পারেননি। কুতুবুদ্দিন কালিঞ্জর লুঠ করে মাহোবা অধিকার করে নেন, হাজবারউদ্দিন হাসান আরনাল কালিঞ্জরের গভর্নর নিযুক্ত হন।

তুর্কিরা কালিঞ্জর দীর্ঘকাল নিজেদের অধিকারে রাখতে পারেনি। পরমারদির পুত্র ত্রৈলোক্যমল্ল (ত্রৈলোক্যবর্মন) তুর্কিদের পরাস্ত করে তুর্কিদের অধীনস্থ সব অঞ্চল পুনরুদ্ধার করেন। রাজধানী কালিঞ্জর বিদেশী শাসন মুক্ত হয়। ত্রয়োদশ শতকের প্রথমদিককার চান্দেল্ল লেখগুলি থেকে জানা যায় যে ললিতপুর, ছাত্তারপুর, পান্না, অজয়গড় ও বেরা (বুন্দেলখণ্ড) তাঁর রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। কলচুরি বিজয়সিংহের কাছ থেকে তিনি সমগ্র দহলমণ্ডল অধিকার করে নেন। হাম্মির বর্মনের সময়ে এই অঞ্চল চান্দেল্ল রাজ্যভুক্ত ছিল। কলচুরিদের কাকোরির সামন্তরাজা কলচুরিদের সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করে চান্দেল্লদের অধীনে নিজেকে স্থাপন করেন। চান্দেল্ল রাজবংশের ওপর

অল্পকালের জন্য দুর্যোগ নেমে এসেছিল। ভজুক (Bhojuka) নামে এক ব্যক্তি আকস্মিকভাবে আক্রমণ চালিয়ে ত্রৈলোক্যবর্মনকে বিপর্যস্ত করেন। চান্দেল্ল রাজার অজয়গড় দুর্গের অধিপতি তাঁকে এই বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেন। এই সামরিক অফিসার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে শান্তিস্থাপন করেন। ভীল, শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি উপজাতির লোকেরা চান্দেল্ল রাজ্যে অশান্তি ও উপদ্রব সৃষ্টি করেছিল, ত্রৈলোক্যবর্মন এদের দমন করে রাজ্যের মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন।

সুলতান ইলতুৎমিসের সেনাপতি মালিক নসরতউদ্দিন তায়াসি কালিঞ্জর আক্রমণ করে প্রচুর ধনরত্ন অধিকার করেন। তিনি এই রাজ্যের শহরগুলি লুঠ করে সম্পদ সংগ্রহ করেন, তবে চান্দেল্ল রাজ্যের কোনো অঞ্চল তিনি অধিকার করেননি। চান্দেল্লদের শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা হলেন বীরবর্মন, তিনি ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রাজত্ব করেন। বীরবর্মনের অনেকগুলি লেখ পাওয়া গেছে। লেখগুলি থেকে জানা যায় যে, বীরবর্মন চান্দেল্ল রাজ্য অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। তাঁর সেনাপতি মল্লয় গোয়ালিয়র, নলপুর ও মথুরার রাজাদের পরাস্ত করেন। তাঁর সামন্তরাজা সিন্ধুতীরে কানহারগড়ের যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। হাম্মির বর্মনের লেখ থেকে জানা যায় এই রাজবংশের রাজারা শাহি উপাধি নেন। দামো ও জব্বলপুর জেলা চান্দেল্ল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, সম্ভবত ১৩০৯ খ্রিস্টাব্দে আলাউদ্দিন খল্‌জি হাম্মির বর্মনের কাছ থেকে দামো জেলাটি অধিকার করে নেন। এই বংশের শেষ যে রাজার নাম পাওয়া যায় তা হলো দ্বিতীয় বীরবর্মন (১৩১৫ খ্রিস্টাব্দ), দ্বিতীয় বীরবর্মনের উত্তরাধিকারীদের কথা কিছু জানা যায় না।

সেন রাজবংশ

বাংলার সেন বংশীয় রাজারা নিজেদের কর্ণাটক ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দেন। তাঁরা আরো দাবি করেন যে, বীরসেন থেকে তাঁদের বংশের উৎপত্তি হয়েছে। বীরসেন ঐতিহাসিক ব্যক্তি নন, সেনদের বংশলতিকায় তাঁকে দাক্ষিণাপথের রাজা বলা হয়েছে। দক্ষিণ ভারতের কানাড়িভাষী অঞ্চল ছিল সেনদের আদি বাসভূমি। দক্ষিণাপথ থেকে সেনরা কীভাবে বাংলায় এসেছিলেন সে সম্পর্কেও নিশ্চিত করে কিছু জানা যায় না। পালরাজাদের লেখগুলি থেকে জানা যায় যে, তাঁরা বিদেশীদের তাঁদের প্রশাসনিক ও সামরিক কাজে নিযুক্ত করতেন। এদের মধ্যে কর্ণাটকের লোকেরাও ছিল। এমন হতে পারে সেন রাজাদের পূর্বপুরুষদের কেউ পাল রাজাদের অধীনে চাকরি করতেন। পরবর্তী প্রজন্মের সেনরা ক্ষমতালাভ করে রাঢ় অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। সেনদের বাংলায় আগমনের আরো একটি সম্ভাব্য কারণ হলো চালুক্য রাজাদের সামরিক অভিযানকালে তাঁরা বাংলায় এসেছিলেন এবং এখানে স্থায়ীভাবে রয়ে যান।

সেন রাজবংশের প্রথম রাজা হলেন সামন্তসেন। সেনদের বংশলতিকায় বলা হয়েছে যে রাঢ়ের এক রাজপরিবারে সামন্তসেনের জন্ম হয়। সামন্তসেন চালুক্যদের সঙ্গে যোগ দিয়ে দক্ষিণে চোলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। অন্য একটি মত হলো চোলরাজা রাজেন্দ্র চালুক্য ও অন্যান্যদের পরাস্ত করে বাংলাদেশ আক্রমণ করলে সামন্তসেন তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। পরিণত বয়সে সামন্তসেন ধর্মাচরণে মন দেন, গঙ্গার তীরবর্তী তীর্থস্থানগুলি তিনি পরিদর্শন করেন। রাজকীয় উপাধি তিনি ধারণ করেছিলেন বলে জানা যায় না তবে রাঢ় অঞ্চলে যে তিনি শাসক ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। সামন্তসেনের পর তাঁর পুত্র হেমন্তসেন রাজা হন, তিনি মহারাজাধিরাজ উপাধি নেন। কলচুরি রাজা কর্ণ রাঢ় অঞ্চল আক্রমণ করলে রাজনৈতিক অশান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। হেমন্তসেন তার সুযোগ নিয়ে রাঢ় অঞ্চলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেনদের লেখতে তাঁকে 'রাজাদের কুশলী রক্ষাকর্তা' (Skilful Protector of kings) বলা হয়েছে। সম্ভবত পাল রাজবংশে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হলে তিনি শূরপাল ও রামপালকে আশ্রয় দিয়েছিলেন।

সেন রাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা হলেন বিজয়সেন (১০৯৫-১১৫৮)। তিনি শূর বংশীয় রাজকন্যা বিলাসদেবীকে বিবাহ করেন। তিনি হলেন পরবর্তী সেন রাজা বল্লালসেনের মাতা। রামপালের মৃত্যুর পর পাল সাম্রাজ্যে ভাঙন দেখা দিয়েছিল। বিজয়সেন তার সুযোগ নিয়ে সমগ্র বাংলাদেশে জয় করার পরিকল্পনা করেন। তিনি কলিঙ্গরাজ অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে নিজের অবস্থানকে শক্তিশালী করেন। রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হলে তিনি পার্শ্ববর্তী রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন, কিন্তু তিনি তাদের সকলকে পরাস্ত করতে সক্ষম হন। রামপালের দুই সামন্তরাজা বীর ও বর্ধনকে তিনি পরাস্ত করেন। গঙ্গা বরাবর পশ্চিমদিকে অগ্রসর হয়ে তিনি কনৌজের গহড়বল বংশীয় রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে পরাস্ত করেন। এই সময়ে মিথিলা আক্রমণ করে সেখানকার শাসক নান্যদেবকে পরাজিত করেন। দ্বাদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে বিক্রমপুরের ভোজবর্মনকে পরাস্ত করে তিনি পূর্ববঙ্গ অধিকার করেন। বরেন্দ্রিতে পালরাজা মদনপাল শাসন করতেন, মদনপালকে পরাস্ত করে তিনি বারেন্দ্রি অধিকার করেছিলেন।

বিজয়সেনের দেওপাড়া, বারাকপুর ও পাইকোর লেখতে বলা হয়েছে যে তিনি গৌড় বঙ্গ ও রাঢ় এই তিন অঞ্চলের ওপর অধিকার স্থাপন করেছিলেন। দক্ষিণে খাড়িমণ্ডল (২৪ পরগণা) তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল। কামরূপ আক্রমণ করে বিজয়সেন রাজাকে বিতাড়িত করেন, কিন্তু তিনি ঐ রাজ্যের ওপর অধিকার স্থাপন করতে পারেননি। কলিঙ্গরাজ অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গের মৃত্যুর পর বিজয়সেন ঐ রাজ্যে হস্তক্ষেপ করেন, অনন্তবর্মনের পুত্র রাঘবকে তিনি পরাস্ত করেন। বিজয়সেন বাংলায় একটি শক্তিশালী

রাজ্য স্থাপন করেন, পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির ওপর প্রভাব বিস্তার করেন। রাজ্য বিস্তারের কাজ শেষ করে তিনি উপাধি নেন 'অরিরাজ-বৃষভ-শংকর' এবং রাজশাহী জেলায় প্রদ্যুম্নেশ্বর শিবমন্দির নির্মাণ করেন। তাঁর সভাকবি উমাপতিধর দেওপাড়া প্রশস্তি রচনা করে তাঁর রাজত্বকালের অনেক তথ্য রেখে গেছেন। বিক্রমপুরের রাজপ্রাসাদে তাঁর রানী বিলাসদেবী 'কনক তুলাপুরুষ মহাদান' উৎসব পালন করেন। বাংলার নদীয়াতে তাঁর দ্বিতীয় রাজধানী বিজয়পুর অবস্থিত ছিল।

বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন (১১৫৮-১১৭৮) উপাধি নিয়েছিলেন 'নিঃশঙ্ক শংকর'। তিনি গৌড়েশ্বর গোবিন্দপালকে পরাস্ত করেন। পিতার সময়ে তিনি মিথিলা আক্রমণ করেছিলেন। তাঁর রাজ্যের মধ্যে ছিল বঙ্গ, রাঢ়, বাগদি, বরেন্দ্রি ও মিথিলা। গৌড়পুর, বিক্রমপুর ও সুবর্ণগ্রাম ছিল তাঁর রাজধানী, বিহারে তাঁর একটি লেখ পাওয়া গেছে, সম্ভবত বিহারের একাংশ বল্লালসেনের রাজ্যভুক্ত ছিল। বল্লালসেন বিদ্বান ও সাহিত্যরসিক মানুষ ছিলেন। গুরু অনিরুদ্ধের কাছে তিনি পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্র পাঠ করেছিলেন। তিনি *দানসাগর* ও *অদ্ভুতসাগর* নামে দুখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ঐতিহ্য অনুসারে বল্লাসসেন বাংলাদেশের হিন্দুসমাজে কুলীন প্রথার প্রবর্তন করেন। চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের কন্যা রামদেবীকে তিনি বিবাহ করেন। ধর্মমতে তিনি শৈব ছিলেন তবে বৈষ্ণবধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল।

বিজয়সেনের পর তাঁর পুত্র লক্ষ্মণসেন (১১৭৮-১২০৫) রাজা হন, উপাধি নেন 'অরিরাজ-মদন-শংকর'। লক্ষ্মণসেনের মোট সাতটি লেখ পাওয়া গেছে, এর মধ্যে পাঁচটি পাওয়া গেছে তাঁর পূর্ববঙ্গের রাজধানী বিক্রমপুরে, বাকি দুটি ধারিয়াগ্রামে। এই লেখগুলি থেকে জানা যায় লক্ষ্মণসেন গৌড়, বঙ্গ ও রাঢ় অঞ্চলের ওপর রাজত্ব করতেন। রাঢ়কে বিভক্ত করে তিনি দুটি ভুক্তি গঠন করেন, এই দুটি ভুক্তির নাম হলো বর্ধমান ও কংকাগ্রাম। লক্ষ্মণসেন একজন অভিজ্ঞ সমরনেতা ছিলেন, সমকালীন তথ্যে তাঁর বিজয়কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তিনি গৌড়ের রাজাকে পরাস্ত করেন। সম্ভবত পিতামহের সঙ্গে তিনি কলিঙ্গ যুদ্ধে যোগদান করেন। কাশীর রাজা গহড়বল বংশীয় জয়চন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সীমান্ত বিরোধ ছিল। বিহারের বুদ্ধগয়া পর্যন্ত জয়চন্দ্র রাজ্যবিস্তার করলে লক্ষ্মণসেন তাঁকে বাধা দেন। জয়চন্দ্রের পূর্বদিকে সম্প্রসারণ প্রতিহত করতে তিনি সক্ষম হন। তিনি কামরূপ (প্রাগ্‌জ্যোতিষ) আক্রমণ করে সেখানকার রাজাকে পরাস্ত করেন। কলিঙ্গ ও কাশীর রাজাদের পরাস্ত করে তিনি পুরী, কাশী ও এলাহাবাদে বিজয়স্তম্ভ নির্মাণ করেন। সম্ভবত এর মধ্যে কিছুটা অতিরঞ্জন আছে।

দ্বাদশ শতকের শেষদিক থেকে সেন রাজ্যে ভাঙন দেখা দিয়েছিল। দোম্মন পাল নামে এক ব্যক্তি খাড়ি অঞ্চল দখল করে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিল। সেন রাজ্যে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও অশান্তির সময়ে বৈদেশিক আক্রমণ ঘটেছিল। তুর্কিরা উত্তর

ভারত জয় করেছিল। মহম্মদ বখতিয়ার খল্‌জি নামে এক তুর্কি অফিসার বিহার জয় করে লক্ষ্মণসেনের দ্বিতীয় রাজধানী নদীয়াতে গিয়ে হাজির হন। লক্ষ্মণসেন এই আকস্মিক আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। ১২০২ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খল্‌জি নদীয়া দখল করেন এবং পরে সেনদের কাছ থেকে উত্তরবঙ্গ অধিকার করে নেন। পূর্ববঙ্গে লক্ষ্মণসেন তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত রাজত্ব করেন। মিনহাজ বখতিয়ার খল্‌জির বাংলা জয়ের বিবরণ রেখে গেছেন। বখতিয়ার মাত্র আঠারো জন অশ্বারোহী নিয়ে বাংলা জয় করেছিলেন—এটি হলো ইতিহাসের একটি অতিকথা। বখতিয়ারের সঙ্গে বেশ বড় একটি অশ্বারোহী বাহিনী ছিল, আর সেনরাজাদের সৈন্যবাহিনী ছিল তাঁদের প্রধান রাজধানী বিক্রমপুরে।

লক্ষ্মণসেন শেষ জীবনে পারিবারিক শৈব ধর্ম ত্যাগ করে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি শুধু সমরনিপুণ সেনাপতি ছিলেন না, তিনি ছিলেন কবি ও সাহিত্যরসিক। শ্রীধর দাসের *সদুক্তিকর্ণামৃতে* তাঁর রচিত কয়েকটি পদ স্থান পেয়েছে। তিনি পিতার অসমাপ্ত *অদ্ভুতসাগর* গ্রন্থখানি সমাপ্ত করেন। তাঁর রাজসভায় ছিলেন *গীতগোবিন্দের* কবি জয়দেব, *পবনদূত* কাব্যের রচয়িতা ধোয়ী; *ব্রাহ্মণ সর্বস্বের* লেখক হলায়ুধ এবং লেখক শ্রীধরদাস। হলায়ুধ ছিলেন লক্ষ্মণসেনের প্রধানমন্ত্রী, শংকরধর যুদ্ধমন্ত্রী। বিহার অঞ্চলে লক্ষ্মণ সম্বতের নিদর্শন পাওয়া যায়।

লক্ষ্মণসেনের মৃত্যুর পর বিশ্বরূপসেন রাজা হন, তাঁর উপাধি ছিল 'বৃষভাঙ্ক-শংকর'। মিনহাজ জানিয়েছেন যে, ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে মুসলমানরা রাজধানী লক্ষ্মণাবতী থেকে রাঢ় ও বরেন্দ্রী শাসন করত। ১২২৬ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্মণাবতীর সুলতান গিয়াসউদ্দিন আয়াজ বঙ্গ জয় করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন, বিশ্বরূপসেন তাঁকে পরাস্ত করেন। পরবর্তী সেন রাজা কেশবসেন 'অসহ্য-শংকর' উপাধি নিয়ে শাসন করতেন। মালিক সৈফুদ্দিন বঙ্গ অধিকারের চেষ্টা করেছিলেন (১২৩১-৩৩), সম্ভবত কেশবসেনের হাতে তিনিও পরাস্ত হন। মুসলিমরা বারবার চেষ্টা করেও বঙ্গের (পূর্ববঙ্গ) ওপর তাদের অধিকার স্থাপন করতে পারেনি। ত্রয়োদশ শতকের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত (১২৪৫ খ্রিস্টাব্দ) সেনরাজারা পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করেছিলেন। মিনহাজ এই ধরনের অভিমত প্রকাশ করেছেন। দেব পরিবারের দনুজমাধব দশরথদেব সেনদের শাসনের অবসান ঘটান।

সেন রাজবংশের পতন

বাংলার সেন রাজবংশ একাদশ শতকের শেষদিকে রাজ্য স্থাপন করে স্বাধীনভাবে শাসন করতে থাকে। ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে এই রাজবংশের পতন ঘটে। সেন রাজবংশের তিনজন রাজা বিজয়সেন, বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন কৃতিত্বের স্বাক্ষর

রেখেছিলেন। পাল রাজাদের মতো এদের একাধিক রাজধানী ছিল। ঢাকার কাছে বিক্রমপুব ছিল তাঁদের প্রধান রাজধানী, বাংলার নবদ্বীপে তারা অস্থায়ীভাবে থাকতেন, এটি হলো গঙ্গাতীরে হিন্দুদের একটি প্রধান তীর্থস্থান। রাজা বল্লালসেন এখানে কিছুকাল কাটিয়েছিলেন। কিন্তু এটি ছিল তাঁদের অস্থায়ী দ্বিতীয় রাজধানী। *বল্লালচরিতে* বলা হয়েছে যে তাঁর তিনটি রাজধানী ছিল—বিক্রমপুর, গৌড় ও স্বর্ণগ্রাম। ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খল্‌জি নদীয়া বা নবদ্বীপ আক্রমণ করে তা অধিকার করে নেন। তার আগে তিনি সেন রাজ্যের অন্তর্গত মগধ অধিকার করেছিলেন। লক্ষ্মণসেন তুর্কি আক্রমণের বিরুদ্ধে তেমন প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রয়াস চালাননি। অনুমান করা হয় যে সেনরাজা তুর্কি আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য রাজমহলের পার্বত্য পথে সৈন্য স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু বখতিয়ার খল্‌জি ঝাড়খণ্ডের দুর্গম অরণ্যপথে অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে দ্রুত বাংলার দিকে এগিয়ে আসেন এবং মাত্র অগ্রগামী ১৮ জন অশ্বারোহীকে নিয়ে নবদ্বীপে এসে পৌঁছান। নদীয়া বরাবরই অরক্ষিত ছিল, এখানো কোনো দুর্গ, প্রাকার বা পরিখা ছিল না। বখতিয়ার সেনরাজার প্রাসাদের ওপর আকস্মিক আক্রমণ চালালে রাজা প্রাসাদ ছেড়ে পালিয়ে যান। তুর্কিরা প্রায় বিনাবাধায় নদীয়া জয় করেছিল। নদীয়া জয় করে বখতিয়ার খল্‌জি গৌড়ে যান, লক্ষ্মণাবতী জয় করে উত্তরবঙ্গের ওপর প্রাধান্য স্থাপন করেন।

বখতিয়ার উত্তরবঙ্গ জয় করলেও সেন শাসনের অবসান ঘটেনি। পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গে সেন রাজাদের শাসন আরো প্রায় পঞ্চাশ বছর টিকেছিল। বখতিয়ার নবদ্বীপ জয় করার অল্প কিছুকাল পরে রাজা লক্ষ্মণসেনের মৃত্যু হলেও তাঁর পুত্র বিশ্বরূপ সেন ও পৌত্র সূর্যসেন ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গ শাসন করেছিলেন। ত্রয়োদশ শতকের শেষদিকে মধুসেন নামে একজন রাজার নাম পাওয়া যায় তবে তিনি সেনবংশীয় রাজা ছিলেন কিনা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। অধ্যাপক নীহার রঞ্জন রায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার ও অন্যান্যরা সেনবংশের পতনের কারণ খুঁজতে গিয়ে এর অভ্যন্তরীণ দুর্বলতাকে বেশি দায়ী করেছেন। একথা ঠিক, এই রাজবংশের পতনের আসল কারণ হলো তুর্কি আক্রমণ। তুর্কি আক্রমণ এই বংশের কর্তৃত্বের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল। অভ্যন্তরীণ বিভেদকামী শক্তিগুলি উৎসাহিত হয়েছিল। নীহার রঞ্জন রায় লিখছেন ঃ 'স্থানীয় আত্মকর্তৃত্বের যে ব্যাধি পাল-রাষ্ট্রকে ভিতর হইতে দুর্বল করিয়া দিয়াছিল, সেন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নাই'। মিনহাজ-উস-সিরাজ তার *তবাকৎ-ই-নাসিরীতে* বাংলায় তুর্কি আক্রমণের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি রাজাকে কুতুবুদ্দিন আইবকের সঙ্গে তুলনা করেছেন, তাঁর শৌর্য-বীর্যের অভাব ছিল না। তবে তুর্কি আক্রমণের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিরোধমূলক কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। বাংলায় তুর্কি অনুপ্রবেশের জন্য লক্ষ্মণসেনের দায়িত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। এপ্রসঙ্গে

উল্লেখ করা প্রয়োজন, পণ্ডিতরা তথ্য প্রমাণ দিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন মাত্র ১৮ জন তুর্কি অশ্বারোহী বাংলা জয় করেনি। অগ্রগামী বাহিনীর পেছনে তুর্কিদের মূল বাহিনী নবদ্বীপে এসে পৌঁছেছিল। অষ্টাদশ অশ্বারোহীর বাংলা জয় একটি মিথ বা অতিকথা মাত্রা। প্রায় বিনাবাধায় বাংলার উত্তরাঞ্চল জয়ের কারণ হল তুর্কিদের সঙ্গে ছিল দ্রুতগামী রণনিপুণ অশ্বারোহী বাহিনী। লক্ষ্মণসেন তুর্কি আক্রমণের আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও তাঁর পদাতিক ও হস্তিবাহিনী নিয়ে কাল কাটাচ্ছিলেন। তুর্কিদের প্রতিরোধ করার জন্য সামরিক সংস্কারের কথা ভাবেননি।

অধ্যাপক নীহার রঞ্জন রায় লিখছেন ঃ "লক্ষ্মণসেন কাপুরুষ ছিলেন না, তিনি হতভাগ্য। সমাজ-ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে, ইতিহাস-চক্রের জটিল ও অমোঘ আবর্তনে বাঙলার ইতিহাস শতাব্দী ধরিয়া যে অনিবার্য পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতেছিল, লক্ষ্মণসেন তার শেষ অধ্যায় মাত্র।" অধ্যাপক রায় ইতিহাসের অমোঘ নিয়তি তত্ত্বের কথা তুলে সেনবংশের পতন ব্যাখ্যা করেছেন। এই অমোঘ নিয়তি হলো সামাজিক শক্তি। বাংলার সমাজে ঐক্য ও সংহতি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেন রাজারা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বর্ণ প্রথার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। উচ্চবর্ণের মানুষের নৈতিক অবক্ষয় ও অবনতি দেখা দেয়। তারা জ্যোতিষ, নিয়তি, কুসংস্কার ইত্যাদিকে আশ্রয় করেছিল, অপরদিকে নিম্নবর্গের মানুষ উচ্চবর্গের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল। জাতিভেদ প্রথার জন্য নৈতিক অবক্ষয় ঘটেছিল, দেশ ও জাতির প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা কোনো শ্রেণীরই ছিল না। জীবনের সর্বস্তরে শাসন, আইন, বিচারব্যবস্থায় এই মানসিকতার, এই শ্রেণী দ্বন্দ্বের প্রতিফলন ঘটেছিল। সামাজিক বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা যে সেন বংশের পতনের একটি কারণ তাতে সন্দেহ নেই। সামরিক শক্তির দুর্বলতা হলো এই বিভেদকামী শক্তিরই অভিব্যক্তি। সৈন্যরা যুদ্ধের জন্য যথেষ্ট প্রস্তুত ছিল না, আর সেনাপতিরা জ্যোতিষ চর্চা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। মিনহাজ ও তিব্বতের ঐতিহাসিক তারনাথ জানিয়েছেন যে জনগণ ভীত ও স্বন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল, মনোবল একেবারেই ছিল না। লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় অনেক জ্যোতিষী ও ভবিষ্যৎ বক্তা ছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন যে বাংলা অচিরেই তুর্কিদের শাসনাধীনে স্থাপিত হবে, লোকজন পালাতে শুরু করেছিল।

সেন রাজবংশের পতনের একটি বড় কারণ হলো সামন্ত প্রভুদের বিদ্রোহ। তুর্কি আক্রমণের ধাক্কায় বিপর্যস্ত সেন রাজ্যের অধীনস্থ সামন্ত ও প্রাদেশিক শাসকেরা এর সুযোগ নিয়ে স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলার দিকে মন দেন। এধরনের তিনটি ঘটনার কথা জানা যায়। লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের শেষদিকে ১১৯৬ খ্রিস্টাব্দে সুন্দরবন অঞ্চলের ডোম্মন পাল নামক এক ব্যক্তি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে উপাধি নেন মহারাজাধিরাজ। দ্বিতীয় রাজ্যটি প্রতিষ্ঠা করেন হরিকালদেব। ১২২১ খ্রিস্টাব্দে তিনি ত্রিপুরাকে নিয়ে

পট্টিকেরা রাজ্য গড়ে তোলেন, কুমিল্লার কাছে ময়নামতী ছিল তাঁর রাজধানী। তৃতীয় রাজ্যটি স্থাপন করেছিলেন দেব রাজবংশ, এদের রাজ্য ছিল মেঘনা নদীর পূর্বতীরে। এই বংশের রাজা দনুজমর্দন দশরথদেব সেনরাজাদের রাজধানী বিক্রমপুর অধিকার করে সেনবংশের অবসান ঘটিয়েছিলেন।

তুর্কিরা উত্তরবঙ্গ অধিকার করার পর সেন রাজ্যের ওপর ক্রমাগত চাপ পড়তে থাকে। সেন রাজারা এই চাপ প্রতিহত করে তাঁদের রাজ্য রক্ষা করতে পারেননি। লক্ষ্মণাবতীর সুলতান গিয়াসউদ্দিন ও মালিক সৈফুদ্দিন সেন রাজ্য আক্রমণ করে একে দুর্বল করে দেন। ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে সেন রাজবংশের পতন প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

চতুর্থ অধ্যায়

গজনি ও ঘুরের আক্রমণ—প্রকৃতি ও তাৎপর্য—রাজপুতদের ব্যর্থতার কারণ

গজনি ও ঘুরের আক্রমণ

দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে (১০০০-১২০০) পশ্চিম, মধ্য এশিয়া এবং উত্তর ভারতের রাজনীতিতে দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছিল। এই পর্বে তুর্কিরা ভারতে সামরিক অভিযান চালিয়েছিল। নবম শতকের শেষদিকে আব্বাসীয় খলিফাতন্ত্রের পতন ঘটে, এদের স্থান নিয়েছিল তুর্কিদের রাজ্যগুলি। তুর্কিদের একটা অংশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল, পারস্য সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত ছিল। নবম শতকের শেষে ট্রান্স-অক্সিয়ানা, খোরাসান এবং পারস্যের কতকাংশে সামানিদরা রাজ্য স্থাপন করেছিল। এরা অমুসলমান তুর্কিদের বিরুদ্ধে লড়াই করত। নানাকারণে এদের মধ্যে আগ্রাসী নিষ্ঠুর লুঠতরাজের মানসিকতা এবং ধর্ম প্রচারের ইচ্ছা জেগেছিল। এদের অধীনে ছিল সে যুগের সবচেয়ে তেজি ঘোড়া (They had at their disposal the finest horses in the world.)। মধ্য এশিয়ার অশ্বারোহী উপজাতির লোকেরা ছিল দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। নতুন জিন ও লোহার পাদানি তাদের অপরাজেয় যোদ্ধায় পরিণত করেছিল। ঘুরের চারপাশের পাহাড়গুলিতে লোহা পাওয়া যেত, এজন্য সৈন্যদের অস্ত্রের অভাব হয়নি। পশ্চিম এশিয়ায় এই সময় 'গাজি' মানসিকতার উদ্ভব হয়েছিল। গাজি হলো একাধারে যোদ্ধা ও মিশনারি (the gazi was as much a missionary as a fighter)। গজনি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হলেন আলপ্তিগিন। তিনি সামানিদ শাসকদের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। পশ্চিম এশিয়ার এই রাজ্যটি সর্বদা বৈদেশিক আক্রমণের ভয়ে ভীত থাকত। সেলজুক ও খাওয়ারিজম শাসকদের সঙ্গে তাদের বিরোধে লিপ্ত হতে হয়। এর ওপর ছিল মোঙ্গলদের আক্রমণ। মধ্য এশিয়ায় একধরনের জঙ্গিবাদের (militarism) উদ্ভব হয়েছিল। এই জঙ্গিবাদের উত্থান ভারত আক্রমণের পথ প্রশস্ত করেছিল। এই জঙ্গিবাদকে বাঁচিয়ে রেখেছিল তুর্কিদের ইক্‌তা ব্যবস্থা। সামরিক অফিসাররা নির্দিষ্ট অঞ্চল থেকে রাজস্ব আদায়ের অধিকার ভোগ করত, সৈন্যবাহিনী পোষণ করত।

এই সময় আফগানিস্তানে হিন্দু শাহী রাজারা রাজত্ব করতেন। মুলতানের কাছে ভাট্টি শাসকরা শাসন করতেন, মুলতানে ছিল মুসলমান শাসক। শাহী শাসক গজনি আক্রমণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। গজনির শাসক সবুক্তিগিন শাহী রাজ্যে প্রবেশ করে শাহী রাজা জয়পালকে পরাস্ত করেন। ফিরিস্তা জানাচ্ছেন যে জয়পালের সঙ্গে যোগ দেন দিল্লি, আজমীর, কালিঞ্জর ও কনৌজের রাজপুত রাজারা। আধুনিক ঐতিহাসিকরা

এই বর্ণনার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এই যুদ্ধের পর কাবুল ও জালালাবাদ গজনির সঙ্গে যুক্ত হয়। সমসাময়িক ঐতিহাসিক উৎবি জানিয়েছেন যে এই যুদ্ধের পর হিন্দুরা আর গজনি আক্রমণের সাহস দেখায়নি (from this time the Hindus drew in their tails and sought no more to invade the land of Ghazni.)। দশম শতকের শেষে ভারতের প্রতিরক্ষার প্রধান ঘাঁটি কাবুলিস্তান ও আফগানিস্তান ভারতের হাতছাড়া হয়ে যায়। এরপর থেকে গজনির ইয়ামিনি শাসকেরা ভারত আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন, গজনি থেকে জালালাবাদ পর্যন্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানো হয়। আফগানিস্তানের হিন্দু শাসক পশ্চিমদিকে প্রতিহত হয়ে পূর্বদিকে পাঞ্জাব অধিকার করেন। শাহী রাজ্য পেশোয়ার থেকে বিপাশা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল, রাজধানী ছিল ওয়াইহিন্দ। সবুক্তিগিনের মৃত্যুর পর মামুদ (৯৯৯-১০৩০) ক্ষমতা লাভ করেন এবং প্রতিবছর ভারতে অভিযান পরিচালনার প্রতিজ্ঞা করেন। ১০০১ খ্রিস্টাব্দে তিনি শাহী রাজাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিলেন, জয়পালকে পরাস্ত করে তিনি তাঁর রাজধানী পেশোয়ারের কাছে ওয়াইহিন্দে গিয়ে হাজির হন। যুদ্ধের পর জয়পাল মামুদের সঙ্গে সন্ধি করে সিন্ধুর পশ্চিমদিকের অঞ্চল ছেড়ে দেন। অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে জয়পাল অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন দেন। তাঁর পুত্র ত্রিলোচনপাল রাজা হন। শাহী রাজবংশ তখনও যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল, মামুদ দুবার অভিযান চালিয়ে পাঞ্জাবে প্রবেশ করেন। ১০০৬ খ্রিস্টাব্দে মামুদ উচ্চ সিন্ধু উপত্যকা অধিকার করতে সক্ষম হন। ১০০৯ খ্রিস্টাব্দে চাচের যুদ্ধে আনন্দপালকে হারিয়ে তাঁদের নতুন রাজধানী নন্দন অধিকার করেন। এই সময় তিনি শাহী রাজাদের ভীমনগর দুর্গটি দখল করেন। ১০১৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি সমগ্র পাঞ্জাব অধিকার করে নেন। মুলতানের মুসলমান শাসক আনন্দপালের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন, এজন্য মামুদ এই রাজ্যটিও অধিকার করেন। তবে কাশ্মীর অধিকার করতে গিয়ে তিনি ব্যর্থ হন। মামুদ আফগানিস্তান, মুলতান ও পাঞ্জাব অধিকার করেছিলেন, গাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রবেশে আর কোনো বাধা ছিল না।

দশম শতকের মধ্যভাগে উত্তরে গুর্জর-প্রতিহার, দক্ষিণে রাষ্ট্রকূট এবং পূর্বভারতে পাল সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এদের পতনের পর উত্তর ভারতে কয়েকটি নতুন রাজশক্তির উত্থান ঘটেছিল। রাজস্থানে চৌহান, বুন্দেলখণ্ডে চান্দেল্ল, মালবে পরমার এবং গুজরাটে চালুক্যরা প্রাধান্য স্থাপন করেছিল, এদের অধীনে ছিল অসংখ্য স্বাধীনতাকামী সামন্তরাজা। কাশ্মীরে শক্তিশালী রানী দিদ্দা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, উত্তর-পশ্চিমের শাহী রাজাদের সঙ্গে এঁদের শত্রুতা ছিল। রাজপুত রাজারা শাহী রাজাদের তুর্কি শক্তি প্রতিরোধের জন্য কোনো সাহায্য দেননি, ফিরিস্তা যাই বলুন না কেন। মামুদ ভারতের অভ্যন্তরে তিনটি অভিযান পরিচালনা করেন; তাঁর এই

অভিযানগুলির দুটি উদ্দেশ্য ছিল—মধ্য এশিয়ায় অভিযান পরিচালনার জন্য সম্পদ সংগ্রহ এবং ভারতের রাজারা যাতে তাঁর বিরুদ্ধে জোট বাঁধতে না পারে তার ব্যবস্থা করা (The purpose of these raids was to acquire wealth for his central Asian campaigns, as also to destabilize the states in the area so that no coalition of powers against him could emerge.)। ১০১৫ খ্রিস্টাব্দে মামুদ ভারতে প্রবেশ করে বরণের রাজপুত রাজাকে পরাস্ত করেন। পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ থেকে তিনি মথুরার দিকে এগিয়ে যান, এখানকার কলচুরি রাজা দ্বিতীয় কোক্কল তাঁকে বাধা দিয়ে ব্যর্থ হন। মথুরা ও বৃন্দাবন লুঠ করে তিনি প্রতিহারদের রাজধানী কনৌজ আক্রমণ করেন, প্রতিহার রাজা তাকে বাধা না দিয়ে পালিয়ে যান। কনৌজ লুণ্ঠন করে মামুদ গজনিতে ফিরে যান, ফেরার পথে তিনি কয়েকজন স্থানীয় রাজাকে পরাস্ত করেন। গঙ্গা উপত্যকায় এটি ছিল মামুদের এক চমকপ্রদ অভিযান, মামুদ মধ্য এশিয়ায় সাফল্য লাভ করেছিলেন, ইরান তাঁর অধিকারে এসেছিল। বাগদাদের খলিফা তাঁকে সম্মানিত করেন।

১০১৯ ও ১০২১ খ্রিস্টাব্দে মামুদ আরো দুবার গাঙ্গেয় উপত্যকায় অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। প্রথমটির উদ্দেশ্যে ছিল রাজপুত রাজারা যাতে সংঘবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারে তার ব্যবস্থা করা। বুন্দেলখণ্ডের রাজপুত রাজা ও গোয়ালিয়রের শাসক শাহী রাজা ত্রিলোচনপালকে সাহায্য দেবার কথা ভেবেছিলেন। মামুদ দ্রুতগতিতে অভিযান চালিয়ে শাহী রাজাকে পরাস্ত করেন এবং কনৌজে চান্দেল্লদের প্রতিনিধিকে দমন করেন। চান্দেল্ল রাজা বিদ্যাধরের সঙ্গে তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। চান্দেল্লদের সঙ্গে ছোটখাটো সংঘাত হয়েছিল, বড় ধরনের সংঘর্ষ হয়নি। মামুদ গোয়ালিয়র জয় করেন, কিন্তু চান্দেল্লদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জয়পরাজয় নির্ধারিত হয়নি, সম্ভবত চান্দেল্ল রাজা তাঁকে কর দিতে রাজি হয়েছিলেন। এসব অভিযান চালিয়ে মামুদ তাঁর সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটাননি, গাঙ্গেয় উপত্যকায় রাজশক্তির পতন ঘটেছিল, শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। চান্দেল্ল শাসকেরা এই অঞ্চলে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করেনি। মামুদের অভিযানের ফলে শাহী রাজাদের হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধারের প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১০২৫ খ্রিস্টাব্দে মামুদ রাজস্থান হয়ে গুজরাটের সোমনাথ মন্দির আক্রমণ করেছিলেন। সোমনাথ মন্দিরের পুঞ্জীভূত সম্পদ অধিকার করা ছিল তাঁর আসল উদ্দেশ্য। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র জানিয়েছেন যে ইসলামের শত্রুদের ধ্বংস করে ধর্মের গৌরব প্রতিষ্ঠা করা তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল (the gazi spirit of waging an all-out war against the enemies of Islam.)। কেম্ব্রিজ হিস্ট্রিতে উল্‌সলি হেগ জানিয়েছেন যে মামুদ মোট সতেরো বার ভারতে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন।

মুসলমান লেখক অলকহিনি মামুদের সোমনাথ মন্দির আক্রমণ ও লুণ্ঠনের বিস্তৃত বিবরণ রেখে গেছেন। অনহিলবারার রাজা মন্দির লুণ্ঠনে বাধা দেন, এজন্য মামুদের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়েছিল। সোমনাথ মন্দিরের বিগ্রহ চূর্ণ করে অপরিমিতি ধনরত্ন তিনি লাভ করেন, মামুদের সোমনাথ আক্রমণের উদ্দেশ্য সফল হয়। মামুদ জাঠদের বিরুদ্ধে তাঁর শেষ অভিযানটি পরিচালনা করেছিলেন। ১০৩০ খ্রিস্টাব্দে মামুদের মৃত্যু হয়। ১০৩০ থেকে দেড়শো বছর ভারতে বৈদেশিক আক্রমণ ছিল না। মামুদের দেড়শো বছর পরে ঘুর রাজ্যের অন্তর্গত গজনির প্রাদেশিক শাসক মৈজুদ্দিন মহম্মদ ঘুরি ভারত আক্রমণ করেন। এই সময়কালে উত্তর ভারত ছিল অশান্ত ও অস্থির। এই অঞ্চলের রাজপুত রাজারা পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন, তবে কেউই একাধিপত্য স্থাপন করতে পারেননি। কনৌজে মামুদের আক্রমণের পর প্রতিহার রাজশক্তির পতন ঘটেছিল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র স্থাপিত হয়েছিল। একাদশ শতকের শেষে গহড়বল রাজবংশ গাঙ্গেয় উপত্যকায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল। প্রথমদিকে এদের রাজধানী ছিল কাশী, পূর্বে পাল ও উত্তরে দিল্লির তোমরদের সঙ্গে এদের সংঘাত ছিল। রাজস্থানে চৌহানবংশীয় রাজপুতরা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। চৌহানদের শত্রুরা হলো গুজরাটের চালুক্য এবং মালবের পরমাররা। খাজুরাহো অঞ্চলে শক্তিশালী রাজবংশ ছিল চান্দেল্লরা, মালবের পরমার এবং কাশীর গহড়বলদের সঙ্গে এরা দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। গহড়বল রাজারা কনৌজ ও দিল্লি অধিকার করেছিলেন। কিন্তু এইসব রাজপুত রাজারা যৌথভাবে মামুদের উত্তরাধিকারীদের প্রতিরোধ করার কথা ভাবেননি। মামুদের মৃত্যুর পর তাঁর ইয়ামিনি রাজবংশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল, মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ায় তাদের শক্তিক্ষয় হয়েছিল, তা সত্ত্বেও ভারতীয় রাজারা তাদের দুর্বলতার সুযোগ নিতে পারেননি। বরং মামুদের উত্তরাধিকারীরা ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে লুণ্ঠনের কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। কাশী পর্যন্ত তারা অভিযান পরিচালনা করেছিল বলে জানা যায়। সি. ই. বসওয়ার্থ জানাচ্ছেন যে ভারতের মন্দিরের সঞ্চিত সম্পদ মধ্য এশিয়ার অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে রেখেছিল, মুদ্রাব্যবস্থা ছিল উন্নতমানের। তবে গজনির শাসকেরা ভারতে রাজ্য স্থাপনের কথা ভাবেনি। মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার রাজনীতি এবং ঘুরিদের উত্থান ভারতে পরবর্তী অভিযানের সম্ভাবনা তৈরি করেছিল।

সেলজুকদের রাজ্য এবং গজনির মধ্যস্থলে পার্বত্য অঞ্চলে ছিল ছোট ঘুর রাজ্য। দ্বাদশ শতকে এই অঞ্চলে গজনির শাসন স্থাপিত হয়। এখানকার একটি ক্ষুদ্র উপজাতির নেতা সানসবনি (Shansbani) বংশীয় গিয়াসউদ্দিন মহম্মদ ক্ষমতা দখল করেন। এই বংশ গজনি অধিকার করে রাজ্যের বিস্তার ঘটিয়েছিল। আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ছিলেন এই বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে ঘুরের শাসকেরা

উপাধি নেন অল-সুলতান, অল-মুয়াজ্জম। পার্শ্ববর্তী সমৃদ্ধ অঞ্চল খোরাসান ও মার্ভ দখলের জন্য ঘুরের শাসকেরা সেলজুকদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন। খোরাসান অধিকার করে ঘুরের শাসকেরা উচ্চহারে কর বসিয়েছিলেন। এই অঞ্চলে সেলজুক ও তুর্কিদের সঙ্গে তাঁদের অবিরাম সংঘর্ষ চলেছিল, বিব্রত ঘুরের শাসকেরা ভারতের দিকে নজর দেন। ঘুরের শাসক গিয়াসউদ্দিন তাঁর ভ্রাতা মৈজুদ্দিনকে গজনির শাসক নিযুক্ত করেন। দুই ভ্রাতার মধ্যে সদ্ভাব ছিল, মৈজুদ্দিন মহম্মদ নিশ্চিন্ত হয়ে ভারতে অভিযান পরিচালনা করেন। গিয়াসউদ্দিন মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন।

উত্তর ভারতের চৌহানরা গুজরাট, মথুরা এবং দিল্লিতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। মামুদের উত্তরাধিকারীদের বিরুদ্ধে চৌহানরা লড়াই করেছিল। চৌহানদের শ্রেষ্ঠ রাজা বিগ্রহরাজ চিতোর জয় করেন, তিনি তোমর শাসকদের কাছ থেকে দিল্লি অধিকার করে নেন। তোমররা চৌহানদের সামন্তরাজা হিসেবে টিকে ছিল। শেষপর্বে চৌহানদের শ্রেষ্ঠ রাজা হলেন তৃতীয় পৃথ্বিরাজ। তিনি চৌহান রাজ্য বিস্তারের নীতি অনুসরণ করেন, রাজস্থানে ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি অধিকার করে তিনি রাজ্য বিস্তার করেন। তিনি খাজুরাহো ও মাহোবার চান্দেল্লদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। চান্দেল্ল বীর অলহা ও উদল বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে মারা যান। 'পৃথ্বিরাজ রসো' ও 'অলহা খণ্ডে' এই যুদ্ধের বর্ণনা আছে, পৃথ্বিরাজ এই যুদ্ধে জয়ী হন। এই যুদ্ধের পর পৃথ্বিরাজ (১১৭৭-৯২) গুজরাটের চালুক্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। গুজরাটের রাজা দ্বিতীয় ভীম পৃথ্বিরাজকে পরাস্ত করেন। এই যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে পৃথ্বিরাজ গাঙ্গেয় উপত্যকা ও পাঞ্জাবে অভিযান চালিয়েছিলেন। কনৌজের গহড়বলদের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্ব চলেছিল। প্রায় সমসাময়িক লেখকেরা জানিয়েছেন যে পৃথ্বিরাজ কনৌজের শাসক জয়চাঁদের কন্যা সংযুক্তাকে অপহরণ করে বিবাহ করেন। পৃথ্বিরাজের সঙ্গে যুদ্ধে জয়চাঁদ পরাস্ত হন। চৌহান ও গহড়বলদের মধ্যে দিল্লি ও উচ্চ গাঙ্গেয় অববাহিকার অধিকার নিয়ে বিরোধ ছিল। পৃথ্বিরাজ তাঁর প্রতিবেশী রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে অবিরাম অভিযান চালিয়ে তাদের শত্রু হন। রাজনৈতিকভাবে তিনি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন, তুর্কিদের সঙ্গে সংঘাত শুরু হলে এজন্য তাঁকে বিরাট মূল্য দিতে হয়।

১১৭৩ খ্রিস্টাব্দে মৈজুদ্দিন গজনির শাসক হন, এর ঠিক দুবছর পর তিনি মুলতানের কারামতিদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ঐ অঞ্চল অধিকার করে নেন। কারামতিদের ধর্ম ছিল ইসলাম ও বৌদ্ধধর্মের এক মিশ্রণ। পরের বছর তিনি উছ অধিকার করেন। ১১৭৮-৭৯ খ্রিস্টাব্দে মৈজুদ্দিন মুলতান ও উছের মধ্য দিয়ে গুজরাটে প্রবেশ করেন কিন্তু গুজরাটের চালুক্য শাসকের কাছে তিনি পরাস্ত হন। গুজরাটে ব্যর্থ হয়ে মৈজুদ্দিন তাঁর রণকৌশল পরিবর্তন করেছিলেন। পেশোয়ার জয় করে তিনি লাহোরে প্রবেশ করেন, লাহোর দখল করে তিনি সিন্ধু অঞ্চলের ওপর আধিপত্য স্থাপন করেন। সিন্ধু ও পাঞ্জাব দখলের পর উত্তর ভারতের রাজপুত রাজাদের সঙ্গে মৈজুদ্দিনের প্রত্যক্ষ

সংঘাত শুরু হয়েছিল। ১১৯১ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ ঘুরি তাবরহিন্দা দুর্গটি অধিকার করেন, এই দুর্গটি ছিল দিল্লির প্রতিরক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পৃথ্বিরাজ এই দুর্গের গুরুত্ব অনুধাবন করে তাবরহিন্দার দিকে এগিয়ে যান। তরাইনের প্রথম যুদ্ধে (১১৯১) পৃথ্বিরাজ সম্পূর্ণভাবে জয়লাভ করেন, মহম্মদ ঘুরি পরাস্ত হন, একজন খল্‌জি সৈনিক তাঁর প্রাণরক্ষা করেন। যুদ্ধে জয়ী হয়ে পৃথ্বিরাজ শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করেননি, সম্ভবত তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে গজনির সুলতানের মতো ঘুরি লুণ্ঠন করে দেশে ফিরে যাবেন, পাঞ্জাব নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবেন। তাবরহিন্দা অধিকার করে তিনি সন্তুষ্ট হন। এই যুদ্ধের পর তিনি ঘুরির সঙ্গে ভবিষ্যত সংঘাতের জন্য কোনো প্রস্তুতি নেননি। চাঁদ বরদাই জানিয়েছেন পৃথ্বিরাজ রাজকার্য অবহেলা করে বিলাসব্যসনে লিপ্ত হয়ে পড়েন। একথা হয়তো সত্য নয়, তবে তিনি বৈদেশিক আক্রমণের গুরুত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি।

১১৯২ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত *তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ* হলো ভারত ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা। মৈজুদ্দিন শক্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হন, দুই পক্ষের শক্তির যথাযথ তুলনা করা সম্ভব নয়। মিনহাজ জানিয়েছেন মৈজুদ্দিনের সঙ্গে এক লক্ষ বিশ হাজার সশস্ত্র সৈন্য ছিল। ফিরিস্তা জানাচ্ছেন যে পৃথ্বিরাজের সঙ্গে তিন লক্ষ অশ্বারোহী, তিন হাজার হাতি ও পদাতিক সৈন্য ছিল। এই বর্ণনায় অবশ্যই অতিরঞ্জন আছে, ঘুরির কৃতিত্বের উজ্জ্বল বর্ণনা দেবার জন্য পৃথ্বিরাজের শক্তির কথা বাড়িয়ে বলা হয়েছে (to emphasize the challenge faced by Muizuddin and the scale of his victory.)। সম্ভবত পৃথ্বিরাজের সঙ্গে ঘুরির চেয়ে বেশি সৈন্য ছিল। ফিরিস্তা আরও জানিয়েছেন যে পৃথ্বিরাজের আহ্বানে সাড়া দিয়ে উত্তর ভারতের প্রধান রাজারা (all the leading Rais of Hind) তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। ফিরিস্তার এই বর্ণনাও সন্দেহজনক কারণ পৃথ্বিরাজের আগ্রাসী নীতি তাঁর প্রতি প্রতিবেশীদের বিদ্বিষ্ট করে তুলেছিল। পৃথ্বিরাজের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন ফিরিস্তা এমন একজন শাসকেরও নাম উল্লেখ করেননি। একথা ঠিক পৃথ্বিরাজের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তাঁর সামন্তদের সৈন্য যোগ দিয়েছিল, চৌহানদের দিল্লির শাসক গোবিন্দরাজ তাঁর সঙ্গে ছিলেন। সামন্তসৈন্য চৌহানদের শক্তিবৃদ্ধি করেনি, বরং পৃথ্বিরাজের দুর্বলতার কারণ হয়েছিল। দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধ অবস্থানগত ছিল না, ছিল গতির যুদ্ধ (The battle of Tarain was more a war of movement than of position.)। মৈজুদ্দিনের দ্রুতগামী হালকা অশ্বারোহী বাহিনী ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র, এই অস্ত্র তাঁর জয় এনে দিয়েছিল। মিনহাজ জানিয়েছেন যে বন্দী পৃথ্বিরাজকে হত্যা করা হয়। সমকালীন হাসান নিজামী মনে করেন যে পৃথ্বিরাজ ঘুরির অধীনে আরও কিছুকাল রাজত্ব করেন, তাঁর পুত্রও ঘুরির অধীনে কিছুকাল দিল্লির শাসক ছিলেন। সেযুগের রাজপুত রাজাদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ বীর পৃথ্বিরাজ দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যান।

দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধের পর চৌহানদের রাজ্য ঘুরির দখলে এসেছিল। দিল্লি, আজমীর, হিসার ও সিরসা অধিকৃত হয়। তার ক্রীতদাস কুতুবুদ্দিন আইবক হিসার ও সিরসার শাসক হন। ঐ বছর কুতুবুদ্দিন দিল্লি ও আজমীর অধিকার করে তুর্কি রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন করেন, ঘুরি গজনিতে ফিরে যান। দিল্লি ও আজমীর অধিকার করে তুর্কিরা কনৌজ আক্রমণ করেছিল। ইতিমধ্যে ডোর রাজপুতদের কাছ থেকে মীরাট, বরণ, কোয়েল (আলিগড়) দখল করা হয়েছিল। জয়চাঁদ ডোর রাজপুতদের কোনো সাহায্য দেননি, এটা ছিল রণকৌশলগত ভুল। ১১৯৪ খ্রিস্টাব্দে ঘুরি কনৌজ ও কাশীর দিকে এগিয়ে যান। উত্তরপ্রদেশের চান্দাবারে ঘুরি ও জয়চাঁদের মধ্যে যুদ্ধ হয়। জয়চাঁদের সঙ্গে একটি বিশাল সৈন্যবাহিনী ছিল কিন্তু জয়চাঁদ দক্ষ সেনানায়ক ছিলেন না। ঘুরি তাঁকে পরাস্ত করে তাঁদের সঞ্চিত ধনসম্পদ লুঠ করেন, বারাণসী লুণ্ঠিত হয়, অনেক মন্দির ধ্বংস করা হয়। ১১৯৮ খ্রিস্টাব্দে কনৌজ তুর্কিদের অধিকারে চলে যায়। তরাইন ও চান্দাবারের যুদ্ধ ভারতে তুর্কি শাসনের সূত্রপাত করেছিল। উত্তর ভারতে বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি অভ্যুত্থানের ঘটনা ঘটেছিল, কিন্তু তুর্কিদের বড় ধরনের প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়নি। তুর্কিরা প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে এই অঞ্চলে তাদের শাসন সংহত করেছিল। দিল্লি ও মালবের মধ্যে দুর্গগুলি অধিকার করে তুর্কিরা নিজেদের শক্তিকে সংহত করেছিল। এই অঞ্চলে বায়ানা, গোয়ালিয়র, কালিঞ্জর, মাহোবা ও খাজুরাহো তুর্কিদের অধীনে এসেছিল।

গাঙ্গেয় উপত্যকা ও রাজস্থান ছাড়াও তুর্কিরা পশ্চিমে গুজরাট এবং পূর্বে বিহার ও বাংলায় সম্প্রসারণের জন্য অভিযান পরিচালনা করেছিল। পশ্চিমে ঘুরির এক ক্রীতদাস গুজরাটের আনহিলবারা আক্রমণ করেন। আনহিলবারা অধিকৃত হয় তবে বেশিদিন তুর্কিদের অধিকারে ছিল না। মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খল্‌জি বিহার ও বাংলা জয় করেন। বিহারে ছিলেন পাল রাজারা, বাংলায় ছিল সেনবংশের শাসন। মিনহাজ বিহার ও বাংলা জয়ের বর্ণনা রেখে গেছেন। সমরকন্দের তুর্কিদের কাছে ঘুরি পরাস্ত হন, এই যুদ্ধে পরাজয়ের পর তিনি মার্ভ ও খোরাসানের ওপর অধিকার হারিয়েছিলেন। পাঞ্জাবে খোক্কর বিদ্রোহ দমন করে গজনিতে ফেরার পথে তিনি কারামতিদের হাতে নিহত হন। মামুদের সভাসদ আল-উতবি তাঁকে একজন দক্ষ সেনাপতি ও রাষ্ট্রনেতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মামুদ ও ঘুরি মিলিতভাবে আক্রমণ চালিয়ে ভারতে তুর্কি সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। মামুদ ঘুরির চেয়ে সমরনীতিতে বেশি দক্ষ ছিলেন। তিনি ভারতে কোনো যুদ্ধে পরাস্ত হননি, অপরদিকে ঘুরি গুজরাট ও তরাইনের প্রথম যুদ্ধে পরাস্ত হয়েছিলেন। ঘুরি পরাস্ত হলেও অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে তিনি তাঁর ভ্রান্তি সংশোধন করে নেন। মূল লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থেকে তিনি যুদ্ধ চালিয়ে যান এবং বাস্তব রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় দিয়ে শেষপর্যন্ত জয়ী হন

(a dogged tenacity of purpose and a grim sense of political realism.) গুজরাটের যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে তিনি রণকৌশলের পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। তিনি রাজস্থানের পথ পরিহার করে পাঞ্জাবের পথে ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। পৃথ্বিরাজের হাতে পরাস্ত হয়ে তিনি অতি দ্রুত সামরিক পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করেন। পরাজয় তাঁর উদ্যমের কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। অধ্যাপক এ. বি. এম. হবিবুল্লাহ্ জানিয়েছেন যে ইতিহাসে মৈজুদ্দিনের স্থান নির্দিষ্ট হয়ে আছে। মামুদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য হলো তিনি ছিলেন একজন বাস্তববাদী রাষ্ট্রনেতা। ভারতের পতনোন্মুখ রাষ্ট্রব্যবস্থার তিনি পূর্ণ সুযোগ নেন। মামুদ বারংবার অভিযান চালিয়ে উত্তর ভারতের বহু শহর, মন্দির, তীর্থস্থান ধ্বংস করে দেন। তিনি শুধু পাঞ্জাব অধিকার করেন, কোনো রাজ্য স্থাপন করেননি। ভিনসেন্ট স্মিথ জানাচ্ছেন যে মামুদ ছিলেন একজন দস্যু, বৃহৎ আকারে তিনি লুঠপাট চালিয়েছিলেন, দুর্বল হিন্দু রাজারা তাঁকে প্রতিরোধ করতে পারেননি। মামুদ নির্বিচারে জনগণের ওপর দুঃখ-দুর্দশা চাপিয়েছিলেন। ঘুরির শাসক ছিলেন অন্যধরনের মানুষ। তিনি জানতেন কীভাবে বিশৃঙ্খল তুর্কি সৈন্যদের ব্যবহার করে রাজ্যের বিস্তার ঘটাতে হয়।

মামুদ ও ঘুরি কেউই ধর্মপ্রচারের জন্য ভারতে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেননি। রাজনৈতিক প্রয়োজনে ধর্মকে তাঁরা ব্যবহার করেছেন। এই দুই শাসকের অর্থের প্রয়োজন ছিল, মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার রাজনীতিতে তাঁরা গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন। ধনসম্পদের লোভে তাঁরা ভারতে এসেছিলেন। ভ্রাম্যমাণ ভাগ্যান্বেষী সৈনিক গাজিদের সমর্থন লাভের জন্য তাঁরা ধর্মের জিগির তুলেছিলেন। মামুদকে শুধু দস্যু বললে তাঁর কৃতিত্বের সঠিক মূল্যায়ন হয় না। পাঞ্জাব অধিকার করে তিনি তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেন, এই পাঞ্জাব থেকে অভিযান চালিয়ে ঘুরি ভারত জয় করেন। মামুদই ভারত জয়ের সূচনা করেছিলেন, তাঁর কাজকে পরিপূর্ণ রূপ দেন ঘুরি। উল্লেখ করা প্রয়োজন মামুদের দেড়শো বছর পরে ঘুরি তাঁর ভারত অভিযান শুরু করেছিলেন। মামুদের পর ভারতের রাজনীতিতে পরিবর্তন ঘটেছিল, চৌহান ও চান্দেল্ল রাজবংশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এই শক্তিশালী বাধা অতিক্রম করে মহম্মদ ঘুরি ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন করেন, তিনি হলেন ভারতে মুসলমান শাসনের প্রকৃত স্রষ্টা।

মামুদ ও ঘুরি দুজনেই শিল্প ও সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। মামুদের রাজসভায় কবি ও সাহিত্যিকরা আশ্রয়লাভ করেন। *শাহনামা*-র রচয়িতা ফিরদৌসি, পণ্ডিত আলবেরুনি, ঐতিহাসিক উতবি তাঁর সভায় ছিলেন। গজনিতে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়, মিউজিয়াম ও গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। দুজনেই হিন্দুদের শাসনব্যবস্থায় স্থান দিয়েছিলেন। ঘুরি আশ্রিত হিন্দু নরপতিদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখেন, ঘুরির রাজসভায় দার্শনিক

ও পণ্ডিত ফকরুদ্দিন রাজি ও কবি নিজামী উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং ঘুরি শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রতি উদাসীন ছিলেন না (He was not indifferent to learning and scholarship.)। এই দুজনের শাসন দক্ষতা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। দুজনেই খোরাসান অঞ্চলে অত্যধিক কর স্থাপনের জন্য জনপ্রিয়তা হারিয়েছিলেন। উতবি জানিয়েছেন যে মামুদের রাজ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলেও সুলতান তেমন ব্যবস্থা নেননি, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেননি। পাঞ্জাব অঞ্চলে মামুদ যে শাসনব্যবস্থা কায়েম করেন তার সম্পর্কেও বিশেষ কিছু জানা যায় না। সম্ভবত মামুদ স্থানীয় শাসনব্যবস্থায় বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটাননি। উত্তর ভারত জয় করে ঘুরি তাঁর ক্রীতদাস আইবকের হাতে শাসন ক্ষমতা তুলে দেন, আইবক স্থানীয় শাসন বজায় রেখেছিলেন।

তুর্কি বিজয়ের প্রকৃতি ও তাৎপর্য

ভারতে তুর্কি আক্রমণের নেতৃত্ব দেন গজনির মামুদ। প্রায় তিরিশ বছর ধরে তিনি সতেরো বার ভারতে অভিযান পরিচালনা করেন। পাঞ্জাব, সিন্ধু, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ ও গুজরাটের ওপর আক্রমণ চালিয়ে লুণ্ঠন করেন, মন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংস করেন। মথুরা, বৃন্দাবন ও কাশীতে তাঁর অভিযান চলেছিল। সেযুগে ক্ষমতার কেন্দ্র কনৌজ তাঁর হাতে বিধ্বস্ত হয়, রাজপুত রাজারা তাকে বাধা দিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ভিনসেন্ট স্মিথ লিখেছেন যে সুলতান মামুদ সে যুগের ধর্মান্ধ তুর্কি মুসলমানের প্রতিমূর্তি হিসেবে ইতিহাসে স্বাক্ষর রেখে গেছেন। ইসলামের অনুশাসন কঠোরভাবে পালন করতে গিয়ে তিনি নিজেকে একজন বর্বর পৌত্তলিকতা বিরোধী মুসলমান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ধনরত্নের প্রতি সীমাহীন লোভ তাঁর মানবিকবোধকে নষ্ট করে দিয়েছিল। একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতের ধনসম্পদ হস্তগত করা ছিল তাঁর লক্ষ্য। ধনলোভের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষ। ইসলামের গৌরব প্রচার তাঁর অভিযানের একটি দিক ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। তিনি অকারণে একের পর এক মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংস করে গেছেন। ভারতে স্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপনের ইচ্ছা তাঁর ছিল না, কোনো বিজিত অঞ্চলে তাঁর অধিকার বজায় রাখার চেষ্টা করেননি। বিশাল ভারতবর্ষ জয় করে শাসন করার মতো সৈন্যসম্পদ ও লোকবল তাঁর ছিল না। সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য যে ধরনের ঝুঁকি নিতে হয় মামুদ তা নিতে চাননি। সেজন্য অভিযানগুলিকে তিনি প্রধানত লুণ্ঠনের কাজে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন।[১]

১. ভিনসেন্ট স্মিথ লিখেছেন, 'So far as India was concerned Mahmud was simply a bandit operating on a large scale, who was too strong for the Hindu Rajas, and was in consequence able to inflict much irreparable damage.'

ভারতের ঐতিহাসিকদের কাছে মামুদের পরিচয় হলো এক অতৃপ্ত আক্রমণকারীর। তিনি মিশনারি বা সাম্রাজ্যের স্রষ্টা ছিলেন না। তিনি ধর্ম প্রচার করতে চাননি, সাম্রাজ্য স্থাপনের ইচ্ছাও তাঁর ছিল না। পূর্বদিকে তাঁর অভিযানের আসল লক্ষ্য ছিল ভারতের অপরিমিত সম্পদ অধিকার করা এবং ধনের অধিকারীদের ধ্বংসসাধন (He was neither a missionary for the propagation of religion in this country nor an architect of empire. The main object of his eastern expeditions seems to have been acquisition of wealth and the destruction of its custodians.)। অধ্যাপক মহম্মদ হাবিব জানাচ্ছেন যে-কোনো সৎ ঐতিহাসিক এবং যে-কোনো মুসলমান যাঁর ইসলামের প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে ধারণা আছে তাঁরা মামুদের এই নীতিজ্ঞানহীন মন্দির ধ্বংস করাকে গোপন করবেন না, বা তাঁকে কোনো অজুহাতেই সমর্থন করবেন না। সমসাময়িক ও পরবর্তী যুগের বহু লেখকই এই কুকীর্তিগুলিকে বেশ ফলাও করে বর্ণনা করেছেন, ...ইসলাম এধরনের বর্বরোচিত কাজ অনুমোদন করে না বা আক্রমণকারীর এই লুণ্ঠন প্রভৃতি কাজকে সমর্থন দেয় না। যেসব হিন্দু রাজা মামুদকে বা তাঁর সৈন্যদের কোনো ক্ষতি করেনি তাদের প্রতি মামুদের আচরণ শরিয়তের কোনো নীতিতেই ব্যাখ্যা করা যায় না। উপরন্তু হিন্দুদের পবিত্র উপাসনার স্থানগুলি এভাবে অপবিত্র করাকে ইসলাম ও অন্যান্য সব ধর্ম নিন্দা করে।

মামুদ ভারতের কোনো অঞ্চল জয় করেননি, শুধু সামরিক প্রয়োজনের কথা ভেবে পাঞ্জাব তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন। অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন যে মামুদের ভারত অভিযানের কোনো রাজনৈতিক দিক নেই মনে করলে ভুল করা হবে। ভারতের ধনসম্পদকে তিনি যেমন নিঃশেষ করেন তেমনি রাজশক্তিকে নির্মম আঘাত হেনে ধ্বংসের কিনারায় দাঁড় করিয়েছিলেন। তিনি ভারতীয় রাজাদের দুর্বলতার কথা প্রথম প্রকাশ করে দেন, এদের অন্তঃসারশূন্যতা বৈদেশিক শক্তিগুলির কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে। তিনি ভারতে মহম্মদ ঘুরির জয়ের পথ প্রশস্ত করে রেখে যান। ভারত জয়ের প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন মামুদ, এই প্রক্রিয়াটি সমাপ্ত করেন মহম্মদ ঘুরি। ঐতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ লিখেছেন যে গজনি ও ঘুরের শাসকদের প্রকৃতিগত পার্থক্য ছিল। গজনির শাসকেরা ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের কথা ভাবেননি, ভেবেছিলেন সম্পদ আহরণের কথা, ইসলামের গৌরব প্রচারের কথা। ঘুরিরা ছিল অন্য ধাতুতে গড়া। দুর্ধর্ষ তুর্কিদের বিজয় অভিযানে নেতৃত্ব দিয়ে তারা সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটাতে চেয়েছিল। নিজেদের সাম্রাজ্য ও সম্পদের বিস্তার চেয়েছিল (The Chiefs of Ghori were men of a different stamp. They were better fitted to lead and command the unruly Turks and knew how to employ their valour and zeal for the purpose of self-aggrandizement.)।

মামুদ ও ঘুরি কেউই ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য ভারতে আসেননি। মামুদ ও ঘুরি দুজনেই ধনলোভে ভারতে এসেছিলেন। ধনলোভের সঙ্গে ঘুরি রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা করেছিলেন। রাজনৈতিক প্রয়োজন সাধনের জন্য অনেক সময় তাঁরা ধর্মকে ব্যবহার করেছেন। হিন্দুস্তানের সম্পদ লুণ্ঠন ও রাজ্যজয় ছিল তুর্কিদের আসল উদ্দেশ্য। রিজভী লিখেছেন যে সৈন্যবাহিনী পোষণের জন্য তাদের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ায় শক্তির দ্বন্দ্ব চলেছিল, গজনি ও ঘুরের পরবর্তীকালের শাসকেরা ক্ষমতার দ্বন্দ্বে পরাস্ত হন। ঘুরি নিজে খাওয়ারিজম শাহ্ আলাউদ্দিনের কাছে পরাস্ত হয়ে খোরাসান ও হেরাত হারিয়েছিলেন (Both were in need of plunder from India to maintain their slave armies and to attract the wandering bands of Islamicized mercenaries known as Ghazis to their forces.)। ঘুরি যে সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন তাঁর বিশ্বস্ত ক্রীতদাস আইবক, কুবাচা ও ইলদুজ তা রক্ষা করেন। দুজনেই তাঁদের জনগণের কাছে ছিলেন বীর, গাজি। ঈশ্বরীপ্রসাদ এঁদের কাজকর্মের তুলনামূলক আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে মহম্মদ ঘুরি মামুদের চেয়ে অনেকবেশি রাজনৈতিকবোধসম্পন্ন ছিলেন (certainly more political than his great predecessor)। ভারতের রাজনৈতিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তিনি সুলতানি শাসনের ভিত্তিস্থাপন করেন, এই শাসন পাঁচশো বছর স্থায়ী হয়েছিল।

তুর্কি অভিযানের বিরুদ্ধে রাজপুত রাজাদের ব্যর্থতার কারণ

অষ্টম শতকের গোড়ার দিকে আরবরা সিন্ধুদেশ জয় করে তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। প্রায় তিনশো বছর ধরে আরব শাসন সিন্ধু ও মুলতান অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। একাদশ শতকের গোড়ার দিকে গজনির মামুদ এবং দ্বাদশ শতকে ঘুর রাজ্যের শাসক মহম্মদ ভারতে আক্রমণ চালিয়ে রাজপুত রাজাদের পরাস্ত করেন। মৈজুদ্দিন মহম্মদ দিল্লি অধিকার করে দিল্লি সুলতানির সূত্রপাত করেন। মামুদ সতেরোবার ভারতে আক্রমণ চালিয়ে রাজপুত শক্তিকে দুর্বল করে ফেলেছিলেন। মৈজুদ্দিন দিল্লি জয় করে এই প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছিলেন। মামুদ আফগানিস্তান ও পাঞ্জাব অধিকার করে ভারতের উত্তর-পশ্চিমের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্বল করে ফেলেছিলেন (The conquest of Afghanistan and the Punjab by Mahmud Ghazni breached the outer defences of India.)। গজনি ও ঘুরের শাসকেরা এইসব অঞ্চলে সৈন্য সমাবেশ করে ইচ্ছামতো ভারতে প্রবেশ করতেন। পাঞ্জাবের হিন্দু শাহী রাজারা এর বিরুদ্ধে স্থায়ী প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেননি। তাঁরা কখনো আক্রমণের উৎসস্থল আক্রমণ করেননি। শুধু শাহী রাজা জয়পাল এধরনের সামরিক কৌশলের কথা ভেবেছিলেন।

একাদশ শতকের শুরু থেকে রাজপুত রাজারা আত্মরক্ষার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। যুদ্ধপদ্ধতি, সামরিক কৌশল, রণনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁরা দূরদৃষ্টির পরিচয় দিতে পারেননি। ভারতের রাজপুত রাজারা কখনো যৌথভাবে গজনি বা ঘুর আক্রমণের কথা ভাবেননি। মামুদের মৃত্যুর পর গজনি রাজ্যে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে তাঁরা এর সুযোগ নিতে পারতেন। গজনি রাজ্যের ঐ দুর্যোগের দিনে মামুদের দুর্বল বংশধররা ভারতে আক্রমণ পরিচালনার কাজ বন্ধ রাখেননি। আজমীর ও কাশী পর্যন্ত তাঁদের আক্রমণ অব্যাহত রেখেছিলেন। রাজপুত রাজাদের রাজনৈতিক দুর্বলতার পরিণতি হলো রণকৌশল সম্পর্কে দূরদৃষ্টির অভাব। রাজপুত রাজাদের মধ্যে ঐক্য ছিল না, একজন আক্রান্ত হলে অন্যজন তার পাশে এসে দাঁড়াত না। দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধে তৃতীয় পৃথ্বিরাজের পরাজয় ঘটলে কনৌজের গহড়বল বংশীয় রাজা জয়চাঁদ তাঁর রাজসভায় আনন্দ-উৎসব পালন করেন (In a false sense of security he had rejoiced at the defeat of Prithviraj at the hands of Muizuddin, and the event was celebrated at his court.)। উত্তর-পশ্চিম ভারতে কোনো শক্তিশালী রাষ্ট্র ছিল না, তবে ভারতের অভ্যন্তরে রাজপুত রাজাদের শক্তি ও সম্পদ কম ছিল না। পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার উপজাতি রাজ্যগুলি আয়তন, লোকসংখ্যা ও সম্পদে রাজপুত রাজ্যগুলির চেয়ে পিছিয়ে ছিল। মধ্য এশিয়ার বেশিরভাগ অঞ্চল হলো অরণ্য ও পর্বতময়, অনুর্বর। তুর্কিদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে রাজপুত রাজারা লোকবল, যুদ্ধ সরঞ্জাম ও সম্পদে এগিয়ে ছিল। অনেকে মনে করেন যে ভারতের জাতিভেদ ব্যবস্থার জন্য রাজপুত সৈন্যবাহিনীতে সৈন্যের অভাব দেখা দিয়েছিল। এই অভিমত ঠিক নয়, রাজপুত সৈন্যবাহিনীতে শুধু রাজপুতরা ছিল না, ছিল জাঠ, মীনা ও অন্যান্য তথাকথিত নিম্নবর্গের মানুষ।

রাজপুতদের শৌর্য ও বীর্যের অভাব ছিল না। রাজপুতরা ছিল অত্যন্ত সাহসী, সুদক্ষ যোদ্ধা ও মৃত্যুভয়হীন। তুর্কিদের সঙ্গে যুদ্ধে তাদের কখনো সাহস ও বীরত্বের অভাব হয়নি। অনেকে মনে করেন যে তুর্কিদের হাতে উন্নত অস্ত্রশস্ত্র ছিল, এজন্য রাজপুতরা পেরে ওঠেনি। বলা হয় তুর্কিরা ঘোড়ার পিঠে জিনের সঙ্গে লোহার পাদানির ব্যবহার শিখেছিল, এই পদ্ধতি ভারতের সৈনিকদের জানা ছিল না। তুর্কি অশ্বারোহী সৈনিকরা ঘোড়ার পিঠে বসে অনায়াসে তীর ও বর্শা চালাতে পারত। পণ্ডিতদের অভিমত হলো এই পদ্ধতি ভারতীয়রা জানত। তবে স্বীকার করতে হয় তুর্কিদের কাছে উন্নতমানের ঘোড়া ছিল, তুর্কিরা ছিল অত্যন্ত দক্ষ অশ্বারোহী। এত উন্নতমানের ঘোড়া ভারতে পাওয়া যেত না। রাজপুতদের পরাজয়ের আসল কারণ হলো তাদের সৈন্যবাহিনীর সংগঠন ও নেতৃত্বের দুর্বলতা। রাজপুত সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ঐক্য ছিল না। রাজপুত সামন্তরাজারা নিজ নিজ সৈন্যবাহিনী নিয়ে যুদ্ধে যোগ

দিতেন। এজন্য একজন সেনাপতির অধীনে ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের যুদ্ধ করার সুযোগ ছিল না। রাজপুতরা সংখ্যার ওপর জোর দিয়েছিল, গতিকে অবহেলা করেছিল। রাজপুত সৈন্যবাহিনী ছিল মন্থর, গতির অভাব ছিল, বিপক্ষের সৈন্যদল অনেকবেশি গতিসম্পন্ন ছিল।

রাজপুতরা হস্তীবাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করত, এই হস্তীবাহিনী অনেকসময় শক্তির উৎস না হয়ে পরাজয়ের কারণ হতো। রাজপুতদের অশ্বারোহী বাহিনী ছিল দুর্বল, অপরদিকে তুর্কিরা ছিল পৃথিবীর সেরা অশ্বারোহী সৈন্য। তুর্কি সুলতানরা নিজেদের অধীনে ঐক্যবদ্ধ সৈন্যবাহিনী গঠন করেছিলেন, তাঁরা সামন্তবাহিনীর ওপর নির্ভর করেননি। তুর্কি সেনাপতিদের অনেকে ছিলেন সুলতানদের ক্রীতদাস, এরা সুলতানের প্রতি অনুগত থেকে প্রাণপণে লড়াই করত। রাজপুতদের এধরনের দক্ষ সেনানী ছিল না। রাজপুত বাহিনীতে উন্নতমানের দক্ষ সেনাপতির অভাব ছিল। রাজপুত রাজারা বড় ধরনের স্থায়ী বেতনভুক সৈন্যবাহিনী রাখতেন না। সামন্তরাজারা সৈন্যবাহিনী গঠন করতেন, রাজস্ব আদায় করতেন, যুদ্ধের সময় রাজাকে এই সৈন্যবাহিনী দিয়ে সাহায্য করতেন। ভারতের এই সামন্তরাজারা ছিল বিদ্রোহপ্রবণ, সুযোগ পেলে তারা বিদ্রোহ করে স্বাধীন হয়ে যেত। অপরদিকে তুর্কিদের মধ্যে ছিল প্রবল উপজাতি আনুগত্য, উপজাতি আনুগত্যের ভিত্তিতে গজনি, ঘুরি, সেলজুক ও খাওয়ারিজম রাজ্য গড়ে উঠেছিল। এসব উপজাতি রাজ্যে ছিল কেন্দ্রীভূত স্বৈরাচারী শাসন। অনুগত সেনাপতিরা ইক্‌তা ভোগ করত, তবে পুরুষানুক্রমে এগুলি ভোগ-দখলের অধিকার তারা পেত না। রাজপুত ও তুর্কিদের রাজনৈতিক ও সামরিক সংগঠনের মধ্যে পার্থক্য রাজপুতদের ব্যর্থতার জন্য অনেকখানি দায়ী ছিল।

সাধারণত বলা হয় যে ভারতের জাতিভেদ প্রথা ও সামন্তপ্রথার জন্য সাধারণ মানুষ রাজপুত রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি উদাসীন হয়ে উঠেছিল। রাষ্ট্রের উত্থান-পতন নিয়ে সাধারণ মানুষের মাথাব্যথা ছিল না। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই যুগে ভারত বা মধ্য এশিয়ায় কোথাও রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য বা দেশপ্রেম তৈরি হয়নি। জনগণ রাজাকে কর দিত, রাজা তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতেন। রাজপুত রাজাদের সমস্যা হলো উন্নতমানের অশ্বারোহী বাহিনী না থাকায় তাঁরা তুর্কিদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় সামরিক ব্যবস্থা নিতে পারেননি, তুর্কি আক্রমণের বিরুদ্ধে দুর্গগুলি রক্ষা করাও সম্ভব হয়নি। একথা ঠিক ইসলাম তার অনুগামীদের নতুন আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছিল, বিধর্মীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাদের ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হয়েছিল। মধ্য এশিয়ায় 'গাজি' মানসিকতার প্রসার ঘটেছিল, স্বেচ্ছাসেবী গাজিরা বিধর্মীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। লুণ্ঠনলব্ধ সম্পদের সম্ভাবনা তাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। অনেকে বলেছেন যে তুর্কিদের মধ্যে সামাজিক সাম্য ছিল, একথা ঠিক নয়। রাজপুত

ও তুর্কিদের মধ্যে মুষ্টিমেয় শাসকশ্রেণী ছিল সুবিধাভোগী। স্বীকার করতে হয় তুর্কিদের মধ্যে সামাজিক গতিশীলতা রাজপুতদের চেয়ে বেশি ছিল। একজন ক্রীতদাসও সামাজিক সম্মান পেত। রাজপুতদের ধর্মবিশ্বাস, কুসংস্কার, জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতা অবশ্যই তাদের দুর্বলতার কারণ হয়েছিল। রাজপুত শাসকশ্রেণী ও শাসিত জনগণের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান গড়ে উঠেছিল। অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন যে এই বিশাল দেশটি তার প্রচুর সম্পদসহ বিদেশী আক্রমণের মুখে অসহায় হয়ে পড়েছিল। বৈদেশিক আক্রমণ এর কারণ নয়, অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার ফল (The utter and precipitate prostration of such a vast and ancient land, endowed with resources far superior and greater to those of her invaders, can be the result mainly of internal decay and not merely of external attacks, which were its effect rather than the cause.)। অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা বিদেশীদের ভারত আক্রমণে উৎসাহ জুগিয়েছিল, তার পতনের কারণ হয়েছিল।

অনেকে ভারতীয় রাজাদের সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। আলবেরুনি তাঁদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন যে হিন্দুরা নিজেদের সেরা জাতি বলে মনে করে, তাদের মতো দেশ নেই, রাজা নেই, বিজ্ঞান নেই। অন্য জাতির সঙ্গে মেলামেশা করলে তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গির অবশ্যই পরিবর্তন ঘটত (The Hindus believe that there is no country but theirs, no king like theirs, no science like theirs...If they travelled and mixed with other nations they would soon change their mind.)। রাজপুতদের সমস্যা হলো তারা অন্যদের কাছ থেকে কিছু শিখতে চায়নি। মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া থেকে তারা কিছুই গ্রহণ করেনি, এই অঞ্চলের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সামরিক সংগঠনের তারা খবর রাখত না। এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তাদের সামরিক সংগঠন ও সমর কৌশলের পরিবর্তন ঘটেনি, সমকালীন পরিবর্তনকে তারা গ্রহণ করতে পারেনি। তুর্কিদের তুলনায় ভারতীয়দের সামরিক সংগঠন, নেতৃত্ব ও সমরকৌশল অবশ্যই দুর্বল ছিল। তাদের সামাজিক সংগঠন ও রাষ্ট্রব্যবস্থা তুর্কিদের চেয়ে পিছিয়ে ছিল। সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ও দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতার জন্য তারা কূটনীতি, সমরনীতি, যুদ্ধবিদ্যা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটাতে পারেনি। এজন্য ভারত সীমান্তে তারা তুর্কিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছিল।

পঞ্চম অধ্যায়

অর্থনীতি (৬৫০-১২০০)

অগ্রহার, কৃষি অর্থনীতির সম্প্রসারণ, ভূমিব্যবস্থায় পরিবর্তন, কৃষক, মধ্যস্বত্বভোগী, ভূস্বামী, আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য

সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে হিউয়েন সাঙ্ সারা ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেছিলেন। কৃষি সমগ্র উপমহাদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ছিল কৃষিজীবী। চীনা পরিব্রাজক ভারতীয় কৃষি সম্পর্কে যা বলেছেন তা থেকে স্বচ্ছন্দে অনুমান করা যায় যে ভারতে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল, বহুরকমের কৃষিজ পণ্য উৎপন্ন হতো। উৎপন্ন ফসলের মধ্যে ধান, আখ, তুলো, তিল, সরিষা ও নীল ছিল প্রধান। গুপ্তরাজাদের আমলে অগ্রহার ব্যবস্থার চলন হয়, গুপ্তরাজারা ব্রাহ্মণ, দেবালয়, মন্দির, বৌদ্ধ মঠ ও বিহারকে ভূমিদান করেন। পূর্ব ভারতের পাল, পশ্চিম ভারতের বকাটক ও দক্ষিণের চোল রাজারা ভূমিদান করেন। গুপ্তরাজাদের তাম্রশাসনগুলি হলো জমি ক্রয়-বিক্রয়ের দলিল। ধনীরা জমি কিনে ব্রাহ্মণ ও মন্দিরকে দান করত (ব্রহ্মদেয় ও দেবদান)। এইসব জমির বেশিরভাগ ছিল পতিত ও অনাবাদী। এইসব জমির সীমানা চিহ্নিত করে রাজারা হস্তান্তর করতেন। বিক্রয় ও দানের পর পুরোহিত ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি যেসব ভূমি লাভ করত তা ছিল স্থায়ী, এর আর পরিবর্তন হতো না। প্রাচীন বাংলার অধিকাংশ জমি যা হস্তান্তরিত হয়েছিল তার বেশিরভাগ ছিল পতিত জমি, অনাবাদী। ব্রাহ্মণ ও মন্দির এগুলির ওপর পুরো মালিকানা লাভ করেছিল। মধ্যভারত, পশ্চিম ভারত ও দাক্ষিণাত্যে এই পর্বে যেসব জমি অগ্রহার হিসেবে দেওয়া হয় তাতে অবশ্য চাষবাস ছিল। রাজারা এগুলি ব্রাহ্মণ ও মন্দিরকে দান করতেন, রাজারা ভূখণ্ড বা গ্রাম দান করতেন, ভূমিদান করার সময় রাজার উচ্চপদস্থ কর্মচারী, গ্রামের সম্ভ্রান্ত মানুষ ও কৃষক উপস্থিত থাকত।

পশ্চিম ভারতে বকাটক আমলে পঁয়ত্রিশখানি গ্রাম অগ্রহার হিসেবে দান করা হয়েছিল। তবে গ্রাম দান করা হলেও গ্রামের ওপর সব অধিকার দানগ্রহীতা পেত না, গ্রাম থেকে তিনি প্রাপ্য রাজস্ব ভোগের অধিকারী হন। গ্রাম ছাড়াও ব্রাহ্মণদের ভূখণ্ড দেওয়ার রীতি ছিল। ব্রাহ্মণ ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের মানুষ অগ্রহার ব্যবস্থার ফলে প্রচুর ভূসম্পত্তির অধিকারী হন। ফাহিয়েন ও হিউয়েন সাঙ্ জানিয়েছেন যে বৌদ্ধ বিহারগুলিও প্রচুর ভূসম্পদের অধিকারী ছিল। অধ্যাপক রামশরণ শর্মা জানিয়েছেন যে দানগ্রহীতা শুধু রাজস্বের অধিকারী হতেন না, তিনি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং

বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব পেতেন। অগ্রহার মালিক প্রশাসনিক ও বিচার সংক্রান্ত অধিকার লাভ করতেন। দানগ্রহীতারা তাঁদের সম্পত্তি চাষবাসের জন্য কৃষক নিয়োগ করতেন, অগ্রহার ব্যবস্থার ফলে ভূমিব্যবস্থায় অবশ্যই পরিবর্তন ঘটেছিল। রাজা ও কৃষকের মধ্যবর্তী স্থলে মধ্যস্বত্বভোগীর আবির্ভাব ঘটে। অগ্রহার ব্যবস্থায় দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণ, মন্দির, বৌদ্ধ বিহার সব ভূম্যধিকারী হয়ে বসেছিল। রামশরণ শর্মা মনে করেন যে অগ্রহার ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে রাজকোষের আয় কমেছিল, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ও বাজেটের ওপর চাপ পড়েছিল। হর্ষবর্ধন তাঁর আয়ের এক-চতুর্থাংশ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কাজকর্মের জন্য ব্যয় করতেন। অন্যদিকে আধুনিক গবেষকরা দেখিয়েছেন যে অগ্রহার ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে কৃষির সম্প্রসারণ ঘটেছিল, অধিকাংশ অগ্রহার জমি ছিল পতিত ও অনাবাদী। অনেকক্ষেত্রে অনাবাদী জমি বিক্রি করে রাজা আয় বাড়িয়ে নিতেন। অনাবাদী জমিতে চাষাবাদ বসানো হয়, কৃষ্ণমোহন শ্রীমালী এধরনের কৃষি সম্প্রসারণের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

প্রাচীন বাংলার তাম্রশাসনগুলিতে অনাবাদী জমি পুরোহিত, ব্রাহ্মণ ও মন্দিরকে দেওয়া হতো বলে জানা যায়। সপ্তম শতকে শ্রীহট্টের সামন্ত লোকনাথ দুশো ব্রাহ্মণকে যে অগ্রহার দেন তা ছিল অরণ্যের মধ্যে। ঐ অরণ্যে আগে জনবসতি ও কৃষিকাজ ছিল না। অষ্টম শতকে সামন্ত মরুণ্ডনাথ জঙ্গল ও জলাজমিতে একটি বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ করে অগ্রহারের ব্যবস্থা করেন। অগ্রহার প্রতিষ্ঠিত হলে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে কৃষক ও অন্যান্য পেশাদার (কামার, কুমোর, তাঁতি ইত্যাদি) গোষ্ঠীর মানুষরা সেখানে গিয়ে হাজির হতো। পরিত্যক্ত অরণ্য, জলাভূমি ও পতিত জমি আবাদী ও বসতিপূর্ণ হয়ে উঠত। রামশরণ শর্মা স্বীকার করে নিয়েছেন যে অগ্রহার ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে শুধু সামন্ত ব্যবস্থার উদ্ভব হয়নি, কৃষির সম্প্রসারণ ঘটেছিল। পরিত্যক্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল কৃষির আওতায় এসেছিল। অগ্রহার ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে রাজার আয় কমেছিল এই মত মেনে নেওয়া যায় না। বরং কৃষিজ উৎপাদন ও জনবসতি বৃদ্ধি পাবার জন্য রাজার আয় বেড়েছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। দক্ষিণ ভারতে পল্লব আমলে অগ্রহার ব্যবস্থার মাধ্যমে অরণ্য ধ্বংস করে বসতি স্থাপন ও কৃষির প্রসার ঘটানো হয়েছিল।

এই পর্বে কৃষির প্রসার ঘটেছিল। কৃষির সম্প্রসারণের নজির হলো কৃষি সম্পর্কে একাধিক গ্রন্থ রচিত হয়। *কৃষি পরাশর, কৃষিসূক্তি* হলো কৃষিবিদ্যা সম্পর্কিত রচনা। শূন্য পুরাণে বলা হয়েছে যে প্রাচীন বাংলায় অন্তত পঞ্চাশ রকমের ধান উৎপন্ন হতো। মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত বিলহরি (জব্বলপুর) লেখতে শাক ও বার্তাকুর উল্লেখ আছে। ভারতের বিস্তীর্ণ উপকূলভাগ জুড়ে প্রচুর নারকেল উৎপন্ন হতো। দক্ষিণ ভারত, কোঙ্কন, আসাম ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় প্রচুর পরিমাণে গুবাক (সুপারি) উৎপন্ন হতো। সুপারির পাশাপাশি পানের চাষ ছিল বলে জানা যায়। দক্ষিণ ভারতে প্রচুর পান উৎপন্ন

হতো। উৎপন্ন কৃষিজ পণ্যের মধ্যে ছিল কার্পাস ও তৈলবীজ। সমকালীন লেখতে এবং বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের বিবরণীতে দক্ষিণ ভারতে তুলো চাষের কথা আছে। চীনা লেখক চাওজুকুয়া *চু-ফান-চি* (১২২৫) গ্রন্থে জানিয়েছেন পংকিলো বা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাদেশে তুলো চাষ হতো। গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যে ভালো তুলো উৎপন্ন হতো। এই অঞ্চলের কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা তুলো চাষের পক্ষে খুব উপযোগী ছিল। ভারতে মশলার চাষ ছিল, মালাবার অঞ্চলে গোলমরিচ উৎপন্ন হতো। আদি মধ্যযুগের লেখমালায় এবং আরব লেখকদের রচনায় মালাবার অঞ্চলে মশলা চাষের কথা জানা যায়। কলহণ জানিয়েছেন যে কাশ্মীরে জাফরানের চাষ ছিল। গুজরাটের লেখতে কর্পূর, হিং, অগুরু, জায়ফল, জৈত্রী, মরিচ ও খেজুরের উল্লেখ আছে। এরমধ্যে কিছু ফল ও ফসল হয়তো পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে চাষ হতো। মরিচ গুজরাটের বাইরে থেকে আমদানি করা হতো। বহু ধরনের কৃষিজ ফসল প্রমাণ করে যে ভারতীয় উপমহাদেশে কৃষির সম্প্রসারণ ঘটেছিল, কৃষি অর্থনীতি দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপিত হয়েছিল।

হালভিত্তিক চাষের সম্প্রসারণের জন্য কৃষি উৎপাদনে বৈচিত্র্য বেড়েছিল। চহমান বিগ্রহরাজের হর্ষ লেখতে (৯৭৫) ‘বৃহদহলের’ (বড় লাঙল) কথা জানা যায়। *মঙ্খকোষ* গ্রন্থে বলা হয়েছে যে হল ছিল অধিকাংশক্ষেত্রে কাঠের তৈরি। কৃষিপ্রধান জীবনে ঢেঁকির ব্যবহার বেড়েছিল। দামোদর গুপ্তের *কুট্টনীমতম,* কলহণের *রাজতরঙ্গিণী, সুভাষিত রত্নকোষ* ও শ্রীধর দাসের *সদুক্তিকর্ণামৃত*-এ ঢেঁকির উল্লেখ দেখা যায়। ঢেঁকি ছাড়া উদুখলের ব্যবহার ছিল, হেমচন্দ্র এই উদুখলের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। কৃষির অচ্ছেদ্য অঙ্গ হলো সেচব্যবস্থা, কৃষিব্যবস্থার সম্প্রসারণের সঙ্গে সেচব্যবস্থার প্রসার ঘটেছিল। আদি মধ্যযুগে শ্রেষ্ঠ সেচব্যবস্থার নিদর্শন পাওয়া যায় কাশ্মীরে। কলহণ কাশ্মীরের সেচব্যবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। বিতস্তার বন্যার প্রকোপ থেকে দেশবাসীকে রক্ষার জন্য সূর্য নামক এক ব্যক্তি রাজা অবন্তীবর্মার শাসনকালে (৮৩৬-৫৫) অসামান্য প্রযুক্তিজ্ঞানের প্রয়োগ ঘটিয়ে বিতস্তার গতিপথ পরিবর্তন করে দেন। এর ফলে বন্যার হাত থেকে দেশবাসী রক্ষা পায়, কাশ্মীরে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল, বাজারে ধানের দাম সস্তা হয়েছিল। এরকম নদীতে বাঁধ দিয়ে জলসেচ গড়ে তোলার নজির আর নেই। এযুগে সেচের জন্য কূপের জল ব্যবহার করা হতো। গভীর কূপ (বাপী) খনন করে চাষের জমিতে জল সরবরাহ করা হতো। গুজরাট ও রাজস্থানে কূপের জলে চাষ হতো। রামশরণ শর্মা দেখিয়েছেন যে কূপের প্রধান কাজ ছিল কৃষিক্ষেত্রে জল সরবরাহ করা। অধ্যাপক ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় রাজস্থানের সেচব্যবস্থার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন।

এই পর্বে সেচের প্রধান যন্ত্রটি হলো অরঘট্ট, এটি আবার ঘটিযন্ত্র, উদ্‌ঘাটক ইত্যাদি নামেও পরিচিত। এই চক্রাকার যন্ত্রটির গায়ে অনেক ঘটি বসানো থাকত, চক্রটি

ঘুরলে ঘটি জলভর্তি হয়ে চাষের জমিতে ছড়িয়ে দিত। রাজস্থানের মান্দোরের ভাস্কর্যে অরঘট্টের রূপটি ধরা আছে। অনেকে এই যন্ত্রটিকে পারস্য দেশীয় চাকাযন্ত্র বলে (Persian wheel) উল্লেখ করেছেন। ইরফান হাবিব জানিয়েছেন যে ভারতের অরঘট্ট এবং পারস্যের চক্র এক নয়। পারস্যের চাকায় দুটি অংশ ছিল, দুটি অংশের মধ্যে একটি 'গিয়ার' থাকত। অনুভূমিক চাকাটি ঘুরলে ওপরের চাকাটিও ঘুরত, ঘটি ভর্তি হয়ে জল কৃষিক্ষেত্রে সরবরাহ করা সম্ভব হতো। ইরফান হাবিব মনে করেন যে এই দ্বিতীয় যন্ত্রটি তুর্কি অভিযানের আগে ভারতে আসেনি। রাজস্থানে অরঘট্ট বলতে গভীর কূপকেও বোঝাত। চতুর্দশ শতকে ইবন বতুতা চট্টগ্রাম থেকে কামরূপ যাবার পথে চক্রাকার এই যন্ত্রটিতে জল তুলতে দেখেছিলেন। সেচব্যবস্থায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগ প্রাধান্য পেয়েছিল। রাজারা অনেকসময় বড় জলাশয় খনন করে কৃষিক্ষেত্রে সেচের ব্যবস্থা করে দিতেন। সন্ধ্যাকর নন্দী *রামচরিত*-এ বরেন্দ্র অঞ্চলে বিশাল দীঘির কথা উল্লেখ করেছেন। দক্ষিণ ভারতে চোলরাজারা 'চোল বারিধি' নামে জলাশয় নির্মাণ করে দেন। দক্ষিণ ভারতে জলসেচ ব্যবস্থার তদারকি করত গ্রামসভাগুলি। উর ও ব্রাহ্মণদের মহাসভাগুলি জলাশয়গুলির রক্ষণাবেক্ষণ, জলবণ্টন, কর আদায় ইত্যাদি কাজ করত। গ্রামসভার অন্তর্ভুক্ত সেচ সমিতির সদস্যরা শ্রমিক নিয়োগ করে জলাশয়গুলি পরিষ্কার করত, জলাশয়ের গভীরতা বাড়াত, জলবণ্টনের ক্ষেত্রেও গ্রামসভাগুলির প্রাধান্য ছিল।

৬৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে অগ্রহার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটেছিল, বৈষ্ণব ও শৈব মন্দিরগুলি ভূসম্পত্তির অধিকারী হয়েছিল। পূর্ব ভারতের বৌদ্ধবিহার নালন্দার অধীনে ছিল ২০৯টি গ্রাম। বাংলার চন্দ্র, বর্মন, দেব প্রভৃতি রাজবংশগুলি প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করেছিলেন। সেন আমলের অন্যতম প্রধান পণ্ডিত হলায়ুধ শর্মার বহু সম্পত্তি ছিল। উত্তর ও পশ্চিম ভারতে প্রতিহার শাসকেরা অগ্রহার ব্যবস্থার প্রসার ঘটিয়েছিলেন। তাঁরা শুধু ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করেছেন, কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে ভূমিদানের নজির নেই। দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট রাজারা ব্যাপকভাবে ভূমিদান করেন, একজন রাষ্ট্রকূট রাজা ১৪০০ গ্রাম দান করেন। দক্ষিণ ভারতে 'ব্রহ্মদেয়' ও 'দেবদানের' অজস্র নজির ছড়িয়ে আছে। একাদশ ও দ্বাদশ শতকে দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলি ভূম্যধিকারী হয়ে বসেছিল, ভূমিব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার প্রসার ঘটেছিল। ভূস্বামীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছিল, ভূমিব্যবস্থায় জটিলতা যে বেড়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। মধ্যস্বত্বভোগীর আবির্ভাব ঘটে, ভূস্বামী ও কৃষকের মধ্যবর্তী স্তরে মধ্যস্বত্বভোগীরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

ধর্মশাস্ত্রে ত্রিস্তর বিশিষ্ট ভূমিব্যবস্থার উল্লেখ দেখা যায়—রাজা, ভূস্বামী ও কৃষক। ভূস্বামী জমি নিজে চাষ করতেন না, এজন্য তাঁকে কৃষক নিয়োগ করতে হতো।

মালিকানাহীন কৃষি-শ্রমিকের উদ্ভব হয়েছিল, বৃহৎ ভূস্বামী এদের নিয়োগ করে কৃষি উৎপাদনের কাজ চালাতেন। জমির ব্যক্তিগত মালিকানা ছাড়াও ভোগাধিকারের মালিকানা তৈরি হয়েছিল। জমির কর্ষক ও ভোগাধিকারী ছিল আলাদা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অগ্রহার জমিতে কৃষকের মালিকানা ছিল না। নালন্দার মহাবিহার এবং দক্ষিণ ভারতের শৈব ও বৈষ্ণব মন্দিরগুলি নিজেদের ভূসম্পত্তি চাষিকে দিয়ে চাষ করাত। রাজস্থান, মালব ও গুর্জর দেশের তাম্রশাসনে বলা হয়েছে যে দানগ্রহীতা নিজে জমির উপস্বত্ব ভোগ করবেন, অন্যকে ভোগ করতে দেবেন (ভুঞ্জ তো ভোজাপয়তঃ), চাষিকে দিয়ে চাষ করাবেন বা নিজে চাষ করবেন। মধ্যস্বত্বের ইঙ্গিত এখানে স্পষ্ট রূপ নিয়েছে। ভূস্বামী অন্যকে জমির উপস্বত্ব ভোগ করতে দিতে পারেন, তাতে কোনো বাধা নেই। কৃষি অর্থনীতিতে বিভিন্ন স্তরের উদ্ভব ঘটেছিল। ভূস্বামীদের ভূখণ্ডের সীমা চিহ্নিত ছিল, তা সত্ত্বেও ভূস্বামীরা পার্শ্ববর্তী চারণভূমিতে চাষ বসিয়ে আয় বাড়াতে পারতেন। রাষ্ট্রকূট রাজারা অবশ্য দানগ্রহীতাদের বাড়তি সুবিধা দেননি। পাল ও সেন রাজারা জমি ছাড়াও ফলের বাগান, পতিত জমি, জলা জমি ইত্যাদি দানগ্রহীতাকে ভোগের জন্য দেন। ওড়িশাতে মাছ ও কচ্ছপের অধিকারও দানগ্রহীতাকে দেওয়া হয়। শর্মা মনে করেন যে অগ্রহার ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্রের ও যৌথ মালিকানার অধিকার ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতের ক্ষেত্রে নোবুরু কারাশিমা দেখিয়েছেন যে উর অঞ্চলের গ্রামসভা যৌথভাবে গ্রামের মালিকানা ভোগ করত, জমি থেকে গ্রামের সকল অধিবাসী উপকৃত হতো। ব্রহ্মদেয় গ্রামগুলিতে ব্রাহ্মণ ভূস্বামীরা ছিলেন। কারাশিমা চোল রাজবংশের শেষপর্বের লেখ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে ব্যক্তি জমি বিক্রি করছেন মন্দিরকে, গ্রামসভার উপস্থিতি চোখে পড়ে না। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে দক্ষিণ ভারতের ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রসার ঘটেছিল। জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রসার ভূস্বামীদের উত্থানের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছিল। ভূস্বামী জমির ওপর 'কানি' অধিকার পান অর্থাৎ ভোগদখলের অধিকার লাভ করেন। এক অঞ্চলের মানুষ অন্য অঞ্চলে গিয়ে জমি কিনে ভূস্বামী হয়ে বসেন। চোল সৈনিকরা জমি কিনে ভূস্বামী হয়ে বসেছিল এমন নজির পাওয়া যায়। জমিতে যৌথ অধিকার সঙ্কুচিত হয়, কৃষক জমি থেকে উৎখাত হয়েছিল, মালিকানা হারিয়েছিল।

শর্মা জানিয়েছেন যে ভূস্বামীরা শুধু জমির অধিকার লাভ করেননি, শাসন ও বিচারের অধিকারও পেয়েছিলেন। সামরিক বাহিনীর অফিসার, রাজকর্মচারীও জমি কিনে ভূস্বামী হয়ে বসেছিল। এইসব ভূস্বামী রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। অধীনস্থ ভূস্বামীরা সম্ভবত রাজাকে কর দিতেন, রাজাকে কর দিয়ে সন্তুষ্ট রেখে তাঁরা নিজ নিজ এলাকায় যথেচ্ছ রাজস্ব বাড়াতে পারতেন। অধীনস্থ জনগণের

কাছ থেকে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নিতেন। সামন্তরাজারাও ভূমিদান করতেন। ভূস্বামীরা শক্তিশালী হলে শাসন ও বিচারব্যবস্থা বিকেন্দ্রীভূত রূপ নিতে থাকে। বাংলার রাজা রামপাল সামন্তদের সাহায্য লাভের জন্য তাঁদের ভূসম্পত্তিসহ বহু সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিলেন, রাজার সার্বভৌমত্ব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভূস্বামীদের এবং তাঁদের অধীনস্থ মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়লে, রাজশক্তি দুর্বল হলে, কৃষকের অবস্থার অবনতি ঘটে। কৃষকদের সকলে মালিকানাহীন ছিল না, অনেকের জমি ছিল, আদি মধ্যযুগে এই অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। এই পর্বে কৃষকের প্রতিশব্দ হল 'হালকর' বা 'বদ্ধহল'। এই কৃষক শুধু জমি চাষ করে, জমির মালিকানা সম্ভবত তার ছিল না। *পদ্মপুরাণ*-এ চাষিদের দুরবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায়। কৃষকের দারিদ্র্য, পাশাপাশি ভূস্বামীদের বিলাসব্যসনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। *স্কন্দপুরাণ*-এ ইঙ্গিত আছে যে কলিযুগে রাজা প্রজাপীড়ন করবেন। কর ও নানাধরনের আইন-বহির্ভূত উপঢৌকন আদায় করা হয়েছিল। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের লেখমালায় অসংখ্য করের উল্লেখ আছে, করের সংখ্যা নিঃসন্দেহে বেড়ে গিয়েছিল। চোল রাজারা করের সংখ্যা বাড়িয়েছিলেন, নির্দিষ্ট কর ছাড়াও অতিরিক্ত কর আদায় করা হতো। কর বাড়লে কৃষকের দুর্গতি বেড়েছিল। দানগ্রহীতাকে নির্দিষ্ট কর ছাড়াও 'উচিত-অনুচিত' কর ও 'বিষ্টি' (বেগার শ্রম) আদায়ের অধিকার দেওয়া হয়। কলহণ জানিয়েছেন কাশ্মীরের রাজারা কৃষকের হাতে ন্যূনতম গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা রেখে বাকি সব গ্রাস করতেন। যাদব দেখিয়েছেন কৃষককে বলা হয়েছে 'আশ্রিত হালিক'। শর্মা ও যাদব মনে করেন যে কৃষককে সম্ভবত ভূমিতে আবদ্ধ করে রাখার চেষ্টা ছিল। কৃষক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা হারিয়েছিল, কোসাম্বী জানাচ্ছেন যে ভূস্বামীদের অত্যাচারের ফলে কৃষকেরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেত।

অত্যাচারের মাত্রা ছাড়ালে কৃষক সম্ভবত ভূস্বামীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাত। শুধু প্রতিবাদ নয়, সম্ভবত তারা প্রতিরোধও গড়ে তুলত, সমকালীন সাহিত্যে এর নজির আছে। পাল আমলের কৈবর্ত বিদ্রোহ হলো কৃষকের প্রতিবাদী আন্দোলনের একটি নিদর্শন, কৃষকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল। *রামচরিত*-এ অবশ্য বলা হয়নি যে দিব্য কৃষকদের নেতা ছিলেন। হেমচন্দ্র জানিয়েছেন যে কৃষকদের শ্রেণী বা সংগঠন ছিল, প্রয়োজন হলে তারা দলবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ করত, প্রতিরোধ গড়ে তুলত। ত্রয়োদশ শতকে কৃষক প্রতিরোধের ঘটনা একেবারে বিরল নয়।

শহরের বিকাশ

কৃষির প্রসার, শিল্পের উন্নতি ও বাণিজ্যের বিস্তার নগরায়ণের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছিল। রামশরণ শর্মা দেখিয়েছেন যে এই পর্বে ভারতে নগরজীবনে অবক্ষয় দেখা

দিয়েছিল। গাঙ্গেয় উপত্যকায় নগরগুলি অবক্ষয়ের পথে চলেছিল, এই ধারা ১০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বজায় ছিল বলে তিনি জানিয়েছেন। অধ্যাপক ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় তাঁর অভিমতের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তিনি দেখিয়েছেন যে এই পর্বে বহু পুরনো শহর টিকে ছিল। বেরিলি জেলার প্রাচীন শহর অহিচ্ছত্রের অস্তিত্ব বজায় ছিল। দিল্লি অঞ্চলে পুরনো শহরগুলির অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়। উত্তরপ্রদেশের অত্রঞ্জিখেরা শহরের পতন ঘটেনি, বারাণসী ধ্বংস হয়নি। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে যা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন তা হলো গাঙ্গেয় উপত্যকার শহরগুলি টিকে ছিল। বিহারের চিরন্দে উৎখনন চালিয়ে শহরের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে, হরিয়ানার পেহোয়াতে (প্রাচীন পৃথুদক) একটি প্রাচীন শহরের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এখানে ঘোড়ার বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল, শহরটি ছিল গুর্জর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। গাঙ্গেয় উপত্যকার একটি শহর হলো তত্ত্বানন্দপুর (বর্তমান বুলন্দশহরের কাছে), সমকালীন লেখমালায় এই শহরের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। রাস্তা, বাজার, দোকান, বাসগৃহসহ শহরটির পুরো পরিচয় পাওয়া যায়। এই শহরে কমপক্ষে ছয়টি মন্দির ছিল। প্রতিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সিয়াডোনিতে নগরের পরিচয় পাওয়া গেছে। এই শহরটি লবণ বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল, শহরের মধ্যে 'হট্ট' বা বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। বণিকরা ছাড়া এই শহরে অন্যান্য শ্রেণীর মানুষজন বসবাস করত, শহরটি রাজনৈতিক-প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল। গুর্জর প্রতিহারদের রাজ্য মধ্যে ছিল গোয়ালিয়র (গোপাদ্রি), এখানে শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ ও তৈলিক শ্রেণীর লোকদের সমাগম হয়। নগরের মধ্যে অন্তত দুটি বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল, নগরটি সম্ভবত প্রাকারবেষ্টিত ছিল। শহরের শাসক ছিলেন কোট্টপাল, গুর্জর শাসকেরা এদের নিযুক্ত করতেন। এই শহরে সামরিক অফিসার থাকতেন, এজন্য অনুমান করা হয় যে এই শহরটির সামরিক গুরুত্ব ছিল। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় মনে করেন যে এই পর্বে তত্ত্বানন্দপুর, সিয়াডোনি ও গোপাদ্রি ছিল পূর্ণ বিকশিত শহর, সিয়াডোনি ও গোপাদ্রি ছিল শহর হিসেবে অগ্রগণ্য।

মধ্যপ্রদেশের কলচুরি রাজারা নগরের পত্তন করেছিলেন। দ্বিতীয় লক্ষ্মণরাজের করিতলাই ও বিলহরি লেখতে শহরের কথা আছে। বিলহরিতে বহু দ্রব্যের আদান-প্রদান হতো বলে জানা যায়, বাণিজ্যপণ্যের ওপর কর ধার্য করা হয়। এই শহরে কৃষিজ পণ্যের বেচাকেনা হতো, পশ্চাদভূমি থেকে কৃষিজ পণ্য এই শহরে আমদানি করা হতো। কৃষি উন্নতির পটভূমিকায় গড়ে উঠেছিল রাজস্থানের নাডোল নগর। নাড্ডুল ছিল একটি গ্রাম, ধীরে ধীরে তা শহরে পরিণত হয়েছিল। বারোটি গ্রামের মধ্যস্থলে অবস্থিত নাড্ডুল বাণিজ্যিক লেনদেনের কেন্দ্র হয়েছিল। এখানে একটি মণ্ডপিকা বা বাজার গড়ে উঠেছিল, পরে রাজস্থানের চহমান রাজারা এখানে রাজধানী

স্থাপন করেন। দাক্ষিণাত্যে কৃষির প্রসার, বাণিজ্যের উন্নতি এবং কৃষিজ পণ্যের লেনদেন নগরায়ণের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছিল। ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে কর্ণাটকের বেলগাঁও (বেণুগ্রাম) ছিল একটি শহর। এখানে বহু বণিক দূর-দূরান্ত থেকে এসে সমবেত হয়েছিল, এখানে কৃষিজাত পণ্যের বাণিজ্য হতো। দক্ষিণ ভারতে চোল রাজ্যে কুড়ামুককু-পালাইয়ারাই নামক যুগ্ম শহরের কথা জানা যায়। পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে খাদ্যের জোগান আসত, কৃষিজ পণ্য ও শিল্পপণ্যের লেনদেন হতো, স্থানীয় সম্ভ্রান্ত গোষ্ঠী ও মন্দিরের চাহিদা মেটাত এই শহর। শহরটির বাণিজ্যিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পেলে বাইরে থেকে বহু বণিক এখানে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করত, মন্দির কর্তৃপক্ষ এদের উৎসাহ দিত। দক্ষিণ ভারতের আরও কিছু শহর মন্দিরের আওতায় বিকশিত হতে থাকে। ১০০০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে নগরায়ণ সারা ভারতে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছিল। তার আগে উত্তর ও মধ্য ভারতে বেশ কিছু নগর প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে আদি মধ্যযুগের নগরায়ণ হলো ভারতে তৃতীয় পর্বের নগরায়ণ। তৃতীয় পর্বের নগরগুলি বেশিরভাগ আঞ্চলিক পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ ছিল, এরা স্থানীয় বাণিজ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। স্থানীয় শক্তির বিকাশ বিভিন্ন অঞ্চলে নগর গড়ে তুলতে সহায়ক হয়, স্থানীয় শক্তিকেন্দ্র হিসেবে নগরগুলি বিকাশলাভ করেছিল।

শিল্প ও শিল্পগিল্ড

ভারতের কৃষিতে বহু পণ্যের উৎপাদন শুরু হয়েছিল, অনেক কৃষিজ পণ্য ছিল শিল্প-পণ্যের উপকরণ। আখ, তুলো, নীল প্রভৃতি কৃষিজ পণ্যকে কেন্দ্র করে শিল্প গড়ে উঠেছিল। ভারতে এযুগে চিনি শিল্প গড়ে উঠেছিল। *দেশীনামমালা*-তে আখ মাড়াই যন্ত্রকে 'হস্তযন্ত্র' বা পীড়নযন্ত্র বলা হয়েছে। রাজস্থানের অর্থুনা লেখতে চিনি ও গুড় শিল্পের উল্লেখ আছে। চাওজুকুয়া জানিয়েছেন যে আদি মধ্যযুগের মালবে প্রচুর চিনি উৎপন্ন হতো, এই চিনি গুজরাটে রপ্তানি করা হতো। আখের মতো বস্ত্রবয়ন ছিল একটি প্রধান শিল্প। হেমচন্দ্র *অভিধান চিন্তামণি*-তে তুলো পেঁজার জন্য ধনুক ব্যবহার করা হতো বলে জানিয়েছেন, *অমরকোষ*-এ তুলো পেঁজার ধনুকের কথা আছে। একাদশ শতকে রচিত *মানসোল্লাস*-এ ভারতের প্রধান বস্ত্রশিল্প কেন্দ্রগুলির উল্লেখ আছে। মুলতান (মূলস্থান), গুজরাটের আনহিলবারা, বঙ্গ (দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গদেশ), নাগপট্টন (তাঞ্জোর) ও চোলদেশে বস্ত্র উৎপন্ন হতো। *রাজতরঙ্গিণী*-তে পাটনকে বস্ত্রকেন্দ্র রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। চাওজুকুয়া মালব ও গুজরাটের বস্ত্রশিল্পের কথা বলেছেন। মার্কোপোলো দাক্ষিণাত্যের বরঙ্গল রাজ্যের বস্ত্রশিল্পের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বাংলার বস্ত্র সম্পর্কে বিদেশীরা প্রশংসা করেছেন। আল মাসুদি, ইবন খোরদাদবা,

আল ইদ্রিসি, চাওজুকুয়া সকলে বাংলার বস্ত্রের প্রশংসা করেছেন। তবে কৌশাম্বী, মগধ ও মথুরার মতো বস্ত্রশিল্পকেন্দ্রের উল্লেখ সমকালীন সাহিত্যে পাওয়া যায় না। সম্ভবত এসব শিল্পকেন্দ্রের অবক্ষয় ঘটেছিল, আদি-মধ্যযুগে বস্ত্রশিল্পের উন্নতি ঘটেছিল কামরূপে।

তৈলবীজের উৎপাদন বেড়েছিল, সেইসঙ্গে তৈল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল। বহু লেখতে তৈলিকদের উল্লেখ আছে। তৈল নিষ্কাশণের জন্য দুরকমের যন্ত্র ছিল—ঔদ্র ও চক্রিক। চক্রিক হলো ঘানিযন্ত্র, সম্ভবত ঘানির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছিল। ধাতুশিল্পের প্রসার ঘটেছিল বলে জানা যায়। রামশরণ শর্মা লোহার ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছিল বলে জানিয়েছেন। দ্বাদশ শতকের একখানি গ্রন্থে (*পর্যায়মুক্তাবলী*) ছয়রকম লোহার উল্লেখ করা হয়েছে। ওড়িশার মন্দিরগুলিতে লোহার ব্যবহার হয়েছিল, রাজারা প্রচুর তাম্রশাসন চালু করেন। অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে তামার ব্যবহার বেড়েছিল। আদি মধ্যযুগে বিভিন্ন অঞ্চলে বহু ধাতুমূর্তি নির্মিত হয়, এর মধ্যে ব্রোঞ্জের মূর্তিগুলি প্রাধান্য পেয়েছিল। পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে বহু ধাতুমূর্তি পাওয়া গেছে। ভারতে উৎকৃষ্ট মানের তরবারি নির্মিত হতো, আরব লেখকেরা পাল সাম্রাজ্যে নির্মিত তরবারির প্রশংসা করেছেন। মগধ ও অঙ্গে ভালো তরবারির উল্লেখ আছে। বারাণসী, সৌরাষ্ট্র ও কলিঙ্গেও ভালো তরবারি তৈরি হতো বলে জানা যায়। ধাতুর ব্যবহারের জন্য জ্বালানির প্রয়োজন হয়, ভারতীয়রা কয়লা ও কাঠকয়লার ব্যবহার শিখেছিল। অধ্যাপক ভক্তপ্রসাদ মজুমদার *দেশীনামমালার* ভিত্তিতে তা প্রমাণ করেছেন।

সমসাময়িক লেখ, ধর্মশাস্ত্র ও বিভিন্ন তথ্যসূত্রে শিল্পীদের গিল্ড বা শ্রেণীর উল্লেখ আছে। গিল্ড হলো শিল্পী-কারিগরদের সংগঠন। সম্ভবত আদি মধ্যযুগে গিল্ডের প্রভাব খানিকটা কমেছিল, সদস্যদের ওপর গিল্ডের প্রভাব আগের মতো ছিল না। লালনজী গোপাল দেখিয়েছেন যে গিল্ড ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে মেনে নিয়েছিল, সদস্যদের স্বাতন্ত্র্য বৃদ্ধি পেয়েছিল, যৌথস্বার্থ এতে খানিকটা ক্ষুণ্ন হয়েছিল। রমেশচন্দ্র মজুমদার দেখিয়েছেন যে কর ফাঁকি, জুয়া খেলা ও বারাঙ্গনার উপস্থিতি ঘটলে রাজা গিল্ডের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে পারতেন। আগে রাজা গিল্ডের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতেন না। *নারদস্মৃতি* থেকে অনুমান করা যায় যে গিল্ডের পরিচালনার ওপর রাজার হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পেয়েছিল, গিল্ডের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা এতে অবশ্যই ক্ষুণ্ন হয়েছিল। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের সাহিত্যে শ্রেণীকরণের উল্লেখ আছে। শ্রেণীকরণ হলো প্রশাসনিক দপ্তর যা গিল্ডগুলির তত্ত্বাবধান করত। আদি মধ্যযুগের শ্রেণীগুলিকে 'জাতি' আখ্যা দেওয়া হয়েছে, জাতি ও শ্রেণী ছিল সমার্থক শব্দ। বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে শ্রেণীকে সংকর বা মিশ্রজাতির বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শাস্ত্রকাররা মিশ্রজাতিকে কখনো ভালো চোখে দেখেননি। কুম্ভকার, তাঁতি, স্বর্ণকার, রজতকার প্রভৃতি হলো

শুদ্ধ জাতি, চর্মকার, তেলি, ইক্ষুপীড়নকারী, রঙ্গকার, কাঁসারি প্রভৃতি হলো অশুদ্ধ। জিনসেন সুরির চোখে স্বর্ণকার, কুম্ভকার, কর্মকার, কারিগর প্রভৃতি সামাজিক গোষ্ঠীর লোকেরা হলো নিম্নমানের, অধম পর্যায়ভুক্ত।

সমকালীন লেখমালায় শ্রেণীর উল্লেখ আছে। গোয়ালিয়র লেখতে অন্তত কুড়িজন তৈলিক প্রধান ও চোদ্দজন মালাকার প্রধানের নাম পাওয়া যায়। এছাড়া সুরা প্রস্তুতকারীদের শ্রেণী ছিল, পাথরকাটা কারিগরদের সংগঠন ছিল। প্রাক্-৬৫০ পর্বে একটি বৃত্তিকে ঘিরে একজন প্রধানের নেতৃত্বে শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। এই পর্বে (৬৫০-১২০০) এক বৃত্তির মধ্যে একাধিক শ্রেণী গড়ে উঠেছিল বলে অনুমান করা হয়। শ্রেণীর যে দৃঢ়বদ্ধ রূপটি আগে দেখা গিয়েছিল তার অবক্ষয় শুরু হয়েছিল। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় মনে করেন যে আদি মধ্যযুগে একটি বৃত্তিকে ঘিরে একটিমাত্র শ্রেণী ছিল না। শ্রেণীগুলি এক একটি পরিবারকে আশ্রয় করে গড়ে উঠতে থাকে। এক পেশায় অনেক সংগঠন এবং একাধিক নেতার আবির্ভাব ঘটে। শ্রেণীর সংগঠনে অবশ্যই ভাঙন দেখা দিয়েছিল। ভক্তপ্রসাদ মজুমদার মনে করেন যে আদি মধ্যযুগে ভূস্বামীদের প্রভাব বেড়েছিল, শ্রমিকদের একটা বড় অংশ কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত হয়েছিল। এজন্য শিল্পগিল্ডের পরিচালনায় শ্রমের অভাব ঘটেছিল। আগে গিল্ডগুলি ব্যাঙ্কিং-এর কাজ করত, গিল্ডের ব্যাঙ্কিং ভূমিকা এ পর্বে অনেকটা ম্লান হয়েছিল। অর্থ লগ্নি করার দৃষ্টান্ত আছে তবে সে অর্থ রাখা হয় শ্রেণীপ্রধানের কাছে, শ্রেণীর কাছে নয়। রাজকীয় হস্তক্ষেপ, শ্রেণীগুলির জাতিতে রূপান্তর, শ্রেণীগুলির পারিবারিক সংগঠনের আকার ধারণ, অর্থলগ্নির ঘটনার বিরলতা প্রমাণ করে যে আদি মধ্যযুগে শ্রেণীর অবনমন ঘটেছিল।

মুদ্রাব্যবস্থা

রামশরণ শর্মা ও তাঁর অনুগামীরা মনে করেন যে এই পর্বে অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য কমেছিল, এজন্য মুদ্রার ব্যবহার কমেছিল। সাম্প্রতিক কালে তিনি তাঁর মতের সংশোধন করে বলেছেন যে ১০০০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য যে বেড়েছিল তার প্রমাণ হলো মুদ্রার ব্যবহার বেড়েছিল। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাদেশের ময়নামতীতে উৎখননের ফলে রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গেছে। অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাদেশে নিরবচ্ছিন্নভাবে রূপার মুদ্রার চলন ছিল। মুদ্রাগুলির গায়ে বৃষমূর্তি ও ত্রিশূলের ছাপ আছে। সম্ভবত মুদ্রাগুলি আরাকানের ধাঁচে তৈরি হয়েছিল। দশম শতকের পর থেকে মুদ্রাগুলির গঠনে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। মুদ্রাগুলি আকারে বড় হয়, একপিঠে নকশা আঁকা হয়, ওজনও বেড়েছিল। মুদ্রাগুলি

ওজনে হালকা হলেও তাদের ধাতুগত বিশুদ্ধতা বজায় ছিল। এইসময় উত্তর ভারতে প্রচলিত মুদ্রাগুলি হলো পুরাণ, ধরণ, কার্ষাপণ ও দ্রম্ম। সমকালীন লেখমালায় ৫৭.৪ গ্রেন ওজন বিশিষ্ট মুদ্রাগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলার হরিকেল মুদ্রার আকৃতি ও ওজনে পরিবর্তনের কারণ হলো এগুলিকে উত্তর ভারতীয় মুদ্রার সমমানে উন্নীত করা হয়। এইসময় পশ্চিম এশিয়ায় প্রচলিত রুপোর মুদ্রার নাম হলো দিরহাম। বাংলার মুদ্রা এগুলির সঙ্গে সমতা বজায় রেখেছিল। সম্ভবত বাংলার মুদ্রা ভারত ও ভারতের বাইরে বাণিজ্য বিনিময়ের কাজে ব্যবহার করা হতো। বাংলার পাহাড়পুর অঞ্চল থেকে খলিফা হারুন রসিদের রৌপ্যমুদ্রা এবং ময়নামতীতে খলিফা মুসতাসিম বিল্লার স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে। অনুমান করা যায় এই অঞ্চলের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ছিল। আরব লেখকেরা চট্টগ্রাম (সমন্দর-সুদকাওয়ান) বন্দরের প্রশংসা করেছেন।

৬৫০-১০০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে উত্তর ভারতে মুদ্রার ব্যবহার কমেছিল এই ধারণা আর সমর্থন করা যায় না। বাণিজ্য চলেছিল, সুতরাং মুদ্রার ব্যবহার ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের মতো উত্তর-পশ্চিম বঙ্গে মুদ্রা পাওয়া যায়নি। পাল ও সেন রাজাদের নামাঙ্কিত মুদ্রার সন্ধান মেলেনি। এদের তাম্রশাসনে পুরাণ ও কপর্দক ব্যবহারের উল্লেখ আছে। কপর্দক হলো কড়ি, বাংলাদেশে কড়ির ব্যবহার ছিল। বহির্বাণিজ্যে কড়ির ব্যবহার ছিল না, সুতরাং বিনিময় বাণিজ্য ছিল বলে অনুমান করা হয়। মাহুয়ান জানিয়েছেন যে বাংলা থেকে চাল যেত মালদ্বীপে, সেখান থেকে কড়ি আসত বাংলায়। কড়ি এখানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যম ছিল। কড়ির উপস্থিতি দিয়ে প্রমাণ করা যায় না যে বাণিজ্য কমেছিল, আবদ্ধ অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে কড়ি ও পুরাণ জাতীয় মুদ্রার মধ্যে সহজ বিনিময় ব্যবস্থা ছিল। ১২৮০টি কড়ির বিনিময়ে একটি রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া যেত, ২০,৪৮০টি কড়ির বিনিময়ে একটি স্বর্ণমুদ্রা। পাল-সেন যুগে মুদ্রা ছিল না বলে বাণিজ্যের ক্ষতি হয়নি, পুরাণ, কপর্দক সহজেই হরিকেলের রৌপ্যমুদ্রার সঙ্গে বিনিময় করা হতো।

বিপুল পরিমাণ কড়ি নিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনায় অসুবিধা হতো। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের লেখগুলিতে নতুন মুদ্রার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই মুদ্রা হলো চূর্ণী। পুরাণ ও চূর্ণী হলো সমার্থক। ওড়িশার লেখতে পুরাণ, কার্ষাপণ ও চূর্ণীকে সমার্থক বলে দেখানো হয়েছে। সম্ভবত সোনা ও রুপোর গুঁড়ো হলো চূর্ণী। আরব লেখকেরা জানিয়েছেন যে প্রতিহারদের রাজ্যে ধাতব চূর্ণ দিয়ে ব্যবসা চালানো হতো। তিব্বতী ঐতিহ্যে স্বর্ণ চূর্ণ ব্যবহারের নিদর্শন আছে। চূর্ণী সোনা ও রুপোর মুদ্রার বিকল্প হিসেবে বিনিময় মাধ্যম হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। সোনা ও রুপোর চূর্ণী ব্যবহারের ফলে বণিকদের বহু কড়ি নিয়ে বিদেশে যেতে হতো না, এতে বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা করা সহজ হয়েছিল। সমকালীন উত্তর ভারতে যেসব ধাতব মুদ্রা

ছিল তাদের ওজন ও ধাতব বিশুদ্ধতা সবসময় নির্ভরযোগ্য হতো না। এজন্য এধরনের মুদ্রা দিয়ে দূরপাল্লার বাণিজ্য পরিচালনা করা সম্ভব হতো না। ধাতু চূর্ণ সম্ভবত এধরনের মুদ্রার স্থান নিয়েছিল। আদি মধ্যযুগে বাংলায় তিন ধরনের বিনিময় মাধ্যম ছিল। সকলের ওপরে ছিল রৌপ্যমুদ্রা দ্রম্ম, কার্ষাপণ, পুরাণ, মাঝখানে ছিল সোনা বা রৌপ্য চূর্ণ এবং সর্বনিম্নে ছিল কপর্দক বা কড়ি। এদের মধ্যে সহজ বিনিময়-যোগ্যতা ছিল। অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মনে করেন শুধু বাংলা নয় উত্তর ভারতের সর্বত্র এধরনের ত্রিস্তর বিশিষ্ট (ধাতব মুদ্রা, চূর্ণী ও কপর্দক) মুদ্রাব্যবস্থা ছিল। এইপর্বে পাঞ্জাবেও বেশ কিছু মুদ্রা পাওয়া গেছে, সমগ্র ভারতবর্ষে বিনিময় প্রথার স্থান নিয়েছিল মুদ্রানির্ভর অর্থনীতি।

অন্তর্বাণিজ্য

সমকালীন লেখমালায় সমগ্র উপমহাদেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের কথা আছে। এসব উপাদানে হট্ট ও হট্টিকার উল্লেখ পাওয়া যায়, এগুলি হলো আধুনিক কালের হাট যা সপ্তাহে একবার বা দুবার বসে। দক্ষিণ ভারতে ও দাক্ষিণাত্যে এধরনের হাট ছিল যেগুলি সন্থে নামে পরিচিত। নির্দিষ্ট দিনের সন্থে সেই দিনের নামানুসারে চিহ্নিত হতো। এই হাটগুলি অনেকসময় মেলার রূপ পরিগ্রহ করত, অনেক মেলায় গবাদি পশুর কেনাবেচা হতো। নবম শতকের রাজস্থানের লেখতে কম্বলী হট্ট ও ঘোটক যাত্রার (ঘোড়ার মেলা) উল্লেখ আছে। অনুমান করা অসঙ্গত হবে না এই ধরনের জীবজন্তুর মেলা বছরের নির্দিষ্ট সময়ে কয়েকদিন ধরে চলত। হাট বা মেলা ছাড়াও মণ্ডপ ও মণ্ডপিকা নামে বাজার ছিল, সম্ভবত এগুলি ছিল আচ্ছাদিত এলাকা। উত্তর ভারতের বাণিজ্যকেন্দ্র হলো মণ্ডপিকা। আদি মধ্যযুগে এই ধরনের বাজারের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল। অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে কাংড়া, গোয়ালিয়র, ভরতপুর, জব্বলপুর, রাজস্থান ও গুজরাটের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন আয়তনের মণ্ডপিকা স্থাপিত হয়েছিল। রাজস্থান ও গুজরাটে এধরনের মণ্ডপিকার সংখ্যা ছিল বেশি। ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় রাজস্থানের অনেকগুলি লেখ বিশ্লেষণ করে বারোটি মণ্ডপিকা ও সমসংখ্যক হাটের সন্ধান পেয়েছেন। তিনি চারটি বাণিজ্যকেন্দ্রের কথাও উল্লেখ করেছেন। মণ্ডপিকাগুলি কোথাও কোথাও শুল্ক মণ্ডপিকা বলে উল্লিখিত হয়েছে, সম্ভবত এইসব স্থানে বাণিজ্যশুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা ছিল। রাজস্থানের মণ্ডপিকাগুলির বেশ কয়েকটি গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত ছিল। সিয়াডোনি, গোয়ালিয়র ও জব্বলপুর অঞ্চলের মণ্ডপিকা ছিল বড় শহরে (পত্তনমণ্ডপিকা), লেখতে এদের মহামণ্ডপিকা বলা হয়েছে।

উত্তর ভারতে বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে মণ্ডপিকার বিকাশ ঘটেছিল। দক্ষিণ ভারতে ছিল নগরম, দক্ষিণ ভারতের লেখতে এই নগরমের উল্লেখ পাওয়া যায়। কেনেথ হল

চোল আমলের লেখমালায় তেত্রিশটি নগরমের সন্ধান পেয়েছেন। হল মনে করেন যে কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গঠিত হতো আর্থ-সামাজিক-প্রশাসনিক কেন্দ্র নাড়ু। প্রত্যেক নাড়ুতে একটি করে নগরম ছিল। বার্টন স্টেইন চোল আমলের কৃষি অর্থনীতি ও নগরমের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ করেছেন। হলের মতে, নগরমগুলি গ্রামের সঙ্গে লেনদেনের কাজ করত, আবার অন্য নাড়ুর সঙ্গে বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের কাজ চালাত। তিনি আরও জানিয়েছেন যে দক্ষিণ ভারতের বণিক সংগঠন 'নানাদেশী'র সঙ্গে নগরমগুলির বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত স্থল বাণিজ্যকেন্দ্র 'এরিবীরপট্টিনমের' সন্ধান হল দিয়েছেন। তবে প্রত্যেক নাড়ুতে একটি করে নগরম ছিল এর কোনো অকাট্য প্রমাণ নেই।

লেখমালায় শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ ও বণিকদের উল্লেখ আছে। দক্ষিণ ভারতের কোলাপুর, মিরাজ ও বেলগাঁওয়ে প্রাপ্ত লেখতে বণিক সমাবেশের কথা আছে। বণিকরা কোথা থেকে এসেছে তার পরিচয় এবং তাদের নামের তালিকা পাওয়া যায়। গুজরাট (লাট), রাজস্থান ও কোঙ্কনের বণিকদের নাম পাওয়া গেছে। উত্তর ভারতে আদি মধ্যযুগে বণিকদের সংগঠনের উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু এই পর্বে দক্ষিণ ভারতে দুটি বণিক সংগঠনের নাম পাওয়া গেছে—*মণিগ্রামম* ও *নানাদেশী* নামে এদুটি পরিচিত ছিল। দশম থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে বাণিজ্যে এদের বিশিষ্ট ভূমিকার কথা জানা যায়। এই সংগঠনের বণিকরা বহু দূর দেশ থেকে পণ্য আমদানি করত এবং রাজদরবারে ও অভিজাতদের কাছে সেগুলি বিক্রি করত। এদের আমদানি পণ্যের তালিকায় ছিল মণিমুক্তো, বিলাসদ্রব্য, সুগন্ধি দ্রব্য, বস্ত্র ইত্যাদি। রাজারা এদের পৃষ্ঠপোষকতা দিতেন, লেখমালায় আরও বলা হয়েছে এই দুই সংগঠনের বণিকদের রক্ষা করত সশস্ত্র প্রহরীরা।

বণিকরা পণ্যসম্ভার নিয়ে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে যেত। বণিকদের কাছ থেকে 'স্কন্ধক' নামক কর আদায় করা হতো। সম্ভবত এইসব বণিকরা কাঁধে করে তাদের বিক্রয়যোগ্য পণ্য বহন করত। স্থলপথ বাণিজ্যের ওপর 'মার্গনক' নামক কর ছিল। যাতায়াত ব্যবস্থার পরিচয় লেখমালায় তেমন পাওয়া যায় না। তবে গুজরাটে প্রাপ্ত একটি লেখতে বলা হয়েছে যে পণ্য বহনের জন্য বলদ, গর্দভ ও উট ব্যবহার করা হতো। রাজস্থানে ভ্রাম্যমাণ বানজারা বণিকদলের অস্তিত্ব ছিল। এরা ষাঁড়ের পিঠে করে এক স্থান থেকে পণ্য অন্য স্থানে বহন করে নিয়ে যেত, বাণিজ্যও করত। ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় বৃষপৃষ্ঠে পণ্য বহনকারী বণিকদের বর্ণনা দিয়েছেন। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত কিছু রাস্তাঘাটের বিবরণও পাওয়া যায়। কিয়াতানের চৈনিক বিবরণে উল্লিখিত হয়েছে যে কামরূপ থেকে উত্তরবঙ্গ হয়ে রাজমহল পাহাড়ের মধ্য দিয়ে (কাঁকজোল) মগধ পৌঁছানো যেত। অষ্টম শতকে অযোধ্যার তিন বণিকভ্রাতা

স্থলপথে তাম্রলিপ্ত বন্দরে এসেছিলেন, গঙ্গেয় উপত্যকার সঙ্গে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলের যোগাযোগ ছিল। একাদশ শতকে আলবেরুনি কনৌজ ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ লক্ষ করেছিলেন, তিনি কয়েকটি পথঘাটের উল্লেখ করেছেন। একটি পথ কনৌজ থেকে বেরিয়ে অযোধ্যা, বারাণসী, পাটনা, মুঙ্গের হয়ে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত পৌঁছেছিল। আর একটি পথ কনৌজ থেকে বেরিয়ে ওড়িশা হয়ে দক্ষিণ ভারতে গিয়েছিল। আলবেরুনি জানিয়েছেন যে কনৌজের সঙ্গে স্থলপথে কাশ্মীর, তিরহুত, কামরূপ ও নেপালের যোগাযোগ ছিল। গুজরাটের বিখ্যাত বন্দর ও মন্দির শহর সোমনাথের সঙ্গে মথুরার সংযোগরক্ষাকারী রাস্তা ছিল, এই পথ মথুরা থেকে বেরিয়ে উজ্জয়িনী, ধর, জয়পুর হয়ে সোমনাথ পৌঁছেছিল। রামশরণ শর্মা বলেছেন যে একাদশ শতক থেকে ভারতের বাণিজ্য বেড়েছিল। সপ্তম থেকে একাদশ শতক পর্যন্ত ভারতের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের গতিময়তার চিত্র পাওয়া যায়।

বহির্বাণিজ্য

শর্মা ও তাঁর অনুগামীরা স্বীকার করেন না যে চতুর্থ থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের বহির্বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সপ্তম শতকে ইসলামের আবির্ভাব আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। ইসলাম শুধু নতুন ধর্মমত প্রচার করেনি, নিয়ে এসেছিল নতুন জীবনদর্শন, জীবনযাপন পদ্ধতি। ইসলামের শাসনাধীন অঞ্চলে নগর ও ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্ব বেড়েছিল। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা বাণিজ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এশিয়ার সমুদ্র বাণিজ্যে আরবদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল। ভারত মহাসাগরে আরবদের আগমন ভারতের বহির্বাণিজ্যকে অবশ্যই প্রভাবিত করেছিল। আরব বণিকরা অষ্টম শতকে ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে মালাক্কা হয়ে চীনে চলে যেত। চীনের ইতিহাসে আরব বণিকদের বাণিজ্যের কথা আছে। ভারতের উপকূলের বন্দরগুলিতে আরবদের বাণিজ্যঘাঁটি ছিল। বাষ্পীয় সমুদ্রযান আবিষ্কারের আগে সমুদ্রবণিকরা মৌসুমী বায়ুর ওপর নির্ভর করত। পশ্চিম এশিয়ার বন্দরগুলি থেকে রওনা হয়ে (হরমুজ, মোখা, এডেন) আরব জাহাজগুলি ভারতের পশ্চিম উপকূলের বন্দরে আসত, এখান থেকে মালাবার ও করমণ্ডল হয়ে তারা চীনে যেত। কীর্তিনারায়ণ চৌধুরী এই আরব বণিকদের বাণিজ্যের বর্ণনা দিয়েছেন। অষ্টম শতকের আগে এই পথে একটি মাত্র আরব জাহাজ যাতায়াত করত, অষ্টম শতক থেকে একাধিক জাহাজ এই পথে পাড়ি দেয়। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে আরব জাহাজগুলি ভারতের পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলিতে ভিড়ত। পারস্য উপসাগরীয় বন্দর মস্কট থেকে জাহাজ ছেড়ে একমাসের মধ্যে মালাবারের কুইলনে পৌঁছানো যেত। ইবন বতুতাও এই বাণিজ্যের উল্লেখ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে আরব জাহাজগুলি (ধাও) কুইলন ও কালিকটে আসত। চীনা

জাহাজ (জাঙ্ক) ভারতীয় বন্দর কালিকট ও কুইলনে বেশি আসত না, আরব জাহাজ থেকে তারা পণ্য পেত। ভারতের পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলি হয়ে উঠেছিল পশ্চিম এশিয়া ও পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্য বিনিময় কেন্দ্র। আন্তর্জাতিক সমুদ্র-বাণিজ্যে ভারত মধ্যস্থের ভূমিকা নিয়েছিল। সন্দেহ নেই ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য এযুগে বৃদ্ধি পেয়েছিল। আরব দেশ থেকে চীন পর্যন্ত পাড়ি দিয়ে লাভ বেশি হতো না, ব্যয় বেশি হতো। এজন্য আরব বণিকরা ভারতকে অন্তর্বর্তী ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করত।

গুজরাট, কোঙ্কন ও মালাবার উপকূল আন্তর্জাতিক এশীয় বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিল। সুলেমান, আল মাসুদি, আল ইদ্রিসি প্রভৃতি আরব লেখকরা ভারতের বন্দর ও বাণিজ্যের উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে গুজরাটের ক্যাম্বে (কানবায়া), কোঙ্কনের সিনদান (সনজন), সোপারা, চৌল, গোয়ার সিন্দাপুর এবং মালাবারের কুইলন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। আরব বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল বসরা ও সিরাফ, পারস্য উপসাগরের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল। পারস্য উপসাগর থেকে যাত্রা শুরু করে আরব জাহাজ গুজরাট ও কোঙ্কনে এসে হাজির হতো। আরব লেখকেরা এই দুই উপকূলের গুরুত্বের বর্ণনা দিয়েছেন। প্রায় সব আরব লেখক কামকামের (মাকামকাম) কথা উল্লেখ করেছেন, এটি হলো কোঙ্কন উপকূলের অঞ্চল। এখানে রাজত্ব করতেন রাষ্ট্রকূট রাজারা (বালাহারা)। আল মাসুদি (৯১৫) কোঙ্কনের চৌল বন্দরে দশ হাজার মুসলমান বণিকের উপস্থিতি লক্ষ করেন। এদের মধ্যে ছিল সিরাফ, বসরা, ওমান ও বাগদাদের বণিকরা। দুজন আরব বণিক মুসাবেন ইশাক আল সান্দালুনি ও আবু সৈয়দ মারুফ বেন জাকারিয়া এখানে প্রায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। রাষ্ট্রকূটদের লেখতে[১] বলা হয়েছে যে আরবরা (সুগতীপ মধুমতি—মহম্মদের অনুগামী) সনজন ও সন্নিহিত উপকূল অঞ্চলের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল। রাষ্ট্রকূটদের সঙ্গে আরবদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল, রাষ্ট্রকূটদের পরেও কোঙ্কন অঞ্চলের সঙ্গে আরবরা বাণিজ্যিক লেনদেন বজায় রেখেছিল। শিলহার বংশীয় রাজাদের লেখতে (১০৩৪) তিনজন আরব বণিকের—আলি, মহর ও মহম্মদের নাম পাওয়া যায়।

মিশরে ফাতেমিদ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলে (৯৬৯) পারস্য উপসাগরীয় বাণিজ্যে অবনতি ঘটে, তবে লোহিত সাগরের বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। লোহিত সাগরের দুই প্রান্তের দুই বন্দর আলেকজান্দ্রিয়া ও এডেন গুরুত্ব পেয়েছিল, এর তাৎপর্য হলো ভারত মহাসাগরের বাণিজ্যের সঙ্গে ইউরোপের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এডেন থেকে ভারতে যাতায়াতের জন্য গুজরাট ও মালাবারকে বেছে নেওয়া হয়। ইবন বতুতা ও

১. তৃতীয় ইন্দ্রের চিনচানি লেখ, ৯২৬।

মার্কোপোলো ভারতের বন্দরগুলির যে তালিকা দিয়েছেন তাতে মালাবারের বন্দরের সংখ্যা বেশি। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নামগুলি হলো কুইলন, কালিকট, পাণ্ডারানি, ম্যাঙ্গালোর, বারকুর, হোনাবুর ও সিন্দাবুর (গোয়া)। এইসব বন্দরের সঙ্গে এডেনের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল, এডেনের সঙ্গে থানা ও ক্যাম্বের যোগাযোগও ছিল। গোটিন পারস্য উপসাগরের কিশ-এর সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। ভারতের পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলিতে মুসলমান বণিকদের নিয়মিত যাতায়াত ছিল। বেঞ্জামিন দ্বাদশ শতকে মালাবারে ইহুদি বণিকদের উপস্থিতি ছিল বলে জানিয়েছেন। ইহুদি বণিকদের চিঠি থেকে এই বাণিজ্যের নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়। এডেন ও আলেকজান্দ্রিয়ার পণ্যের চাহিদা, দাম, জাহাজী পরিবহন, বণিকদের মধ্যেকার সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে প্রচুর তথ্য পাওয়া গেছে এই চিঠিগুলি থেকে। আরব বণিকরা শ্রীলঙ্কার (সেরেনদির) সঙ্গে বাণিজ্যের কথাও উল্লেখ করেছেন। পশ্চিমদিকে মালদ্বীপ এবং পূর্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে আরবদের বাণিজ্য ছিল। এজন্য তারা বাণিজ্যে শ্রীলঙ্কার গুরুত্ব যথাযথভাবে অনুধাবন করেছিল।

অষ্টম শতকের পর পূর্ব ভারতের বড় বন্দর তাম্রলিপ্তের পতন ঘটে। নবম ও দশম শতকে আরব লেখকরা জানাচ্ছেন যে 'সমন্দর' (চট্টগ্রামের কাছে) ছিল বাংলার সমৃদ্ধ বন্দর। আল ইদ্রিসি লিখেছেন যে এই বন্দরে বাণিজ্য করে আরব বণিকরা লাভবান হয়। ইবন বতুতা চট্টগ্রামকে বলেছেন 'সুদকাওয়ান'। এই বন্দর সমৃদ্ধ ছিল, বাণিজ্যিক লেনদেন চলেছিল, কামরূপের বাণিজ্য এই পথে পরিচালিত হতো। আরব লেখকরা আরও জানিয়েছেন যে চট্টগ্রামের সঙ্গে ওড়িশা ও কাঞ্চীর বাণিজ্য চলেছিল। শ্রীলঙ্কা থেকেও চট্টগ্রাম বন্দরে পণ্য পাঠানো হতো। সমন্দরের মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে বাংলার বাণিজ্য চলেছিল, পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে চট্টগ্রামের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য চলত দক্ষিণ ভারতের উপকূল বন্দরগুলির মাধ্যমে। কাঞ্চীপুরম ছিল এই বাণিজ্যের একটি বড় ঘাঁটি। চোল শাসনকালে করমণ্ডল উপকূল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও চীনের সঙ্গে বাণিজ্য পরিচালনা করে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। রাজরাজ চোলের রাজত্বকালে মামল্লপুরম ছিল একটি বড় বন্দর। দক্ষিণ ভারতের একটি বণিক গোষ্ঠী এই বন্দরের কাজকর্ম তদারকির ভার পেয়েছিল। এই অঞ্চলে নেগাপত্তমের (নাগপট্টনম) উত্থান হলে মামল্লপুরমের গুরুত্ব কমে যায়। চীনের সু বংশের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে চোলরাজা রাজরাজ (লোৎসা-লোৎসা) চীনে দূত পাঠিয়েছিলেন। দশম শতকের আগে এশিয়ার সমুদ্র-বাণিজ্যে চীনের উপস্থিতি তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, এরপর থেকে সমুদ্র-বাণিজ্যে চীনের ভূমিকা অবশ্যই বৃদ্ধি পেয়েছিল। এশীয় বাণিজ্যের দুই প্রান্তে ছিল চীন ও আরবরা, ভারত ছিল এদের মধ্যে অন্তর্বর্তী ঘাঁটি।

রাজেন্দ্র চোলের আমলে (১০১২-৪৪) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও চীনের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। শ্রীবিজয়ের রাজা (জাভা, সুমাত্রা, মালয়) নাগপত্তমে চূড়ামণি বিহার নির্মাণ করে দেন। দক্ষিণ ভারতের এক মন্দিরে শ্রীবিজয়ের প্রতিনিধি চীনের সোনা দান করেন। এ থেকে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে করমণ্ডল ও চীনের মধ্যে অন্তর্বর্তী ঘাঁটি ছিল শ্রীবিজয়। শ্রীবিজয়ের রাজা চোলদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। কাম্বোডিয়া অঞ্চলের সঙ্গেও চোলদের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। রাজেন্দ্র চোলের একটি লেখতে কম্বোজ রাজের পাঠানো উপঢৌকনের কথা আছে। হল জানিয়েছেন যে অর্থনৈতিক কারণে এঁদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার দরকার হয়েছিল। পরবর্তী চোলরাজারাও বাণিজ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। প্রথম কুলোতুঙ্গ শুল্ক (সুঙ্গ) তুলে দেওয়ার কথা বলেছিলেন, বিদেশী বণিকদের উৎসাহ দেবার জন্য তিনি শুল্ক ছাড়ের কথা বলেছিলেন। কুলোতুঙ্গ ব্রহ্মদেশের (পাগান) রাজার সঙ্গেও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। চাওজুকুয়া জানিয়েছেন যে চীন থেকে ব্রহ্মদেশ হয়ে চোল রাজ্যে যাওয়া যেত। সম্ভবত চোলরাজা ব্রহ্মদেশের মাধ্যমে চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর সময়ে বেঙ্গি উপকূলে বিশাখাপত্তনমের উত্থান হয়, এই বন্দরটির অন্য নাম হলো কুলোতুঙ্গ-চোলপট্টনম। বিশাখাপত্তনম বন্দরের গুরুত্ব বেড়ে চলেছিল, কৃষ্ণা-গোদাবরী ব-দ্বীপ অঞ্চলের এই বন্দর দিয়ে সহজে ব্রহ্মদেশে যাওয়া যেত। দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে চোল নৌবহরের আধিপত্য বৃদ্ধি পেয়েছিল, রাজরাজ ও রাজেন্দ্র নৌবহরের সাহায্যে শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ ও শ্রীবিজয় অধিকার করেন। তবে শ্রীলঙ্কা ছাড়া আর কোথাও চোলরাজারা তাঁদের নৌসাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটাননি। জর্জ স্পেন্সার মনে করেন যে শুধু সম্পদ আহরণের জন্য চোলরাজারা নৌঅভিযান পরিচালনা করেন। শুধু সম্পদের জন্য তাঁরা দীর্ঘকাল নৌঅভিযান চালিয়েছিলেন এই অভিমত অনেকে মানতে চান না, সম্ভবত বাণিজ্যিক স্বার্থে তাঁরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নৌঅভিযান পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা চীনের সঙ্গে সরাসরি বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপগুলির চীন বাণিজ্যে মধ্যবর্তীর ভূমিকা তাঁরা খর্ব করতে চেয়েছিলেন। রোমিলা থাপার মনে করেন যে ভারত মহাসাগরে আরব বণিকদের ভূমিকাকে তাঁরা সঙ্কুচিত করার প্রয়াস চালিয়েছিলেন। আরব বণিকদের আধিপত্য খর্ব করা ছিল চোলদের নৌঅভিযানের একটি লক্ষ্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়	উত্তর ভারতে নগরায়ণ ও বাণিজ্য—দক্ষিণ ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতি ঃ নগরায়ণ ও বাণিজ্য

উত্তর ভারতে নগরায়ণ ও বাণিজ্য

গুপ্তযুগের শেষদিক থেকে ভারতে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের ধারাটি সক্রিয় ছিল। এই পরিবর্তনের মাধ্যম ছিল সামন্ততন্ত্র। গুপ্তযুগের আগে ভূমিদান প্রথা থেকে এর শুরু হয়েছিল, নবম ও দশম শতকে তা পরিপূর্ণতা পেয়েছিল। সামন্তব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হলো গ্রামীণ স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা। সামন্তব্যবস্থার পরিণতি হলো বাণিজ্যের অবনতি এবং নগরের অবক্ষয়। বলা হয়েছে আদি মধ্যযুগে রাজাদের মুদ্রিত মুদ্রার সংখ্যা খুবই কম, বাণিজ্যিক লেনদেন কমেছিল। সাহিত্যিক উপাদানের মধ্যে এই ধারণার সমর্থন খোঁজা হয়েছে। গুপ্ত ও উত্তর-গুপ্ত যুগে ভারতে নগরায়ণের অবক্ষয় হয়েছিল বলে কিছু তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে শুধু স্থানীয় পরিভোগের জন্য উৎপাদন হতো, বিনিময়ের জন্য উৎপাদন ছিল না এই তত্ত্বটি অনেকে মানতে চান না। অধ্যাপক ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় উত্তর ভারতের কিছু আকর বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে নগরায়ণ ও বাণিজ্য ছিল।

নগরায়ণ ও বাণিজ্যর পরিচয় দেবার জন্য অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় তিনটি অঞ্চল বেছে নিয়েছেন—সিন্ধু ও গঙ্গার মধ্যবর্তী অঞ্চল, গঙ্গা অববাহিকা এবং মালব অঞ্চল। গঙ্গা উপত্যকা ও মালবে আদি ঐতিহাসিক পর্বে নগরের উদ্ভব হয়েছিল। সিন্ধু-গঙ্গার মধ্যবর্তী অঞ্চলে হরিয়ানার কারনাল জেলার পৃথুদকে (পেহোয়া) নগর ছিল বলে জানা যায়। একটি লেখতে পৃথুদককে 'অধিষ্ঠান' বলা হয়েছে, এখানে গবাদি পশু বিক্রির মেলা বসত। অশ্বের বেচাকেনা হত, অশ্ব ব্যবসায়ীরা তাদের সংঘের নেতার অধীনে অশ্ব নিয়ে হাজির হতো। বাইরের থেকে ব্যবসায়ীরা আসত, নটি অঞ্চল থেকে বণিকদের আসার প্রমাণ আছে। লাহোরের কাছ থেকে বণিকরা এখানে ঘোড়া বিক্রির জন্য আসত বলে তথ্য আছে। এরা অভারতীয় ছিল না, কয়েকজন ব্রাহ্মণের নামও পাওয়া গেছে। নবম শতকে পেহোয়াতে একটি বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল, এদেশের বণিকরা এমনকি ব্রাহ্মণরাও তাতে যোগ দিয়েছিল। এখানকার অশ্ব ব্যবসায়ীরা শুধু স্থানীয় মন্দিরকে নয়, দূরের শহরগুলি যেমন কান্যকুব্জ, ভোজপুর ও অন্যান্যদের অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এই জেলা থেকে রাজা, ঠাকুর ও গ্রামের লোকেরা ঘোড়া কিনত। অনেক সময় এদের লোকেরা এসে ঘোড়া কিনে নিয়ে যেতো। পৃথুদক উত্তর-পশ্চিমের ঘোড়ার বাণিজ্যে বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিল।

পৃথুদক হয়তো পুরো শহর হয়ে ওঠেনি, তবে এটি ছিল একটি নিগম। এর অবস্থান ছিল গ্রাম ও উন্নত শহরের মধ্যবর্তী স্তরে, সেইযুগে অধিষ্ঠান বলতে বোঝাত একটি শহর।

গঙ্গার পশ্চিম তীরে বুলন্দ শহরের কাছে অহরে তত্ত্বানন্দপুর নামে একটি শহরের কথা জানা যায়। উচ্চ গাঙ্গেয় অববাহিকায় তত্ত্বানন্দপুর ছিল একটি পূর্ণ বিকশিত শহর। পৃথুদকের মতো এটিও গুর্জর-প্রতিহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। এটির নামের সঙ্গে রয়েছে পুর শব্দ যার অর্থ হলো নগর। তাছাড়া একে পত্তন বলে উল্লেখ করা হয়েছে, পত্তন কখনো গ্রাম, পল্লী বা অগ্রহার হয় না। এই শহরের যে পরিকল্পনার কথা জানা যায় তার থেকে বলা যায় যে এটি গ্রাম ছিল না। শহরের মধ্যে ছোট রাস্তা, বড় রাস্তা ও হট্টমার্গ ছিল, পূর্বদিকে ছিল বাজার, দোকান ও বাসগৃহ। সম্ভবত শহরের অন্যান্য অঞ্চলেও বাজার ও নাগরিকদের বাসগৃহ ছিল। লেখমালায় এই শহরের ছটি মন্দিরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে (দশাবতার, সর্বমঙ্গলা ইত্যাদি)। নথিপত্রে দুধরনের গৃহের উল্লেখ পাওয়া যায়—দোকান ও বাসগৃহ, অনেক দোকানের সঙ্গে গৃহও ছিল। গৃহগুলি ইট দিয়ে মজবুত করে তৈরি করা হয়েছিল। বহুজাতির মানুষ এই শহরে অট্টালিকা বানিয়ে বাস করত। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে তত্ত্বানন্দপুরের অস্তিত্ব সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এখানে উৎখনন চালিয়ে ইটের বাড়ি, কিছু যন্ত্রপাতি, তামার তৈজসপত্র, লোহার কাস্তে এবং আদি মধ্যযুগের তিন রকমের মুদ্রা পাওয়া গেছে।

আদি মধ্যযুগের উত্তর ভারতের আর একটি বড় শহর হলো ঝাঁসি জেলার ললিতপুরের কাছে সিয়াডোনি। গুর্জর-প্রতিহার যুগে এর উদ্ভব হয়েছিল (৯০৭-৯৬৮), তত্ত্বানন্দপুরের মতো এটিও ছিল পত্তন, পত্তনের মধ্যে অনেকগুলি রাস্তা ও বাজার ছিল। এখানকার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো বাণিজ্য ও বণিকদের জন্য পৃথক রাস্তা ছিল। বিভিন্ন জাতির মানুষ এখানে গৃহনির্মাণ করে বসবাস করত। এই শহরটি তত্ত্বানন্দপুরের চেয়ে আয়তনে অনেক বড় ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শহরের মধ্যে ছিল অনেকগুলি হট্ট, বণিক ও কারিগরদের বীথি (দোকান)। হট্টকে বাসগৃহ থেকে পৃথক করা হয়নি, একই অঞ্চলে হট্ট ও বাসগৃহ ছিল। হট্টের মধ্যে মন্দির বা ব্রাহ্মণের বাসগৃহও ছিল। অহরের মতো মন্দির হলো নগর পরিকল্পনার অঙ্গ, সব শহরে মন্দির দেখা যায়। অহরের মতো সিয়াডোনিতে অনেকগুলি মন্দির ছিল। সিয়াডোনি প্রধানত ছিল বাণিজ্যকেন্দ্র (Siyadoni was primarily a commercial centre) কারণ এখানে শুধু হট্ট ছিল না, ছিল শুল্ক আদায়ের চৌকি। এখানে একটি টাঁকশালের কথাও জানা যায়, এখানে কিছু রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাজকর্মও হতো।

নবম শতকে মধ্যপ্রদেশের গোপগিরি (গোয়ালিয়র) হলো একটি দুর্গ শহর। গুর্জর-প্রতিহার রাজাদের একজন প্রতিনিধি এই দুর্গ শহরের শাসক ছিলেন। শহরে ছিলেন কোট্টপাল ও বলাধিকর্তা, বলাধিকর্তা হলেন সামরিক অফিসার। এই শহরের মধ্যে পাহাড়ি ও সমতলভূমি দুই-ই ছিল। গোপাগিরি সেযুগে ছিল একটি বাণিজ্য কেন্দ্র, শ্রেষ্ঠী ও সার্থবাহরা এখানে বাস করত। স্থানীয় সভায় বণিকদের এরা প্রতিনিধিত্ব করত। শহরের মধ্যে হট্টিকা ছিল, ছিল তৈলিকদের বাসস্থান। সন্দেহ করার কারণ নেই যে এটি ছিল একটি শিল্প-উৎপাদন ও বাণিজ্যকেন্দ্র। এই চারটি শহরের আকৃতি ও গঠন এক ছিল তা বলা যাবে না। পৃথুদক পুরোপুরি শহর হয়ে ওঠেনি, এটি ছিল প্রধানত একটি মেলা কেন্দ্র, বলা যায় আধা শহর। তত্ত্বানন্দপুর ও সিয়াডোনি অবশ্যই পরিণত নগর ছিল। এদের গড়নে কিছু পার্থক্য অবশ্যই ছিল। উত্তর সভার উল্লেখ আছে, দণ্ডপাশিক ও দূতকের কথা আছে। কিন্তু স্পষ্টভাবে বলা হয়নি কীভাবে শহর দুটির শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হতো। সিয়াডোনিতে গুর্জর-প্রতিহারদের চারজন শাসকের নাম পাওয়া যায়, 'পঞ্চকুল' সম্ভবত শাসন পরিষদ হিসেবে কাজ করত। দলিলপত্রে করণিক ও কৌপটিকের উল্লেখ আছে। সিয়াডোনি প্রতিহার রাজাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল। গোপগিরি ছিল একটি সামরিক ঘাঁটি, এর সামরিক গুরুত্ব রাজনৈতিক গুরুত্বের চেয়ে বেশি ছিল। এখানকার শাসন ছিল সামরিক ধাঁচের কারণ কোট্টপাল ও বলাধিকর্তা ছিলেন প্রধান শাসক। গোপগিরির অধীনে ছিল পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রাম।

সমসাময়িক তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করে বলা যায় তত্ত্বানন্দপুর, সিয়াডোনি ও গোপগিরি পরিকল্পিত নগর ছিল না। বিপণি, মন্দির ও বাসগৃহগুলির নির্মাণে কোনো পরিকল্পনার ছাপ পাওয়া যায় না। শহরগুলিতে জাতি মহল্লা ছিল না, দক্ষিণ ভারতের নগরায়ণের ক্ষেত্রে তা পাওয়া যায়। তত্ত্বানন্দপুরে ব্রাহ্মণের গৃহের পাশে বণিকের গৃহ ছিল, সিয়াডোনিতে একই অবস্থা লক্ষ করা যায়। গোপগিরিতে দুটি হট্ট ছিল যেখানে বাসগৃহও নির্মিত হয়েছিল। সিয়াডোনিতে দুধরনের বিপণি ছিল—প্রথাগত, বংশানুক্রমিক এবং নতুন বণিকদের স্থাপিত বিপণি (স্বোপার্জিত)। শহর হিসেবে প্রতিষ্ঠার আগে এইসব অঞ্চলে বাণিজ্যিক কাজকর্ম ছিল, এজন্য শহরের মধ্যে হট্টগুলির অবস্থান লক্ষ করা যায়। হাট ও দোকানের সঙ্গে বাসগৃহ গড়ে উঠলে শহরের সূচনা হয়েছিল।

এই শহরগুলি বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে দূরপাল্লার বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তত্ত্বানন্দপুরে রাজস্থানের বরক্কট, মথুরার গন্ধবণিক ও অপাপুরার বণিকরা বাস করত। বরক্কট বণিকরা সম্পত্তির বেচা-কেনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। সিয়াডোনিতে মণ্ডপিকা ছিল, মণ্ডপিকার সঙ্গে শহরের বাইরের বণিকরা যুক্ত ছিল। গোপগিরিতে

ছিল সার্থবাহরা যারা দূরপাল্লার বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত হতো। উত্তর ভারতে অনেকগুলি বাণিজ্যপথ ছিল, বণিকরা তাদের পণ্য নিয়ে বাণিজ্য পথ ধরে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে পাড়ি দিত। আদি মধ্যযুগে শাসকরা নানাকারণে শহর গড়ে তোলেন। শাসকদের স্থাপিত শহরের সঙ্গে তত্ত্বানন্দপুর, সিয়াডোনি ও গোপগিরির পার্থক্য ছিল। এদের গড়নে পার্থক্য ছিল। সিয়াডোনি ছিল রাজনৈতিক কেন্দ্র, প্রতিহারদের সামন্ত রাজারা এখানে শাসন করতেন। শাসকরা বদলি হতেন, সিয়াডোনিতে ষাট বছরে চারজন শাসকের নাম পাওয়া গেছে। মহোদয়ের (কনৌজ) একজন শাসক রিয়াক্কা নামে একটি শহর ব্রাহ্মণকে দান করেন। নাসিক অঞ্চলে পরমার ভোজ একটি শহরের অর্ধেক ও সংলগ্ন গ্রাম একজন সামন্তকে দান করেন।

সামন্ত শাসিত হলেও সিয়াডোনির বাণিজ্যের কোনো ক্ষতি হয়নি। শহরগুলিতে বহু বণিক ও কারিগররা বাস করত, বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন জাতির প্রাধান্য ছিল। তত্ত্বানন্দপুরে চতুর্বৈদ্য, ব্রাহ্মণরা ছাড়া ছিল বহু বণিক জাতির লোক, গন্ধবণিক, সুবর্ণ বণিক, ক্ষত্রিয় বণিক, মহাজনদের কথা উল্লিখিত হয়েছে। সুবর্ণ বণিক মহাজনরা ছিল সবচেয়ে প্রভাবশালী গোষ্ঠী। গোপগিরিতে ছিল শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ, তৈলিক মহত্তক ও মালিকা-মহর। বণিক ও মহাজনরা ছাড়া সিয়াডোনিতে রাজপুরুষ, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালরা ছিল (মাতঙ্গ), নিমক বণিক, কুম্ভকার, কল্লপাল (মদ প্রস্তুত কারক), তাম্বুলিক, তৈলিক, শিলকূট (পাথর মিস্ত্রি), লোহাবল (কর্মকার) প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এখানে নিমক বণিকরা ছিল সবচেয়ে প্রভাবশালী। বণিক ও কারিগররা গিল্ডের মাধ্যমে নিজেদের সংগঠিত করেছিল। গোপগিরি লেখতে এদের 'শ্রেণি' বলা হয়েছে। গিল্ডের একজন প্রধান ছিলেন (মহত্তম)। তৈলিক, মহর ও তাম্বুলিকদের গিল্ড ছিল। জাতিকেন্দ্রিক গিল্ডও ছিল পেশাদারি গিল্ডের পাশাপাশি। পণ্ডিতদের অনুমান গিল্ডের বেশিরভাগ ছিল পরিবার কেন্দ্রিক, জাতি বা পেশা কেন্দ্রিক নয়। গিল্ডের সংগঠনে বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করা যায় না, গিল্ড অঞ্চল ও জাতির সীমাকে অতিক্রম করে পেশাকে আশ্রয় করেছিল।

নগরের বণিক, কারিগর ও রাজপুরুষদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, বণিকরা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে দান করতেন, শাসককে কর দিতেন। সিয়াডোনিতে স্থানীয় শাসক মণ্ডপিকা থেকে কর আদায় করতেন, তিনি কর আদায়ের জন্য 'পঞ্চকুল' নিয়োগ করতেন। শ্রেষ্ঠী ও সার্থবাহরা পঞ্চকুলের মধ্যে স্থান পেতেন। মন্দিরগুলি বণিকদের দানে গড়ে উঠত। তত্ত্বানন্দপুরের ছ'টি দেব মন্দিরের অন্তত দুটি ছিল জাতি-দেবতা- সুবর্ণ বণিকদের কনক দেবী, গন্ধ বণিকদের গন্ধশ্রীদেবী। সিয়াডোনিতে মন্দিরগুলি নির্মাণ করেন বণিকরা, মন্দিরগুলি ছিল শহরের প্রধানকেন্দ্র। মন্দিরের নিজস্ব কিছু

ভূসম্পত্তি ছিল। পৃথুদকের ভ্রাম্যমাণ বণিকরা দ্রম্ম দিত, সিয়াডোনিতে বণিকরা মন্দিরের জন্য দৈনিক কিছু অর্থ দান করত। মন্দিরগুলি কোনো শিল্প পণ্যের উৎপাদনে অর্থ বিনিয়োগ করে লভ্যাংশ পেত। সিয়াডোনিতে বণিক ও উৎপাদকদের কাছে অর্থ জমা রেখে মন্দিরগুলি অর্থ সংগ্রহ করত, তত্ত্বানন্দপুরেও এই ধরনের ব্যবস্থা ছিল। বিভিন্ন বণিক গোষ্ঠীর লোক মন্দিরের জমি কিনে বা লিজ নিয়ে গৃহনির্মাণ করেছিল। সিয়াডোনিতে মন্দিরের অধীনে অনেক গৃহ ও বিপণি ছিল, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রীতিনীতি একই ধরনের ছিল।

পৃথুদক, তত্ত্বানন্দপুর, সিয়াডোনি ও গোপগিরি ছিল নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। আদি পর্বের নগরায়ণের সঙ্গে আদি মধ্যযুগের নগরায়ণের একটি তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। তুলনার দুটি দিক হলো শহরের গড়ন, সামাজিক গঠন, বাণিজ্যের ধরন ও পণ্য উৎপাদন। আরো একটি প্রাসঙ্গিক সমস্যা হলো আদি পর্বের নগরায়ণ ও মুদ্রা-নির্ভর অর্থনীতি গুপ্ত-উত্তর যুগে স্বাভাবিক অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হলো কীভাবে। এর একটি সম্ভাব্য উত্তর হলো গুপ্তযুগে রোমান বাণিজ্যের অবনতি, মুদ্রার সরবরাহে ঘাটতি। গুপ্তযুগে রোমান বাণিজ্যে ঘাটতি হলেও, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। গুপ্ত-উত্তর যুগে ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কমেছিল, কিন্তু দূরপাল্লার বাণিজ্য কমেনি, তাজিক ও তুরস্কদের (তুর্কি) সঙ্গে বাণিজ্য বেড়েছিল আরবরা সিন্ধুদেশে শাসন স্থাপন করেছিল, পশ্চিম উপকূলে আক্রমণ চালিয়েছিল। বৈদেশিক বাণিজ্যে অবনতি হলেও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সজীব ছিল, পণ্য উৎপাদন ছিল। গঙ্গা অববাহিকায় চাষবাস বেড়েছিল, উৎপাদন বেড়েছিল, নতুন শাসকগোষ্ঠী উদ্বৃত্ত আহরণের ব্যবস্থা করেছিল। বাণিজ্যিক পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়েছিল।

যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া হয় যে বৈদেশিক বাণিজ্য কমেছিল, তাতে প্রমাণিত হয় না অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও পণ্য উৎপাদন ব্যাহত হয়েছিল। নগরায়ণের ক্ষেত্রেও তা সর্বাংশে সত্য। নগরায়ণের জন্য দুটি জিনিসের বিশেষ করে প্রয়োজন হয়, একটি হলো বাণিজ্য, অন্যটি শাসকগোষ্ঠী। আদি মধ্যযুগের ভারতে এই দুই সামাজিক শক্তি সক্রিয় ছিল বলে পণ্ডিতরা অনুমান করেছেন। ইতিহাসের আদি পর্বে নগরায়ণের ক্ষেত্রে বৈদেশিক বাণিজ্যের বিশেষ ভূমিকা ছিল না। আদি মধ্যযুগে বৈদেশিক বাণিজ্যের অবনতি নগরায়ণের ক্ষতি করেনি। বলা হয় অগ্রহার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ হলে নগরের অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল। অগ্রহার ব্যবস্থার উদ্ভব ও সম্প্রসারণের অনেক পরেও নগরায়ণ প্রক্রিয়া সচল ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে অগ্রহার সম্প্রসারিত হলেও বাণিজ্য ও নগরায়ণের ক্ষতি হয়নি। মরিসন জানিয়েছেন যে বাংলার এই

অঞ্চলে শহর ছিল, মুদ্রা ছিল, উদ্বৃত্ত উৎপাদন ছিল, বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। অধ্যাপক ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় মনে করেন অগ্রহার গ্রহীতারা অনেকে নগরে বাস করতে শুরু করেন। মোগল অভিজাতদের মতো তারা নগরায়ণ ও বাণিজ্যকে উৎসাহ দেন।[১] গ্রামাঞ্চলে তারা পণ্য উৎপাদন ভিত্তিক মুদ্রা-নির্ভর অর্থনীতির সম্প্রসারণ ঘটিয়েছিলেন। অগ্রহার অর্থনীতির পটভূমিকায় উত্তর ভারতে দুটি বাজার কেন্দ্রের উদ্ভবের কথা জানা যায়। দেবপালের নালন্দা লেখতে 'দেবপালদেবহট্টের' উল্লেখ আছে। রাজস্থানের যোধপুরের সামন্ত কাক্কুক একটি বাজার স্থাপন করেন। এইসব হট্ট ও মণ্ডপিকা যে যৌথভাবে শহর গড়ে তুলতে পারে তার প্রমাণ হলো তত্ত্বানন্দপুর ও সিয়াডোনি। এইসব শহরে শহর সম্পত্তি ও বাণিজ্যিক পণ্য বেচা-কেনা হতো। আদি মধ্যযুগের 'শিল্প শাস্ত্রে' শহর ও শহর পরিকল্পনার কথা আছে, শহরে শাসক ও সামন্তদের বাসস্থানও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

গুপ্ত ও গুপ্ত-উত্তর যুগে শহরের অবক্ষয়ের কথা উৎখননের ফলে প্রকাশিত হয়েছে, সমর্থিতও হয়েছে। হিউয়েন সাঙ্ সপ্তম শতকের গোড়ার দিকে নগরের অবক্ষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। সাকল, কৌশাম্বী, শ্রাবস্তী, কপিলাবস্তু, রামগ্রাম, কুশিনগর ও বৈশালী অবক্ষয়ের মুখে পড়েছিল। এইসব অঞ্চলে শুধু শহর নয়, গ্রামেও অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল (Peopled villages)। তিনি সিটি ও টাউনের মধ্যে পার্থক্য করেছিলেন, বৈশালীকে তিনি বলেছেন টাউন, মগধ হলো সিটি (walled cities have but few inhabitants but the towns are thickly populated.)। তার সময়ে কনৌজ ও বারাণসী হলো সিটি। এদের সম্পর্কে তিনি লিখেছেন যে এগুলিতে ঘন জনবসতি ছিল (thickly populated), বহু পণ্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে জড় করা হতো। সিন্ধু ও গঙ্গার মধ্যবর্তী স্থলে ও গাঙ্গেয় অববাহিকায় নগরায়ণের বৈশিষ্ট্যগুলি তার নজরে পড়েছিল। থানেশ্বর ছিল বাণিজ্যকেন্দ্র, দুষ্প্রাপ্য পণ্যসামগ্রী এখানে বিক্রির জন্য আনা হতো। 'পোলোহিমপুলো' নামে একটি সমৃদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্রের নাম তিনি উল্লেখ করেছেন। এই অঞ্চলে পুরনো নগরগুলি টিকে ছিল, নতুন নগরের পত্তন হয়েছিল, প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন এই সত্যকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এ সম্পর্কে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের পরিমাণ বেশ কম (Our information is scanty)। পুরনো শহরের মধ্যে বেরিলি জেলার অহিচ্ছত্রের নাম পাওয়া যায়, আদি মধ্যযুগের সাহিত্যে অহিচ্ছত্রের উল্লেখ আছে। দিল্লির পুরনো কেল্লা অঞ্চলে কুষাণ যুগ থেকে শহর অবিচ্ছিন্নভাবে রক্ষা পেয়েছে। উত্তরপ্রদেশের ইটা জেলার অত্রঞ্জিখেরায় গুপ্ত ও উত্তর-গুপ্ত পর্বের শহরের নিদর্শন

১. ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়, *দ্য মেকিং অব আরলি মিডাইভ্যাল ইন্ডিয়া,* পৃ. ১৪৯।

ছড়িয়ে আছে। বারাণসীর কাছে রাজঘাটে ৭০০-১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে শহর ছিল বলে জানা যায়। বিহারের সারন জেলার চিরন্দে আদি মধ্যযুগে শহর ছিল বলে প্রত্নতাত্ত্বিকরা অনুমান করেছেন, এখানে কিছু মুদ্রাও পাওয়া গেছে। আদি মধ্যযুগের আলিগড় অঞ্চলে শংকর নামে শহর ছিল, নবম থেকে দ্বাদশ শতক হলো এর সময়কাল।

হিউয়েন সাঙ্ গঙ্গা অববাহিকার অনেকগুলি শহরের অবক্ষয়ের কথা বলেছেন (deurbanization)। এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে অনেকগুলি বাণিজ্য পথ গিয়েছিল। এই পথগুলি গয়া, পাটলিপুত্র, বৈশালী, কুশিনগর, তরাই অঞ্চল, শ্রাবস্তী ও কৌশাম্বীকে যুক্ত করেছিল। এই বাণিজ্য পথগুলির বিবরণ পাওয়া যায় না, সম্ভবত এগুলি নষ্ট হলে এগুলির ওপর নির্ভরশীল শহরগুলিও সংকটের মধ্যে পড়েছিল। আদি মধ্যযুগের আকরে এসব বাণিজ্য পথের উল্লেখ পাওয়া যায় না, বাণিজ্য পথগুলি কেন নষ্ট হলো তারও বিবরণ পাওয়া যায় না। রাজনৈতিক সংগঠন, বাণিজ্য ও নগরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বলে সমাজ বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। অনেকে এমন কথাও বলেছেন যে নগরায়ণ ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় উৎস হলো রাজশক্তি। শাসক স্থিতিশীল অবস্থা গড়ে তোলেন, বাণিজ্যের প্রসার ও নগরায়ণ ঘটে। নগরায়ণের অবক্ষয় এই রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে। বুদ্ধের সময়কার মহাজনপদগুলি শুধু আঞ্চলিক সংগঠন ছিল না, রাজনৈতিক সংগঠনও ছিল। মেডভেডেভ (Medvedev) জানিয়েছেন হিমালয় সংলগ্ন গণরাজ্যগুলি তাদের অধিকার হারিয়ে উত্তর ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, তাদের গুরুত্ব হারিয়েছিল। উত্তর-গুপ্তযুগে সিন্ধু-গঙ্গা ও গাঙ্গেয় অববাহিকায় বড় ধরনের রাজ্য ছিল না। এই অঞ্চলে হিউয়েন সাঙ ও হর্ষের সময় কনৌজ ও থানেশ্বর বড় শহর ছিল, এগুলি বাণিজ্য ও শাসনকেন্দ্র ছিল। রাজস্থান, কাশ্মীর ও বাংলার শাসকরা যে নতুন নগরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সমকালীন সাহিত্য ও লেখমালায় তার বিবরণ ছড়িয়ে আছে। গুর্জর-প্রতিহারদের শাসনকালে তত্ত্বানন্দপুর, সিয়াডোনি ও গোপগিরি স্থাপিত হয়, তবে কোন্ শাসক এগুলি স্থাপন করেছিলেন তা জানা যায় না।

সাম্রাজ্য বা রাজ্য গড়ে উঠলে শহর ও বাণিজ্য গড়ে ওঠে একথা বলা যায় না। পূর্ব উপকূলে চালুক্যদের রাজ্য ছিল, সেখানে পুরনো শহরগুলি, নানা উত্থান-পতন সত্ত্বেও, টিকে ছিল। রাজ্য ছিল বলে শহরগুলি টিকে ছিল না, শহর টিকে থাকার আসল কারণ হলো বাণিজ্য পথের ওপর এগুলি অবস্থিত ছিল। দ্বিতীয় প্রধান কারণ হলো শিল্প উৎপাদন কেন্দ্র। বারাণসী হলো এই ধরনের শহরের টিকে থাকার নিদর্শন। গঙ্গার তীরে অবস্থিত হওয়ায় বাণিজ্যের সুবিধা ছিল, তাছাড়া বারাণসী ছিল সূক্ষ্ম বস্ত্র

ও হাতির দাঁতের সৌখিন দ্রব্য উৎপাদনের একটি বড় কেন্দ্র। বস্ত্রের উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে বারাণসীর সুনাম আদি মধ্যযুগ পর্যন্ত টিকে ছিল। বিভিন্ন অঞ্চলে এধরনের শিল্প উৎপাদন কেন্দ্র ছিল। আদি ঐতিহাসিক পর্বের যে গিল্ডগুলির কথা জানা যায় (আঠারো) তার মধ্যে অন্তত সাতটি—স্বর্ণকার, পাথর মিস্ত্রি, পিতল-কাঁসার কারিগর, তৈলিক, মালি, কুম্ভকার ও ক্যারাভ্যান বণিক—তত্ত্বানন্দপুর, সিয়াডোনি ও গোপগিরিতে ছিল। আদি মধ্যযুগে নগরায়ণ ও শিল্প উৎপাদনে যে বড় রকমের অবক্ষয় ঘটেছিল তা বলা যায় না। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য চলেছিল, বহু শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্রে স্বাভাবিক কাজকর্ম ছিল, মুদ্রার মাধ্যমে লেনদেন ছিল। শুধু সামন্ততন্ত্র দিয়ে এযুগের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন ব্যাখ্যা করা যায় না।

দক্ষিণ ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতি ঃ নগরায়ণ ও বাণিজ্য

গ্রামীণ অর্থনীতি

দক্ষিণ ভারতে চোল শাসনকালে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তাতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। চোল রাজারা ব্রাহ্মণ, মন্দির ও অন্যান্যদের ভূমিদান করেন (অগ্রহার), আবাদী ও পতিত উভয় প্রকার জমিতে অগ্রহার দেওয়া হয়েছিল। চোল আমলে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে এবং গ্রামসভার নেতৃত্বে জলসেচের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছিল। গ্রামাঞ্চলে জমির মালিকরা হলেন ব্রাহ্মণ ও বেলালরা (Velalas), কৃষক ও রায়তদের ওপর এদের নিয়ন্ত্রণ ছিল। জমির ওপর এদের নিয়ন্ত্রণ এতবেশি ছিল যে এরা প্রয়োজনবোধ করলে কৃষকদের জমি থেকে উৎখাত করতে পারত। ভূমিব্যবস্থার একেবারে নিম্নদেশে ছিল কারিগর ও কৃষি শ্রমিকরা। ব্রহ্মদেয় (অগ্রহার) দক্ষিণে ব্রাহ্মণ্য সমাজব্যবস্থা কায়েম করেছিল। অগ্রহার ব্যবস্থার পত্তন হলে গ্রামীণ সমাজে কিছু পরিবর্তন ঘটে যায়, নতুন মালিক ও কৃষকদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠে। অগ্রহার মালিকরা ছিলেন রাজসভার অনুগ্রহভাজন ব্যক্তি, কৃষিব্যবস্থা ও প্রযুক্তির সঙ্গে সুপরিচিত, সেই তুলনায় কৃষকরা ছিল অজ্ঞ ও অনগ্রসর। ব্রহ্মদেয় জমির শর্তাবলীর কিছু পরিবর্তন হয়নি, পল্লব আমল থেকে তা প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় ছিল।

সুন্দর চোল অনিরুদ্ধ ব্রহ্মাধিরাজ নামক এক ব্রাহ্মণকে জমি দিয়েছিলেন (আন-বিল লেখ)। তিনি জমি দেওয়ার আগে জমির সীমা নির্দিষ্ট করে দেন, জমিতে যে গাছ, বাগান, পুকুর ইত্যাদি ছিল সব দানগ্রহীতাকে দেওয়া হয়। ঐ দানপত্রে বলা হয় জমির রাজস্ব, বিচারের আয়, শুল্ক থেকে আয় সব দানগ্রহীতাকে দান করা হলো। আরো বলা হয়েছিল দানগ্রহীতা ইচ্ছামত জমি ব্যবহার করতে পারবেন। চোল রাজারা বড় বড় বাঁধ নির্মাণ করে কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের ব্যবস্থা করে দেন। গ্রামসভা নিজেদের গ্রামে জলসেচের ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। অগ্রহার জমিতে বেগার শ্রম নিয়ে জলসেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল। নিম্নবর্গের মানুষ বা ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক

বেগার শ্রম জোগাত। অনেকে ছিল চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক (bonded labour), জমির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকরা হস্তান্তরিত হতো। চোলদের শাসনের শেষপর্বে জমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার সম্প্রসারণ ঘটেছিল, জমির ওপর গ্রামের যৌথ মালিকানা সঙ্কুচিত হয়েছিল।

আদিমধ্য যুগের ভারতবর্ষে কৃষক অভ্যুত্থান বা কৃষক বিদ্রোহের ঘটনা বিরল নয়। যখন অঢেল জমি পাওয়া যেত কৃষক একস্থান ছেড়ে অন্যস্থানে চলে যেত। জমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা স্থাপিত হলে কৃষক অত্যাচারিত হয়ে বিদ্রোহ করত। চোল শাসনের সবচেয়ে উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য হলো স্বায়ত্তশাসন। গ্রামের কৃষকদের সভার নাম উর, অগ্রহার গ্রামের সংস্থার নাম সভা, এইসব প্রতিষ্ঠানের সভায় রাজকীয় কর্মচারীরা উপস্থিত থাকত। তবে প্রশাসনিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করত না, পর্যবেক্ষক ও উপদেষ্টা হিসেবে তারা কাজ করত। গ্রামের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত ছিল, রাজনৈতিক পরিবর্তন গ্রামীণ জীবনে কোনো সমস্যার সৃষ্টি করত না। গ্রামীণ জীবন ছিল অনেকখানি স্বনির্ভর এবং স্বয়ংশাসিত (autonomy at village level deserves to be underlined)। বড় বড় গ্রামগুলি কতকগুলি মহল্লায় ভাগ করে পৃথক পৃথক সভা গঠন করা হতো। সাধারণত একই পেশার লোকেরা এক একটি পৃথক মহল্লায় সংঘবদ্ধভাবে বাস করত, ছুতোর, কুম্ভকার, কর্মকার ইত্যাদির পৃথক মহল্লা ছিল। এই মহল্লার সভাগুলি সম্পন্ন প্রধান বেলালদের সঙ্গে পরামর্শ করে পণ্য উৎপাদন করত। মহল্লার সভা জলসেচ, ভূমিতে অধিকার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা চালাত।

কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি নাড়ু গঠন করা হতো। নাড়ুর মধ্যে ছিল ব্রহ্মদেয়, মন্দির ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান নগরম, পণ্য বিনিময়ের বাজার ছিল। সম্পন্ন কৃষক বেলালরা কৃষিজ পণ্যের বাণিজ্য তদারকি করত, সমগ্র অঞ্চলে তাদের অবাধ যাতায়াত ছিল। নাড়ু অবশ্য স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ছিল না, কেন্দ্রীয় সরকার এর শাসন পরিচালনা করত। কয়েকটি নাড়ু নিয়ে একটি বলনাড়ু গঠন করা হতো, বলনাড়ুর ওপরে ছিল মণ্ডলম। একটি বলনাড়ুতে বেশ কয়েকটি ব্রহ্মদেয় গ্রাম থাকত যেখানে ব্রাহ্মণরা বাস করত। দক্ষিণের তাম্রপর্ণী উপত্যকায় ব্রাহ্মণদের উপনিবেশ ছিল। ব্রহ্মদেয় অঞ্চলে যেখানে আবাদী জমি ছিল মালিক ও কৃষক আলোচনা করে নিজেদের সম্পর্ক ঠিক করে নিত। অবশ্যই দানগ্রহীতা এতে বেশি সুবিধা পেত। মণ্ডলমগুলিকে প্রশাসনিক, রাজস্ব বিভাগীয় ও নাগরিক কারণে পুনর্বিন্যাস করা হতো। মণ্ডলমগুলিতে বেশিরভাগ অধিবাসী হতো কৃষক এবং অরণ্যবাসী উপজাতির মানুষ।

দক্ষিণ ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতিতে ব্রহ্মদেয় ও মন্দিরের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। সরকার এদের পৃষ্ঠপোষকতা করত। সরকার, অগ্রহার ও মন্দির উৎপাদনের ওপর

নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেছিল। মন্দিরগুলি শুধু জমির মালিক ছিল না, শিল্প ও বাণিজ্যেও তাদের ভূমিকা ছিল। মন্দির ঘিরে মেলা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হতো, এসব থেকে মন্দিরের আয় হতো। কৃষি, জলসেচ ব্যবস্থা ও বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রে মন্দির ছিল অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। গ্রামের সভাগুলি সর্বত্র একরকম ছিল না। উরের সদস্য হতো গ্রামের সকলে, একটি ছোট কমিটি দৈনন্দিন কাজগুলি পরিচালনা করত। অগ্রহার সভা ঠিক একইভাবে গঠিত হতো, বিভিন্ন কাজ যেমন জলসেচ, উদ্যান সংরক্ষণ ইত্যাদির জন্য পৃথক কমিটি ছিল। সভার সদস্যরা অনেকসময় লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত হতো। উত্তরামেরুর ব্রহ্মদেয় গ্রামের সভার যে বিবরণী পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় ঐ গ্রামে ৩০টি মহল্লা ছিল, বিদ্বান ও সৎ ব্যক্তিরা সভার সদস্য হতেন। কয়েকটি নির্দিষ্ট অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিরা সভার সদস্য হতে পারত না। নির্বাচিত কমিটি একবছর শাসন চালাত, চোল মন্দির প্রাঙ্গণে সভার অধিবেশন বসত।

গ্রামসভা গ্রামের রাজস্ব ধার্য ও সংগ্রহের কাজ করত। রাজস্ব ছাড়াও গ্রামসভা অন্য কর, শুল্ক ইত্যাদি ধার্য ও আদায় করতে পারত। জলসেচ ব্যবস্থার ওপর গ্রামসভা কর ধার্য করতে পারত। স্থানীয় আয় ও রাষ্ট্রীয় আয় পৃথক করে রাখা হতো। গ্রামের সমস্ত কর, আয় ও ব্যয়ের হিসেব রাখত গ্রামসভা। ভূমির অধিকার, জলসেচ ব্যবস্থা ইত্যাদি নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে সভা হস্তক্ষেপ করে বিরোধ মিটিয়ে দিত। ছোট গ্রামগুলিতে গ্রামসভার সদস্যরা সব কাজ করত, বড় গ্রামগুলিতে এসব কাজ করার জন্য কয়েকজন কর্মচারী রাখা হতো। নাড়ু স্তরে পেশাদার ব্যক্তিদের নিযুক্ত করা হতো, বেলালদের মধ্য থেকে গ্রামীণ কর্মচারী নিযুক্ত করা হতো। এরা গ্রাম ও রাজধানীর মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে চলত। সামাজিক ক্ষেত্রে এসব কর্মচারীরা উচ্চস্তরে আরোহণের সুযোগ পেত (enlarged the possibilities of upward mobility)। চোল আমলের শেষ পর্বে করের সংখ্যা বেড়েছিল, রাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারীদের কাজও বেড়েছিল, তবে গ্রামীণ জীবনে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার বজায় ছিল।

গ্রামীণ জীবনে ভূমিস্বত্বের ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয়েছিল। জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রসার ঘটেছিল, তবে যৌথ মালিকানা একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। কোনো বিশেষ কারণে কৃষকের কর মকুব হয়ে যেত, মন্দিরে জলসরবরাহ করলে অধীনস্থ কৃষকরা করের ক্ষেত্রে কিছু ছাড় পেত। কৃষকদের সামরিক কাজের বিনিময়ে করে ছাড় মিলত। সামরিক কাজে সাধারণত নিম্নবর্গের মানুষকে গ্রহণ করা হতো। ব্রহ্মদেয় জমির মালিক ও মন্দির উভয়ে ভূস্বামী বলে বিবেচিত হতো। ভূস্বামীরা সাধারণভাবে রাষ্ট্রকে কর দিত, ভূমিহীন কৃষকরা মালিকের জমিতে মজুরি নিয়ে চাষ করত। কৃষি শ্রমিকের সামাজিক মর্যাদা ছিল না, গ্রামের সভায় সদস্য তাকে করা হতো না, শাসন

ব্যবস্থায় তাকে নেওয়া হতো না। এধরনের কিছু মানুষ মন্দিরের জমিতে চাষ করত, কিন্তু মন্দিবে প্রবেশের অধিকার তাদের ছিল না। কৃষক ও শ্রমিক জঙ্গল পরিষ্কার করে বা পতিত জমি উদ্ধার করে চাষ করত। শাসকরা এই কাজকে উৎসাহ দিত কারণ এতে রাষ্ট্রের আয় বৃদ্ধি পেত। কৃষকরা চাষবাসের সঙ্গে পশুপালন করে আয় বাড়িয়ে নিত। চোল রাজাদের আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভূমিরাজস্ব, খনি, বন, লবণ, শুল্ক, বিচার ও বেগার প্রথা (বেত্তি) থেকে তাদের আয় হতো। জমির উৎপাদিকা শক্তি ও জলসেচের সুবিধা বিবেচনা করে কর ধার্য করা হতো। চোলদের কোনো কোনো জমিতে বছরে দুবার বা তিনবার ফসল উৎপন্ন হতো, তবে উৎপাদনের হারে তারতম্য ছিল। রাজস্ব সাধারণত উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ হতো, তবে বিশেষক্ষেত্রে কর থেকে ছাড় বা অব্যাহতি মিলত।

রাষ্ট্র কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজস্বের স্থায়ী বন্দোবস্ত করেছিল, তবে বেশিরভাগ অঞ্চলে ধার্য রাজস্ব ছিল অস্থায়ী, কর ধার্য করার জন্য মাঝে মাঝে জমি জরিপ করা হতো। ভূমিকরের সঙ্গে কৃষককে অন্যান্য স্থানীয় কর দিতে হতো, করের চাপ ছিল বেশি। কৃষক শাসকের কাছে কর হ্রাসের আবেদন করত বা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে পালিয়ে যেত। এরকম ঘটনা ছিল কম কারণ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে গিয়ে বসতি গড়ে তোলা খুব সহজ হতো না। রাজারা গ্রাম থেকে যৌথভাবে রাজস্ব আদায় করতেন, সেক্ষেত্রে মোট রাজস্ব থেকে নিষ্কর ভূমির রাজস্ব বাদ হয়ে যেত। বাসস্থান, মন্দির, পুষ্করিণী, জলসেচ খাল, শ্মশান, কারিগর ও অস্পৃশ্যদের বাসস্থানের ওপর কর ধার্য হতো না। দক্ষিণের কর্ণাটক অঞ্চলে প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরা হলেন গোবুন্দা, গৌড়া ও হেগড়ে, এরা ছিলেন ভূস্বামী। গ্রামের জমির হস্তান্তর, জলসেচ ব্যবস্থার সংরক্ষণ, কর আদায়, গ্রামসভা পরিচালনা সব কাজ এরা করতেন। গোবুন্দারা ছিল দুই শ্রেণীর—প্রজা গোবুন্দা ও প্রভু গোবুন্দা। প্রভু গোবুন্দা হলো উচ্চ শ্রেণীর জমিদার, প্রজা গোবুন্দার সামাজিক অবস্থান ছিল নিম্নস্তরে। তারা গ্রামের স্বায়ত্তশাসন ও সরকারি কর্মচারী হিসেবে দ্বৈত ভূমিকা পালন করত। এই গোবুন্দারা বিচারক হিসেবে কাজ করত আবার রাষ্ট্রের প্রয়োজন হলে সৈন্য সংগ্রহ করে দিত। প্রথমদিকে রাষ্ট্র ব্রাহ্মণ ও জৈন সাধুদের অগ্রহার দিয়েছিল অনাবাদী ও পতিত জমিতে। এগুলি চাষের আওতায় এনে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অরণ্যবাসী কৃষক এবং দক্ষিণের তামিল অঞ্চলের কৃষকরা এসব অঞ্চলে উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল।

দক্ষিণে জমিদার শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, ভূস্বামীদের অধীনে অনেক মধ্যস্বত্বভোগী তৈরি হয়েছিল। মধ্যস্বত্বভোগী ও সামন্তরা কৃষির সম্প্রসারণ ঘটিয়ে পরিবেশের রূপান্তর ঘটিয়ে দেয়। কোনো স্থানীয় নায়ককে রাজারা জমিদান করতেন, তাঁর বংশধররা গ্রামে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের অধিকার কায়েম করতেন। ব্রাহ্মণরা

অগ্রহার নিয়ে গ্রামে এলে আরো পরিবর্তন ঘটে যায়। মাঝে মাঝে অগ্রহার গ্রহীতা ব্রাহ্মণ ও স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিত, এদের মধ্যে নতুন করে সম্পর্ক নির্ধারিত হতো। কৃষকরা জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করত, অনেকসময় এর ধর্মীয় আবরণ থাকত। শাসক, ব্রাহ্মণ দানগ্রহীতা এবং উৎপাদক কৃষক নিয়ে দক্ষিণের রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। অন্ধ্রপ্রদেশের জমি খুব উর্বর ছিল না, এখানে জলসেচের ব্যবস্থা করে পতিত জমিতে চাষ বসাতে পুঁজির দরকার হতো। কাকতীয় রাজারা পরিত্যক্ত গ্রামগুলি অধিগ্রহণ করে গ্রাম বসিয়েছিলেন। কাকতীয় রাজারা এবং তাঁদের অধীনস্থ সামন্তরা ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করে কৃষির উন্নতি ঘটানোর চেষ্টা করেন। কেরালা অঞ্চলে এই ধরনের ৩২টি অগ্রহার গ্রাম ছিল, জমি ছিল উর্বর। রাজা, ব্রাহ্মণ ও মন্দির ছিল অধিকাংশ কৃষি জমির মালিক। কৃষকরা মন্দিরের জমি চাষ করত, কারিগররা নানা পণ্য সরবরাহ করত, ব্রাহ্মণ ও নায়াররা কেরালার ভূমিব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করত। মন্দিরগুলির নিজস্ব সৈন্য ছিল, গ্রামের সভার ওপর এদের নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয়েছিল। গ্রামের বীরনায়ক পরিবার সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা পেত। গ্রামের জীবনযাত্রা ছিল খুব সহজ ও সরল, আহার-বিহারে বিলাসব্যসন ছিল না। গ্রামের মানুষের সঞ্চয় হতো সামান্য। ব্রাহ্মণরা ছিল নিরামিষাশী, অন্যরা মাংস খেত। সম্পন্ন মানুষরা ভাল বাড়িতে বাস করত, সাধারণ মানুষের গৃহগুলি ছিল অত্যন্ত সাধারণ ও নিম্নমানের। ধনীরা কৃষি ও বাণিজ্যে তাদের মূলধন লগ্নি করত, মঠ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করে তারা পুণ্য সঞ্চয় করত, সামাজিক সম্মান পেত।

নগরায়ণ ও বাণিজ্য

গ্রামাঞ্চলে পণ্যবিনিময় স্থান, তীর্থস্থান এবং মেলাকে ঘিরে শহর গড়ে উঠেছিল। শাসক গ্রামের বাজারকে উৎসাহ দিত কারণ এখান থেকে রাজস্ব আদায় হতো। সামরিক ছাউনি থেকে শহরের সূত্রপাত হতো। দশম শতকের আগে বাণিজ্যকেন্দ্রকে কেন্দ্র করে শহর গড়ে উঠেছিল, কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুতে পত্তনম হলো বাণিজ্যকেন্দ্র। শহরগুলি নদী ও সমুদ্রতীরে স্থাপিত হতো। বনজুপত্তন হলো বণিকদের শহর। বণিকদের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হবার আগে এগুলিতে প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল বা কোনো তীর্থস্থান ছিল। সপ্তম শতকে শ্রবণবেলগোলা (মহীশূর) ছিল একটি তীর্থক্ষেত্র, দ্বাদশ শতকে এটি হলো বণিকদের আবাসস্থল একটি বড় শহর। জৈনদের প্রতিষ্ঠানকে এই বণিকরা অর্থ জোগাত। বণিকদের প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে শহর গড়ে উঠলেও গোড়ার দিকে এগুলি ছিল গ্রামের বাণিজ্যকেন্দ্র বা প্রশাসনের কার্যালয়। চালুক্যদের শাসনকালেও এধরনের ঘটনা ঘটেছিল। ধনবান বণিক ও ভূস্বামীরা শহরের শাসনব্যবস্থায় প্রাধান্য পেত। গ্রামে বহু জায়গায় সাপ্তাহিক বাজার ছিল, এই বাজারগুলি শহরে পরিণত হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গোবুন্দা ও হেগড়ে শহরের শাসনের সঙ্গে যুক্ত

হতো, মহাজন ও বণিকরা শহর শাসনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। শহরে আদায়ীকৃত রাজস্বের একাংশ এরা পারিশ্রমিক হিসেবে পেত। দক্ষিণের শহরগুলির জীবনে উত্থান-পতন ছিল, দশম শতক থেকে এদের অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রয়ে যায়।

দক্ষিণ ভারতে নগরম হলো বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে পণ্য বিনিময় হতো আবার এগুলি মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত হতো। নগরত্তর নামে একটি সংস্থা এগুলি পরিচালনা করত, কর আদায় করত, এরা বৈদেশিক বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত হতো। বণিক এবং বণিকদের সংস্থা গিল্ডগুলি শুল্ক দিত, প্রবেশকর দিত। সমকালীন লেখসমূহে বিভিন্ন ধরনের শহর করের কথা আছে, স্থানীয় এবং কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ এসব কর থেকে লাভবান হতো। কর্ণাটকের লেখগুলি ঘোড়া, সোনার জিনিস, বস্ত্র, সুগন্ধিদ্রব্য, মরিচ, চাল, মশলা, পান, নারিকেল, চিনি ইত্যাদির ওপর স্থাপিত করের উল্লেখ করেছে। দক্ষিণের সমস্ত অঞ্চলের মধ্যে পণ্য চলাচল করত। একাদশ শতক থেকে সংঘবদ্ধ বণিক শ্রেণীর (corporate trading enterprise) কথা জানা যায়, শহরের আমলাদের মধ্যে বিভিন্ন স্তর ছিল। গ্রাম শহরে রূপান্তরের প্রাথমিক পর্বে রাষ্ট্রের কাছ থেকে করসংক্রান্ত কিছু সুযোগ-সুবিধা পেত, তবে বাণিজ্য বাড়লে কর, শুল্ক ও প্রবেশ কর বসিয়ে রাষ্ট্র তা পুষিয়ে নিত।

চোল বণিকরা বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। নাগপতম, মহাবলীপুরম, কাবেরিপত্তনম, শালিয়ুর ও করকাই ছিল পূর্ব উপকূলের বন্দর-শহর। পূর্বদিকের বাণিজ্যের সঙ্গে এরা যুক্ত ছিল, বিশাখাপত্তনম বন্দরের রাজার নামানুসারে নাম হলো কোলতুঙ্গচোলপত্তনম। একাদশ শতকের গোড়ার দিকে কাম্বোডিয়া থেকে প্রতিনিধিদল চোল দরবারে এলে পূর্বাঞ্চলের বাণিজ্য উৎসাহিত হয়েছিল। চীনের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের বাণিজ্য বেড়েছিল। চীনের সঙ্গে দক্ষিণের বাণিজ্য ছিল চীন সরকারের একচেটিয়া ব্যবসা। চীনের সুঙ্ রাজবংশের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে দক্ষিণের বণিকরা চীনের দক্ষিণাঞ্চলের বন্দরগুলিতে গিয়ে বাণিজ্য করত। চীন ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ছিল, চীনের পণ্ডিতরা ভারতের জ্যোতিষ ও রসায়ন বিদ্যায় আগ্রহ দেখিয়েছিলেন।

মোঙ্গলরা মধ্যএশিয়ার ওপর আধিপত্য স্থাপন করলে চীন জলপথে পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপে পণ্য রপ্তানি করত। দক্ষিণ ভারত থেকে চীনে রপ্তানি করা হতো বস্ত্র, মশলা, ভেষজদ্রব্য, মূল্যবান পাথর, হাতির দাঁত ও কর্পূর। এই সমস্ত পণ্য ভারত পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতেও রপ্তানি করত, সঙ্গে থাকত রঙ, সুগন্ধি দ্রব্য, চিনি, চন্দনকাঠ প্রভৃতি। পারস্য, আরব ও মিশরের সঙ্গে দক্ষিণের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। পারস্য উপসাগরীয় বন্দর (সিরাফ) কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়ায় দক্ষিণ ভারত থেকে পণ্য পাঠানো হতো। মালাবার উপকূলে কুইলন বন্দর থেকে চের রাজ্যের পণ্য পশ্চিমে রপ্তানির ব্যবস্থা ছিল। মার্কোপোলো দক্ষিণ ভারত ও আরব দেশগুলির মধ্যে

বিশাল ঘোড়া বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। আরব ও দক্ষিণ ভারতের বণিকরা এই বাণিজ্য থেকে লাভবান হন। ঘোড়া ও হাতি ছিল মূল্যবান পণ্য, এজন্য এদের চিকিৎসা ব্যবস্থাও গড়ে উঠেছিল। সমুদ্র উপকূলের জলদস্যুরা বাণিজ্য পোতগুলি আক্রমণ করে লুঠ করত, সঙ্গম সাহিত্যে এই জলদস্যুদের উল্লেখ আছে। পশ্চিম উপকূলের শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রকূট বণিকদের লুণ্ঠনের জন্য জলদস্যুদের উৎসাহ দিত। আরব সাগর, বঙ্গোপসাগর এবং দক্ষিণ চীন সাগরে জলদস্যুদের উৎপাত ছিল। যেসব বন্দরে জলদস্যুদের উৎপাত কম ছিল সেখানে বাণিজ্য বেড়েছিল, বণিক সংস্থাগুলি প্রচুর মুনাফা করেছিল। অন্ধ্রের কাকতীয় রাজারা ত্রয়োদশ শতকে একটি রাজকীয় আদেশ জারি করে মটুপল্লী বন্দরে বণিকদের রক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। রাজারা বলেছিলেন যে বণিকদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট হারে কর আদায় করতে হবে এবং তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। মার্কোপোলো জানিয়েছেন যে মটুপল্লী থেকে উৎকৃষ্ট মসলিন ও হীরে রপ্তানি করা হতো। শক্তিশালী বণিক সংস্থাগুলি নিজেদের পণ্য ও বাণিজ্য রক্ষার জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল।

দক্ষিণ ভারতে যে পণ্য উৎপাদিত হতো তার বেশিরভাগ স্থানীয় পরিভোগে লাগত। বৈদেশিক বাণিজ্য বাড়তি চাহিদা তৈরি করেছিল। হাতি, ঘোড়া, মূল্যবান পাথর, সুগন্ধী দ্রব্য, মশলা ও উৎকৃষ্ট বস্ত্র, ধাতব দ্রব্য, স্বর্ণালঙ্কার, মৃৎপাত্র ও লবণ ছিল রপ্তানি পণ্য। বণিকদের সংস্থাগুলি (গিল্ড) এই বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত। বণিকরা যৌথভাবে বাণিজ্য করত না, কিন্তু সংস্থার সদস্য হতো। বণিকদের সংস্থাগুলি হলো মণিগ্রামম, আয়াভোল, নানাদেশী, নগরত্তম, অঞ্জুভাল্লম ও ভালানিয়ার। এসব সংস্থা একই পণ্যে বা একই অঞ্চলে বাণিজ্য করত না। আয়াভোলের চেয়ে মণিগ্রামম ছিল ছোট সংস্থা, অঞ্জুভাল্লম কেরালা অঞ্চলে বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই বণিক সংস্থাগুলি দক্ষিণের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বাণিজ্য করত। আয়াভোল ছিল আইহোলের ব্রাহ্মণ ও মহাজনদের সংস্থা, এটি দাক্ষিণাত্য ও চোলদের বাণিজ্য কেন্দ্রগুলিতে বাণিজ্যরত ছিল। অগ্রহার অঞ্চলের ব্রাহ্মণরা শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ সত্ত্বেও দূরপাল্লার বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। বণিক সংস্থাগুলি খুব প্রতিপত্তিশালী ছিল, বিভিন্ন অঞ্চলের বাণিজ্যের সঙ্গে তারা যুক্ত ছিল। মন্দির নির্মাণ, জলাশয় খনন ইত্যাদি কাজ যেমন তারা পরিচালনা করত তেমনি প্রয়োজন হলে শাসকগোষ্ঠীকে অর্থ সরবরাহ করত।

স্থানীয় বণিক সংস্থা হলো নগরম। বড় সংস্থার সঙ্গে একযোগে এরা উৎপাদন স্থান থেকে পণ্য সংগ্রহ করত, সারাদেশে বণ্টনের ব্যবস্থা করত। রাষ্ট্রের সহযোগিতা নিয়ে এরা বিদেশে বাণিজ্য করতে যেত না, তবে প্রয়োজন হলে রাষ্ট্র এদের সাহায্য করত। শ্রীবিজয়ের ক্ষেত্রে চোল রাজারা বণিকদের সহায়তা দিয়েছিল। এধরনের

রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে উপনিবেশ গঠন করা হতো না, বাণিজ্যের পথে প্রতিবন্ধকতা দূর করা হতো। রাজা ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা বাণিজ্যে অর্থ লগ্নি করত, বণিক সংস্থাগুলি রাজাদের মূল্যবান উপঢৌকন দিত। বণিকদের অর্থ ছিল, সামাজিক সম্মান ছিল, কিন্তু রাজনৈতিক প্রভাব তেমন ছিল না। বণিক সংস্থার মধ্যে ব্রাহ্মণরা সম্ভবত রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে ক্ষুণ্ণ করতে চায়নি, রাজা তাদের অগ্রহার দেন এবং প্রয়োজন হলে তিনি তা প্রত্যাহার করতে পারতেন। নগরকেন্দ্রিক পেশাদার সংস্থাগুলি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার ভাগ চায়নি, রাজতন্ত্রের ধারণা সারা দেশে দৃঢ়বদ্ধ ছিল। অনেক বণিক সংস্থার বিদেশে বাণিজ্য ছিল, এরা চোলদের সামরিক ও নৌশক্তির ওপরে নির্ভর করত। শাসকগোষ্ঠী গিল্ডগুলিকে ক্ষমতা দিয়েছিল, প্রয়োজনবোধ করলে তারা তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারত। ছোট ছোট রাজ্যগুলিতে বণিক সংস্থাগুলি বেশি শক্তিশালী ছিল কারণ রাজাদের তারা অর্থ জোগাত।

গ্রামাঞ্চলে বিনিময় প্রথা ছিল, বিনিময়ের প্রধান পণ্য ছিল ধান, পশু ও কাপড়। বাজারে তাম্র মুদ্রার চলন ছিল, উচ্চমূল্যের পণ্য বেচা-কেনায় সোনার ও রুপোর টাকার ব্যবহার হতো। দূরপাল্লার বাণিজ্য এবং রাজস্ব প্রদানের ক্ষেত্রে সোনা-রুপোর টাকার প্রয়োজন হতো। চোল রাজারা রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন করেছিলেন, স্বর্ণমুদ্রার ব্যবহার ছিল খুব সীমিত, স্বর্ণমুদ্রার নাম ছিল কালাঞ্জু। বণিকরা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিল, এদের মধ্যে লেনদেনে ব্যাঙ্ক নোট (Promissory notes) মুদ্রার স্থান নিত। স্বর্ণমুদ্রার অবাধ চলন ছিল, তবে একাদশ শতক থেকে মুদ্রামানে অবনতি ঘটেছিল, বিভিন্ন অঞ্চলের স্বর্ণমুদ্রার ওজনে এবং গুণগতমানে পার্থক্য ছিল। এজন্য গ্রামসভা ও নগরম এদের যথার্থ মূল্য নির্ধারণের প্রয়াস অব্যাহত রেখেছিল। দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণরা ও মন্দিরগুলি তেজারতি কারবারের সঙ্গে যুক্ত ছিল। অর্থের লেনদেন করে এরা লাভবান হতো, ধর্মের প্রচার হতো, মন্দিরগুলি আরো ধনশালী হয়ে উঠত।

সপ্তম অধ্যায়

সংস্কৃতি

প্রাদেশিক সাহিত্য—বাংলা, মারাঠি, গুজরাতি, তামিল, তেলেগু ও কানাড়ি

পাল ও সেন যুগে বাংলার জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত ভাষা। ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সাহিত্য এই ভাষায় রচিত হয়। বাংলাদেশে অপভ্রংশের ব্যবহার ছিল। এই পর্বের গোড়ার দিকে শুধু ব্যক্তি ও স্থানের নামে বাংলার ব্যবহার ছিল। চর্যাপদ হলো বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পঞ্চাশটি চর্যাপদ আবিষ্কার করেন। 'হাজার বছরের পুরনো বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে এগুলি প্রকাশিত হয় (১৯১৬)। মহাযান মতবাদের শাখা বজ্রযান সিদ্ধাচার্যগণ হলেন এই চর্যাপদগুলির রচয়িতা। ড. শহীদুল্লার মতে এগুলির রচনাকাল হলো সপ্তম শতক, গৃহীত মতটি হলো ৯৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এগুলি রচিত হয়। এই পর্বে আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির জন্ম হয়েছিল। এই চর্যাপদগুলি উচ্চস্তরের কবিতা নয়, তবে এর মধ্যে আবেগ, চিত্রকল্প ও ব্যঞ্জনার অভাব নেই (occasionally they breathe a true poetic spirit and are marked by beauty of expression, fine conception and imagery, and a deep sensibility and emotion.)। গান হিসেবে এগুলি রচনা করা হয়েছিল, প্রত্যেক পদের সঙ্গে রাগিণীর উল্লেখ আছে। এই পদগুলির ভাষাতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় গুরুত্ব ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় স্বীকার করে নিয়েছেন। এই পদগুলির আবেগ, অনুভূতি, ধর্মীয়ভাব পরবর্তীকালে সহজিয়া ধর্মমত, বৈষ্ণব পদ, শাক্ত পদাবলী ও বাউল সঙ্গীতকে প্রভাবিত করেছিল।

নাম ও চর্যাপদ ছাড়া প্রথম দিককার বাংলা ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় *প্রাকৃত পয়ঙ্গল* (১৪০০) গ্রন্থে। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় এর মধ্যে অনেকগুলি বাংলা পদ লক্ষ করেছেন। সংস্কৃত *মানসোল্লাস*-এ (১১৩০) অনেকগুলি বাংলা পদ আছে। *প্রাকৃত পয়ঙ্গল*-এ ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের নজির পাওয়া যায়। মাগধী অপভ্রংশ থেকে বাংলার উৎপত্তি হয়েছে। বাংলার কবিরা সংস্কৃত, অপভ্রংশ ও বাংলায় লিখতেন, জয়দেবের *গীত গোবিন্দ*-এর মধ্যে অপভ্রংশের মিশ্রণ ঘটেছে বলে অনেকে মনে করেন। পশ্চিমী অপভ্রংশ হলো 'খরিবলি হিন্দি' এবং এই ভাষা প্রায় সমগ্র ভারতে প্রচলিত ছিল। গোরখনাথ ও তাঁর অনুগামীদের লেখায় (গোরখবোধ) প্রাচীন বাংলার নিদর্শন পাওয়া যায়। চর্যাপদের মাধ্যমে বাংলা সমগ্র উত্তর ভারতের সাহিত্যের বিকাশকে প্রভাবিত

করেছিল (Ancient Bengal in this way can be said to have influenced the rest of North India through her Charyapada literature.)।

বাংলার মতো মারাঠি ভাষা ও সাহিত্যের শুরু হয়েছে লেখ থেকে। ৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের শ্রবণবেলগোলা লেখতে মারাঠি ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়। *মানসোল্লাস*-এ একটি মারাঠি গানের উল্লেখ আছে। মারাঠি সাহিত্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য লেখক হলেন মুকুন্দরাজ। তিনি দ্বাদশ শতকে তাঁর দার্শনিক গ্রন্থ *বিবেকসিন্ধু* (১১৯০) রচনা করেন। শঙ্করাচার্যের শিষ্য মুকুন্দরাজ একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, তিনি আরো কয়েকখানি দর্শন গ্রন্থ রচনা করেন। মহারাষ্ট্রে এই পর্বে অনেকগুলি ধর্ম সম্প্রদায় ছিল, এদের মধ্যে একটি ছিল গোরখনাথের অনুগামী সম্প্রদায়। গোরখনাথকে নিবেদিত কয়েকটি মারাঠি গান পাওয়া যায়। *গোরক্ষঅমরনাথ সংবাদ*-এ মারাঠি গদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায়। এই সম্প্রদায়ভুক্ত জ্ঞানদেব রচনা করেন সুবিখ্যাত *জ্ঞানেশ্বরী*, ভগবত গীতার এই ব্যাখ্যা মারাঠি সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। মারাঠি লেখকরা এই রচনাটিকে বিশ্বের একটি শ্রেষ্ঠ রচনা বলে মনে করেন (It is undoubtedly one of the great masterpieces of the world.)। *অমৃতানুভব* হলো জ্ঞানদেবের অপর দার্শনিক রচনা, উপনিষদের দর্শনের ওপর তিনি এটি রচনা করেন। কবিতার সংকলন গাথা ও *জ্ঞানেশ্বরী* হলো মহারাষ্ট্রের বারাকরী সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ অবদান। এই সম্প্রদায়ের আদর্শ ছিল ভক্তি, ভক্তির মাধ্যমে জীব মুক্তিলাভ করে। জ্ঞানদেবের গুরু নিবৃত্তিনাথ, ভ্রাতা সোপনদেব ও ভগ্নী মুক্তাবাঈ মারাঠি ভাষায় লিখেছিলেন। এঁদের রচনার পরিমাণ বেশি নয়, এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা স্বেচ্ছায় জীবন ত্যাগ করতেন যখন তাঁদের মনে হতো যে জীবনের কাজ শেষ হয়েছে।

চক্রধর ত্রয়োদশ শতকে 'মহানুভব' নামে একটি সংস্কারপন্থী সম্প্রদায় গঠন করেন। জন্মসূত্রে গুজরাতি চক্রধর মহারাষ্ট্রে অবস্থান করেন, মারাঠি ভাষায় লেখেন এবং নিজের ধর্মমত প্রচার করেন। চক্রধরের শিষ্য নাগদেবাচার্য ও তাঁর অনুগামীরা তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন। এঁরা ধর্মের ব্যাখ্যা করেছেন, টীকা, শব্দকোষ, ব্যাকরণ ইত্যাদি লিখেছেন, জীবনী ও জীবনস্মৃতিও লেখা হয়েছে। মহারাষ্ট্রে একটি বড় ধর্ম সম্প্রদায় হলো ভাগবত গোষ্ঠী, এরা পান্ধারপুরের বিট্ঠলের উপাসক। ভক্তির মাধ্যমে এই গোষ্ঠীর লোকেরা ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন চায়, নামদেব হলেন এই সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা। এই সম্প্রদায় জাতিভেদ মানত না, এদের মধ্যে অস্পৃশ্যতা ছিল না, এই সম্প্রদায় বহু সন্ত-কবি উপহার দিয়েছিল যাঁরা মহারাষ্ট্রে খুব জনপ্রিয় ছিলেন। এঁরা বেদান্ত দর্শন প্রচার করেন, নামদেব ও তাঁর অনুগামীরা বহু গান ও কবিতা রচনা করেন। বিখ্যাত সন্ত-কবি তুকারাম এই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হন। মহাদায়সা

ও জনাবাঈ হলেন এযুগের মহিলা কবি। জনাবাঈ নামদেবের পরিচারিকা ছিলেন। এইসব কবিদের রচনা 'অভঙ্গ' নামে পরিচিত। মহারাষ্ট্রের 'কীর্তন সম্প্রদায়' গান ও কবিতা রচনায় অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। মহাকাব্য ও পুরাণগুলিকে অনুসরণ করে গান ও কবিতা লেখা হতো। কীর্তনকাররা গদ্য ও পদ্য রচনার মাধ্যমে মহারাষ্ট্রের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে রেখেছেন। অবধূত, জঙ্গম, লিঙ্গাইত ও গাণপত্য সম্প্রদায়ের সাধুরাও কিছু কিছু গান ও কবিতা রচনা করেছেন। এই পর্বের সব কবিতা হলো ধর্মীয় কবিতা।

প্রথমদিককার গুজরাতি সাহিত্যের ওপর অপভ্রংশের প্রভাব ছিল খুব বেশি। *রসবন্ধ* হলো প্রথমদিককার গুজরাতি কবিতার নিদর্শন। গোড়ার দিকে শুধু কবিতার মাধ্যমে ভাব প্রকাশ করা হতো, গদ্য ছিল না। বেশিরভাগ রচনা ছিল ধর্মীয় ও উপদেশমূলক। জৈনগুরুরা কিছু রচনা রেখে গেছেন। হেমচন্দ্র তাঁর *সিদ্ধহেম* গ্রন্থে অপভ্রংশ ও পুরনো গুজরাতির মিশ্রণের নিদর্শন রেখে গেছেন। এই লেখাগুলি সাধারণ মানুষের প্রেম, বীরত্ব, নৈতিকতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে রচিত হয়। জৈন লেখকরা সাধারণ মানুষকে শিক্ষাদানের জন্য 'দেশ ভাষায়' লিখেছিলেন। রস কবিতাগুলিতে শ্রীকৃষ্ণের জীবনলীলার বর্ণনা আছে, নৃত্যের সঙ্গে এই গানগুলি গাওয়া হতো। পুরনো গুজরাতি ভাষায় লেখা রসগানগুলি অনেকসময় জৈনদের উৎসবে গাওয়া হতো। বজ্রসেনের *ভরতেশ্বর-বহুবলী-ঘোরা* কাব্যে রাজা ভরত ও প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভের পুত্রদের মধ্যে যুদ্ধের কাহিনী পাওয়া যায়। অন্যান্য রসকাব্যে জৈন সন্তদের কাহিনী পাওয়া যায়। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, বিবাহ ইত্যাদি নিয়ে রচিত হয়েছে 'বারহমাসা', 'মাতৃকা' ও 'বিবাহল'। এগুলিতে ঋতুগুলিরও পরিচয় পাওয়া যায়। বিনয়চন্দ্র হলেন এই ধরনের কবিতার শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি নেমি ও রাজিমতীর প্রণয় কাহিনী নিয়ে লিখেছেন *নেমিনাথ চতুশপদিকা*। মাতৃকাগুলিতে ধর্মীয় ও নৈতিক উপদেশ আছে। সোমমূর্তি হলেন 'বিবাহল' শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ লেখক, এসব লেখার সবচেয়ে বড় গুণ হলো এগুলি খুব জনপ্রিয় ছিল।

১০০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তামিল ভাষাভাষী অঞ্চলে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কমেছিল, শৈব ও বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল। *তেবারম* ও *তিরুবাচকম* হল শৈব নয়নার সন্তদের রচিত গীতসংকলন, বৈষ্ণব আলবার সন্তরা লেখেন *নালায়িরা প্রবন্ধম*। ৬০০-৮৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এইসব অনবদ্য সঙ্গীত রচিত হয়, দক্ষিণের জীবন ও সংস্কৃতির ওপর এদের অসামান্য প্রভাব লক্ষ করা যায়। তিরুমালিকাই তিরুইসাইপ্পা শিবস্তোত্র রচনা করেন, এগুলিও সমান জনপ্রিয় ছিল। সেনথানার ও পত্তিনাথার হলেন এধরনের কাব্যরচয়িতা। এই পর্বের তামিল কবিরা রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের তামিল সংস্করণ প্রকাশ করেন। কানাড়া কাব্যের তিন রত্নের মতো

তামিল কাব্যের তিনরত্ন হলেন কম্বন, ওট্টাকুট্টন ও পুগালেন্দি। কম্বন চোলরাজ কুলোতুঙ্গের সভাকবি ছিলেন, তিনি তামিল ভাষায় রামায়ণ রচনা করেন। তামিল রামায়ণ কম্বন রামায়ণ নামে পরিচিত হয়। কম্বনের অন্য রচনা হলো *সদকোপার-অনথাথি* ও *এরুলুপাথু*। পুগালেন্দি রচনা করেন *নলবেনবা*, নল ও দময়ন্তীর কাহিনী নিয়ে এই গ্রন্থ লেখা হয়েছে। মহাভারতের কাহিনী নিয়ে তিনি আরও কয়েকখানি কাব্য রচনা করেন, *অল্লি অরাসনি*, *পভলাকোড্ডি* হলো তাঁর অন্যান্য জনপ্রিয় রচনা। *কলাম্বকম* হলো তাঁর আর একটি বিখ্যাত রচনা। ওট্টাকুট্টন *উত্তরকাণ্ড* ছাড়াও লিখেছেন *পরনিস* ও *উলাস*, যুদ্ধ বিষয় নিয়ে এগুলি লেখা হয়েছিল।

আভ্‌ভাই নামে (Avvai) একজন মহিলা কবির রচনা পাওয়া যায়। মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ এই মহিলা কবি লেখেন *নান্নুরকোভাই*, *কালভিয় লুককম* ও *অনন্ত মিলমালাই*। তাঁর উজ্জ্বল, বুদ্ধিদীপ্ত লেখার জন্য তামিল কাব্যের জননীর মর্যাদার আসন তিনি অলংকৃত করে আছেন (the beloved matriarch of Tamil poetry)। *পেরিয়াপুরাণম* হল শিব প্রশস্তিমূলক কাব্য, লেখক হলেন সেক্কিলার ও নাম্বি। এগুলির মধ্যে স্থান পেয়েছে ইতিহাস ও জনশ্রুতি। মেকাণ্ড, অরুলনন্দী ও উমাপতি তামিল ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন শাস্ত্র। এই শাস্ত্রে শৈব সিদ্ধান্ত দর্শনের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। মেকাণ্ডর *শিবজ্ঞানবোধম* হলো এই দর্শনের ব্যাখ্যা। উমাপতি লিখেছেন *শিবপ্রকাশম*, অরুলনন্দীর রচনা হলো *শিবজ্ঞানসিদ্ধিয়ার*। উমাপতির অন্য রচনা হলো বিতর্কিত *সংকল্প নিরাকরনম*।

অন্ধ্রপ্রদেশের ভাষা হলো তেলেগু। অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মতো তেলেগু ভাষার যাত্রা শুরু হয়েছিল শিলালিপিতে। যুদ্ধমল্ল ও মোপুর এই ধরনের লেখ উৎকীর্ণ করেন। প্রথমদিককার তেলেগু ভাষার দুটি দিক—দেশী ও মার্গ। সংস্কৃত প্রভাবমুক্ত গ্রামীণ মানুষের ভাষা ও সাহিত্য হলো দেশী। সাধারণ গ্রাম্য কবি দেশী ভাষায় কবিতা ও গান লিখেছেন। বিষয়গুলি হলো দোলনা, প্রেম, শস্য সংগ্রহ। তেলেগু ভাষায় এগুলি হলো লালিপাতালু, জভলিলু ও উদুপুপাতালু। এই কথ্য ভাষার সঙ্গে স্থানীয় দ্রাবিড় ভাষার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ, আর্য ভাষার সঙ্গে যোগ নেই। মার্গি ভাষার ওপর সংস্কৃতের প্রভাব বেশি, রাজসভা ও অভিজাতদের জন্য এই ভাষায় কাব্য ও গান লেখা হয়। নান্নিয়া এই ভাষায় মহাভারত লিখে অমর হয়ে আছেন। নান্নিয়ার অসম্পূর্ণ মহাভারতকে সম্পূর্ণতা দেন টিক্কান্না। তেলেগু সাহিত্যের তিনরত্নের অপর নামটি হলো এররানা। নান্নিয়া বেঙ্গির চালুক্যরাজার সভাকবি ছিলেন, তাঁর আদেশে তিনি মহাভারত রচনার কাজে হাত দেন। টিক্কান্না মহাভারতের কিছু অংশ ছাড়াও রামের জীবন নিয়ে কাব্য রচনা করেন। এররানা মহাভারতের কতকাংশ রচনা ছাড়াও দুখানি গ্রন্থ *হরিবংশ* ও *নৃসিংহপুরাণ* রচনা করেন। এই তিন কবি চম্পু কাব্য রচনা করেছেন, এতে গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণ ঘটেছে।

এই বিখ্যাত ত্রয়ীর পর একাদশ ও দ্বাদশ শতকে বিশেষ মৌলিক রচনা দেখা যায় না। এই যুগে পাভুলুরু মল্লন ও এলুগন্তি পেদ্দন লেখেন গণিতশাস্ত্রের ওপর প্রবন্ধ। সোমনাথ লেখেন *বাসবপুরাণ* ও *অনুভবসার*। তেলেগু কবি নানচোড় লেখেন *কুমারসম্ভবম* কাব্য। এই গ্রন্থখানি কালিদাসের শুধু অনুকরণ নয়, এর মধ্যে কবির মৌলিকতা ও প্রতিভার স্বাক্ষর রয়েছে। ত্রয়োদশ শতকে রামায়ণের দুখানি সংস্করণ প্রকাশিত হয়, এ গ্রন্থ দুখানির লেখক হলেন রঙ্গনাথ ও হুল্লাক্কি ভাস্কর। তেলেগু সাহিত্যের অন্যান্য লেখকেরা হলেন অথর্বন, কেতন, বেদ্দন, মরণ ও মাচন্ন। এঁরা সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন অথবা সংস্কৃত গ্রন্থের অনুসরণে গ্রন্থ রচনা করেছেন।

তামিল ছাড়া দক্ষিণ ভারতের ভাষাগুলির মধ্যে কানাড়া হলো সবচেয়ে পুরনো। জৈন, বীরশৈব ও বৈষ্ণবরা কানাড়া সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। এছাড়াও বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও ইসলামের প্রভাব আছে কানাড়া সাহিত্যের ওপর। তবে কানাড়া ভাষা ও সাহিত্য সংস্কৃতের কাছে অবশ্যই ঋণী ছিল। যাঁরা কানাড়া সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের অনেকে সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। কানাড়া ভাষায় প্রথমদিককার গদ্য লেখা হলো জৈন লেখক শিবকত্যাচার্যের *বোদ্দা আরাধনা*। লেখতে কানাড়া ভাষার আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল, রাজা ও সামন্তপ্রভুরা কানাড়া ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। রাষ্ট্রকূট রাজা অমোঘবর্ষ (নৃপতুঙ্গ) লেখেন *কবিরাজমার্গ*। হৈসল, চালুক্য, বিজয়নগর ও মহীশূরের রাজারা এই ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাজসভায় সাধারণত আটজন বিদ্বান থাকতেন যাঁদের 'অষ্টদিগ্‌গজ' বলা হতো। তবে এসব রাজারা একই সঙ্গে তেলেগু কবিসাহিত্যিকদেরও উৎসাহ দিতেন। অনেকে দুই ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছেন। এই যুগের আগে সামন্তভদ্র, পূজ্যপাদ ও কবিপরমেষ্ঠি আবির্ভূত হন, অমোঘবর্ষ এঁদের নামোল্লেখ করেছেন।

অমোঘবর্ষ লিখেছেন অলংকার শাস্ত্রের ওপর, কাব্য রচনার রীতিনীতি এই গ্রন্থে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, সম্ভবত দণ্ডীর কাব্যাদর্শ তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। প্রথম গুণবর্মন লেখেন *শূদ্রক* ও *নেমিনাথপুরাণ* (হরিবংশ)। দশম শতকে কানাড়া সাহিত্য পেয়েছিল তিনরত্নকে—পম্পা, পোন্না ও রন্নাকে। প্রথম নাগবর্মা ছন্দের ওপর লেখেন *ছন্দমবুধি*। প্রথম পম্পা হলেন কানাড়া সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক। পম্পা লেখেন *আদি পুরাণ* ও *বিক্রমার্জুন বিজয়*। *আদি পুরাণ*-এ তিনি জৈনদের প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভের ইতিহাস বলেছেন। পোন্না লিখেছেন *শান্তিপুরাণ*, এটি হলো ষোড়শ তীর্থঙ্করের কাহিনী। *অজিতপুরাণ*-এ রন্না দ্বিতীয় তীর্থঙ্করের পরিচয় দিয়েছেন। চাবুন্দরায় চব্বিশজন তীর্থঙ্করের পরিচয় রেখেছেন *চাবুন্দরায় পুরাণে*। এই তিন কবি-লেখক জৈন ধর্ম ও ঐতিহ্যকে আশ্রয় করেন, তবে তাঁরা অন্য বিষয়েও লিখেছেন। পম্পার *বিক্রমার্জুন বিজয়* এবং রন্নার *সাহসভীম বিজয়* মহাভারতের কাহিনী-নির্ভর রচনা।

একাদশ শতকে কানাড়া রচনা পরিমাণে খুব কম, জাগবর্মাচার্য ও চন্দ্ররাজ যথাক্রমে লেখেন *চন্দ্রচূড়ামণি শতক* ও *মদনতিলক*। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে কানাড়া সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে জৈন লেখকদের অবদানে। বীরশৈব (লিঙ্গায়েত) আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সাহিত্য রচিত হয়েছে। এই সম্প্রদায়কে সংগঠিত করেন বাসব, এঁদের রচনা পদ্ধতির নাম হলো বচন। বচন শাস্ত্রে ভক্তির প্রাধান্য লক্ষণীয়। তামিল সাহিত্যে নায়নাব ও আলভারদের মতো এঁরা অজস্র কবিতা ও গান রচনা করেছেন। এঁদের ধর্মভাবনার ওপর রামানুজের বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদের প্রভাব পড়েছিল। সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে এঁরা তাঁদের বচনগুলি রচনা করেন, বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে এগুলি গাওয়া হতো। এই সম্প্রদায়ের মহিলা কবি হলেন মহাদেবী আক্কা। অন্য কবিরা হলেন হরিহর, রাঘবঙ্কা ও পদ্মরস। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে বীরশৈবদের পাশাপাশি জৈন লেখকেরা সাহিত্য রচনা করেছেন। নাগচন্দ্র লিখেছেন *মল্লিনাথপুরাণ*, রামায়ণের জৈন সংস্করণ রচিত হয়েছে। নাগচন্দ্রের রামায়ণের নাম হলো *রামচন্দ্রচরিত* পুরাণ। নেমিচন্দ্র রচনা করেন রোমান্টিক কাব্য *লীলাবতী*। জৈন সম্প্রদায়ের মহিলা কবি হলেন কান্নি। দ্বিতীয় নাগবর্মা লিখেছিলেন অলঙ্কার শাস্ত্রের ওপর গ্রন্থ *কাব্যাবলোকন*। মল্লিকার্জুন হলেন সংকলক, *তিনি সূক্তিসুধার্নব* নামে কানাড়া কাব্যের একখানি সংকলন প্রকাশ করেন।

স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা ঃ কারিগরি শিল্প

ভারতে মন্দির, প্রাসাদ, দুর্গ, স্মৃতিসৌধ ইত্যাদি নির্মাণে একটি বিশিষ্ট শৈলী অনুসরণ করা হয়েছে। ভারতের শিল্পশাস্ত্রে তিনটি রীতির কথা আছে—নাগর, দ্রাবিড় ও বেসরা। হিমালয় থেকে বিন্ধ্য এই অঞ্চলে প্রচলিত ছিল নাগর রীতি, কৃষ্ণা থেকে কন্যাকুমারীতে ছিল দ্রাবিড় রীতি এবং বিন্ধ্য থেকে কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্তী স্থলে ছিল বেসরা রীতি। এই অঞ্চলে রীতিটি চালুক্য রীতি নামেও পরিচিতি লাভ করে। নাগর রীতির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো ক্রুশের মতো চতুষ্কোণ বিশিষ্ট পরিকল্পনা এবং শিখর (Cruciform plan and the curvilinear sikhar)। উত্তরপ্রদেশের দেওগড়ের দশাবতার মন্দির এবং ভিতরগাঁও মন্দিরে এই শিল্পশৈলীর নিদর্শন পাওয়া যায়। অষ্টম শতক নাগাদ এই নাগর শৈলী তার পূর্ণ পরিণত রূপ লাভ করেছিল। এই রীতির সূচনা হয়েছিল গুপ্তযুগের শেষদিকে। দক্ষিণ ভারতের শিল্পরীতি হলো পিরামিডাকৃতি গঠন এবং সূক্ষ্ম চূড়া। মন্দিরের মধ্যে অবশ্যই থাকবে গর্ভগৃহ, প্রদক্ষিণ চত্বর, বিমান ও স্তুপি। এই দুই রীতির মিশ্ররূপ হলো বেসরা। ভারতের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ছিল নাগর শৈলী। উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে বিজাপুর, পশ্চিমে পাঞ্জাব থেকে পূর্বে বাংলা পর্যন্ত এই রীতিতে স্থাপত্য শিল্প গড়ে উঠেছিল।

মন্দিরময় ওড়িশা হলো মন্দির স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন (There are perhaps more temples now in Orissa than in all the rest of Hindustan put together.)। এখানে নাগর রীতির বিশুদ্ধ রূপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এখানে মন্দিরের চারটি অংশ পিষ্ট, বাড়, গণ্ডি ও মস্তক, গর্ভগৃহ ও জগমোহন এইভাবে বিভক্ত। অনেক মন্দির রথের আকৃতি বিশিষ্ট। ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির হলো ওড়িশা রীতির পরিণত রূপ। লিঙ্গরাজ মন্দিরের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো এর সুউচ্চ দেউল। সুবিখ্যাত পুরীর জগন্নাথ মন্দির আয়তনে বিশাল এবং লিঙ্গরাজের শিল্পরীতিতে নির্মিত। ওড়িশা রীতির চারটি বৈশিষ্ট্য এতে পাওয়া যায়। কোনারকের সূর্য মন্দির একটি সাত ঘোড়ায় টানা রথের মডেলে তৈরি করা হয়েছে। মন্দির গাত্রে অসংখ্য ভাস্কর্য দিয়ে অলংকৃত করা হয়েছে, জীবজন্তু, গাছপালা, ইত্যাদির সঙ্গে নরনারীর প্রেমও বাদ যায়নি। সবকিছু স্বাভাবিকভাবে স্থান পেয়েছে, কোথাও কিছু আরোপিত নয়, সবকিছু স্বাভাবিক। নাগর রীতির সম্প্রসারণ ঘটেছিল মধ্য ভারতে, সিরপুরের লক্ষ্মণ মন্দির, গোয়ালিয়রের মন্দির এবং মহাদেব মন্দিরে এই রীতির নিদর্শন আছে। গর্ভগৃহ, মণ্ডপ ও অন্তরাল এই তিন অংশ নিয়ে মন্দির স্থাপত্য গড়ে উঠেছে। নর্মদা, শোন ও মহানদীর উৎপত্তিস্থলে অমরকণ্টকে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর মন্দির আছে। অমরকণ্টক মন্দিরের সমগোত্রীয় হলো সোহাগপুরের বিরাটেশ্বর শিব মন্দির।

দশম শতকে নির্মিত হয়েছে চান্দেল্ল রাজাদের সুবিখ্যাত খাজুরাহো মন্দিরগুলি। এখানে অন্তত তিরিশটি মন্দির আছে, এগুলি হলো শৈব, জৈন ও বৈষ্ণব মন্দির। মহাদেব, রাম ও পার্শ্বনাথের নামে মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছে। পার্শ্বনাথের পাশে আছে অতিসুন্দর আদিনাথ মন্দির। খাজুরাহোর মন্দির স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হলো মহাদেব মন্দির। এর নির্মাণকৌশল, ধারণা, সূক্ষ্মকাজ বিস্ময়ের উদ্রেক করে (brilliant in its conception and the most imposing in its perfect finish and grace)। যোধপুরের কাছে ওসিয়াতে অনেকগুলি সুন্দর মন্দির নির্মিত হয়, শৈলী ছিল নাগর। ড. ক্রামরিশ এই মন্দিরগুলির গঠনসৌন্দর্যের প্রশংসা করেছেন (It is a model of clarity in the disposition and proportion of its architectural theme.)। রাজস্থানে অনেকগুলি জৈন মন্দির আছে, এগুলির মধ্যে নেমিনাথ সবচেয়ে বিখ্যাত। মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে মন্দিরটি স্থাপিত। রাজস্থানের মন্দির শৈলীর সঙ্গে গুজরাটের শৈলীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। কাথিয়াবাড়ের গোপ মন্দিরগুলিতে গান্ধার শিল্পের প্রভাব পড়েছিল বলে সাঙ্কালিয়া মনে করেন। এখানকার মন্দিরে চতুষ্কোণ রীতি ত্যাগ করে আয়তক্ষেত্রের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে (rectangular design of the sanctum)। গুজরাটের সোলাঙ্কি রাজারা মোধেরাতে সূর্য মন্দির নির্মাণ করেন, এই মন্দিরের বিশালতা ও গাম্ভীর্য দর্শককে আকৃষ্ট করে। দক্ষিণে কৃষ্ণা-তুঙ্গভদ্রা

উপত্যকা পর্যন্ত নাগর শৈলীর প্রসার ঘটেছিল। আইহোল, পত্তদকল, মহামুক্তেশ্বর ও আলমপুরে নাগর রীতির মন্দির স্থাপত্য পাওয়া গেছে। নাগর ও দ্রাবিড় রীতির মিশ্রণে চালুক্য শৈলী তৈরি হয়েছে। সিন্ধু-গঙ্গা অঞ্চলে পাথর কেটে মন্দির নির্মিত হয়। কাংড়ার বৈজনাথে এই পাথরের মন্দিরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। উত্তর, পূর্ববঙ্গ, বিহার অঞ্চলে নাগর রীতিতে মন্দির নির্মিত হয়। বর্ধমানের সৎদেওলিয়াতে নাগর রীতির ইট দিয়ে গড়া মন্দির আছে, বাঁকুড়ার সিদ্ধেশ্বর হলো এই রীতির আর একটি নিদর্শন।

পল্লব রাজারা শিল্প ও সাহিত্যের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। প্রথম নরসিংহ বর্মন মামল্লপুরমে (মহাবলীপুরম)[1] রথের আকৃতি বিশিষ্ট আটটি মন্দির নির্মাণ করেন, রীতি হলো দ্রাবিড়। কাঞ্চীর কৈলাসনাথ মন্দির পল্লব স্থাপত্যের আর এক উজ্জ্বল নিদর্শন। কাঞ্চীর বৈষ্ণব মন্দিরও সম্ভবত পল্লব রাজারা নির্মাণ করেন। চোল রাজাদের আমলে দ্রাবিড় রীতি পরিণত সুষমামণ্ডিত রূপ লাভ করেছিল। বিজয়ালয়ের চোলেশ্বর মন্দির, তাঞ্জোরের রাজরাজেশ্বর এবং রাজেন্দ্র চোলের গঙ্গাইকোণ্ডচোলপুরম মন্দির চোল স্থাপত্যের সব অপূর্ব নিদর্শন। নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী এই মন্দিরটিকে বলেছেন 'দুঃসাহসী প্রযুক্তি কৌশলের নিদর্শন' (modern predatory engineering)। চালুক্য শাসিত গুজরাট অঞ্চলে ছিল বেসরা রীতির চলন। নাগর ও দ্রাবিড় রীতির পাশাপাশি ছিল বেসরা রীতি, বিমান ও মণ্ডপ হলো এই রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। আইহোল ও পত্তদকলে এই রীতির নিদর্শন ছড়িয়ে আছে, লাকুণ্ডির জৈন মন্দির এই রীতিতে নির্মিত হয়েছে। দ্বাদশ শতকে এই চালুক্য শৈলী পরিণত হয়েছে। হৈসল রাজারা এই শৈলীতে মন্দির নির্মাণ করেছেন। কাশ্মীরের রাজারা অনেক স্তূপ ও চৈত্য নির্মাণ করেছেন। ললিতাদিত্যের মন্দিরগুলিতে বৈদেশিক প্রভাব পড়েছে। রাজশাহীর পাহাড়পুরে একটি বিশাল মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া গেছে। ভারতের মন্দির স্থাপত্য যেমন বিচিত্র তেমনি অসাধারণ সুষমামণ্ডিত।

ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে অষ্টম ও নবম শতকে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল, ধ্রুপদী ধারাও পাশাপাশি প্রবহমান ছিল। ভারতের ভাস্কর্য নিদর্শনগুলি অবশ্যই ত্রিমাত্রিক (three dimensional), চিত্রকলা হলো দ্বিমাত্রিক। কোনো কোনো শিল্পে ভাস্কর্য ও চিত্রকলা মিশে গেছে, অজন্তা ও ইলোরার গুহাগুলির ক্ষেত্রে এর নিদর্শন আছে। ভাস্কর্যের ওপর ধর্মের প্রভাব খুব বেশি; প্রথমদিকে ভাস্কর্য হলো দেবদেবীর মূর্তি, এর মধ্যে মিশেছে ধর্মীয় আবেগ ও সৃজনশীলতা। বিষ্ণু, সূর্য, উমা-মহেশ্বর, বুদ্ধমূর্তি নির্মিত হয়েছে, মন্দিরে বহু মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। ভাস্কর্যের উন্নতি সর্বত্র একই সময়ে

১. এই স্থানটি চেন্নাই থেকে ৪৮ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত।

হয়নি। কোনো কোনো স্থানে ভাস্কর্যের চেয়ে চিত্রকলা ও কারিগরি শিল্প প্রাধান্য পেয়েছে। জীবনের প্রয়োজনে শিল্পসুষমামণ্ডিত পণ্য তৈরি হয়েছে। পোড়ামাটির মূর্তি, চিত্র নির্মাণ করে শিল্পী-কারিগর জীবিকানির্বাহ করেছে। দেবদেবীর পাশাপাশি জীবজন্তু, গাছপালা, নরনারীর মূর্তিও তৈরি হয়েছে। ভারতবর্ষে চিরকাল অলংকার শিল্পের চলন ছিল, কারিগর ও শিল্পীরা চাহিদা অনুযায়ী এগুলি নির্মাণ করেছে। সোনা, রুপো, পাথর, ব্রোঞ্জ ও পিতলের সব সুন্দর মূর্তি ও অলংকার নির্মিত হয়েছে। মন্দিরগাত্রে, পর্বত গুহায়, প্রাসাদে নানাধরনের মূর্তি, বাদ্যযন্ত্র, জীবনের নানাদিক প্রতিফলিত হয়েছে। শিল্প কখনো জীবনবিমুখ নয়, পার্থিব জীবনের নানাদিকের প্রতিফলন ঘটেছে ভাস্কর্যে।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে অষ্টধাতুর মূর্তি নির্মিত হয়েছে। নালন্দার মূর্তিগুলি উল্লেখের দাবি রাখে। পূর্ব ভারতে বাংলা ও বিহারে পার্থিব জীবনের প্রতিফলন ঘটেছে সমকালীন ভাস্কর্যে, বাংলার সেনরাজারা এই ভাস্কর্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। ওড়িশার ললিতগিরি, উদয়গিরি ও রত্নগিরিতে ভাস্কর্য উৎসাহিত হয়েছে। পাথর দিয়ে বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করা হয়েছে, ভুবনেশ্বর, পুরী ও কোনারকে অসংখ্য মূর্তি আছে। মানুষের পাশে স্থান পেয়েছে কার্তিকেয়, গণেশ ও মহিষাসুরমর্দিনী। সাঁচী, মথুরা ও অমরাবতী হলো ভাস্কর্যের পীঠস্থান। খাজুরাহোর মন্দিরগুলিতে অপূর্ব সব ভাস্কর্য মূর্তি সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে, কোনারকের মন্দিরে হাতির মূর্তিগুলিও কম সুন্দর হয়। রাজপুতনা, গুজরাট, বাংলা সর্বত্র ভাস্কর্য উৎসাহ পেয়েছে। হিমালয়ের সন্নিহিত চম্বা, কাংড়া, কুলু ও কুমায়ুন অঞ্চলে অসংখ্য দেবদেবী ও নারী-পুরুষের মূর্তি, পশুপাখির মূর্তি ছড়িয়ে আছে। কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য সোনা ও রুপোর দেবমূর্তি বানিয়েছিলেন। চোল আমলে অপূর্ব সুন্দর নটরাজের মূর্তিগুলি নির্মিত হয়। শৈব ও বৈষ্ণব সন্তদের অনেক মূর্তি পাওয়া গেছে। ভারতে ভাস্কর্য যত উন্নত চিত্রকলা তত উন্নত নয়। অজন্তা, বাগ ও বাদামীতে চিত্রকলার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। অজন্তার অবলোকিতেশ্বর মূর্তি, বাগের হাতির শোভাযাত্রা এবং বাদামির শিব-পার্বতী চিত্র অবশ্যই সুষমামণ্ডিত এবং উন্নত মানের। কৈলাস মন্দির, ইলোরায় এবং তিরুমালাইপুরমে চিত্রাবলীর অভাব নেই। শিল্পী তুলির সূক্ষ্ম টানে মানুষের ভাব ও আবেগকে প্রকাশ করেছেন। ধ্রুপদী ঐতিহ্যের সঙ্গে স্থানীয় পরিবেশকে মিশিয়ে অপূর্ব সব চিত্রমালা সৃষ্টি করেছেন। বাংলাদেশে তথা পূর্ব ভারতে চিত্রশিল্পের রূপটি হলো মিনিয়েচার, গ্রন্থাবলীতে নানাদৃশ্য এঁকে একে সুশোভিত করা হয়েছে। সরসীকুমার সরস্বতী *পালযুগের চিত্রকলা* গ্রন্থে এইসব মিনিয়েচারের পরিচয় তুলে ধরেছেন।

দক্ষিণের ইলোরা মন্দিরের ছাদগুলিতে চিত্রাবলী স্থান পেয়েছে। উত্তরপ্রদেশের দশাবতার মন্দিরের ছাদেও চিত্রকলার নিদর্শন আছে। ইলোরার চিত্ররীতিতে শুধু

দেবদেবীর নয়, নর ও নারী, মেঘ ও অদ্ভুত সব প্রাণীর চিত্র পাওয়া যায়। মামল্লপুরমের মন্দিরগুলিতে বা পত্তদকলের মন্দিরে অসংখ্য চিত্র আছে। দেহের নির্মাণে অবাস্তবতা নেই, সৌষ্ঠব আছে। তবে স্বীকার করতে হবে আদি মধ্যযুগের চিত্রশিল্পে বাগ, অজন্তা ও বাদামীর মতো শিল্পসুষমা নেই, বুদ্ধির দীপ্তি নেই। নান্দনিক সুষমা ও রস সৃষ্টিতে এগুলি অনেক পিছিয়ে ছিল তাতে সন্দেহ নেই। তাঞ্জোর, তিরুমালাই ও কাঞ্চীর মন্দিরের চিত্র সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। চালুক্য আমলে সমৃদ্ধ গুজরাট অঞ্চলে চিত্রকলার উন্নতি ঘটেছিল। এই অঞ্চলের পরমার ও চহমান শাসকেরা এধরনের উন্নত মান বজায় রাখতে পারেননি। গুজরাটের চিত্রশিল্প অবশ্যই পাণ্ডুলিপিতে বিধৃত মিনিয়েচার। তবে অস্বীকার করা যাবে না যে এইসব চিত্রে বৈচিত্র্য ছিল। বাংলার মিনিয়েচারগুলিও এর সমগোত্রীয়। পূর্ব ভারতের স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার প্রভাব পড়েছিল তিব্বত ও নেপালের ওপর। ধর্ম, প্রাকৃতিক পরিবেশ, জীবনচর্যার বিচিত্র রূপ অবশ্যই স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ ঘটিয়েছিল। স্থানীয় স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও ভারতের শিল্পে সবসময় একটি মূল সূত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সুরটিকে খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না। ধ্রুপদী ধ্যানধারণার সঙ্গে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য মিলে আদি মধ্যযুগে শক্তিশালী জীবনকেন্দ্রিক শিল্পধারার সৃষ্টি করেছিল। রাজস্থান রীতি, দ্রাবিড় রীতি, পূর্ব ভারতের রীতি সব এই মূলসূত্রটিকে কখনো বিসর্জন দেয়নি। অস্বীকার করা যায় না সীমান্তবর্তী অঞ্চলের ওপর বিদেশী প্রভাব ছিল, কাশ্মীরের শিল্পরীতি সম্ভবত বিদেশী শৈলী দ্বারা প্রভাবিত ছিল।

দর্শন ও ধর্ম সম্প্রদায়

সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ ও জৈন হলো ভারতের প্রধান ধর্মমত ও ধর্ম সম্প্রদায়। ইসলাম সিন্ধু ও মুলতান অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। দাক্ষিণাত্য ও পশ্চিম ভারতে জৈনদের প্রভাব ছিল, বিহার ও বাংলাদেশে ছিল বৌদ্ধরা। হিন্দুধর্মের নতুন বৈশিষ্ট্য হলো মূর্তিপূজা, মন্দির স্থাপন ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতা। এই পর্বের ভারতীয় রাজারা ধর্মসহিষ্ণুতার পরিচয় দেন। প্রতিহার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিষ্ণুর উপাসক, তাঁর উত্তরাধিকারীরা শিব, ভগবতী ও সূর্যের উপাসক ছিলেন। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পাল রাজারা ব্রাহ্মণদের পৃষ্ঠপোষণ করেন। ভারতের ধর্মগুলি পরস্পরের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল, বুদ্ধ ও জিন হলেন হিন্দুদের দেবতা। ব্রাহ্মণ্যধর্মের ওপর বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের অহিংসা নীতির প্রভাব পড়েছিল। এই পর্বে বৌদ্ধধর্মের মৌল পরিবর্তন ঘটেছিল, পূর্ব ভারতে তন্ত্রের প্রভাবে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে বজ্রযান শাখার উদ্ভব হয়। বৌদ্ধধর্ম তার মূলনীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে স্তোত্র, স্তব, মুদ্রা, মণ্ডল, ক্রিয়া ও চর্যাকে আশ্রয় করেছিল। শংকরাচার্যের মতো দার্শনিক ও

পণ্ডিত শৈবধর্মের মৌল পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। শুধু শৈব ধর্মমত নয়, তিনি সমগ্র ব্রাহ্মণ্যধর্মকে প্রভাবিত করেন। দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণবধর্ম নতুনভাবে উজ্জীবিত হয়ে নতুন দর্শনের প্রতিষ্ঠা করেছিল। ভক্তি, জ্ঞান ও কর্মকে জীবের মুক্তির পথ বলে গণ্য করা হয়। বৈষ্ণব আচার্যরা এবং মীমাংসা দর্শনের প্রবক্তা শঙ্কর ও কুমারিল নতুন দর্শন প্রতিষ্ঠা করেন।

এই পর্বে বৌদ্ধধর্মের দুই শাখা হীনযান ও মহাযান মতবাদের অবনতি ঘটে, তন্ত্রাশ্রয়ী বজ্রযান মতবাদের প্রতিষ্ঠা হয়। যাগযজ্ঞহীন, পূজার্চনাহীন যে উচ্চস্তরের ধর্মদর্শনের প্রতিষ্ঠা গৌতম বুদ্ধ করেছিলেন তা থেকে বৌদ্ধধর্ম সরে গিয়ে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি রূপ ধারণ করেছিল। নতুন বজ্রযান মতের প্রতিষ্ঠাতারা বুদ্ধ, অসঙ্গ ও নাগার্জুনের উন্নত দর্শনের কথা বললেও তাঁরা যোগ, দেবদেবী, মুদ্রা, ক্রিয়া ইত্যাদির ওপর জোর দেন। এসবের মাধ্যমে মানুষ শক্তি লাভ করতে পারে, উচ্চতম আদর্শ লাভ করা অসম্ভব হয় না। মহাযান মতবাদের সূত্র হলো ধ্বনি, এই ধ্বনি থেকে উদ্ভব হয় তন্ত্রের। ধ্বনি হলো মন্ত্র, বিদ্যাধররা (পুরোহিত) এই মন্ত্রগুলি পাঠ করে শিষ্যের উন্নতি ঘটাতেন। বুদ্ধের অংশ হলো বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর, তাঁর উদ্দেশে ধ্বনি বা মন্ত্রগুলি নিবেদিত হয়। এই মন্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাতটি হলো 'ওঁ মণিপদ্মমে হুম' (Om Manipadme Hum), এই মন্ত্রটি সব জ্ঞানের উৎস। *মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে* দুর্দশা থেকে রক্ষা পাবার জন্য তারার উপাসনার কথা বলা হয়েছে। সপ্তম শতক থেকে তারা স্তোত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তারা অবলোকিতেশ্বরের সঙ্গিনী, সব বুদ্ধের মাতা, মৈত্রী ও করুণার আধার। ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুরুষ ও শক্তির সঙ্গে তুলনীয় হলো এই ধারণা। পরবর্তীকালে তারা হলেন বুদ্ধের সঙ্গিনী, শিব ও পার্বতীর মতো। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের অপর আকরগ্রন্থ হলো *গুহ্যসমাজ*। *গুহ্যসমাজের* প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো যোগ। সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য প্রয়োজন শীল, ব্রত, শৌচাচার, নিয়ম, হোম, জপ ও ধ্যান। এইভাবে শিষ্য তৈরি হলে তন্ত্রগুরু তাকে গোপন তন্ত্রমুদ্রা শিক্ষা দেন। এইসব তন্ত্রমন্ত্রের আসল উদ্দেশ্য হলো চরম সত্যকে জানা (unknowable reality)। নাগার্জুন, বসুবন্ধুরা যে চরমসত্যের কথা বলেছেন বজ্রযানীরা সেই সত্যের অন্বেষণ করেন। এই দর্শন অনুযায়ী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক ও অখণ্ড, এখানে কোনো ধরনের ভেদাভেদ বাঞ্ছনীয় নয়। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ ও শব্দময় জগৎ হলো সত্যের এক রূপ। দ্বেষ, মোহ, রাগকে জয় করে মানুষ বোধিচিত্ত লাভ করে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ঐক্যের ধারণায় পৌঁছায়। বজ্রযানীরা পঞ্চ মকারকে (মদ্য, মাংস, মৈথুন, মৎস্য ও মুদ্রা) সাধনার উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করেন। মহাযান মতবাদ থেকে বজ্রযান মতবাদের উদ্ভব হয়, মহাযানী মতবাদ সর্বপ্রাণীর মোক্ষের কথা বলেছিল। তান্ত্রিক মতের সঙ্গে এই দার্শনিক তত্ত্বের অবশ্যই অমিল ছিল।

মালব ছাড়া আর কোথাও জৈনধর্মের প্রভাব ছিল না। সপ্তম শতকে বাংলায় যে নির্গ্রন্থ সম্প্রদায় ছিল তারা অবশ্যই প্রভাব-প্রতিপত্তি হারিয়েছিল। মালব ও গুজরাট অঞ্চলে জৈনধর্মের প্রভাব ছিল। চাপ রাজা, প্রতিহার ও পরমার রাজারা এদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দক্ষিণে গঙ্গা, রাষ্ট্রকূট, চালুক্য ও কদম্বরা এদের নানাধরনের সহায়তা দেন। রাষ্ট্রকূট রাজা প্রথম অমোঘবর্ষ নৃপতুঙ্গ সম্ভবত জৈনধর্মাবলম্বী ছিলেন। পূর্বের চালুক্যগণ জৈনগুরুদের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তামিল অঞ্চলে শৈব নয়নার এবং বৈষ্ণব আলবার সাধুরা জৈনধর্মের বিরোধী ছিলেন। এঁদের প্রচারের ফলে জৈনধর্ম ক্ষতিগ্রস্ত হয়, নবম ও দশম শতকে দক্ষিণ ভারতে তাদের প্রভাব হ্রাস পায়। আলবার ও নয়নার সাধুরা জৈনদের মতো দান, জাতিভেদহীন সমাজ ও ত্যাগের আদর্শ প্রচার করেন, রাজারা এঁদের প্রতি সদয় হন। জৈনধর্ম হিন্দুধর্মের অনেক আচার-আচরণ, দেবদেবীকে গ্রহণ করেছিল। হরিভদ্র হলেন এযুগের শ্রেষ্ঠ জৈনলেখক। *সৎদর্শন সমুচ্চয়* গ্রন্থে তিনি ভারতীয় দর্শন ব্যাখ্যা করেন। অন্যান্য জৈন লেখকরা হলেন বপ্পভট্টি, শীলঙ্ক, শোভন ও ধনপাল। এযুগে জৈনধর্মের সবচেয়ে বড় অবদান হলো অহিংসা নীতি। জৈনধর্মের প্রভাবে যাগযজ্ঞ থেকে হিন্দুরা সরে এসেছিল, অধিকাংশ ভারতীয় নিরামিষ আহার গ্রহণ করতে থাকে।

জৈনধর্মের দার্শনিক ভিত্তি হলো জিনের প্রতি অবিচল আনুগত্য, সর্বপ্রাণীর প্রতি করুণা, সকলের প্রতি সদয় আচরণ এবং সর্বপ্রাণীর মঙ্গল করার আকাঙ্ক্ষা। সোমদেব বলেছেন যে জৈনধর্মের চারটি দান হলো আশ্রয়, খাদ্য, ঔষধ ও ধর্মীয় উপদেশ। সোমদেবের *যশোস্তিলক*-এ এই দর্শনের পরিচয় আছে। এই পর্বে শৈবধর্ম সারা ভারতে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে শৈবধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল। বেদান্তের দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত মতবাদের মতো শৈবধর্মের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় তৈরি হয়েছিল। কাশ্মীরের শৈবধর্ম ছিল একেশ্বরবাদী, এর পদ্ধতির নাম হলো ত্রিক, স্পন্দ ও প্রত্যভিজ্ঞ। এই দর্শন অনুযায়ী শিব হলেন একমাত্র ঈশ্বর (supreme God), তিনি আত্মা, অপরিবর্তনীয় এবং চৈতন্য, পরাসম্বিত ও পরমেশ্বর। তিনি বিশ্বময়, আবার বিশ্বোত্তীর্ণ। তাঁকে বলা হয়েছে 'অনুত্তর', তাঁর বাইরে কোনো অস্তিত্ব নেই। উপনিষদের ঈশ্বর ব্যাখ্যার মতো শৈব মতবাদে বলা হয়েছে যে ভাষা ও চিন্তায় তাঁকে ধরা যায় না। অদ্বৈত বেদান্তের সগুণ ব্রহ্মের মতো তিনি সব সৃষ্টির উৎস। শক্তি হলো শিবের সৃষ্টিশীলতার উৎস। শক্তির পাঁচটি রূপ হলো চিৎশক্তি, আনন্দশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি। তিনি স্বেচ্ছায় নিজেকে প্রকাশ করেন, সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হলো তাঁর ইচ্ছাধীন। মানুষ নিজের চেষ্টায় মোক্ষ লাভের অধিকারী হয় না, শিবের করুণায় মানুষ মোক্ষ লাভ করে (Divine Grace)।

দক্ষিণের শৈবধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হলেন শংকরাচার্য (৭৮৮-৮২০)। অদ্বৈত দর্শনের ভাষ্যকার ছিলেন শৈব। উপনিষদ, ভগবদ্গীতা ও ব্রহ্মসূত্রের তিনি ভাষ্য রচনা করেন, দেবতাদের উদ্দেশে স্তোত্র রচনা করেন। তাঁর মতে, পরমেশ্বর হলেন শিব (God of Gods)। সমকালীন অনেকে মনে করত তিনি হলেন শিবের অবতার। তিনি শৈবধর্মকে বহু অনাচার থেকে মুক্ত করেন, উজ্জয়িনী ও কাশ্মীরে গিয়ে শৈব আচার্যদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হন, তার শাণিত যুক্তির কাছে অন্যরা পরাস্ত হন। শংকরাচার্যের দর্শন অদ্বৈতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত, ব্রহ্ম হলো একমাত্র বাস্তব ও সত্য, বাকি সব মায়া। ব্রহ্ম এমন একটি অস্তিত্ব যাকে বর্ণনা করা যায় না। ব্রহ্ম হলো চৈতন্য—চৈতন্য ও বাস্তব পৃথক নয়। বহু স্থান পরিভ্রমণ করে তিনি তাঁর অদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। বিভিন্ন স্থানে মঠ স্থাপন করে তিনি তাঁর শিষ্যদের অধ্যক্ষ হিসেবে বসিয়েছিলেন। মিশনারি আন্দোলনের তিনি হলেন স্রষ্টা। তিনি বেদান্তকে মর্যাদার আসনে বসিয়েছিলেন। শৈব ও বৈষ্ণবরা বেদান্তকে তাঁদের ধর্মমতের কেন্দ্রস্থলে বসান। রামানুজ বলছেন যে বিষ্ণু হলেন ব্রহ্ম। শৈব শ্রীকণ্ঠ জানালেন যে শিব হলেন একমাত্র ব্রহ্ম, বল্লভ বলেন যে ব্রহ্ম হলেন বৃন্দাবনের কৃষ্ণ। ভাস্কর তাঁর ভেদাভেদ তত্ত্বে অদ্বৈতের মায়াবাদকে আক্রমণ করেন।

গুপ্তোত্তর যুগে সমগ্র উত্তর ভারত জুড়ে বৈষ্ণবধর্মের প্রাধান্য দেখা যায়। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের রাজারা বৈষ্ণবধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তামিল দেশে বৈষ্ণবধর্ম সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছিল, বৈষ্ণব আচার্যরা এই ধর্মের দর্শনকে ব্যাখ্যা করেন। বৈষ্ণব আচার্য নাথমুনী (রঙ্গনাথাচার্য) *ন্যায়তত্ত্ব*-এ বিশিষ্টাদ্বৈত মতবাদ ব্যাখ্যা করেন। এই দর্শনের মৌল বৈশিষ্ট্য হলো বিশ্বাস ও ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ (absolute surrender to God)। নাথমুনী যে সম্প্রদায় স্থাপন করেন তা শ্রীবৈষ্ণব নামে পরিচিত হয়। আলবার সাধুদের সঙ্গীত তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি কর্মের যৌক্তিকতা স্বীকার করেননি, শংকরের মতো তিনি জ্ঞানমার্গের কথা বলেননি, বলেছেন শুধু ভক্তির কথা। রামানুজ হলেন এই সম্প্রদায়ের একজন শ্রেষ্ঠ প্রচারক। এই পর্বে তন্ত্রসাধনা প্রসারলাভ করেছিল কারণ সাধারণ মানুষ এই মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। *মহানির্বাণতন্ত্র*-এ শক্তিকে সৃষ্টির উৎস বলে বর্ণনা করা হয়েছে, এমনকি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর শক্তি থেকে উৎপন্ন হয়েছেন। তান্ত্রিক মতবাদে মন্ত্র, যন্ত্র, মুদ্রা, ন্যাস ও ইষ্ট দেবতার কথা বলা হয়েছে। সাধনার মাধ্যমে সাধক দিব্যভাব লাভ করে, তার মুক্তি হয়। হিন্দু দেবদেবীদের ঘিরে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল, দেবদেবীরা হলেন বিষ্ণু, শিব, শক্তি, সূর্য ও গণেশ।

একাদশ ও দ্বাদশ শতকে বৌদ্ধধর্ম ভারতে প্রায় বিলুপ্ত হয়েছিল। কোথাও কোথাও প্রচ্ছন্নভাবে টিকে ছিল (ধর্মঠাকুর সম্প্রদায়)। জৈনধর্ম শুধু গুজরাট অঞ্চলে

টিকে ছিল। উত্তর ভারতে মুসলমানদের উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের ওপর তন্ত্রের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে তন্ত্রের প্রভাবে অনৈতিকতা ও অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল, ভারতের সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক জীবনে অবশ্যই অবনতি ঘটেছিল। ভারতের মন্দিরগুলিতে দেবদাসী প্রথা গড়ে উঠেছিল। দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারতে শৈব ও বৈষ্ণবধর্মের প্রসার ঘটলে জৈনধর্ম আধিপত্য হারিয়েছিল। তবে জৈনধর্মের মধ্যে তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানের অনুপ্রবেশ ঘটেনি। রামানুজ ও মাধবের মতো আচার্যের প্রভাবে বৈষ্ণবধর্ম তান্ত্রিক প্রভাব থেকে অনেকখানি মুক্ত ছিল। শংকর বৈষ্ণব দর্শনকে আক্রমণ করেছিলেন কারণ ভক্ত ও ভগবানের ধারণা অদ্বৈতবাদ বিরোধী। শংকরাচার্যের প্রচার সত্ত্বেও বৈষ্ণব আচার্যরা কৃষ্ণ-গোপী তত্ত্ব থেকে বিচ্যুত হননি। শৈবদের মধ্যে তন্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, কাপালিক ও কালামুখ সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল।

হীনযান ও মহাযান মতবাদকে সরিয়ে দিয়ে তান্ত্রিক বৌদ্ধ মতবাদ বজ্রযান প্রাধান্য পেয়েছিল। মহাযান মতবাদ থেকে বজ্রযানের উদ্ভব হয়েছিল। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম যোগ, উপবাস, তীর্থযাত্রা ইত্যাদি থেকে সরে এসে জীবনভোগের সহজ পদ্ধতি অনুসরণ করেছিল। বজ্রধর হলেন একমাত্র সত্য, তিনি অদ্বৈত, তিনি করুণা। বজ্রযানের মধ্যে গড়ে ওঠে কালচক্রযান। দেবদেবীদের নিয়ে বজ্রযান ও কালচক্রযান সহজিয়া মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছিল। চর্যাপদ ও দোহাতে এই দুই মতবাদের কথা আছে। বাংলা, বিহার ও উত্তরপ্রদেশে এই মতবাদ প্রচলিত ছিল। হীনযান ও মহাযান ভারত থেকে বিদায় নিয়েছিল। গুজরাট ও মালব অঞ্চলে জৈনধর্ম টিকে ছিল। চালুক্য, কলচুরি ও পরমার রাজারা এদের নানাভাবে সাহায্য দেন। দক্ষিণে পশ্চিমী চালুক্য ও হৈসল রাজারা জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষণ করেন। জৈন লেখকরা সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশে তাঁদের ধর্মশাস্ত্র রচনা করেন। দেবসুরি, মাণিক্যচন্দ্র ও সুরাচার্য হলেন এপর্বের জৈন লেখক। রামচন্দ্র এগারোখানি নাটক লেখেন, হস্তিমল্ল চারখানি নাটক লিখেছিলেন।

বৈষ্ণব ধর্মমতে রাধাকৃষ্ণের লীলা প্রাধান্য পেয়েছে। *ভগবতপুরাণ*, *ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ* ও লক্ষ্মণসেনের সভাকবি জয়দেবের *গীতগোবিন্দ*-এ কৃষ্ণলীলা প্রাধান্য পেয়েছে। দক্ষিণ ভারতে নাথমুনী প্রতিষ্ঠিত শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায় উচ্চস্তরের বৈষ্ণব দর্শন অনুসরণ করেছে। দক্ষিণে বৈষ্ণবধর্ম অনেক উন্নত স্তরে পৌঁছেছিল। যমুনাচার্য ও রামানুজ হলেন এই সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ আচার্য। রামানুজ অনেকগুলি বৈষ্ণব দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো *বেদান্তসার*, *ব্রহ্মসূত্র* ও *ভগবদগীতা*। রামানুজের দর্শন হলো বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। তিনি তিনটি চিরকালীন নীতির কথা বলেছেন—চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর। চিৎ (আত্মা) ও অচিৎ (সৃষ্টি) নিয়ে ঈশ্বর তৈরি

হয়েছেন। ঈশ্বর সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা (God is the creator, preserver and destroyer of the world.)। বৈষ্ণবদের ভক্তি হলো উপনিষদের ঈশ্বর উপাসনার সমান। দক্ষিণের শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায় দুইগোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যায়—বড়কালাই ও তেনকালাই। বড়কালাই ছিল উত্তর প্রভাবিত, তেনকালাই ছিল দক্ষিণ প্রভাবিত। বড়কালাই কর্মের ওপর জোর দিয়েছিল, তেনকালাই ভক্তির ওপর। 'ওঁ নমঃ নারায়ণায়' বললেই মুক্তিলাভ সম্ভব। বৈষ্ণবদের অন্য সম্প্রদায় হলো নিম্বার্ক প্রতিষ্ঠিত। তিনি উত্তর ভারতে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করেন, তিনি রচনা করেন *বেদান্ত পারিজাতসৌরভ* ও *সিদ্ধান্তরত্ন*। মাধব হলেন বৈষ্ণব ধর্মমতের আর একজন বড় প্রচারক।

ভারতের রাজন্যবর্গের অনেকে শৈব ধর্মমতে বিশ্বাসী ছিলেন। বাংলার সেনবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয়সেন, গহড়বল রাজবংশের রাজা গোবিন্দচন্দ্র, চালুক্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম মূলরাজ এবং পরমার রাজা প্রথম ভোজ সকলে শৈব ছিলেন। শৈবধর্মের নতুন সম্প্রদায় হলো বীরশৈব বা লিঙ্গায়েত। এই ধর্মের প্রচারক ছিলেন রেণুক, দারুক, ঘণ্টাকর্ণ, ধেণুকর্ণ ও বিশ্বকর্ণ। ভারতের চতুর্দিকে এঁরা পাঁচটি মঠ (কেদার, উজ্জয়িনী, শ্রীশৈল, রম্ভাপুরী ও কাশী) স্থাপন করে বীরশৈব মতবাদ প্রচার করেন। এদের শ্রেষ্ঠ আচার্য হলেন বাসব, দক্ষিণের কানাড়াভাষী অঞ্চলে তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন। শৈবদের অন্য সম্প্রদায় হলো সামান্য, মিশ্র ও শুদ্ধ শৈব। আগম অনুসরণ করে বীরশৈব আচার্যরা উপদেশ দিতেন, এদের দর্শনের নাম হলো 'শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈত', ঈশ্বর এক ও অবিভাজ্য। পরাশিব হলেন পরমেশ্বর (supreme reality), তিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দ। তিনি বিশ্বময় ও বিশ্বোত্তীর্ণ (He is immanent as well as transcendent.) আত্মা হলো শিবের অংশ, অবিদ্যার জন্য মানুষ নিজেকে স্বতন্ত্র বলে গণ্য করে। সাধকের লক্ষ্য হলো শিবের সঙ্গে মিশে যাওয়া (unity with Parasiva)। শৈবদের অন্য গোষ্ঠীর নাম শৈবসিদ্ধান্ত। মেকণ্ড শৈবসিদ্ধান্ত দর্শনের ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর গ্রন্থ *শিবজ্ঞানবোধম*-এ। এই দর্শন ঈশ্বরের দ্বৈত সত্তায় বিশ্বাস করত, তবে মেকণ্ড নিজের দর্শনকে 'খাঁটি অদ্বৈত' বলে (true Advaita) উল্লেখ করেছেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর চেয়ে শিব শ্রেষ্ঠ। এই দর্শন অবতারতত্ত্বে বিশ্বাস করত না। জীব ও মায়া তত্ত্ব দিয়ে তিনি তাঁর দর্শনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। শ্রীকণ্ঠ শিবাদ্বৈতবাদ ব্যাখ্যা করেছেন, ব্রহ্ম হলেন পরাশিব, দুইয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। জন্মচক্রের মধ্যে দিয়ে জীব ঈশ্বর লাভ করে। শ্রীকণ্ঠ দুইয়ের মধ্যে একককে প্রত্যক্ষ করেছেন (unity in duality)। তাঁর দর্শনের অঙ্গ হলো সৎকার্যবাদ, সাধনার মাধ্যমে ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার ঘটে। শংকরাচার্যের অদ্বৈতদর্শন বেদের প্রতি ভারতীয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ধর্মপ্রচারকরা বেদান্তের মধ্যে তাঁদের দর্শনের উৎস খুঁজেছিলেন। শংকরের উচ্চস্তরের দর্শনচিন্তা সাধারণ মানুষের বোধগম্য ছিল না। রামানুজ সাধারণ মানুষের

কাছে গ্রহণযোগ্য বৈষ্ণব দর্শনের কথা বলেন। শুধু জ্ঞান নয়, ভক্তি ও কর্মের মাধ্যমে সাধক ঈশ্বরলাভ করতে পারে। সব ভারতীয় ধর্ম মোক্ষের সন্ধান করেছিল। পথ ছিল ভিন্ন, কিন্তু লক্ষ্য ছিল এক—ঈশ্বরলাভ। ধর্মের মাধ্যমে মানুষ উন্নততর জীবনের সন্ধান করেছিল। ইসলাম ধর্মের মধ্যে সুফিরা উদার, মুক্ত মন নিয়ে ঈশ্বরের অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিল।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

নবম শতকে চিকিৎসা শাস্ত্রের ওপর গ্রন্থ রচনা করেন মাধবকর, তাঁর গ্রন্থের নাম হলো *মাধবনিদান*। এই গ্রন্থে সবরোগের বিবরণ আছে এবং সবরোগ একসঙ্গে চিকিৎসার বিধান দেওয়া হয়েছে। এই গ্রন্থখানি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল, পরবর্তীকালে চক্রপাণি দত্ত ও বঙ্গসেন এই গ্রন্থের কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন। মাধবকরের সমকালীন লেখক হলেন দুধবল, তিনি অগ্নিবেশের *চরকসংহিতা* সম্পাদনা করেন। মাধবনিদানকে অনুসরণ করে লেখা হয় *সিদ্ধিযোগ* নামক একখানি চিকিৎসাশাস্ত্র সংক্রান্ত গ্রন্থ। এই গ্রন্থের লেখকবৃন্দ মাধবকরের কাছে তাদের ঋণ স্বীকার করেছেন। সম্ভবত ১০০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তিনি আবির্ভূত হন। ধন্বন্তরির লেখা *নিঘন্টু* হলো একখানি ভেষজ উদ্ভিদ সংক্রান্ত শব্দকোষ। অমর তাঁর 'কোষে' এই গ্রন্থখানির পুরনো সংস্করণ ব্যবহার করেছেন। এই গ্রন্থের রচনাকাল হলো অষ্টম শতক। এর আগে পারদের ব্যবহার জানা ছিল না, এই গ্রন্থে পারদের উল্লেখ আছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের নতুন শাখার সূচনা হয়েছিল এই যুগে। পারদ ও অন্যান্য ধাতব ঔষধের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। পারদ থেকে ঔষধ বানিয়ে মানুষকে আরও শক্তিশালী করা যায় বলে দাবি করা হয়েছিল। নাগার্জুন *রসরত্নাকর*-এ পারদের ব্যবহারের কথা বলেছেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় *হিস্ট্রি অব হিন্দু কেমিস্ট্রি*-তে জানিয়েছেন যে এই গ্রন্থখানি সপ্তম অথবা অষ্টম শতকে রচিত হয়। জার্মান পণ্ডিত উইন্টারনিৎস মনে করেন যে দশম শতকে এই গ্রন্থখানি রচিত হয়েছিল।

অঙ্কশাস্ত্রে শ্রীধর এই যুগের ওপর তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন, তিনি হলেন *গণিতসার* গ্রন্থের লেখক। ভাস্করাচার্যের *লীলাবতী*-র সমগোত্রীয় হলো এই গ্রন্থ। শ্রীধর রাষ্ট্রকূট রাজা প্রথম অমোঘবর্ষের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন, ৮৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তিনি রাষ্ট্রকূট রাজসভায় ছিলেন। নবম শতকে মনু লেখেন *বৃহস্মানস*। আলবেরুনি জানাচ্ছেন যে এই গ্রন্থের ওপর ভিত্তি করে মুঞ্জালা *লঘুমানস* রচনা করেন। আলবেরুনির লেখা থেকে জানা যায় যে এযুগে কনৌজের বলভদ্র ছিলেন অনেকগুলি জ্যোতিষগ্রন্থের লেখক, জ্যোতিষের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অবাধ বিচরণ ছিল। পতঞ্জলির *যোগসূত্র*-এর ওপর তিনি টীকা রচনা করেন। এই যুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হলেন দ্বিতীয় আর্যভট্ট, তাঁর

রচিত বিজ্ঞান গ্রন্থের নাম হলো *আর্যসিদ্ধান্ত*। তিনি ছিলেন ভাস্করাচার্যের পূর্ববর্তী লেখক, ভাস্করাচার্য তাঁর গ্রন্থে আর্যভট্টের নাম উল্লেখ করেছেন। দশম শতকের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানীরা হলেন পৃথুস্বামী, ভট্টপাল ও বিজয়নন্দী। বিজয়নন্দী লেখেন *করনাতিলক* নামক গ্রন্থ। আলবেরুনি এঁদের নাম উল্লেখ করেছেন। এঁদের মধ্যে ভট্টপাল ছিলেন বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত পণ্ডিত ব্যক্তি। বিভিন্ন বিজ্ঞান গ্রন্থের ওপর তিনি টীকা রচনা করেন এবং সম্ভবত *গণিতস্কন্ধ* গ্রন্থখানি রচনা করেন। তিনি বরাহমিহিরের সুবিখ্যাত *বৃহৎসংহিতার* ওপর বিস্তৃত ভাষ্য ও টীকা রচনা করে যশস্বী হন। দশম শতকে এই ভাষ্য রচিত হয় এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের ইতিহাস এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। কল্যাণবর্মা রচনা করেন *সারাবলী,* ভট্টপাল এই গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। দশম শতকের আগেই *সারাবলী* রচিত হয়েছিল।

একাদশ শতকে বাংলার চক্রপাণি দত্ত *আয়ুর্বেদ দীপিকা* ও *ভানুমতী* নামে দুখানি চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। প্রথমখানি ছিল চরক সংহিতার ওপর, দ্বিতীয়খানি ছিল সুশ্রুত সংহিতার ওপর লেখা। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা হলো *চিকিৎসা-সারসংগ্রহ,* এই গ্রন্থে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস পাওয়া যায়। ভগভট্ট ও বৃন্দের সময় থেকে ভেষজ বিজ্ঞানে ধাতব পদার্থের প্রয়োগ শুরু হয়েছিল। চক্রপাণি দত্ত এই শাখার বিস্তৃত বিবরণ তাঁর গ্রন্থে রেখে গেছেন। চক্রপাণি দত্ত অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর একখানি গ্রন্থ হলো *শব্দচন্দ্রিকা,* এই গ্রন্থে পাওয়া যায় নানাধরনের সবজির গুণাগুণ এবং খনিজ পদার্থের নানাদিক। *দ্রব্যগুণ সংগ্রহ* হলো খাদ্য বিজ্ঞানের ওপর রচিত গ্রন্থ (dietetics)।

পাল রাজা ভীমপালের চিকিৎসক সুরপাল চিকিৎসা বিজ্ঞানে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ লেখেন। তাঁর পিতা ও পিতামহ রাজা রামপাল ও গোবিন্দচন্দ্রের চিকিৎসক ছিলেন। সুরপাল (সুরেশ্বর) রচনা করেন *শব্দপ্রদীপ, বৃক্ষায়ুর্বেদ* নামক দুখানি গ্রন্থ। যেসব উদ্ভিদের চিকিৎসা সংক্রান্ত গুণাগুণ আছে তাদের পরিচয় আছে এই গ্রন্থে। *লোহাপদ্ধতি* গ্রন্থে তিনি লোহার চিকিৎসা বিষয়ক ব্যবহারের উল্লেখ করেছেন। একাদশ শতকের মধ্যভাগের আর একজন চিকিৎসা বিজ্ঞানী হলেন বঙ্গসেন। তিনি সম্ভবত বাঙালি ছিলেন। বঙ্গসেন লেখেন *চিকিৎসাসার সংগ্রহ* নামে গ্রন্থ, সুশ্রুত ও মাধবের লেখাকে অনুসরণ করে তিনি তাঁর গ্রন্থ রচনা করেন। শালিহোত্র হলো অশ্ব, অশ্বের রোগ এবং নিরাময় সংক্রান্ত একখানি গ্রন্থ। সেই সময় যুদ্ধ ও পরিবহনের কাজে ঘোড়ার খুব কদর ছিল, এইজন্য অশ্বরোগ সংক্রান্ত গ্রন্থ রচিত হয়। মিলহন লেখেন *চিকিৎসামৃত* (১২২৪)। শার্ঙ্গধরের *সংহিতা*-য় পাওয়া যায় অহিফেন, পারদ ইত্যাদির ব্যবহার। এই গ্রন্থে চিকিৎসা শাস্ত্রে নাড়ীবিদ্যার

গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে, নাড়ীর গতি বিচার করে রোগ নির্ণয় করা হতো। ধাতবগুণের ওপর লেখা দুখানি গ্রন্থ হলো *রসার্ণব* (১২০০) ও *রসরত্নসমুচ্চয়*। এদের লেখক হিসেবে পাওয়া যায় ভগভট্ট ও অশ্বিনীকুমারের (নিত্যনাথ) নাম।

অঙ্কশাস্ত্রের ওপর শ্রীধর *ত্রিশতি* নামক গ্রন্থ লেখেন, গ্রন্থখানির রচনাকাল হলো একাদশ শতক। দ্বাদশ শতকে ভাস্করাচার্য *সিদ্ধান্ত শিরোমণি* রচনা করেন। এই গ্রন্থের দুখানি অধ্যায় লীলাবতী ও বীজগণিত এযুগের গণিত শাস্ত্রের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদান। ব্রহ্মগুপ্ত ও শ্রীধরের রচনার ওপর নির্ভর করে ভাস্করাচার্য তাঁর অঙ্কশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি বিভিন্ন রাশির মিল (combination) দেখিয়েছেন। বীজগণিত হলো এই শাখার ওপর একখানি পূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ রচনা। ভোজ নক্ষত্র বিজ্ঞানের ওপর লেখেন *রাজমৃগাঙ্ক*, শতানন্দ লেখেন *ভাস্বতী* নামক গ্রন্থ, এঁরা দুজনে ছিলেন একাদশ শতকের লোক। ভাস্করাচার্যের *সিদ্ধান্ত শিরোমণি*-তে 'গ্রহগণিত' ও 'গোল' নামে দুখানি অধ্যায় আছে, এই দুখানি অধ্যায়ে নক্ষত্র বিজ্ঞান সংক্রান্ত অনেক তথ্য আছে। ভাস্করাচার্য *করণাকুতুহল* নামে আরও একখানি গ্রন্থ লেখেন। ভাস্করাচার্যের পর অঙ্কশাস্ত্র ও নক্ষত্র বিজ্ঞানে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের অভাব ঘটেছিল।

স্থাপত্য বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদি ক্ষেত্রে আরও কিছু গ্রন্থ লেখা হয়েছিল। পরবর্তীকালে লেখা *হস্ত্যায়ুর্বেদ* হলো হস্তীবিজ্ঞান সম্পর্কিত একখানি গ্রন্থ। *বাস্তুকার* ও *শিল্পরত্ন*-এ স্থাপত্য বিদ্যার কথা আছে, বুদ্ধভট্টের *রত্নপরীক্ষা*-য় রত্ন বিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। মনোবিজ্ঞানের ওপর জগৎদেব লেখেন *স্বপ্নচিন্তামণি*। সেনবংশীয় রাজা বল্লালসেন লেখেন *অদ্ভুতসাগর*। প্রযুক্তি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই যুগে বড় রকমের পরিবর্তনের কথা জানা যায় না। জলসেচের জন্য অরঘট্টের ব্যবহার জানা ছিল, চাকার সঙ্গে ঘট লাগিয়ে পুষ্করিণী ও কূপ থেকে জলসেচের ব্যবস্থা করা হতো। তাঁতে বস্ত্রবয়নের কাজ চলত, তবে চরকার সাহায্যে সুতো কাটার ব্যবস্থা সম্ভবত হয়নি, টাকুর সাহায্যে সুতো কাটা হতো হাতে। উৎপাদন অবশ্যই কম হতো। ভারতে কাগজের ব্যবহার ছিল না, গাছের ছাল, পাতা ও চামড়া কাগজের মতো ব্যবহার করা হতো। কম্পাসের ব্যবহার জানা ছিল না, সূর্যের গতি ও অবস্থান দেখে সময় নির্ণয় করা হতো। রেশমের উৎপাদন জানা ছিল, তবে উন্নত ধরনের সুতো কাটার পদ্ধতি সম্ভবত জানা ছিল না। কৃষিপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটেনি। লোহার ব্যবহার ছিল, খনি থেকে লোহা নিষ্কাশনের পদ্ধতি ভারতীয়দের আয়ত্ত হয়েছিল। সম্ভবত লোহা তৈরির জন্য জ্বালানির যে প্রয়োজন হয় তারও ব্যবহার জানা ছিল। কয়লা ও কাঠ কয়লার ব্যবহার শুরু হয়েছিল। শুধু লোহা ও কয়লা নয়, তামা, সোনা, রুপো ও মণিমুক্তোর ব্যবহার ভারতীয়রা ভালোভাবে আয়ত্ত করেছিল, এসব প্রযুক্তি ভারতীয়দের আয়ত্তাধীন ছিল।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় ভারতীয়দের অবদান

পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত ভারতে গণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসা ও রসায়ন শাস্ত্রের চর্চায় নবযুগের সূচনা হয়েছিল। এই আটশো বছরে ভারতের গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ, চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও রসায়ন শাস্ত্রবিদ্‌রা মৌলিকতা ও স্বকীয়তার পরিচয় রেখেছিলেন। এই পর্বের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করা হলেন আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, মহাবীর, শ্রীধর, ভাস্কর, মুঞ্জাল ও চক্রপাণি দত্ত। এই পর্বের বিজ্ঞানীরা দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতন (decimal place value notation) পদ্ধতি ও শূন্যের ব্যবহার আবিষ্কার করেছিলেন। এই দুই আবিষ্কার যে শুধু গণিত ও জ্যোতিষচর্চার উন্নতি ঘটিয়েছিল তা নয়, বিজ্ঞানের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিতে এই মৌলিক আবিষ্কারের বিশেষ অবদান ছিল। শূন্য সংবলিত নতুন অঙ্কপাতন পদ্ধতির আবিষ্কার করে বিজ্ঞানীরা প্রচলিত গ্রন্থাদির সংস্কার ও সংশোধন করেছিলেন। আদিমধ্য যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ হলেন আর্যভট্ট (৪৯৯), তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা হলো *আর্যভট্টীয়*। এই গ্রন্থখানি মোট চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত—দশ গীতিকা, গণিতপাদ, কালক্রিয়া ও গোলপাদ। গণিতপাদে তিনি নানা গাণিতিক বিষয় যেমন বর্গমূল, ঘনমূল, সমান্তর শ্রেণী, ত্রৈরাশিক, সমীকরণ সমাধান ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করেছেন। দশ গীতিকা, কালক্রিয়া ও গোলপাদে আর্যভট্ট জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে নিজের গবেষণা লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রাচীনকালের জ্যোতির্বিদগণের মধ্যে তিনি প্রথম পৃথিবীর আহ্নিক গতির কথা উল্লেখ করেন। জ্যোতিষে আর্যভট্টের আর একটি বিশিষ্ট অবদান হলো পরিবৃত্ত ও উৎকেন্দ্রীয় বৃত্তের সাহায্যে গ্রহ-গতির ব্যাখ্যা প্রদান। আর্যভট্ট সূত্রকার ছিলেন, সূত্রকারের রীতি অনুযায়ী তাঁর গবেষণার ফল তাঁর সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

আর্যভট্টের শিষ্যরা যথেষ্ট কৃতী ছিলেন, লাটদেব, প্রথম ভাস্কর ও লল্ল তার প্রধান শিষ্য ছিলেন। লাটদেব এতবড় বিজ্ঞানী ছিলেন যে তার গুণগ্রাহীরা তাঁর নাম দেন *সর্বসিদ্ধান্ত গুরু*। বরাহমিহির (৫০৫ খ্রিস্টাব্দ) হলেন সর্ববিদ্যা বিশারদ। গণিত, জ্যোতিষ, ফলিত জ্যোতিষ, ভূগোল, মণিকবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি জ্যোতিষের ওপর লেখেন *পঞ্চ সিদ্ধান্তিকা*। এই গ্রন্থে তিনি প্রাচীন কালের পাঁচটি প্রধান জ্যোতিষীয় গ্রন্থ পৌলিশ, রোমক, বাশিষ্ঠ, সূর্য ও পৈতামহ সিদ্ধান্তের আলোচনা করেছেন। সিংহাচার্য, প্রদ্যুম্ন, বিজয় নন্দী প্রভৃতি প্রাচীন জ্যোতির্বিদদের নাম তিনি উল্লেখ করেছেন। *বৃহৎ সংহিতায়* তিনি ফলিত জ্যোতিষ নিয়ে আলোচনা করেছেন। দুষ্প্রাপ্য পাথর, সুগন্ধি দ্রব্য, ধাতু নিষ্কাশন বিদ্যার আলোচনা আছে তাঁর গ্রন্থে। *বজ্রলেপ* নামে তিনি একধরনের গুঁড়োর (সিমেন্ট) কথা উল্লেখ করেছেন, এই গুঁড়োর বাঁধন শক্তি ছিল বজ্রের মতো কঠিন। গণিত ও জ্যোতিষে আর

একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হলেন ব্রহ্মগুপ্ত (৫৯৮ খ্রিস্টাব্দ)। অধ্যাপক সার্টন লিখেছেন ব্রহ্মগুপ্ত হলেন ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, তাঁর সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ (one of the greatest scientists of his race and the greatest of his time)। উজ্জয়িনী ছিল তাঁর বিজ্ঞান সাধনার কেন্দ্র। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হলো *ব্রহ্ম-স্ফুট-সিদ্ধান্ত*, পরে তিনি *খণ্ডখাদ্যক* ও *উত্তর খণ্ড-খাদ্যক* নামে আরো দুখানি জ্যোতিষ বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর গ্রন্থ আরবি ও ফারসি ভাষায় অনূদিত হয়। জ্যোতিষ ও গণিতশাস্ত্রে তিনি মৌলিক অবদান রেখেছিলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় মাত্রার নির্ণেয় ও অনির্ণেয় সমীকরণ সমাধান তিনি আবিষ্কার করেন। বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের নানা ধর্ম সম্পর্কে তার আবিষ্কৃত কয়েকটি প্রতিজ্ঞা গণিতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।

গণিত সার সংগ্রহের রচয়িতা হলেন মহাবীর (৮৩০ খ্রিস্টাব্দ)। এই গ্রন্থে গুণোত্তর প্রগতি, দ্বিঘাত সমীকরণের তিন প্রকার সমাধান, উপবৃত্ত, ভগ্নাংশ প্রভৃতির আলোচনা আছে। নবম শতকের আর একজন গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ হলেন মুঞ্জাল। ভারতীয় জ্যোতিষে অয়ন-চলন, অয়ন-চলনের বেগ ও এর তাৎপর্য আলোচনা করে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। ভাস্কর অয়নগতি আলোচনার সময়ে মুঞ্জালের নাম করেছেন, মুঞ্জালের অয়ন-গতিবেগ তিনি গ্রহণ করেছেন। দশম শতকের শ্রীপতি জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি *জ্যোতিষ রত্নমালা, ধীকোটি* ও *সিদ্ধান্তশেখর* রচনা করেন। একাদশ শতকের গোড়ার দিককার শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ হলেন শ্রীধর, তাঁর রচিত গণিতগ্রন্থ হলো *গণিতসার*। এর মধ্যে তিনশ শ্লোক আছে, সেজন্য এর নাম হলো *ত্রিশতিকা*। দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধানের আবিষ্কর্তা হলেন শ্রীধর। সার্টন জানিয়েছেন যে সংস্কৃতে শূন্যের গুণ ও তাৎপর্য সম্পর্কে এতে চমৎকার ব্যাখ্যা আছে। ভারতের গণিত ও জ্যোতিষ চর্চায় একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হলেন ভাস্কর (১১১৪ খ্রিস্টাব্দ), তাঁর প্রতিভা আর্যভট্ট ও বরাহমিহিরের সঙ্গে তুলনীয়। ভারতীয় গণিতজ্ঞদের মধ্যে তিনি সম্ভবত সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা হলো *সিদ্ধান্ত শিরোমণি*, তাঁর অন্য গ্রন্থ হলো *সর্বতোভদ্র যন্ত্র*, এখানি কাল-পরিমাণ বিষয়ক গ্রন্থ।

সিদ্ধান্ত শিরোমণির চারটি অংশ—লীলাবতী, বীজগণিত, গ্রহ গণিতাধ্যায় ও গোলাধ্যায়। প্রথম দুটি খণ্ডে পাটিগণিত ও বীজগণিত এবং শেষোক্ত দুখণ্ডে তিনি জ্যোতিষ আলোচনা করেছেন। ভাস্করের পাটিগণিত *লীলাবতী* একখানি জগৎ বিখ্যাত গ্রন্থ। বীজগণিতের আলোচনায় তিনি মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। ত্রিকোণমিতির সাইন সারণি তিনি তৈরি করে দেন। আদি মধ্যযুগে বিজ্ঞানীরা পাটিগণিত ও বীজগণিতের যেমন চর্চা করেছেন, জ্যামিতির ক্ষেত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য চর্চা চোখে পড়ে না। পরিমিতি বিদ্যাকে কেন্দ্র করে (mensuration) কিছু চর্চা হয়েছিল। ত্রিভুজের নির্ভুল ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র দেন ব্রহ্মগুপ্ত। ত্রিকোণমিতিতে বিজ্ঞানীদের সাফল্য ছিল

অনেকবেশি। সাইন, কো-সাইন, ভার্স-সাইন প্রভৃতি কোণানুপাত তাঁরা আবিষ্কার করেন। পঞ্চ সিদ্ধান্তিকায় বরাহমিহির বিভিন্ন সাইন অনুপাতের মানে ও একটি সাইন-সারণি তৈরি করেছেন।

আদিমধ্য যুগের ভারতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছিল। চিকিৎসা বিজ্ঞানের সঙ্গে রসায়নশাস্ত্রের সম্পর্ক স্থাপিত হয়, এরফলে চিকিৎসাবিদ্যা নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছিল। শুধু ভারতবর্ষ নয়, ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্র মধ্যপ্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। নাগার্জুন, বাগ্‌ভট, মাধবকর, বৃন্দ, চক্রপাণি দত্ত, ডহ্লন, শার্ঙ্গধর হলেন এযুগের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ও রসায়নবিদ। এযুগে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয়, পশু চিকিৎসালয় ইত্যাদি স্থাপিত হয়। ফা-হিয়েন পাটলিপুত্রে দাতব্য চিকিৎসালয় দেখে লিখেছিলেন, "এদেশের রাজন্যবর্গ ও ধনবান ব্যক্তিরা এই শহরে দরিদ্র, নিরাশ্রয়, খঞ্জ প্রভৃতি দুঃস্থ ব্যক্তিদের জন্য অনেকগুলি হাসপাতাল স্থাপন করেছেন। এইখানে তাহারা বিনা পয়সায় সর্বপ্রকার সাহায্য পাইয়া থাকে। চিকিৎসকগণ তাদের রোগ পরীক্ষা করে খাদ্য, পানীয় ও ঔষধের ব্যবস্থা করেন।" সপ্তম শতকে হিউয়েন সাঙ্ এদেশের হাসপাতাল ব্যবস্থা দেখে মুগ্ধ হন। হর্ষবর্ধন শহরে, গ্রামে ও প্রধান প্রধান রাস্তার ধারে বহু চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। হিউয়েন সাঙ্ পুণ্যশালা নামে আরো একধরনের দাতব্য প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ করেছেন যেখানে দরিদ্র ও অনাথরা আহার ও চিকিৎসা পেত।

আদিমধ্য যুগের ভারতে পশু চিকিৎসারও ব্যবস্থা ছিল, শালিহোত্র লেখেন *অশ্বায়ুর্বেদ সিদ্ধান্ত*। পালকাপ্যের *হস্ত্যায়ুর্বেদ* হলো হস্তি চিকিৎসার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এযুগের একজন শ্রেষ্ঠ রসায়নবিদ হলেন নাগার্জুন, ধাতুবিদ্যা, পারদ ঘটিত যৌগিক সম্বন্ধে জ্ঞান ও নানাবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে তিনি অবদান রেখে গেছেন। তিনি সম্ভবত নবম শতকের লোক ছিলেন। *নাবনীতক* নামক একখানি গ্রন্থে ভেষজের গুণাগুণ সম্পর্কে অনেক তথ্য আছে, এতে রোগ ও চিকিৎসা প্রণালীর কথা আছে। প্রাচীন ভারতের চিকিৎসাশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ তিনজন ব্যক্তি হলেন চরক, সুশ্রুত ও বাগ্‌ভট। বাগ্‌ভট হলেন *অষ্টাঙ্গ সংগ্রহের* রচয়িতা। সিন্ধু অঞ্চলে আরো একজন বাগভটের কথা জানা যায় যিনি *অষ্টাঙ্গ-হৃদয়-সংহিতা* নামক চিকিৎসাবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেন। বাংলায় পাল রাজাদের রাজত্বকালে বৈদ্যজাতির খুব উন্নতি হয়েছিল। নরপালদেবের রাজত্বকালে চক্রপাণি দত্ত *চিকিৎসাসার সংগ্রহ* নামে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন। এতে সেযুগে প্রচলিত নানাবিধ ওষুধের নাম পাওয়া যায়। তিনি সুশ্রুত সংহিতার ওপর *ভানুমতী* এবং চরক সংহিতার ওপর চক্রতত্ত্ব দীপিকা নামে টীকা রচনা করেন। তিনি শুধু চিকিৎসক নন, একজন খ্যাতনামা রসায়নবিদ ছিলেন। পারদ-গন্ধক ঘটিত লবণের আবিষ্কর্তা সম্ভবত তিনি। শার্ঙ্গধর

ছিলেন পশ্চিম ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ও রসায়নবিদ। সম্ভবত তিনি ত্রয়োদশ শতকের লোক ছিলেন। শার্ঙ্গধর সংহিতায় নানারকম ওষুধ, শারীরবৃত্ত ও রাসায়নিক পদার্থের আলোচনা করেছেন তিনি। এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে চিকিৎসাবিধি আলোচিত হয়েছে, নাড়ী পরীক্ষার তিনি বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা যায় এমন বহু রাসায়নিক যৌগিক ও মিশ্রণের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। সোনা, রুপো, লোহা, পারদ, তামা, টিন, সীসা প্রভৃতি ধাতুর রাসায়নিক গুণাগুণের কথা তাঁর গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। ত্রয়োদশ শতকের একজন সুচিকিৎসক ও বৈয়াকরণ হলেন নরহরি।

আদিমধ্য যুগে কারিগরি শিল্প ও চিকিৎসা বিদ্যার প্রয়োজনে রসায়নের উদ্ভব হয়েছে। চরক ও সুশ্রুত উভয়ে লবণ, ক্ষার প্রস্তুত বিধি ও সন্ধিত পানীয়ের (fermented drink) কথা উল্লেখ করেছেন। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পাঁচ মৌলিক পদার্থের সংমিশ্রণে যৌগিক পদার্থের উদ্ভব হয়। বাগ্‌ভট, বৃন্দ ও চক্রপাণি দত্ত রাসায়নিক পদার্থের কথা উল্লেখ করেছেন। বৃন্দের *সিদ্ধযোগে* তাম্র, রসামৃত চূর্ণ প্রভৃতি পারদঘটিত কয়েকটি যৌগিকের প্রস্তুত প্রণালী দেওয়া আছে। চক্রপাণি দত্ত পারদ, তামা, লোহা, রুপো প্রভৃতি ধাতুর কয়েকটি যৌগিক প্রস্তুত প্রণালী তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ভারতের তন্ত্রসাধকরা মধ্যযুগে রাসায়নিক বিদ্যার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তান্ত্রিক কামিয়ার দুটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো তিব্বতী বিশ্বকোষ *কাঞ্জুর* ও *তাঞ্জুর*। নাগার্জুনের *রসরত্নাকরে* নিকৃষ্ট ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করার প্রণালী আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে বহু রাসায়নিক যন্ত্রপাতির উল্লেখ আছে। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো পেষণযন্ত্র, বংশযন্ত্র, নালিকা যন্ত্র, দোলা যন্ত্র, অধস্পাতন যন্ত্র, পাতন যন্ত্র ইত্যাদি।

আদিমধ্য যুগে খনি থেকে ধাতু নিষ্কাশনের প্রক্রিয়া ভারতীয়রা আয়ত্ত করেছিল। এই সময়কার রসায়ন সংক্রান্ত গ্রন্থে বিভিন্ন ধাতুর কথা আলোচিত হয়েছে। সংকর ধাতু হলো পিতল, কাঁসা ও বর্তলোহ। ধাতু ও সংকর ধাতুর আবার প্রকারভেদ আছে, পার্থক্য নির্দেশ করার জন্য সুন্দর, অর্থবোধক নাম ব্যবহার করা হয়েছে। শুধু বিজ্ঞানী বা রসায়নবিদ নন, ধাতুশিল্পী ও খনির কাজে নিযুক্ত কারিগরদের হাতে রাসায়নিক জ্ঞানের প্রভূত উন্নতি ঘটেছিল। নানামূর্তি গড়ার কাজে এসব ধাতুর ব্যবহার ছিল, ভারতে প্রাচীন পদ্ধতিতে তামা নিষ্কাশন করা হতো। ব্রোঞ্জ, কাঁসা ও পিতলের মতো তামা প্রধান সংকর ধাতুর ব্যবহার ছিল। আগ্নেয়াস্ত্র নির্মাণে ব্রোঞ্জ ও পিতলের ব্যবহার করা হতো, চুল্লিতে কাঠকয়লার সাহায্যে লোহা গলানো হতো। বাংলার বীরভূম জেলাতে লোহা তৈরি হতো। মধ্যযুগে ভারতের লোহা ও ইস্পাতের বিশ্বজোড়া খ্যাতি ছিল।

ভারতীয় বিজ্ঞানীরা পৃথকভাবে পদার্থতত্ত্ব আলোচনা করেননি, পদার্থতত্ত্ব দর্শনের আলোচনায় স্থান পেয়েছিল। ভারতের দার্শনিকরা বস্তু ও পদার্থের অন্তর্নিহিত ধর্ম ও স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। বস্তুর গুরুত্ব, গতি, বল, অভিকর্ষ, ধ্বনি, ধ্বনি সৃষ্টির কারণ ইত্যাদি নিয়ে মৌলিক আলোচনা করেছেন। দর্শন ও বিজ্ঞান প্রসঙ্গে ভারতীয় বিজ্ঞানী ও দার্শনিকরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কথাও আলোচনার মধ্যে এনেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল লিখেছেন যে কঠোর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুশীলন না হলে বিজ্ঞান অপ্রমাণিত জল্পনা-কল্পনা হয়ে থাকত (The whole movement was genuinely and positively scientific)। বৌদ্ধ, জৈন দর্শন এবং প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানে পরমাণুবাদ আলোচনায় স্থান পেয়েছে। বৈশেষিক ন্যায়ে পরমাণুবাদ ও রাসায়নিক সংযুতির কথা আছে, এই সংযুতি হলো সংহতিক্রিয়া। বিভিন্ন কারণে বস্তু গতিশীল হয়। এজন্য বস্তুর গতিও বহুপ্রকার। বল হলো গতিসৃষ্টির একটি কারণ এবং বলের জন্য গতির ত্বরণ (acceleration) হয়। আধুনিক বলবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ভরবেগ। গতিশীল বস্তুর ভর ও বেগের গুণফল হলো এই ভরবেগ। আদিমধ্য যুগে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা এই তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

অষ্টম অধ্যায়

আদি মধ্যযুগে সামন্তব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশ

ভারতীয় লেখকদের মধ্যে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রথম প্রাচীন ভারতে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশের কথা উল্লেখ করেন। খ্রিস্টীয় চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে ভারতের অর্থনীতি, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় এই নতুন প্রবণতা দেখা দেয়। ষষ্ঠ থেকে নবম শতকের মধ্যে সামন্তব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটেছিল, এর পরিণত রূপটি পাওয়া যায় নবম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে। দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বি তাঁর *এন ইনট্রোডাকশন টু ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি* গ্রন্থে বলেছেন যে দুভাবে ভারতে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব ঘটেছিল। ভারতের রাজারা ব্রাহ্মণ, মন্দির, বৌদ্ধ ও জৈন বিহার, মঠ, আশ্রম, সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের নিষ্কর ভূমিদান করেন, এর নাম হলো অগ্রহার ব্যবস্থা। অগ্রহার ব্যবস্থার মাধ্যমে ভারতের রাজনীতি, শাসন ও অর্থনীতিতে বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থার পত্তন হয়। কোসাম্বির মতে, অন্য আর একভাবে নিচুতলা থেকে সামন্তব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। ভারতের সম্পন্ন কৃষক প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষিদের কাছ থেকে ভূসম্পত্তি কিনে নিয়ে ভূম্যধিকারী হয়ে বসেছিল। রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে ভূস্বামীরা স্বাধীন স্বতন্ত্র ক্ষমতা কেন্দ্র গড়ে তুলেছিল, সামন্ততান্ত্রিক প্রবণতা জোরদার হয়েছিল। আদি মধ্যযুগে (৬৫০-১২০০) আঞ্চলিকতার বিকাশ ঘটেছিল, রাজনৈতিক পরিস্থিতি সামন্ততন্ত্রের উদ্ভবের অনুকূল ছিল, সারা উপমহাদেশে অসংখ্য আঞ্চলিক শক্তির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

কার্ল মার্কস সামন্তব্যবস্থাকে এক বিশেষ ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থা হিসেবে দেখেছিলেন। দাসব্যবস্থাকে সরিয়ে দিয়ে এই ব্যবস্থা ইউরোপে কায়েম হয়েছিল। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার পতন ঘটিয়েছিল। অষ্টম থেকে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত সময়কাল হলো ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের যুগ। সামন্ত-ব্যবস্থায় ভূমি হলো উৎপাদনের প্রধান উপাদান, কৃষি অর্থনীতি প্রাধান্য পেয়েছিল, শিল্প উৎপাদন ও বাণিজ্য কমেছিল। ইউরোপে স্বয়ংসম্পূর্ণ আবদ্ধ, গতিহীন অর্থনীতি এবং বিকেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছিল। ভূমির ওপর ভূস্বামীদের (সামন্ত প্রভুদের) অধিকার স্থাপিত হয়। উৎপাদনের সব উপকরণ এবং উৎপন্ন ফসলের ওপর ভূম্যধিকারীদের অধিকার স্থাপিত হয়েছিল। ভূস্বামীরা ছিল অসংখ্য স্তরে বিভক্ত, কৃষি অর্থনীতির সর্বনিম্ন স্তরে ছিল সার্ফ বা ভূমিদাসরা। ভূমিদাসরা ভূমিতে আবদ্ধ থাকে, ভূমিতে তাদের কোনো অধিকার থাকে না, দেশের আইনে তাদের কোনো মানবিক অধিকার থাকে না। জমির মালিকানার বদল হলে ভূমিদাসদেরও অন্য মালিকের অধীনে স্থাপন করা হয়। ভূস্বামীরা সর্বাধিক উদ্বৃত্ত আহরণের জন্য নানা ধরনের কর ও বেগার শ্রম আদায় করে। ভূস্বামী ও ভূমিদাসদের মধ্যে আধিপত্য ও অধীনতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

উৎপন্ন ফসলের ওপর ভূস্বামীর একচেটিয়া আধিপত্য স্থাপিত হবার জন্য শুধু ভোগের জন্য উৎপাদন হয়, বাণিজ্যিক পণ্য উৎপাদন হয় না, বাণিজ্য কমে আসে। সামন্তব্যবস্থায় আঞ্চলিকতার উদ্ভব হয়, বিভিন্ন অঞ্চল স্বনির্ভর হয়ে ওঠে। সামন্ত প্রভুরা শুধু উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করেন না, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্তৃত্বের অধিকারী হন। কেন্দ্রীভূত রাজশক্তির স্থানে অসংখ্য আঞ্চলিক কর্তৃত্ব গড়ে ওঠে। রামশরণ শর্মা, বি. এন. এস. যাদব ও ডি. এন. ঝা ভারতের সামন্ততন্ত্রের তত্ত্বগত কাঠামোটি নির্মাণ করেছেন। ভারতের রাজারা ব্রাহ্মণদের নিষ্কর ভূমিদান করতেন (ব্রহ্মদেয়), পরে মন্দির (দেবদান), জৈন ও বৌদ্ধমঠ, আশ্রমকে ভূমিদান করা হয়। এর নাম হলো অগ্রহার ব্যবস্থা। প্রথমে পুরোহিত, ব্রাহ্মণ ও ধর্মীয় কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের অগ্রহার দেওয়া হলেও পরে সরকারি কর্মচারী, প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্যদের নিষ্কর ভূমিদান চলতে থাকে। শর্মা দেখিয়েছেন যে আদি মধ্যযুগে প্রতিহারদের শাসনাধীন উত্তর ও পশ্চিম ভারত, পালদের অধীনস্থ বিহার ও বাংলা এবং রাষ্ট্রকূটদের অধীনস্থ দাক্ষিণাত্যে সামন্তব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল। পালরাজ রামপালের সময়ে বাংলাদেশে অন্তত চোদ্দজন সামন্ত ছিলেন।

অধ্যাপক শর্মা জানিয়েছেন যে সামন্তব্যবস্থার উদ্ভব এক বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছিল। ভূমিব্যবস্থায় ভূস্বামীদের আবির্ভাব ঘটে, ভূস্বামীদের অধীনে মধ্যস্বত্বভোগীদের আবির্ভাব হয়। ভূমিতে রাজকীয় মালিকানা এবং যৌথ মালিকানা কমতে থাকে। পুরাণে কলিযুগের সূচনাকালকে সংকটকাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই সময় দণ্ডের অভাব, বর্ণাশ্রম ধর্মের বিপর্যয়, বৈদেশিক আক্রমণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে অসুবিধা এবং রাজার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব হ্রাসের কথা বলা হয়েছে। শর্মা মনে করেন কলিযুগের আবির্ভাবকালের এই সংকট আসলে আদি মধ্যযুগের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক সংকট। এই পটভূমিতে ভারতে সামন্ততন্ত্রের আবির্ভাব ও বিকাশ ঘটেছে, অগ্রহার ব্যবস্থায় দানগ্রহীতারা ভূস্বামী হয়ে যান। তাঁরা রাজস্ব আদায় করতেন এবং অগ্রহার অঞ্চলের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বও তাঁদের হাতে ছিল। রাষ্ট্রের ক্ষমতা হ্রায় পায়, ভূস্বামীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। রাজা রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে অসুবিধা বোধ করলে ভূস্বামীদের হাতে রাজস্ব সংগ্রহের ভার দেন। গুপ্ত ও বকাটক রাজারা অগ্রহার ব্যবস্থা শুরু করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই প্রবণতা ক্রমশ বাড়তে থাকে, দক্ষিণের শৈব ও বৈষ্ণব মন্দিরগুলিকে বহু ভূমিদান করা হয়েছিল। এই সব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ভূম্যধিকারী হয়ে বসেছিল। বিহারের বিখ্যাত বৌদ্ধ বিহার নালন্দার জন্য পাল রাজারা ২০৯টি গ্রাম দান করেন। যবদ্বীপের শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজা বালপুত্রদেব দেবপালের অনুমতি নিয়ে আরো পাঁচখানি গ্রাম দান করেন। নালন্দার অধীনে মোট ২১৪টি গ্রাম ছিল। বাংলার চন্দ্র, বর্মন, দেব প্রভৃতি রাজবংশ ময়নামতী বিহারের উদ্দেশ্যে প্রচুর ভূমিদান করেছিল। পাল রাজারা ব্রাহ্মণদের প্রচুর ভূমিদান করেন, সেন বংশের শাসনকালে এই প্রবণতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল। সেনদের প্রধানমন্ত্রী

হলায়ুধের অনেক ভূসম্পত্তি ছিল। উত্তর ও পশ্চিম ভারতে প্রতিহার রাজারা অগ্রহার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটিয়েছিলেন। তারা ব্রাহ্মণকে ভূসম্পত্তি দান করেছেন, কোনো প্রতিষ্ঠানকে ভূমিদান করেননি। দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট রাজারা এই ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটিয়েছিলেন, একজন রাষ্ট্রকূট রাজা ১৪০০ গ্রাম দান করেন। সুদূর দক্ষিণের লেখমালায় ব্রহ্মদেয় ও দেবদানের অসংখ্য নজির ছড়িয়ে আছে।

অগ্রহার ব্যবস্থার ফলে ভূমিব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার প্রসার ঘটেছিল, ভূস্বামীর সংখ্যা বেড়েছিল। ভূস্বামীর সংখ্যা ও ক্ষমতা বাড়লে কৃষকের অবস্থার অবনতি ঘটেছিল। ধর্মশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে জমির মালিকানা তিনজনের—রাজা, ভূস্বামী ও কৃষক। ভূস্বামী তাঁর সব জমি নিজে চাষ করতে পারতেন না, এজন্য কৃষি শ্রমিক দিয়ে জমি চাষ করিয়ে তিনি শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করতেন। অগ্রহার ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে মালিকানাহীন কৃষি শ্রমিকের উদ্ভব হয়েছিল। মন্দির ও অগ্রহারের ব্যক্তিমালিক কৃষি শ্রমিক দিয়ে শুধু চাষ করাতেন না, তিনি অন্যকে ভোগাধিকার দান করতেন। ভূস্বামীর অধীনে নানাস্তরে বিভক্ত ভূস্বামীর আবির্ভাব ঘটে। ইউরোপের স্তরবিন্যস্ত সামন্তব্যবস্থার সঙ্গে এর মিল লক্ষ করা যায়। রাজাদের তাম্রশাসনে যে ভূমিদানের বিবরণ পাওয়া যায় তাতে প্রদত্ত ভূমির সীমানা খুব ভালভাবে চিহ্নিত হতো না। দানগ্রহীতা এর সুযোগ নিয়ে গ্রামের চারণভূমি, অরণ্যভূমি, জলাভূমির ওপর নিজের অধিকার স্থাপন করতেন। পাল-সেনদের তাম্রশাসনে দানগ্রহীতাকে জমিতে উৎপন্ন ফল, মাছ, কচ্ছপ ইত্যাদির অধিকার দান করা হয়। উৎপন্ন ফসলের অংশ ছাড়াও দানগ্রহীতা এগুলি ভোগের অধিকার লাভ করেন।

শর্মা মনে করেন যে অগ্রহার ব্যবস্থার ফলে ভূমিতে রাজকীয় ও যৌথ অধিকার সঙ্কুচিত হয়, ভূস্বামীর অধিকারের সম্প্রসারণ ঘটেছিল। রাষ্ট্রকূট আমলে গ্রামের যৌথ অধিকারভুক্ত জমি ভূস্বামীর অধিকারে চলে যায়। নোবুরু কারাশিমা চোল আমলের অনেকগুলি লেখ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে মন্দিরগুলি গ্রামের জমি কিনেছিল। গ্রামসভা উর মন্দিরকে জমি বিক্রি করেছিল, বহু ব্যক্তি মন্দিরকে জমি বিক্রি করেছিল। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে দক্ষিণ ভারতের জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রসার ঘটেছিল। কিছু ব্যক্তি জমির ওপর ভোগাধিকার (কানি) পেয়েছিল, এক অঞ্চলের মানুষ অন্য অঞ্চলে গিয়ে জমি কিনে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। চোল সৈন্যবাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসাররা জমি কিনে জমিদার হয়ে বসেছিল।

শর্মা জানাচ্ছেন যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের রাজশক্তি তাদের কর্মচারীদের নির্দিষ্ট অঞ্চলে স্বশাসনের অধিকার দেন। রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিরা ভূমির মালিকানা পান, অধীনস্থ অঞ্চলের ওপর এরা কর্তৃত্ব করতেন। সামন্তরা রাজাদের কর দিতেন, সৈন্যবাহিনী দিয়ে সাহায্য করতেন, রাজাকে সন্তুষ্ট রেখে তারা নিজ নিজ এলাকায় যথেচ্ছ কর সংগ্রহ করতে পারতেন। কৃষকের ওপর অত্যাচার হতো। মধ্যযুগের

জাগির ব্যবস্থার সঙ্গে এর অনেক সাদৃশ্য আছে। প্রতিহারদের রাজ্যে সামন্তরা বংশানুক্রমিকভাবে তাদের অধীনস্থ এলাকা ভোগ করত। বিগ্রহ পালের আমলের একটি লেখ উদ্ধৃত করে শর্মা দেখিয়েছেন যে সামন্তরা ভূমিতে অধীনস্থ সামন্ত তৈরি করতেন। এই অবস্থায় শাসন, সম্পদ আহরণ, বণ্টন সবকিছুতে বিকেন্দ্রীকরণ শুরু হয়ে যায়। সন্ধ্যাকর নন্দী *রামচরিতে* রামপালের আমলের কৈবর্ত বিদ্রোহের কথা উল্লেখ করেছেন। কৈবর্ত নেতা দিব্য উত্তরবঙ্গ দখল করে শাসন স্থাপন করেন। রামপাল চোদ্দজন সামন্তরাজার সাহায্য নিয়ে এই বিদ্রোহ দমন করেন। তিনি রামচরিতে এই চোদ্দজন রাজার নামের তালিকা দিয়েছেন। এই ঘটনা থেকে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না বাংলাদেশে সামন্ততন্ত্র বেশ শক্তিশালী ছিল। সামন্তদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল কারণ রামপাল তাদের সাহায্যের বিনিময়ে প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করেন।

রামশরণ শর্মা ও যাদব দেখিয়েছেন আদি মধ্যযুগে ভারতীয় কৃষকের অবস্থার অবনমন ঘটেছিল। আদি মধ্যযুগের আগে কৃষকদের বলা হতো গৃহপতি, কুটুম্বি। সম্ভবত কৃষক ছিল স্বাধীন, তার কিছু জমির মালিকানা ছিল বলে মনে হয়। আদি মধ্যযুগের নথিপত্রে গৃহপতি, কুটুম্বিদের আর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। তার বদলে পাওয়া যায় হালকর, বদ্ধহল, আশ্রিতহালিক প্রভৃতি শব্দ যা দিয়ে অধীনস্থ কৃষকদের বোঝানো হয়েছে। *পদ্মপুরাণে* চাষিদের দুরবস্থার বর্ণনা আছে। কৃষকদের ওপর অবৈধ নানা কর চাপানো হয়েছিল, আইন বহির্ভূত নানা উপঢৌকন আদায় করা হয়। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে আদি মধ্যযুগে করের সংখ্যা বেড়েছিল। ভূস্বামীকে নির্দিষ্ট কর ছাড়াও উচিত-অনুচিত কর ও বেগার শ্রম (বিষ্টি) দিতে হতো। কাশ্মীরের রাজারা কৃষকের হাতে ন্যূনতম গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা রেখে বাকি সব অধিকার করে নিতেন। শর্মা ও যাদব মনে করেন কৃষকের অবস্থার শুধু অবনমন ঘটেনি, কৃষক সম্ভবত ভূমির সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। সন্দেহ নেই কৃষক স্বাধীন অস্তিত্ব হারিয়েছিল, তবে ভারতের কৃষক ইউরোপের ভূমিদাস হয়েছিল কিনা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কোসাম্বি দেখিয়েছেন যে ভূস্বামীর করের চাপ বাড়লে, জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠলে কৃষক চাষ ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করত।

বলপ্রয়োগে কর আদায় এবং অত্যাচার মাত্রা ছাড়ালে কৃষক সম্ভবত প্রতিরোধ গড়ে তুলত। যাদব ইঙ্গিত দিয়েছেন যে অতিরিক্ত বিষ্টি আদায় করা হলে প্রজারা সামন্তপ্রভুর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ জানাত। বাংলার কৈবর্ত বিদ্রোহকে শর্মা ও যাদব কৃষক প্রতিরোধ বলে উল্লেখ করেছেন। শর্মা আরো অনুমান করেছেন যে কৃষকরা পালরাজাদের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল। সন্ধ্যাকর নন্দী অবশ্য কোথাও বলেননি যে রামপালের আমলে কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল। দিব্য পালদের কর্মচারী ছিলেন, তিনি জাতিতে ছিলেন কৈবর্ত। কৈবর্তরা সাধারণ অস্ত্র নিয়ে মহিষের পিঠে চড়ে পালদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। কৃষিজীবীরা যে অত্যাচারিত হলে ভূস্বামীর বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নিত এমন তথ্য অন্য আকরেও পাওয়া যায়।

সামন্তব্যবস্থা মুখ্যত কৃষিব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল ছিল, আগের যুগে এতখানি কৃষি নির্ভরতা লক্ষ করা যায় না। সমকালীন সাহিত্যে কৃষিকে সর্বশ্রেণীর পক্ষে শ্রেয় বৃত্তি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শর্মা ও যাদব মনে করেন কৃষির ওপর বেশি জোর দিয়ে শিল্প ও বাণিজ্যের অবক্ষয়কে বোঝানো হয়েছে। পুরাণগুলিতে বলা হয়েছে কলিযুগে শিল্প ও বাণিজ্যের অবনতি ঘটবে। রোম-ভারত বাণিজ্যের অবনতি ঘটেছিল, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারতের ভূমিকা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছিল। আদি মধ্যযুগে বাণিজ্য ও বণিকের কথা বেশি নেই। অগ্রহার ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে স্বনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, বাণিজ্যিক লেনদেনের পণ্য এই অর্থনীতিতে উৎপন্ন হতো না। আঞ্চলিক পণ্য অঞ্চলেই ভোগ করা হতো। বাণিজ্যিক অবক্ষয়ের সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো মুদ্রার অনুপস্থিতি। আদি মধ্যযুগে পাল, সেন ও রাষ্ট্রকূটদের মুদ্রা নেই, কড়ি হলো বিনিময় মাধ্যম (কপর্দক)। কড়ি দিয়ে দূরপাল্লার বাণিজ্য চালানো যায় না, যেটুকু বাণিজ্য ছিল তা হলো স্থানীয়। শর্মা লিখেছেন যে মুদ্রা-নির্ভর অর্থনীতি 'রক্তাল্পতার' শিকার হয়েছিল, ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন ও লেনদেন কমেছিল।

স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা হলে শিল্প বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে নগরের অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল। যাদব দেখিয়েছেন আদি মধ্যযুগে নগরগুলি গ্রামের আকার নিয়েছিল। নগরায়ণের অবক্ষয় প্রায় সর্বভারতীয় রূপ পরিগ্রহ করেছিল। হিউয়েন সাঙের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করে শর্মা দেখিয়েছেন যে গাঙ্গেয় উপত্যকায় বহু সমৃদ্ধ নগর অবক্ষয়ের পথে চলেছিল। কৌশাম্বী, শ্রাবস্তি, কপিলাবস্তু, রামগ্রাম, কুশীনগর ও বৈশালীর মতো বিখ্যাত নগর আগের মতো সমৃদ্ধ ছিল না। অনেক নগর ধুঁকছিল, অনেকগুলি পরিত্যক্ত হয়। অনেক নগরের পুরাতাত্ত্বিক অবশেষ বিশ্লেষণ করে শর্মা দেখিয়েছেন যে আদি মধ্যযুগে শহরগুলি ভগ্নদশায় পৌঁছেছিল। নগরের অবক্ষয় হলো সামন্তব্যবস্থার একটি প্রধান লক্ষণ। বাণিজ্যের অবক্ষয় ও শিল্পের উৎপাদন হ্রাস নগরের অবক্ষয়কে ত্বরান্বিত করেছিল। যেসব নগর তখনো টিকেছিল সেগুলি হলো রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কেন্দ্র এবং তীর্থক্ষেত্র। কারিগরি উৎপাদন ক্ষেত্র এবং বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে নগরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। মুদ্রাব্যবস্থার মতো নগরায়ণের ক্ষেত্রেও 'রক্তশূন্যতার' সৃষ্টি হয়েছিল।

রামশরণ শর্মা ও যাদব যা বলতে চান তা হলো আদি মধ্যযুগে ভারতে সামন্ততন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল। ভূমিতে অগ্রহার ব্যবস্থার দরুন ব্যক্তি মালিকানার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, রাজার কর্তৃত্ব ও যৌথ মালিকানা হ্রাস পেয়েছিল। ভূমিকে কেন্দ্র করে বহুস্তরে বিভক্ত সামন্তশ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। কৃষক জমির মালিকানা হারিয়ে বদ্ধহল বা আশ্রিত হালিকে পরিণত হয়, কৃষকের ওপর অত্যাচার ও শোষণ বেড়েছিল। কারিগরি শিল্পের অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল, মুদ্রার ব্যবহার কমেছিল, বাণিজ্য কমেছিল, নগরের পতন ঘটতে থাকে। গ্রামীণ স্বনির্ভর, বদ্ধ অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, সমগ্র উপমহাদেশে অর্থনৈতিক অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল।

শর্মা ও যাদব মার্কসবাদী সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির ব্যাখ্যাকে ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে সামন্ততন্ত্রের একটি ছক তৈরি করেছেন। তবে সকলে তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারেননি। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সরকার ও হরবন্‌স মুখিয়া তাঁর তত্ত্বের বিরোধিতা করেছেন। সরকার স্বীকার করেন না অগ্রহার ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে রাজার ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ঘটেছিল। দানগ্রহীতা যে নিষ্কর ভূমি পেতেন তাতে রাজার রাজকীয় বা অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিশেষ ক্ষতি হতো না। দানগ্রহীতা শুধু রাজস্ব ভোগের অধিকারী হতেন, রাজস্ব আদায়ের অধিকার সম্ভবত তাকে দেওয়া হতো না। অগ্রহারের ফলে রাজার যে আর্থিক ক্ষতি হতো ভূম্যধিকারীর পৃষ্ঠপোষকের স্বেচ্ছাদানে তার অনেকখানি পূরণ হয়ে যেত। তাছাড়া রাজা অগ্রহার অঞ্চল থেকে রাজস্ব আদায়ের অধিকার একেবারে ছেড়ে দিতেন না। 'করশাসন' আদেশাবলীর উদ্ধৃতি দিয়ে সরকার দেখিয়েছেন যে অগ্রহার এলাকা থেকে রাজা কর সংগ্রহ করতেন। সরকার আরো জানাচ্ছেন যে আদি মধ্যযুগের সঙ্গে আগের যুগের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিশেষ পার্থক্য ছিল না। ভূস্বামীরা জমিদারের মতো রাজস্বের একাংশ ভোগ করতেন। সরকার অভিজাততন্ত্রের নজির উদ্ধৃত করেছেন, আদি মধ্যযুগের কৃষকের দুরবস্থার দিকে নজর দেননি। আদি মধ্যযুগের সামন্ত বা করদ রাজাদের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, তা সত্ত্বেও তিনি সামন্ততন্ত্রের কাঠামোটিকে স্বীকার করেননি।

হরবন্‌স মুখিয়া শর্মার সামন্ততন্ত্রের তত্ত্বটিকে বাতিল করে দিয়েছেন। তিনি মনে করেন আদি মধ্যযুগে এবং মধ্যযুগে কৃষক উৎপাদনের উপকরণগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিল। উৎপাদনের উপকরণের ওপর যদি ভূস্বামীর অধিকার না থাকে তাহলে তিনি কৃষকের ওপর উৎপীড়ন করতে পারেন না। ভূস্বামী ও কৃষকের মধ্যে প্রভু-দাসের সম্পর্কও তৈরি হয় না। আদি মধ্যযুগে ভূমিতে আবদ্ধ ভূমিদাস প্রথা ভারতে ছিল না। ভূমিদাস নেই, প্রভু-দাসের সম্পর্ক নেই, সুতরাং ভারতে সামন্তপ্রথা ছিল একথা বলা যায় না। ভূস্বামী ও কৃষকের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে সম্পর্ক তৈরি হতো না, ভারতের সমকালীন সাহিত্যে চুক্তির উল্লেখ নেই। ইউরোপে সামন্তপ্রথা চুক্তির ওপর নির্ভরশীল ছিল। ভারতের আকরগুলি এসম্পর্কে নীরব। চুক্তির সম্পর্ক ছিল না, এজন্য কৃষক স্বাধীনতা হারিয়ে ভূমিদাস হয়নি। এজন্য হরবন্‌স মুখিয়ার মতো অনেকে সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন, সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। সাম্প্রতিককালে অধ্যাপক ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন আদি মধ্যযুগে পৃথুদক, সিয়াডোনি, গোপাদ্রি ও তত্ত্বানন্দপুরের মত শহর ছিল। শহরগুলিতে শিল্পপণ্য উৎপাদনেরও ব্যবস্থা, ছিল, বণিকরা শহরের মণ্ডপিকাতে বাণিজ্য করতে পারত। অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে আদি মধ্যযুগে মুদ্রার অনুপস্থিতির কথা যা বলা হয় তা সর্বাংশে সত্য হয়। ঐ পর্বে বাংলাদেশে রুপোর মুদ্রার চলন লক্ষ করা যায়।

দ্বিতীয় পর্ব

তুর্ক-আফগান যুগ (১২০০-১৫৫৬)

প্রথম অধ্যায়

ইতিহাস-চিন্তা ও সুলতানি যুগের ইতিহাসের উপাদান

ঐতিহাসিক সাহিত্য—প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক সাহিত্য, বিদেশীদের বিবরণী, লেখ, মুদ্রা, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

প্রাচীন ভারতের সঙ্গে তুলনায় দিল্লি সুলতানির ইতিহাসের উপাদান বিশাল, বৈচিত্র্যপূর্ণ, নির্ভরযোগ্য এবং গুণগতমানে উন্নত। মুসলমান ঐতিহাসিকরা সমকালীন ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করেছেন। এইসব ইতিহাসে স্থান, কাল, পাত্রের বর্ণনা আছে, আছে কালানুক্রম, রাজনৈতিক ও সামরিক ঘটনাবলীর পরিচয়। সুলতানির ইতিহাস যেমন লেখা হয়েছে তেমনি এযুগে প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক ইতিহাসও রচিত হয়েছে। লিখিত আকর ছাড়াও আছে স্থাপত্য নিদর্শন, মুদ্রা, লেখ ও কিছু দলিল-দস্তাবেজ। বিদেশী পর্যটকরা ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন, তাঁরা এদেশের রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক জীবনের ওপর মূল্যবান তথ্য রেখে গেছেন। সুলতানি যুগে নির্মিত অসংখ্য প্রাসাদ, দুর্গ, মসজিদ, মাদ্রাসা, খান্‌কা ও স্মৃতিসৌধ আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের কাঠামো নির্মাণে সহায়ক হয়। সুলতানি যুগের ইতিহাসের উপাদানগুলিকে আলোচনার সুবিধার জন্য চারভাগে ভাগ করা যায়—(ক) সমসাময়িক বা প্রায়-সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিকদের লেখা ইতিহাস, (খ) প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক ইতিহাস, (গ) বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী এবং (ঘ) স্থাপত্য নিদর্শন, প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য, মুদ্রা, লেখ, দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদি।

ক. সমসাময়িক ইতিহাস

তুর্কি মুসলমানরা ভারত জয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস রচনার ধারাটিও সঙ্গে করে এনেছিল। সিন্ধুদেশে আরব শাসনের শুরু থেকে মুসলমান শাসনের শেষ অবধি মুসলমান ঐতিহাসিকরা এর ধারাবাহিক ইতিহাস লিখে রেখে গেছেন। ইবনাল আসীরের *কামিলাৎ-তারিখ* (১২৩০) গ্রন্থখানি মহম্মদ ঘুরির বংশ পরিচয় এবং মধ্য এশিয়া সম্পর্কে বহু তথ্য সরবরাহ করে। এই গ্রন্থে উল্লিখিত তারিখগুলি মোটামুটি নির্ভরযোগ্য বলে ধরে নেওয়া হয়। কামিলাৎ-তারিখের পরিপূরক গ্রন্থ হলো আতামালিক জুয়াইনির *তারিখ-ই-জাহান গুসা-ই-জুয়াইনি* (১২৬০)। মধ্য এশিয়ার ইতিহাসের সঙ্গে এতে পাওয়া যায় পশ্চিম এশিয়ায় মোঙ্গল আক্রমণের ইতিহাস। লেখক মোঙ্গল নেতা হলাকুর অধীনে উচ্চপদে ছিলেন। সমকালীন ঘটনাবলীর তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষ দর্শক, তবে তাঁর লেখায় কিছুটা পক্ষপাতিত্ব এসেছে। হামদুল্লা মাস্তোকি কাজবিনী লেখেন

তারিখ-ই-গাজীদা (১৩২৯)। গজনি, ঘুর ও ভারতের সুলতানদের সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য তথ্য এতে আছে। আরবদের সিন্ধুবিজয় সম্পর্কে প্রাথমিক আকর গ্রন্থ হলো আরবি ভাষায় লেখা *চাচনামা*। মহম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধুবিজয়ের কথা এই গ্রন্থ থেকে জানা যায়। মহম্মদ আলি বিন কুফী এই গ্রন্থখানির ফারসি অনুবাদ করেন। সিন্ধু জয়ের ওপর আরও একখানি গ্রন্থ পরবর্তীকালে লিখেছিলেন মীর মহম্মদ মাসুম, *তারিখ-ই-সিন্ধ* ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে লেখা হয়। আবু নাসের বিন উতবি লেখেন ইয়ামিনি রাজবংশের ইতিহাস *কিতাবুল ইয়ামিনি*। এতে সবুক্তিগিন ও মামুদের ইতিহাস আছে ১০২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। মামুদের জীবনীর ওপর আরও একখানি গ্রন্থ হলো আবুল ফজল বৈহাকির *তারিখ-ই-মামুদী*।

হাসান নিজামীর *তাজ-উল-মাসির* হলো দিল্লি সুলতানির আদিপর্বের ইতিহাস (১১৯২-১২২৮)। দিল্লি সুলতানির প্রথম পর্বের আর একজন ঐতিহাসিক হলেন মিনহাজ-উস-সিরাজ। তাঁর *তবাকৎ-ই-নাসিরীতে* (১২৬০) ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত দিল্লি সুলতানির ইতিহাস পাওয়া যায়। বিভিন্ন তথ্য থেকে উপাদান সংগ্রহ করে এই বিচারক-ঐতিহাসিক ইতিহাস লিখেছেন। তাঁর গ্রন্থে মুসলমান শাসকদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ আছে। মহম্মদ ঘুরির ভারত অভিযান ও ইখতিয়ার উদ্দিন মহম্মদ বখতিয়ার খল্‌জির বাংলা জয়ের কাহিনী এতে পাওয়া যায়। তাঁর গ্রন্থে অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের কথা নেই। সমকালীন বহু ঘটনার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন কিন্তু পক্ষপাতশূন্যভাবে নিরপেক্ষ ইতিহাস তিনি লিখতে পারেননি। সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের মধ্যে একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন আমীর খসরু (১২৫৩-১৩২৫)। কায়কোবাদ, জালালুদ্দিন খল্‌জি, আলাউদ্দিন, মুবারক খল্‌জি ও গিয়াসুদ্দিন তুঘলকের পৃষ্ঠপোষকতা তিনি লাভ করেন। তাঁর পুরো নাম হলো আবুল হাসান আমিনউদ্দিন খুসরভ। প্রধানত কবি, হিন্দুস্তানের তোতাপাখি, খসরু গদ্যে ও পদ্যে বহু ইতিহাসাশ্রয়ী গ্রন্থ লেখেন। তাঁর মসনবি ও দিবানগুলি হলো ইতিহাসনির্ভর। তাঁর রচনার মধ্যে আছে *কিরান-উস-সাদিন, মিফতা-উল-ফুতু, আশিকা, নু-সিপিহর* ও *তুঘলকনামা*। এগুলি হলো সব কাব্যগ্রন্থ, তবে ইতিহাসের উপাদান আছে। গদ্যে তিনি লিখেছেন ঐতিহাসিক গ্রন্থ *খাজাইনুল ফুতুহ* (তারিখ-ই-আলাই)। এই ইতিহাস থেকে পাওয়া যায় আলাউদ্দিনের রাজত্বের প্রথম ষোলো বছরের তথ্য এবং দাক্ষিণাত্য বিজয়ের কাহিনী। সমকালীন দেশের কথা ও সমাজের পরিচয় দিতে কবি-ঐতিহাসিক ভুল করেননি। তবে মনে রাখা দরকার তিনি প্রথমে ছিলেন কবি, পরে ঐতিহাসিক (he writes more as a poet than as a professional historian)।[১]

১. রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত *দিল্লি সুলতানাত*, পৃ. ২।

বারানি হলেন সুলতানি যুগের একজন শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক। তাঁর বিখ্যাত রচনা *তারিখ-ই-ফিরুজশাহী*-তে (১৩৫৮) তিনি চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সুলতানি রাজত্বের ইতিহাস লিখেছেন। উলেমা সম্প্রদায়ের মানুষ বারানি ঐতিহাসিকের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন (Barani had high conception of a historian and considered it to be his essential duty to record honestly the whole truth.)। সত্য প্রকাশ করা হলো ঐতিহাসিকের ধর্ম, বারানি ঐতিহাসিকের এই ধর্ম পালন করেননি। প্রথম কারণ হলো তিনি তাঁর পৃষ্ঠপোষক সুলতানের দোষত্রুটির কথা প্রকাশ করেননি। এই ত্রুটি আমীর খসরুর মধ্যেও লক্ষ করা যায়। খসরু আলাউদ্দিনের নিষ্ঠুরতা এবং বিশ্বাসঘাতকতার কথা এড়িয়ে গেছেন। বারানিও তাই করেছেন। ইলিয়ট তাঁকে 'অসত্যভাষী' (unfair narrator) বলে উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক ফিরিস্তা তাঁর বিরুদ্ধে সত্য গোপন করার অভিযোগ এনেছেন (Firishta blames Barani for withholding the truth.)। বারানি ছিলেন দরবারী ঐতিহাসিক, তিনি দরবারের কাগজপত্র দেখেছিলেন। অথচ তাঁর বর্ণনায় ঐতিহাসিক কালানুক্রম রক্ষা করেননি, তাঁর গ্রন্থে উল্লিখিত তারিখ ও স্থানগুলির পরিচয় বেশ ত্রুটিপূর্ণ (he is very sparing and inaccurate in his dates)। বারানির ইতিহাস পদ্ধতিও ছিল বেশ ত্রুটিপূর্ণ (He is also wanting in method and arrangement.)। গ্রীক ঐতিহাসিক থুকিডিডিসের মতো তিনি নায়কদের মুখে সংলাপ বসিয়েছেন। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ *ফতোয়া-ই-জাহান্দারি*-তে রাষ্ট্রীয় কাঠামো, প্রশাসন, আদর্শ ও আইন-কানুনের কথা আছে। বারানির ইতিহাসে সুলতানি যুগের প্রশাসনিক ব্যবস্থার অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তিনি যত্ন করে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা, উৎপাদন, বাজার দ্রব্যমূল্য ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করেছেন।

মিনহাজ ও বারানি ছাড়া সুলতানি যুগের আরও কয়েকজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক হলেন ইসামী, শামস-ই-সিরাজ আফিফ ও ইয়াহিয়া সরহিন্দি। ইসামীর *ফুতু-উস-সালাতিন* (১৩৫০) শাহ্নামার মডেলে রচিত হয়। গজনির ইয়ামিনি রাজবংশের ইতিহাস থেকে শুরু করে তিনি মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্ব পর্যন্ত ইতিহাস লিখেছেন। তিনি মহম্মদ বিন তুঘলকের অত্যাচারের শিকার হন। বাহমনি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দিন হাসান বাহমন শাহের পৃষ্ঠপোষকতা তিনি লাভ করেন। ইসামী ঐ যুগের সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয় দিয়েছেন। শামস-ই-সিরাজ আফিফ লিখেছেন *তারিখ-ই-ফিরোজশাহী*, এতে ফিরুজ তুঘলকের রাজত্বের ইতিহাস আছে। বারানি যেখানে শেষ করেছেন আফিফ সেখানে শুরু করেছেন। ইয়াহিয়া সরহিন্দের *তারিখ-ই-মুবারকশাহী*-তে মহম্মদ ঘুরি থেকে সৈয়দবংশের শেষপর্যন্ত সমগ্র সুলতানি যুগের ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। আফিফের বর্ণনায় যেসব ত্রুটি আছে সরহিন্দের লেখা থেকে তা দূর করা যায়। আহম্মদ ইয়াদগার *তারিখ-ই-সালাতিন-ই-আফগান*

গ্রন্থে লোদীদের ইতিহাস লিখেছেন। নিয়ামতুল্লাহর *মাখজান-ই-আফগান* এবং আবদুল্লার *তারিখ-ই-দাউদী* হলো শূর ও লোদী বংশের নির্ভরযোগ্য উপাদান। নিজামুদ্দিন ও ফিরিস্তা সুলতানি যুগ সম্পর্কে বহু তথ্য সরবরাহ করেছেন।

ফিরুজ তুঘলকের রাজত্বের একখানি নির্ভরযোগ্য আকর গ্রন্থ হলো সুলতানের নিজের আত্মজীবনী *ফুতুহাত-ই-ফিরুজশাহী*। ক্ষুদ্র এই পুস্তিকাখানি সুলতানের মানসিকতার পরিচয় বহন করে। *সিরাত-ই-ফিরুজশাহী* (১৩৭০) নামে আরও একখানি গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়, তবে লেখকের নাম জানা যায় না। *ওয়ালিয়াৎ-ই-মুস্তাকি* ও *তারিখ-ই-মুস্তাকি* নামে দুখানি পাণ্ডুলিপির কথা জানা যায়। এগুলির লেখক হলেন শেখ রিজকুল্লাহ্ (১৪৯১-১৫৮১), তিনি মুস্তাকি নামে লিখতেন। ইনি লোদী ও শূরদের সমসাময়িক ইতিহাস লিখেছেন। নিজামুদ্দিন ও ফিরিস্তা সুলতানি আমলের প্রদেশগুলির ইতিহাস সম্পর্কে তথ্য রেখে গেছেন। প্রদেশগুলির পৃথক ইতিহাস লেখা হয়েছে, *তারিখ-ই-বাহাদুরশাহী* হলো সিন্ধু প্রদেশের ইতিহাস। এই গ্রন্থখানি পাওয়া যায় না, তবে নিজামুদ্দিন, আবুল ফজল ও ফিরিস্তা এই গ্রন্থখানিকে ব্যবহার করে গ্রন্থ লিখেছেন। মীর মহম্মদ মাসুম লিখেছেন *তারিখ-ই-সিন্ধ* (১৬০০)। মীর তাহির মহম্মদ নিসইয়ানি লিখেছেন *তারিখ-ই-তাহিরি* (১৬৪৪-৫৫), আলি শেরকানি সিন্ধুর ওপর লিখেছেন *তুফাৎ-উল-কিরম*। সিন্ধু হলো মুসলমানদের অধিকৃত প্রথম ভারতীয় প্রদেশ, এজন্য এবিষয়ে গ্রন্থের সংখ্যা অনেক বেশি। কাশ্মীরী অভিজাত হায়দার মালিক *তারিখ-ই-কাশ্মীর* (১৫৭৮) গ্রন্থে কাশ্মীরের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস দিয়েছেন। রাজতরঙ্গিণী অনুসরণ করে তিনি এই ইতিহাস লিখেছেন। *তারিখ-ই-রশিদী* হলো মির্জা হায়দার দুঘলাতের রচিত ইতিহাস, এখানি ছিল *রাজতরঙ্গিণী*-র পরিপূরক গ্রন্থ।

খ. প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক ইতিহাস

শুধু সিন্ধু ও কাশ্মীরের নয়, অন্যান্য প্রদেশের বিস্তৃত ইতিহাস আছে। বাংলার ইতিহাস লিখেছেন গোলাম হোসেন সলিম, তাঁর গ্রন্থের নাম হলো *রিয়াজ-উস-সালাতিন*। বখতিয়ার খলজির আক্রমণ থেকে শুরু করে তিনি ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস লিখেছেন। এই গ্রন্থের অনেক ত্রুটি আছে। স্যার যদুনাথ বলেছেন যে এই গ্রন্থখানিতে তথ্য কম, তারিখ ও বর্ণনায় ত্রুটি আছে, শিথিল ঐতিহ্যের ওপর তিনি নির্ভর করেছেন, ফার্সি ভাষায় লিখিত আকরগুলি তিনি দেখেননি (This book, named the Riyaz-us-Salatin, is meagre in facts, mostly incorrect in detail and dates, and vitiated by loose traditions, as its author had no knowledge of many of the standard Persian authorities who had treated of Bengal as part of their general histories of India.)। সিকান্দর

বিন মুহম্মদ লিখেছেন *মিরাত-ই-সিকান্দরি*, মুসলমান বিজয় থেকে ১৬১১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এতে গুজরাটের ইতিহাস পাওয়া যায়। আলি মহম্মদ খানের *মিরাত-ই-আহম্মদী* (১৭৫৬-৬১) হলো গুজরাটের আরও একখানি ইতিহাস। মীর আবু তোরাব ওয়ালি লিখেছেন *তারিখ-ই-গুজরাট*। আরবি ভাষায় গুজরাটের ইতিহাস লিখেছেন আবদুল্লাহ মুহম্মদ বিন ওমর আলমাক্কি।

সৈয়দ আলি তবতবা লিখেছেন *বুরহান-ই-মাসীর*, এই গ্রন্থখানি হলো গুলবর্গা ও বিদরের বাহমনি এবং আহম্মদনগরের নিজামশাহী রাজবংশের ইতিহাস। এই গ্রন্থ রচনায় লেখক ইসামীর *ফুতু-উস-সালাতিন* থেকে অনেক তথ্য নিয়েছেন। রফিউদ্দিন সিরাজী লিখেছেন *তাজকিরাত-উল-মুলুক*—বিজাপুরের আদিলশাহী বংশের ইতিহাস। দ্বাদশ শতক থেকে আকবরের কাশ্মীর জয় পর্যন্ত ইতিহাস জানতে হলে তিনখানি সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থের ওপর নির্ভর করতে হয়। জনরাজ এধরনের একখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন, মুসলমান ঐতিহাসিকরা এগুলির ওপর নির্ভর করে ইতিহাস লিখেছেন। বিদেশীরা বিজয়নগরের ইতিহাসের জন্য অনেক উপাদান রেখে গেছেন। বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায় *আমুক্তমাল্যদা* গ্রন্থে এই রাজ্যের রাজনীতির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের সভাকবি পেদ্দন এই রাজ্যের কথা কাব্যে উল্লেখ করেছেন। বিজয়নগরের রাজপুত্র কম্পনের বিদূষী স্ত্রী গঙ্গাদেবী লিখেছেন সুন্দর একখানি ঐতিহাসিক কাব্য *মাদুরাবিজয়ম*। রাজনাথ লিখেছেন *অচ্যুতরায়ভ্যুদয়* নামে ইতিহাসাশ্রিত একখানি গ্রন্থ, বিজয়নগরের ইতিহাস রচনায় তা সহায়ক হয়। প্রাদেশিক ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান হলো চারণকবিদের গাথাগুলি। চাঁদ বরদাই লিখেছেন *পৃথ্বিরাজ রসো*, এর থেকে কিছু ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। রাজস্থানের খত্ সাহিত্য, আসামের 'বুরাঞ্জি' সাহিত্য, মহারাষ্ট্রের 'বখর' সাহিত্য, পাঞ্জাবের 'জনমসখী', ওড়িশার 'মাদলা-পঞ্জিকা' থেকে কিছু ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করা যায়। তবে এখানে জনশ্রুতি, প্রবাদ, ইতিহাস এমনভাবে মিশে আছে যে ঐতিহাসিককে খুব সাবধানে অগ্রসর হতে হয়। প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক ইতিহাসের একটি বড় আকর হলো বৈষ্ণব সাহিত্য, চৈতন্যের জীবনী সাহিত্য, সুফিদের রচিত গ্রন্থ, কবীরের দোহা ও মীরা বাঈয়ের ভক্তিগীতি। সংস্কৃতির ইতিহাস রচনায় এসব উপাদানকে অগ্রাহ্য করা যায় না। কবি আমীর খসরু তাঁর গুরু নিজামুদ্দিনের কথা লিখে গেছেন।

গ. বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী

এপর্বে ভারতে এসেছিলেন বহু বিদেশী পর্যটক। এঁদের রেখে যাওয়া বিবরণী হলো মধ্যযুগের ভারত ইতিহাসের এক প্রাথমিক উপাদান। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নামটি হলো ইবন বতুতা (১৩০৪-৭৮)। তাঁর পারিবারিক নাম হলো বতুতা, আসল নাম হলো আবু আবদুল্লাহ মহম্মদ। তিনি বহু দেশ ঘুরেছিলেন, বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয়

করেছিলেন। তিনি প্রায় চোদ্দ বছর (১৩৩৩-৪৭) ভারতে কাটিয়েছিলেন, তার মধ্যে আট বছর দিল্লিতে ছিলেন। মহম্মদ বিন তুঘলক তাঁকে কাজী ও সরকারের নানা উচ্চপদে নিযুক্ত করেন। সুলতান কোনো কারণে তাঁর ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে কারারুদ্ধ করেন, পরে তাঁকে মুক্তি দেন। সুলতান তাঁকে উচ্চপদ দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি রাজি হননি, তিনি সুলতানের দূত হিসেবে চীনে যেতে রাজি হন। বাংলা থেকে জাহাজে চড়ে সুমাত্রা ও জাভা হয়ে তিনি চীনে পৌঁছেছিলেন। ইবন বতুতার *রেহলা* (Rehla) হলো বহু ঐতিহাসিক তথ্যের আকর। সেযুগের বহু রাজনৈতিক ঘটনার কথা যেমন এতে আছে তেমনি আছে রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের কথা। ভারতের রাস্তাঘাট, পরিবহন, ডাকব্যবস্থা, গোয়েন্দা বিভাগ, সেযুগের মানুষের চিন্তাভাবনা, কৃষিজ উৎপাদন, রাজসভা, রাজসভার অনুষ্ঠান, বাণিজ্য, জাহাজ পরিবহন, সঙ্গীত ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া যায়। মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকাল সম্পর্কে তিনি হলেন তথ্যের আকর। তিনি সুলতানকে কাছ থেকে দেখেছিলেন, মধ্যযুগের এই জটিল চরিত্রের মূল্যায়নে ইবন বতুতা হলেন সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য আকর। প্রথমত, তিনি ছিলেন বিদেশী, দেশে ফিরে গিয়ে তিনি তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখেছিলেন। সুলতানের অনুগ্রহের দিকে তাকিয়ে তাঁকে লিখতে হয়নি। নির্ভয়ে মোহমুক্ত মন নিয়ে তিনি ভারতের কথা লিখেছেন। ইবন বতুতার পক্ষে ঐতিহাসিকের দায়িত্ব পালন করা সহজ হয়েছে। সত্যকে জানার ও প্রকাশ করার মতো মানসিকতা এবং সুযোগ তাঁর ছিল। অল কালকাসন্দি চতুর্দশ শতকে লিখেছিলেন *সুভ-উল-আশা* নামে একখানি গ্রন্থ। এই লেখক কখনো ভারতে আসেননি, তিনি ভারত ভ্রমণকারী বিদেশী ও ভূগোলবিদ্‌দের সরবরাহ করা তথ্যের ওপর নির্ভর করে তাঁর ইতিহাস লিখেছিলেন। পারস্যদেশীয় দূত আবদুর রজ্জাক ১৪৪২ খ্রিস্টাব্দে কালিকটের সামোরিনের (Zamorin of Calicut) রাজসভায় এসেছিলেন। এখান থেকে বিজয়নগরে এসে তিনি ঐ রাজ্যের শাসন, সমাজ এবং অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ রেখে গেছেন।

এই পর্বে কয়েকজন ইউরোপীয় পর্যটক ভারতে এসেছিলেন। ত্রয়োদশ শতকের শেষে ফ্রান্সিসক্যান সন্ন্যাসী জন ও মার্কোপোলো ভারতে এসেছিলেন। চীন থেকে পারস্য হয়ে ভেনিস যাওয়ার পথে মার্কোপোলো দক্ষিণ ভারতে এসেছিলেন। তিনি তাঁর এক সহকর্মীর কাছে তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন, সেই বর্ণনা ভ্রমণকাহিনীর রূপ নিয়েছে। তিনি দক্ষিণ ভারতের সমসাময়িক ঘটনাবলীর কথা উল্লেখ করেছেন। ১৪২০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ নিকোলো কন্টি বিজয়নগরে এসেছিলেন, তাঁর লেখায় বিজয়নগরের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। গোয়ার পর্তুগীজ গভর্নর আলবুকুয়ার্ক রাজা মানুয়েলকে যেসব চিঠিপত্র লিখেছিলেন তাঁর পুত্র সেগুলি সম্পাদনা করেছেন। গুজরাটের সুলতান এবং পর্তুগীজদের মধ্যে সম্পর্কের কথা এতে পাওয়া যায়। রুশ বণিক নিকিতিন

১৪৭০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বাহমনি রাজ্যে এসেছিলেন। ইতালীয় লুদোভিকো দ্য বার্থেমা (১৫০২-০৬), পর্তুগীজ দুয়ার্তে বারবোসা (১৫০০-১৬) এবং ডমিংগো পেজ (১৫০০-০২) বিজয়নগর পরিভ্রমণ করে তাঁদের বর্ণনা রেখে গেছেন। নুনিজ বিজয়নগরের রাজস্বব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন।

ঘ. প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান

সুলতানি যুগের লেখ ও মুদ্রা হলো এযুগের ইতিহাসের আর একটি বড় উপাদান। দক্ষিণ ভারতের রাজারা অনেক লেখ রেখে গেছেন। সুলতানদের মুদ্রার সাহায্য নিয়ে কালানুক্রম, সুলতানদের তারিখ এবং তাঁদের রাজ্যসীমা নির্ধারণ করা যায়। ওড়িশা, দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারতের হিন্দু রাজাদের লেখ থেকে শাসন ও রাজস্বব্যবস্থা সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। মুসলমান ঐতিহাসিকদের রচনার ত্রুটিগুলি এইসব লেখ থেকে সংশোধন করা যায়। এডওয়ার্ড টমাস দিল্লির পাঠান শাসকদের মুদ্রার বিস্তৃত বর্ণনা রেখেছেন। বিভিন্ন জাদুঘরে এসব মুদ্রা সংরক্ষিত আছে, এগুলি এযুগের ইতিহাসের এক নির্ভরযোগ্য উপাদান। লেনপুল মনে করেন যে মধ্যযুগের সুলতানদের সঠিক ইতিহাস তাঁদের মুদ্রায় ধরা পড়েছে। এই মুদ্রাগুলি সেইসব তথ্য সরবরাহ করে যেগুলি সাধারণত ঐতিহাসিকরা এড়িয়ে যান। সিংহাসন আরোহণের তারিখ, রাজ্যসীমা, প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক, ধর্মগুরুর সঙ্গে সম্পর্ক ইত্যাদি তথ্য মুদ্রা থেকে পাওয়া যায় (As a rule we may look upon Muhammedan coins as the surest foundation for an exact history of the dynasties by which they were issued. The coins of a Muslim ruler generally go far to establish those outward data in regard to his reign which oriental historians too often neglect or mis-state. The year of accession, the extent of his dominion, his relations with neighbouring powers and with the spiritual chief of his religion are all facts for which we may look with confidence to his coins.)। বিজয়নগর রাজ্যের রাজাদের প্যাগোডা (pagoda) এবং মাদুরা এবং বাহমনি সুলতানদের মুদ্রা প্রচুর পরিমাণে রক্ষিত হয়েছে। মাদুরা ও বাহমনি সুলতানদের মুদ্রাগুলি দিল্লির সুলতানদের ধাঁচে তৈরি হয়েছে। সুলতানি যুগের ইতিহাসের উপাদান হলো বহু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। বহু নিদর্শন যেমন প্রাসাদ, দুর্গ, মাদ্রাসা, মসজিদ, স্মৃতিসৌধ, খান্‌কা ইত্যাদি অক্ষত আছে, বহু নিদর্শন নষ্ট হয়েছে। এগুলি প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। বর্তমানের ঐতিহাসিক এগুলি নিজে দেখে সুলতানি যুগের শিল্প ও স্থাপত্যের মূল্যায়ন করেন।

মূল্যায়ন

সুলতানি যুগে সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় অধিকাংশ ইতিহাস লেখা হয়েছে। অধিকাংশ ঐতিহাসিক হয় উচ্চপদে ছিলেন অথবা সুলতানের অনুগ্রহ পেয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমীর খসরু সুলতান আলাউদ্দিন খল্‌জির অনুগ্রহ পেয়েছিলেন, জিয়াউদ্দিন বারানি ফিরুজ তুঘলকের দাক্ষিণ্য লাভ করেন। এজন্য এঁদের পক্ষে নির্ভয়ে পক্ষপাতশূন্য হয়ে ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হয়নি। এঁদের রচিত অধিকাংশ ইতিহাসে দেখা যায় ঐতিহাসিক তাঁর পৃষ্ঠপোষক সুলতানের প্রশংসা করছেন। পরবর্তীকালের অন্যান্য সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে প্রমাণ করা যায় ঐসব সুলতান একেবারে নিষ্কলঙ্ক বা ত্রুটিহীন ছিলেন না। আমীর খসরু আলাউদ্দিনের বিশ্বাসঘাতকতা বা নিষ্ঠুরতার কথা উল্লেখ করেননি। অর্থাৎ দরবারী ঐতিহাসিক নির্মোহ বা নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে ইতিহাসের ঘটনাবলী বিচার করতে পারেননি। এজন্য বর্তমানকালের ঐতিহাসিককে খুব সতর্কভাবে এইসব দরবারী ইতিহাস ব্যবহার করতে হয়। অন্যান্য উপাদান থেকে তথ্য সংগ্রহ করে মধ্যযুগের ইতিহাসের উপাদানগুলিকে পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করতে হয়।

সুলতানি যুগের ইতিহাসের আর একটি বড় ত্রুটি হলো সব ঐতিহাসিক তাঁদের বর্ণনায় রাজনীতি, সামরিক অভিযান ও প্রশাসনিক নিয়মরীতির ওপর জোর দিয়েছেন। বেশিরভাগ রচনায় পাওয়া যায় যুদ্ধের কথা, সাম্রাজ্য বিস্তার, বিদ্রোহ বা রাজনৈতিক ঘটনাবলী। দরবারের ইতিহাস পড়লে মনে হয় সেযুগে রাজদরবার ও সমর শিবিরের বাইরে বর্ণনার আর কোনো বিষয়বস্তু ছিল না। অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন, ধর্মবিশ্বাস, সাহিত্য, শিল্প-সংস্কৃতি এঁদের রচনায় স্থান পায়নি। যেটুকু সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের কথা আছে তা একান্তই গৌণ, বর্ণনায় এসব মুখ্য স্থান পায়নি। ব্যতিক্রম হলেন বারানি, তিনি অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি তথ্য সরবরাহ করেছেন। অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের পরিচয় তুলে ধরেছেন। দরবারী ঐতিহাসিকদের সীমাবদ্ধ রচনার জন্য মধ্যযুগের সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে আধুনিককালে জ্ঞান সীমিত হয়ে আছে।

দরবারী ইতিহাসের আর একটি বড় ত্রুটি হলো লেখকেরা ধর্মবিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে ধর্মনিরপেক্ষ ইতিহাস লিখতে পারেননি। এঁদের লেখায় ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেয়েছে, বর্ণনা এবং বিশ্লেষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ, উদার, সহিষ্ণু দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মধ্যযুগের ইতিহাস। ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনা স্বচ্ছ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছিল। এযুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক বারানি এই ত্রুটি থেকে মুক্ত নন। তিনি সুলতানকে হিন্দুদের বিরুদ্ধে কঠোর হতে বলেছেন। এসব ত্রুটি স্বীকার করে নিয়েও বলা যায় মধ্যযুগের ঐতিহাসিক অনুকূল পরিবেশ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। মানবজীবন বা ইতিহাসচর্চা সম্পর্কে উদার মানবিক ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠেনি। এই সীমাবদ্ধতার মধ্যে ইতিহাসচর্চা করে এক সুবিশাল

ইতিহাস সাহিত্য তাঁরা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রেখে গেছেন। তাঁদের রেখে যাওয়া প্রাথমিক উপাদানের সঙ্গে আধুনিককালে অন্যান্য উপাদান মিলিয়ে সুলতানি যুগের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হয়েছে।

সুলতানি যুগের ঐতিহাসিক

মিনহাজ-উস-সিরাজ

মিনহাজ-উস-সিরাজ হলেন দিল্লি সুলতানির আদি পর্বের ঐতিহাসিক। ইসলামের উৎপত্তি থেকে ১২৫৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি দিল্লি সুলতানির পরিচয় তুলে ধরেছেন। সমকালীন সুলতান নাসিরুদ্দিন মামুদের (১২৪৬-১২৬৫) নামানুসারে তাঁর গ্রন্থের নামকরণ করেছেন *তবাকৎ-ই-নাসিরী*। মধ্য প্রাচ্যের মার্ভ ও বল্‌খের মধ্যস্থল জুজুযানি হলো তাঁর জন্মস্থান, এজন্য তিনি মিনহাজ-উস-সিরাজ জুজুযানি নামে পরিচিত হন। তিনি এক অভিজাত পরিবারে জন্মেছিলেন, তাঁর পিতা ও পিতামহ ঘুর রাজ্যের উচ্চপদ অলঙ্কৃত করেন। তাঁর পরিবারের রাজকার্যের অভিজ্ঞতা ছিল, তাঁর পিতা ঘুর রাজ্যের কাজীর পদে ছিলেন। মিনহাজ নিজে সুপণ্ডিত ছিলেন, যুদ্ধ, কূটনীতি ও বিচারবিভাগে কাজ করার অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি দিল্লিতে আসেন, মৃত্যু পর্যন্ত তিনি দিল্লিতে ছিলেন, মাঝখানে প্রায় তিন বছর তিনি বাংলার রাজধানী লক্ষ্মণাবতীতে কাটিয়েছিলেন। তিনি দিল্লির নাসিরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, দিল্লির কাজী হিসেবেও কাজ করেছিলেন। তিনি ইমাম, খাতিব, কাজী ও সদর-ই-জাহান হিসেবে কাজ করেছিলেন। বারানি তাঁর পূর্বসূরি মিনহাজের রচনার প্রশংসা করেছেন। বারানির মতে, তিনি ছিলেন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি, ধর্মতত্ত্ববিদ, রাষ্ট্রনেতা, কূটনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদ। ভারতের বহুস্থান তিনি পরিভ্রমণ করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। লাহোর, মুলতান, উচ, গোয়ালিয়র, আমরোহা, কোল ও লক্ষ্মণাবতী তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। হিন্দুস্তানের জীবনযাত্রা ও পরিবেশ সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠেছিল।

ফ্রানজ রোজেনথাল (Franz Rosenthal) তাঁর তবাকৎকে বংশানুক্রমিক ইতিহাস বলে উল্লেখ করেছেন (dynastic historiography)। মধ্যপ্রাচ্যে মুসলিম পণ্ডিতরা যে ইতিহাস রচনার ধারার সূচনা করেছিলেন মিনহাজ তারই অনুসরণ করেছেন। ইসলামের উৎপত্তি দিয়ে ইতিহাস শুরু, ঐতিহাসিকদের সময়কালে তার শেষ। এই ইতিহাস প্রশস্তিমূলক, পৃষ্ঠপোষক সুলতানের স্তুতি ও প্রশংসা এখানে অবশ্যই ছিল (He named his work in honour of his patron Nasiruddin and adopted an eulogistic manner in writing it)। ইসলামের বিশ্বজনীন প্রেক্ষিতকে তিনি ব্যবহার করেছেন, নবীদের ইতিহাস বর্ণনা করে তিনি পারস্য, মধ্যপ্রাচ্য ও দিল্লির সুলতানদের কথা বলেছেন। মিনহাজ মোঙ্গলদের কথা সবিস্তারে বলেছেন, মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে তিনি নিজে লড়াই করেছিলেন। ইসলামের শত্রু হিসেবে তিনি মোঙ্গলদের চিত্রিত

করেছেন। কে. এ. নিজামী মনে করেন পুনরুক্তি সত্ত্বেও তাঁর ইতিহাসে কেন্দ্রীয় ঐক্য ক্ষুণ্ন হয়নি, শৃঙ্খলা ও পারম্পর্য রক্ষা করে তিনি ইতিহাস রচনা করেছেন (on the whole his treatment is systematic and basically coherent within the framework designed by him for his study)। হরবংশ মুখিয়া জানাচ্ছেন যে মিনহাজের ইতিহাসে পটভূমি এত বড় যে প্রেক্ষিতকে যথাযথভাবে তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। তিনি কুড়িটির বেশি রাজবংশের কথা বলেছেন, রাজাদের পরিচয় দিয়েছেন, নীলনদ থেকে গঙ্গা, পয়গম্বর থেকে চিঙ্গিজ খান সকলকে তাঁর ইতিহাসের বিষয়বস্তু করেছেন। বাংলায় তুর্কি অভিযানের বর্ণনা দিতেও তিনি ভুল করেননি।

মিনহাজের ইতিহাসের প্রধান বিষয় হলো গজনি, ঘুর, ইলবারি সুলতান, অভিজাত ও মোঙ্গল আক্রমণের কাহিনী। ব্যক্তির জীবনকে কেন্দ্র করে মিনহাজ ঘটনাবলীর উল্লেখ করেছেন, আর এই ঘটনাবলী হলো রাজনৈতিক ও সামরিক। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর কার্য-কারণ সম্পর্ক তাঁর ইতিহাসে নেই, আঞ্চলিক ইতিহাসের সঙ্গে বিশ্ব ইতিহাসের যোগসূত্র তিনি অন্বেষণ করেননি। বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক ও সামরিক ঘটনাবলীকে তিনি একসূত্রে বাঁধার চেষ্টা করেছেন। মিনহাজ মনে করেন, মানুষের কাজকর্মের মধ্যে পরিবর্তনের শক্তি সক্রিয় রয়েছে তবে মাঝে মাঝে তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা ও নিয়তির কথা এনেছেন। তিনি বলেছেন যে অমোঘ নিয়তির ইচ্ছায় ইলতুৎমিস হিন্দুস্তানের অধীশ্বর হয়েছেন। দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধে (১১৯২) সর্বশক্তিমান আল্লার ইচ্ছায় ঘুরি জয়ী হয়েছেন। প্রথম তরাইনের যুদ্ধে ঘুরির পরাজয়কে তিনি এড়িয়ে গেছেন (For Minhaj, causation in history lies in human volition, though at times divine will and predestination intrude into his narrative as causing historical events)।

বিচারক, পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ ঐতিহাসিক ইতিহাস রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। সেযুগে ধর্ম ও নীতিবোধ প্রচারের জন্য ইতিহাস রচনার ঐতিহ্য ছিল। তার আগে মুবারক শাহ লেখেন *শাজারা*, এর বিষয় হলো বিভিন্ন বিখ্যাত বংশের ইতিহাস, ঘুরিদের বিজয় কাহিনী। হাসান নিজামী লেখেন *তাজ-উল-মাসির*, এই গ্রন্থেও ঘুরিদের বিজয় কাহিনী পাওয়া যায়। মিনহাজ অনেক আকর থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তার ইতিহাস লিখেছিলেন। বিশ্বাসযোগ্য কাহিনী, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, জনশ্রুতি, বণিকঁদের সাক্ষ্য কোনো কিছুই তিনি বাদ দেননি (In methodology he took great pains in collecting information from trustworthy chronicles, testimony of persons, hearsay, and even unspecified sources)। তিনি সুন্দর, সহজভাবে তাঁর বক্তব্যকে উপস্থাপিত করেছেন, কোথাও জড়তা নেই, অতিশোয়োক্তি করেননি বলে অনেকে মনে করেন। তবে অপ্রিয় সত্য তিনি প্রকাশ করেননি, পৃষ্ঠপোষক বলবনের ক্ষতি হতে পারে ভেবে অনেক ঘটনা তিনি প্রকাশ করেননি (written in a plain, unaffected

style and correct language his narrative is straight forward and accurate)। তার ইতিহাস পদ্ধতির সবচেয়ে বড় ত্রুটি হলো তিনি সমকালীন সমালোচনামূলক ইতিহাস রচনা পদ্ধতির (ইসনাদ) যে চলন ছিল তা এড়িয়ে গেছেন। হাদিস রচনার যে উপাদানভিত্তিক শৃঙ্খলাবদ্ধ রচনার কথা তিনি জানতেন তারও ব্যবহার তিনি করেননি।

দিল্লি সুলতানির দুই শক্তিশালী স্তম্ভ উলেমা ও অভিজাততন্ত্রের কথা তাঁর ইতিহাসে প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি নিজে এই দুই সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি তুর্কি অভিজাততন্ত্র ও উলেমাদের কথা বলেছেন, প্রসঙ্গক্রমে দিল্লির দরবেশদের কথা এসেছে। নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, দরবেশ মিনহাজের মুখে ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা শুনতেন। তিনি তুর্কি অভিজাতদের প্রশংসা করেছেন, অতুর্কিদের তিনি নিন্দা করেছেন। তিনি খল্‌জিদের উত্থানের কথা বলেননি। রাজিয়ার শাসন দক্ষতার তিনি প্রশংসা করেছেন, কিন্তু অভিজাতদের ক্ষমতা হ্রাস করতে গিয়ে তিনি নিজের বিপদ ডেকে আনেন। বলবন তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, এজন্য বলবনের সব দুষ্কর্মকে তিনি চেপে গেছেন। সুলতান নাসিরুদ্দিনকে তিনি চিত্রিত করেছেন একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ হিসেবে, যিনি রাজকার্য বিসর্জন দিয়ে ধর্ম-কর্ম নিয়ে দিন কাটাতেন। বলবন সহ ইলতুৎমিসের চল্লিশজন অভিজাতের কথা উল্লেখ করে পঁচিশ জনের বর্ণনা দিয়েছেন। ইলতুৎমিসের কাছে 'এরা সকলেই ছিল সহানুভূতিশীল ও স্নেহের পাত্র। এরা সকলেই তাঁকে একজন স্নেহময় ও দয়ালু পিতা হিসেবে দেখে থাকে।' সেযুগে কুতুবুদ্দিন হাসান ঘুরি ছিলেন একজন বিখ্যাত অভিজাত। বলবন ষড়যন্ত্র করে প্রকাশ্য দরবারে তাকে হত্যা করেন, মিনহাজ এই তথ্য গোপন করে গেছেন কারণ বলবন ছিলেন তাঁর পৃষ্ঠপোষক। ইলতুৎমিস তাঁর সন্তানদের মধ্যে কন্যাকে যে শাসনের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব বলে মনে করতেন তার বর্ণনা মিনহাজের গ্রন্থে পাওয়া যায়।

সেই যুগে উলেমারা ছিল শিক্ষিত এবং রাজনীতিতে অত্যন্ত প্রভাবশালী গোষ্ঠী। দিল্লি সুলতানির গোড়ার দিকে মধ্য এশিয়ার বহু বিদ্বান ও ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি দিল্লিতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মিনহাজ এদের কথা উল্লেখ করেছেন। উলেমারা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিল, মিনহাজ নিজেও রাজনীতি করতেন। সন্ত দরবেশদের অনেকে রাজনীতি করতেন না, আধ্যাত্মিক সাধনা নিয়ে মগ্ন হয়ে থাকতেন। এযুগে মৌলানা নুর তুর্ক ছিলেন একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয়, নির্লোভ, সজ্জন দরবেশ। তিনি উলেমাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ পছন্দ করতেন না। তাদের ভোগবিলাস, আড়ম্বরপ্রিয়তা ও পার্থিব সম্পদের প্রতি আসক্তি নুর তুর্কের সমালোচনার বিষয় হয়। এই অপরাধের জন্য মিনহাজ এই সর্বজনশ্রদ্ধেয় দরবেশের বিরুদ্ধে কুৎসা ও গুজব ছড়াতে দ্বিধা করেননি। মিনহাজের রচনার আরও ত্রুটি আছে। তিনি দেখিয়েছেন যে তুর্কিরা বিনা আয়াসে উত্তর ভারত জয় করেছিল, ভারতীয় প্রতিরোধের কথা তিনি

উল্লেখ করেননি। তুর্কিরা এদেশ জয় করে কী ধরনের শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল তার উল্লেখ নেই। অন্যান্য সূত্র থেকে জানা যায় যে চিঙ্গিজ খান মধ্য এশিয়ার পলাতক খাওয়ারিজম শাহ জালালুদ্দিন মঙ্গবর্নীর প্রশংসা করেছিলেন। মিনহাজের গ্রন্থে এর উল্লেখ নেই। ইলতুৎমিস সম্পর্কে তিনি অনেক কিছু জানতেন কিন্তু সুলতানকে তাঁর দোষ-গুণসহ সজীব, জীবন্ত করে চিত্রিত করতে পারেননি।

মিনহাজ মোঙ্গল আক্রমণ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ রেখে গেছেন। মোঙ্গলদের সঙ্গে তিনি নিজে যুদ্ধ করেছিলেন, মোঙ্গল আক্রমণ ইসলামের পক্ষে ছিল অভিশাপস্বরূপ। তবু তিনি চিঙ্গিজ খানের যে চিত্র এঁকেছেন তা তাঁর সূক্ষ্ম বিচারবোধ ও দক্ষতার পরিচয় বহন করে। চিঙ্গিজ খান ছিলেন নৃশংস ও নিষ্ঠুর, নির্বিচারে হত্যা করতেন, অথচ তাঁর মধ্যে মানবিক গুণের অভাব ছিল না। তিনি ছিলেন দয়ালু, সত্যবাদী, প্রতিশ্রুতি দিলে তা পালন করার চেষ্টা করতেন। সৈন্য শিবিরে কঠোরভাবে শৃঙ্খলা রক্ষা করতেন, নারীজাতির সম্মান করতেন, তিনি ঈশ্বর বিশ্বাসীও ছিলেন। তার এই চরিত্রচিত্রণ অনেকখানি বাস্তবসম্মত বলে মনে হয়। ইসলামের পরম শত্রুর এধরনের চিত্রণ বেশ বিস্ময়কর বলেই মনে হয়। মিনহাজ জীবনের বেশিরভাগ সময় ভারতবর্ষে কাটিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর লেখায় ভারতীয়দের কথা খুব কম পাওয়া যায়। রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের বাইরে তিনি জীবনের সন্ধান করেননি। আলবেরুনির মতো সর্বদর্শী দৃষ্টি তাঁর ছিল না, ভারতের সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর কোনো কৌতূহল ছিল না। মুসলিম রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও উলেমাদের নিয়ে গঠিত জগতের মধ্যে তিনি ঘোরাফেরা করেছেন।

বলবন মিনহাজ সম্পর্কে বলেছেন যে তিনি ছিলেন নির্ভীক, কিন্তু তাঁর লেখায় এই নির্ভিকতা ও নিরপেক্ষতার পরিচয় নেই। তিনি অনেক সত্য চেপে গেছেন, বলবনের দোষগুলিকে এড়িয়ে গেছেন, সমকালীন অন্যান্য ঐতিহাসিকরা সেগুলি প্রকাশ করে দিয়েছেন। বিদ্বান সমালোচক তাঁর গ্রন্থের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন যে তিনি শুধু স্তাবক নন (he rarely indulges in highflown eulogy), সমকালীন বহু তথ্য তিনি সরবরাহ করেছেন। দিল্লি সুলতানির তুর্কি অভিজাততন্ত্র ও উলেমাদের অন্তরঙ্গ পরিচয় আছে তাঁর তবাকতে। তাঁর লেখার একটি বড় ত্রুটি হলো তিনি সবকিছু অতিসংক্ষেপে সেরেছেন (he is brief to a fault)। তার বর্ণনা এত সংক্ষিপ্ত যে অনেকক্ষেত্রে তা কাজে লাগে না। তার বিশ্বজনীন ইতিহাসের প্রেক্ষিত বড়ই দুর্বল (The universal history of Minhaj does not reveal any broad historical perspective)। দিল্লি সুলতানির প্রশাসনিক কাঠামো, ইক্‌তা ব্যবস্থা, মুদ্রা ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক পরিবেশ, ইলতুৎমিসের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের কথা মিনহাজের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তবে যেটুকু পাওয়া যায় তার মূল্যও নেহাত কম নয়।

জিয়াউদ্দিন বারানি

জিয়াউদ্দিন বারানি হলেন সুলতানি যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক। ইতিহাসের বিষয়বস্তু ও ইতিহাস দর্শন সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট ধারণা ছিল। ইতিহাসের বিষয়বস্তু সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে ইতিহাস রাজা ও অভিজাততন্ত্রের পরিচয় দেয়, আইন, শাসন ও সরকারি নিয়মবিধির কথা জানায়, শাসকরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে পারেন। ইতিহাস সত্যানুসন্ধানী, সত্যকে প্রকাশ করা হলো ইতিহাসের ধর্ম (true and correct)। *তারিখ-ই-ফিরুজশাহীর* মুখবন্ধে বারানি তাঁর ইতিহাস দর্শন ব্যাখ্যা করেছেন। মধ্যযুগের উলেমা সম্প্রদায়ভুক্ত ঐতিহাসিক কোরানকে সব জ্ঞানের উৎস বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। কোরানে বলা হয়েছে যে শক্তিশালী জাতি ও সভ্যতার ইতিহাস পাঠ করে মানুষ শিক্ষালাভ করে। মধ্যযুগে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল ধর্মকেন্দ্রিক, বারানি ইতিহাস রচনায় ধর্মের ভাষা, ভঙ্গি ও বাগধারা ব্যবহার করেছেন। বারানির দৃষ্টিতে ইতিহাস হলো মানুষের সামগ্রিক জীবনের উত্থান-পতন (a panorama of human activity), অতীতের কাহিনী থেকে শিক্ষা নিয়ে মানুষ বর্তমানের ভুল-ভ্রান্তি এড়াতে পারে। ঐতিহাসিক লক্ষ করেন সাম্রাজ্য ও জাতির কেন উত্থান-পতন ঘটে (Process of historical change), পরিবর্তন হয়।

ইতিহাস থেকে মানুষ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে (history gives man a rare insight into human affairs), মানুষ ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য, শত্রু-মিত্র বিচার করতে শেখে। ইতিহাস পাঠ করে মানুষ বাস্তববাদী হয়ে ওঠে কারণ সে অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা লাভ করে। শাসক ইতিহাস থেকে পান সাহস, বিপদের সম্মুখীন হওয়ার অভিজ্ঞতা, অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তিনি রাষ্ট্রব্যবস্থার দুর্বলতা চিহ্নিত করেন ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেন। তিনি উপলব্ধি করেন কীভাবে শুভ থেকে শুভের সৃষ্টি হয়, অশুভ থেকে অশুভের। বারানি লিখেছেন যে মহাপুরুষদের জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত থেকে সাধারণ মানুষ জীবনযুদ্ধে লড়াই করার জোর পায়। বারানির ইতিহাস দর্শনের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি লিখেছেন যে ইতিহাসের ভিত্তি হলো সত্য (The foundation of history rests on truthfulness)। ঐতিহাসিক সঠিকভাবে সত্যকে প্রকাশ করবেন, অতিরঞ্জন ও অতিশয়োক্তি হলো কবির কাজ। ঐতিহাসিক মিথ্যা কথা লিখলে তার ইতিহাস পরিত্যক্ত হবে, ঐতিহাসিক মর্যাদা হারাবেন। ধর্মভীরু মোল্লা জিয়াউদ্দিন বারানি আরও জানিয়েছেন ঐতিহাসিক মিথ্যা লিখলে পরকালে তার মুক্তি হবে না। বারানির মতে, ঐতিহাসিকের দায়বদ্ধতা জাগতিক ও পারলৌকিক। বারানির ইতিহাস চিন্তার দ্বিতীয় প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ইতিহাসের সঙ্গে হাদিসের নিকট সম্বন্ধ স্থাপন। তাঁর এই ধারণার জন্য অধ্যাপক পিটার হার্ডি বলেছেন যে বারানির ইতিহাস চিন্তা ছিল ধর্ম নির্ভর (Barani's historical approach was theologically

conditioned)। অধ্যাপক কে. এ. নিজামী মনে করেন যে বারানির ইতিহাস চিন্তা ধর্ম-নির্ভর ছিল না। ইতিহাসচর্চা ও হাদিস চর্চার পদ্ধতিগত মিলের জন্য বারানি হাদিসের কথা উল্লেখ করেছেন। বারানি ঠিক এই কারণে ইতিহাস ও হাদিসকে যমজ বিষয় বলেছেন, দুয়ের রচনা পদ্ধতি হলো একরকমের। সমকালীন মানুষের সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে হাদিস রচিত হয়েছে, পদ্ধতিগতভাবে ইতিহাসও তাই।

ঐতিহাসিক হিসেবে বারানির মনোজগৎ ছিল জটিলতায় পূর্ণ, মাঝে মাঝে তার পরিবর্তন ঘটেছে। এক বিশেষ ঐতিহাসিক পটভূমিতে, সামাজিক পরিবেশে তাঁর মনোলোক ও চিন্তার জগৎ উন্মোচিত হয়েছে। বারানি এক অভিজাত পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁর পরিবার তিন প্রজন্ম ধরে ইলবারি, খল্‌জি ও তুঘলকদের অধীনে কর্মরত ছিল। তাঁর মাতামহ সিপাহশালার হুসামুদ্দিন বলবনের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন, তিনি 'ভকিল-ই-দার বরবক সুলতানি' হিসেবে কাজ করতেন, বলবন তাঁকে পছন্দ করতেন, লক্ষ্মণাবতীর গুরুত্বপূর্ণ শাহানা পদে তাকে নিয়োগ করেন। বারানির পিতা মুবায়িদ-উল-মুলক আরকালি খানের নায়েব ছিলেন, দিল্লির অভিজাত মহল কিলুঘরিতে প্রাসাদোপম বাড়িতে বাস করতেন। তাঁর পিতৃব্য আলা-উল-মুলক সুলতান আলাউদ্দিনের বিশ্বাসভাজন ছিলেন। জালালুদ্দিনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে তিনি আলাউদ্দিনের সহকারী ছিলেন। তিনি কারা ও অযোধ্যার গভর্নর ও পরে দিল্লির কোতায়াল পদে নিযুক্ত হন। আলাউদ্দিন সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতেন। বারানির পিতা পরে বরনের নায়েব ও খাওয়াজগি পদে ছিলেন। মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে বারানি সভাসদ হন, সতেরো বছর তিনি নাদিম ছিলেন। এটি ছিল একজন পণ্ডিত, বুদ্ধিজীবীর পদ, সুলতান তাঁর সঙ্গে প্রায়ই পরামর্শ করতেন, তাঁর ইতিহাস জ্ঞানের প্রশংসা করতেন।

ফিরুজ তুঘলকের শাসনের শুরুতে বারানির ভাগ্যবিপর্যয় ঘটেছিল, তিনি সমস্ত সুযোগ-সুবিধা, নিষ্কর ভূমি, পেনসন সব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যান। রাজবংশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শাসকগোষ্ঠীর পরিবর্তন হতো। বারানি নতুন শাসকগোষ্ঠীর আস্থা হারিয়েছিলেন। বারানির পরিবার শুধু রাজসভা নয় সেযুগের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা করত। আলাউদ্দিনের শাসনকালের ছেচল্লিশ জন বিদ্বান ব্যক্তির তিনি নাম করেছেন যাঁরা সকলে তাঁর শিক্ষক ছিলেন। তিনি বলেছেন যে এঁদের মধ্যে কয়েকজন ছিল গজ্জালি ও রাজির মতো পণ্ডিত। সে যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী, কবি, ঐতিহাসিক আমীর খসরু ও আমীর হাসান সিজ্জি তাঁর বন্ধু ছিলেন। দিল্লির বিদ্বৎ সমাজে বারানি সমাদর পেতেন কারণ তাঁর আচার-ব্যবহার ছিল মার্জিত, ছিল বুদ্ধিদীপ্ত রসবোধ ও সামাজিক সম্মান। পারিবারিক অবস্থা এবং রাজদরবারের লোক হওয়ার জন্য তিনি ছিলেন অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর তেমন

মেলামেশা ছিল না। শেখ নিজামুদ্দিন আউলিয়ার 'খানকায়' তিনি সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন, সেটা ছিল তাঁর জীবনের শেষ পর্ব, মনের শান্তি কামনায় তিনি খানকায় যেতেন।

বারানি ছিলেন অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক, দরবারের সভাসদ, তার সামাজিক অবস্থান তার দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করে দিয়েছিল। তিনি রাজপরিবার ও অভিজাতদের ছাড়া সমাজের আর কোনো শ্রেণীকে ভালোভাবে জানতেন না। তাঁর ইতিহাস চিন্তার ওপর পারস্যের প্রভাব লক্ষ করা যায়, তিনি মনে করেন পারস্যের সাসানীয় শাসকরা হলেন আদর্শ শাসক। তিনি সিংহাসনের পাশে বসে শুধু রাজপরিবার ও শাসকশ্রেণীকে দেখেছিলেন, তাদের কথা বলেছেন। ইতিহাস হলো এদের কথা, শাসন হলো এদের একচেটিয়া অধিকার, রাজবংশ ও অভিজাততন্ত্রের বাইরে মহৎ কিছু তিনি লক্ষ করেননি। ইসলামের পয়গম্বর হলেন সুলতান-ই-পয়গম্বরান, পয়গম্বরদের সুলতান। তাঁর গুরু নিজামুদ্দিন আউলিয়াকে তিনি পছন্দ করতেন কারণ হাজার হাজার দর্শনার্থী তাঁর কাছে আসত। শেষজীবনে যখন নিজামুদ্দিনের খানকার এককোণে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন তখনো তিনি অভিজাততান্ত্রিক মনোভাব থেকে মুক্ত হতে পারেননি। ক্ষমতার শেষ রেশটুকু তখনো তাঁকে প্রভাবিত করে রেখেছে। তিনি তাঁর দুর্ভাগ্যকে প্রশান্তচিত্তে গ্রহণ করতে পারেননি, তিনি মানসিকভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলেন। তার বুদ্ধিদীপ্ত রসালাপ ব্যঙ্গে পরিণতি পায়, ঐশ্বর্য থেকে তিনি দুর্দশাগ্রস্ত হতাশ জীবনে নিক্ষিপ্ত হন। তাঁর চিন্তা ও মননের ওপর এর প্রভাব পড়েছিল। অভিজাত মানসিকতা থেকে মুক্ত হলে তিনি সুলতানদের ইতিহাস না লিখে চিশ্‌তি সম্প্রদায়ের ইতিহাস লিখতেন।

ভগ্ন, দুর্দশা ও হতাশাগ্রস্ত জীবনে বারানি লিখলেন *তারিখ-ই-ফিরুজশাহী*, *ফতোয়া-ই-জাহান্দারি* ও *হসরতনামা*। প্রত্যেকটি লেখার মধ্যে ফুটে উঠেছে হতাশাগ্রস্ত ব্যক্তিত্বের মনোজগৎ। পয়গম্বর মহম্মদের জীবনী *সানা-ই-মহম্মদি* লিখেছিলেন এমন এক সময়ে যখন তিনি জানতেন না যে আগামীকাল তিনি বেঁচে থাকবেন (he was not hopeful of being alive till the morning)। পয়গম্বরের আশীর্বাদ লাভের জন্য তিনি গ্রন্থখানি রচনা করেন। চরম দুঃখের মধ্যেও বারানির মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেনি। জন্ম ও মৃত্যুতে তিনি ছিলেন অভিজাত, অভিজাততন্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি জগৎ ও জীবনকে দেখেছিলেন।

বারানির চেতনায় সবসময় অভিজাততান্ত্রিক মনোভাব সক্রিয় ছিল, নিম্নবর্গের মানুষের প্রতি তাঁর দৃষ্টি স্বচ্ছ ছিল বলা যায় না। তাঁর এই শ্রেয়মন্যতাবোধ এসেছিল রাজনীতি থেকে, সামাজিক বা ধর্মীয় অবস্থা থেকে নয়। মহম্মদ বিন তুঘলক লাধধা, নাজবা, মানকা, শেখ বাবু নায়েক প্রভৃতি সাধারণ মানুষকে উচ্চপদে বসালেন। বারানি

অনুভব করলেন যে পুরনো অভিজাততন্ত্র শীঘ্রই ক্ষমতা ও অধিকার হারাবে। মহম্মদ বিন তুঘলক বিদ্বান মানুষ ছিলেন, সাহিত্য ও ইতিহাস ভালোবাসতেন, বারানি তাঁর রাজসভায় স্থান পেয়েছিলেন। কিন্তু বারানি সেই পরিবেশে অস্বস্তি বোধ করেন কারণ সাধারণ, মধ্যবিত্তরা অভিজাততন্ত্রে উন্নীত হয়েছিল। মহম্মদ বিন তুঘলকের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তিনি দরবারের পদ হারালেন। তাঁর আকস্মিকভাবে পতন হলো (he slept a powerful amir but rose up a poverty-stricken pauper)। ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণ হলো মহম্মদ সিন্ধুদেশে আকস্মিকভাবে মারা গেলে দিল্লিতে উজির খাজা জাহান একজন শিশুকে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। সিন্ধুতে শেখ নাসিরুদ্দিন চিরাগ ও অন্যান্যরা ফিরুজকে সিংহাসনে বসিয়েছিল। বারানি খাজা জাহানকে সমর্থন করে নিজের ভাগ্যবিপর্যয় ডেকে আনেন।

খাজা জাহান ও তার অনুচররা নতুন শাসক গোষ্ঠীর হাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন। ফিরুজ তুঘলকের হস্তক্ষেপের জন্য বারানির জীবন রক্ষা পায় কিন্তু দরবারের পদ, সম্পত্তি, মর্যাদা সব হারিয়ে ছিলেন। তিনি চরম দুঃখের দিনে লিখলেন যে 'ঈশ্বর জীবনের শুরুতে আমাকে অনেক দিয়েছেন, শেষে দিয়েছেন অসম্মান'। তিন প্রজন্মের আমির পরিবারের সদস্য, নিজে নাদিম বারানি এখন সর্বস্বান্ত হলেন। দুঃসময়ে বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন সকলে তাকে পরিত্যাগ করেছিল। রাজনীতিতে খান-ই-জাহান মকবুল ছিলেন অত্যন্ত পরাক্রমশালী, ভারতীয় বংশোদ্ভূত মকবুল বিদেশী অভিজাতদের সরিয়ে ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেন। এজন্য বারানি মহম্মদ বিন তুঘলকের নিয়োগ নীতিকে দায়ী করেন। তিনি নিম্নবর্গের মানুষকে উচ্চপদে বসিয়ে পুরনো অভিজাততন্ত্রের দুর্ভাগ্য ডেকে আনেন। তিনি লিখলেন যে মহম্মদ বিন তুঘলকের পরামর্শদাতা দার্শনিকরা এজন্য দায়ী। নিম্নবর্গের মানুষকে শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়, স্থিতিশীলতার স্বার্থে দর্শনচর্চা বন্ধ হওয়া দরকার। বারানির দৃষ্টি আচ্ছন্ন, সবরকম সংস্কার তার চিন্তাশক্তিকে পঙ্গু করে ফেলেছে, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তার স্বাভাবিক চিন্তা নেই, সাধারণ মানুষ, নিম্নবর্গের মানুষ ও বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে তিনি বিষোদ্‌গার করেছেন (he begins to hate the low-born and philosophers)। বারানির এই অন্ধ আবেগের সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই, নিজের হতাশাগ্রস্ত জীবনের জটিলতা থেকে তিনি এমন মনোভাব গড়ে তুলেছিলেন।

ইসলাম মানুষে-মানুষে প্রভেদ মানে না, এজন্য তিনি ধার্মিক ও অধার্মিকদের কথা তুলেছেন (faith and infidelity)। তিনি মনে করেন যে ধর্মান্তরিত মুসলমানরা খাঁটি মুসলমান নয়, ফতোয়া-ই-জাহান্দারিতে এইসব ধর্মান্তরিতদের স্ববিরোধিতা তিনি উল্লেখ করেছেন। নিম্নবর্গ ও উচ্চবর্গের মধ্যে পার্থক্য হলো জাগতিক, পারলৌকিক নয়, তিনি কোনো ধর্মশাস্ত্রের সমর্থন চাননি। বারানির মনোজগতের সঙ্গে তাঁর

ইতিহাসচর্চার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। তিনি নিজের জীবনের উত্থান-পতনের কারণ অনুসন্ধান করেছেন, তাঁর রচনায় মন্ময়তার (subjectivism) প্রতিফলন ঘটেছে। ঠিক এই ধরনের উত্থান-পতন তিনি সুলতান ও অভিজাতদের জীবনেও লক্ষ করেছেন। জালালুদ্দিন খল্‌জির সভার বর্ণনা দিতে গিয়ে বারানি নিজের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করেছেন। বলবনের শাসনের পরিচয় দিতে গিয়ে তার অদৃষ্ট নিয়ে হাহুতাশ করেছেন (The despair that is in my heart flows in tears of blood from my eyes)। এরকম মানসিক অবস্থায় ইতিহাস লিখতে বসে তিনি মহম্মদ বিন তুঘলকের সব কার্যাবলীর নিন্দা করেছেন। কিন্তু মহম্মদের মৃত্যু তাঁর কাছে বেদনাদায়ক কারণ তিনি তারপর সবকিছু হারিয়েছেন, তার মনের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। তিনি মহম্মদকে বলছেন সন্ত, পয়গম্বর, আবার পরমুহূর্তে বলছেন নিমরোদ এবং ফারাও। সুলতান মহম্মদ বৈপরীত্যের মিশ্রণ নন, দ্বিধাগ্রস্ত নন, ঐতিহাসিক নিজে হলেন একজন খণ্ডিত ব্যক্তিত্ব (It was not so much the Sultan who was a mass of inconsistencies or a mixture of opposites but the historian himself was a miserably torn personality)। সুলতানের মূল্যায়নে তার জটিল মনস্তত্ত্বের প্রতিফলন ঘটেছিল (He projected his own psychological states in his assessment of the Sultan's character)। বারানি তাঁর নিয়োগনীতি, যুক্তিবাদী মানসিকতা ইত্যাদির সমালোচনা করেছেন। আবার তাঁর অনুগ্রহ পেয়েছিলেন এজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। বর্তমান অবস্থার কথা ভেবে তিনি সুলতানকে প্রশংসা করেছেন, অতীতের কথা যখন আলোচনা করেছেন সুলতান তাঁর নিন্দাভাজন হয়েছেন (When Barani is in his present, he has love for Muhammad Bin Tughluq ; when he is in his past, he has nothing but hatred for him)। ঐতিহাসিকের অনুভূতি ও মনোভাবের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে, তাঁর মনোজগতের এই টানাপোড়ন, উত্থানপতন অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা ছিল।

মহম্মদ বিন তুঘলকের সঙ্গে ঐতিহাসিকের মৌলিক পার্থক্য ছিল। রাষ্ট্রচিন্তায় সুলতান ছিলেন অগ্রগামী, বিপ্লবী, চিন্তায় যুক্তিবাদী। বারানি রাজনীতিতে ছিলেন রক্ষণশীল এবং ধর্মের ক্ষেত্রে ঐতিহ্যানুসারী (a reactionary in politics and a blind follower of tradition in religious matters)। পার্থক্য সত্ত্বেও বারানি মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালের পূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন। ইসামী ও ইবন বতুতা সুলতানের রাজত্বকালের অনেক তথ্য সরবরাহ করেছেন, কিন্তু বারানির ব্যাখ্যা ও বর্ণনা সুলতানের সর্বাঙ্গীণ পরিচয় তুলে ধরেছে। ইসামী বা বতুতা তার ধারে কাছে যেতে পারেননি। ইবন বতুতার মহম্মদ একজন বিদ্বান ব্যক্তি, দয়ালু কিন্তু অত্যাচারী। ইসমীর সুলতান অধার্মিক, বিপথচালিত, আবেগপ্রবণ এবং উৎপীড়ক। তারিখ-ই-

ফিরুজশাহীতে প্রকৃত, সজীব ব্যক্তিত্বের মহম্মদকে পাওয়া যায়। বারানি সুলতান সম্পর্কে কঠোর, তিক্ত, অন্যায্য অনেক মন্তব্য করেছেন, এসবের মধ্য দিয়ে সুলতানের ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। বারানি তাঁর মন্ময় চিন্তাকে তথ্যের ওপর আরোপ করে কোনো পূর্ব-নির্ধারিত বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেননি। ব্যক্তির চরিত্রায়ণে তাঁর মন্ময় চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে। বারানির লেখার একটি গুণ হলো তিনি অর্থনৈতিক জীবনের ওপর প্রচুর তথ্য সরবরাহ করেছেন, আর কোনো মধ্যযুগের ঐতিহাসিক অর্থনৈতিক তথ্যের সরবরাহে এত উৎসাহ দেখাননি। আলাউদ্দিনের বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা তাঁর লেখাতে পাওয়া যায়।

তাঁর জীবনে উত্থানপতন, ঘাত-প্রতিঘাত ছিল, তা সত্ত্বেও বারানি ঐতিহাসিকের সততা রক্ষা করে চলেছেন (a fairly honest historian)। তিনি কোনো তথ্য বা ঘটনা গোপন করেননি, বিকৃত করেননি, তার নিজের বা পরিবারের কাছে অস্বস্তিকর তথ্য নৈর্ব্যক্তিকভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে মহম্মদ সম্পর্কে সত্য কথা বলার সাহস তার নেই। আলাউদ্দিন খল্‌জির ষড়যন্ত্রকে তিনি নিন্দা করেছেন, নিজের পিতৃব্যকে রেহাই দেননি। তাঁর মনের মুকুরে যা প্রতিফলিত হয়েছে লিখে গেছেন, তার বৃদ্ধ মন অনেক ঘটনাকে ঠিক ঠিক লিপিবদ্ধ করতে পারেনি, ঘটনার পারম্পর্য রক্ষিত হয়নি। তাঁর রচিত ইতিহাসের কালানুক্রম কাঠামোটি দুর্বল, এটি হলো তার লেখার প্রধান ত্রুটি (a weak chronological framework)। তিনি পাঠককে সব ঘটনা জানাতে চাননি, যুগের ধর্ম ও প্রাণশক্তির সঙ্গে পরিচয় করাতে চেয়েছেন। অন্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে বারানির ইতিহাস বুঝতে হয়। মিনহাজ ইলতুৎমিসের জীবন ও সাধনার পরিচয় দিয়েছেন (তবাকৎ-ই-নাসিরি)। কিন্তু তাঁর বর্ণনায় প্রাণ নেই, সামরিক ঘটনাবলীর দীর্ঘ বর্ণনা আছে, পাঠক ইলতুৎমিসের সমস্যা ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় পায় না। বারানি বলবনের প্রসঙ্গে ইলতুৎমিসের কথা উল্লেখ করেছেন, মাত্রা দু-একটি বাক্যে তিনি তাকে সজীব, প্রাণবন্ত করে তুলেছেন।

বারানি তাঁর চরিত্রদের মুখে সংলাপ বসিয়ে চরিত্রকে সজীব করে তুলেছেন। ইলতুৎমিসের সংলাপ থেকে অভিজাতদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অনুধাবন করা যায়। বিদ্বান ও ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে সুলতানের সম্পর্ক তিনি যথাযথভাবে তুলে ধরেছেন, যুগের ধারাটি প্রকাশিত হয়েছে। সমকালীন ঐতিহাসিকদের সঙ্গে তুলনায় বারানি মধ্যযুগের জীবনধারাটি অনেক বেশি বুঝেছিলেন। মিনহাজের ইতিহাস তথ্যসমৃদ্ধ কিন্তু মোটেই আকর্ষণীয় নয় (dull, drab, insipid)। তিনি সমাজ ও অর্থনীতির কথা বলেননি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের কথা জানা যায় না। বারানি খল্‌জি সাম্রাজ্যবাদের সামরিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দিকগুলি তুলে ধরেছেন। আলাউদ্দিনের যুদ্ধগুলির বর্ণনায় কিছু ভুলভ্রান্তি ঢুকে পড়েছে, কিন্তু যুগের মূল সুরটি

তিনি ঠিকমত তুলে ধরেছেন। এমনকি কবি, দার্শনিক আমীর খসরু তাঁর কাছাকাছি আসতে পারেননি।

অধ্যাপক পিটার হার্ডি বলেছেন বারানির ইতিহাস হলো ধর্মশাস্ত্রের অঙ্গ, অতীত হল শুভ-অশুভের দ্বন্দ্বক্ষেত্র। অধ্যাপক নিজামী তাঁর সঙ্গে সহমত হতে পারেননি। তিনি জানিয়েছেন যে বারানির ইতিহাস হলো রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বর্ণনা, তিনি বলবনের রাষ্ট্রনীতির ব্যাখ্যা করেছেন, অভিজাতদের কার্যকলাপের বর্ণনা দিয়েছেন। শাসনের সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা করেছেন। গোঁড়া রক্ষণশীল বারানি স্বীকার করেছেন যে ভারতে শরিয়ত আইন প্রয়োগ করা যাবে না, এখানে রাষ্ট্রীয় আইন 'জাবাবিত' প্রয়োগ করতে হবে। তিনি নিজে একজন আলিম ছিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক বাস্তবতাকে অস্বীকার করেননি। ফতোয়া-ই-জাহান্দারি তিনি লিখেছিলেন ফিরুজ শাহের রাজত্বকালে। ফিরুজ ধর্মভীরু শাসক ছিলেন, তা সত্ত্বেও বারানি বাস্তব রাজনৈতিক জীবনকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। অধ্যাপক মহম্মদ হাবিব লিখেছেন যে বারানি শুধু ইতিহাস লেখেননি, ইতিহাসকে তিনি সমাজবিজ্ঞান হিসেবে দেখে অভিজ্ঞতার আলোকে ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। ধর্ম ও ঐতিহ্যকে গুরুত্ব দেননি।

বারানি তাঁর গ্রন্থে বলবন থেকে ফিরুজশাহ্ তুঘলক পর্যন্ত ন'জন শাসকের পরিচয় দিয়েছেন। মাতামহ হুসামুদ্দিনের কাছ থেকে তিনি বলবন সম্পর্কে কিছু তথ্য পেয়েছিলেন। বলবনের দবির ছিলেন বারানির বন্ধু আমির হাসানের পরিচিত ব্যক্তি। হাসান ও খসরুর কাছ থেকে তিনি প্রিন্স মহম্মদ সম্পর্কে বেশকিছু জেনেছিলেন। জালালুদ্দিন থেকে ফিরুজ তুঘলক পর্যন্ত তিনি নিজের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভর করেন। আলাউদ্দিনের সামরিক অভিযান সম্পর্কে তিনি বিস্তৃত বিবরণ দেননি কারণ তাজউদ্দিন এসম্পর্কে লিখেছিলেন, কোনো বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করা ছিল তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। প্রথম জীবনে সমকালীন প্রায় সব সাহিত্য তিনি পাঠ করেছিলেন। বারানি সম্ভবত নোট তৈরি করে ইতিহাস লিখতে বসেননি। অধ্যাপক মহম্মদ হাবিব জানিয়েছেন যে বারানি স্মৃতি, কাগজ, কালি ও কলম ছাড়া আর কোনো উপাদান ব্যবহার করেননি। তবে উচ্চপদস্থ অফিসার, গভর্নর ইত্যাদির যে তালিকা তিনি দিয়েছেন নোট ছাড়া তা দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাঁর দুখানি গ্রন্থের অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য থেকে বলা যায় যে তারিখ-ই-ফিরুজশাহী তিনি আগে রচনা করেন, জাহান্দারি পরের রচনা। ঐতিহাসিক দার্শনিক হয়েছেন পরের গ্রন্থে।

নিজের নামকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তিনি তারিখ লিখেছিলেন। সম্ভবত এই গ্রন্থ লিখে তিনি সুলতান ফিরুজশাহের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। ফিরুজশাহ্ মহম্মদকে শ্রদ্ধা করতেন, বারানি তাকে নিন্দা করেছেন, ফারাওয়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সম্ভবত ফিরুজ আন্তরকিভাবে মহম্মদকে শ্রদ্ধা করতেন না, এজন্য

বারানি তাঁর সম্পর্কে এরকমের মন্তব্য করতে সাহস করেন। তিনি হয়ত দুটো ইতিহাস লিখতে চেয়েছিলেন। প্রথমটি পূর্ববর্তী শাসকদের নিয়ে, দ্বিতীয়টি ফিরুজশাহ্‌কে নিয়ে। তারিখের দুই অংশের মধ্যে পার্থক্য আছে, দ্বিতীয় অংশে তিনি তোষামোদকারী। তিনি ফিরুজের মধ্যে দেবত্বের চিহ্ন দেখেছেন (He finds divine attribute in the person of Firuz.), তাঁর রাজসভা আল্লার দরবারের মতো। ফিরুজের প্রশংসা করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি খাজা জাহানকে নিন্দা করেছেন কারণ এই ব্যক্তি তার সব দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী ছিলেন। বারানি এখানে ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারেননি, খান-ই-জাহান মকবুলের ক্ষেত্রেও তার নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। হিন্দুদের প্রতি তিনি অসহিষ্ণুতা দেখিয়েছেন, তাঁর শিক্ষা ও পরিবেশ এজন্য দায়ী ছিল। সেই যুগও ছিল ধর্মীয় আবেগ ও সংস্কারে আচ্ছন্ন, উদার, মানবিক ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠেনি। নিজামী বলেছেন যে বারানিকে বুঝতে হলে তার ভাষা, আঙ্গিক, ভাবধারা সব বুঝতে হবে। হিন্দু শব্দ ব্যবহার করলেও তার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ছিল না, তুর্কি শব্দ ব্যবহার করে তিনি জাতি বোঝাতে চাননি। যখন তিনি বলেছেন মহম্মদ কর বাড়িয়েছিলেন এক থেকে দশ তিনি গাণিতিক হিসেব দেননি। তারিখ-ই-ফিরুজশাহী বুঝতে হলে আগে ঐতিহাসিককে ভালোভাবে জানতে হবে (The Tarikh-i-Firuz Shahi is, indeed, for one who knows Ziyauddin Barani.)।

কবি-ঐতিহাসিক আমীর খসরু

আমীর খসরু (১২৫৪-১৩২৫) হলেন সুলতানি যুগের একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী, কবি, সঙ্গীতজ্ঞ এবং ঐতিহাসিক। বুদ্ধি, প্রতিভা ও শিক্ষায় অসাধারণ হওয়া ছাড়াও তিনি ছিলেন একজন উচ্চস্তরের অতীন্দ্রিয়বাদী। শেখ নিজামুদ্দিন আউলিয়ার তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান শিষ্য, তাঁর লেখায় গুরুকে তিনি অমর করে রেখেছেন। কবিতা লিখে এবং অন্যান্য চারুশিল্পের সাধনা করে তিনি অমরত্ব লাভ করতে চেয়েছিলেন। নিজামুদ্দিনের সান্নিধ্যে এসে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে যায়। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন মানুষ কী করে দৈনন্দিন চাওয়া-পাওয়ার উর্ধ্বে উঠতে পারে, আত্মার অন্তর্বিকাশ বাইরের প্রাপ্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। নিজামুদ্দিনের দারিদ্র্যক্লিষ্ট ভগবৎ প্রেমে বিভোর আনন্দিত জীবন তাঁকে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নতুন দৃষ্টি দিয়েছিল। তারমধ্যে প্রেম ও স্নেহের অভাব ছিল না, আল্লাহকে সব সমর্পণ করে তিনি আনন্দে বিভোর হয়ে থাকতেন। শিল্প ও সংস্কৃতির প্রায় সবক্ষেত্রে ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ, সঙ্গীত রচনায় ও সঙ্গীত যন্ত্রের বাদনে তাঁর দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত। নিজামুদ্দিনের জামাতখানায় গানের অনুষ্ঠান হতো, আমীর খসরু তাতে অংশ নিতেন, সঙ্গীত উপভোগ করতেন।

এক অভিবাসী তুর্কি পরিবারে ১২৫৪ খ্রিস্টাব্দে (৬৫২ অল হিজরি) উত্তরপ্রদেশের পাতিয়ালিতে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা সৈফুদ্দিন লাচিন উপজাতির একজন নেতা ছিলেন, তাঁর মাতা ছিলেন বলবনের যুদ্ধমন্ত্রী ইমাদুল মুল্‌কের কন্যা। বাবা ইলতুৎমিসের দরবারে আমীর পদে ছিলেন, মাত্র সাতবছর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন, কিন্তু পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতার জন্য তাঁর বিদ্যার্জনে কোনো ব্যাঘাত হয়নি। সমকালের বিজ্ঞান, দর্শন, কাব্য তিনি সবই পড়েছিলেন, তিনি অনেকগুলি ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। তুর্কি, ফার্সি, আরবি ছাড়াও তিনি হিন্দি ও সংস্কৃত শিখেছিলেন। ইজাজ-ই-খুসরাবিতে তিনি বাক্যালঙ্কার নিয়ে বিশাল আলোচনা করেছেন। দিল্লি ছিল সেযুগে ইসলামের একটি বিশিষ্ট শিক্ষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র। রাজধানীতে বিচিত্র ধরনের মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল, নিকৃষ্ট মানুষের পাশাপাশি ছিল বহু উৎকৃষ্ট মানুষ। রাজধানীর আলো-আঁধারিতে আমীর খসরুর প্রতিভা স্বাভাবিক বিকাশের পথ খুঁজে পেয়েছিল। কবি ও শিল্পী হওয়া সত্ত্বেও তিনি জীবন বিমুখ ছিলেন না, তিনি দুনিয়াদারির সঙ্গে দীনদারীকে মিলিয়েছিলেন।

প্রথম জীবন থেকে খসরু রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সভাসদ হিসেবে তিনি জীবন কাটিয়েছিলেন, কিন্তু রাজনীতির মলিনতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে কারার গভর্নর গিয়াসউদ্দিন বলবনের ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দিন মহম্মদ কপলিখাঁর সভাসদ হিসেবে তিনি জীবন শুরু করেন। ইনি মালিক ছজ্জু নামে পরিচিত ছিলেন, তিনি খুব যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু রাজনীতিতে সাফল্য লাভ করেননি। বারানি আমীর খসরুর বন্ধু ছিলেন, তিনি ছজ্জুর প্রশংসা করেছেন। মালিক ছজ্জুর উদ্দেশে একটি কাসিদা (স্তুতি) রচনা করে তিনি প্রচুর অর্থ লাভ করেন। বুঘরা খান তাঁর কবিতায় সন্তুষ্ট হয়ে তাকে কিছু অর্থ দিলে মালিক ছজ্জু অসন্তুষ্ট হন। তিনি বুঘরা খাঁর সভাসদ হিসেবে যোগদান করেন। বুঘরা খান বাংলার গভর্নর হলে লক্ষ্মণাবতীতে তিনি গিয়েছিলেন, কিন্তু পূর্বাঞ্চলের আবহাওয়া তাঁর ভাল লাগেনি বলে দিল্লিতে ফিরে আসেন। ভাগ্যক্রমে তিনি বলবনের জ্যেষ্ঠপুত্র সুলতান মহম্মদের সাহচর্য লাভ করেন, তিনি এই রাজপুত্রের সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে চলে যান। সেখানে মোঙ্গলদের সঙ্গে যুদ্ধে সুলতান মহম্মদ নিহত হন। কবি ও ঐতিহাসিক নিজেও যুদ্ধ করেছিলেন, অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান। 'শহিদ রাজপুত্র'কে নিয়ে তিনি যে কবিতাটি রচনা করেন তা সকলকে স্পর্শ করেছিল, এই শোকগীতি রচনা করে খসরু জনপ্রিয় হয়ে যান।

বলবনের মৃত্যুর পর তাঁর পৌত্র কায়কোবাদ সুলতান হন, বিলাসী এই সুলতান অল্পদিনে অসুস্থ হয়ে পড়েন। জালালুদ্দিন খল্‌জি দিল্লিতে ক্ষমতা দখল করে নতুন শাসনের সূত্রপাত করেন। কবি অযোধ্যার প্রাদেশিক গভর্নর হাতিম খানের সভাসদ

হন, তার আগে তিনি কায়কোবাদের রাজসভায় কিছুকাল কাটিয়েছিলেন। জালালুদ্দিনের সঙ্গে কবির আগেই পরিচয় ছিল, তিনি কবিকে সমাদরে গ্রহণ করেন, দরবারে উচ্চপদ ও সম্মান দেন। তিনি হন 'শাহী কোরাণের রক্ষক' এবং দরবারের সর্বোচ্চ সভাসদ। জালালুদ্দিন নৃত্য, গীত ও সঙ্গীতের সমজদার ছিলেন। জালালুদ্দিনের বিরুদ্ধে তার পুরনো পৃষ্ঠপোষক হাতিম খান ও মালিক ছজ্জু বিদ্রোহ করেন, জালালুদ্দিন এদের দমন করলে কবি তাকে কবিতায় অভিনন্দিত করেন। ১২৯৬ খ্রিস্টাব্দে আলাউদ্দিন পিতৃব্যকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করেন, কবি-ঐতিহাসিক এসম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেননি। আলাউদ্দিনের রাজসভায় তিনি সভাসদ ছিলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা হিসেবে তিনি ঘটনাটিকে মেনে নেন। আলাউদ্দিন শাসক হিসেবে সফল হয়েছিলেন, তিনি সাম্রাজ্য বিস্তার করেছেন, শাসন করেছেন। কবি-ঐতিহাসিক তাঁর বীর নায়ককে পেয়ে কাসিদা রচনা করে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। আলাউদ্দিনের শাসনকালে খসরু সবচেয়ে বেশি লিখেছেন, এরমধ্যে পাঁচখানি প্রণয়ধর্মী কাব্য হলো উল্লেখযোগ্য, এগুলি তিনি তাঁর গুরুকে উৎসর্গ করেন।

আমীর খসরু মসনবি, দিবান, কাসিদা ও গজল লিখেছেন, এগুলির সংখ্যা বেশি। তিনখানি গ্রন্থে ইতিহাস আছে, এই তিনখানি গ্রন্থ হলো *খাজাইনুল ফুতুহ, নু সিপিহর* ও *তুঘলকনামা*। প্রথমখানি গদ্যে লেখা, বাকি দুখানি পদ্যে রচিত, বিষয় হলো ঐতিহাসিক ঘটনাবলী। খাজাইনুল ফুতু-তে আলাউদ্দিনের দাক্ষিণাত্য জয়ের কাহিনী আছে,.আছে তার প্রশাসনিক সংস্কারের ইতিহাস। আলাউদ্দিনের শাসনকাল সম্পর্কে আমীর খসরু নির্ভরযোগ্য তথ্য সরবরাহ করেছেন। আমীর খসরু ছজন সুলতানের শাসনকাল দেখেছেন। তাঁর পরিবার উচ্চপদে দীর্ঘকাল অধিষ্ঠিত ছিল, তিনি নিজে সারাজীবন কেন্দ্রে ও প্রদেশে সভাসদ হিসেবে কাজ করেছেন। ঘটনার উত্থানপতন লক্ষ করেছেন, কিন্তু ঐতিহাসিকের দৃষ্টি নিয়ে তিনি এগুলি দেখেননি। ইতিহাস লেখার পদ্ধতি, আঙ্গিক, দর্শন সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট ধারণার অভাব ছিল। কবি চলমান জীবনের ছবি দেখেছেন, সমকালের ইতিহাস লিখেছেন, অতীতে অনুসন্ধান করে ইতিহাস লেখার আগ্রহ তাঁর ছিল না। তাঁর খাজাইনুল ফুতু-র ভাষা ও ভঙ্গি একেবারে কবির, ঐতিহাসিকের নয় (history with Amir Khusrau was comtemporary history, and he could not shake off his obsession with literary accomplishments.)।

নু সিপিহরে খসরু আলাউদ্দিনের পুত্র মুবারক খলজির ইতিহাস দিয়েছেন। তিনি মুবারক খলজির সভাসদ ছিলেন যদিও সুলতান তাঁর গুরুকে একেবারেই পছন্দ করতেন না। মুবারক খলজি দাক্ষিণাত্য জয় করে নিজের অধিকার স্থাপন করেছেন। ঐতিহাসিক তাঁর বিবরণ দিয়েছেন, তাঁর সময়কার প্রাসাদ ষড়যন্ত্র এবং মুবারক খলজির

নিষ্ঠুরতার কথাও আছে। *তুঘলকনামায়* তিনি সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের ক্ষমতা দখলের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। খসরু খান নামক এক নিম্নবর্গের মানুষ ধর্মান্তরিত মুসলমানদের নিয়ে (বরদু) ক্ষমতা দখল করেছিলেন। তিনি মুবারক খল্‌জিকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেন। গিয়াসউদ্দিন তুঘলক খসরুকে পরাস্ত করে ক্ষমতা দখল করেন। আমীর খসরু তুঘলক শাসন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস লিখেছেন, গাজি মালিক গিয়াসউদ্দিনের বীরত্ব, সাহসিকতা ও নেতৃত্বের প্রশংসা করেছেন। খসরুর ছখানি গ্রন্থে ঐতিহাসিক উপাদান আছে, এগুলি সব বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে তাঁর গ্রন্থে। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে কবি-ঐতিহাসিক (১২৮৯-১৩২৫) ক্ষমতার অলিন্দে ঘোরাফেরা করেছেন, রাজশক্তির উত্থানপতন দেখেছেন, অভিজাততন্ত্রের জীবনযাপন প্রত্যক্ষ করেছেন, তিনি নিজেও অভিজাত পরিবারের সন্তান ছিলেন। রাজনৈতিক ঘটনাবলীকে প্রত্যক্ষ করে তার নির্ভরযোগ্য ইতিহাস রচনা করার সুযোগ তাঁর ছিল, কিন্তু কবি-ঐতিহাসিক তা করেননি।

কবি-ঐতিহাসিক ভারতবর্ষকে ভালবেসেছেন, ভালোবেসেছেন এদেশের মানুষজন, ভাষা ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে। দিল্লির সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তিনি বড় হয়েছেন, দরবেশ নিজামুদ্দিনের প্রভাব পড়েছে তাঁর জীবন ও দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। তিনি ছিলেন প্রধানত কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ, তিনি কাব্যে ইতিহাসের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। অধ্যাপক পিটার হার্ডি লিখেছেন যে খসরু কবিতা লিখেছেন, ইতিহাস লেখেননি (Amir Khusrau did not write history, he wrote poetry)। ঐতিহাসিকের কাজ হলো তথ্যের ওপর ভিত্তি করে অতীতের পুনর্নির্মাণ (The task of the historian is to reconstruct the past)। সেযুগে ইতিহাসের ধারণা অন্যরকম ছিল। দরবারি খসরু শাসকের অনুরোধে, পুরস্কারের লোভে বা খ্যাতির আশায় ইতিহাস লিখেছেন কবির ভাষায়। প্রবহমান ঘটনাবলীর পরম্পরা অনুসরণ করে ইতিহাস লেখার মেজাজ তাঁর ছিল না। বারানির মতো সমকালীন লেখকদের ইতিহাস পড়ে তিনি ইতিহাস লেখার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেননি। যেটুকু ইতিহাস তিনি লিখেছেন তার মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতিফলন বা নিয়তির হস্তক্ষেপ তিনি লক্ষ করেছেন। আমীর খসরুর চরিত্রগুলি হয় ভালো নয় মন্দ, ভালো-মন্দ মিশ্রিত বাস্তব মানুষের উপস্থিতি তার ইতিহাসে নেই। তবে এসব ত্রুটি সত্ত্বেও বলা যায় খসরু ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ঘটনা গোপন করেননি, মিথ্যা কথা বলেননি, শুধু অপ্রীতিকর ঘটনা এড়িয়ে গেছেন। আলাউদ্দিনের বিশ্বাসঘাতকতা বা নিষ্ঠুরতার কথা তিনি এড়িয়ে গেছেন। তিনি সমকালের ইতিহাস লিখেছেন, সমকালীন ঘটনাবলীর ঐতিহাসিককের পক্ষে সবসময় নির্ভয়ে সত্যকথা বলা সম্ভব হয় না। ইতিহাসের ঘটনাবলীর বর্ণনায় তিনি বহুস্থানে পবিত্র কোরান থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

কাউয়েল (Cowell) লিখেছেন যে আমীর খসরুর বর্ণনায় অতিশয়োক্তি ও অতিরঞ্জন আছে, উপমা ও অলংকারের তিনি খুব বেশি ব্যবহার করেছেন। তবে তিনি ইতিহাসের যেসব তথ্য সরবরাহ করেছেন সেগুলিকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না (the facts of history are tolerably dependable)। খসরুর সবচেয়ে বড় অবদান হলো তাঁর লেখায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বহু উপাদান ছড়িয়ে আছে। আফজল-উল-ফাবায়িক গ্রন্থে খসরু নিজামুদ্দিন আউলিয়ার অন্তরঙ্গ পরিচয় তুলে ধরেছেন, দরবেশের সঙ্গে তাঁর নিজের অন্তরঙ্গতাও এতে স্থান পেয়েছে। ইতিহাসের ঘটনাস্রোতের মধ্যে তিনি নৈতিকতা ও ধর্মের জয় দেখেছেন। খসরু খানের বিরুদ্ধে গিয়াসউদ্দিনের সংঘাতকে তিনি এভাবে চিত্রিত করেছেন। ইতিহাস লেখার সময় তিনি সাহিত্য সৃষ্টির কথা ভেবেছেন, শাশ্বত সৃষ্টির কথা মনে রেখেছেন (Khusrau's concern has been not only to write the annals of his royal patron's reign, but to produce a masterpiece of literature)।

খসরু ইতিহাস লিখেছেন, কিন্তু তিনি প্রথমে ছিলেন কবি, পরে ঐতিহাসিক। তিনি তাঁর পৃষ্ঠপোষক শাসকের স্তুতি করেছেন, নিরপেক্ষ ইতিহাস লেখার চেষ্টা করেননি। সেই মেজাজ ও মানসিকতা সম্ভবত তাঁর ছিল না (Amir Khusrau wrote much about the past but he was more a poet than an historian, more a panegyrist than an impartial writer.)। তবে একথা অস্বীকার করা যাবে না তার ইতিহাস নতুন তথ্য সরবরাহ করেছে এবং তার যুগকে অনেকাংশে আলোকিত করেছে। ঐতিহাসিকের কাজ যদি হয় অতীতকে আলোকিত করা, অতীত সম্পর্কে আধুনিককালের মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধি করা তাহলে বলা যায় তাঁর মিফতা, খাজাইনুল ও তুঘলকনামা সেই উদ্দেশ্য সাধন করেছে। খসরু শুধু কবি নন, একজন যোগ্য ঐতিহাসিক। তাঁকে যদি সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করা হয় তবে দেখা যায় যে তিনি তাঁর কাব্য প্রতিভার নিদর্শন তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, অমরত্ব কামনা করেছেন, কিন্তু তাঁর ঐতিহাসিক লেখাগুলির যথেষ্ট মূল্য আছে। এগুলিকে বাতিল করা যায় না। ইতিহাস সাহিত্যে তাঁর অবদান অগ্রাহ্য করার মতো নয়, এগুলি স্থায়ী আসন লাভ করেছে (Viewed favourably he was a historian. It has to be admitted that his works have great historical value and the contributions made by him to historical literature are in no way negligible)।

ইবন বতুতার ভারত দর্শন

যুগে যুগে ভারতে বহু বিদেশী পর্যটক এসেছেন, তাদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন, এগুলি হলো ভারত ইতিহাসের প্রাথমিক আকর। চতুর্দশ শতকে ভারতে এসেছিলেন মরক্কোর পরিব্রাজক ইবন বতুতা (১৩০৪-১৩৭৮)। তাঁর পারিবারিক

নাম বতুতা, আসল নাম হলো আবু আবদুল্লাহ মহম্মদ। ভারতে তিনি পরিচিত ছিলেন মৌলানা বদরুদ্দিন নামে। মরক্কোর তাঞ্জিয়ের শহরে তাঁর জন্ম হয়, পিতার নাম আবদুল্লাহ্ ইবন মহম্মদ। তাঁর পরিবারিক পেশা ছিল বিচার বিভাগীয় কাজ এবং দাতব্যসংস্থা পরিচালনা। পৃথিবীর সর্বকালের সব পর্যটকের মধ্যে ভ্রমণের তীব্র নেশা থাকে। নতুন দেশ দেখার তীব্র আকাঙ্ক্ষা যেমন তাঁর মধ্যে ছিল, তেমনি ছিল প্রবল ধর্মীয় আবেগ। ইসলামের পবিত্র তীর্থস্থানগুলি দেখার অদম্য ইচ্ছা তাঁর ছিল, সাধু, সন্ত ও দরবেশদের সঙ্গ করার ইচ্ছাও তাঁর মধ্যে জেগেছিল। ভারতে অবস্থানকালে (১৩৩৩-১৩৪৭) তিনি এদেশের বহু সন্ত ও দরবেশের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁদের সঙ্গ তাঁর ভালো লাগত। চীন যাবার পথে তিনি শ্রীহট্টের বিখ্যাত দরবেশ শেখ জালালুদ্দিনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। দিল্লির সে যুগের বিখ্যাত দরবেশ শেখ শিহাবুদ্দিনের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার জন্য তিনি মহম্মদ তুঘলকের রোষদৃষ্টিতে পড়েছিলেন। দিল্লিতে অবস্থানকালে (১৩৩৩-১৩৪২) তিনি সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে কিছুকাল সন্তের জীবনযাপন করেন। সুলতান মহম্মদ তুঘলকের দরবারে তিনি দুজন হিন্দুযোগীর অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম দেখেছিলেন।

ইবন বতুতা একুশ বছর বয়সে দেশ ছেড়ে ইসলামী প্রাচ্যের প্রায় সব দেশ ভ্রমণ করেন। আফ্রিকার উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও উত্তর-পূর্বের অনেক দেশ তিনি দেখেছিলেন। উত্তর আফ্রিকার দেশগুলি, আরব, সিরিয়া, ইরাক, ইরান ভ্রমণ শেষ করে তিনি ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে ভারতে প্রবেশ করেন। কাবুল, মুলতান, পাঞ্জাব হয়ে তিনি দিল্লিতে আসেন। মহম্মদ তাঁকে দিল্লির কাজী ও দাতব্যসংস্থা পরিচালনার ভার দেন। সুলতান তাঁকে বারো হাজার টাকা (দিনার) আয় হয় এমন সাড়ে চারখানি গ্রামের ইক্তার রাজস্বের বরাত দিয়েছিলেন। ইবন বতুতার রেহালায় (Rehla) শুধু ভারতের কথা নয়, আছে সিংহল, মালদ্বীপ, সুমাত্রা ও চীনের কথা। তিনি বহু দুর্গম পথ পাড়ি দিয়েছেন, দস্যুদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়েছেন, এদেশের স্থানীয় রাজাদের যুদ্ধবিগ্রহেও অংশ নিয়েছেন। তিনি অকপটে এদেশের রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থনীতি, ধর্মীয় জীবন ও চিন্তাভাবনার পরিচয় তুলে ধরেছেন, তার বর্ণনা থেকে মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকাল সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। তাঁর রেহলা হলো তাঁর রাজত্বকালের একটি নির্ভরযোগ্য প্রাথমিক উপাদান। তিনি নির্ভয়ে, মোহমুক্ত মনে সুলতানের মূল্যায়ন করেছেন। সুলতান তাঁকে চীনের সম্রাটের কাছে দূত হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। বাংলা থেকে জাহাজে চড়ে সুমাত্রা ও জাভা হয়ে তিনি চীনে পৌঁছেছিলেন। তাঁর রেহালায় পাওয়া যায় দিল্লি সুলতানির প্রথম দিককার রাজনৈতিক ইতিহাস, তিনি প্রধান কাজী কামালুদ্দিনের কাছ থেকে এই ইতিহাস পেয়েছিলেন। এই ইতিহাস একেবারে নির্ভুল নয়, কিছু ভুল-ভ্রান্তি আছে, স্মৃতির ওপর নির্ভর করে কামালুদ্দিন তাঁকে এই ইতিহাস শুনিয়েছিলেন।

সম্ভবত তিনি দেশে ফিরে যখন *রেহালা* লিখেছিলেন স্মৃতির ওপর নির্ভর করেছিলেন, কোথাও লিখিত নোটের কথা উল্লেখ করেননি। দিল্লি সুলতানির রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানগুলির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। সেযুগের কৃষিজ উৎপাদন, শিল্পপণ্য, বাণিজ্য, রাস্তাঘাট, পরিবহন, ডাক ব্যবস্থা ও গোয়েন্দা বিভাগের তিনি পরিচয় রেখেছেন। রাজসভা, রাজসভার অনুষ্ঠান, রাজকীয় শোভাযাত্রা, ঈদ উৎসব, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদির পরিচয় দিতে তিনি ভোলেননি। তার ভ্রমণ বৃত্তান্তটিকে আধুনিক মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন ইবন জুজায়ি নামে এক পণ্ডিত।

১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দে ইবন বতুতা সিন্ধু ও পাঞ্জাব অঞ্চলে প্রবেশ করেন, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নদী-অববাহিকা বলে তিনি এর উল্লেখ করেছেন। নীলনদের অববাহিকার সঙ্গে এর তুলনা করেছেন। এখান থেকে মহম্মদ তুঘলকের রাজ্যসীমা শুরু হয়েছে। সিন্ধুর শাসক ছিলেন সরতেজ। সুলতানি যুগের উন্নত ডাক ব্যবস্থার তিনি পরিচয় দিয়েছেন। ডাক ছিল দুরকমের—ঘোড়ায় বয়ে নিয়ে যাওয়া ডাক হলো উলাক, মানুষে বয়ে নিয়ে যাওয়া ডাক হলো দাওয়া। ডাক হরকরাদের হাতে লাঠি ও মাথায় ঘণ্টা লাগানো থাকত। খুরাসান (ইরাক) থেকে ভারতে ডাকের মাধ্যমে ফলের আমদানি হতো। ডাক ব্যবস্থার মাধ্যমে বন্দীদের একস্থান থেকে অন্যস্থানে পাঠানো হতো। সুলতান বিদেশীদের সম্মান করেন (আইজ্জা), উচ্চপদে নিয়োগ করেন। সুলতানের কর্মচারীদের মধ্যে অনেক বিদেশী আছে। সুলতান বা তার প্রাদেশিক গভর্নরদের সঙ্গে দেখা করতে হলে মূল্যবান উপহার দিতে হয়, সুলতান আবার তার চেয়ে বেশি মূল্যবান উপহার ফেরৎ দেন। এজন্য বিদেশীদের উপহার কেনার জন্য বণিকরা ধার দেয়। ঘোড়া, হাতি, উট, ক্রীতদাস-দাসী, ফল, বস্ত্র ইত্যাদি উপহার দেওয়া হতো।

তিনি সিন্ধু উপত্যকার অরণ্যে গণ্ডার দেখেছিলেন। সিন্ধু নদ পার হয়ে তিনি জনানি শহরে আসেন, ভারতে তাঁর দেখা প্রথম শহর। তিনি বলছেন যে শহরটি বেশ বড় ও সুন্দর, বাজারগুলি বেশ ভালো। এখানকার লোকেরা হলো সামির গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, এদের সামাজিক আচার-আচরণের সঙ্গে অন্যদের মিল নেই। বতুতা এখান থেকে গিয়েছিলেন শিবিস্তান, শহরটির বাইরে মরুভূমি। নদীর ধারে তিনি জনার, শুঁটি (মুশুক্ক), তরমুজ, কুমড়ো উৎপন্ন হতে দেখেছেন, মোষের দুধ ও মাছ পাওয়া যায় অঢেল। টিকটিকির মতো একরকমের প্রাণী (শকাঙ্কুর) তারা মশলা দিয়ে রান্না করে খায়। এখানে প্রচণ্ড গরম ছিল, কাপড় ভিজিয়ে গায়ে জড়িয়ে নিতে হয়। শিবিস্তানে তিনি বিশিষ্ট আইনজ্ঞ আলা-উল-মুলকের সঙ্গে পরিচিত হন। ইনি ছিলেন লাহোরি শহর ও প্রদেশের শাসনকর্তা, বতুতা তাঁর সঙ্গে জলপথে লাহোরি যান। সেই যুগের

ভারতীয় জাহাজের তিনি বর্ণনা দিয়েছেন। জাহাজে ছিল আলা-উল-মুলকের রক্ষীদল, মাল্লা, দাস-দাসী, পতাকা, ঢাক, ভেরি, শিঙ্গা, বাঁশী ইত্যাদি, গায়করা ভোর থেকে খাবার সময় পর্যন্ত গান করত।

লাহোরি হলো বন্দর-শহর, সমুদ্রের মুখে অবস্থিত, শহরটিকে বতুতা বলেছেন 'মন ভোলানো শহর'। বিদেশীরা এখানে বাণিজ্য করতে আসত, শহরের বার্ষিক আয় ছিল আট লক্ষ টাকা। শাসক পেতেন মোট রাজস্বের কুড়ি ভাগের এক ভাগ, এই হারে সুলতান তার প্রাদেশিক শাসকদের নিযুক্ত করতেন। শহর থেকে সাতমাইল দূরে তিনি সম্ভবত হরপ্পার একটি ধ্বংসাবশেষ দেখতে গিয়েছিলেন। পাঁচদিন লাহোরিতে কাটিয়ে তিনি যান বুক্কুর শহরে, সেখান থেকে যান সিন্ধুর উচ শহরে। এই শহরটি ছিল অনেক বড়, অনেক ঘর-বাড়ি ও বাজার দিয়ে সাজানো। উচের শাসক ছিলেন মালিক শরিফ জালালুদ্দিন আল-কাজি, তিনি ছিলেন একজন সাহসী, বিদ্বান ও উদারচেতা ব্যক্তি। পরে দিল্লিতে তাঁর সঙ্গে আবার দেখা হয়েছিল। উচ থেকে তিনি সিন্ধু প্রদেশের রাজধানী মুলতানে গিয়েছিলেন, খুসরাবাদ নদী পেরিয়ে শহরটিতে প্রবেশ করতে হয়। সিন্ধুর সুবাদার কুতুব-উল-মুল্কের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেন, তাকে একটি দাস, একটি ঘোড়া, কিছু বাদাম ও কিসমিস উপহার দেন। তিনি সুবাদারের দরবারের বর্ণনা দিয়েছেন। পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনীতে নিয়োগের সময় সৈনিকদের দক্ষতা পরীক্ষা করা হতো।

ইবন বতুতা দিল্লিতে সুলতানের সঙ্গে দেখা করার জন্য মুলতান থেকে রওনা হন। পথটি ছিল উর্বর, জনবসতি ভরা, দিল্লি চল্লিশ দিনের পথ। মুলতান ছেড়ে তিনি পাঞ্জাবের ফিরোজপুর জেলার অবোহর শহরে আসেন, এটি ছিল হিন্দুস্তানের প্রথম শহর, আয়তনে ছোট, কিন্তু নদী ও গাছপালায় চোখ জুড়ানো চেহারা। মরক্কোর অধিবাসী বতুতার কাছে ভারতবর্ষের বহুস্থান শস্য-শ্যামলা বলে মনে হয়েছে। এখানকার ফল আম, কাঁঠাল, নারঞ্জ, জাম, মহুয়া ও কসেরার তিনি উল্লেখ করেছেন, আঙুর ও ডালিমের কথাও তিনি লিখেছেন। এইখানে তিনি ভারতীয় কৃষির কথা উল্লেখ করেছেন। ভারতীয়রা বছরে দুবার ফসল ফলাতো—আমন ও রবি। কুধরু, কাল ও সামাখ নামে তিনরকমের জোয়ারের চাষ ছিল। জোয়ারের রুটি সাধু, সন্ত ও দরিদ্র মানুষদের খাদ্য ছিল, বিনা চাষেও জোয়ার হতো। মুগ ও মাষের চাষ ছিল, লোবিয়া, ক্ষুদে প্রভৃতি নিকৃষ্ট শস্য পশু খাদ্যের জন্য উৎপন্ন হতো। বসন্তকালে উৎপন্ন হতো গম, যব, মটর, কলাই, মসুর, শারদীয় ফসলের জমিতে রবি শস্যের চাষ হতো। এই দেশের উর্বরতা দেখে বতুতা মুগ্ধ হন।

তিনি আরও জানিয়েছেন যে ভারতে তিনবার ধানের চাষ হয়। চাল হলো ভারতের একটি প্রধান খাদ্যশস্য, তিল ও আখের চাষ ছিল। আবোহর থেকে বেরিয়ে মরুভূমি

পেরিয়ে তিনি পাঞ্জাবের অযোধানে এসেছিলেন। অমুসলমানদের তিনি কাফের বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন যেসব কাফের সুলতানের অধীনতা মানেনি, তারা জোটবদ্ধ হয়ে লড়াই করত। সুফি দরবেশ শেখ ফরিদউদ্দিন ছিলেন অযোধানের বিশিষ্ট ব্যক্তি। এখানে তিনি হিন্দু নারীদের সহমরণ প্রথা দেখেছিলেন, পরে আজমীরে তিনি আরও তিনটি সহমরণ দেখেছিলেন। সুলতানের অনুমতি নিয়ে সহমরণের ব্যবস্থা করতে হতো। সহমরণের জন্য পরিবারের সম্মান বেড়ে যেত, সতীর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ত। বতুতা সহমরণের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন, কিন্তু তিনি নিজে এই ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা সহ্য করতে পারেননি, অজ্ঞান হয়ে যান। গঙ্গানদীকে হিন্দুরা পবিত্র বলে মনে করে, অনেকে গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন দেয়। অযোধান থেকে তিনি সরসুতিতে আসেন। শহরটি ছিল বেশ বড়, এখানে উৎকৃষ্ট জাতের চাল উৎপন্ন হয়, এই অঞ্চল থেকে প্রচুর রাজস্ব আদায় করা হয়।

সরসুতি থেকে হানসি, এটি ছিল একটি পরিকল্পিত শহর, ঘনবসতিপূর্ণ। এখান থেকে তিনি দিল্লির উপকণ্ঠ মসুদাবাদে যান, সেখান থেকে দিল্লি।

ইবন বতুতার মতে, দিল্লি ছিল ইসলামী প্রাচ্যের সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে বড় শহর। তিনি কায়রো, বাগদাদ, দামাস্কাস, মক্কা, মদিনা সব দেখেছেন, দিল্লির সঙ্গে কারোর তুলনা হয় না। বতুতা জানিয়েছেন দিল্লি একটি শহর নয়, চারটি শহরের সমষ্টি। দিল্লির মধ্যে আছে পুরনো দিল্লি, আলাউদ্দিনের সিরি, গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের তুঘলকাবাদ এবং মহম্মদ তুঘলকের জাঁহাপনা। শহরটিকে ঘিরে আছে একটি বিশাল প্রাকার, এটি এগারো হাত চওড়া। এর মধ্যের ঘরগুলিতে রক্ষীরা থাকে, অস্ত্র ও শস্যভাণ্ডার রয়েছে। শহরের আঠারোটি ফটক আছে, ফটকের বাইরে সমাধিস্থল ; এগুলি নানারকমের ফুলগাছ দিয়ে সাজানো, পরিবেশ মনোরম। দিল্লির জুমা মসজিদটি বিশাল, পাথর দিয়ে তৈরি। উত্তর দিকে রয়েছে কুতুবমিনার, সারা বিশ্বে যার জুড়ি নেই। সুলতান ইলতুৎমিস জল সরবরাহের জন্য একটি জলাশয় নির্মাণ করেন, জলাশয়ের ধারে আখ, শসা, তরমুজ, কুমড়ো, খরমুজ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

দিল্লির প্রধান কাজী কামালুদ্দিন তাঁকে দিল্লি সুলতানির প্রতিষ্ঠা থেকে মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকাল পর্যন্ত (১১৯২-১৩২৫) ইতিহাস শুনিয়েছেন। সম্ভবত কাজী তাঁর স্মৃতি থেকে এই ইতিহাস শুনিয়েছিলেন, এজন্য বতুতার বর্ণনার মধ্যে কিছু ভুল-ভ্রান্তি রয়ে গেছে। বতুতা জানিয়েছেন মুসলমানরা ১১৮৮ খ্রিস্টাব্দে দিল্লি জয় করেছিলেন, সঠিক তারিখ হলো ১১৯২ খ্রিস্টাব্দ। ইলতুৎমিসের উত্তরাধিকারীদের সম্পর্কে যেসব তথ্য তিনি দিয়েছেন তার মধ্যেও ভুল আছে। বতুতার কাছ থেকে নির্ভুল রাজনৈতিক ইতিহাস পাওয়া না গেলেও প্রশাসনিক ইতিহাস, আর্থ-সামাজিক

তথ্য ও সুলতানির জীবনযাত্রার কিছু অন্তরঙ্গ পরিচয় মেলে। আধুনিককালের মানুষের কাছে সেটা হলো উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি। সুলতান শিহাবুদ্দিনের মৃত্যুর পর কুতুবুদ্দিন দিল্লির সুলতান হন। কুতুবুদ্দিন আইবক মাত্র চার বছর রাজত্ব করার পর মারা যান। মহম্মদ ঘুরি তাঁকে খুব বিশ্বাস করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর কুতুবুদ্দিনের জামাতা ইলতুৎমিস (লাজমিশ) দিল্লির সুলতান হন এবং বিশ বছর রাজত্ব করেন। তিনি ছিলেন ন্যায়বিচারক, সদগুণ সম্পন্ন, দক্ষ শাসক, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যাদের কোনো অভিযোগ আছে তাদের তিনি রঙিন পোশাক পরতে বলেন যাতে তিনি তাদের সহজে চিহ্নিত করতে পারেন। তাঁর প্রাসাদের ফটকে দুটি ঘণ্টা বাঁধা শিকল ছিল, কোনো ব্যক্তি সেই ঘণ্টা বাজালে তিনি ধরে নিতেন কোনো বিচারপ্রার্থী এসেছেন। সম্রাট জাহাঙ্গির পরবর্তীকালে এধরনের ব্যবস্থা করেছিলেন। ইলতুৎমিস তিন পুত্র ও এক কন্যাকে রেখে মারা যান, সিংহাসন নিয়ে এদের মধ্যে বিরোধ বেধেছিল। রাজিয়া ক্ষমতা দখল করে চার বছর রাজত্ব করেন। রাজিয়া ক্ষমতা নিজের হাতে রাখতে পারেননি, রক্ষণশীল সমাজ মহিলার শাসন পছন্দ করেনি। তাঁর হাবসি ক্রীতদাস ইয়াকুতের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের কথা উঠেছিল, তিনি পরাস্ত ও নিহত হন। ইলতুৎমিসের কনিষ্ঠ পুত্র নাসিরুদ্দিন মাহমুদ ক্ষমতা দখল করেন, তার শ্বশুর হলেন গিয়াসউদ্দিন বলবন। শ্বশুর ছিলেন শাসন ব্যাপারে সর্বেসর্বা। নাসিরুদ্দিন ছিলেন ধার্মিক মানুষ, কোরান নকল করে অর্থ উপার্জন করতেন। তাঁকে হত্যা করে বলবন ক্ষমতা দখল করেন।

গিয়াসউদ্দিন বলবন হলেন সুলতানি শাসকদের মধ্যে একজন দক্ষ ব্যক্তি। তাঁর স্থাপিত দার-উল-আম হলো এক মহৎ কীর্তি। সুলতান দরবারে বসে দুঃস্থ, আর্ত, নির্যাতিত মানুষদের রক্ষা করতেন। সেযুগে সুলতানদের 'খোন্দ-আলম' (মহীপতি) বলে সম্বোধন করা হতো। বলবনের দুটি পুত্র ছিল—মহম্মদ ও বুঘরা খান। তাতারদের সঙ্গে লড়াইয়ে মহম্মদ মারা যান। বলবনের মৃত্যুর পর বুঘরা খানের পুত্র মৈজুদ্দিন কায়কোবাদ সুলতান হন, তিনি বিলাসী ছিলেন। বতুতা জানিয়েছেন তাঁকে হত্যা করে জালালুদ্দিন খল্‌জি সিংহাসন অধিকার করেন। সম্ভবত তাঁর শিশু পুত্র সামসুদ্দিন কায়মুরসকে হত্যা করে জালালুদ্দিন সিংহাসন দখল করেছিলেন (১২৯০)। জালালুদ্দিনের অধীনে কারা প্রদেশের গভর্নর ছিলেন আলাউদ্দিন খল্‌জি, এই অঞ্চলটি ছিল খুবই সমৃদ্ধ, প্রচুর চাল, গম ও চিনি উৎপন্ন হতো। আলাউদ্দিন ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী, সাহসী ও উদ্যমী। তিনি দেবগিরি লুণ্ঠন করে অর্থ সংগ্রহ করেন এবং পিতৃব্যকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করেন। ইবন বতুতা লিখেছেন আলাউদ্দিন হলেন দিল্লির সেরা সুলতানদের একজন। তিনি সুদক্ষ শাসক ছিলেন, বাজার দর নিয়ন্ত্রণ করেন। সুলতানের ভ্রাতুষ্পুত্র সুলেমান তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করেন। আলাউদ্দিনের পাঁচটি

পুত্র ছিল (খিজির খান, সাদি, আবুবকর, মুবারক ও শিহাবুদ্দিন)। মুবারক ক্ষমতা দখল করেন, অন্যরা সেযুগের শক্তিশালী দুর্গ গোয়ালিয়রে অন্ধ অবস্থায় বন্দী ছিল। মুবারক দক্ষিণ ভারতে বিদ্রোহ দমনে গিয়েছিলেন, দিল্লি থেকে দৌলতাবাদ পর্যন্ত ভালো রাস্তা ছিল। সারা রাস্তায় পর্যটকদের জন্য ভালো অতিথিশালা ছিল। মুবারকের শাসন শান্তিতে কাটেনি। চার বছর পর তার এক ধর্মান্তরিত আমীর খসরু ক্ষমতা দখল করেন, সুলতান নিহত হন। তাকে পরাস্ত ও নিহত করে গিয়াসুদ্দিন তুঘলক সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন করুণা উপজাতির তুর্কি, তিনি যুদ্ধে কৃতিত্ব দেখিয়ে গাজি মালিক উপাধি পান। মুলতানের জুমা মসজিদ তিনি নির্মাণ করেন। বতুতা লিখেছেন যে মুলতানের জুমা মসজিদের গায়ে একটি লেখ আছে। তাতে বলা হয়েছে 'আমি (গিয়াসউদ্দিন তুঘলক) তাতারদের সঙ্গে মোট উনত্রিশ বার যুদ্ধ করেছি এবং তাদের পরাজিত করেছি। এই কৃতিত্বের জন্য আমাকে মালিক-উল-গাজি উপাধি দেওয়া হয়।'

দিল্লিতে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি পুত্র জুনা খাঁকে (জউন) তেলেঙ্গানার বিদ্রোহ দমনের জন্য পাঠিয়েছিলেন। তিনি সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরিকল্পনা করেছিলেন, সুলতান তা ব্যর্থ করে দেন। সুলতান বাংলার বিদ্রোহ দমন করে ফিরে আসার সময় অভ্যর্থনা মঞ্চ ভেঙে পড়লে নিহত হন (১৩২৫)। বতুতা পরিষ্কার বলেছেন যে এটি ছিল মহম্মদ তুঘলকের ষড়যন্ত্র। সন্ত দরবেশ নিজামুদ্দিনের সঙ্গে মহম্মদের ঘনিষ্ঠতা ছিল, বতুতা জানিয়েছেন যে একবার সমাধিস্থ অবস্থায় দরবেশ মহম্মদকে বলেছিলেন ঃ 'তোমার হাতে রাজদণ্ড তুলে দিলাম।' বতুতা বলছেন এ পর্যন্ত যে ইতিহাস দিলাম তার উৎস হলেন কাজী শেখ কামালুদ্দিন। মহম্মদের রাজত্বকালের ইতিহাস (১৩৩৩-৪২) তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে। তিনি সুলতানের চরিত্রের একজন নিরপেক্ষ প্রত্যক্ষদর্শী, তিনি দেশে ফিরে গিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন। এজন্য তিনি সুলতান সম্পর্কে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে, পক্ষপাতশূন্য হয়ে লিখতে পেরেছেন। দরবারি ঐতিহাসিকদের সঙ্গে এখানে তাঁর পার্থক্য তৈরি হয়েছে। বারানি এতখানি নিরপেক্ষ হতে পারেননি। মহম্মদের চরিত্র তাঁর লেখনীর টানে সজীব, জীবন্ত হয়ে ওঠে। সুলতান ছিলেন অসাধারণ মাতৃভক্ত, সুলতানের মাতা মখদুম জাহান একদিন দোলায় চড়ে প্রাসাদে ফিরলেন। জনতার মাঝে মায়ের পায়ের পাতা চুম্বন করে সুলতান তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। সুলতানের মা ধর্মপ্রাণা, সদাশয়া ছিলেন, প্রচুর দান-ধ্যান করতেন, বহু অতিথিশালা বানিয়ে ছিলেন। সেখানে ফকির ও দরবেশদের বিনা ব্যয়ে থাকার ব্যবস্থা ছিল। সুলতান ছিলেন অমায়িক ও ভদ্র মানুষ। সুলতান তাঁকে দিল্লির কাজীর পদে নিযুক্ত করেন, বারো হাজার টাকা বার্ষিক আয় হয় এমন সাড়ে চারখানি গ্রামের ইক্‌তা দেন। দিল্লিতে বতুতার পরিচয় ছিল মৌলানা

বদরুদ্দিন। সুলতান ছিলেন অত্যন্ত ধর্মভীরু মানুষ, নিয়মিতভাবে নামাজ পড়তেন, রোজা রাখতেন। মুসলমানরা যাতে ধর্মীয় বিধিবিধান পালন করেন সেদিকে লক্ষ রাখেন। তিনি আইনের শাসন বলবৎ করেন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার দিকে দৃষ্টি রেখেছিলেন। একবার এক হিন্দু তার বিরুদ্ধে ভ্রাতৃহত্যার অভিযোগ এনেছিল, সুলতান কাজীর বিচারসভায় পায়ে হেঁটে উপস্থিত হন এবং বিচারের রায় মেনে নেন। এভাবে সুলতান তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিচারব্যবস্থাকে মর্যাদা দেন, তিনি বাদী পক্ষকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে সন্তুষ্ট করেন।

তিনি মহম্মদ তুঘলকের সময়কার মন্বন্তরের কথা উল্লেখ করেছেন, খাদ্যশস্যের দাম অস্বাভাবিক বেড়েছিল। সুলতান দিল্লির প্রত্যেক নাগরিককে ছমাস ধরে খাদ্যশস্য সরবরাহ করেন। ইবন বতুতা স্বয়ং কুতুবের সমাধির কাছে দাতব্য অতিথিশালা খুলে আর্ত ও দুঃস্থ মানুষদের খাদ্য সরবরাহ করেন। প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার সুলতান ফৌজদারী আদালত বসিয়ে নিজেই বিচার করতেন, ধনী-নির্ধন সকলকে শাস্তি দিতেন। বিদ্বান, সাধু, অভিজাত কেউই রেহাই পেত না। বিচারের ক্ষেত্রে ইসলামী শরিয়ত আইন অনুসরণ করা হতো। সুলতানের এক নিকট আত্মীয়াকে অসতীত্বের অভিযোগে পাথর ছুঁড়ে মারা হয়, কাজী কামালুদ্দিন প্রথম পাথরটি ছুঁড়েছিলেন। সুলতানের বিশাল গুপ্তচর বাহিনী ছিল, তারা সুলতানকে রাজ্যের সব সংবাদ সংগ্রহ করে জানাত। গোপন সংবাদ পেয়ে সুলতান প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতেন। সুলতান দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য অনেক শুল্ক তুলে দেন। দোয়াব অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হলে তিনি কৃষকদের ঋণ দেন, বীজ, বলদ ও জলসরবরাহের ব্যবস্থা করে দেন। এসব হলো সম্রাটের গুণ, দোষ হলো তিনি ছিলেন অসম্ভব নিষ্ঠুর ও নির্মম। প্রতিদিন তিনি দেখেছেন প্রাসাদের দুপাশে মুণ্ড কাটা মানুষের মৃতদেহ পড়ে আছে, মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পর তিনদিন তা পড়ে থাকত। সম্ভবত সুলতান ত্রাস সৃষ্টি করে অপরাধ দমন করার কথা ভেবেছিলেন। বতুতা এও বলেছেন, প্রতিদিন কোনো না কোনো লোক তাঁর করুণা পেত, আবার কেউ কেউ তাঁর নিষ্ঠুরতার শিকার হতো। নিষ্ঠুরতা ও উদারতার কথা আলোচনা করে বতুতা বলেছেন যে উদারতা হলো তাঁর চরিত্রের আসল গুণ।

ইবন বতুতার লেখায় মহম্মদের রাজসভার বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। সুলতানের ছিল একটি বিশাল দরবার কক্ষ, সেখানে সাদা কাপড়ে ঢাকা মঞ্চের উপর সুলতানের সিংহাসন ছিল। সুলতান পা মুড়িয়ে প্রার্থনার ভঙ্গিতে সিংহাসনে বসতেন। এই দরবার কক্ষে (Audience Hall) ঢোকার চারটি প্রবেশ পথ ছিল। সুলতান সাধারণত বিকালের দিকে দরবারে বসতেন। উজির, কর্মসচিব, ব্যক্তিগত সচিব, নকিব ও অন্যান্যরা তাঁর পেছনে দাঁড়াত, সশস্ত্ররক্ষীরা থাকত, একজন চামর নিয়ে মাছি তাড়াত।

সুসজ্জিত ঘোড়া ও হাতিগুলি তাঁর সামনে দিয়ে চলে যেত, হাতিগুলি মাথা নীচু করে সুলতানকে অভিবাদন জানাত। মাঝখানে থাকত সুলতানের দর্শনপ্রার্থীরা। সভার লোকেরা বিসমিল্লা বলে ধ্বনি তুলত, দর্শনার্থী হিন্দু হলে 'আল্লাহ তোমায় পথ দেখাক' (হদাফুল্লাহ) ধ্বনি তোলা হতো। রাজসভায় দর্শনার্থীরা উপঢৌকন নিয়ে আসত, কর্মচারীরা তা গ্রহণ করে আরো বেশি উপঢৌকন ফেরত দিতো, এটাই ছিল প্রথা। দুটি ঈদ অত্যন্ত ধুমধামের সঙ্গে পালন করা হতো। সুলতান উৎসবের সময় বিশিষ্ট ব্যক্তি ও কর্মচারীদের উপহার দিতেন। হাতি ও ঘোড়াগুলিকে বস্ত্র দিয়ে সাজান হতো, হাতির পিঠে রাজকীয় পতাকা শোভা পেত, এদের নিয়ে রাজকীয় শোভাযাত্রা বেরুত। অভিজাত, সৈনিক, কাজী, কর্মচারী সকলে এতে যোগ দিতো। সুলতান মস্‌জিদে গিয়ে প্রার্থনা করে ফিরে আসতেন, শোভাযাত্রা চলাকালীন আল্লাহো-আকবর ধ্বনি দেওয়া হতো। প্রত্যেক অভিজাত ব্যক্তির পতাকা ও বাদ্যযন্ত্র ছিল। সুলতানের নিজস্ব পতাকা, নাকাড়া, ভেরি, দামামা, তুরি, শিঙ্গা ও সানাই ছিল। উৎসবের সময় প্রাসাদকেও সাজানো হতো, শামিয়ানা টাঙানো হতো, সুন্দর পর্দা ঝোলানো হতো। উৎসবের সময় সোনার সিংহাসন ও ধুনুচি বার করা হতো, ধুনুচির সুগন্ধে প্রাসাদ আমোদিত হয়ে উঠত। খাওয়া-দাওয়া হতো, গান ও বাজনার ব্যবস্থা ছিল, সাতদিন ধরে নানা অনুষ্ঠান হতো। এইসময় সুলতান আত্মীয়-স্বজনদের বিবাহের ব্যবস্থা করতেন, প্রচুর উপহার বিলোতেন, দাসদের মুক্তি দিতেন।

সুলতান সাধু, যোগী ও দরবেশদের শ্রদ্ধা করতেন। একবার সুলতান বতুতাকে হিন্দু যোগীদের অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়েছিলেন। অবিশ্বাস্য এই অলৌকিক ক্ষমতা দেখে বতুতা বিস্মিত হন। তাঁর সামনে একজন হিন্দুযোগী সুলতানের আদেশে বসা অবস্থায় শূন্যে উঠে যান, আবার তাঁর গুরুর আদেশে ভূমিতে নেমে আসেন। সুলতান সুফি ও সন্তদের সরকারি কাজে নিয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু সেযুগের শ্রেষ্ঠ সুফিরা সরকারি কাজ পছন্দ করত না। এই নিয়ে শেখ শিহাবুদ্দিনের সঙ্গে সুলতানের বিরোধ বেধেছিল। বতুতা এই সুফি দরবেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন, এজন্য তাঁকেও সুলতানের রোষ দৃষ্টিতে পড়তে হয়েছিল। শিহাবুদ্দিন সুলতানকে স্বৈরাচারী বলেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেছিলেন যে সুলতান দিল্লির সব অধিবাসীকে জোর করে দৌলতাবাদে নিয়ে গিয়েছিলেন। সুলতান শিহাবুদ্দিনকে মৃত্যুদণ্ড দেন। বতুতা সুলতানের কাজ ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাস নেন, ফকির হয়ে যান। সুলতান তাঁকে অনুরোধ করলেও তিনি আর কোনো পদ গ্রহণ করেননি, তবে সুলতানের দূত হিসেবে চীনে যেতে রাজী হন (১৩৪২)।

বতুতা সুলতানের কারাচল অভিযানের কথা উল্লেখ করেছেন, এতে সুলতানের বহু সৈন্য মারা যায়। পরে সুলতানের সঙ্গে তাদের সন্ধি হয়। বতুতা দুর্ভিক্ষের মর্মান্তিক

পরিণতির কথা জানিয়েছেন। তিনি নিজের চোখে দেখেছিলেন কয়েকমাস আগে মারা যাওয়া একটি ঘোড়ার চামড়া তিনজন স্ত্রীলোক কেটে খাচ্ছে। হরিয়ানা অঞ্চলে নির্জন, পরিত্যক্ত গ্রাম দেখেছিলেন। ইবন বতুতা ভারতের সামাজিক জীবনের কিছু কথা তুলে ধরেছেন। হিন্দুস্তানে মহিলা বন্দীরা ছিল খুব সস্তা, উপহার সামগ্রীর মধ্যে থাকত দাস-দাসী। তবে মহিলা দাসীরা হতো খুব নোংরা এবং শহরের চাল-চলন জানত না। উজির তাকে দশজন মহিলা দাসী উপহার দেন, তিনি তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে এদের বিলিয়ে দেন। ভারতের হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তারা দলবেঁধে বাস করে, মুসলমানরা তাদের ওপর আধিপত্য করে। চৌধুরীরা হলো (জমিদার) হিন্দুদের প্রধান। মুতাশরিফ এদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করে। বতুতা ভারতের প্রশাসনিক ব্যবস্থার যে পরিচয় রেখেছেন তাতে দেখা যায় এই ব্যবস্থা ছিল দুর্নীতিগ্রস্ত। সুলতান বতুতাকে কিছু টাকা মঞ্জুর করেন, খাজাঞ্চি তার কাছে এজন্য ঘুষ চেয়েছিল। দক্ষিণ ভারতে প্লেগের উপদ্রবের কথা তাঁর লেখা থেকে জানা যায়। বতুতা সেযুগের বিখ্যাত দরবেশ কামালুদ্দিন সালার মাসুদ ও শেখ সামসুদ্দিনের কথা উল্লেখ করেছেন।

১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে বতুতা সুলতানের প্রচুর উপঢৌকন নিয়ে চীনের পথে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু ভাগ্যবিরূপ হওয়ায় তিনি ১৩৪৭ খ্রিস্টাব্দের আগে চীনে পৌঁছুতে পারেননি। তিনি দিল্লি থেকে বেরিয়ে আলিগড়ে আসেন (কোয়েল), এখানে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়েন। সেখান থেকে যান কনৌজ, কনৌজ থেকে গোয়ালিয়র, চান্দেরী, ধর উজ্জয়িনী হয়ে তিনি দৌলতাবাদের পথ ধরেছিলেন। এসব শহরের তিনি অল্পবিস্তর বর্ণনা দিয়ে গেছেন। দৌলতাবাদের মারাঠা মহিলাদের সৌন্দর্যের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। এখানকার ধনী ব্যবসায়ী শাহ্দের কথাও উল্লেখ করতে ভোলেননি। তিনি জানিয়েছেন যে এই অঞ্চলে প্রচুর আঙুর ও বেদানা উৎপন্ন হয়। দিল্লিতে যেমন তেমনি দৌলতাবাদে গায়ক ও নর্তকীদের মহল্লা আছে। এখানকার মানুষ মাছ-মাংস খায় না, নিরামিশাষী, প্রত্যহ স্নান করে, মদ্যপানকে পাপ বলে মনে করে। নদীর ধারে কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের জন্য তিনি জলচক্র দেখেছিলেন। শহরের লোকেরা ন্যায়নিষ্ঠ ও ধার্মিক, অতিথিদের আপ্যায়ন করে। দক্ষিণের নন্দরবার থেকে তিনি ক্যাম্বে আসেন, ক্যাম্বে থেকে হোনাভুর, সেখান থেকে মালাবার। ইবন বতুতা গোলমরিচের দেশে এলেন। এখানকার অধিবাসীরা হিন্দু, তারা অহিন্দুদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলে। মালাবার উপকূলের নারকেল, গোলমরিচ, সুপারি ও কলার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। এখানে বড় বড় জলাশয় তিনি দেখেছেন (বাইন)। কালিকটের রাজার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। এখানে তেরোখানি চীনা জাহাজ ছিল, তার একখানিতে তিনি চীনে যাবার ব্যবস্থা করলেন, উপহার সামগ্রীসহ সেই জাহাজ ডুবে যায়।

কালিকট থেকে তিনি কুইলনে যান, সেখান থেকে হোনাভুর, সেখান থেকে তিনি যান মালদ্বীপে। দুহাজার দ্বীপ নিয়ে গড়া মালদ্বীপ, বাসিন্দারা সকলে মুসলমান, দুধ, মাছ, নারকেল, ফল হলো প্রধান ফসল। এখানে তিনি বিচারকের পদ নেন, বিবাহ করেন। এখানকার মেয়েদের তিনি উচ্চ প্রশংসা করেছেন, এখানকার মেয়েরা অত্যন্ত সেবাপরায়ণা। এখানে বেশ কিছুকাল কাটিয়ে তিনি সিংহলে চলে আসেন (সাইলন)। এখান প্রচুর দারুচিনি উৎপন্ন হতো, এখানে মূল্যবান পাথর পদ্মরাগ, পোখরাজ ও নীলা পাওয়া যেত। এখানে তিনি বুদ্ধের পদচিহ্ন (আদমের) দেখেছিলেন, দেবদাসী প্রথার উল্লেখ করেছেন। সিংহল থেকে তিনি মাবার রাজ্যে আসেন, সেখান থেকে কালিকট, দ্বিতীয়বার মালদ্বীপ ঘুরে তিনি বাংলায় আসেন।

বাংলা তার মতে একটি বিরাট দেশ, প্রচুর ধান হয়, জিনিসপত্র খুব সস্তা। খুরাসানীরা বলে বাংলা হলো 'ভালো জিনিসে ভরা একটি নরক' (দোজখ-ই-পুর নিয়ামত), একটি দিনারে এখানে ১৪সের চাল কেনা যায়। বাংলার লোকেরা মনে করে দেশে জিনিস-পত্রের দাম বেড়েছে। মরক্কোর অধিবাসী মহম্মদ-উল-মসখুদি তাঁকে বলেন যে তাদের তিনজনের সংসারের বার্ষিক ব্যয় হলো আট দিরহাম। একটি দুধেলা গাই বিক্রি হত তিন দিনারে, এক দিরহামে আটটা মুরগি পাওয়া যায়। ভেড়া, চিনি, ঘি ও অন্যান্য পণ্যের দামও সস্তা বলে তিনি জানিয়েছেন। তিরিশ হাত মিহি কাপড়ের দাম হল দু দিনার। একজন সুন্দরী বাঁদীর দাম হল এক সুবর্ণ দিনার। তিনি নিজে একটি সুন্দরী দাসী কিনেছিলেন, নাম আসুরা। তার সঙ্গী দুই দিনারে একটি সুশ্রী বালক কিনেছিলেন। তিনি বাংলার চট্টগ্রাম বন্দরে এসেছিলেন (সুদকাওয়ান), বন্দর শহর চট্টগ্রাম। সুলতান ফকরুদ্দিন তখন পূর্ববাংলার শাসক, তিনি সন্ত ও দরবেশদের পছন্দ করতেন। একজন ফকিরকে তিনি চট্টগ্রামের নায়েব নিযুক্ত করেন। চট্টগ্রাম থেকে বতুতা শ্রীহট্টে (তাব্রিজ) দরবেশ শেখ জালালুদ্দিনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে নদী পথে সোনারগাঁ ফিরে আসেন। নদীর দুই তীরের শ্যামলিমা তাকে মুগ্ধ করেছিল, নদীর ধারে তিনি জলচক্র দেখেছিলেন। নদীর বুকে তিনি অগণ্য বাণিজ্যতরী দেখেছিলেন। সোনারগাঁ থেকে জাহাজ ধরে সুমাত্রা হয়ে তিনি চীনে পৌঁছেছিলেন।

ইবন বতুতা বহু দেশ ভ্রমণ করেছিলেন, পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকার বহু শহর তিনি দেখেছিলেন। দেশ ও মানুষ সম্পর্কে তার প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল, ভারতে তিনি উচ্চপদে ছিলেন। অভিজাত শ্রেণীর জীবনযাত্রা ও দরবার সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। সত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল, সত্যকে তিনি অকপটে প্রকাশ করেছেন। নিজের যৌনজীবনকে তিনি গোপন করেননি। দেশে ফিরে গিয়ে তিনি ভারতের কথা লিখেছেন, মহম্মদের মূল্যায়ন করেছেন। বারানি, আফিফ ও

ইসামী এইভাবে লিখতে পারেননি। রাজবংশ ও অভিজাততন্ত্রের কথা তাঁরা খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করতে পারেননি। ইবন বতুতার ইতিহাস দরবারি ইতিহাস নয়, বরং দরবারি ইতিহাসের ব্যতিক্রম। দরবারি ইতিহাসের ত্রুটিগুলি তাঁর বর্ণনা থেকে সংশোধন করার সুযোগ পাওয়া যায়। মহম্মদ তুঘলকের চরিত্র চিত্রণে তিনি হলেন নির্ভরযোগ্য প্রাথমিক উপাদান। ইবন বতুতার বর্ণনার ত্রুটি হলো তিনি আলবেরুনির মতো এদেশের সমাজ, সংস্কৃতি, দর্শন, ধর্ম ইত্যাদি বোঝার চেষ্টা করেননি। সম্ভবত রক্ষণশীল মানসিকতার জন্য তা সম্ভব হয়নি। তিনি হিন্দু যোগীদের অলৌকিক ক্ষমতা দেখে বিস্মিত হয়েছেন, তাদের ধর্ম ও সমাজ নিয়ে আলোচনা করেননি। তাঁর বর্ণনায় ভারতের সামগ্রিক জীবনের কথা নেই, আছে খণ্ড, বিক্ষিপ্ত চিত্র। তাঁর বর্ণনায় ভারতের সমৃদ্ধ শিল্প ও সংস্কৃতির বিবরণ নেই। এসব সত্ত্বেও বলা যায় ইবন বতুতা যে বর্ণনা রেখে গেছেন তার মূল্য অপরিসীম।

শামস-ই-সিরাজ আফিফ

শামস-ই-সিরাজ আফিফের ইতিহাস হলো ফিরুজ তুঘলকের রাজত্বকালের ইতিহাস (১৩৫১-১৩৮৮)। তাঁর রচিত, ইতিহাসের নাম দিয়েছেন *তারিখ-ই-ফিরুজশাহী*, বারানির ইতিহাসের ঐ একই নাম। আফিফ গিয়াসউদ্দিন তুঘলক, মহম্মদ তুঘলক, ফিরুজ তুঘলক এবং ফিরুজের মৃত্যুর দশ বছর পরে (১৩৯৮) দিল্লির ওপর তৈমুরের আক্রমণ নিয়ে একখানি মহাগ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন। হয়তো তিনি এদের নিয়ে লিখেছিলেন কিন্তু তার কিছুই পাওয়া যায়নি। ফিরুজ তুঘলকের যে ইতিহাস পাওয়া যায় তাও সম্ভবত সম্পূর্ণ নয় (the extant version of what he wrote about Firuz Shah Tughlaq is by no means complete.)। তিনি পাঁচভাগে ভাগ করে সুলতান ফিরুজ শাহের গুণাবলীর (মনাকিব) পরিচয় দিয়েছেন। ইতিহাসের ঘটনাবলীর তিনি নিজস্ব ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তিনি কেন ইতিহাস লিখতে গেলেন তারও একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তৈমুর কর্তৃক দিল্লি লুণ্ঠনের পর তিনি *তারিখ-ই-ফিরুজশাহী* লিখেছিলেন। সম্ভবত ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজের সম্পর্কে যা বলেছেন তা হলো যখন তিনি ইতিহাস লেখেন তখন তিনি বৃদ্ধ, ক্ষীণ, দুর্বল শরীরের মানুষ। তাঁর পিতা সাবনবিশ-ই-খাবাসান (সুলতানের ক্রীতদাসদের অফিসার) ও দেওয়ান-ই-উজিরাতের কর্মচারী ছিলেন। তিনি নিজে কোনো সরকারি পদে ছিলেন না (he does not mention holding any official post himself)।

বারানি আশাহত হয়ে ইতিহাস রচনার কাজে মন দেন, আফিফ আশাহত হয়ে বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা দ্বারা তাড়িত হয়ে ইতিহাস রচনা করেননি। পিটার হার্ডি জানিয়েছেন

যে বারানি ও আফিফের দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য ছিল (the Tarikh-i-Firuz Shahi is not suffused by any sense of disappointed ambition or neglected merit.) তৈমুরের ভারত আক্রমণের ঘটনাটি ঐতিহাসিকের মনের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। দিল্লির স্বর্ণযুগের পরিচয় তুলে ধরে তিনি সম্ভবত তৈমুরের বীভৎসতার প্রেক্ষাপট রচনা করতে চেয়েছিলেন। তবে এ সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। ঐতিহাসিক হিসেবে আফিফ মনে করেন যে তাঁর কাজ হলো শাসকদের গুণাবলীর কথা তুলে ধরে পাঠককে অবহিত করা (it was merely his duty to record great deeds for the edification of his readers.)। আফিফের ইতিহাস হলো 'মনাকিব', শাসকের গুণাবলীর পরিচয়। তারিখ-ই-ফিরুজশাহী হলো এই ধরনের ইতিহাস, গ্রন্থখানি অবশ্যই জীবনীমূলক। ইসলামী ঐতিহ্যে 'মনাকিব' লেখার চলন ছিল, সন্ত, ধর্মশাস্ত্রবিদ ও ধর্মীয় প্রধানদের মনাবিক বা জীবনী লেখা হতো, সন্ত ও দরবেশদের জীবনী পাঠ করে জনগণ শিক্ষা লাভ করত। আফিফের ইতিহাস হলো মনাকিব-ই-ফিরুজশাহী। এখানে যা উল্লেখযোগ্য তা হলো আফিফ ইসলামী সংস্কৃতির এই সাহিত্য শাখাকে ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। এজন্য অনুমান করা হয় তার রচনার পেছনে সুফি দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা সক্রিয় ছিল (strong sufi undertones)।

আফিফ ফিরুজের জীবনী রচনার কাজ শুরু করেছেন এমনভাবে যেন তিনি একজন সন্তের জীবনী লিখছেন। আল্লাহ্ দুটি জগৎ সৃষ্টি করেছেন—ইহলোক ও পরলোক। যারা তার আদেশ যথাযথভাবে পালন করে এবং তার ভজনা করে তারা স্বর্গসুখ লাভ করে। আল্লাহতালার প্রেরিত পুরুষ মহম্মদ হলেন দুই জগতের প্রধান, তিনি হলেন প্রকৃত সুফি, ক্ষমতার প্রতি তার আসক্তি নেই। তিনি তার ক্ষমতা উলেমা, মাশেখ ও সুলতানদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সুলতানরা ধর্মগুরুদের আদর্শ অনুযায়ী চলেন। আফিফ আদর্শ সুলতানের পালনীয় দশটি কর্তব্য ও গুণাবলীর কথা (মাকামাত) উল্লেখ করেছেন। মাকামাতের উল্লেখ থেকে মনে হয় আফিফ কোনো সুলতানের নয়, একজন পুণ্যাত্মা দরবেশের জীবনী লিখছেন (Afif intended to write in a manner befitting a biographer of a pious Sufi rather than a politic sultan.)। 'মকাম' শব্দের প্রয়োগ করে তিনি আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে পার্থিব জগতের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। তিনি ইতিহাসে তত্তবা (অনুশোচনা), ওয়ারা (wara) (বেআইনি কাজ থেকে দূরে থাকা) বা রিজা (আল্লাহতালার কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ) করার কথা বলেছেন। সাধনার দ্বারা কোনো দরবেশ এসবের অধিকারী হন।

আফিফের দশটি 'মকামাত' (গুণাবলী) হল ঃ (ক) শাফাকাত—সৃষ্ট প্রাণীর প্রতি করুণা, প্রত্যেক ন্যায়নিষ্ঠ বিজ্ঞ সুলতান এই করুণার অধিকারী হবেন। (খ) আফ (Afw) হলো ক্ষমা। সুলতান অন্যের পাপকে ক্ষমা করার মতো উদার হবেন। (গ) আদল ও ফজল হলো বিজ্ঞতা ও ন্যায়বিচার। (ঘ) মুকাতিল ও মুহারিব হলো সমস্ত অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা। সুলতান হবেন সত্য ধর্মের রক্ষক। (ঙ) সুলতান *ইতহার* ও *ইফতিখার* অনুশীলন করবেন। তিনি উদারভাবে মানুষকে উচ্চস্তরে আরোহণের সুযোগ করে দেবেন। (চ) সুলতানের থাকবে অজামত ও রব (ক্ষমতা ও গাম্ভীর্য)। এই ক্ষমতা ও গাম্ভীর্য দিয়ে তিনি বিধর্মীদের দমন করবেন। (ছ) সুলতান সবসময় সাবধানী হবেন (হুঁশিয়ারি) এবং বিদারি (সতর্ক) থাকবেন। তিনি ভাল কাজের দিকে বেশি নজর দেবেন, পার্থিব দ্রব্যের প্রতি লিপ্সা সংযত রাখবেন। (জ) সুলতান হবেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন (ইনতিবা ও ইবরাত), তিনি জনগণের সামনে সৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন। (ঝ) সুলতান নিজের মধ্যেকার অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে সফল হবেন (ফত) এবং বিধর্মী ও রাষ্ট্রের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই (নুসরাত) চালাবেন। (ঞ) সুলতান দূরদৃষ্টির অধিকারী হবেন (কিয়াসাত ও ফিরাসাত) ধর্ম, রাষ্ট্র ও সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করবেন। আফিফ জানাচ্ছেন যে চল্লিশ বছর ধরে সুলতান ফিরুজ তুঘলক দেশে শান্তি বজায় রেখেছিলেন, দেশের কোথাও একটি পাতাও নড়েনি (not a leaf stirred on the tree of dominion.)। ফিরুজশাহীর প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত আফিফ ফিরুজ শাহের স্তুতিগান করেছেন গদ্য কবিতায়।

আফিফ লিখেছেন যে ফিরুজের আগেকার সুলতানরা রাজ্য রক্ষার জন্য তরবারি হাতে তুলে নিয়েছেন। এরা জানতেন না যে আল্লাহর ইচ্ছায় রাজ্য স্থিতিশীল হয়, কোনো লোকের প্রাণহরণ করা অন্যায় কাজ। সুলতানি আমলের শ্রেষ্ঠ শাসক ফিরুজ (the seal of the Sultan of Delhi) সত্য ও ন্যায়বিচারের পথ ধরে প্রজাদের হৃদয় জয় করে নেন (Firuz Shah Tughluq resorted to justice and fair dealing to win the hearts of men.)। আফিফের ভাষায় ফিরুজ হলেন সেই যুগের ইমাম। তার শাসনকালে মোঙ্গল আক্রমণের ঘটনা ঘটেনি, অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহে রাষ্ট্রের শান্তি নষ্ট হয়নি। আফিফ দিল্লিতে এমন কথাও শুনেছিলেন যে সুলতানের জন্য রাজ্যে দুর্যোগ নেই, তাঁর মৃত্যুর অল্পকাল পরে দিল্লির ওপর ভয়ঙ্কর অভিশাপ নেমে এসেছিল। মক্কাতেও অঘটন ঘটেছিল, ধর্মীয় কাজকর্মের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হয়েছিল। আফিফ তার পাঠকদের জানিয়েছেন তাঁর ইতিহাসের নায়ক সুলতান সাধারণ মানুষ নন, তিনি হলেন একজন ওয়ালি, আল্লাহর প্রিয়পাত্র। আফিফের সমস্যা হলো তিনি সন্তের

জীবনীর প্রচলিত ধারায় একজন পার্থিব সুলতানের চিত্র এঁকেছেন। পরিস্থিতির উপস্থাপন করে তিনি একজন শাসকের ব্যক্তিত্বের মূল্যায়নের চেষ্টা করেননি। তার কাছে প্রেক্ষিত সুলতানের ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতাকে আরো উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ করেছে, প্রেক্ষিতের প্রভাবে সুলতানের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠেনি।

আফিফ ফিরুজের জীবনের পটভূমি এমনভাবে প্রস্তুত করেছেন যে পাঠকের মনে হবে তিনি কোনো সন্তের জীবনী লিখতে বসেছেন (Hagiology)। মহামানবের আবির্ভাবের নানা লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, ঘটনাকে প্রতীক অর্থে ব্যবহার করে অর্থপূর্ণ করে তোলা হয়েছে। ফিরুজের পিতা ও মাতার চরিত্রকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে তাদের পুত্র অবশ্যই শেখ-সুলতান, ইমাম মালিক বা হাজী-বাদশাহ হবেন। ফিরুজের পিতা সিপাহশালার রজব সব গুণের আধার ছিলেন। আলাউদ্দিন রজব ও দুজন তুঘলককে উচ্চপদ দেন। রজবের পিতৃব্য গিয়াসউদ্দিন তুঘলক এক হিন্দু রাজার কন্যাকে জোর করে তার সঙ্গে বিয়ে দেন। রজবের এই হিন্দু স্ত্রী নয়লা বিবির সন্তান হলেন ফিরুজ। আফিফ জানিয়েছেন এই হিন্দু রমণী ফিরুজের পিতার মতো তেজস্বিনী ছিলেন। ১৩০৯ খ্রিস্টাব্দে ফিরুজশাহ্ তুঘলকের জন্ম হয়। ফিরুজের সাতবছর বয়সে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়, গিয়াসউদ্দিন তুঘলক রাজপুত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এইসময়ে তাঁর সৌভাগ্যের অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। সেই সময়কার সন্তরা বলেছিলেন যে ফিরুজ সুলতান হবেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর দিল্লির পতন ঘটবে। মহম্মদ তুঘলক তাঁকে শাসনকার্যে দক্ষ করে তোলার জন্য নানাধরনের শিক্ষা দেন, মহম্মদের চারজন ডেপুটির একজন ছিলেন ফিরুজ।

ফিরুজ এক ধর্মরাজ্যের শাসক হয়ে বসেন, সিন্ধু প্রদেশে বিদ্রোহ দমনকালে মহম্মদ তুঘলকের আকস্মিকভাবে মৃত্যু হয়। সৈন্যবাহিনীর সামনে ছিল মোঙ্গল আক্রমণের আশঙ্কা। সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যেসব মালিক, শেখ ও উলেমারা ছিলেন তাঁরা মনে করেন যে তাঁদের একজন ইমামের প্রয়োজন যিনি তাদের নেতৃত্ব দেবেন। সিন্ধু থেকে দিল্লি অনেক দূরে এবং তাঁরা শত্রু পরিবেষ্টিত। সুতরাং তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন যে ফিরুজ তাদের সুলতান হবেন। ফিরুজ আপত্তি জানিয়েছিলেন, মক্কায় যাবার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন। একজন অভিজাত প্রায় জবরদস্তি করে তাঁকে-সিংহাসনে বসিয়ে দেন, ফিরুজ কাঁদতে কাঁদতে রাজমুকুট পরিধান করেন। তিনি রাজকীয় পোশাক পরতে অস্বীকার করেন কারণ তখন মহম্মদের জন্য শোক পালন চলছিল। মহম্মদের অন্য এক ভ্রাতুষ্পুত্র দাবর মালিকের দাবিকে বাতিল করা হয় কারণ তার চেয়ে ফিরুজ যোগ্যতর ছিলেন। আফিফ এমনভাবে ঘটনাটিকে উপস্থাপন করেছেন পাঠকের মনে হবে কোনো শাসক নন একজন ধর্মগুরু সম্প্রদায়ের নেতার মৃত্যুর পর দায়িত্ব গ্রহণ করছেন।

ফিরুজ তুঘলক বিনাবাধায় সিংহাসন লাভ করেননি। দিল্লিতে মহম্মদের প্রতিনিধি ছিলেন খাজা জাহান আহম্মদ আয়াজ, মহম্মদের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তিনি তাঁর শিশু পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে দেন। আফিফের ভাষায় এটি কোনো রাজনৈতিক সংঘাত ছিল না, এটি ছিল ধর্মের সঙ্গে জাগতিক মানুষের লড়াই। খাজা জাহান লোকটি মন্দ ছিলেন না, আসলে তিনি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তেমন উন্নতি করতে পারেননি। ফিরুজ এই সময় যেসব পদক্ষেপ নেন তা ছিল আল্লাহতালার আশীর্বাদপুষ্ট। সিন্ধুর থাট্টা থেকে ফিরুজ তাঁর অনুগামীদের নিয়ে দিল্লিতে আসেন। পথে তিনি অত্যন্ত শান্ত ও সংযত ছিলেন, সিন্ধু থেকে দিপালপুর হয়ে তিনি দিল্লিতে প্রবেশ করেন। এই পথ ধরে গিয়াসউদ্দিন দিল্লিতে প্রবেশ করে খসরু খানকে (বরদু) পরাস্ত করে ক্ষমতা দখল করেন। ফিরুজ এধরনের সংস্কারে বিশ্বাসী ছিলেন (good omen)। খাজা জাহানের সঙ্গে বিশ হাজার সৈন্য ছিল, কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তারা সব ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। যুদ্ধ না করেই ফিরুজ দিল্লিতে প্রবেশ করেন (Afif observed that this can only occur by the favour of God and not through the efforts of man.)। খাজা জাহান ফিরুজের কাছে আত্মসমর্পণ করেন, ফিরুজ তাকে ক্ষমা করতে চেয়েছিলেন। অভিজাতদের পীড়াপীড়িতে তিনি খাজাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে বাধ্য হন। খাজা শান্তভাবে মৃত্যুদণ্ড মেনে নেন, আফিফ সুলতানের করুণা ও দয়ার কথা বারবার উল্লেখ করেছেন।

তিনি সাধারণভাবে ঘটনার পারম্পর্য রক্ষা করে ফিরুজ তুঘলকের ইতিহাস বর্ণনা করে গেছেন। ঘটনার বর্ণনায় তিনি খুঁটিনাটিতে মনোনিবেশ করেছেন, তার ঐতিহাসিক পারম্পর্য কঠোরভাবে মেনে চলার কথা ভাবেননি [in recounting the events of the reign, Afif, though paying heed to a very general chronological sequence of events, does not attempt to place them in a close chronological order, althouh within particular episodes he does (but without dates) narrate a story in detail.]। আফিফ সব সময় তাঁর নায়ককে উজ্জ্বল করে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে সুলতান মকামাতগুলি যথাযথভাবে পালনের চেষ্টা করেছেন। ফিরুজ বাংলার বিরুদ্ধে দুবার সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। দুটি কারণে তিনি অভিযান চালাতে বাধ্য হন, একটি হলো গৌরব লাভ করা, দ্বিতীয়টি হলো অত্যাচারিতদের রক্ষা করা। তার বাংলা অভিযান দুটি ব্যর্থ হয়। তিনি থাট্টায় অভিযান চালিয়েছিলেন কারণ তাঁর মন্ত্রীরা ঐ অঞ্চল পুনরুদ্ধারের পরামর্শ দেন, যুদ্ধ করতে বলেন (it is a rule for kings to go and conquer enemy strong holds, every year.)। নিয়মবশত তিনি যুদ্ধ করেন আবার নিয়মবশত তিনি যুদ্ধ থেকে বিরত হন। দক্ষিণের মাবার রাজ্যের

মুসলমানরা তাঁকে হস্তক্ষেপ করার অনুরোধ করলে তিনি রাজী হননি। তাঁর উজির তাঁকে রাজকর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করেন এবং মুসলমানদের সঙ্গে লড়াই করলে যে ক্ষতি হয় তার উল্লেখ করেন। যুদ্ধের ফলে সুন্নি মুসলমানরা লাভবান হয়, প্রজারা সুখে থাকে, বিধর্মীদের দমন করা যায়। আবার বিদ্রোহ দমন করে নতুন অঞ্চল জয় করাও সম্ভব হয়। অসুবিধা হলো মুসলমানদের সঙ্গে লড়াই হলে ঈশ্বরের খাতায় তা নথিভুক্ত হয়। ইসলামের উন্নতির জন্য যে অর্থ সংগ্রহ করা হয়, ইসলামের শক্তিক্ষয়ে তা ব্যয় হয়ে যায়। হাজার হাজার মুসলমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কোনো ভালো কাজ হয় না। মুসলমান মহিলাদের সম্মান বিপন্ন হয়, অবৈধ অর্থ রাজকোষে জমা পড়ে। অন্য মুসলমান শাসক মুসলমানের বিরুদ্ধে লড়াই করতে উৎসাহিত বোধ করে। ভালো শাসক এধরনের কাজ করেন না, রোজ কিয়ামতের দিন (Day of Judgment)-এর জবাব দিতে হবে। এসব কাজের ফলে পয়গম্বর অসম্মানিত হন। উজির খান জাহানের যুদ্ধ সম্পর্কিত বক্তব্য শুনে ফিরুজের চোখদুটি অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে-কোনো মুসলমান শাসকের বিরুদ্ধে তিনি লড়াই করবেন না। চল্লিশ বছর (তিনি এই সংখ্যা কয়েকবার ব্যবহার করেছেন) ফিরুজ কোনো মুসলমানের ক্ষতি করেননি।

আফিফ জানিয়েছেন যে সুলতানের চরিত্রের সবচেয়ে মহৎগুণ হলো তার মহানুভবতা, রাজনৈতিক কারণে তিনি প্রজাকল্যাণের নীতি অনুসরণ করেননি। সারাজীবন তিনি আমলা ও সৈন্যদের অকাতরে সম্পদ বিলিয়েছেন। দরবেশ শেখ সদরুদ্দিন তাকে বলেছিলেন যে মৃত্যুর সময় একজন খাঁটি মুসলমানের দুটি চিন্তা থাকে। তিনি মৃত্যুর পর স্বর্গে যাবেন কিনা এবং তার পরিবারের কী হবে। সুলতান লৌকিক ও পারলৌকিক এই দুই দুশ্চিন্তা থেকে মুসলমানদের রক্ষা করেছেন। তিনি সৈনিকদের বেতনের পরিবর্তে ভূমিরাজস্বের বরাত দেন (ওয়াঝ), দেশের সব জমি খান, মালিক ও আমীরদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। যেসব সৈনিক ঠিকমত ঘোড়া রাখতে পারত না, তাদের তিনি ক্ষমা করে দেন। একজন সৈনিক মারা গেলে তার ওয়াঝ তার পুত্র, জামাতা, দাস, আত্মীয় ও পত্নীরা ভোগ করতে পারত, রাষ্ট্র তা অধিগ্রহণ করত না। তিনি রাষ্ট্রের সব বকেয়া প্রাপ্য ঋণ বাতিল করে দেন। তিনি জনকল্যাণমূলক আরও কয়েকটি কাজ করেন। দুঃস্থ কন্যাদের বিবাহের জন্য তিনি রাষ্ট্র থেকে সাহায্য দেন, কর্মহীনদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন। ফিরুজের রাজত্বকালে সর্বশ্রেণীর মানুষ সুখে ও সমৃদ্ধির মধ্যে ছিল (all classes of the people enjoyed boundless prosperity), ফিরুজের বদান্যতার জন্য তা সম্ভব হয়।

আফিফ সুলতানের প্রশংসা করেছেন কারণ তিনি হলেন সন্ত ও দরবেশদের পৃষ্ঠপোষক। দরবেশ শেখ কুতুবুদ্দিন মানওয়ার তাকে সুফি বলে উল্লেখ করেন। এই

দরবেশের আশীর্বাদ নিয়ে ফিরুজ নির্বিঘ্নে দিল্লিতে পৌঁছেছিলেন এবং তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন। যুদ্ধে যাবার আগে সুলতান দিল্লির কাছে সুফিদের সমাধিতে গিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতেন, তাদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করতেন (before every expedition the Sultan used to visit the tombs of the saints near Delhi and pray for divine assistance) আফিফ নিজের চোখে এসব দেখেছিলেন। নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সমাধিতে তিনি বেশি যেতেন। এই উপলক্ষ্যে সুলতান দান করতেন, প্রত্যেক সমাধিতে তিনি তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। এরা দরিদ্রদের দেখা-শোনা করত, আফিফের পিতা এধরনের কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। আফিফ জানাচ্ছেন যে সুলতান সে যুগের দরবেশ নুরুদ্দিনকে তার নতুন রাজধানী ফিরুজাতে বসবাসের জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শেখ রাজী হননি, তবে সুলতান আশা করেছিলেন শেখের আশীর্বাদে ফিরুজার নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত হবে। সুলতান একদিন স্বপ্নে সিপাহশালার মাসুদ গাজীকে দেখেছিলেন। তার পরামর্শে চুল, দাড়ি, গোঁফ সব কেটে ফেলেন, এরপর সুলতানকে ঠিক ধার্মিক লোকের মতো দেখাত। তিনি এরপর অধর্ম ও অনাচারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন।

আফিফের কাছে সুলতান ফিরুজ শাহ তুঘলক হলেন ধর্মের রক্ষক ও অধর্মের শত্রু (a scourge of unorthodoxy and a defender of the faith)। মিশরের আব্বাসীয় বংশীয় খলিফা তাঁকে খেলাত পাঠিয়েছিলেন (a robe of honour), তার ক্ষেত্রে এর বৈশিষ্ট্য হলো সুলতান মহম্মদ তুঘলকের মতো তিনি তা প্রার্থনা করেননি। আফিফ বলেছেন যে সুলতান হলেন সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যেমন পয়গম্বর হজরত ছিলেন পয়গম্বরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (the seal of the sultans as Muhammad was the seal of the prophets.)। সুলতান ইসলামী আইন বিরোধী সব কাজকর্ম বন্ধ করে দেন। চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য, স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্রের ব্যবহার, অবৈধ কর সব তিনি তুলে দেন (he abolished practices against the Muslim Holy Law such as painting, sculpture, the use of gold and silver vessels and the levying of unauthorized taxes and dues.)। ফিরুজের আগে কোনো দিল্লি সুলতান জিজিয়া স্থাপন করেননি, তিনি করেছিলেন, উলেমাদের মতামতকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। এদের পরামর্শ নিয়ে তিনি এক ব্রাহ্মণকে কঠোর শাস্তি দেন কারণ তিনি ধর্মদ্রোহিতার কাজ করেছিলেন (committed apostasy)। সেচ সেবিত এলাকায় কী হারে রাজস্ব ধার্য হবে সেব্যাপারেও তিনি উলেমাদের পরামর্শ নেন। ধর্মীয় আচার-আচরণ পালনের ক্ষেত্রে সুলতান কঠোরভাবে নিয়মরীতি মানতেন, তার সভাসদদের সামনে তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। মৃত্যুর আগে ইসলামী শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি উপযুক্ত ক্রীতদাসদের মুক্তি দিতে থাকেন।

ধর্মভীরু, গোঁড়া এই সুলতান ছিলেন একজন মহান নির্মাতা। তিনি শুধু সুরক্ষিত শহর ফিরুজা ও ফতেহাবাদ নির্মাণ করেননি, অনেকগুলি মসজিদ ও সমাধিসৌধ নির্মাণ করেন। জীবনের শেষ দিকে তিনি অনেকগুলি মসজিদের সংস্কার করেন এবং পয়গম্বরের ঐতিহ্য অনুসরণ করে তিনি এসব প্রতিষ্ঠানের ইমাম ও মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করেন। পথিকদের জন্য তিনি সরাইখানা নির্মাণ করে দেন এবং এগুলি দেখাশোনা করার জন্য খাঁটি সুন্নিদের নিযুক্ত করেন। হাসপাতাল স্থাপন করে তিনি তাদের ব্যয় নির্বাহের জন্য আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করেন। সুলতান শহরের মধ্যে ঘড়ি বসিয়ে শহরবাসীকে সময় জানানোর ব্যবস্থা করেন, এতে সময়মতো নামাজ পড়া ও রোজা রাখা সম্ভব হয়। সুলতানের সহকারীরা ছিলেন উদার, ভদ্র ও দয়ালু, এরা বিবেচনার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যয় করত। সুলতানের উজির তেলেঙ্গানার ধর্মান্তরিত হিন্দু খান জাহান মকবুল ছিলেন অনন্য (He was blessed with a peerless wazir.)।

আফিফ এযুগের অনেকগুলি বিস্ময়কর সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলির মধ্যে ছিল তিন ফুট উচ্চতার একজন বামন, বিশাল দুজন কৃষ্ণকায় দৈত্য সদৃশ মানুষ, দাড়ি বিশিষ্ট দুজন মহিলা, একটি ভেড়ার তিনটি পা, পাঁচ পায়ের একটি গাভী ইত্যাদি। আফিফ সুলতানের প্রশংসামূলক একখানি জীবনী গ্রন্থ রচনা করেছেন। সুলতান ফিরুজশাহ নরদেহী মানুষ নন, তার কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই, তিনি হলেন একজন দেবদূত। আফিফ তাঁর সময়কার নানা সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে সুলতান সেগুলির কীভাবে সমাধান করেছেন। তিনি পারম্পর্যপূর্ণ ধারাবাহিক ইতিহাস লেখেননি, ঘটনাগুলিকে নিয়ে ইতিহাস রচনা করেছেন (His treatment is topical, not chronological.)। পাঁচটি অধ্যায়ে তিনি ঘটনাগুলিকে সাজিয়েছেন (কিসম)। ফিরুজের জন্ম থেকে সিংহাসন আরোহণ পর্যন্ত হলো প্রথম অধ্যায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে লক্ষ্মণাবতীতে পরিচালিত দুটি সামরিক অভিযান, জাজনগর (ওড়িশা) ও নগরকোটের অভিযান। তৃতীয় অধ্যায়ে আছে থাট্টা অভিযান, জাম ও বাবিনিয়া অধিকার এবং ঘড়ি বসিয়ে (gong) শহরবাসীকে সময় জানানোর ব্যবস্থা। চতুর্থ অধ্যায়ে পাওয়া যায় যুদ্ধ থেকে সরে আসার নীতি এবং মানুষের হৃদয় জয়ের ইচ্ছা। পঞ্চম ও শেষ অধ্যায়ে আছে তাঁর মস্তক মুণ্ডনের কথা, যুবরাজ ফত খানের মৃত্যু এবং তার খান ও মালিকদের কৃতিত্বের কথা। এই সঙ্গে পাওয়া যায় ফিরুজের জীবনের শেষ দিনগুলির কথা।

ফিরুজের জীবনকে আফিফ যেভাবে সাজিয়েছেন সম্ভবত সেভাবে ঘটনা ঘটেনি। তিনি যুদ্ধের কাহিনীগুলিকে আগে স্থাপন করেছেন, পরে রেখেছেন শান্তিপূর্ণ শাসনের ইতিহাস। তারিখ-ই-মুবারক শাহীতে বলা হয়েছে যে সুলতান জীবনের শেষদিকে ১৩৮১-৮২ খ্রিস্টাব্দে কতেহরে (রোহিলখণ্ড) বিদ্রোহ দমনের জন্য সৈন্যবাহিনী

পাঠিয়েছিলেন। আফিফ দেখাতে চান সুলতান প্রথম জীবনে যুদ্ধে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, শেষজীবনে শাসনের কাজে তিনি সহনশীল পিতৃ হৃদয়ের পরিচয় রেখেছেন (Afif rather wishes to display the sultan first as a successful leader in war but with human instincts, and then as a reformed character, a gentle and pacific father of his people.)। আফিফ তাঁর ইচ্ছামত ঘটনা সাজিয়ে ইতিহাস লিখেছেন, কাব্যের দাবি অনুযায়ী চলেছেন, তার ইতিহাসে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত নেই। তিনি সুলতানের গুণাবলীর ওপর জোর দিয়েছেন (whatever he does is right and is right because he does it)। কোন্ পরিস্থিতিতে ঘটনা ঘটছে আফিফ তার ব্যাখ্যা দেননি। ফিরুজ বাংলা, থাট্টা, জাজনগর ও নগরকোটে অভিযান পরিচালনা করেছেন কারণ ঐসব অঞ্চলে অত্যাচার হয়েছে, তার বংশের প্রতি দুর্ব্যবহার হয়েছে, বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা প্রয়োজন বা সুলতান প্রতিবছর যুদ্ধ করবেন এটাই হলো রীতি। কোন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে সুলতান যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তার উল্লেখ নেই (He is not concerned to reconstruct the particular historical situations in a manner capable of explaining why such motives could be responsible for action at a particular time.)। ফিরুজ থাট্টা অভিযানের পর সৈন্যবাহিনীর দুরবস্থা দেখে যুদ্ধ পরিহার করে চলেন, আফিফ বলছেন যে ইসলামের ক্ষতি হবে ভেবে তিনি যুদ্ধ থেকে বিরত হন।

আফিফের বর্ণনায় ফিরুজের প্রজাহিতৈষী নীতির সঙ্গে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। সুলতান তার রাজস্বের প্রায় সবটাই সৈন্য ও আমলাদের মধ্যে বিলিয়ে দেন, রাষ্ট্রের পক্ষে এর ফল যে কী হতে পারে আফিফের বর্ণনায় তা পাওয়া যায় না। সম্ভবত আফিফ এ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। আলাউদ্দিন বিদ্রোহের ভয়ে ভূমিরাজস্বের বরাত দেওয়া বন্ধ করেন। আফিফ এই তথ্যের উল্লেখ করেছেন শুধু সুলতানের মহত্ত্ব দেখানোর জন্য। এধরনের ঘটনা যে ফিরুজের রাজত্বকালেও ঘটতে পারে সে ইঙ্গিত নেই। আলাউদ্দিনের সময়কার সস্তা বাজার দরের সঙ্গে ফিরুজের আমলের তিনি তুলনা করেছেন। আলাউদ্দিন বাজার নিয়ন্ত্রণ করে দ্রব্যমূল্য কমিয়েছিলেন। আফিফ জানাচ্ছেন যে ফিরুজের বিনা প্রয়াসে দ্রব্যমূল্য সস্তা ও স্থিতিশীল ছিল। সে যুগের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির তিনি বর্ণনা দেননি। মানুষের কর্মকাণ্ডের নিরিখে তিনি ইতিহাস লেখার কথা ভাবেননি (Afif is not concerned so to reconstruct the past as to explain historical events in terms of human volition.)।

আফিফের ইতিহাসের বিষয় হলেন ফিরুজ শাহ তুঘলক। তিনি সুলতানকে ব্যক্তি মানুষ হিসেবে দেখেননি যিনি সমকালীন ঘটনাবলীর ওপর প্রভাব রেখেছেন

(Afif is not concerned to present him as an individual, human figure, excercising a peculiar, invidual influence upon the events of his times.)। ব্যক্তি সুলতানের দোষগুণের কথা তিনি এড়িয়ে গেছেন। সুলতান হলেন একজন আদর্শ মুসলমান শাসক, ইনি সরিয়া প্রবর্তন করেছেন, বিধর্মীদের দমন করেছেন, সন্ত ও দরবেশদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সুলতান দয়ালু ও উদার-কর্মচারীদের মুক্ত হস্তে দান করেন, অনাথ ও দরিদ্ররা তার সহায়তা লাভ করে এবং তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন না। তাঁর জীবনী হয়ে উঠেছে একজন আদর্শ মুসলমান শাসকের জীবন্ত প্রতিমূর্তি। মানবিক পরিবেশে স্থাপন করে তিনি সুলতানের চরিত্র চিত্রণ করেননি (He is a tailor's dummy, rather than a figure of flesh and blood.)। ফিরুজের জীবনীর সঙ্গে সময় ও পারিপার্শ্বিকের কোনো সম্পর্ক নেই। এই দৈবী মানুষকে প্রকাশ করার কাজ হলো ইতিহাসের (History exists only to reveal what existed before history.)। ইতিহাস সুলতানের চরিত্র নির্মাণ করেনি, সুলতানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশে প্রেক্ষিত হিসেবে কাজ করেছে (History does not itself mould and develop the sultan's characteristics, it merely provides a stage for their manifestation.)। ঐতিহাসিক জানাচ্ছেন যে সুলতানের জন্মের মুহূর্তে জানা যায় যে তিনি একজন মহান ব্যক্তি হবেন (he was destined to be the man of his age)। সুলতানের কাজকর্ম ইতিহাস গড়ে তোলে না। এরকম এক সন্তের অস্তিত্বের জন্য জিনিসপত্রের দাম সস্তা হয়েছে, দেশে সমৃদ্ধি এসেছে, খলিফা স্বীকৃতি দিয়েছেন। এসবের মধ্যে কোনো কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই, ঈশ্বরের অমোঘ বিধানের এগুলি হলো অচ্ছেদ্য অঙ্গ (For Afif, these phenomena are merely complementary aspects of the great, divinely ordained, order of Being.)।

আফিফ মনে করেন ঘটনার বিবরণী প্রকাশ করা, পরিবর্তন নথিবদ্ধ করা ঐতিহাসিকের কাজ নয় (Historian's aim is not to record change)। এজন্য তিনি কয়েকটি ঘটনা বেছে নিয়েছেন, পারম্পর্য রক্ষা করেননি, একটি ঘটনা থেকে অন্য ঘটনায় তিনি স্বচ্ছন্দে চলে গেছেন। সুলতানের রাজত্বকালের বৈশিষ্ট্যগুলিকে যথাযথভাবে তুলে ধরা হলো তার কাজ। আফিফের ইতিহাস দর্শনের ভিত্তি হলো ইতিহাসের বাইরে গিয়ে স্রষ্টার সৃষ্টির বিধিনিয়মকে তুলে ধরা (Afif finds intelligibility in history only by looking beyond history itself to the whole order of divine creation.)। আফিফ জানিয়েছেন যে মানবিক ঘটনার পেছনে দৈব হস্তক্ষেপ কাজ করে, সন্তরা ঘটনাকে প্রভাবিত করেন। আফিফ কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন। খাজা জাহানের বিরুদ্ধে ফিরুজের সাফল্য, মহম্মদ খান ও খান জাহানের মধ্যে বিরোধ এবং

তৈমুরের আক্রমণ থেকে হান্সির লোকদের অব্যাহতি সবই হলো দৈব অনুগ্রহ ও সুফিদের দান। দৈব হস্তক্ষেপের অর্থ অনেক সময় বুদ্ধির অগম্য থাকে কারণ ফিরুজ সামসুদ্দিন আবু রিজা নামক একজন দুষ্ট লোককে দেওয়ান-ই-উজিরাতে নিয়োগ করেন। তারিখ-ই-ফিরুজ শাহীতে আফিফ মুসলিম ধর্মীয় ও নৈতিক বিধি-নিয়মগুলি তুলে ধরেছেন। ইতিহাস হলো সাহিত্যের একটি শাখা, এর মাধ্যমে তিনি সেই যুগের বিস্ময়কর ঘটনাগুলির কথা বলতে চেয়েছেন, কিন্তু সুলতান সব সময় কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। এক একসময় মনে হয়েছে সুলতান দৈবানুগৃহীত মানুষ নন, সাধারণ মানুষ, নাহলে তৈমুরের আক্রমণের মতো বীভৎস ঘটনা ঘটলো কীভাবে।

ঐতিহাসিক দেওয়ানি-উজিরাতের কর্মচারীদের কথা উল্লেখ করেছেন কারণ তার পিতা ঐ বিভাগের কর্মচারী ছিলেন। এই বিভাগের বিশৃঙ্খলার জন্য আবু রিজাকে দায়ী করেছেন। সুলতান এই বিভাগের অন্যদের সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হয়ে আবু রেজাকে মুস্তাওফি-ই-মামালিক (প্রদেশের হিসেবরক্ষক) নিযুক্ত করেন। আবু রিজা এই বিভাগের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে উৎকোচ নিতে শুরু করে দেন। উজির খাজা জাহান তাকে নির্বাসনে পাঠান, আফিফ এই ঘটনাটিকে নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। আবু রিজার মতো লোকেরা তৈমুরের আক্রমণের পটভূমি তৈরি করেছিল। ফিরুজের রাজত্বের শেষপর্বের ইতিহাসে তিনি পারম্পর্য অনুসরণ করেছেন। গুজরাটে শামসুদ্দিন দামঘানি বিদ্রোহ করেন (১৩৮১), কয়েকজন অভিজাত মারা যান। আবু রিজা দেওয়ান হন, তাকে নিয়ে উজিরাতে গোলযোগ দেখা দেয় (১৩৮৩), সুলতান অসুস্থ হয়ে পড়েন (১৩৮৭)। যুবরাজ মহম্মদ খানের সঙ্গে উজিরের বিরোধ বাধে এবং ফিরুজ মৃত্যু মুখে পতিত হন (১৩৮৮)। আফিফ এখানে পুরোপুরি ঐতিহাসিক হয়ে উঠেছেন। ফিরুজের ক্রীতদাস প্রীতি যে প্রাদেশিক বিদ্রোহের কারণ তা তিনি উল্লেখ করতে ভুল করেননি, তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন এসব হলো ঐতিহাসিক হিসেবে আফিফের গৌণ রচনা। বারানির মতো তিনি ঘটনার কার্য-কারণ নিয়ে মাথা ঘামাননি (offering a coherent interpretation of how and why things happen in history.)। তৈমুরের আক্রমণকে বিভাজন রেখা ধরে (great divide) তিনি তার আগেকার সুখ ও সমৃদ্ধির কথা স্মরণ করেছেন। দৈব হস্তক্ষেপকে তিনি দুর্জ্ঞেয় বলে উল্লেখ করেছেন। ইতিহাসের মধ্যে তিনি নীতিবোধ বা কর্মনীতির সন্ধান পাননি (He does not interpret the past in such a way as to teach specific principles and courses of action.)। ইতিহাস ধর্মের সৌন্দর্যকে প্রকাশ করে দেয়, ধর্ম শিক্ষা দেয় না।

ঐতিহাসিক হিসেবে আফিফ নির্ভরযোগ্য তথ্যকে অনুসরণ করেছেন (authorities), নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের সরবরাহ করা তথ্য তিনি গ্রহণ করেছেন। বিতর্কিত বিষয়

সম্পর্কে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা করেননি (Afif does not argue from his evidence in order to decide upon disputed issues.)। মহম্মদের মৃত্যুর পর খাজা জাহান দিল্লিতে তার শিশুকে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন ফিরুজের প্রতি বিরাগবশত নয়, দিল্লিতে নৈরাজ্যের আশঙ্কায়, সমকালীন ব্যক্তি কিশলু খানের কাছে তিনি এই তথ্য পেয়েছিলেন। এভাবে তিনি বিতর্কিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন। মহম্মদ ও ফিরুজ জ্বালামুখি মন্দিরের মূর্তি দর্শন করেছেন বলে প্রবাদ ছিল, আফিফ তার পিতার কাছ থেকে জেনেছিলেন যে ঘটনাটি সত্য নয়। ঐতিহাসিক সত্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে আফিফ ধর্মকে ব্যবহার করেছেন (Afif's criteria for ascertaining historical truth are ultimately religious.)। আফিফ যেখানে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাননি সেখানে নিজের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে লিখেছেন। ফিরুজের শেষ পর্বের ইতিহাস তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে লিখেছেন। মনাকিব শৈলীতে তৈমুরের আক্রমণের আগে দিল্লি সুলতানির স্বর্ণ যুগের ইতিহাস তিনি লিখে রেখে গেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাজনৈতিক কাঠামো

রাজনৈতিক ইতিহাস

১২০৬ খ্রিস্টাব্দে দিল্লি সুলতানির প্রতিষ্ঠা থেকে ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধ পর্যন্ত মোট ছটি রাজবংশ রাজত্ব করেছিল—ইলবারি তুর্কি (১২০৬-৯০), খল্‌জি (১২৯০-১৩২০), তুঘলক (১৩২০-১৪১৪), সৈয়দ (১৪১৪-৫১), লোদি (১৪৫১-১৫২৬) এবং শূর (১৫৪০-১৫৫৬)। ১৫২৬-১৫৪০ পর্যন্ত মোগলরা ক্ষমতায় ছিল। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তুর্কিরা বাংলায় লক্ষ্মণাবতী, রাজস্থানে আজমীর ও রণথম্ভোর, দক্ষিণে উজ্জয়িনী এবং পশ্চিমে মুলতান ও সিন্ধু পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেছিল। তুর্কিদের সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাজ্যে নানাধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছিল, এজন্য পরবর্তী প্রায় একশ বছর ধরে তাদের রাজ্য প্রায় গতিহীন, নিশ্চল হয়ে ছিল। তুর্কিদের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সমস্যা ছিল। প্রথমত, রাজস্থান, বুন্দেলখণ্ড এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বায়ানা ও গোয়ালিয়রের শাসকরা ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের প্রয়াস চালিয়েছিল। এই ক্ষমতার দ্বন্দ্বে উত্থানপতন ছিল, রাজপুতরা কখনো সংঘবদ্ধভাবে তুর্কিদের বিতাড়নের প্রয়াস চালায়নি। গঙ্গা উপত্যকা বা পাঞ্জাবে তুর্কিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়নি, একমাত্র ব্যতিক্রম হলো মৈজুদ্দিনের বিরুদ্ধে খোক্করদের বিদ্রোহ। যেহেতু রাজপুত রাজারা তুর্কিদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলেননি, তাঁদের ব্যক্তিগত বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন উদ্যোগকে 'তুর্কিদের বিরুদ্ধে হিন্দু প্রতিক্রিয়া' বলা ঠিক নয়। দ্বিতীয়ত, তুর্কি অভিজাতদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ছিল, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব থেকে রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছিল। তুর্কি শাসকদের এই অস্থিরতা দমনের জন্য সময় ও শক্তি ব্যয় করতে হয়েছিল। কয়েকজন তুর্কি শাসক নিজেদের জন্য স্বাধীন, স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস চালিয়েছিলেন। মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খল্‌জি ও তাঁর বংশধররা লক্ষ্মণাবতী ও বিহারকে দিল্লির প্রভাবমুক্ত রাখার প্রয়াস চালিয়েছিলেন। মুলতান ও সিন্ধু অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি সক্রিয় ছিল। কিছুকালের জন্য দিল্লি ও লাহোরের অভিজাতদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলেছিল। মাঝে মাঝে প্রাদেশিক গভর্নররা (ইক্‌তাদার) দিল্লির কেন্দ্রীয় শাসনকে অগ্রাহ্য করে চলত, তুর্কি শাসনের শুরু থেকে ভারতে আঞ্চলিকতা গড়ে উঠেছিল।

দিল্লি সুলতানির সূচনা থেকে মধ্য এশিয়ার রাজনৈতিক উত্থানপতন তার উপর প্রভাব বিস্তার করত। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে মৈজুদ্দিনের মৃত্যুর পর ঘুরি সাম্রাজ্য ভেঙে

পড়েছিল, মৈজুদ্দিনের প্রিয় ক্রীতদাস তাজউদ্দিন ইলদুজ গজনির শাসক হন। অন্য আর একজন ক্রীতদাস নাসিরুদ্দিন কুবাচা মুলতান ও উচের অধিকার লাভ করেন। লাহোরের আমীরদের আমন্ত্রণ পেয়ে কুতুবুদ্দিন লাহোর যান এবং দিল্লি সুলতানির সিংহাসনে বসেন। আইবক ও কুবাচা ইলদুজের দুই কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন, এদের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না, পাঞ্জাব নিয়ে এঁদের মধ্যে বিরোধ চলেছিল। আইবক লাহোরের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিলেন, লাহোর ছিল তাঁর রাজধানী। মার্ভের খাওয়ারিজম শাহ্ ছিলেন মধ্য এশিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী শাসক, তিনি ঘুর ও গজনি দখল করে নেন। গজনি ও ঘুর অধিকার করে ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হওয়ার আগেই তিনি মোঙ্গল আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েন। মোঙ্গল নেতা চিঙ্গিজ খান ১২১৮ খ্রিস্টাব্দে ট্রান্স-অক্সিয়ানা ও খোরাসান অধিকার করেন। মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার শহরগুলি মোঙ্গল আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যায়, নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চলেছিল, কারিগর, নারী ও শিশুদের ক্রীতদাস করা হয়। মোঙ্গল আক্রমণের ভালো দিক হলো এই অঞ্চলে বাণিজ্যের উন্নতি হয়, শহর ও শহরজীবন আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল। চিঙ্গিজ খান খাওয়ারিজম রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন, ট্রান্স-অক্সিয়ানা, সমরকন্দ ও বুখারার পতন ঘটে। খাওয়ারিজম শাসক জালালুদ্দিন মঙ্গবর্নী গজনি ও ঘুরে চিঙ্গিজকে বাধা দিয়ে তাঁর বিরাগভাজন হন। ১২২১ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধুতীরে তিনি মঙ্গবর্নীকে পরাস্ত করেন, জালালুদ্দিন সিন্ধু অতিক্রম করে পালিয়ে যান। ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে চিঙ্গিজ খানের মৃত্যুর পর মোঙ্গল সাম্রাজ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব দেখা দিলে তুর্কি শাসকরা দিল্লি সুলতানিকে সংহত করার সুযোগ পান। মোঙ্গলদের উত্থান এবং মধ্য এশিয়ার ঘুর সৈন্যবাহিনীর সমর্থন থেকে বঞ্চিত হবার জন্য ভারতে তুর্কি শাসকগোষ্ঠী দিল্লি সুলতানির দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটাতে পারেননি। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে মৈজুদ্দিনের মৃত্যু হলে মধ্য এশিয়ার রাজনীতির সঙ্গে দিল্লির প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। নিজেদের শক্তি ও সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে তুর্কি শাসকরা সুলতানি গড়ে তোলেন, এদেশের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ রাষ্ট্রব্যবস্থা তাঁদের গঠন করতে হয়। ধীরে ধীরে উত্তর ভারতে নতুন ধরনের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনধারা গড়ে উঠেছিল।

কুতুবউদ্দিন আইবক—দিল্লি সুলতানির প্রথম শাসক

মৈজুদ্দিন মহম্মদ ঘুরির প্রিয় ক্রীতদাস কুতুবউদ্দিন আইবক (১২০৬-১২১০) মৈজুদ্দিনের মৃত্যুর পর লাহোরে আমীরদের সমর্থন নিয়ে সুলতান হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করেন। তরাইনের দুই যুদ্ধে এবং পরবর্তীকালে উত্তর ভারতে সুলতানি রাজ্যের বিস্তারে তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। ভারতের রাজনীতিতে তাঁর প্রাধান্য ছিল, তিনি সৈন্যবাহিনীর প্রধান হিসেবে কাজ করতেন। তিনি মৈজুদ্দিনের সহকারী

হিসেবে কাজ করতেন কিন্তু তিনি তাঁর মনোনীত উত্তরাধিকারী ছিলেন না। নিজের প্রতিভাবলে তিনি সিংহাসনে বসেছিলেন, অল্পকাল পরে ঘুরের শাসক সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ তাঁকে ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তি দেন। মুসলিম আইনে একজন ক্রীতদাস শাসক হতে পারেন না। অধ্যাপক এ. বি. এম. হবিবুল্লাহ লিখেছেন যে সেইসময় ভারতে প্রতিষ্ঠিত তুর্কি রাজ্য অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সমস্যার মধ্যে পড়েছিল। দিল্লি সরকার তখনো সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল না, তুর্কি নেতাদের মধ্যে ঐক্যের অভাব ছিল। ঘুরির নতুন সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ যোগ্য ও দক্ষ ছিলেন না। মধ্য এশিয়ায় খাওয়ারিজম শাসক শক্তিশালী হয়ে উঠে গজনি দখলের কথা ভাবেন। হিন্দুরা প্রথম আক্রমণের ধাক্কা সামলে তুর্কি শক্তিকে আক্রমণ করতে থাকে, হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধারের দিকে নজর দিয়েছিল। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কালিঞ্জর পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয় এবং চান্দেল্ল রাজা আরও দক্ষিণে অগ্রসর হওয়ার কথা ভাবেন। গাঙ্গেয় উপত্যকায় বহু হিন্দু নেতা তুর্কিদের বিরোধিতা করার কথা ভেবেছিল। গহড়বাল শাসন তখনো নিঃশেষ হয়নি, এই বংশের শাসক হরিশচন্দ্র বদায়ুন ও ফারুখাবাদ জেলায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরিহাররা গোয়ালিয়র উদ্ধার করেছিল। পূর্বদিকে মুসলিম শক্তির ওপর বিরাট বিপর্যয় নেমে এসেছিল। দূরত্ব ও খল্‌জিদের গোষ্ঠী দ্বন্দের জন্য বাংলায় ও পূর্ব ভারতে মুসলিম শক্তির অগ্রগতি ব্যাহত হয়। মৈজুদ্দিনের মৃত্যুর সময় সিন্ধু ও পাঞ্জাবের কিছু অংশ এবং গাঙ্গেয় উপত্যকার ওপর তুর্কিদের প্রাধান্য ছিল। এখানে রাজপুত প্রতিরোধ ক্রমশ শক্তিশালী হতে থাকে।

মৈজুদ্দিন মহম্মদ ঘুরির কোনো পুত্রসন্তান ছিল না, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ ঘুরি রাজ্যলাভ করেন। তিনি উদ্যমী বা দক্ষ ছিলেন না। মৈজুদ্দিনের মৃত্যুর পর খাওয়ারিজম শাহ আগ্রাসী হয়ে উঠে গজনি দখলের পরিকল্পনা করেন। মৈজুদ্দিনের তিনজন প্রধান অনুগামী কার্যত তাঁর রাজ্য ভাগ করে নেন। তাজউদ্দিন ইলদুজ গজনি দখল করে আফগানিস্তান ও সিন্ধুর মধ্যবর্তী কারঘান ও সঙ্কুরণ অধিকার করেন। তাঁর জামাতা নাসিরুদ্দিন কুবাচা সিন্ধু (উছ) অধিকার করে শাসক হয়ে বসেন। আর হিন্দুস্তানের অধিকর্তা ছিলেন কুতুবুদ্দিন আইবক। ইলদুজ শুধু গজনি নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না, তিনি সমগ্র দিল্লি রাষ্ট্রের ওপর সার্বভৌমত্ব দাবি করেন। আইবক মধ্য এশিয়ার এই রাজনৈতিক টানাপোড়েন নিয়ে বিব্রত ছিলেন, তিনি ভারতে সুলতানি রাষ্ট্রের সংহতিকরণের কাজে মন দিতে পারেননি। সুলতান হওয়ার পর বেশিরভাগ সময় তিনি লাহোরে কাটিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী এবং দানশীল ব্যক্তি, প্রভুর প্রতি আনুগত্যে তিনি ছিলেন অবিচল। বলা হয়েছে গজনির সুলতান মাহমুদ তাঁকে সুলতান উপাধি দেন। দাবি করা হয়েছে যে তাঁর নামে খুৎবা

পাঠ করা হয় এবং তাঁর নামে মুদ্রা উৎকীর্ণ করে চালু করা হয়। তাঁর কোনো মুদ্রা পাওয়া যায়নি, আর খুৎবা পাঠের কোনো অকাট্য প্রমাণ নেই।

ক্ষমতালাভের পর আইবক মাত্র চারবছর বেঁচে ছিলেন। এই চারবছর তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এবং মধ্য এশিয়ার অস্থির রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। ইলদুজের ওপর খাওয়ারিজম শাহের চাপ বাড়লে তিনি লাহোরের দিকে অগ্রসর হন, আইবক তাকে প্রতিরোধ করেন, সিন্ধুর অপর পারে তাকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হন। আইবক গজনি জয় করার কথা ভেবেছিলেন কিন্তু এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়নি। গজনি জয় করলে তিনি বৃহত্তর রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে পড়ে যেতেন। খাওয়ারিজম শাহের সঙ্গে দ্বন্দ্বে তিনি লিপ্ত হয়ে পড়তেন, এতে দিল্লি সুলতানির নিরাপত্তা ও অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ত। আইবক লাহোর দখল করে রেখে সিন্ধুকে তাঁর সীমান্ত হিসেবে মেনে নেন। সিন্ধুর অপর পারের রাজনৈতিক আবর্তের সঙ্গে তিনি নিজেকে জড়াননি। তিনি গজনির সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করেননি তবে স্বাধীনভাবে দিল্লি সুলতানি চলতে থাকে। তিনি এর স্বতন্ত্র বিকাশের পথ ধরেন। হাবিব ও নিজামী লিখেছেন যে আইবক দিল্লি সুলতানির রূপরেখাটি তৈরি করে দেন। তিনি দুটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন—একটি হল এর স্বাধীন, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করা, অপরটি হল এর সীমান্ত নির্ধারণ করা। এই দুটি লক্ষ্য তিনি আংশিকভাবে পূরণ করতে সক্ষম হন, তবে প্রশাসনিক কাঠামো গঠনের দিকে নজর দিতে পারেননি (Aibak remained preoccupied with the problem of preserving his government's separate entity and of establishing a political frontier. That task was still unaccomplished when be died in A.D. 1210. But he had successfully initiated a state and outlined its foreign policy)।

উচ্চমানের এবং প্রভূত উদ্যমের অধিকারী আইবকের চরিত্রে তুর্কিদের সাহসিকতা এবং পারসিকদের বদান্যতার মিশ্রণ ঘটেছিল, অত্যন্ত দানশীলতার জন্য তাঁর নাম হয়েছিল 'লাখ বক্স'। আবার তুর্কিদের মতো তাঁর চরিত্রে নিষ্ঠুরতার অভাব ছিল না, লক্ষ মানুষকে হত্যা করতে তিনি দ্বিধা করতেন না। সমকালীন লেখকরা তাঁর উদারতা, দানশীলতা ও বীরত্বের প্রশংসা করেছেন। সে যুগের অনেক তুর্কি শাসক উদারতা ও ন্যায়বিচারের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছেন অথচ যুদ্ধে এরা ছিলেন ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর। হাসান নিজামী ও ফকরে মুদাব্বির দুজনেই তাঁর মধ্যে এক সংবেদনশীল পৃষ্ঠপোষক খুঁজে পেয়েছেন এবং তাঁদের রচনা তাঁর নামে উৎসর্গ করেছেন। অন্তত দুটি ঘটনায় পরাজিত হিন্দু রাজাদের পক্ষে তিনি তাঁর প্রভুর কাছে অনুরোধ রেখেছিলেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও বিশ্বস্ত কাজের জন্য মৈজুদ্দিন ভারতে তাঁর অধিকাংশ সাফল্য লাভ করেন। দিল্লি রাজ্য গঠনের বিশদ পরিকল্পনা এবং শক্তির জোগান দিয়েছিলেন কুতুবুদ্দিন

আইবক। দিল্লি সুলতানির রূপরেখাটির তিনি হলেন প্রথম রূপকার, এর বৈদেশিক নীতির স্রষ্টা।

মৈজুদ্দিন মহম্মদ ঘুরির প্রিয় ক্রীতদাস কুতুবুদ্দিন আইবক (১২০৬-১০) ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে মৈজুদ্দিনের মৃত্যুর পর লাহোরে আমীরদের সমর্থন নিয়ে সুলতান হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করেন। তরাইনের দুই যুদ্ধে এবং পরবর্তীকালে উত্তর ভারতে সুলতানি রাজ্যের বিস্তারে তাঁর ভূমিকা ছিল, ভারতের রাজনীতিতে তাঁর নিঃসন্দেহে প্রাধান্য ছিল। তিনি মৈজুদ্দিনের সহকারী হিসেবে কাজ করতেন কিন্তু তিনি মৈজুদ্দিনের মনোনীত উত্তরাধিকারী ছিলেন (ওয়ালিআহদ) একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। নিজ প্রতিভাবলে তিনি সিংহাসনে বসেছিলেন, অল্পকাল পরে ঘুরের শাসক সুলতান মাহমুদ তাঁকে ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তি দেন। মুসলিম আইনে একজন ক্রীতদাস শাসক হতে পারেন না। এই ঘটনার পর হিন্দুস্তানে গজনির শাসকের আর কোনো দাবি ছিল না। গোড়াতেই মধ্য এশিয়ার রাজনীতি থেকে দিল্লি সুলতানি মুক্ত হয়েছিল। ক্ষমতালাভের পর আইবক মাত্র চার বছর বেঁচে ছিলেন। ঐসময়ে তিনি দিল্লি সুলতানির বিস্তারের কাজে মন দিতে পারেননি। লাহোরে চৌগান খেলার সময় তিনি ঘোড়া থেকে পড়ে মারা যান। তাঁর সংক্ষিপ্ত শাসনকালের তাৎপর্য হলো দিল্লি সুলতানি স্বাধীনভাবে বিকাশের পথ ধরেছিল। সমকালীন লেখকেরা তাঁর উদারতা, দান ও বীরত্বের প্রশংসা করেছেন। তিনি একসঙ্গে লক্ষ টাকা দান করতেন ('লাখ বক্স'); আবার লক্ষ মানুষকে হত্যা করতে দ্বিধা করতেন না। উদারতা ও ন্যায়বিচারের প্রতি আগ্রহ কিন্তু যুদ্ধে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা সেযুগের অনেক তুর্কি শাসকের মধ্যে দেখা যায়।

শামসুদ্দিন ইলতুৎমিস (১২১০-৩৬) ছিলেন কুতুবুদ্দিনের ক্রীতদাস ও জামাতা। তিনি দিল্লি সুলতানিকে শুধু রক্ষা করেননি, এর সম্প্রসারণ ঘটিয়েছিলেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে সুলতানি রাষ্ট্রব্যবস্থার পত্তন করেন, তাঁকে বলা হয় দিল্লি সুলতানির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। ইলতুৎমিসের অনেকগুলি সমস্যা ছিল। কুতুবুদ্দিনের মৃত্যুর পর আরাম শাহ্ নামক এক ব্যক্তি দিল্লির সিংহাসন দাবি করেন, ইলতুৎমিস তরাইনের যুদ্ধে তাঁকে পরাস্ত করেন। ইলতুৎমিসের আরও সমস্যা ছিল। দিল্লির কয়েকজন আমীর ইলতুৎমিসের বিরোধিতা করেন, ইলতুৎমিস এঁদের পরাস্ত করেন। সমকালীন ঐতিহাসিক মিনহাজ জানিয়েছেন যে, আরও কয়েকবার তাঁকে এধরনের বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়। মিনহাজের মতে, আল্লাহ্‌র আশীর্বাদে ইলতুৎমিস জয়ী হন, সম্ভবত ইলতুৎমিস বিদ্রোহীদের চেয়ে অনেক বেশি দক্ষ ছিলেন। দিল্লি ও তার অধীনস্থ অঞ্চলসমূহ কাশী, অযোধ্যা, বদায়ুন ও শিবালিক অঞ্চল তাঁর অধীনে স্থাপিত হয়। ভারতে এই সময় চারটি ক্ষমতা কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল—দিল্লিতে ইলতুৎমিস, মুলতান ও উচ ছিল নাসিরুদ্দিন

কুবাচার অধীন, খল্‌জি আমীররা লক্ষ্মণাবতীতে স্বাধীনভাবে চলতে থাকেন এবং পাঞ্জাবের ওপর কুবাচা, তাজউদ্দিন ইলদুজ ও ইলতুৎমিস তিনজনে দাবি রেখেছিলেন।

পাঞ্জাব ও সিন্ধু অধিকারের জন্য ইলতুৎমিস ধৈর্য, কৌশল ও কূটনীতির ওপর নির্ভর করেন। তিনি সুযোগের জন্য অপেক্ষা করেন, এখানে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েননি। গোড়ার দিকে তিনি গজনির শাসক ইলদুজের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন, তাঁর পাঠানো 'মুক্তিপত্র' এবং রাজকীয় কর্তৃত্বের প্রতীক 'দরবাশ' (দুমুখো ছড়ি) গ্রহণ করেন। এতে অবশ্য ইলদুজের কর্তৃত্ব মেনে নেওয়া হয়। মধ্য এশিয়ার খাওয়ারিজম শাহ্ কর্তৃক গজনি থেকে বিতাড়িত হয়ে ইলদুজ পাঞ্জাব অধিকার করেন, কুবাচা বিতাড়িত হন। পাঞ্জাব অধিকার করে ইলদুজ ভারতের ওপর কর্তৃত্ব দাবি করেন। ইলতুৎমিসের সঙ্গে ইলদুজের বিরোধ হয়, এই বিরোধে ইলতুৎমিস জয়ী হন, ইলদুজ পরাস্ত ও নিহত হন। পাঞ্জাব নিয়ে কুবাচার সঙ্গে ইলতুৎমিসের দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল। কুবাচাকে পরাস্ত করে ইলতুৎমিস পাঞ্জাব অধিকার করেন। মধ্য এশিয়া থেকে চিঙ্গিজ খান কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে জালালুদ্দিন মঙ্গবর্নী পাঞ্জাবে প্রবেশ করেন, তিনি ইলতুৎমিসের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইলতুৎমিস মোঙ্গলদের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হতে চাননি, তিনি জালালুদ্দিনের আবেদন বাতিল করেন। ইলতুৎমিস সৈন্য নিয়ে জালালুদ্দিনের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। তিনি লাহোর ত্যাগ করে কুবাচার রাজ্যে প্রবেশ করেন, মোঙ্গলরা এই অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল। জালালুদ্দিন ১২২৪ খ্রিস্টাব্দে ভারত ত্যাগ করে চলে যান, চিঙ্গিজের ভয়ে তিনি এই অঞ্চলে অগ্রসর হননি। চিঙ্গিজের মৃত্যুর পর ১২২৮ খ্রিস্টাব্দে ইলতুৎমিস কুবাচাকে আক্রমণ করেন, উচ তিনি দখল করেন। সংঘর্ষের সময় কুবাচা সিন্ধু নদীতে ডুবে মারা যান, মুলতান ও সিন্ধু ইলতুৎমিসের রাজ্যভুক্ত হয়। তাঁর নেতৃত্বে সুলতানি রাজ্য অনেকখানি সংহত হয়েছিল।

ইলতুৎমিসের দীর্ঘ শাসনকালে সুলতানি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। কনৌজের গহড়বল শাসকরা বদায়ুন, কনৌজ দখল করেছিল, কাশীতে বিদ্রোহ হয়েছিল। বাংলার শাসক গিয়াসউদ্দিন খল্‌জি ইলতুৎমিসের কর্তৃত্ব মানেননি। কতেহারের রাজপুত সর্দাররা এই অঞ্চলে অরাজকতা সৃষ্টি করেছিল, দোয়াব ও অযোধ্যার হিন্দু সর্দারদের সঙ্গে ইলতুৎমিসের দ্বন্দ্ব ছিল। এইসব অঞ্চলে তখন ঘন জঙ্গল ছিল, বিদ্রোহীরা সহজে এখানে আশ্রয় নিয়ে রাজশক্তিকে অগ্রাহ্য করত। বাংলার বিরুদ্ধে ইলতুৎমিস দুবার অভিযান পরিচালনা করেন। গিয়াসউদ্দিন পরাস্ত ও নিহত হন, কিন্তু বাংলার খল্‌জি মালিকরা সুযোগ পেলেই বিদ্রোহ করতেন। সুলতানি রাজ্যের মধ্যে বিদ্রোহ হয়েছিল, গহড়বল বংশীয় রাজপুত রাজারা বদায়ুন ও কনৌজ অধিকার করেন। কাশীতে তুর্কি শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়েছিল। কতেহারের রাজপুতরা এখানে নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছিল, ইলতুৎমিস এদের দমন করে

শিবালিক পর্যন্ত শান্তি স্থাপন করেন। অযোধ্যা ও দোয়াবের হিন্দু প্রধানদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ চলেছিল, এই অঞ্চল ছিল জঙ্গলাকীর্ণ, এখানে তুর্কি শাসন প্রতিষ্ঠা করা ছিল দুরূহ কাজ। আইবকের মৃত্যুর পর হিন্দু রাজারা বায়ানা ও গোয়ালিয়র দুর্গ পুনরায় অধিকার করেন। ইলতুৎমিস সেকালের দুর্ভেদ্য দুর্গ রণথম্ভোর অধিকার করে সামন্ত চৌহান-রাজাদের অধীনে স্থাপন করেন। আজমীরে তুর্কিদের অধিকার ছিল। এরপর তিনি একে একে বায়ানা ও গোয়ালিয়র পুনর্দখল করেন, গোয়ালিয়র থেকে তিনি বুন্দেলখণ্ড ও মালব আক্রমণ করেছিলেন। তাঁর সেনাপতি মালিক নসরৎউদ্দিন তায়সি কালিঞ্জর অধিকার করেন। ভীলসা, উজ্জয়িনী ও মালবের ওপর আক্রমণ চালানো হয়। জীবনের শেষদিকে উত্তর-পশ্চিমে যুদ্ধরত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

ইলতুৎমিসের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হলো তিনি কুবাচা ও ইলদুজকে প্রতিহত করে দিল্লি সুলতানির সংহতি বজায় রাখেন। মধ্য এশিয়ার রাজনীতি থেকে মুক্ত হয়ে সুলতানি রাজ্য স্বাধীন, স্বতন্ত্র বিকাশের পথ ধরেছিল। শাসক হিসেবে তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল, কুশলী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। ১২২৯ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদের খলিফা আল মুস্তানসির বিল্লার প্রেরিত দূত তাঁকে সুলতান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। এতে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, তাঁর বংশের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। মৈজুদ্দিন ও আইবক শাসন কাঠামো গঠনের সময় পাননি, ইলতুৎমিস শাসন কাঠামো গঠনের কাজে মনোনিবেশ করেন। সুলতানির প্রাদেশিক শাসন (ইক্‌তা), সৈন্যবাহিনী ও মুদ্রা ব্যবস্থার তিনি গোড়াপত্তন করেন। দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে ইলতুৎমিস ইক্‌তা ব্যবস্থার পত্তন করেন। প্রথমটি হলো সামন্ত ব্যবস্থার উচ্ছেদ করা এবং দ্বিতীয়টি হলো দূরবর্তী অঞ্চলের ওপর কেন্দ্রের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। ইক্‌তাদাররা রাজস্ব আদায়, সৈন্যবাহিনী গঠন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও বিচার বিভাগীয় কাজকর্ম করত। তিনি তুর্কিদের বিজিত প্রদেশগুলিতে ইক্‌তাদার হিসেবে নিয়োগ করেন। দোয়াব অঞ্চলে এই ব্যবস্থা প্রথম প্রবর্তন করা হয়। সামন্ততান্ত্রিক প্রবণতা যাতে গড়ে না ওঠে সেজন্য তিনি ইক্‌তাদারদের নিয়মিতভাবে বদলি করতেন। ইলতুৎমিস সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠনেও আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে তিনি একটি স্থায়ী সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। সুলতান স্বয়ং এই বাহিনীর তদারকি করতেন। সুলতানির মুদ্রা ব্যবস্থায় ইলতুৎমিসের অবদান ছিল। আরবদের অনুকরণে তিনি তামার মুদ্রা জিতল ও রুপোর টাকা চালু করেন। তাঁর মুদ্রাব্যবস্থা পরবর্তীকালের সুলতানরা অনুসরণ করেন।

এ. বি. এম. হবিবুল্লাহ্ জানিয়েছেন যে, ইলতুৎমিস হলেন দিল্লি সুলতানির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এই রাষ্ট্রনেতা ভারতে প্রকৃতপক্ষে তুর্কি শাসনের সূচনা করেন। ভারতের শিশু মুসলমান রাষ্ট্রটিকে তিনি দেন রাজধানী,

বংশানুক্রমিক রাজতান্ত্রিক সরকার, শাসকগোষ্ঠী ও একটি শাসনব্যবস্থা। পূর্বসূরিদের কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন কিছু বিক্ষিপ্ত বিজিত অঞ্চল, রেখে যান একটি সুসংহত, সুগঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থা। ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে আইবকের ক্রীতদাস হিসেবে তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেন, দু'দশকের মধ্যে তিনি সুলতান হন। এই ঘটনা তাঁর অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। তিনি যখন ক্ষমতা লাভ করেন তখন ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল খুব অনিশ্চিত, রাষ্ট্র, রাজতন্ত্র, শাসন কাঠামো কিছুই ছিল না। শাসনের কোনো ঐতিহ্য ছিল না। তিনি ছিলেন এক অজানা সমুদ্রের নিঃসঙ্গ নাবিক। তিনি শুধু সুলতানির প্রতিষ্ঠাতা নন, এর রাজধানীরও প্রতিষ্ঠাতা। মধ্য এশিয়ার বিতাড়িত কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, ধর্মজ্ঞ ও বিদ্বান ব্যক্তিরা দিল্লিতে এসে সমবেত হন, তাঁর আতিথ্য লাভ করেন। বহু অট্টালিকা, মসজিদ, খান্‌কা, মাদ্রাসা দিয়ে তিনি রাজধানীকে সুসজ্জিত করেন। কুতুবমিনারের নির্মাণ কাজ তিনি শেষ করেন, জলাধার হৌজ শামসি তিনি নির্মাণ করেন। শুধু বিদ্বান ব্যক্তিরা নন, সেই যুগের সুফি দরবেশরাও তাঁর পৃষ্ঠপোষণ লাভ করেন। দরবেশ কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি তাঁর কাছ থেকে সম্মান ও সমাদর লাভ করেন।

ইলতুৎমিস দিল্লি সুলতানির সাংস্কৃতিক নীতির সূচনা করে যান। তাঁর শাসনকালে দিল্লি মুসলিম সংস্কৃতির এক পীঠস্থানে পরিণত হয়। নতুন রাষ্ট্রের জন্য তিনি আমলাতন্ত্র গঠন করেন, এই আমলাতন্ত্রের মধ্যে তুর্কি, অতুর্কি তাজিক ও ক্রীতদাসরা ছিল। এদের মধ্যে স্বার্থ দ্বন্দ্ব শাসনব্যবস্থাকে দুর্বল করে দিয়েছিল। ইলতুৎমিস শুধু সুলতানিকে রক্ষা করেননি, এর সম্প্রসারণ ঘটিয়েছিলেন। খলিফার অনুমোদন নিয়ে রাজতন্ত্র স্থাপন করলেও রাজনীতিতে তিনি উলেমাদের প্রভাব বিস্তার করতে দেননি। তিনি সুলতানির লক্ষ্য ও নীতি নির্ধারণ করেন। নিজামী মনে করেন যে, আইবক শুধু দিল্লি সুলতানির রূপরেখাটির কথা ভেবেছিলেন, ইলতুৎমিস তাকে দেন ব্যক্তিত্ব, মর্যাদা, লক্ষ্য, পথ, শাসন ও শাসকগোষ্ঠী (Aibak merely visualised an outline of the Sultanat. Iltutmish gave it an individuality and a status, a motive power and a direction, an administrative system and a governing class.)। ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইলতুৎমিস মারা যান। তাঁর রাজত্বকাল সমকালীন মানুষের স্মৃতিতে বহুকাল উজ্জ্বল হয়েছিল। নানাদিকে তিনি সাফল্যলাভ করেন, আইবকের অসম্পূর্ণ কাজকে তিনি সম্পূর্ণতা দেন। নানা সমস্যা ও অসুবিধার মধ্যে তিনি সুলতানি রাজ্য গড়ে তোলেন। প্রাক্তন ক্রীতদাস ইলতুৎমিস তাঁর পুত্রদের জন্য নিশ্চিত উত্তরাধিকার রেখে যান, তাঁর রাজবংশ খলিফার স্বীকৃতি পেয়েছিল। এটি হল তাঁর কৃতিত্বের পরিচায়ক। মধ্যযুগের ভারতকে তিনি মোঙ্গল আক্রমণের সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করেছিলেন। সে যুগে মোঙ্গলরা ছিল অপ্রতিরোধ্য, বহু শক্তিশালী রাষ্ট্রব্যবস্থার তারা

পতন ঘটিয়েছিল। তিনি সুলতানি রাষ্ট্রের সংহতি রক্ষা করেন, এর সম্প্রসারণেরও ব্যবস্থা করেন। এই প্রতিভাবান সুলতান সুলতানি রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামোটি নির্মাণ করে দেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত নিরঙ্কুশ স্বৈরাচারী রাষ্ট্র পরবর্তীকালে খল্‌জি সাম্রাজ্যবাদের প্রসারে সহায়ক হয়। উলেমাদের সঙ্গে তিনি কোনো বিরোধে লিপ্ত হননি, কৌশলে সমঝোতা করে চলেন। তাঁর সম্প্রসারণবাদী নীতির জন্য সৈন্যবাহিনী তাঁর ওপর সন্তুষ্ট ছিল। এ.বি.এম. হবিবুল্লাহ লিখেছেন যে, তাঁকে হয়তো একজন মহান শাসক বলা যাবে না কিন্তু একথা বললে অত্যুক্তি হয় না যে তিনি একজন অত্যন্ত দক্ষ, কুশলী শাসক ছিলেন। এই শিশুরাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডের মধ্যে তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে যান। আইবক দিল্লি সুলতানির সার্বভৌমত্বের প্রতিষ্ঠাতা, অবিসংবাদিতভাবে সুলতান ইলতুৎমিস হলেন এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাতা, এর প্রথম শাসক।

বিহার ও বাংলা জয়

মৈজুদ্দিনের শাসনকালে মহম্মদ বিন বখতিয়ার খল্‌জি নামে একজন সামরিক অফিসার বিহার ও বাংলার উত্তরাঞ্চল জয় করেন। সমকালীন ঐতিহাসিক মিনহাজ সিরাজ তাঁর সাহস, কৌশল, উদ্যোগ ও বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। খল্‌জিরা হলো তুর্কিদের একটি শাখার নাম। অযোধ্যার ইক্‌তাদারের অধীনে কাজ করার সময় বিহার সীমান্তে দুখানি গ্রাম দেখাশোনার দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়। এখানে গহড়বল বংশীয় শাসকেরা শাসন করত, তারা শক্তিশালী ছিল না। বাংলায় সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণসেন রাজত্ব করতেন। বখতিয়ার খল্‌জির সামরিক নেতা হিসেবে সুনাম হয়েছিল, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের খল্‌জিরা তাঁর নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়েছিল। মৈজুদ্দিন তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় পেয়ে তাঁকে 'খেলাত' (জমকালো পোশাক) পাঠিয়ে সম্মানিত করেন। বখতিয়ার খল্‌জি সৈন্যবাহিনী নিয়ে বিহারের একটি বৌদ্ধমঠ আক্রমণ করেন, সম্ভবত এটি ছিল নালন্দা মহাবিহার। তিনি বিক্রমশীলা মহাবিহারটিও আক্রমণ করে অধিকার করে নেন। ১২০২ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিহারের রাজধানী উদ্ভাণ্ডপুর অধিকার করে নিয়ে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন।

বিহার জয় করে লুণ্ঠিত দ্রব্যসহ তিনি দিল্লিতে কুতুবুদ্দিনের সঙ্গে দেখা করেন, কুতুবুদ্দিন তাঁকে উৎসাহ দেন, খেলাত দিয়ে সমাদর করেন। এই ঘটনা প্রমাণ করে সেযুগের একটি রাষ্ট্রনীতি। সুলতানরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে রাষ্ট্রের বিস্তার ঘটলে তাকে তাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করে নিতেন। অধীনস্থরা কখনো সুলতানের প্রতি অনুগত থাকতেন, অথবা সুযোগ পেলে স্বাধীন হয়ে যেতেন। সুলতানি রাষ্ট্র কাঠামো অবশ্যই ছিল ক্ষণভঙ্গুর। বখতিয়ার বাংলা অভিযানের জন্য প্রস্তুত হন। বাংলার রাজা লক্ষ্মণসেন ছিলেন অশীতিপর বৃদ্ধ, কিন্তু একসময় ভালো যোদ্ধা হিসেবে তাঁর সুনাম ছিল।

মিনহাজ জানাচ্ছেন যে, তিনি সুশাসক ছিলেন এবং দানের ক্ষেত্রে উদারতা দেখাতেন। লক্ষ্মণসেন এই সময় নদীয়াতে ছিলেন, সম্ভবত তিনি এখানে তীর্থ করতে এসেছিলেন। বখতিয়ার খল্‌জির বীরত্বের খ্যাতি তাঁর কাছে পৌঁছেছিল। মিনহাজ তাঁর নদীয়া জয়ের বর্ণনা রেখে গেছেন। অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে তিনি নদীয়ার দিকে এগিয়ে যান, সঙ্গে তাঁর আঠারো জন সৈন্য ছিল, বাকিরা ছিল পেছনে। স্থানীয় মানুষ তাঁকে অশ্ব ব্যবসায়ী বলে ভুল করেছিল। বখতিয়ার প্রাসাদ আক্রমণ করলে বৃদ্ধ সেন রাজা পেছনের দরজা দিয়ে পূর্ববঙ্গে পালিয়ে যান। তুর্কি সেনাপতি শহর অধিকার করেন। নদীয়াকে মিনহাজ সেনদের রাজধানী বলে উল্লেখ করেছেন। সেনদের প্রথম রাজধানী ছিল বিক্রমপুর, পরের রাজধানী লক্ষ্মণাবতী, নদীয়া ছিল একটি ছোট শহর, তীর্থক্ষেত্র, বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র। এখানে সেনদের সৈন্যবাহিনী ছিল না। বিনাবাধায় বখতিয়ার নদীয়া অধিকার করেন, নদীয়ার পর তিনি লক্ষ্মণাবতী দখল করে তুর্কি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। মৈজুদ্দিনের নামে মুদ্রার প্রচলন করলেও নিজের নামে খুৎবা পাঠ করেন। নামমাত্র দিল্লির আনুগত্য স্বীকার করলেও তিনি কার্যত স্বাধীন ছিলেন।

বিহার ও বাংলা জয়ের পর বখতিয়ার খল্‌জি বেশিদিন জীবিত ছিলেন না। তিব্বত ও তুর্কিস্তান জয়ের জন্য তিনি একটি সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। এই বাহিনী নিয়ে তিনি আসাম পর্যন্ত অগ্রসর হন, সেখানে বাগমতী নদীতে ডুবে তিনি মারা যান, তাঁর সঙ্গী সৈন্যবাহিনী ধ্বংস হয়ে যায়। অন্যমতে ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর অনুচর আলি মর্দান তাঁকে হত্যা করে বাংলা-বিহার অধিকার করেন। বখতিয়ারের অনুচরদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে আলি মর্দান কুতুবুদ্দিনের সঙ্গে দেখা করেন। কুতুবুদ্দিন তাঁকে বাংলার শাসক হিসেবে স্বীকৃতি দিলে তিনি বাংলায় ফিরে এসে ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করেন, চাতরা নেন, নিজের নাম খুৎবা পাঠ করেন। শাসক হিসেবে আলি মর্দান ছিলেন অত্যাচারী, তাঁকে অপসারিত করে ইয়াজ নামে একজন খল্‌জি আমীর ক্ষমতা দখল করেন। সুলতান হিসেবে তিনি নাম নেন গিয়াসউদ্দিন। মিনহাজ জানাচ্ছেন যে, গিয়াসউদ্দিন ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, যোগ্য, প্রজাহিতৈষী শাসক। তাঁর আমলে এই অঞ্চলের উন্নতি হয়, প্রজাকল্যাণের জন্য তিনি অনেকগুলি প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। উত্তর-পশ্চিমে ইলতুৎমিসের ব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে গিয়াসউদ্দিন বিহার ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ওপর তাঁর কর্তৃত্বের বিস্তার ঘটান।

বিহারে ইলতুৎমিসের অফিসারদের সঙ্গে ইয়াজের সংঘাত বেধেছিল। ১২২৫ খ্রিস্টাব্দে ইলতুৎমিস ইয়াজের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন, উভয়ের মধ্যে সন্ধি হয় কিন্তু তা স্থায়ী হয়নি। ইলতুৎমিস দিল্লিতে ফিরে গেলে ইয়াজ সন্ধি ভঙ্গ করেন, বিহার থেকে ইলতুৎমিসের অফিসারদের তাড়িয়ে দেন। ইলতুৎমিসের পুত্র নাসিরুদ্দিন মাহমুদ ইয়াজকে পরাস্ত ও নিহত করে বাংলা অধিকার করেন। অল্পকাল পরে তাঁর

মৃত্যু হলে বাংলার খল্‌জিরা আবার বিদ্রোহী হয়। ১২৩০ খ্রিস্টাব্দে ইলতুৎমিস বাংলায় অভিযান চালিয়ে এই অঞ্চল দখল করে নেন কিন্তু বাংলার সমস্যা রয়ে যায়, কেন্দ্রে বিন্দুমাত্র দুর্বলতা দেখা দিলে বাংলা বিদ্রোহ করে স্বাধীন হয়ে যেত। ইলতুৎমিসের বংশধরদের শাসনকালে বাংলা দিল্লির বশ্যতা স্বীকার করেছিল, তবে বলবনকে বাংলায় তিনবার অভিযান পরিচালনা করতে হয়। চতুর্দশ শতকে ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনকালে বাংলা স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্র বিকাশের পথ ধরেছিল (১৩৪২-১৫৭৫)।

কেন্দ্রীভূত রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম (১২৩৬-৯০)

রাজিয়া ও রাজনৈতিক অস্থিরতা (১২৩৬-৪৬)

ইলতুৎমিসের মৃত্যুর পর দশ বছর ধরে দিল্লিতে রাজনৈতিক অস্থিরতা ছিল। এই দশ বছরের মধ্যে ইলতুৎমিসের চারজন উত্তরাধিকারী সিংহাসনে বসেন এবং সকলেই আততায়ীর হাতে নিহত হন (রুকনুদ্দিন, রাজিয়া, বাহরাম শাহ্‌ ও মাসুদ)। তুর্কি অভিজাতদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ছিল এই অশান্তির কারণ। তুর্কিদের মধ্যে অনেকগুলি উপজাতি ছিল, সব উপজাতি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি। মধ্য এশিয়ায় মৈজুদ্দিনের সঙ্গে অমুসলমান ঘুজদের লড়াই হয়েছিল। মুসলমান তুর্কি উপজাতির লোকেরাও পরস্পরের সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত হতো। ইলতুৎমিসের অভিজাতদের মধ্যে তুর্কিরা যেমন ছিল তেমন ছিল অতুর্কি তাজিকরা। এরা হলো পারস্যের লোক, শাসন ব্যাপারে দক্ষ, তুর্কিরা ছিল দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, শাসনকার্য ভালোরকম বুঝত না। ভারতে তাজিকরা তাদের শাসন দক্ষতার জন্য ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছেছিল। ইলতুৎমিসের উজির নিজামুল-মুল্‌ক-জুনাইদি ছিলেন একজন তাজিক, যোদ্ধা তুর্কিরা তাজিকদের পছন্দ করত না কারণ তারা ছিল কলম-পেষা আমলা। উপজাতি আবেগ অনেক কমে গেলেও ভারতের তুর্কি অভিজাতদের মধ্যে যোগাযোগ ও পারিবারিক বন্ধন তখনও যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। সুলতানরা তুর্কি ক্রীতদাস সংগ্রহ করে তাদের যুদ্ধবিদ্যা ও শাসন ব্যাপারে দক্ষ করে তুলতেন। ইলতুৎমিসের একটি দক্ষ ক্রীতদাস গোষ্ঠী ছিল, বারানি এদের 'চল্লিশা' বলেছেন (চিহলগনি)। তবে সকলে ইলতুৎমিসের ক্রীতদাস হলেও এদের মধ্যে ঐক্য ছিল না। বারানির মতে, ইক্‌তা, সৈন্য, পদ ও সম্মান নিয়ে এদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, কেউ কারও নেতৃত্ব মানত না।

এই পটভূমিকায় ভারত ইতিহাসের এক রোমান্টিক চরিত্র রাজিয়ার (১২৩৬-৪০) উত্থান ও পতন ঘটেছিল। তাঁর সিংহাসন প্রাপ্তির কারণ হলো বদায়ুন, মুলতান, হান্সি ও লাহোরের শক্তিশালী ইক্‌তাদাররা ইলতুৎমিসের পুত্র রুকনুদ্দিনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, উজির নিজামুল-মুল্‌ক বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেন। রুকনুদ্দিন জনপ্রিয়তা

হারিয়েছিলেন কারণ তিনি ক্ষমতা লাভের পর বিলাস-ব্যসনে মন দেন, তাঁর মাতা শাহ্তুর্কান (তিনি একদা দাসী ছিলেন) সব ক্ষমতা লাভ করেন। রুকনুদ্দিন বিদ্রোহ দমনের জন্য রাজধানীর বাইরে গেলে রাজিয়া দিল্লির জনসমর্থন নিয়ে সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি প্রচার করেন যে পিতা ইলতুৎমিস তাঁকে উত্তরাধিকারিণী মনোনীত করে যান। সমস্যা হলো তুর্কি অভিজাতরা ইলতুৎমিসের এই মনোনয়ন মেনে নেননি। রাজিয়া ক্ষমতা দখল করলেও তুর্কি অভিজাতদের কোনো শক্তিশালী গোষ্ঠীর সমর্থন তিনি লাভ করেননি। বিরোধীদের মধ্যে দ্বন্দ্বকে জিইয়ে রেখে তিনি ক্ষমতায় টিকে থাকেন। মুলতান, লাহোর, হান্সি ও বদায়ুনের প্রাদেশিক শাসকরা তাঁকে সুলতান হিসেবে মেনে নেননি, উজির তাঁর বিরোধিতা করেন। রাজিয়া এঁদের কয়েকজনকে নিজের দলে টেনে নেন।

ক্ষমতা দখল করে রাজিয়া প্রশাসনের পুনর্বিন্যাস করেন। মিনহাজ জানাচ্ছেন যে সারা দেশে শান্তি স্থাপিত হয়, রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। লক্ষ্মণাবতী থেকে দেবল পর্যন্ত সমস্ত মালিক ও আমীররা রাজিয়ার কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছিল। রাজিয়া পুরুষের পোশাক পরে রাজকার্য পরিচালনা করতেন, হাতির পিঠে চড়ে তিনি দিল্লির রাজপথে বের হতেন, বোরখা ত্যাগ করেন। গোঁড়া মুসলিমদের মধ্যে বিরোধিতা দেখা দিয়েছিল, তবে দিল্লির জনসমর্থন তখনও তাঁর পক্ষে ছিল। দিল্লি ও প্রদেশের অভিজাতদের একাংশ তাঁর বিরোধিতায় নেমেছিল। এই বিরোধিতার কারণ হলো মালিক ইয়াকুত নামে একজন হাবসী ক্রীতদাস তাঁর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিল। রাজিয়া তাঁকে আমীর-আখুর (অশ্বশালার অধ্যক্ষ) নিযুক্ত করলে তুর্কি অভিজাতরা ক্ষুণ্ণ হন। তুর্কি অভিজাতরা মনে করেন যে রাজিয়া একটি বিরোধী শক্তিকেন্দ্র গড়ে তুলছেন। রাজিয়ার সঙ্গে ইয়াকুতের অন্তরঙ্গতার অভিযোগ উঠেছিল, অবশ্য এর কোনো ভিত্তি নেই। আসল কথা হলো রাজিয়া দৃঢ়তার সঙ্গে শাসনের রাশ ধরেছিলেন, ক্ষমতা নিজের হাতে রেখেছিলেন। লাহোরের গভর্নর কবীর খান তাঁর বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ করেন, রাজিয়া সৈন্যবাহিনী নিয়ে লাহোরে উপস্থিত হলে কবীর খান আত্মসমর্পণ করেন। তিনি তাঁকে মুলতানের ইক্তাদার নিযুক্ত করেন। এরপর তাবারহিন্দার গভর্নর আলতুনিয়া তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, আলতুনিয়া দিল্লির তুর্কি অভিজাতদের মদত পেয়েছিলেন। তুর্কি অভিজাতরা বিদ্রোহ করে ইয়াকুতকে হত্যা করে, রাজিয়া বন্দী হন। ষড়যন্ত্রকারীরা বাহরাম শাহকে সিংহাসনে বসিয়েছিল। রাজিয়া আলতুনিয়াকে বিবাহ করে সিংহাসন পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন, পথে দস্যুদের হাতে তিনি নিহত হন।

রাজিয়ার করুণ পরিণতি দিল্লির তুর্কি অভিজাতদের ক্রমবর্ধমান শক্তির স্বাক্ষর বহন করে। মিনহাজ রাজিয়ার ভূয়সী প্রশংসা করে লিখেছেন যে শুধু মহিলা

হবার জন্য তিনি রাজনীতিতে ব্যর্থ হন। তিনি ছিলেন একজন বিজ্ঞ শাসক, দয়ালু, ন্যায়পরায়ণ এবং প্রজাকল্যাণকামী। যুদ্ধবিদ্যায় তিনি যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জন করেন। তুর্কি অভিজাতদের ষড়যন্ত্রের জন্য তিনি ব্যর্থ হন, তাঁর উত্তরাধিকারীরাও কেউ সফল হতে পারেননি। ১২৪০-৪৬ পর্যন্ত দিল্লির তুর্কি অভিজাতরা ক্ষমতার দ্বন্দ্বে মেতে উঠেছিল, রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলেছিল। ইলতুৎমিসের বংশধরকে সুলতান হিসেবে মেনে নিলেও তারা ক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখতে চেয়েছিল। তাদের ইচ্ছামতো আইতিগিন বাহরামের নায়েব নিযুক্ত হন, তাছাড়া ছিল উজির ও মুস্তাওফি (হিসেব রক্ষক)। এরা সকলে ছিল তুর্কি অভিজাত। বাহরাম ক্ষমতা নিজের হাতে নিতে চাইলে তাঁকে পদচ্যুত করে মাসুদকে সিংহাসনে বসানো হয়। উজির নিজামুল-মুল্‌ক প্রতিদ্বন্দ্বীদের হাতে নিহত হলে বলবন ক্ষমতার কাছাকাছি পৌঁছে যান। বলবন ইলতুৎমিসের পৌত্র নাসিরুদ্দিন মাহমুদকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজে নায়েব হন। মাহমুদ রাজকার্যে আগ্রহী ছিলেন না, তিনি ধর্মকর্ম নিয়ে দিন কাটাতেন। ১২৪৬-৮৭ এই দীর্ঘকাল বলবন ছিলেন সব রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী। প্রথম বিশ বছর (১২৪৬-৬৫) তিনি ছিলেন নায়েব, ১২৬৫-৮৭ পর্যন্ত তিনি ছিলেন সুলতান। ইলতুৎমিসের পরিবারের রাজপুত্রদের সকলকে হত্যা করে তিনি নিষ্কণ্টক হন।

বলবনের শাসন

শাসক হিসেবে বলবন কেন্দ্রীভূত শক্তিশালী সরকারের প্রতিষ্ঠা করেন। বলবন মনে করেন যে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সমস্যার মোকাবিলা করতে হলে রাজতন্ত্রের ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এজন্য তিনি দৈবানুগৃহীত স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের আদর্শ প্রচার করেন। রাজা হলেন ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব (জিল-ই-আল্লাহ্), অন্য কারও কাছে তাঁর দায়বদ্ধতা নেই। অভিজাতরা কখনো রাজার সমকক্ষ হতে পারেন না। রাজার মর্যাদা তুলে ধরার জন্য তিনি জাঁকজমকপূর্ণ রাজসভা গঠন করেন, সিজ্‌দা ও পাইবস প্রথার প্রবর্তন করেন।[১] বলবন রাজসভায় সবসময় গাম্ভীর্য বজায় রাখতেন, দুর্ধর্ষ দেহরক্ষীরা উন্মুক্ত কৃপাণ হাতে তাঁকে পাহারা দিত এবং শোভাযাত্রার সময় তাঁর সঙ্গী হতো। ঐশ্বর্য ও শক্তির প্রকাশ ঘটিয়ে বলবন প্রজাদের আনুগত্য পেতে চেয়েছিলেন। শুধু সাধারণ প্রজা নয়, রাজা ও রায়রা বলবনের ঐশ্বর্য ও শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হন। সুলতান হয়ে বলবন মদ্যপান ত্যাগ করেন। ক্ষমতালাভ করে বলবন শক্তিশালী অভিজাতদের অনেককে হত্যা করেন, রায়হান ও কুতলুগ খান নিহত হন।

১. সিজ্‌দা হলো আভূমিনত হয়ে কুর্নিশ করা, পাইবস হলো পায়ের পাতা চুম্বন।

বলবন অভিজাতদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি নিজের আত্মীয়, সেই যুগের একজন খ্যাতনামা যোদ্ধা শেরখানকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন। তিনি তুর্কি অভিজাতদের উচ্চপদে নিয়োগ করেন, অতুর্কিদের পদচ্যুত করেন। বলবন অনভিজাত কাউকে উচ্চপদ দেননি, হিন্দু ও ধর্মান্তরিত মুসলমানরা বলবনের শাসন-ব্যবস্থায় স্থান লাভ করেনি। বলবনের প্রশাসনে তেত্রিশ জন অনভিজাত বিভিন্ন পদে ছিলেন, বলবন এঁদের সকলকে পদচ্যুত করেন। পারস্যের প্রবাদ পুরুষ আফ্রাসিয়াবের বংশধর বলে বলবন নিজের পরিচয় দিতেন, নিম্নবর্গের মানুষকে পছন্দ করতেন না। উজির নিজামুল-মুল্‌ক ছিলেন তাঁতি পরিবারের সন্তান, এজন্য তিনি তাঁর উচ্চপদের সঙ্গে যুক্ত সম্মান হারিয়েছিলেন। তবে একথাও ঠিক বলবনের কঠোর জাতিবৈষম্য-মূলক নিয়োগ নীতি সত্ত্বেও অতুর্কিরা শাসনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তুর্কিদের একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। বলবন তাঁর শাসনব্যবস্থায় ন্যায়বিচারের ওপর জোর দিয়েছিলেন, ন্যায়বিচারের মাধ্যমে রাজার অধিকার তুলে ধরা ছিল তাঁর লক্ষ্য। বারানি জানিয়েছেন যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের প্রতি তাঁর সহানুভূতি তাঁর শাসনকে জনপ্রিয়তা দিয়েছিল। ধনী-নির্ধন, অভিজাত-অনভিজাত উচ্চ-নিচ সকলে ন্যায়বিচার পেত, রাজ্যের গুপ্তচর বারিদরা তাঁকে শাসন বিষয়ে অবহিত রাখত এবং বলবন সেইমতো ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। জনগণের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বলবন ছিলেন একাধারে কঠোর এবং কোমল (a combination of harshness and benevolence)। বলবন মনে করেন যে অধিক সম্পদ বা প্রচণ্ড দারিদ্র্য দুই-ই অশান্তি নিয়ে আসে। এজন্য তিনি পুত্র বুঘরা খানকে রাজস্ব স্থাপনের ব্যাপারে নরমপন্থা অনুসরণ করতে উপদেশ দেন। ইক্‌তাদার থাকাকালীন তিনি কৃষকদের নানাভাবে সহায়তা দেন, দরিদ্র ও অসহায় মানুষদের রক্ষা করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। সুলতান হিসেবে তিনি নারী, শিশু, বৃদ্ধ, দরিদ্র ও অসহায় মানুষদের রক্ষার প্রয়াস চালিয়েছিলেন, সৈন্যবাহিনীর অত্যাচার থেকে তিনি দরিদ্র মানুষদের রক্ষা করেন।

শান্তিভঙ্গের ঘটনা ঘটলে বা বিদ্রোহ ঘটলে বলবন কঠোর হতেন। ইলতুৎমিসের মৃত্যুর পর মেওয়াটি রাজপুতরা (Meos) দিল্লির আশেপাশে অত্যাচার ও লুঠপাট চালাত। এইসময় এই অঞ্চলের সর্বত্র অরণ্য ছিল, পথঘাট ছিল না, এতে দস্যু ও তস্করদের সুবিধা হয়, বাণিজ্যের ক্ষতি হয়। দিল্লির নাগরিকরা স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করতে পারত না। দোয়াব অঞ্চলে দস্যুবৃত্তি এত বেড়েছিল যে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। বলবন দিল্লির আশেপাশের জঙ্গল পরিষ্কার করেন এবং মেওয়াটি দস্যুদের দমন করেন। তিনি এখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন এবং অনেকগুলি থানা বসিয়েছিলেন। দুর্ধর্ষ আফগান সৈনিকদের শান্তিরক্ষার কাজে এখানে মোতায়েন করা হয়। দোয়াব অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে তিনি বিদ্রোহীদের দমন করে অনুগত ইক্‌তাদার বসিয়েছিলেন।

এই অঞ্চলে ঘন জঙ্গল পরিষ্কার করে তিনি রাস্তাঘাট নির্মাণ করে দেন। অযোধ্যার ক্ষেত্রে তিনি একই পদ্ধতি অনুসরণ করেন। দুর্গ নির্মাণ করে তিনি আফগান সৈন্য নিয়োগ করেন। শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে এসেছিল, চাষবাস, ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হয়েছিল। বণিক ও বানজারারা পণ্য নিয়ে দিল্লিতে চলে আসে, দিল্লির বাজারে গবাদি পশু, ক্রীতদাস ইত্যাদির দাম কমেছিল। বলবন কতেহার (রোহিলখণ্ড) অঞ্চলে বিদ্রোহ দমন করেন, বদায়ুন ও আমরোহা অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। বলবনের এই কঠোর নীতিকে ঐতিহাসিকরা 'লৌহ ও শৃঙ্খলের' (blood and iron) নীতি বলেছেন, বলবনের সব নীতির ক্ষেত্রে এই ধরনের কঠোরতা ছিল না।

সেযুগে মনে করা হতো যে সৈন্যবাহিনী হলো রাষ্ট্রের স্তম্ভ, কেন্দ্রীভূত স্বৈরাচারের সৈন্যবাহিনী না হলে চলে না। বলবন কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সৈন্যবাহিনী গঠন করেছিলেন। দক্ষ অফিসারদের নিয়োগ করা হয়, সৈন্যবাহিনীর আয়তন বৃদ্ধি করা হয়েছিল। ইক্‌তা থেকে কেন্দ্রীয় সৈন্যবাহিনীর অফিসার ও সৈন্যদের বেতনের ব্যবস্থা করা হয়। সৈন্যবাহিনীকে দক্ষ রাখার জন্য বলবন এদের নিয়ে প্রায়ই শিকারে বের হতেন। কেন্দ্রীয় সৈন্যবাহিনী ছাড়াও বলবনের ইক্‌তাদাররা নিজস্ব সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। অশ্ব ও হস্তী বাহিনীকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। মধ্য এশিয়া থেকে অভিবাসন অনেকখানি কমেছিল, এজন্য আফগান, ভারতীয় মুসলমান ও হিন্দুরা বলবনের সৈন্যবাহিনীতে স্থান পেয়েছিল। দক্ষ সৈন্যবাহিনী থাকা সত্ত্বেও বলবন সুলতানি রাজ্যের সম্প্রসারণের কথা ভাবেননি, মোঙ্গল আক্রমণের আশঙ্কা থাকায় তিনি রাজ্যের সংহতি সাধনের দিকে মনোনিবেশ করেন।

বারানি জানিয়েছেন যে বলবন রাষ্ট্রের মর্যাদা ও কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর কঠোর শাসনের জন্য উচ্চ-নীচ সকলে তাঁর কর্তৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেও দেশের মধ্যে অশান্তি ও বিরোধিতা ছিল। ভারত সীমান্তের তুর্কি অভিজাতরা স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা ভেবেছিল, দেশের মধ্যে হিন্দু রাজা ও সামন্তরা তুর্কি শাসন উচ্ছেদের কথা ভেবেছিল। গোয়ালিয়র ও রণথম্ভোর ছিল বিদ্রোহী, বলবন গোয়ালিয়র অধিকার করেন, কিন্তু রণথম্ভোর অধিকার করতে পারেননি। রণথম্ভোরের চৌহানরা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তুর্কিদের অধীনে ছিল আজমীর ও নাগৌর, এর বাইরে রাজস্থানে তুর্কিদের কোনো অধিকার ছিল না। যমুনার দক্ষিণে বুন্দেলখণ্ডে ছিল চান্দেল্ল, ভর ও বাঘেলা শাসকরা। বলবন রেবার বাঘেলা প্রধানের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে কিছু ধনসম্পদ লাভ করেন। বদায়ুন ও সম্ভল অঞ্চলে কতেহারিয়া রাজপুতরা বিদ্রোহী ছিল, বলবন অভিযান চালিয়ে এই অঞ্চলে তুর্কিদের প্রাধান্য স্থাপন করেন। রাজপুতরা সুলতানি রাজ্যের ঐক্য ও অখণ্ডতার ওপর আক্রমণ চালায়নি। বলবন অভ্যন্তরীণ বিরোধিতা দমনের জন্য 'হিন্দু আতঙ্ক' তৈরি

করেন। বলবন মালবে একটি লুণ্ঠন অভিযান পরিচালনা করেন, এখানে রাজ্যবিস্তার তাঁর লক্ষ্য ছিল না।

সীমান্তে তুর্কি অভিজাতরা স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছিল, কুরলুগ তুর্কিরা পাঞ্জাবের সল্ট রেঞ্জে এধরনের প্রয়াস শুরু করেছিল, মুলতান ও সিন্ধুদেশে তারা সম্প্রসারণের চেষ্টা করেছিল। তারা মোঙ্গলদের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত ছিল, সুলতানি রাজ্য এদের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিল। বলবনের নামমাত্র অধীনে ছিল লাহোর, আসলে বিপাশা নদী বরাবর বলবন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। পাঞ্জাবের বেশিরভাগ তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল। সিন্ধুপ্রদেশে স্থানীয় শাসকরা দিল্লির প্রতি অনুগত ছিল না, অনেকের সঙ্গে মোঙ্গলদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। দিল্লির কর্তৃত্ব থেকে মুক্তি পাবার জন্য অনেকে মোঙ্গলদের আধিপত্য মেনে নিয়েছিল। তবে ইলতুৎমিস ও পরে বলবন সিন্ধু ও মুলতানের ওপর দিল্লির নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেন। বাংলা ও বিহার শাসন করতেন লক্ষ্মণাবতীর শাসকরা, এঁরা কখনো দিল্লির প্রতি বশ্যতা স্বীকার করতেন, আবার সুযোগ পেলে স্বাধীনতা ঘোষণা করতেন। বাংলার প্রাদেশিক শাসকরা কামরূপ (আসাম), জাজনগর (ওড়িশা) ও দক্ষিণবঙ্গের (রাঢ়) ওপর আধিপত্য স্থাপন করেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী বাংলার শাসকরা অযোধ্যা পর্যন্ত ক্ষমতা বিস্তারের প্রয়াস চালিয়েছিলেন, শক্তি ও সম্পদের অভাবে তা সম্ভব হয়নি। ইলতুৎমিস দুবার বাংলার শাসক ইয়াজের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। ইয়াজের মৃত্যুর পর তুর্কি অভিজাত তুরঘান খান ক্ষমতা দখল করে রাঢ় ও ত্রিহুত আক্রমণ করেন। তবে তিনি দিল্লির সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হননি। বলবন তাঁর ক্রীতদাস উজবেগকে লক্ষ্মণাবতীর গভর্নর নিযুক্ত করেন। উজবেগ প্রায় স্বাধীনভাবে চলতেন, ওড়িশা ও রাঢ় অঞ্চল আক্রমণ করে ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। উজবেগ অযোধ্যা জয় করে সুলতান উপাধি ধারণ করেন, নিজের নামে খুৎবা পাঠ করেন। আসাম আক্রমণ করতে গিয়ে উজবেগ পরাস্ত ও নিহত হন। উজবেগের পর বলবন তাঁর অন্য আর এক ক্রীতদাস তুঘ্রিলকে বাংলার গভর্নর নিযুক্ত করেন। ওড়িশা আক্রমণ করে তিনি প্রচুর ধনরত্ন লাভ করেন, এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বলবন বাংলার বিদ্রোহ দমনের জন্য তিনবার অভিযান পাঠিয়েছিলেন। আমিন খান ও বাহাদুর ব্যর্থ হলে বলবন নিজেই তৃতীয় অভিযানটির নেতৃত্ব দেন। দুবছর ধরে অভিযান চালিয়ে বলবন তুঘ্রিলকে পরাস্ত ও নিহত করেন, বিদ্রোহীদের দৃষ্টান্তমূলক চরম শাস্তি দেন। দ্বিতীয় পুত্র বুঘরা খানকে বাংলার গভর্নর নিযুক্ত করে বলবন দিল্লিতে ফিরে আসেন।

বলবনের উত্তরাধিকারীরা মাত্র তিন বছর ক্ষমতায় ছিলেন। বুঘরা খানের পুত্র কায়কোবাদ সিংহাসন লাভ করেন। তিনি বিলাসব্যসনে নিমগ্ন হন, তাঁর হয়ে নিজামুদ্দিন শাসন পরিচালনা করতেন। তুর্কি অভিজাতদের সঙ্গে বিরোধ বাধলে তিনি

নিজেই নিহত হন, শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল। সীমান্তে নিযুক্ত খল্‌জি অফিসার জালালুদ্দিন খল্‌জি দিল্লিতে এসে শাসনের ভার নেন। তিনি কায়কোবাদের শিশুপুত্র সামসুদ্দিন কায়মুরসকে হত্যা করে দিল্লির সিংহাসন দখল করেন (১২৯০)। এই ঘটনাটিকে খল্‌জি বিপ্লব বলা হয়েছে। বলবনের বংশ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি, কিন্তু তিনি দোয়াব অঞ্চলে শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন, এই অঞ্চলে কৃষিকাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্য বেড়েছিল। তাঁর কঠোর শাসননীতির ফলে দিল্লি সুলতানির সম্প্রসারণের পটভূমি তৈরি হয়ে যায়। বলবন শাসনব্যবস্থা পুনর্গঠনের জন্য প্রয়াস চালাননি, তবে তিনি ইক্‌তাদারদের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিলেন। ইক্‌তার উদ্বৃত্ত আয় থেকে যে অর্থ তিনি পান তা দিয়ে সৈন্যবাহিনী গঠন করেন, রাজসভার জাঁকজমক বাড়ান। বলবন কোনো বড় ধরনের নির্মাণকার্যে হাত দেননি। বলবনের সৈন্যবাহিনী কতখানি দক্ষ ছিল নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না। তিনি সম্প্রসারণ পরিহার করেন, মোঙ্গলদের পাঞ্জাব থেকে বিতাড়নের সাহস দেখাননি। বাংলার বিদ্রোহ দমন করতে তাঁর ছয় বছর সময় লেগেছিল। তুর্কি অফিসাররা ছিল বিদ্রোহপ্রবণ, বলবন অনেক তুর্কি অভিজাতকে হত্যা করে শাসক গোষ্ঠীকে দুর্বল করে দেন। তাজিকদের দূরে সরিয়ে দিয়ে তিনি শাসনব্যবস্থাকে দুর্বল করে ফেলেন। ভারতীয় মুসলমান, হিন্দু ও সাধারণ তুর্কিরাও তাঁর শাসনব্যবস্থায় স্থান পায়নি। এজন্য খল্‌জিরা সহজে তাঁদের পরাস্ত করেছিলেন। বলবনের ত্রুটির চেয়ে তাঁর কৃতিত্ব ছিল বেশি, তাঁর শক্তিশালী রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য রাষ্ট্রকে প্রস্তুত করে দিয়েছিল। বলবন শিশু সুলতানিকে সংহত ও ঐক্যবদ্ধ রেখেছিলেন।

খল্‌জি বিপ্লবের প্রকৃতি ও তাৎপর্য

মামলুক বংশীয় সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন দীর্ঘ চল্লিশ বছর (১২৪৬-১২৮৭) শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রথম বিশবছর তিনি ছিলেন তাঁর জামাতা নাসিরুদ্দিন মাহমুদের উজির, পরের বিশ বছর তিনি ছিলেন সুলতান। অশীতিপর বৃদ্ধ সুলতান মৃত্যুশয্যায় অভিজাত আমীরদের অনুরোধ করেছিলেন যেন তাঁর প্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদের পুত্র কায়খসরুকে সিংহাসনে বসানো হয়। শক্তির রাজনীতি ন্যায়নীতির ধার ধারে না। ১২৮৭ খ্রিস্টাব্দে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের মৃত্যু হলে তাঁর শেষ ইচ্ছাও বাতিল হয়ে যায়। বলবনের বন্ধু দিল্লির কোতোয়াল ফকরুদ্দিনের ষড়যন্ত্রে খসরু উত্তর-পশ্চিমের মুলতান প্রদেশে প্রেরিত হন। বলবনের দ্বিতীয় পুত্র বুঘরা খানের পুত্র মৈজুদ্দিন কায়কোবাদ সিংহাসন লাভ করেন। সিংহাসনের ওপর বুঘরা খানের দাবি ছিল অনেক বেশি জোরালো, তবে তিনি পুত্রের সিংহাসন প্রাপ্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াননি। তিনি বাংলায় স্বাধীন নরপতিরূপে শাসন করতে থাকেন। মাত্র

সতেরো বছর বয়সে কায়কোবাদ সুলতান হন। শান্ত, রুচিশীল, উদার প্রকৃতির এই যুবক পিতামহের কঠোর শাসনে পালিত হন, বিলাস-ব্যসন থেকে তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল।

কায়কোবাদ আকস্মিকভাবে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে বসেন। তাঁর দরবারে গায়ক, গায়কী, নর্তক-নর্তকীদের ভিড় বেড়েছিল। যমুনাতীরে কিলুঘরিতে তিনি নতুন প্রাসাদ বানিয়ে বাস করতে থাকেন, তাঁর সভাসদরা নতুন রাজধানীতে চলে আসেন এবং বিলাসব্যসনে ডুবে যান। কায়কোবাদের বিলাসী জীবনের পরিণতি হল বলবন প্রতিষ্ঠিত দক্ষ শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল। শাসকের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য, গোয়েন্দা বাহিনীর ভয় বা শাসনের শৃঙ্খলা কোনোটাই বজায় ছিল না। এর সুযোগ নেন কোতোয়াল ফকরুদ্দিনের জামাতা মালিক নিজামুদ্দিন। সুলতানকে বিলাসব্যসনে নিমগ্ন রেখে তিনি শাসন ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেন, দেশ শাসনের সব দায়িত্ব ছিল তাঁর হাতে। মালিক নিজামুদ্দিন ও তাঁর স্ত্রী সুলতানি দখল করার জন্য ষড়যন্ত্র শুরু করে দেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল বিলাসী সুলতান মৈজুদ্দিন অসুস্থ হয়ে অল্পকালের মধ্যে মারা যাবেন। তাঁর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী মুলতানের গভর্নর বলবনের পৌত্র কায়খসরুকে তিনি গুপ্তহত্যার ব্যবস্থা করেন।

প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বীদের ধ্বংস করে নিজামুদ্দিন বলবনের বংশের প্রতি অনুগত অভিজাতদের ধ্বংস করার কাজে মন দেন। তিনি মৈজুদ্দিনের মন্ত্রী খাজা খতিরকে হত্যা করেন, নব মুসলমানরা সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন এই অভিযোগে তাদের হত্যা করা হয়। মুলতানের করদ রাজা এবং বরনের শাসককে সরিয়ে দেওয়া হয়। নিজামুদ্দিন ক্ষমতার লোভে এত উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠেছিলেন যে তিনি সুলতানের পানীয়ের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেন। বিষপান করেও সুলতান মারা যাননি, অসুস্থ হয়ে পড়েন। এসব ঘটনার পরেও সুলতান নিজামুদ্দিনকে বিশ্বাস করতেন, নিজামুদ্দিন ও তার স্ত্রী প্রাসাদের ওপর আধিপত্য স্থাপন করেন। নিজামুদ্দিনের শ্বশুর তাকে সাবধান করে দেন, কিন্তু তিনি নিরস্ত হননি। ইতিমধ্যে বুঘরা খান অযোধ্যায় পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিজামুদ্দিনের অপসারণের পরামর্শ দেন। নিজামুদ্দিন গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হন। মৈজুদ্দিনের শাসনকাল ছিল (১২৮৭-১২৯০) প্রশাসনিক ব্যর্থতা, গুপ্তহত্যা ও ষড়যন্ত্রের এক কলঙ্কময় অধ্যায়।

নিজামুদ্দিন ষড়যন্ত্রপ্রিয় ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন কিন্তু তিনি শাসন ব্যবস্থার শৃঙ্খলা বজায় রেখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর দিল্লির শাসন পরিচালনার জন্য কোনো যোগ্য ব্যক্তি ছিল না। পিতার শত উপদেশ সত্ত্বেও সুলতান মৈজুদ্দিন কায়কোবাদের চরিত্রের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। অবিরাম মদ্যপানে তাঁর স্বাস্থ্যের আরও অবনতি হয়, প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। এই সংকটজনক মুহূর্তে সুলতান সামানার

গভর্নর জালালউদ্দিন ফিরোজ খল্‌জিকে দিল্লিতে ডেকে পাঠান। তাঁকে নতুন উপাধি দেওয়া হয় শায়েস্তা খান, যুদ্ধমন্ত্রীর পদ (আরজ-ই-মামালিক) ও বরনের জাগির তাঁকে দেওয়া হয়। এই নিয়োগের পাশাপাশি তুর্কি অভিজাত মালিক আইতমার কাছন ও মালিক আইতমার সুরখা মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হন। এরা ছিলেন বলবন বংশের প্রতি অনুগত তুর্কি অভিজাত। জালালুদ্দিন ছিলেন একজন দক্ষ সেনানায়ক ও প্রশাসক। অল্পকালের মধ্যে তুর্কি অভিজাতরা তাঁর সম্পর্কে ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠেছিলেন কারণ তিনি ছিলেন খল্‌জি গোষ্ঠীর লোক। খল্‌জিদের অতুর্কি মনে করা হত। সুলতানের আরও শারীরিক অবনতি ঘটলে রাজদরবারে রেষারেষি ও দলাদলি আরও বেড়েছিল। তুর্কিদের নেতৃত্ব দেন কাছন ও সুরখা, অতুর্কিদের নেতৃত্বে ছিলেন জালালউদ্দিন।

তুর্কিরা মৈজুদ্দিনের শিশুপুত্র শামসুদ্দিন কায়মুরসকে সিংহাসনে বসিয়ে শাসন পরিচালনা করতে থাকেন। উচ্চপদগুলি অভিজাতদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। জালাউদ্দিন তুর্কি অভিজাতদের বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব লক্ষ করে দিল্লির নিকটবর্তী বাহারপুরে গিয়ে আশ্রয় নেন। জালালউদ্দিন দিল্লি ত্যাগ করলে তুর্কি অভিজাতরা তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেছিল। তুর্কি ও খল্‌জিদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াই শুরু হয়েছিল। তুর্কি নেতা কাছন ও সুরখা নিহত হন, জালালের অনুচররা দিল্লিতে প্রবেশ করে শিশু সুলতান শামসুদ্দিনকে বাহারপুরে নিয়ে যায়। এই ঘটনায় দিল্লির জনতা ও অভিজাতরা হতভম্ব হয়ে পড়েছিল, তারা বাহারপুর আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু কোতোয়াল ফকরুদ্দিনের পরামর্শ অনুযায়ী এই পরিকল্পনা বাতিল হয়। এরপর তুর্কি দলের অনেকে খল্‌জিদের দলে যোগ দিয়েছিল। জালালউদ্দিন ক্ষমতার দ্বন্দ্বে জয়ী হন, তুর্কিরা বিধ্বস্ত হয়েছিল। ১২৯০ খ্রিস্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি জালালউদ্দিন প্রেরিত গুপ্তঘাতক অসুস্থ সুলতান মৈজুদ্দিন কায়কোবাদকে হত্যা করে তার মৃত দেহ যমুনার জলে নিক্ষেপ করেছিল। এই ঘটনার অল্পদিন পরে জালালুদ্দিন তাঁর অনুচরদের নিয়ে দিল্লিতে প্রবেশ করে সিংহাসনে বসেন। শিশু শামসুদ্দিনকে কারাগারে পাঠানো হয়, সেখানে তার মৃত্যু হয়। শামসুদ্দিন কায়মুরস তিনমাস কয়েকদিন নামমাত্র সুলতান ছিলেন। বারানি লিখেছেন যে দিল্লির অভিজাতরা এই পরিবর্তন মেনে নিতে পারেনি, তারা নতুন সুলতানকে অভিনন্দন জানায়নি।

১২৯০ খ্রিস্টাব্দে খল্‌জিদের ক্ষমতা দখলের ঘটনাটিকে খল্‌জি বিপ্লব বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দিল্লির জনতা ও অভিজাতরা খল্‌জিদের সমর্থন করেনি কারণ তাদের ধারণা হয়েছিল খল্‌জিরা হল অতুর্কি। বারানি লিখেছেন যে খল্‌জিরা ছিল 'অন্য জাতিগোষ্ঠীর লোক'। ঐতিহাসিক নিজামুদ্দিন আহম্মদ লিখেছেন যে খল্‌জিরা ছিল চিঙ্গিজ খানের জামাতা কুলিজ খানের বংশধর। তিনি আরও জানিয়েছেন যে

সেলজুগনামায় খল্‌জিদের তুর্কি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ফিরিস্তা ও বদায়ুনি উভয়ে মনে করেন খল্‌জিরা ছিল তুর্কি। আফগানিস্তানের হেলমদ নদীর উভয়তীর খল্‌জ নামে পরিচিত ছিল। এই অঞ্চলে যেসব তুর্কি বাস করত তারা খল্‌জি নামে পরিচিতি লাভ করে। চিঙ্গিজ খানের আগে থেকে খল্‌জিদের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক র‍্যাভারর্টি (Raverty) এবং মধ্য-এশিয়া বিশেষজ্ঞ বার্থোল্ড (Barthold) খল্‌জিদের তুর্কি জাতিভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। দীর্ঘকাল আফগানিস্তানে বসবাসের জন্য আফগানদের অনেক বৈশিষ্ট্য খল্‌জিরা গ্রহণ করেছিল। খল্‌জিরা ছিল তুর্কি, গজনি ও ঘুরির ভারত আক্রমণের সময় তারা ভারতে প্রবেশ করে। মধ্য এশিয়ায় মোঙ্গল আক্রমণের তীব্রতা বাড়লে এরা ভারতে অধিক সংখ্যায় প্রবেশ করেছিল। ভারতে শাসনক্ষমতা ইলবারি তুর্কিরা দখল করেছিল, এরাই খল্‌জিদের স্বতন্ত্র জাতিগোষ্ঠী হিসেবে গণ্য করত। প্রায় একশ বছর ক্ষমতা ভোগের পর ইলবারি তুর্কিদের হাত থেকে ক্ষমতা খল্‌জিদের হাতে চলে যায়। সমকালীন ভারতীয়দের মনে হয়েছিল রাজনীতিতে এক বিপ্লব ঘটে গেছে। তুর্কিদের শাসনের অধিকার ভারতীয়রা মেনে নিয়েছিল। ভারতীয়দের রক্ষণশীল মানসিকতা এজন্য অনেকটা দায়ী ছিল। ইলবারি তুর্কি ও খল্‌জিদের মধ্যে জাতিগত কোনো পার্থক্য ছিল না।

অধ্যাপক কিশোরী শরণ লাল খল্‌জি বিপ্লবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, এই বিপ্লবের তাৎপর্য ও গুরুত্ব ছিল সুদূরপ্রসারী। এই বিপ্লব শুধু রাজনৈতিক পালাবদল ঘটায়নি, এই বিপ্লব ভারতের ইতিহাসে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছিল। (ক) খল্‌জি বিপ্লব ভারতের রাজনীতিতে অবিরাম যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সাম্রাজ্য বিস্তারের যুগের সূচনা করেছিল। খল্‌জিরা শুধু উত্তর ভারত নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল না, দক্ষিণ ভারতের ওপর তারা আধিপত্য স্থাপন করেছিল। দেবগিরি, বরঙ্গল, দ্বারসমুদ্র ও মাবার দিল্লি সুলতানির আধিপত্য মেনে নিয়ে বার্ষিক কর দিতে রাজি হয়েছিল। আলাউদ্দিন দক্ষিণের বহু যুগ সঞ্চিত সম্পদের একাংশ অধিকার করেছিলেন। (খ) এই বিপ্লবের ফলে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নানাধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছিল। সুলতানি রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি ছিল অভিজাততন্ত্র, উলেমা সম্প্রদায় ও সৈন্যবাহিনী। খল্‌জি সুলতানরা অভিজাতদের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেন, এদেশীয়দের অভিজাততন্ত্রে স্থান দেন। তুর্কিদের অভিজাতপদ আর একচেটিয়া ছিল না। সুলতানি শাসনের ওপর উলেমাদের প্রভাব ছিল, উলেমারা সুলতানদের পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করতেন। আলাউদ্দিন উলেমাদের প্রভাব খর্ব করেন। খল্‌জি শাসনকালে রাজস্ব ও সৈন্যবাহিনীর ক্ষেত্রে অনেকগুলি সংস্কার প্রবর্তিত হয়। জমি জরিপ করে রাজস্ব ধার্যের ব্যবস্থা হয়, সুলতান নিজের অধীনে শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। (গ) খল্‌জি বিপ্লব সংস্কৃতির ইতিহাসে এক গৌরবময় যুগের সূচনা করেছিল। এযুগে

অসাধারণ সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয়, কবি আমীর খসরু এযুগকে স্মরণীয় করে রেখেছেন। খল্‌জিদের ধমনীতে রাজরক্ত ছিল না, তারা ছিল সাধারণ মানুষ। ক্ষমতা দখল করে খল্‌জিরা এই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছিল যে সিংহাসন অভিজাতদের একচেটিয়া নয়। অভিজাতদের দাবিকে নস্যাৎ করে সাধারণ খল্‌জিরা ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছেছিল। অধ্যাপক এ. বি. এম. হবিবুল্লাহ্ মনে করেন, খল্‌জি বিপ্লব হলো তুর্কি শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানদের বিদ্রোহ ও প্রতিবাদ। বিদেশী তুর্কি অভিজাতরা শাসন, আইন, বিচার ইত্যাদির জন্য মধ্য এশিয়ার ঘুর ও গজনির দিকে তাকাত। ভারতীয় মুসলমানরা বাইরের ঐতিহ্য ও আদর্শের প্রতি অনুগত ছিল না, এদেশের ঐতিহ্যকে তারা গ্রহণ করেছিল। খল্‌জি বিপ্লবের ফলে ভারতে সাধারণ মানুষের রাজত্ব শুরু হয়েছিল। নীল রক্তের তুর্কি অভিজাতরা এদেশের মুসলমানদের হীন ও নীচ বংশজাত বলে মনে করত। খল্‌জি বিপ্লব এদের প্রচণ্ডভাবে আঘাত করেছিল। ভারতের ইতিহাসে রাজবংশের পরিবর্তন কোনো নতুন ঘটনা নয়। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে আকস্মিকভাবে রাজবংশের পরিবর্তন ঘটে যেত, এজন্য বিশেষ কোনো রাজবংশের প্রতি ভারতীয়দের আনুগত্য গড়ে ওঠেনি। একথা ঠিক ইলবারি তুর্কিরা প্রায় একশো বছর ধরে শাসন করেছিল, তাদের প্রতি ভারতীয়দের খানিকটা দুর্বলতা ছিল। কিন্তু প্রয়োজন হলে মুহূর্তের মধ্যে এই দুর্বলতা পরিহার করে নতুন রাজবংশকে গ্রহণে কোনো বাধা ছিল না। জনগণের কাছে খল্‌জি বংশের প্রতিষ্ঠা কোনো বড় রকমের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল না।

বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার, নির্বাচন বা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে জালালউদ্দিন খল্‌জি তার রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেননি। কার্যত সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে তিনি ক্ষমতা দখল করেন, শক্তির প্রয়োগ করে খল্‌জিরা ক্ষমতায় টিকে ছিলেন। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য খল্‌জিরা অভিজাততন্ত্র, উলেমা বা জনগণের সমর্থন কামনা করেননি। ভালোমন্দ যেভাবেই শাসন করুন না কেন খল্‌জিরা মুসলিম বিশ্বকে দেখিয়েছিলেন যে ধর্মীয় সমর্থন ছাড়াই রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারে, ভালোভাবে শাসনও চলতে পারে। সমকালীন মুসলিম বিশ্বের ইতিহাসে এটি ছিল নজিরবিহীন ঘটনা। খল্‌জিরা শুধু সাম্রাজ্য বিস্তার করেননি, বৈদেশিক আক্রমণ থেকে তাঁরা ভারতবর্ষকে রক্ষা করেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মোঙ্গল অনুপ্রবেশের ওপর তাঁরা নজর রেখেছিলেন, আলাউদ্দিন মোঙ্গলদের সঙ্গে সাতবার সংঘাতে লিপ্ত হন। আলাউদ্দিনের সুদক্ষ সামরিক ব্যবস্থার জন্য মোঙ্গলরা ভারতে প্রবেশ করতে পারেনি। আলাউদ্দিন ছাড়া অন্য কোনো দুর্বল শাসক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলে দিল্লির সুলতানি মোঙ্গলদের হাতে চলে যেত। মধ্যযুগীয় পরিস্থিতিতে আলাউদ্দিনের অনেকগুলি সংস্কার যেমন বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছিল অভিনব। এর অনেকগুলি সাফল্যমণ্ডিত হয় যদিও বেশিদিন টিকে

থাকেনি। খল্‌জি শাসনের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো সামরিক শক্তির ওপর অত্যধিক নির্ভরতা। এজন্য সমকালীন বিজ্ঞ ব্যক্তিরা মনে করতেন খল্‌জি শাসনের ভিত আলগা, কারণ এর পেছনে জনসমর্থন নেই।

ড. কে. এস. লাল খল্‌জি বিপ্লবের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, এই বিপ্লব শুধু একটি নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেনি, অনেকগুলি পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল। সতীশচন্দ্র মনে করেন এই বিপ্লব আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। বারানি লিখেছেন যে খল্‌জিদের তুর্কিদের সিংহাসনে বসতে দেখে দিল্লির জনতা স্তম্ভিত ও বিস্মিত হয়েছিল (were struck by admiration and amazement at seeing the Khaljis occupying the throne of the Turks.)। বারানি খল্‌জিদের অন্য জাতির লোক মনে করেছিলেন। তাঁর এই ধারণা ঠিক নয়, খল্‌জিরা ছিল তুর্কিদের একটি শাখা। খল্‌জিদের অভ্যুত্থানের সবচেয়ে বড় তাৎপর্য হলো শাসকগোষ্ঠী অনেকখানি সম্প্রসারিত হয়েছিল (broadening of the social base of the ruling class), তুর্কি, তাজিক, ভারতীয় মুসলমান, হিন্দু সকলে শাসকগোষ্ঠীতে স্থান পেয়েছিল। জালালুদ্দিন ও আলাউদ্দিন এই রাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করেন। খল্‌জি বিপ্লব হলো তুর্কি অভিজাতদের বিরুদ্ধে অতুর্কিদের প্রতিবাদ। তুর্কিরা শাসন, আইন ইত্যাদির জন্য গজনি ও ঘুরের দিকে তাকাত। ভারতীয় মুসলমানরা দিল্লির দিকে তাকাত, বাইরের ঐতিহ্যের প্রতি তাদের আনুগত্য ছিল না। ভারতে সাধারণ মানুষের রাজত্ব শুরু হয়েছিল।

সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে খল্‌জিরা ক্ষমতা দখল করেছিল, শক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে খল্‌জিরা ক্ষমতায় টিকে ছিল। জনসমর্থন, অভিজাত ও উলেমাদের সমর্থনের ওপর তাঁরা নির্ভর করেনি। শাসন ও ধর্মের মধ্যে তারা বিভাজন রেখাটি তুলে ধরে। মুসলিম বিশ্বকে তারা দেখিয়েছিল যে ধর্মের সমর্থন ছাড়াই রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারে। মুসলিম বিশ্বের ইতিহাসে এটি ছিল নজিরবিহীন ঘটনা। খল্‌জি বিপ্লবের ফলে অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহ ও সাম্রাজ্য বিস্তারের যুগের সূচনা হয়েছিল। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছিল। এই বিপ্লব সাংস্কৃতিক ইতিহাসেও গৌরবময়। এযুগে অসাধারণ সাহিত্য সৃষ্টি হয়, আমীর খসরু এই যুগকে আলোকিত করেন। আলাউদ্দিন সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি অনুসরণ করেন, সারা ভারতে মুসলিম শাসন স্থাপিত হয়। খল্‌জিরা মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিহত করেছিল। আলাউদ্দিনের সুদক্ষ সৈন্যবাহিনীর জন্য মোঙ্গলরা ভারতে প্রবেশ করতে পারেনি, অন্য কোনো দুর্বল শাসক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলে দিল্লি মোঙ্গলদের অধিকারে চলে যেত।

আলাউদ্দিন অনেকগুলি অভিনব সংস্কার প্রবর্তন করেন। রাজস্ব, সৈন্যবাহিনী, বাজার নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ব্যবস্থার অনেকগুলি সাফল্যমণ্ডিত হয়, যদিও বেশিদিন টিকে

থাকেনি। খল্জিরা সামরিক শক্তির ওপর বেশি নির্ভর করেছিল, তাদের পেছনে জনসমর্থনের অভাব ছিল। খল্জি বিপ্লব যে নানাদিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ তাতে সন্দেহ নেই।

খল্জিদের শাসন (১২৯০-১৩২০)

ইলবারি তুর্কিরা ৮৪ বছর ধরে সুলতানি শাসন পরিচালনা করেছিল, পরবর্তী তিরিশ বছর ছিল খল্জিদের শাসন। বারানি খল্জিদের অতুর্কি বলে উল্লেখ করেছেন। সাম্প্রতিককালের গবেষণা প্রমাণ করেছে যে খল্জিরা হলো তুর্কিদের একটি শাখা। খল্জিদের উত্থান সমাজের নতুন শ্রেণীকে ক্ষমতার অংশীদার করেছিল। জালালুদ্দিন খল্জি শাসন ব্যাপারে সংকীর্ণ জাতিবৈষম্যমূলক নীতি (policy of narrow exclusivism) অনুসরণ করেননি। তুর্কি, তাজিক, হিন্দুস্তানি সকলকে তিনি শাসনব্যবস্থায় স্থান দেন। জালালুদ্দিন নতুন শাসননীতি প্রবর্তন করেন। সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষের সমর্থন ও সদিচ্ছার ওপর রাষ্ট্র নির্ভর করবে। শাসন হবে জনকল্যাণমুখী, কাউকে আঘাত না করা ছিল তাঁর নীতি। বলবনের আত্মম্ভরিতা ও উৎপীড়নের নীতি থেকে তিনি সরে আসেন। ধর্মভীরু মুসলমান হলেও তিনি হিন্দুদের ধর্মান্তরকরণ ও সম্মানহানি ঘটানোর নীতি অনুসরণ করেননি। তাঁর সহকর্মী আহম্মদ চাপের সঙ্গে আলোচনায় তিনি হিন্দুদের স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণের অধিকার দানের কথা বলেছিলেন। তিনি মনে করেন যে সন্ত্রাস দিয়ে মানুষের হৃদয় জয় করা যায় না। এধরনের রাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করলে ইসলাম জনপ্রিয়তা হারাবে। ১২৯৬ খ্রিস্টাব্দে জালালুদ্দিনকে হত্যা করে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলাউদ্দিন খল্জি সিংহাসন অধিকার করেন।

আলাউদ্দিন (১২৯৬-১৩১৬) জালালুদ্দিনের মানবতাবাদী জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করেননি। তিনি মনে করেন এধরনের নীতি অনুসরণ করলে রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে পড়বে, এ নীতি যুগের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বলবনের ত্রাস সৃষ্টিকারী রাষ্ট্রনীতি তিনি পছন্দ করেন। আলাউদ্দিনের রাজত্বের গোড়ার দিকে পরপর কয়েকটি বিদ্রোহ হয়। দিল্লির উপকণ্ঠে স্থাপিত নবমুসলমানরা বিদ্রোহ করেছিল, তাঁর আত্মীয় আকাত খান বিদ্রোহী হয়ে ক্ষমতা দখলের প্রয়াস চালিয়েছিল। বদায়ুন ও অযোধ্যার প্রাদেশিক শাসকরা বিদ্রোহ করে, হাজী মাওলা নামে এক ব্যক্তি দিল্লিতে বিদ্রোহ করে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেছিল। আলাউদ্দিন এসব বিদ্রোহ দমন করেন। বিদ্রোহ দমনের পর আলাউদ্দিন বিদ্রোহের কারণ বিশ্লেষণ করে কতকগুলি সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্তগুলি হলো রাষ্ট্রে ঠিকমতো সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা নেই, শাসনকার্য অবহেলিত হয়, মদ্যপান ও অভিজাতদের মধ্যে মেলামেশা ষড়যন্ত্রের পরিবেশ

তৈরি করে দেয়। জনগণের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হলে বিদ্রোহের প্রবণতা দেখা দেয়।

বিদ্রোহের কারণগুলি দূর করার জন্য আলাউদ্দিন চারটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রথম আদেশে তিনি সরকারি অনুদানগুলি বাতিল করে দেন। যেসব লোক সরকারি ভাতা, অনুদান, পেনসন বা নিষ্করভূমি ভোগ করত তারা অধিকার হারিয়েছিল। বারানি জানাচ্ছেন যে আলাউদ্দিনের কৃষি অর্থনীতির সংস্কারের উদ্দেশ্য ছিল জনগণের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হতে না দেওয়া। সরকারি কর্মচারীদের আদেশ দেওয়া হয় তারা যেন কড়াকড়ি করে সরকারি সব প্রাপ্য আদায় করে নেয়। বারানি লিখেছেন যে আলাউদ্দিনের এই আদেশ সরকারি কর্মচারীরা এত কঠোরভাবে প্রয়োগ করেছিল যে অল্পকালের মধ্যে দেশের বেশিরভাগ মানুষের হাতে আর সঞ্চয় ছিল না। শুধু মালিক, আমীর, সরকারি কর্মচারী ও বণিকদের হাতে কিছু অর্থ ছিল। দ্বিতীয় আদেশে সুলতান দেশের গুপ্তচর বাহিনীর পুনর্গঠন করেন। সরকারি কর্মচারী, প্রাদেশিক গভর্নর, গ্রাম, বাজার ও শহরের সংবাদ গুপ্তচররা সংগ্রহ করে আলাউদ্দিনকে জানাত। আলাউদ্দিন যথাযথ প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতেন, অল্পদিনের মধ্যে শাসনব্যবস্থায় যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছিল। তৃতীয় আদেশে আলাউদ্দিন মদ প্রস্তুত ও বিক্রি বন্ধ করে দেন। মদ্যপান বিরোধী আইন ভঙ্গ করা হলে তিনি শাস্তি দিতেন, পরবর্তীকালে এই আইনের কঠোরতা খানিকটা হ্রাস করা হয়, প্রকাশ্যে মদ প্রস্তুত ও বিক্রি আগের মতো নিষিদ্ধ ছিল। চতুর্থ আদেশটি ছিল অভিজাতদের সম্পর্কে। সুলতানের অনুমতি ছাড়া অভিজাতদের সামাজিক মেলামেশা ও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ হয়। এই চারটি আদেশ জারি করে আলাউদ্দিন বিদ্রোহের সম্ভাবনা দূর করেন, শাসনকার্যে উন্নতি ঘটান।

আলাউদ্দিন শাসননীতিতে কঠোর ছিলেন। বিদ্রোহী মোঙ্গলদের তিনি নিষ্ঠুর শাস্তি দেন। জালালুদ্দিনের মতো তিনি বিশ্বাস করতেন ভারতে খাঁটি ইসলামী রাষ্ট্র ও শরিয়ত প্রবর্তন করা সম্ভব নয়। কাজী মুঘিশকে তিনি বলেছিলেন ভারতে ইসলামী রাষ্ট্র শক্তি ও সম্পদ দেখাবে, শরিয়ত অনুযায়ী শাস্তি দিতে পারবে না। তিনি কাজীকে বলেছিলেন যে রাষ্ট্র ও জনগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তাকিয়ে তিনি আদেশ জারি করেন। এই আদেশ শরিয়ত অনুযায়ী বেআইনি কিনা তিনি জানেন না। বারানি মনে করেন যে আলাউদ্দিন রাষ্ট্র ও শরিয়তের ক্ষেত্র পৃথক বলে গণ্য করতেন, প্রথমটি হলো রাজার অধিকার, দ্বিতীয়টি হলো কাজী ও মুফ্‌তিদের। আলাউদ্দিনের শাসনকালে অতুর্কি তাজিক, হিন্দুস্তানি ও অন্যান্য গোষ্ঠীর লোকেরা শাসনব্যবস্থায় স্থান পেয়েছিল। আলাউদ্দিনের সেনাপতি জাফর খান, নসরত খান, মালিক কাফুর সকলে ছিলেন অতুর্কি। মালিক নায়ক নামে তাঁর একজন হিন্দু সেনাপতি ছিলেন, ভারতীয় মুসলমানরা তাঁর সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল।

দিল্লি সুলতানির সম্প্রসারণ (১২৯৬-১৩২৮)

১২০৬ খ্রিস্টাব্দে দিল্লি সুলতানির প্রতিষ্ঠা থেকে ১২৯০ পর্যন্ত দিল্লি সুলতানির বিস্তার ঘটেনি। ইলবারি তুর্কিরা দিল্লি সুলতানির সংহতি রক্ষার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। প্রথম একশো বছর ধরে দিল্লি সুলতানির বিস্তার না হবার কারণ হলো চারটি ঃ (১) দিল্লিতে রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলেছিল। (২) তুর্কি সেনাপতিরা স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের জন্য প্রয়াস চালিয়েছিলেন, ভারতে আসার পরেও তুর্কিদের এই উপজাতি প্রবণতা বন্ধ হয়নি। (৩) মোঙ্গল আক্রমণের আশঙ্কায় সুলতানরা ভীত ও সন্ত্রস্ত ছিলেন। (৪) অধিকারচ্যুত হিন্দু রাজারা ক্ষমতা ফিরে পাবার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন। খল্‌জিদের উদার রাষ্ট্রনীতি সম্প্রসারণের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছিল। অতুর্কি, হিন্দু, মুসলমান সকলকে তাঁরা প্রশাসন ও সৈন্যবাহিনীতে গ্রহণ করেন। তিরিশ বছর ধরে দিল্লি সুলতানির বিস্তারের কাজ চলেছিল। এর মধ্যে তিনটি পর্ব লক্ষ করা যায়—প্রথমপর্বে গুজরাট, রাজস্থান ও মালব অধিকৃত হয়। দ্বিতীয় পর্বে দাক্ষিণাত্য (মহারাষ্ট্র) ও সুদূর দক্ষিণাঞ্চলে আক্রমণ চালিয়ে আলাউদ্দিন দক্ষিণের রাজাদের কাছ থেকে কর ও বশ্যতা আদায় করেন। শেষপর্বে (১৩১৫-২৫) সমগ্র দক্ষিণ ভারতের ওপর দিল্লির কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। বাংলাও দিল্লির অধীনে স্থাপিত হয়েছিল, প্রায় সমগ্র ভারত দিল্লির অধীনে এসেছিল।

গজনির মাহমুদ ও ঘুরির মৈজুদ্দিন গুজরাটকে তাঁদের আক্রমণের লক্ষ্য করেছিলেন। এখানকার চালুক্য শাসকরা তুর্কিদের বাধা দেন। গুজরাট হলো জনবহুল, সমৃদ্ধ, শিল্প ও বাণিজ্যে উন্নত অঞ্চল। গুজরাটের ক্যাম্বে বন্দর (খামবয়াত) দিয়ে পশ্চিম এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও চীনের সঙ্গে বাণিজ্য চলত। এখানকার হিন্দু, জৈন ও আরব বণিকরা ছিল ধনী, মন্দিরগুলিতে ছিল প্রচুর সোনা ও রুপো। গুজরাট বন্দরের মাধ্যমে আরব ও মধ্যপ্রাচ্যের ঘোড়া সংগ্রহ করা হতো। গুজরাটের রাজা করণ ও তাঁর প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে বিরোধের সুযোগ নিয়ে আলাউদ্দিন ১২৯৯ খ্রিস্টাব্দে গুজরাট আক্রমণ করেন। আলাউদ্দিনের সেনাপতি উলুগ খান ও নসরত খান সিন্ধু হয়ে জয়সলমীরে প্রবেশ করেন, সেখান থেকে চিতোর হয়ে তাঁরা গুজরাটে প্রবেশ করেন। রাজা রাজধানী আনহিলবারা ত্যাগ করে দেবগিরিতে পালিয়ে যান। দক্ষিণ গুজরাটের বাগলানায় তাঁর অধিকার বজায় ছিল। আলাউদ্দিন এখানে তাঁর গভর্নর নিযুক্ত করেন। রাজস্থানে আজমীর, নাগৌর ও মাদোর তুর্কিদের অধীনে ছিল, বাকি সব অঞ্চল ছিল রাজপুত রাজাদের অধীন। গুজরাট জয়ের পর আলাউদ্দিন রাজস্থান ও মালব জয়ের পরিকল্পনা করেন, গুজরাটের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য এই দুই অঞ্চল জয়ের প্রয়োজন ছিল। ১৩০১ খ্রিস্টাব্দে আলাউদ্দিনের সেনাপতি উলুগ খান ও নসরত খান

রাজস্থানের দুর্ভেদ্য দুর্গ রণথম্ভোর আক্রমণ করেন। রাজা হাম্মির দেব উলুগ খানকে পরাস্ত করেন, নসরত খান নিহত হন। এই ঘটনার পর আলাউদ্দিন নিজেই রণথম্ভোর আক্রমণ করেন। মহিলারা জহরব্রত করে জীবন বিসর্জন দেন, পুরুষরা যুদ্ধ করে প্রাণ দেন, আলাউদ্দিন রণথম্ভোর অধিকার করেন। রণথম্ভোরের পর আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণ করেন। চিতোরের রাণা রতন সিং যুদ্ধ করে প্রাণ দেন। মালিক মহম্মদ জায়সির পদ্মিনী উপাখ্যান আধুনিক ঐতিহাসিকরা বাতিল করেছেন।[২] চিতোরের পতনের পর মারওয়াড় ও বুন্দি আলাউদ্দিনের বশ্যতা স্বীকার করেছিল, জয়সলমীর, সীবানা ও জালোর আলাউদ্দিন অধিকার করে নেন। রাজস্থানের রণথম্ভোর, চিতোর ও আজমীর ছাড়া আলাউদ্দিন বাকি অঞ্চলের ওপর তুর্কি শাসন স্থাপন করেননি। রাজপুত রাজাদের সঙ্গে তিনি সুসম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস চালিয়েছিলেন, রাজপুত রাজারা স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করেন।

গুজরাট ও রাজস্থান জয়ের পর আলাউদ্দিন মালব জয়ের জন্য অভিযান পরিচালনা করেন। মালব ছিল সমৃদ্ধ এবং আয়তনে বিশাল। ইলতুৎমিস ও বলবন মালব আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু মালব বিজিত হয়নি। মালব জয় করে আলাউদ্দিন গুজরাটের প্রবেশপথ নিরাপদ করেন। ১৩০৫ খ্রিস্টাব্দে আইন-উল-মুল্‌ক মুলতানি মালব আক্রমণ করে রাজাকে পরাস্ত ও নিহত করেন, সমগ্র অঞ্চল সুলতানির অন্তর্ভুক্ত হয়। বাংলা ও ওড়িশা ছাড়া সমগ্র উত্তর ভারত তুর্কিদের অধীনে এসেছিল।

আলাউদ্দিনের দাক্ষিণাত্য জয়

আলাউদ্দিন ছিলেন একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী সাম্রাজ্যবাদী শাসক। মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করে তিনি সৈন্যবাহিনী ও শাসনব্যবস্থার পুনর্গঠন করেন। এরপরে তিনি দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারত জয়ের পরিকল্পনা করেন। কে. এস. লাল লিখেছেন যে আলাউদ্দিন ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য বা তার গৌরব বৃদ্ধির জন্য দক্ষিণে অভিযান পাঠাননি। সুলতান ধর্মাদর্শ থেকে রাষ্ট্রাদর্শকে পৃথক করেছিলেন। আলাউদ্দিন দক্ষিণ ভারতের বিপুল ঐশ্বর্য খ্যাতির দ্বারা প্রভাবিত হন, ধন ও যশোলাভের জন্য তিনি দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারতে অভিযান পাঠিয়েছিলেন। ১২৯৬ খ্রিস্টাব্দে দেবগিরি আক্রমণ করে তিনি প্রচুর ধনরত্ন লাভ করেন। কে. এস. লাল মনে করেন দেবগিরির সোনা দিয়ে তিনি মসনদ দখল করেছিলেন। উলস্‌লি হেগ জানাচ্ছেন যে আলাউদ্দিন সুলতানির সাম্রাজ্যবাদী পর্বের সূচনা করেন, তিনি সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য গড়ে

২. রাজস্থানের ঐতিহাসিক জি. এস. ওঝা এই ঘটনার ঐতিহাসিকতা স্বীকার করেননি।

তোলেন। দক্ষিণের রাজাদের মধ্যে বিরোধ তাঁকে ঐ অঞ্চলে অভিযান চালাতে উৎসাহিত করেছিল।

এই সময় দাক্ষিণাত্য ও সুদূর দক্ষিণে চারটি রাজ্য ছিল, এই রাজ্যগুলির ধনসম্পদের খ্যাতি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিন্ধ্য পর্বতমালার ঠিক দক্ষিণ-পশ্চিমে ছিল দেবগিরি রাজ্য, যাদব বংশীয় রাজা রামচন্দ্রদেব এখানে রাজত্ব করতেন। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ছিল তেলেঙ্গানা রাজ্য, এই রাজ্যের রাজা ছিলেন কাকতীয় (গণপতি) বংশীয় প্রতাপরুদ্রদেব, তাঁর রাজধানী ছিল বরঙ্গল। দেবগিরি রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বর্তমান কর্ণাটক রাজ্যে ছিল দ্বারসমুদ্র রাজ্য, হৈসল বংশীয় রাজা তৃতীয় বীরবল্লাল এখানে রাজত্ব করতেন। একেবারে সুদূর দক্ষিণে ছিল পাণ্ড্যদের রাজ্য, মুসলমান ঐতিহাসিকরা একে 'মাবার' বলে উল্লেখ করেছেন, এর রাজধানী ছিল মাদুরাই। সিংহাসন নিয়ে দুই পাণ্ড্য রাজপুত্র বীর পাণ্ড্য ও সুন্দর পাণ্ড্য দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিলেন। রামচন্দ্র তাঁর প্রতিশ্রুতিমত আলাউদ্দিনকে কর পাঠাননি, ১৩০৮ খ্রিস্টাব্দে আলাউদ্দিন এখানে দুটি সৈন্যদল পাঠিয়েছিলেন। গুজরাটের পরাজিত শাসক করণ দক্ষিণের বাগলানা অঞ্চলে নিজের অধিকার বজায় রেখেছিলেন, তিনি পরাস্ত হন। যুগ্ম বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন মালিক কাফুর, রামচন্দ্র পরাস্ত হয়ে আত্মসমর্পণ করেন। তিনি দিল্লিতে এসে আলাউদ্দিনের সঙ্গে দেখা করেন, সম্ভবত তাঁর কন্যার সঙ্গে আলাউদ্দিনের বিবাহ হয়। কর ও আনুগত্যের বিনিময়ে তিনি রাজ্য ফিরে পান। আলাউদ্দিন দাক্ষিণাত্যে বিজিত রাজ্য তাঁর রাজ্যভুক্ত করেননি। দেবগিরি থেকে আলাউদ্দিন দক্ষিণে তাঁর অভিযানগুলি পরিচালনা করেন। রাজপুত রাজাদের সঙ্গে তাঁর যে রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল দক্ষিণে তা সম্প্রসারিত হয়।

১৩০৯ খ্রিস্টাব্দে মালিক কাফুর তেলেঙ্গানা রাজ্যটি আক্রমণ করেন। পূর্বের এক ব্যর্থ অভিযানের স্মৃতি মুছে ফেলার জন্য এখানে অভিযান পাঠানো হয়। বরঙ্গল দুর্গের পতন হলে রাজা ১৩১০ খ্রিস্টাব্দে শান্তিচুক্তি করতে বাধ্য হন। সঞ্চিত সম্পদ, হাতি, ঘোড়া মালিক কাফুরের হাতে তুলে দিয়ে তিনি স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পান। তেলেঙ্গানা জয় করে মালিক কাফুর দ্বারসমুদ্র আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হন। দেবগিরি থেকে বেরিয়ে তিনি দ্বারসমুদ্রের দিকে এগিয়ে যান। রাজা এইসময় পাণ্ড্য রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন। তিনি ফিরে এসে কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধে পরাস্ত হন, তিনি দিল্লির বশ্যতা স্বীকার করে নেন, বার্ষিক করদানে রাজী হন। ১৩১১ খ্রিস্টাব্দে মালিক কাফুর সুদূর দক্ষিণের পাণ্ড্য রাজ্যটি আক্রমণ করেন। এই রাজ্যটি ছিল আয়তনে বিশাল। দেশে তখন দুই রাজপুত্রের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে যুদ্ধ চলেছিল, কিন্তু তাঁরা মালিক কাফুরের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। তাঁরা গেরিলা পদ্ধতি অনুসরণ করে মালিক কাফুরকে বাধা দেন, মন্দির ও শহর ধ্বংস করে আলাউদ্দিনের সেনাপতি নির্মম

প্রতিশোধ নেন। সম্ভবত তিনি রামেশ্বরম পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। মাবার রাজ্য থেকে তিনি প্রচুর ধনরত্ন সংগ্রহ করেন। জীবনের শেষদিকে আলাউদ্দিন দেবগিরিতে তৃতীয়বার অভিযান পাঠিয়েছিলেন (১৩১৫)। দেবগিরির নতুন রাজা ভীল্লমা বিদ্রোহী হলে মালিক কাফুর দেবগিরি দুর্গসহ ঐ রাজ্যের বেশকিছু অঞ্চল দখল করে নেন। আলাউদ্দিনের দাক্ষিণাত্য নীতির পরিবর্তন হয়েছিল। দক্ষিণের রাজ্যগুলির ওপর সামরিক ও কূটনৈতিক চাপ বজায় রাখার জন্য তিনি অধিগ্রহণের নীতি অনুসরণ করেন।

অর্থ ও মর্যাদা লাভ ছিল আলাউদ্দিনের দাক্ষিণাত্য নীতির উদ্দেশ্য, এই উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছিল। তিনি অর্থ ও রাজনৈতিক গৌরব লাভ করেন। দক্ষিণের রাজ্যগুলি সাম্রাজ্যভুক্ত করে তিনি সামরিক ঝুঁকি নেননি, সাম্রাজ্য বিস্তার না করে তিনি ধনসম্পদ, কর ও আনুগত্য পেয়েছিলেন। তবে দক্ষিণ অঞ্চলের ওপর দিল্লির আধিপত্য স্থায়ী হয়নি, দক্ষিণের রাজারা প্রায় স্বাধীনভাবে চলতেন। কর বা আনুগত্য কোনোটাই তিনি পেতেন না। শেষদিকে মালিক কাফুর দিল্লিতে ছিলেন, তার সুযোগ নেন দক্ষিণের রাজারা। মুবারক খল্‌জি ও মহম্মদ বিন তুঘলক নতুন করে দক্ষিণ ভারত জয় করেন। আলাউদ্দিন দক্ষিণ ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের সূচনা করেন, তাঁর প্রদর্শিত পথে তাঁর উত্তরসূরিরা এগিয়েছিলেন। মুবারক খল্‌জি দেবগিরি ও বরঙ্গল পুনরায় জয় করেন। গিয়াসউদ্দিন তুঘলক দক্ষিণে সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি অনুসরণ করেন। তাঁর নির্দেশে পুত্র উলুগ খান (মহম্মদ বিন তুঘলক) বরঙ্গল আক্রমণ করেন। তিনি বরঙ্গল জয় করে সরাসরি সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেন, বরঙ্গলের নতুন নাম হয় সুলতানপুর। ১৩২৩ খ্রিস্টাব্দে গিয়াসউদ্দিন মাবার রাজ্যের রাজধানী মাদুরাই অধিকার করেন, এই অঞ্চল দিল্লি সুলতানির অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৩২৮ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ বিন তুঘলক কর্ণাটকে অভিযান পাঠিয়ে ঐ অঞ্চল সুলতানি রাজ্যভুক্ত করে নেন। দিল্লি থেকে অনেকদূরে এক বিশাল অঞ্চল সুলতানি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। সেই যুগে সুদূর দিল্লি থেকে এসব অঞ্চল শাসন করা ছিল দুরূহ কাজ। দিল্লি সুলতানি নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয়, ভাঙতে শুরু করে। সাম্রাজ্যের অতিবিস্তার তার শক্তি বৃদ্ধি করেনি, বরং তার দুর্বলতার কারণ হয়েছিল।

তৃতীয় অধ্যায়	রাজনৈতিক ইতিহাস ঃ কেন্দ্রীভূত সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যের সমস্যা (১৩২০-১৪১২)

খল্‌জি শাসনের শেষ—তুঘলক শাসনের শুরু

আলাউদ্দিনের শেষজীবনে তীব্রতম ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল, তাঁর প্রিয় সেনাপতি মালিক কাফুর ক্ষমতালিপ্সু হয়ে উঠেছিলেন। তিনি যুবরাজ খিজর খানকে বন্দী করে অন্ধ করে দেন। আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর এক শিশুকে সিংহাসনে বসিয়ে তিনি ক্ষমতা নিজের হাতে রাখেন, কিন্তু একমাসের মধ্যে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন, মুবারক খল্‌জি ক্ষমতা দখল করেন। তিনি দাক্ষিণাত্য ও গুজরাটে অভিযান পাঠিয়েছিলেন। বারানি জানিয়েছেন যে তিনি দুশ্চরিত্র ছিলেন। বরদু নামে একটি সদ্য ধর্মান্তরিত সম্প্রদায়কে তিনি শাসনব্যবস্থায় স্থান দেন। এদের নেতা খসরু মালিক তাঁকে হত্যা করে (১৩২০) সিংহাসন দখল করেন। সীমান্তের দক্ষ সামরিক নেতা গিয়াসউদ্দিন তুঘলক বরদুদের সরিয়ে ক্ষমতা দখল করেন। তিনি মাত্র পাঁচবছর শাসন ক্ষমতায় ছিলেন। তিনি গুজরাট, বরঙ্গল ও বাংলার বিদ্রোহ দমন করেন, ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দে অভ্যর্থনা মণ্ডপ ভেঙে পড়লে তাঁর মৃত্যু হয়। গিয়াসউদ্দিন ও তাঁর পুত্র মহম্মদ বিন তুঘলক (১৩২৫-১৩৫১) আলাউদ্দিনের বিজিত রাজ্য সাম্রাজ্যভুক্ত না করার নীতি অনুসরণ করেননি, আনুগত্য ও কর নিয়ে তারা সন্তুষ্ট ছিলেন না। বারানি জানাচ্ছেন যে পিতা ও পুত্র দুজনে খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। মহম্মদ বিন তুঘলক এক ইঞ্চি ভূমিও তাঁর সাম্রাজ্যের বাইরে রাখতে চাননি। এদের শাসনকালে দিল্লির অধীনে স্থাপিত হয় বরঙ্গল, মাবার, মাদুরাই ও দ্বারসমুদ্র। বারানি আরও জানিয়েছেন যে নতুন কোনো অঞ্চল বিজিত হলে মহম্মদ বিন তুঘলক তাঁর রাজস্ব নির্ধারণের ব্যবস্থা করতেন। শাসন ছিল খুব কেন্দ্রীভূত, সারা ভারতবর্ষ ছিল একই শাসনাধীনে, প্রশাসনিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল।

বারানি ও সমকালীন ঐতিহাসিকরা দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রথমটি হলো জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। বারানি আলাউদ্দিনের বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রশংসা করেছেন, তবে তাঁর অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার নিন্দা করেছেন। তুলনামূলকভাবে গিয়াসউদ্দিন তুঘলক ছিলেন নরমপন্থী এবং জনকল্যাণকামী শাসক। অত্যধিক কর বসিয়ে তিনি দেশকে ধ্বংস করতে চাননি, উন্নতির পথ বন্ধ করতে চাননি। হিন্দুদের ওপর এমনভাবে কর স্থাপনের কথা ভেবেছিলেন যাতে তারা অতি ধনী হয়ে বিদ্রোহ করতে না পারে, আবার একেবারে নির্ধন হলে তারা চাষবাস করতে পারবে না, এতে দেশের ক্ষতি হবে। তুঘলক যুগে রাষ্ট্র প্রথম কৃষি ও হস্তশিল্পের গুরুত্ব অনুধাবন

করতে পেরেছিল। কৃষির নিরবচ্ছিন্ন সম্প্রসারণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। জালালুদ্দিন যে মানবতাবাদী জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের কথা বলেছিলেন তুঘলক যুগে তার প্রতিষ্ঠা হয়। গিয়াসউদ্দিন আলাউদ্দিনের অনুগামী আমীরদের প্রতি উদার ব্যবহার করেন, তাঁদের সরকারি পদ ও ইক্‌তা দেন। উলেমারা যেসব নিষ্কর জমি ভোগ করতেন সেগুলি সম্পর্কে অনুসন্ধান করে তিনি অনেকগুলি বাতিল করেন। পূর্ববর্তী শাসকদের কাছ থেকে যাঁরা আর্থিক অনুদান পেয়েছিলেন তাঁদের হিসেব দিতে বলা হয় এবং এঁদের বেশিরভাগ অনুদানের অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, ধর্মভীরু খাঁটি মুসলমান গিয়াসউদ্দিন ধর্ম সম্পর্কে উলেমাদের ব্যাখ্যা গ্রহণ করেননি। উলেমারা হিন্দুদের নির্ধন করে অসম্মানের মধ্যে নিক্ষেপ করার পক্ষপাতী ছিলেন। মহম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন বিদ্বান ও পরিশীলিত মানুষ, দর্শন, অঙ্কশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, কাব্য ও সাহিত্যে তিনি পারদর্শী ছিলেন। বারানি তাঁকে 'যুক্তিবাদী' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি হিন্দু যোগী ও জৈন সন্তদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন, ধর্ম বিশ্বাসের জন্য কাউকে আঘাত করার মধ্যে তিনি যুক্তি খুঁজে পাননি। বারানি নিজে উলেমা ছিলেন। তিনি জানাচ্ছেন যে মহম্মদ পয়গম্বর ও সুলতান হতে চেয়েছিলেন, এই অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই। আলাউদ্দিনের বিরুদ্ধেও তিনি এই ধরনের অভিযোগ তুলেছিলেন। মহম্মদ সুফি দরবেশদের শ্রদ্ধা করতেন, আজমীরে মৈনুদ্দিনের সমাধিতে তিনি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছিলেন। বহু সুফি সাধকের সমাধিতে তিনি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করে দেন, দিল্লিতে নিজামুদ্দিনের সমাধিটি তিনি নির্মাণ করেন। মহম্মদ উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, জৈন মন্দির পরিদর্শন করে তিনি নিষ্কর ভূমিদান করেন, হিন্দুদের হোলি উৎসবে তিনি যোগ দিতেন। রক্ষণশীলরা এজন্য তাঁকে পছন্দ করত না। বারানি বলেছেন যে তিনি ছিলেন উগ্র স্বভাবের, ধীরভাবে চিন্তা করে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না। তিনি শাসনব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে চেয়েছিলেন। বারানি ও ইবন বতুতা উভয়ে জানিয়েছেন যে তিনি শাস্তি ও পুরস্কারদানের ব্যাপারে ভারসাম্য রাখতে পারতেন না। নিম্নবর্গের মানুষকে তিনি উচ্চ গুরুত্বপূর্ণ পদে বসাতেন।

বারানি মহম্মদ বিন তুঘলকের পরিকল্পনাগুলির উল্লেখ করেছেন। এগুলিকে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ও কৃষি সংক্রান্ত এভাবে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণীতে ছিল রাজধানী স্থানান্তর, সাম্রাজ্য বিস্তার ও উদার শাসন নীতি এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিল মুদ্রা সংস্কার ও রাজস্ব বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল, এজন্য এগুলিকে সুস্পষ্টভাবে বিভক্ত করা যায় না। সুলতানের প্রথম বিতর্কিত পরিকল্পনা হলো রাজধানী স্থানান্তর—দিল্লি থেকে দেবগিরি (দৌলতাবাদ)। সুলতান দিল্লির নাগরিকদের সকলকে নতুন রাজধানীতে যাবার নির্দেশ

দেন। বলা হয়েছে যে দিল্লির অধিবাসীদের শাস্তিদানের জন্য সুলতান এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আসল কথা হল দৌলতাবাদ ছিল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, এইরকম কেন্দ্র থেকে সাম্রাজ্য শাসনের সুবিধা হয়। দিল্লি ছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের খুব নিকটে অবস্থিত, মোঙ্গলরা অতর্কিতে দিল্লির উপকণ্ঠে এসে হাজির হতো। দৌলতাবাদ রাজধানী হলে অতর্কিত মোঙ্গল আক্রমণের আশঙ্কা থেকে সাম্রাজ্য মুক্তি পাবে। দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারত ছিল বিদ্রোহপ্রবণ, এখানে মুসলিম উপনিবেশ স্থাপিত হলে এই অঞ্চল ভালোভাবে শাসন করা সম্ভব হবে। মুসলমান শাসন স্থায়িত্বলাভ করবে। কে. এ. নিজামী লিখেছেন যে মহম্মদ বিন তুঘলক দিল্লি ত্যাগ করেননি, দৌলতাবাদকে তাঁর দ্বিতীয় রাজধানী করেছিলেন। সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটলে দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপনের নজির ইতিহাসে পাওয়া যায়। রোমান সম্রাটরা দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন, ভারতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীতে দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। ইবন বতুতা ও বারানি সুলতানের রাজধানী স্থানান্তরের অতিরঞ্জিত বর্ণনা দিয়েছেন। এঁরা জানিয়েছেন যে সুলতান দিল্লির সব অধিবাসীকে সাতশ মাইল পথ পেরিয়ে দৌলতাবাদে যেতে বাধ্য করেছিলেন। এতে দিল্লির নাগরিকরা অবশ্যই কষ্টের মধ্যে পড়েছিল এবং অনেকের মৃত্যু হয়। শুধু প্রশাসনকে সরিয়ে নিলেই সুলতানের উদ্দেশ্য সাধিত হতো, লোকজন নিয়ে যাবার দরকার ছিল না। দক্ষিণের রাজ্য বরঙ্গল, দ্বারসমুদ্র ও মাবারে বিদ্রোহ হলে সুলতান আবার দিল্লিতে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নেন (১৩৩৫-৩৭)। এতে রাজকোষের অর্থের অপচয় ঘটে, জনগণের দুর্দশা বেড়েছিল। নিজামীর মতে, সুলতান জনগণের বিশ্বাস ও আনুগত্য হারিয়েছিলেন। এর ভালো দিক হলো বহু বিদ্বান ও সংস্কৃতিবান মুসলমান দক্ষিণ ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান বেড়েছিল।

সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী সাম্রাজ্যবাদী শাসক। বারানি জানিয়েছেন যে সুলতান খোরাসান ও ইরাক জয় করার জন্য একটি বিশাল সৈন্যবাহিনী গঠন করেন (৩,৭০,০০০)। মোঙ্গল নেতা তারমাশিরিন খান তাঁকে মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া জয় করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। ইরান ও ইরাকের রাজনীতির সঙ্গে পরিচিত কয়েকজন ব্যক্তি তাঁকে ঐ অঞ্চলে সামরিক অভিযান পাঠানোর পরামর্শ দেন। সুলতান সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য একবছর ধরে সৈন্যবাহিনী পোষণ করেন। পরে ঐ অঞ্চলের রাজনীতিতে পরিবর্তন ঘটতে দেখে সুলতান সাম্রাজ্য বিস্তার পরিকল্পনা ত্যাগ করেন, সৈন্যবাহিনী ভেঙে দেন। ১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দে সুলতান কারাচিল আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। হিমাচল প্রদেশের কুলু ও কাংড়া অঞ্চল হলো কারাচিল, এখানকার শাসক সুলতানের আধিপত্য মানত না। এই অঞ্চলে, ইবন বতুতার লেখা থেকে অনুমান করা হয়, চীনাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। সুলতান এই অঞ্চলে দশ

হাজার সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত শীতে, খাদ্যাভাবে ও পার্বত্য উপজাতিদের আক্রমণে সুলতানের বাহিনী সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। তবে কিছুকাল পরে এই অঞ্চলের শাসক সুলতানের সঙ্গে চুক্তি করে কর দিতে রাজি হন এবং বশ্যতা স্বীকার করেন। সুতরাং কারাচল অভিযান পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছিল বলা যায় না।

তুঘলক বংশের আধুনিক ঐতিহাসিক আগা মাহদি হুসেন মহম্মদ বিন তুঘলককে ঐ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানদীপ্ত শাসক বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি শুধু তুঘলক বংশের নন, চতুর্দশ শতকের একজন শ্রেষ্ঠ যুক্তিবাদী, উদারনৈতিক ও বুদ্ধিবিভাসিত মানুষ ছিলেন। সব ধর্মের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, ধর্মীয় গোঁড়ামি তাঁকে স্পর্শ করেনি, উলেমা ও মৌলভীরা তাঁকে প্রভাবিত করেনি। মাহদি হুসেন জানিয়েছেন যে ঐ সময় দেশে একধরনের ধর্মীয় বিপ্লব ঘটে যায়। বিভিন্ন মুসলমান সম্প্রদায়, হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনরা স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণের অধিকার পেয়েছিল। তাঁর ধর্মীয় সহনশীলতা প্রশাসনিক নীতিতে প্রতিফলিত হয়েছিল, অনেক হিন্দুকে তিনি উচ্চতর পদে বসিয়েছিলেন। ইবন বতুতা জানিয়েছেন যে রতন নামে এক হিন্দু তাঁর রাজস্ব মন্ত্রী ছিলেন। আকবরের মতো তিনি হিন্দুসমাজের কু-প্রথাগুলি দূর করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন। পূর্ববর্তী সুলতানরা শুধু উলেমাদের বিচার বিভাগে নিযুক্ত করতেন, মহম্মদ এই নীতির পরিবর্তন করে সাধারণ বিদ্বান ব্যক্তিকে বিচার বিভাগীয় পদে নিযুক্ত করেন। দেশ ও জনগণের মঙ্গলের জন্য তিনি তিনটি নতুন রাষ্ট্রীয় বিভাগ গঠন করেন। তিনটি নতুন বিভাগ হলো কৃষি, শিল্প ও জনকল্যাণ। বলাবাহুল্য, গোঁড়া রক্ষণশীলরা সুলতানের উদার, প্রগতিশীল শাসন নীতির কঠোর সমালোচনা করেন।

মহম্মদ বিন তুঘলক মুদ্রাব্যবস্থা সংস্কারের পরিকল্পনা করেছিলেন। ড. ঈশ্বরী প্রসাদ জানিয়েছেন যে সুলতানের টাঁকশাল থেকে সুন্দর মুদ্রা বের হতো। সুলতানের তিন ধরনের মুদ্রা ছিল—সোনার মোহর, রুপোর টাকা ও তামার জিতল। সাধারণত লেনদেনের কাজে রুপোর টাকা ও তামার জিতল ব্যবহার করা হতো। সুলতান রুপোর টাকা তুলে দিয়ে তামা ও পিতলের 'প্রতীক মুদ্রা' প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন। অধ্যাপক মহম্মদ হাবিব জানিয়েছেন যে তিনি ব্রোঞ্জের প্রতীক মুদ্রাও চালু করেছিলেন। প্রতীক মুদ্রার ধারণা একেবারে নতুন ছিল না, চীন ও পারস্যে এধরনের মুদ্রার চলন ছিল। বারানি মনে করেন যে রাজকোষে আয় বাড়ানোর জন্য সুলতান প্রতীক মুদ্রার প্রচলন করেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার অঙ্গ ছিল তাঁর প্রতীক মুদ্রাব্যবস্থা। বলা হয় সারা বিশ্বে রুপোর সরবরাহে সংকট চলেছিল, এই সংকটের মোকাবিলার জন্য সুলতান প্রতীক মুদ্রার পথ ধরেন। প্রতীক মুদ্রার সাফল্যের জন্য দুটি জিনিসের অবশ্য প্রয়োজন হয়—সরকারের স্থায়িত্ব এবং জাল মুদ্রার বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। সে যুগের মানুষ সরকারের স্থায়িত্বে বিশ্বাস করত না। বারানি জানাচ্ছেন যে সুলতান

প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে নকল মুদ্রা তৈরি বন্ধ করতে পারেননি। বারানির ভাষায় 'প্রত্যেক হিন্দুর গৃহ হলো একটি টাঁকশাল' (House of every Hindu became a mint.)। এত জাল মুদ্রাবাজারে এসেছিল যে বণিকরা প্রতীক মুদ্রা নিতে অস্বীকার করে, লেনদেন, আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুলতান প্রতীক মুদ্রা বাতিল করে আবার পুরনো মুদ্রা চালু করেন (১৩৩২-৩৩)।

বারানি, আফিফ ও ইবন বতুতা সুলতানের রাজস্ব বৃদ্ধি পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেছেন। সাম্রাজ্য বিস্তার, শাসন ও অন্যান্য পরিকল্পনার জন্য সুলতানের অর্থের প্রয়োজন ছিল। দোয়াব ছিল সুলতানির সবচেয়ে সমৃদ্ধ অঞ্চল। দুটি কারণে সুলতান এই অঞ্চলে রাজস্ব বৃদ্ধির কথা ভেবেছিলেন। এই অঞ্চল থেকে বাড়তি রাজস্ব সংগ্রহ করা যায় এবং বিদ্রোহপ্রবণ কৃষকরা শায়েস্তা হয়। এই পরিকল্পনা অযৌক্তিক ছিল না। এই পরিকল্পনার ত্রুটি হলো যে সময়ে কর ধার্য করা হয় তা একেবারে উপযুক্ত ছিল না। বারানি জানিয়েছেন যে ঐ অঞ্চলে তখন দুর্ভিক্ষ চলছিল, কৃষক সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। খরা চলেছিল, চাষ-আবাদ বন্ধ ছিল, জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পেয়েছিল। কৃষকেরা সুলতানের আদেশের বিরোধিতা করতে চায়নি, তাদের বাড়তি কর দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। এজন্য তারা কর দেওয়া বন্ধ করেছিল। সুলতান এই অবস্থায় ভারসাম্য বজায় রাখতে পারেননি, তিনি কঠোরভাবে রাজস্ব আদায়ের নির্দেশ দেন। বারানি জানাচ্ছেন যে সুলতান সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে কৃষকদের বন্য পশুর মতো হত্যা করেন। কৃষকরা দোয়াব ছেড়ে উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে পালিয়ে যায়, সমগ্র অঞ্চল জনশূন্য হয়ে যায়। সুলতান তাঁর ভুল বুঝতে পেরে কৃষকদের পুনর্বাসনের জন্য কয়েকটি জনকল্যাণকর ব্যবস্থা নেন। তাঁর সরকার কূপ খনন করে জলসেচের ব্যবস্থা করেছিল, তিনি কৃষকদের 'সোন্ধর' (কৃষিঋণ) দেন। তবে সুলতান যখন এসব ব্যবস্থা নেন তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে, সুলতানের জনকল্যাণকর ব্যবস্থার সুযোগ নিতে বেশি কৃষক বেঁচে ছিল না।

মূল্যায়ন

আলোচনার সুবিধার জন্য তাঁর শাসনকালকে তিনভাগে ভাগ করা যায়—১৩২৪-৩৫, ১৩৩৬-৪৫ এবং ১৩৪৫-৫১। প্রথম পর্বে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বিশাল সাম্রাজ্যের সংহতি সাধনের কাজে তিনি নিযুক্ত ছিলেন। এই পর্বে কর্ণাটকে কাম্পিল তিনি শুধু জয় করেছিলেন, মুলতান ও লক্ষ্মণাবতীর বিদ্রোহ তিনি দমন করেন। সিন্ধুর বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হয়। রাজধানী স্থানান্তর, খোরাসান ও কারাচিল অভিযান ও মুদ্রা সংস্কারের পরও সুলতানের মর্যাদা অটুট ছিল। তিনি ছিলেন চীন, ইরাক ও উজবেগ শাসকদের সমকক্ষ। দ্বিতীয় পর্বে দোয়াবে দুর্ভিক্ষ হয়, মাবার, বরঙ্গল ও দ্বারসমুদ্র

বিদ্রোহ করে, বাংলা বিদ্রোহ করে স্বাধীন হয়ে যায়। অর্থ ও জনসম্পদের অভাবে দূরবর্তী অঞ্চলে দিল্লির শাসন বজায় রাখার তিনি চেষ্টা করেননি। শেষপর্বে উত্তর ও দক্ষিণে অশান্তি দেখা দিয়েছিল, অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেড়েছিল, ভূমিতে ইজারাদারদের শোষণ বেড়েছিল। অযোধ্যার সদা আমীর (মোঙ্গল ও আফগান) আইন-উল-মুলক বিদ্রোহী হন। দেশী ও বিদেশী আমীরদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেড়েছিল। মহম্মদ শেষ পর্বে বিদেশী ইরানী, তুর্কি ও খোরাসানী আমীরদের প্রাধান্য দেন (আইজজা), ধর্ম ও জাতির ভিত্তিতে তিনি অভিজাততন্ত্র গঠন করেননি। তাঁর অভিজাততন্ত্রে স্থান পেয়েছিল নিম্নবর্গের মানুষ—কারিগর, মালি, নাপিত, রাঁধুনি, তাঁতি, মদ প্রস্তুতকারক ও সঙ্গীতশিল্পীরা। এদের উচ্চপদে বসালে সম্ভ্রান্ত বংশীয় আমীররা ক্ষুব্ধ হন। এরা সৈনিক ছিল না, এজন্য বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হতো। মহম্মদ বিন তুঘলক সুফিদের প্রাধান্য দেন, সুফিরা তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেনি, এজন্য কয়েকজনকে তিনি মৃত্যুদণ্ড দেন। উলেমারা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে আইনসম্মত বলে ফতোয়া দেন। মহম্মদ কায়রোর আব্বাসীয় খলিফার অনুমোদন আনেন (মনসুর), মুদ্রায় খলিফার নাম উৎকীর্ণ করেন। কিন্তু গোঁড়া উলেমারা তাঁর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটায়নি।

শেষপর্বে তাঁর ইজারাদারি ব্যবস্থার জন্য (মুকাতা) কারা, বিদর, মালব ও গুজরাটে অশান্তি দেখা দেয়, অভিজাতরা বিদ্রোহ করেছিল। তা সত্ত্বেও সুলতানের মর্যাদা অটুট ছিল; চীন, মিশর, খোরাসান, ইরাক, ট্রান্স-অক্সিয়ানা ও আফ্রিকার দেশগুলি থেকে রাষ্ট্রদূতরা তাঁর রাজসভায় এসেছিল। সুলতান গুজরাটের বিদ্রোহ দমন করেন, সিন্ধুতে তাঘির বিদ্রোহ দমন কালে তাঁর মৃত্যু হয় (১৩৫১)। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর মনোনীত উত্তরাধিকারী সিংহাসন লাভ করেন, শাসনব্যবস্থা সচল ছিল। বিশাল সাম্রাজ্যে কেন্দ্রীভূত স্বৈরাচার বজায় রাখতে গিয়ে তিনি বিপদ ডেকে আনেন। কৃষি বিভাগ গঠন করলেও তিনি কৃষির উন্নতির পরিকল্পনা নেননি। তিনি একটি মিশ্র শাসকগোষ্ঠী তৈরি করেন, এতে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলে স্থান পেয়েছিল (a composite ruling class consisting of Hindus and Muslims.)। শুধু অভিজাত নয়, সাধারণ মানুষকে তিনি শাসকগোষ্ঠীতে স্থান দিয়েছিলেন। তিনি হলেন মধ্যযুগের ভারত ইতিহাসের এক অনন্য চরিত্র (unique character)। এই বিদ্বান সুলতান ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন নিষ্কলুষ, তাঁর ছিল অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধি। ইবন বতুতা তাঁকে 'রক্তপিপাসু' বলেছেন, ইংরেজ লেখক লেনপুল তাকে অস্বাভাবিক বলেছেন। মাহদি হুসেন মনে করেন সে যুগের দুই প্রভাবশালী সামাজিক গোষ্ঠী উলেমা ও অভিজাত তাঁর প্রতি বিরক্ত হন। নিজামী মনে করেন যে সমকালীন বারানি তাঁর প্রতি অবিচার করেছেন। সুলতানের গোঁড়ামিমুক্ত উদার শাসন তাঁকে উলেমা ও অভিজাতদের

বিরাগভাজন করেছিল, উলেমা শ্রেণীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। এজন্য তিনি সুলতানকে 'পরস্পরবিরোধী গুণাবলীর মিশ্রণ' বলে উল্লেখ করেছেন (It was not the Sultan who was a mass of inconsistencies or a mixer of opposites, but that the historian himself was a miserably torn personality.)। সুলতান অনেক গুণে ভূষিত হলেও তাঁর অভাব ছিল সাধারণ জ্ঞানের, পরিমিতি বোধের। জনগণের মানসিক অবস্থা বোঝার মতো ধৈর্য তাঁর ছিল না। সেই যুগের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি, ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ ও প্লেগের মড়ক, প্রকৃতির অভিশাপ ও ব্যক্তিগত ত্রুটি সুলতানের ব্যর্থতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল।

প্রজাকল্যাণকামী রাষ্ট্র ঃ সুলতানি রাজ্যে ভাঙন

ফিরুজ তুঘলক

সুলতান ফিরুজ তুঘলকের দীর্ঘ রাজত্বকাল (১৩৫১-১৩৮৮) সুলতানি ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। জালালুদ্দিন খল্‌জি প্রজাকল্যাণকামী রাষ্ট্রের যে আদর্শ তুলে ধরেন ফিরুজ তুঘলক তাই অনুসরণ করেন। ফিরুজ জনগণকে সন্তুষ্ট করে চলার নীতি অনুসরণ করেন (a policy of conciliation)। অভিজাত, শাসক, সৈনিক, যাজক, কৃষক সকলে মহম্মদ বিন তুঘলকের আচরণে অসন্তুষ্ট ছিল। ফিরুজ এদের আনুগত্য ফিরে পাবার চেষ্টা করেন। কয়েকটি সামরিক অভিযান পরিচালনা করে ফিরুজ সাফল্যলাভ করেননি, এরপর তিনি যুদ্ধ পরিহার করে প্রজাকল্যাণ ও উন্নতির ওপর জোর দেন। দুর্ভাগ্যজনক হলো ফিরুজের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সংকীর্ণ। ধর্মের সংকীর্ণ ব্যাখ্যার ওপর নির্ভর করে তিনি অন্যান্য সম্প্রদায় সম্পর্কে অসহনশীল নীতি অনুসরণ করেন। তাঁর প্রজাকল্যাণকামী রাষ্ট্রাদর্শ এতে অবশ্যই ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। ফিরুজ কতকগুলি প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়েছিলেন যেগুলি তাৎক্ষণিক সাফল্য এনেছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে এতে রাষ্ট্রের ক্ষতি হয়। তাঁর আত্মজীবনী *ফুতুহাত-ই-ফিরুজশাহী*-তে প্রজাকল্যাণকামী রাষ্ট্রাদর্শের কথা আছে। তিনি ঘোষণা করেন যে রাজ্য জয় নয়, সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ নয়, তাঁর রাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য হলো জনগণকে সুখী ও সন্তুষ্ট রাখা। রক্তপাত বন্ধ করে তিনি শাসক ও শাসিতের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। মৃত্যুদণ্ড, অঙ্গচ্ছেদ, দৈহিক প্রহার, নির্যাতন ইত্যাদি তিনি বন্ধ করে দেন। মহম্মদ বিন তুঘলকের সময় যাঁরা এধরনের চরম শাস্তি পেয়েছিলেন তাঁদের তিনি ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা করেন। মহম্মদ বিন তুঘলক প্রদত্ত সব রাষ্ট্র ঋণ তিনি মাফ করে দেন। কোরান ও শরিয়তের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন। ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যাকার ছিলেন উলেমারা, দিল্লি সুলতানির শুরু থেকে এর ওপর ইসলামী প্রভাব পড়েছিল। ফিরুজ তুঘলক হলেন প্রথম মুসলিম শাসক যিনি কোরান ও শরিয়তের নির্দেশ অনুযায়ী শাসন করেন।

ভীতি ও ত্রাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত শাসনের তিনি বিরোধী ছিলেন। অর্থনৈতিক উন্নতি ও জনগণের সহযোগিতা হবে রাষ্ট্রনীতি। বিরোধীদের তিনি কখনো কঠোর শাস্তি দেননি। পূর্ববর্তী সরকার ধর্মজ্ঞ বিদ্বান ও দরিদ্রদের যে নিষ্কর ভূমি অধিগ্রহণ করেছিল ফিরুজ সেগুলি ফিরিয়ে দেন। ফিরুজ এধরনের নিষ্কর ভূমির পরিমাণ বাড়িয়েছিলেন (ইনাম, ইদরার)। বারানি জানাচ্ছেন যে এসব ব্যবস্থার ফলে শাসন স্থিতিশীল হয়, ধনী-দরিদ্র সকলে সন্তুষ্ট হয়েছিল, হিন্দু-মুসলিম সকলে নিজ নিজ কাজে মন দিয়েছিল (the administration became stable, all the tasks of government became firm, and all men, high and low, were satisfied, and the subjects, Muslims and Hindus, made content, and every one busied himself in his own pursuits.)। সমকালীন সব লেখক জানিয়েছেন যে ফিরুজ শাহের চল্লিশ বছরের রাজত্বকালে সব পণ্য সস্তা ছিল। ফিরুজের জীবনীকার শামস-ই-সিরাজ আফিফ লিখেছেন যে আলাউদ্দিন কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রেখেছিলেন, ফিরুজের কোনো চেষ্টা ছাড়াই দেশে সব দ্রব্য সস্তা ছিল। এই স্বাচ্ছন্দ্যের ভাগ পেয়েছিল সকলে, বণিক, কারিগর সকলে উৎপাদন ও মজুরি বৃদ্ধির ফলে লাভবান হয়েছিল। আফিফ সামগ্রিকভাবে দেশের সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেছেন। কৃষকদের কথা উল্লেখ করে আফিফ জানিয়েছেন যে ফিরুজ শরিয়ত অনুযায়ী কর ধার্য করেন, সব বেআইনি কর তুলে দেন, নতুন করে রাজস্ব (জমা) ধার্য করেন। রাজস্ব ধার্যের নীতি ছিল উৎপন্ন ফসল, জরিপ নয়, দেশে কখনো দুর্ভিক্ষ হয়নি।

উলস্‌লি হেগ ফিরুজ তুঘলককে তার গঠনমূলক কাজের জন্য রোমান সম্রাট অগাস্টাসের সঙ্গে তুলনা করেছেন। দিল্লিতে তিনি অনেকগুলি শহর নির্মাণ করেন। ফতেহাবাদ, হিসার, ফিরোজপুর, জৌনপুর ও ফিরুজাবাদ তিনি নির্মাণ করেন। দিল্লির মসজিদ, মাদ্রাসা, মিনার, প্রাসাদ, সমাধিস্তম্ভগুলি তিনি সংস্কার করেন। ফিরিস্তা জানাচ্ছেন যে শুধু শহর নয়, দিল্লির আশেপাশে তিনি বারোশো উদ্যান বসিয়েছিলেন। তিনি অনেকগুলি সুফি খান্‌কা নির্মাণ করে দেন, এদের জন্য নিষ্কর ভূমিদান করেন। গঠনমূলক কাজগুলি ছিল তাঁর প্রতিভার আসল ক্ষেত্র। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বিধবা, অনাথ ও দুঃস্থদের জন্য তিনি রাষ্ট্রীয় অনুদানের ব্যবস্থা করেন। কৃষিকাজের উন্নতির জন্য তিনি পাঁচটি খাল খনন করেন। পথিক ও কৃষকদের জন্য তিনি আরও একশ পঞ্চাশটি কূপ খনন করেন। তিনি হলেন দিল্লি সুলতানির প্রথম শাসক যিনি জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য বিভিন্ন সরকারি বিভাগ গঠন করেন। বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য তিনি কর্মনিযুক্তি কেন্দ্র স্থাপন করেন (Unemployment bureau)। 'দেওয়ানি খয়রাত' বিভাগ গরীব, অনাথ, দুঃস্থ ও বিধবাদের সরকারি সাহায্য দিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব

জনকল্যাণমূলক কাজের সুবিধা পেত শুধু মুসলমানরা। তাঁর 'দারুলসাফা' দরিদ্র মানুষদের বিনাব্যয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিল।

ফিরুজ শাহ সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করেন। দুটি অশোকস্তম্ভ দিল্লিতে এনে তিনি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। নগরকোট আক্রমণকালে তিনি জ্বালামুখী মন্দির থেকে তিনশো সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করেন, এর মধ্যে কয়েকখানি ফার্সিতে অনূদিত হয়। শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি তিনটি কলেজ ও তিরিশটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। শিক্ষক ও ছাত্রদের স্টাইপেন্ডের পরিমাণ বাড়িয়ে দেন, শিক্ষাখাতে তিনি বার্ষিক ছত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করতেন। ক্রীতদাসদের জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য তিনি তাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। ক্রীতদাসদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্রীয় বিভাগ গঠন করা হয়। মধ্যযুগে যুদ্ধ, রক্তপাত, সাম্রাজ্য বিস্তার ছিল রাজাদের কাজ। সেই পরিবেশে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রনীতির সূচনা করে তিনি অবশ্যই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

১৩৫১ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণের রাজ্যগুলি বিদ্রোহ করেছিল, গুজরাট, সিন্ধু ও বাংলা বিদ্রোহ করে স্বাধীন হয়ে যায়। ফিরুজ বড় যোদ্ধা ছিলেন না। তিনি মোট সাতবার সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছিলেন, দুবার বাংলার বিরুদ্ধে, দুবার সিন্ধু দেশে, এবং একবার করে জাজনগর, নগরকোট ও রোহিলখণ্ডে তিনি সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করেন। বাংলা ও দাক্ষিণাত্য তিনি পুনরায় জয় করতে পারেননি, এই প্রদেশগুলি স্বাধীন হয়ে যায়। বাংলায় ইলিয়াস শাহ ও তাঁর পুত্র সিকান্দার শাহ তাঁর আক্রমণ প্রতিহত করেন। ফিরুজ ওড়িশা আক্রমণ করে রাজার কাছ থেকে কর ও উপঢৌকন হিসেবে হাতি আদায় করেন। কাংড়া উপত্যকার নগরকোট রাজ্যটি ফিরুজ আক্রমণ করে বশ্যতা আদায় করেন। তিনি দুবার সিন্ধুর থাট্টায় অভিযান চালিয়ে স্থানীয় শাসকদের কর ও আনুগত্য দানে বাধ্য করেন। থাট্টা অভিযানের পর (১৩৬৫-৬৭) ফিরুজ আর সামরিক অভিযান পরিচালনা করেননি, সাম্রাজ্যের সংহতি ও উন্নতিসাধন ছিল তাঁর নীতি। তিনি শাসনের কাজে মন দেন, রাষ্ট্রের মধ্যে বিভেদ দূর করে সংহতি স্থাপনের জন্য তিনি অভিজাত শ্রেণীর সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন। তিনি মহম্মদের অভিজাতদের উচ্চপদে বসান। মহম্মদের অভিজাত খান-ই-জাহান মকবুল উজির পদ পান, তিনি সুলতানের হয়ে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করতেন। তাতার খাঁ, আইন-ই-মাহরুক, ইমাদউল মুল্ক সকলে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। বিদেশী অভিজাতদের প্রতি তাঁর কোনো দুর্বলতা ছিল না। নিম্নবর্গের মানুষদের তিনি অভিজাত শ্রেণীতে গ্রহণ করেননি (mean and ignoble)। ফিরুজ অভিজাতদের উচ্চ বেতন দেন, তাঁর খান ও মালিকদের বার্ষিক বেতন ছিল চার থেকে আট লক্ষ টাকা, তাঁর উজির পেতেন তেরো লক্ষ টাকা ও ভাতা। ইক্তা থেকে তারা রাজস্ব পেতেন। ফিরুজ তাঁর রাজত্বের শুরুতে রাজস্ব

ধার্য করেছিলেন, পরে আর কখনো তা বাড়ানো হয়নি। কৃষিকাজ বাড়লে অভিজাতরা লাভবান হন। ফিরুজ বংশানুক্রমিক অভিজাততন্ত্রের পত্তন করেন।[১] এই নীতির ফলে কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হয়ে যায়, অভিজাতরা শক্তিশালী হয়।

ফিরুজের শাসনব্যবস্থায় অভিজাতদের পরে ছিল সৈন্যবাহিনীর স্থান। সামরিক কাজে পটু এবং রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতায় আগ্রহী ব্যক্তিদের তিনি সৈন্যবাহিনীতে গ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় বাহিনীর সৈনিকদের তিনি নগদ বেতন দেননি, দিল্লি ও দোয়াবে তাদের ওয়াঝ দেওয়া হয়। কেন্দ্রের সৈন্যদের ৮০ শতাংশ ওয়াঝ পেয়েছিল। বাকি ২০ শতাংশ নগদ বেতন বা অভিজাতদের ইক্‌তা থেকে বেতন পেত (ঘাইর ওজাহি)। সৈন্যদের ক্ষেত্রেও তিনি বংশানুক্রমিক নীতি প্রবর্তন করেন, একজন সৈন্য মারা গেলে তার পুত্র ওয়াঝ পেত (গ্রামের রাজস্ব)। কোনো পুরুষ সেই পরিবারে না থাকলে মহিলারা ওয়াঝ পেত। ফিরুজের এই ব্যবস্থায় অবশ্যই ত্রুটি ছিল। বংশানুক্রমিক নীতির চেয়ে ক্ষতিকর হয়েছিল দাগ ও হুলিয়া প্রথা তুলে দেবার সিদ্ধান্ত। সৈন্যবাহিনীতে দুর্নীতি প্রবেশ করেছিল, ফিরুজ নিজেও তা জানতেন। সৈন্যবাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য তিনি ক্রীতদাস সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেন। এর একাংশ তাঁর সৈনিকের কাজ করত। এদের সঙ্গে অভিজাত ও সৈন্যবাহিনীর বিরোধ বেধেছিল। উজির খান-ই-জাহান মকবুল ও তাঁর পুত্র জৌনা শাহ্ শাসনব্যবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেন, পিতা ও পুত্র ছিল ক্ষমতার কেন্দ্র।

ফিরুজের রাজস্ব মন্ত্রী ছিলেন খাজা হিসামুদ্দিন জুনাইদ। দেশের জমি পরিদর্শন করে অনুমানের ওপর ভিত্তি করে তিনি মোট রাজস্ব ধার্য করেন ছয় কোটি পঁচাত্তর লক্ষ টাকা, এই জমার আর পরিবর্তন হয়নি। উৎপন্ন ফসল কৃষক ও রাষ্ট্রের মধ্যে ভাগ হতো। ফিরুজ অনেকগুলি খাল খনন করেন, তাতে কৃষির উৎপাদন বেড়েছিল, রাষ্ট্র ২০-৩০ শতাংশ রাজস্ব হিসেবে নিত। আফিফ লিখেছেন যে শতদ্রু থেকে আলিগড় (কয়েল) পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলে কৃষিকাজ বেড়েছিল, শস্য চাষের ধরনেও পরিবর্তন ঘটে। শুধু অভিজাতরা নন, কৃষক, কারিগর ও বণিকরা লাভবান হয়। সেচ সেবিত অঞ্চলে তিনি ১০ শতাংশ বাড়তি জলকর বসিয়েছিলেন, তবে শরিয়ত অনুমোদিত নয় এমন একুশটি কর তিনি তুলে দেন। কোরান অনুমোদিত খারাজ, খোম, জিজিয়া ও জাকাত তিনি স্থাপন করেন। কৃষিকাজের উন্নতি হলে নতুন শহর স্থাপিত হয়, শহরগুলি ছিল শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র। ফিরুজের ক্রীতদাস কারিগররা শহরের কারখানায় কাজ পেয়েছিল। তাঁর কৃষি ও নগর উন্নয়নের ধারণা ছিল আধুনিক। তিনি জনহিতকর

১. 'When a person holding an office died, I transferred his office and his dignities to his son, and the status, perquisites and dignities of the office were not reduced in any way.'

কাজগুলি করার জন্য একটি পৃথক বিভাগ গঠন করেন। পথিকদের জন্য তিনি অনেকগুলি বিশ্রামাগার নির্মাণ করে দেন। ফিরুজ সঙ্গীত ভালোবাসতেন। সবেবরাত উৎসবের সময় তিনি নানা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতেন। শেষজীবনে তিনি খানিকটা ধর্মান্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি সুফি দরবেশ ফরিদউদ্দিনের শিষ্য ছিলেন, জঙ্গী দরবেশ সালার মাসুদের প্রভাব পড়েছিল তাঁর ওপর। এরপর থেকে কঠোরভাবে তিনি ইসলামী আচার-আচরণ অনুসরণ করেন। ব্রাহ্মণদের ওপর জিজিয়া কর ধার্য করেন, হিন্দুদের মন্দির ভেঙে দেন। ইসমাইলি সম্প্রদায়ের প্রতি তিনি সমানভাবে বিরূপ ছিলেন, সুফিদেরও তিনি ক্ষমা করেননি। ধর্মীয় জীবনে যে পুরোপুরি অসহনশীলতা ছিল তা বলা যায় না, অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ হয়, হিন্দু প্রধানদের সঙ্গে ফিরুজের সম্পর্ক ভালো ছিল। উলেমাদের প্রভাবে তিনি অসহনশীল হয়ে ওঠেন, তাঁর জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রনীতি ক্ষুণ্ণ হয়। হিন্দু ও মুসলমানের যৌথ অভিজাততন্ত্র গঠনের প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়, লোদিরা এই নীতি অনেকটা ফিরিয়ে আনেন। স্যার হেনরি ইলিয়ট ফিরুজ তুঘলককে 'সুলতানি যুগের আকবর' বলে উল্লেখ করেছেন। এই দুই রাষ্ট্রনেতার নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গিতে মৌল পার্থক্য ছিল। উভয়ে জনকল্যাণকামী ছিলেন, এর বেশি মিল নেই। আকবর ছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা, ফিরুজ সাম্রাজ্যের অনেকখানি হারিয়েছিলেন। আকবর অনেক বেশি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শাসক ছিলেন, শাসনব্যবস্থার পুনর্গঠনে আকবরের মৌলিক অবদান ছিল। ফিরুজ পুরনো ব্যবস্থার মধ্যে অল্প কিছু পরিবর্তন এনেছিলেন। ফিরুজ স্বধর্মীদের স্বার্থে দেশ শাসন করেন, উলেমাদের দ্বারা প্রভাবিত হন। আকবরের উদার সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। আকবর জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা, ফিরুজ তুঘলকের শাসনের ফলে সুলতানি শাসন দুর্বল হয়ে ভাঙনের পথে চলেছিল।

সুলতানি রাজ্যে ভাঙন

ফিরুজ তুঘলকের শাসন শেষ হবার আগেই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল। রাজপুত্র এবং সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মহম্মদের সঙ্গে উজির দ্বিতীয় খান-ই-জাহানের বিরোধ বেধেছিল। মহম্মদ ফিরুজের সমর্থন নিয়ে উজিরকে ক্ষমতাচ্যুত করেন, রাজপুত্র কার্যত পিতার সহ-শাসক হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। ফিরুজের ক্রীতদাসরা (প্রায় এক লক্ষ) এই রাজনৈতিক পরিবর্তন পছন্দ করেনি। মহম্মদের সঙ্গে ক্রীতদাসদের বিরোধ শুরু হলে ফিরুজ ক্রীতদাসদের পক্ষ নেন, রাজপুত্র মহম্মদ ক্ষমতাচ্যুত হন। ১৩৮৮ খ্রিস্টাব্দে ফিরুজের মৃত্যুর পর রাজপুত্রদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে লড়াই শুরু হয়ে যায়। ক্রীতদাসরা নিজেদের পছন্দমতো ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসানোর প্রয়াস চালিয়ে ব্যর্থ হয়, এরা পরাস্ত হয়ে বিতাড়িত হয়। একের পর এক

রাজপুত্র সিংহাসন অধিকার করেন এবং অল্পকাল পরে সরে যেতে বাধ্য হন। ১৩৯৪ খ্রিস্টাব্দে তুঘলক বংশের *শেষ শাসক নাসিরুদ্দিন মাহমুদ* সিংহাসন দখল করেন, তিনি ১৪১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেছিলেন। ইতিমধ্যে প্রাদেশিক গভর্নররা কেন্দ্রের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে একে একে স্বাধীন হয়ে যায়, গুজরাট, পাঞ্জাব, মালব ও খান্দেশে এই ঘটনা ঘটে। নাসিরুদ্দিন মাহমুদের উজির কনৌজ থেকে বিহার পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল শাসনের ভার পান। এভাবে জৌনপুর রাজ্যের জন্ম হয়। বিভিন্ন প্রান্তে হিন্দু প্রধানরা রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করেছিল, দিল্লি সুলতানির আয়তন ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। সমকালীন পরিস্থিতির প্রতিফলন ঘটেছিল প্রচলিত প্রবাদে 'সুলতানের শাসন চলে দিল্লি থেকে পালাম পর্যন্ত'।

দিল্লি সুলতানির পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল তৈমুরের আক্রমণ (১৩৯৮-৯৯)। তৈমুর দিল্লি ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ লুণ্ঠন করেন। ১৩৯৬-৯৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে তৈমুরের পৌত্র উছ, দিপালপুর ও মুলতানের ওপর আক্রমণ চালিয়েছিলেন। দিল্লির শাসকরা উত্তর-পশ্চিমে বিদেশী অনুপ্রবেশ নিয়ে মাথা ঘামাননি, প্রতিরোধমূলক কোনো ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়নি। দিল্লিতে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন চালিয়ে তৈমুর বহু বন্দী সহ দেশে ফিরে যান, ভারত থেকে নিয়ে যান বহু কারিগর ও মিস্ত্রী। লাহোর, দিপালপুর ও মুলতান তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এরই ভিত্তিতে বাবর দিল্লির ওপর তাঁর দাবি রেখেছিলেন। তৈমুরের ভারত আক্রমণের অন্য কোনো তাৎপর্য লক্ষ করা যায় না। তৈমুরের আক্রমণের পর দিল্লি সুলতানি দ্রুত গতিতে ভেঙে পড়তে থাকে। কোনো ব্যক্তিকে এই পতনের জন্য দায়ী করা ঠিক নয়। মধ্যযুগের ভারতে বিচ্ছেদকামী শক্তিগুলি প্রবল ছিল। অনেক স্থানীয় প্রধানের সঙ্গে ছিল তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের লোকজন অথবা স্থানীয় সমর্থন। কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হলে এরা রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করে দিত। দিল্লি সুলতানি দুভাবে এদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিল— ব্যক্তিগত ক্রীতদাস বাহিনী গঠন করে এবং সুলতানের ওপর নির্ভরশীল শাসকগোষ্ঠী স্থাপন করে। এই ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল ইক্‌তা। কিন্তু সমস্যা হলো সুলতান শক্তিশালী উচ্চাকাঙ্ক্ষী অভিজাতদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন না। এরা নিজেদের অধীনস্থ অঞ্চলে স্বাধীন ক্ষমতাকেন্দ্র গড়ে তুলেছিল। দূরবর্তী প্রদেশগুলির (বাংলা, সিন্ধু, গুজরাট, দৌলতাবাদ) গভর্নরদের নিয়ন্ত্রণ করা সহজ ছিল না। সুলতানরা এদের নিয়ন্ত্রণের জন্য জাতিগত ভিত্তিতে শাসকগোষ্ঠী গঠন করেন, মিশ্রগোষ্ঠী গঠন করা হয় এবং গুপ্তচরদের মারফত এদের কাজকর্মের ওপর নজর রাখা হয়। এসব সত্ত্বেও শাসকগোষ্ঠীকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়নি। ফিরুজ তুঘলক বংশানুক্রমিক অভিজাততন্ত্র গঠন করে এই সমস্যার সমাধানের প্রয়াস চালিয়েছিলেন, কিন্তু তিনিও ব্যর্থ হন।

এই পরিস্থিতিতে ধর্ম রাষ্ট্রের সহায়ক হয়নি। দিল্লি সুলতানিতে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ছিল মুসলমানদের মধ্যে, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে নয়। হিন্দু কৃষক ও প্রধানদের সম্পদ লুঠ করার জন্য অনেক সময় ধর্মের জিগির তোলা হতো। সৈন্যবাহিনীর নিয়োগ নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছিল, মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ায় মোঙ্গল আক্রমণ শুরু হলে সুলতানরা এই অঞ্চল থেকে সৈন্য সংগ্রহ করতে পারতেন না। সুলতানরা আফগান, তুর্কি বংশজাত, মোঙ্গল ও ধর্মান্তরিত মুসলমান ও হিন্দুদের সৈন্যবাহিনীতে স্থান দিয়েছিল। এইসব জাতিগোষ্ঠীর সৈন্যদের পৃথক সমস্যা ছিল। ফিরুজ তুর্কি ও মোঙ্গলদের সৈন্যবাহিনীতে গ্রহণ করে বংশানুক্রমিক সৈন্যবাহিনী গঠনের প্রয়াস চালিয়েছিলেন। তাঁর ক্রীতদাস বাহিনীতে ধর্মান্তরিত ভারতীয়রা ছিল, তাঁর এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা সফল হয়নি। বংশানুক্রমিক সৈনিক ছিল অদক্ষ, ক্রীতদাস বাহিনী ছিল স্বার্থপর ও আনুগত্যহীন। এরা পরস্পরের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত ছিল। সুলতানদের একটি বড় সমস্যা ছিল উত্তরাধিকার। অভিজাতরা সুলতানের মনোনীত ব্যক্তিকে মেনে নিতে চাইলেও সিংহাসন নিয়ে বিরোধ হতো। জ্যেষ্ঠ পুত্রের উত্তরাধিকার নীতি কার্যকর হত না। সুলতানের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র ও পৌত্ররা সিংহাসন দখলের লড়াইয়ে নামত, অভিজাতরা এর সুযোগ নিত। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তারা বিবদমান রাজপুত্রদের পক্ষ নিত, বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব রাজবংশের পতন ঘটাত।

তৈমুরের ভারত আক্রমণ ও তার তাৎপর্য

মধ্য এশিয়ার সমরকন্দের শাসক তৈমুর ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে ভারত আক্রমণ করেন। তিনি ছিলেন একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী, সাম্রাজ্যবাদী শাসক। তাঁর সাম্রাজ্যের মধ্যে ছিল তুর্কিস্তান, আফগানিস্তান, পারস্য, সিরিয়া, কুর্দিস্তান এবং এশিয়া মাইনরের একটি বড় অংশ। জীবনের শেষ দিকে তিনি ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। তাঁর আত্মজীবনীতে (মালফুজত-ই-তৈমুরি) তিনি ভারত আক্রমণের দুটি কারণের কথা উল্লেখ করেছেন। বিধর্মীদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করে 'গাজি' হওয়া এবং বিধর্মীদের সম্পদ লুঠ করে শক্তি বৃদ্ধি করা। ধর্মীয় ও পার্থিব এই দুই কারণে তিনি ভারত আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন।[২] তৈমুরের মধ্যে চিঙ্গিজ খানের নিষ্ঠুরতা এবং মাহমুদের উন্মত্ত আবেগের মিলন ঘটেছিল। তৈমুরের পৌত্র পীর মহম্মদ ছিলেন কাবুল, কান্দাহার ও গজনির শাসক। তৈমুরের আগেই তিনি ভারতে অভিযান

২. তৈমুর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'My great object in invading Hindustan had been to wage a religious war against the infidel Hindus'. তিনি আরও লিখেছেন 'the army of Islam might gain something by plundering the wealth and valuables of the infidels'.

পাঠিয়েছিলেন, সিন্ধু অতিক্রম করে তাঁর সৈন্যবাহিনী উচ ও মুলতান অধিকার করেছিল। তৈমুরের ভারত প্রবেশে কোনো বাধা ছিল না। তুঘলক বংশের শেষ দিকে সুলতান ছিলেন মাহমুদ তুঘলক, তিনি ছিলেন দুর্বল, অপদার্থ। তাঁর হয়ে শাসন করতেন মাল্লু নামে তাঁর এক মন্ত্রী। আগেই বাংলা, বাহমনি ও বিজয়নগর স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিল। তুঘলকদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে গুজরাট, মালব ও জৌনপুর স্বাধীন হয়ে যায়। তৈমুরের প্রতিনিধি খিজর খান লাহোর, দিপালপুর ও মুলতান অধিকার করেছিলেন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়, এগুলি স্বাধীন হয়ে চলতে থাকে। সামানা, বায়ানা, কল্পি ও মাহোবা কেন্দ্রীয় সরকারকে মানত না, ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য নষ্ট হয়েছিল।

এই পটভূমিতে ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ-এপ্রিল মাসে তৈমুর ভারতে প্রবেশ করেন। কাবুলে মুসলমানরা তাঁর কাছে কাটোর ও সিয়াপোশের (কাশ্মীর ও কাবুলের মধ্যবর্তী অঞ্চল) হিন্দুদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল। তৈমুর নিজেকে ইসলামের রক্ষাকর্তা হিসেবে গণ্য করতেন। তিনি কাটোর (Kator) ও সিয়াপোশের (Siyahposh) বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। কাটোরের বিধর্মীদের পরাস্ত করে তিনি তাদের শহর পুড়িয়ে দেন। পুরুষদের হত্যা করা হয়, শিশু ও নারীদের বন্দী করা হয়, সম্পদ লুণ্ঠিত হয় (to kill all the men, to make prisoners the women and children and to plunder and lay waste all their property.)। ভারত আক্রমণে তিনি এই ধাঁচটি অনুসরণ করেছিলেন। মৃতদের কঙ্কালের ওপর তিনি স্তম্ভ নির্মাণ করেন, পর্বতগাত্রে তাঁর বিজয়কাহিনী খোদিত করে দেন। পথে আফগান উপজাতিদের বিদ্রোহ তিনি দমন করে ভারতের দিকে অগ্রসর হন। ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে তিনি সিন্ধু অতিক্রম করেন। ঝিলাম নদী বরাবর অগ্রসর হয়ে তিনি ভাতনির দুর্গ আক্রমণ করে ধ্বংস করে দেন। সারসুতি অধিকার করেন, সর্বত্র একই ধরনের হত্যালীলা চলেছিল। তৈমুর ভাতনির দুর্গের পতন সম্পর্কে লিখছেন, 'ইসলামের তরবারি বিধর্মীদের রক্তে ধোয়া হলো। দুর্গের সব সম্পত্তি ও খাদ্যশস্য আমার সৈন্যরা অধিকার করে নিল। বাড়িগুলিতে আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, সমস্ত অট্টালিকা ও দুর্গ মাটির সঙ্গে মিশে যায়'।

পথে জাঠদের পরাস্ত করে পানিপথ হয়ে তিনি দিল্লিতে প্রবেশ করেন। দিল্লির উপকণ্ঠে তাঁবু ফেলে তিনি তাঁর ঘোড়সওয়ারদের দিল্লি লুণ্ঠনের জন্য পাঠিয়েছিলেন। তুঘলক সুলতান মাহমুদ তাঁর মন্ত্রী মাল্লুকে সঙ্গে নিয়ে তৈমুরকে বাধা দিয়ে পরাস্ত হন, তিনি পালিয়ে যান। তৈমুরের সঙ্গে এক লক্ষ বন্দী ছিল, বিদ্রোহের ভয়ে দিল্লি প্রবেশের আগে তিনি এদের সকলকে হত্যা করেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এটি হলো একটি নজিরহীন নিষ্ঠুরতার ঘটনা। দিল্লিতে প্রবেশ করে তৈমুর অভাবনীয় অত্যাচার,

হত্যা ও লুণ্ঠন চালিয়েছিলেন। তৈমুর আত্মজীবনীতে এই বীভৎস তাণ্ডবের বর্ণনা রেখে গেছেন। দিল্লি লুঠ করে তিনি বহু ধনরত্ন লাভ করেন। মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল ছাড়া দিল্লির আর কোনো অঞ্চল তাঁর হত্যা ও ধ্বংসলীলা থেকে রেহাই পায়নি। তৈমুর লিখেছেন যে দিল্লির অধিবাসীরা বাধা দিয়েছিল বলে হত্যা ও ধ্বংসের পরিমাণ বেশি হয়েছিল। গঙ্গা ও যমুনার তীরে তাঁর ধ্বংসলীলা চালিয়ে তৈমুর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে নগরকোট ও জম্মুতে গিয়ে হাজির হন। ১৩৯৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে সিন্ধু অতিক্রম করে তিনি দেশে ফিরে যান।

ভারতবর্ষের ওপর যুগে যুগে বিদেশীরা আক্রমণ চালিয়েছে। কিন্তু কোনো আক্রমণকারী একটি মাত্র অভিযানে ভারতের এত ক্ষতি করেনি (Timur had inflicted on India more misery than had ever before been inflicted by any conqueror in a single invasion.)। তৈমুরের ঘোষিত লক্ষ্য ছিল বিধর্মীদের ধ্বংস করা এবং তাদের সম্পদ লুঠ করা। আসলে হিন্দু ও মুসলমান সকলে তাঁর অভিযানের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। দিল্লির তুঘলক শাসক মাহমুদের বিরুদ্ধে তিনি লড়াই করেছিলেন, ধ্বংস ও লুঠ করা ছিল তাঁর অভিযানের আসল উদ্দেশ্য। ধর্মকে তিনি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। তৈমুর ভারত থেকে বিদায় নিলে উত্তর ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে ছিল নৈরাজ্য ও অস্থিরতা। দিল্লি জনশূন্য হয়ে যায়, যারা বেঁচে ছিল তারা দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর শিকার হয়েছিল (Many died of sickness and many of hunger.)। ইসলামের রক্ষাকর্তা ইসলামের রাজধানীকে দুঃখ ও দুর্দশার মধ্যে নিক্ষেপ করেছিলেন। তৈমুরের অভিযানের পর তুঘলক বংশের পতন ঘটে। মাহমুদ ও তাঁর মন্ত্রী মাল্লুর মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছিল, মাল্লু দিল্লির আশপাশের অঞ্চলগুলি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। মাল্লুর মৃত্যুর পর মাহমুদ শাহ্ দিল্লিতে ফিরে আসেন। তিনি নামমাত্র শাসক ছিলেন, আসল শাসক ছিলেন দৌলত খান লোদি। মাহমুদ শাহের মৃত্যুর পর দৌলত খান সিংহাসনে বসেন, তাকে পরাস্ত করে খিজির খান দিল্লি অধিকার করেন, তুর্কি শাসনের অবসান ঘটে। তিনি সৈয়দ বংশ প্রতিষ্ঠা করেন (১৪১৪)। তৈমুরের আক্রমণের সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য হলো তিনি ভারতবর্ষ থেকে শুধু সম্পদ লুণ্ঠন করেননি, ভারতের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা বিদেশীদের কাছে তুলে ধরেন। তৈমুরের প্রদর্শিত পথ ধরে তারই বংশধর বাবর ভারতবর্ষে অভিযান পরিচালনা করেন। দিল্লি জয় করে তিনি মুঘল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। তৈমুর ভারত থেকে বহু শিল্পী ও কারিগর তাঁর দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন, এরা মধ্যপ্রাচ্যের স্থাপত্য ও শিল্পের ওপর ভারতীয় প্রভাব রেখেছিল। তৈমুরের অভিযানের গঠনমূলক দিক হলো এই সংস্কৃতির সমন্বয়। মুঘল যুগে মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে মুঘল শাসকদের যোগাযোগ বজায় ছিল।

চতুর্থ অধ্যায়

শাসকগোষ্ঠী, কেন্দ্রীয় শাসন ও সামরিক সংগঠন, ইক্‌তা ও ওয়াঝদারি ব্যবস্থা

শাসকগোষ্ঠী

সুলতানি যুগে সবচেয়ে প্রভাবশালী সামাজিক গোষ্ঠী হলো অভিজাত, এরা হলো শাসকগোষ্ঠী। এদের তিনভাগে ভাগ করা হয়—খান, মালিক ও আমীর। এই শ্রেণী বিভাজন খুব স্পষ্ট ছিল বলা যায় না। রাজদরবারের বেশ কিছু পদাধিকারী—সরজনদার (সুলতানের ব্যক্তিগত বাহিনীর অফিসার), সাকি-ই-খাস (তত্ত্বাবধায়ক), সিপাহশালার (সর-ই-খাইল) আমীর বলে গণ্য হতো। আমীর শব্দটি সরকারি প্রভাবশালী ব্যক্তিকে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হতো। অভিজাততন্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী শ্রেণী হলো খান ও মালিক, খান ও মালিকরা সরকারের সব উচ্চপদগুলি অধিকার করত। মিনহাজ ও বারানি অভিজাতদের যে তালিকা প্রণয়ন করেছেন তাতে শুধু মালিকদের নাম পাওয়া যায়। মোঙ্গল বাহিনীতে দশ হাজার সৈন্যের পদাধিকারী হলো খান। দিল্লি সুলতানিতে খান হলো বিশেষ পদমর্যাদা, বলবনের উপাধি ছিল উলুগ খান, রাজপুত্র হিসেবে মহম্মদ বিন তুঘলকের উপাধি ছিল উলুগ খান। অভিজাতদের অন্যান্য উপাধিগুলি হলো খাজা-জাহান, ইমাদ-উল-মুলক, নিজাম-উল-মুলক প্রভৃতি। সুলতানরা অভিজাতদের অনেক কিছু দিতেন, এগুলির মধ্যে ছিল জমকালো পোশাক, ঘোড়া, তরবারি, পতাকা, ঢাক প্রভৃতি। সুলতান প্রদত্ত এসব পারিতোষিকের বিশেষ মূল্য ছিল, এসবের মাধ্যমে প্রশাসনে তার অবস্থান এবং সুলতানের সঙ্গে সম্পর্ক নির্দিষ্ট হতো। সুলতানরা বিশেষ অনুষ্ঠানের সময় অভিজাতদের হাতি ও ঘোড়া উপহার দিতেন।

সুলতানি শাসনের সঙ্গে যুক্ত অভিজাতদের সংখ্যা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। মিনহাজ সিরাজ ইলতুৎমিসের ৩২ জন অভিজাতের কথা উল্লেখ করেছেন, এদের মধ্যে ছিল মধ্য এশিয়ার বিতাড়িত ৮ জন রাজপুত্র। বারানি চল্লিশ জন সদস্য বিশিষ্ট অভিজাত গোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করেছেন (তুরকান-ই-চিহলগনি)। এই চল্লিশা সম্ভবত ছিল ইলতুৎমিসের উচ্চপদস্থ অভিজাত। বারানি বলবনের অভিজাতদের সংখ্যা দিয়েছেন ছত্রিশ, এরা সকলে ছিল মালিক, কাজীদের তিনি বাদ দিয়েছেন। আলাউদ্দিনের সময়ে উচ্চ অভিজাতদের সংখ্যা হলো ৪৮, এর মধ্যে সাতজন ছিল আলাউদ্দিনের নিকট আত্মীয়। আলাউদ্দিনের মৃত্যু পর্যন্ত দিল্লি অভিজাতদের সংখ্যা বেশি ছিল না, এরা ছিল একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী। তুঘলক আমলে সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ঘটলে অভিজাতদের

ত্রয়োদশ শতকের ভারত

গজনি
কাশ্মীর
মোঙ্গল অধিকৃত অঞ্চল
মুলতান
লাহোর
সামানা
হান্সি
দিল্লি
দিল্লি সুলতানাত
কামরূপ
বঙ্গোপসাগর
চান্দেল্ল
লখনৌতি
পরমার
বাঘেলা
যাদব

সূত্র ঃ সতীশচন্দ্র, *মিডাইভ্যাল ইন্ডিয়া*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫

সংখ্যা বেড়েছিল। এই ক্ষুদ্রায়ত্ত গোষ্ঠীর মধ্যে প্রবল স্বার্থদ্বন্দ্ব ছিল, জাতিগত ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক বিরোধের সৃষ্টি করত। তুর্কিরা মনে করত তাজিক, খল্‌জি, আফগান ও হিন্দুস্তানিদের চেয়ে তারা হলো শ্রেষ্ঠ। ইলতুৎমিসের মৃত্যুর পর তুর্কিরা তাজিকদের বিতাড়িত করে ক্ষমতা একচেটিয়াভাবে ভোগ করতে থাকে। খল্‌জিরা ক্ষমতা দখল করে এই ব্যবস্থার পতন ঘটিয়েছিল, অভিজাতদের মধ্যে তাজিক, আফগান, মোঙ্গল ও হিন্দুস্তানিরা স্থান পেয়েছিল। প্রতিভা উচ্চপদে আরোহণের মাপকাঠি হয়েছিল, জাতিগত আধিপত্যের যুগ শেষ হয়ে যায়। ইবন বতুতা জানিয়েছেন যে দিল্লির সুলতানরা বিদেশী অভিজাতদের মর্যাদা দিতেন, ভারতে তারা সামাজিক মর্যাদা ভোগ করত।

সুলতানি অভিজাতদের সামাজিক উৎপত্তির কথা বিশেষ জানা যায় না, গোড়ার দিকে সামাজিক গতিশীলতা অবশ্যই ছিল। বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মানুষ সামরিক দক্ষতা দেখিয়ে বা সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অভিজাততন্ত্রে স্থান করে নিত, সর্বোচ্চ পদে উঠে যেত। অনেক অভিজাত প্রথম জীবনে ছিলেন ক্রীতদাস, এরা ধীরে ধীরে ক্ষমতার শীর্ষে উঠেছিলেন। ত্রয়োদশ শতকে এই ধারাটি সচল ছিল। এই সময়ে রাজবংশের উত্থানপতন চলেছিল, এক রাজবংশের পতন হলে তার অনুগৃহীত অভিজাতরা ক্ষমতাচ্যুত হতেন। অভিজাতরা এসময়ে এক প্রজন্মের বেশি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতেন না। খল্‌জি ও তুঘলকদের আমলে অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে বহু সম্প্রদায়ের মানুষ স্থান পেয়েছিল, এর সামাজিক ভিত্তি সম্প্রসারিত হয়, স্থিতিশীল হয়। খল্‌জি, আফগান ও হিন্দুস্তানিরা এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, তবে তুর্কিরা বাদ যায়নি। অভিজাতরা ক্ষমতাচ্যুত হলেও সামাজিক মর্যাদা হারাত না, কিছুকাল পরে হয়তো তারা আবার ক্ষমতা ফিরে পেত। অভিজাত ও উলেমারা ছিল আশরাফ-সমাজের উচ্চতম শ্রেণী, সম্মানিত, নীচে ছিল আতরাফরা। রাষ্ট্র অভিজাতদের কর্মসংস্থান, বিধবাদের পেনসন দান ও কন্যাদের বিবাহের জন্য অর্থের ব্যবস্থা করে দিত।

অভিজাতরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—শস্ত্র ব্যবসায়ী (আহল-ই-সইফ) এবং বুদ্ধিজীবী (আহল-ই-কলম)। বুদ্ধিজীবীরা বিচারক ও যাজক হিসেবে কাজ করত, উলেমারা এই বুদ্ধিজীবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গোড়ার দিকে সুলতানি রাজ্যের কাজ ছিল বিদ্রোহী প্রধান, মুকাদ্দম ও কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করা। এই পর্বে রাষ্ট্রব্যবস্থায় বুদ্ধিজীবীদের বিশেষ কোনো ভূমিকা ছিল না, তবে আশা করা হতো যে উজির একজন বুদ্ধিজীবী হবেন। অভিজাতরা বুদ্ধিজীবীদের অবজ্ঞা করত, তাদের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাজের অনুপযুক্ত বলে গণ্য করত। কাজী মুঘিশ আলাউদ্দিনকে মোঙ্গলদের সঙ্গে শান্তি স্থাপনের পরামর্শ দিলে সুলতান তাঁকে সামরিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে উপদেশদানের জন্য ব্যঙ্গ করেন। কাজী ছিলেন একজন

কেরানির পুত্র। আশরাফদের মধ্য থেকে অভিজাতদের গ্রহণ করা হতো। এজন্য অভিজাততন্ত্রের মধ্যে স্থিতিশীলতা এসেছিল, মুসলমান সমাজে শ্রেণী বিভাজন বেড়েছিল। আজলাফরা (আতরাফ) হলো (কাম আসল) তাঁতি, কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষ। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ ও আহার-বিহার ছিল না। এই ধরনের বিভাজন মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার সমাজে ছিল, ভারতে প্রচলিত জাতিব্যবস্থার পটভূমিতে মুসলমানদের মধ্যে জাতিবিভাজন দেখা দিয়েছিল। ভারতে মনে করা হতো শুধু আশরাফ বা উচ্চবর্গের মানুষরা শাসন ব্যাপারে যোগ্য ও দক্ষ। মহম্মদ বিন তুঘলক যোগ্যতার ভিত্তিতে নিম্নবর্গের হিন্দু ও মুসলমানকে (মদ প্রস্তুতকারক, তাঁতি, নাপিত, মালি, দোকানি ইত্যাদি) উচ্চপদে বসালে উচ্চবর্গের মানুষের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। নানাকারণে মহম্মদ বিন তুঘলকের পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছিল। ফিরুজ তুঘলক রাজকীয় অভিজাত ও উচ্চবর্গের মানুষদের মধ্য থেকে অভিজাতদের মনোনীত করেন, তিনি তাঁর কাজের জন্য প্রশংসিত হন। অভিজাতরা হিন্দুস্তানিদের অভিজাততন্ত্রে অন্তর্ভুক্তির বিরোধী ছিল না, তারা নিম্নবর্গের মানুষকে অভিজাত পদ দানের বিরোধী ছিল। ফিরুজের প্রধানমন্ত্রী খান-ই-জাহান প্রথম জীবনে ব্রাহ্মণ ছিলেন, এজন্য তার বিরুদ্ধে অভিজাতদের তেমন আপত্তি ছিল না। বারানি মিশ্র সম্প্রদায় বরদুদের উচ্চশ্রেণীতে গ্রহণের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছিলেন। এরা ছিল নিম্নবর্গের ধর্মান্তরিত মুসলমান, আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর এরা অল্পসময়ের জন্য ক্ষমতা দখল করেছিল।

বারানি জানিয়েছেন যে অভিজাতদের তেমন সঞ্চয় থাকত না। অর্থের অভাব ঘটলে এরা হিন্দু শাহ্ ও মুলতানি বণিকদের কাছ থেকে অর্থ ধার নিত। ইক্‌তার আয় থেকে মহাজনরা ঋণের জন্য বরাত পেত, সব সম্পদ এদের ঘরে গিয়ে মজুত হতো। আলাউদ্দিন ভূমিরাজস্ব সংগ্রহের কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা গড়ে তুললে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। তুঘলকদের আমলে সেই ব্যবস্থা চলেছিল। এই সময় থেকে সরকার নগদ অর্থে রাজস্ব সংগ্রহ করত, ইক্‌তা ও খালসা সব জমি থেকে নগদে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা হয়। ইবন বতুতাকে পাঁচ হাজার দিনারের বিচারকের পদ দেওয়া হয়, এজন্য তাকে আড়াইখানি গ্রামের রাজস্ব নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। একজন মালিক সাধারণত পেতেন পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার টাকা, একজন আমীর পেত তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা। ফিরুজ অভিজাতদের বেতন ও ভাতা অনেকখানি বাড়িয়েছিলেন। তাঁর উজির খান-ই-জাহান মকবুল পেতেন তের লাখ টাকা ও অন্যান্য ভাতা। অন্যান্য অভিজাতরা বার্ষিক গড়ে চার থেকে আট লাখ টাকা পেত। এর অর্থ হলো শাসকগোষ্ঠীর হাতে কৃষি উদ্বৃত্তের অনেকখানি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। অভিজাতরা এর একাংশ ব্যয় করত, বাকি অংশ মজুত করে রাখত। ফিরুজের অভিজাত মালিক শাহিন ছিলেন সুলতানের

নায়িব আমীর-ই-মজলিশ। তিনি মৃত্যুকালে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা, মণিমুক্তো ও দামী পরিচ্ছদ রেখে যান। আর একজন আমীর বসির সুলতানি তের কোটি টাকা রেখে মারা যান, সুলতান এর মধ্যে নয় কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। তবে এগুলি হলো ব্যতিক্রমী ঘটনা। সুলতানি অভিজাতদের সঞ্চয়ের ফলে দেশে মুদ্রা-নির্ভর অর্থনীতির সম্প্রসারণ ব্যাহত হয়েছিল। মুদ্রা-নির্ভর অর্থনীতি গড়ে উঠলে অভিজাতদের বাণিজ্য ও বণিক সম্প্রদায় সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টেছিল। ইবন বতুতা জানিয়েছেন যে দিল্লির সুলতানদের বাণিজ্যপোত ছিল। সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক তাঁর বন্ধু শিহাবুদ্দিন কাজরুনিকে তাঁর তিনখানি জাহাজ বাণিজ্যের জন্য দিয়েছিলেন। কাজরুনির বিস্তৃত বৈদেশিক বাণিজ্য ছিল, তাঁকে বলা হতো 'বণিক সম্রাট' (King of merchants)। তুঘলকদের আমলে বণিকদের শাসনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। মহম্মদ বিন তুঘলক শিহাবুদ্দিনকে ক্যাম্বে (খামবয়াত) বন্দরের গভর্নর নিযুক্ত করেন। ইবন বতুতা জানাচ্ছেন যে মহম্মদ বিন তুঘলক তাঁকে উজির পদ দানের মনস্থ করেন, উজির খান-ই-জাহানের ষড়যন্ত্রে তিনি নিহত হন।

ইরাকের বণিক আবুল হাসান ইবাদী মহম্মদ বিন তুঘলকের অর্থ নিয়ে বাণিজ্য করতেন। তিনি ইরাক ও খোরাসান থেকে সুলতানের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য পণ্য কিনতেন। অভিজাতরা সুলতানকে অনুসরণ করতেন। অভিজাতরা বাণিজ্যের চেয়ে উদ্যান স্থাপনে বেশি আগ্রহী ছিলেন, ফিরুজের অভিজাতরা অনেক উদ্যান বসিয়েছিলেন। অভিজাতদের শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সম্ভবত তারা অশিক্ষিত ছিলেন না, তারা শিক্ষিত ক্রীতদাস কিনতেন। এই ক্রীতদাসরা ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে শিক্ষা পেত। অভিজাতদের নিজস্ব একটি সাংস্কৃতিক জীবন ছিল। অনেকে সাহিত্য, নৃত্য ও সঙ্গীতের সমঝদার ছিলেন, কবি ও সাহিত্যিকদের তাঁরা পৃষ্ঠপোষণ করতেন। ভারতে ইন্দো-মুসলিম সংস্কৃতির নতুন ধারা গড়ে উঠেছিল। অভিজাতরা ছিলেন এর পৃষ্ঠপোষক। এই ধারার গঠনে অভিজাত ও সুফিদের অবদান ছিল। জিয়া নাখসাবি অনেক বিষয়ে গ্রন্থ লেখেন, কবিতা লেখেন, অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থের ফার্সিতে অনুবাদ করেন। শস্ত্র ব্যবসায়ী হলেও সুলতানি অভিজাতরা সংস্কৃতিকে অবহেলা করেননি।

তুর্কিদের আগমনের প্রাক্‌কালে রাজপুতরা ছিল ভারতের শাসকশ্রেণী। তুর্কি শাসন প্রতিষ্ঠার পর উত্তর ভারতের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে স্থানীয় শাসনের সঙ্গে যুক্ত ছিল রাজপুতরা। এদের বলা হতো রায়, রাণা, রাবাত, কখনো কখনো এদের প্রধান বা সর্দার বলা হয়েছে। এদের সশস্ত্র অনুচর বাহিনী ছিল, গ্রামের দুর্গে অনুচর পরিবেষ্টিত হয়ে এরা বাস করত। এদের সংখ্যা কত সঠিকভাবে বলা যায় না, যা বলা যায় তা হলো দেশের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় তাদের প্রাধান্য ছিল। সমকালীন

মুসলমান ঐতিহাসিকরা এদের রাষ্ট্রের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, এদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার জন্য সুলতানদের পরামর্শ দিয়েছেন, কিন্তু সুলতানরা এদের সঙ্গে স্থায়ী শত্রুতার সম্পর্ক বজায় রাখেননি। এরা সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব সময়মত দিলে এবং অনুগত থাকলে সাধারণত এদের উৎখাত করা হতো না। হিন্দু প্রধান ও তুর্কি শাসকদের মধ্যে ক্রমশ রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বলা হয়েছে যে হিন্দু রায়রা একশ ক্রোশ পেরিয়ে বলবনের রাজসভার জাঁকজমক দেখতে আসত। বলবন বাংলার বিদ্রোহী শাসক তুঘ্রিলকে দমন করে অযোধ্যায় ফিরে এলে হিন্দু রায়রা তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। ফিরুজের বাংলা অভিযানকালে পূর্ব-উত্তরপ্রদেশের কয়েকজন হিন্দু প্রধান তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। এদের মধ্যে ছিলেন গোরখপুর ও চম্পারণের রায় উদয় সিং। তিনি কুড়ি লক্ষ টাকা রাজস্বও জমা দেন। কারার গভর্নর মালিক ছজ্জু জালালুদ্দিনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন স্থানীয় হিন্দু রায় ও রাবাতরা, ছজ্জু পরাস্ত হলে হিন্দু রায়রা জালালুদ্দিনের সঙ্গে আপস করেন। তাঁর রাজদরবারে এদের দেখা যেত। ফিরুজ তুঘলকের রাজসভায় হিন্দু প্রধান অনিরাথু, রায় মদর, রায় সুমের, রাবাত অধিরাম ও অন্যান্যরা ছিলেন। রাজসভায় এঁদের আসন গ্রহণের অধিকার ছিল।

সুলতানি শাসনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হলেও এইসব গ্রাম প্রধানদের অস্তিত্ব অনিশ্চিত ছিল। সুলতানরা সুযোগ পেলে এদের উৎখাত করতে ছাড়তেন না, কেন্দ্রীয় রাজস্বব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটিয়ে তাঁরা এদের ক্ষমতা ও অধিকার কেড়ে নিতেন। এর ফলে কৃষকদের দেয় করের পরিমাণ কমেনি, তবে গ্রাম প্রধানদের সুযোগ-সুবিধা কমেছিল, তাদের অধীনস্থ মধ্যস্বত্বভোগীদের অধিকার সঙ্কুচিত হয়েছিল। চতুর্দশ শতকের গোড়া থেকে জমিদারদের কথা জানা যায়। বংশানুক্রমিক মধ্যস্বত্বভোগীদের বোঝানোর জন্য জমিদার শব্দ ব্যবহার করা হয়। আমীর খসরু জমিদারদের কথা বলেছেন। সুলতানি যুগে খুত, মুকাদ্দম ও চৌধুরীরা হলো জমিদার। জমি জরিপ করে যাদের রাজস্ব ধার্য করা হয় এমন মধ্যস্বত্বভোগীকেও জমিদার বলা হয়েছে, এরা থোক রাজস্ব দেওয়ার অধিকারী ছিল না। মুঘল যুগে কৃষি উদ্বৃত্তের স্থায়ী অংশীদার হলো জমিদার, জমির মালিক, কৃষি উদ্বৃত্তের একাংশের মালিক সকলে জমিদার। গ্রামের প্রধানদেরও জমিদার বলা হতো। এদের জীবনযাত্রার মান কেমন ছিল বলা যায় না, তবে দরিদ্র জনগণের জীবনযাত্রার সঙ্গে তুলনায় এরা যে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকত তাতে সন্দেহ নেই।

অভিজাতদের সহযোগী শাসকগোষ্ঠী ছিল, এরা রাজস্ব, প্রশাসন, ধর্ম ও বিচার বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ধর্ম ও বিচার সংক্রান্ত কাজকর্ম পরিচালনা করত কাজী ও মুফ্‌তিরা, প্রত্যেক শহরে এদের দেখা পাওয়া যেত। শরিয়ত অনুযায়ী এরা মুসলমানদের

দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচার করত। হিন্দুদের প্রথাগত আইন ও ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী বিচার হতো। প্রধান কাজীর পদ ছিল। অনেক শহরে দাদবক নামে একটি পদ ছিল। এই পদাধিকারীর কাজ ছিল অত্যাচারমূলক কর সম্পর্কে অনুসন্ধান ও মুসলমানদের সম্পত্তি ইত্যাদির তদারকি করা। কর ধার্যের জন্য এসবের হিসেব রাখা হতো, আমীররা এসব কাজ করত। কোতোয়ালের অধীনে মুহতাসিবের কাজ ছিল মুসলমানরা যাতে শরিয়তের নির্দেশ পালন করে তা দেখা। তারা ঠিকমত রোজা, নামাজ ইত্যাদি পালন করছে কিনা তার দিকে এদের নজর রাখতে হতো। বাজারে ওজন ও পরিমাপ ব্যবস্থার তদারকি তাকে করতে হতো। এসব পদাধিকারীরা সরকারি বেতন পেতেন, মুসলমান জনসংখ্যা বাড়লে এসব পদের সংখ্যাও বেড়ে যায়। মসজিদে ইমাম ও মুয়াজ্জিনরা ছিলেন, ছিলেন কোরান পাঠকের দল। সমাধিস্থলে বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এরা কোরান পাঠ করত। মক্তব ও মাদ্রাসায় উলেমারা শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হতেন। উলেমারা সামাজিক সম্মান পেতেন। মুসলিম আইন, তর্কশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি এঁরা শিখতেন, আরবি ও ফার্সি জানতে হতো। মুসলিম পণ্ডিত, সুফি ও দরবেশরা রাষ্ট্র থেকে নানাধরনের অনুদান পেত।

এদের সামাজিক উৎসের কথা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না, সমাজের মধ্যবর্তী বা নিম্নমধ্যবর্তী স্তরে ছিল এদের অবস্থান। কয়েকজন উলেমা উচ্চপদ পেতেন, কাজী ও প্রধান কাজীর পদ পেতেন, এরাও ছিল সেযুগের শাসকগোষ্ঠী। কবি, সাহিত্যিক, পণ্ডিত, ঐতিহাসিক, হাকিম ও নিম্নপদস্থ সরকারি কর্মচারী (আমিন, মুহরার প্রভৃতি) সকলে ছিল এক সামাজিক শ্রেণীভুক্ত। দেশের শিক্ষিত শ্রেণী হিসেবে এরা সামাজিক সম্মান পেত, উলেমারা ধর্মের ব্যাখ্যা দিত। তবে উলেমাদের সকলে পছন্দ করত না। বুঘরা খান তাঁর পুত্র কায়কোবাদকে অর্থগৃধ্নু উলেমা সম্প্রদায় সম্পর্কে সাবধান করে দেন। আমীর খসরু কাজীদের মনে করতেন অজ্ঞ এবং দুর্নীতিগ্রস্ত। এদের কোনো সরকারি কাজ পাওয়া উচিত নয় বলে তিনি মনে করেন। এরা উদ্ধত ও দাম্ভিক, ক্ষমতাসীন ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করার জন্য এরা ন্যায়নীতি ও বিশ্বাসকে বিসর্জন দেয়। সুলতানরা এদের রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে দিতেন না, ধর্ম, বিচার ও শিক্ষার ক্ষেত্রে এদের নির্দিষ্ট ভূমিকা ছিল। অস্বীকার করা যায় না উলেমারা সাধারণ মুসলমান ও শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করত, এরা মুসলমান সমাজের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের প্রয়াস চালাত। উলেমাদের অনেকে ছিলেন বিদেশী, মোঙ্গল আক্রমণের জন্য এঁরা ভারতে এসে আশ্রয় নেন অথবা ভারতের সমৃদ্ধির কথা শুনে এদেশে এসেছিলেন। ভারতকে এরা জানতেন না, এঁদের একাংশ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভাজনের ওপর জোর দিয়ে ধর্মীয় দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করত। ধর্মীয় পার্থক্য সত্ত্বেও এদের মধ্যে যে সামাজিক সংহতি ছিল তাকে অস্বীকার করা হতো।

আলাউদ্দিন খল্‌জি কেন্দ্রে শাসনের জন্য বড় মাপের প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন। রাজস্বব্যবস্থার সংস্কার হলে প্রদেশ ও জেলাগুলিতে বহু কর্মচারীর প্রয়োজন হয়। বারানি এদের ক্ষমতা, দুর্নীতি ও অত্যাচারের নিখুঁত বর্ণনা রেখে গেছেন। এরা কোন্ সামাজিক গোষ্ঠী থেকে এসেছিল বলা যায় না। উলেমা ও ধর্মান্তরিত মুসলমানদের একাংশ এইসব কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। মুকাদ্দম ও পাটোয়ারিরা ছিল হিন্দু, এরা গ্রামে বাস করত, অন্যরা সকলে ছিল মুসলমান। মহম্মদ বিন তুঘলক এদের সঙ্গে হিন্দুদেরও প্রশাসনে স্থান দেন, এদের মধ্যে অল্প কয়েকজন হিন্দু উচ্চপদ পেয়েছিলেন। হিন্দুরা ফার্সি শিখে সুলতানি শাসনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল।

সুলতানদের সঙ্গে অভিজাততন্ত্রের সম্পর্ক

মুসলমান সমাজের আশরাফরা দুভাগে বিভক্ত ছিল—ওম্‌রাহ্ ও উলেমা। ওম্‌রাহ্ হলো অভিজাতশ্রেণী, অর্থ ও মর্যাদার মানদণ্ডে সুলতানের পরেই ছিল অভিজাতদের স্থান। এরা ক্ষমতাসীন সুলতানকে সমর্থন করত, অনেকসময় অনধিকার হস্তক্ষেপের ঘটনা ঘটত। কোনো রাজবংশ দুর্বল হলে অভিজাতরা ক্ষমতা দখল করে বসত। কোনো কারণে অভিজাত ক্ষমতাচ্যুত হলে তার বংশধররা সামাজিক মর্যাদা ভোগ করত, সময় ও সুযোগমতো তারা আবার সরকারের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হতো। সুলতানের দাস বা অভিজাত ব্যক্তির পোষ্য হিসেবে একজন অভিজাত সন্তানের জীবন শুরু হতো। তারপর উন্নতির সোপান ধরে সে এগিয়ে যেত, সরকারি পদ পেত এবং আমীর পদে উন্নীত হতো। এরপর থেকে সে অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হতো, তার বংশধররা চিরকাল সামাজিক সম্মান ভোগ করত। দিল্লি সুলতানির নির্দিষ্ট উত্তরাধিকার আইন ছিল না, জ্যেষ্ঠের অধিকার স্বীকার করা হতো না। রাজবংশের প্রতি জনগণের আনুগত্য তৈরি হয়নি। সুলতান কোনো অভিজাতকে প্রভাবশালী হতে দেখলে ভয় পেতেন। অভিজাতদের সামনে দুটি বিকল্প ছিল—সুলতানের অনুগত হয়ে জীবন কাটানো অথবা বিদ্রোহ করা। পশ্চিমে অভিজাতরা স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার ভোগ করত, রাজপুত অভিজাতদের এধরনের অধিকার ছিল। কিন্তু সুলতানি অভিজাতদের এই অধিকার দেওয়া হয়নি। অভিজাত মারা গেলে তার খেতাব, বেতন ও ভাতা তার উত্তরাধিকারী পেত না। সুলতান ইচ্ছা করলে যে-কোনো অভিজাতের পদ কেড়ে নিতে পারতেন। অভিজাতরা সুলতানের দয়ার ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিল, এজন্য অবশ্য অভিজাত ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতো না।

সুলতানি যুগের অভিজাতরা তিনভাগে বিভক্ত ছিল—খান, মালিক ও আমীর। অভিজাতরা আমীরের নীচে কোনো পদ পেত না, এদের নীচে ছিল সামরিক বিভাগের সরখেল ও সিপাহশালার। আমীরদের সম্ভবত সামরিক ও বেসামরিক উভয় কাজ

করতে হতো। অভিজাত ব্যক্তির মর্যাদা নির্দিষ্ট হতো তার সুগল খেতাব ও ইক্তার আয় দিয়ে। কে কী খেতাব পাবে তার বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। প্রত্যেক অভিজাত ব্যক্তির ব্যয় নির্বাহের জন্য বার্ষিক আয়ের বন্দোবস্ত ছিল। সুলতানের অধীনে কিছু পদ ও খেতাব ছিল। সুলতানের অধীনে প্রাসাদ, কারখানা পরিদর্শক, মন্ত্রী, সচিব, প্রাদেশিক গভর্নর ও জেলা শাসকের পদ ইত্যাদি ছিল, অন্যান্য কিছু সামরিক ও বেসামরিক পদ ছিল। অভিজাতদের উচ্চ খেতাবগুলি হল উলুগ খান, খাজা-জাহান, ইমাদ-উল-মুলক, নিজাম-উল-মুলক প্রভৃতি। সুলতানি রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশগুলিতে হিন্দু প্রভাব ছিল। বাংলার সুলতান হিন্দুদের নায়ক, খান, রাজা উপাধি দেন। অভিজাতদের মরাতিব এই অভিধা দেওয়া হতো, এই উপাধিধারীরা অনুচরদের নিয়ে শোভাযাত্রা করে দরবারে আসত। সুলতান অভিজাতদের ব্যয় নির্বাহের জন্য ইক্তা দিতেন। ইক্তার আয়তনের ওপর তাদের রাজনৈতিক প্রভাব ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা নির্ভর করত। পশ্চিম এশিয়া থেকে ইক্তা ব্যবস্থা ভারতে প্রবেশ করেছিল। ইক্তার অধিকারী মুক্তির প্রশাসনিক স্বাধীনতা ছিল। ইক্তার আয় থেকে মুক্তি নিজস্ব ব্যয়, সৈন্য-বাহিনীর ব্যয় ইত্যাদি মিটিয়ে বাকি অংশ কেন্দ্রীয় কোষাগারে জমা দিত। ইক্তাদার অনেক সময় অন্যাকে রাজস্ব আদায়ের ইজারা দিত, এজন্য দরিদ্র কৃষকের কাঁধে বাড়তি বোঝা চাপত। দিল্লিতে ইক্তার হিসেব পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু এদের পক্ষে ইক্তাদারের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হতো না। প্রত্যন্ত অঞ্চলের ইক্তাদাররা ছিল নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ইক্তা, সম্মান, খেতাব ইত্যাদি অভিজাত ব্যক্তিকে দেওয়া হতো, তার মৃত্যুর সঙ্গে এসব শেষ হয়ে যেত। রাষ্ট্র যতদিন শক্তিশালী ছিল ততদিন এই ব্যবস্থা চলেছিল, রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে পড়লে এই অধিকারগুলি অভিজাত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা ভোগ করতেন। রাষ্ট্র সরকারি চাকরি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির মধ্যে একটি স্পষ্ট বিভাজন রেখা বজায় রেখেছিল। মহম্মদ বিন তুঘলকের মৃত্যুর পর কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হয়ে পড়লে এই নীতি বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। আফগান অভিজাতরা ইক্তাকে বংশানুক্রমিক সম্পত্তির রূপ দিয়েছিল।

সুলতান সিকান্দর লোদী তাঁর ওমরাহ মসনদে আলির বংশধর জৈনুদ্দিনকে ইক্তা দেন। তিনি তাঁর আদেশে পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন যে আলির বংশধর হিসেবে নয়, তার যোগ্যতার জন্য তাকে ইক্তা দেওয়া হলো। রাষ্ট্র ইক্তার ওপর অধিকার বজায় রাখতে আগ্রহী ছিল। ধর্মীয় ও জনহিতকর কাজের জন্য যে ওয়াকফ দেওয়া হতো তার ওপরও সরকারি নিয়ন্ত্রণ ছিল। রাজবংশ দুর্বল হয়ে পড়লে মুক্তি বংশানুক্রমিকভাবে ইক্তা ভোগ করতে থাকে, তবে সুলতানরা তা স্বীকার করত না। ইক্তার আয়তন অনেক সময় বিশাল হতো, অনেক ছোটখাট ইক্তাও ছিল। ফিরুজ তুঘলকের রাজত্বকালে ইক্তা থেকে মোট আয়ের পরিমাণ ছিল সাতান্ন কোটি টাকা।

খান খেতাবধারীরা ছিল অভিজাততন্ত্রের শীর্ষে, পরে ছিল মালিকদের স্থান, রাজকীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আমীরদের মালিক পদে প্রমোশন দেওয়া হতো। খান ও মালিকদের সুযোগ-সুবিধা প্রায় একইরকম ছিল, তবুও এদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য বজায় রাখা হতো। খান, মালিক ও আমীরদের খেতাব ধরে সম্বোধন করার প্রথা ছিল। আমীররাও বিশেষ ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত, তবে খান ও মালিকদের সঙ্গে এদের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পার্থক্য ছিল। খান নটি ধ্বজ ও দশটি ঘোড়া নিয়ে শোভাযাত্রা করার অধিকারী ছিল, আমীরের অধিকার ছিল তিনটি ধ্বজ ও দুটি ঘোড়ার। ইলতুৎমিস মালিক নাসিরুদ্দিনকে একটি হাতি উপহার দেন, তিনি আমীরদের প্রত্যেককে একটি করে ঘোড়া উপহার দেন। পদমর্যাদা অনুসারে প্রত্যেক অভিজাত জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহের জন্য রাষ্ট্র থেকে অর্থ পেত, প্রত্যেকের দাস-দাসী, অনুচর ছিল। রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে এরা আমন্ত্রিত হতো এবং পদমর্যাদা অনুযায়ী আসন গ্রহণ করত। সুলতান অভিজাতদের ঘোড়া, তরবারি, জমকালো পোশাক (খেলাত), পতাকা, ঢাক ইত্যাদি পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করতেন।

সুলতানরা অভিজাতদের ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল ছিলেন। ইলতুৎমিস অভিজাতদের সমর্থনের তাৎপর্য উপলব্ধি করেন এবং স্বীকার করেন। অভিজাতদের সমর্থন না পেলে তিনি সুলতানি রাজ্যকে সংহত করতে পারতেন না। সুলতান ও অভিজাতরা একই সামাজিক গোষ্ঠীর লোক ছিলেন, এজন্য এরা খানিকটা স্বাধীনভাবে চলতেন। ইলতুৎমিসের অভিজাতরা চল্লিশা নামে একটি সংস্থা গঠন করেছিল, বলবন নিজে চল্লিশার সদস্য ছিলেন। তিনি এই সংস্থাকে রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক বলে গণ্য করেন। তিনি এই সংস্থার প্রভাবশালী সদস্যদের হত্যা করেন, পরে এই সংস্থাটি ভেঙে দেন। তবে অভিজাতদের সুযোগ-সুবিধাগুলি তিনি বাতিল করেননি। তিনি তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন যে অভিজাতদের সমর্থন ছাড়া কোনো রাষ্ট্র শক্তিশালী হতে পারে না। বলবন অভিজাততন্ত্রের উন্নতির বিরোধী ছিলেন না। বলবনের আমলের এই বিপর্যয় অভিজাতরা কাটিয়ে উঠেছিল, পরবর্তীকালে অভিজাতরা শক্তিশালী হয়েছিল। সুলতানরা এদের সমর্থন কামনা করতেন। আলাউদ্দিন বিদেশাগতদের আধিপত্য পছন্দ করেননি, তিনি ভারতীয় অভিজাতদের দরবারে ক্ষমতা ও পদ দুই-ই দেন। আলাউদ্দিনের উত্তরাধিকারীদের সময়ে ভারতীয়রা এত বাড়াবাড়ি করেছিলেন যে গিয়াসউদ্দিন তুঘলক তার সুযোগ নিয়ে ক্ষমতা দখল করেন। মহম্মদ বিন তুঘলক তুর্কি অভিজাত ও ভারতীয় অভিজাত উভয়কে পছন্দ করেননি, তিনি বিদেশীদের আহ্বান করে নিয়ে এসে উচ্চপদ দেন। কিন্তু ভারতের প্রতি এঁদের আন্তরিক আকর্ষণ ছিল না, অর্থলোভে এঁরা ভারতে এসেছিলেন, সরকারি কাজকর্মে এঁদের মন ছিল না। এরপর সুলতান জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে হিন্দুস্তানের সকলকে শুধু যোগ্যতার ভিত্তিতে

নিযুক্ত করেন। সমসাময়িক মুসলমান লেখকরা এজন্য তাঁর নিন্দায় মুখর হয়ে ওঠেন। ফিরুজ তুঘলক খান-ই-জাহান-কে উজির পদে নিয়োগ করেন, ইনি ছিলেন একজন ভারতীয়।

অভিজাতদের অনেকে সুলতানের ক্রীতদাস হিসেবে জীবন শুরু করেন। পরে তাঁরা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হলে সুলতানরা তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ করতেন না। সুলতান তাঁর আসনে অটল ছিলেন, অভিজাত তাতে হস্তক্ষেপ করত না, কোনো রাজনৈতিক সংকট দেখা দিলে সুলতান অবশ্যই অভিজাত ব্যক্তির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতেন। শান্তির সময়ে সুলতান ও অভিজাতদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকত, সুলতান হতেন এদের বন্ধু ও দরদী। অভিজাতদের মধ্যে বিরোধ বাধলে সুলতান হস্তক্ষেপ করে বিরোধ মিটিয়ে দিতেন। সৈয়দ ও আফগানদের শাসনকালে সুলতান অভিজাতদের ওপর নিয়ন্ত্রণ অনেকখানি হারিয়ে ফেলেন, অভিজাতরা স্বাধীনভাবে চলতে থাকে। শেষপর্বে রাজনৈতিক কারণে রাষ্ট্র অভিজাতদের ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছিল। সুলতানি যুগে অভিজাতদের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না, এই অভিজাততন্ত্রের মধ্যে ছিল বিদেশী ও ভারতীয়রা। রাজবংশের উত্থান-পতনের সঙ্গে এদের চরিত্র ও গঠনে পরিবর্তন ঘটে যেত। সুলতানি যুগের শুরুতে সব অভিজাতরা ছিল তুর্কি, পরে আফগানরা এই শ্রেণীতে স্থান পায়। ফিরুজ তুঘলক আফগানদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। মোঙ্গলদের কেউ কেউ অভিজাততন্ত্রে স্থান পেয়েছিল। তুঘলকরা ছিল মিশ্রজাতি, এরা সকলকে নিয়ে অভিজাত শ্রেণী গঠন করেছিল। শেষপর্বে মুঘলরা অভিজাত শ্রেণীতে স্থান করে নিয়েছিল, রাজপুতরা অভিজাততন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। গুজরাট ও মালবের সুলতানদের সঙ্গে হিন্দু অভিজাতদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল।

সুলতানি রাষ্ট্রে উলেমাদের ভূমিকা

সুলতানি যুগে উচ্চস্তরের মুসলমান সমাজ দুভাগে বিভক্ত ছিল—আহল-ই-কলম (বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়) এবং আহল-ই-তীগহ (শস্ত্র ব্যবসায়ী সৈনিক)। এরা হলো মুসলমান সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণী—ওম্‌রাহ্ (অভিজাত) ও উলেমা (ধর্মশাস্ত্রবিদ্)। উলেমারা সাধারণত হতেন সুন্নি সম্প্রদায়ের লোক, অতুর্কি ও অভারতীয়। বিভিন্ন দেশ ও জাতির লোক নিয়ে সুলতানি যুগের উলেমা সম্প্রদায় গঠিত হয়। এদের বেশিরভাগ ছিলেন আরব, ইরান ও আফগানিস্তানের লোক। উলেমা শ্রেণীতে প্রবেশ করার মতো শিক্ষা-দীক্ষা ভারতীয় মুসলমানদের ছিল না। সামাজিক শ্রেণী হিসেবে উলেমারা ঐক্যবদ্ধ ছিল, সমাজে এদের প্রভাব সম্বন্ধে সচেতন এবং নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য জোটবদ্ধ হয়েছিল। যেখানে মুসলমানরা সংঘবদ্ধ

হয়ে বসবাস করত সেখানে উলেমাদের দেখা যেত। শিক্ষক, বিচারক ও ধর্মশাস্ত্রের ভাষ্যকার হিসেবে এরা কাজ করত, সরকারি পদেও এরা নিযুক্ত হতো। সরকারি, বেসরকারি বিদ্যালয় এবং নিজেদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে এরা শিক্ষকতা করত। উলেমাদের একাংশ ইমাম, খাতিব, মুহতাসিব হিসেবে কাজ করত। অনেকে শুধু সাধারণ মুসলমানের মধ্যে ধর্মীয় উপদেশ বিতরণ করত। সুলতানি যুগের সব বিদ্বান লোক ও ইতিহাসবিদ্‌রা ছিলেন উলেমা সম্প্রদায়ভুক্ত। ইসলামী ধর্মশাস্ত্রে এরা পাণ্ডিত্য অর্জন করতেন, ধর্মীয় ও সামাজিক সমস্যা দেখা দিলে এরা 'ফতোয়া' (সিদ্ধান্ত) দিতেন।

সুলতানি শাসনের গোড়া থেকে উলেমারা ছিলেন সুলতানদের সহযোগী। শুধু সুলতানরা নন, মন্ত্রী ও অভিজাতরা উলেমাদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। উলেমারা ছিলেন ধর্ম-বিশেষজ্ঞ এবং ধর্ম-বিষয়ক উপদেষ্টা, রাষ্ট্রের শাসন, আইন ও নীতির ব্যাপারে এদের মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হতো। সাধারণত উলেমাদের একটি নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম অনুযায়ী শিক্ষা নিতে হতো। এই পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল মুসলিম ধর্মশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, আরবি ও ফার্সি ভাষা এবং তফসির, হাদিস, কালান প্রভৃতি মুসলিম ধর্ম সাহিত্য। কোরানে শ্রেণী হিসেবে উলেমাদের উল্লেখ আছে; কর্মাদর্শের দ্বারা এই শ্রেণী সাধারণ মানুষকে ধর্মপথে আকৃষ্ট করবেন এই আশা প্রকাশ করা হয়েছে। পবিত্র গ্রন্থে এদের জন্য কোনো বিশেষ ব্যবস্থার নির্দেশ নেই। উলেমারা প্রচার করত যে 'পয়গম্বর মহম্মদ নাকি বলেছেন যে উলেমারা হলো সত্যদ্রষ্টার সার্থক উত্তরসাধক, ওদের সম্মান দেখাও।' উলেমাদের শ্রদ্ধা করলে ইসলামের প্রবর্তক তথা আল্লাহ্‌কে ভক্তি নিবেদন করা হয়। এসব কথা তারা প্রচার করত। ইসলামী ধর্মশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের জন্য এদের বিশেষ সামাজিক মর্যাদা ছিল।

দিল্লির সুলতানরা বিশাল হিন্দু জনসমুদ্রের মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য ধর্মকে অবলম্বন করেন। রাজনৈতিক প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে সুলতানরা নিজেদের 'ইসলামের রক্ষক' হিসেবে প্রচার করেন। নতুন সুলতান খুৎবায় নিজের নাম যুক্ত করতেন, মুদ্রায় তাঁর নাম উৎকীর্ণ হতো। সুলতান ধার্মিক হোন বা না হোন, বাইরে তিনি ধর্মীয়ভাব বজায় রাখতেন। রাজনৈতিক কার্যকলাপের সমর্থন খুঁজতেন তিনি ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে। সুলতানদের উলেমারা এভাবে মদত দিতেন। কোরানে বলা হয়েছে 'আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র দূতের আজ্ঞানুবর্তী হও, তোমাদের মধ্যে যে যোগ্য ব্যক্তি তার ওপর কর্তৃত্ব ন্যস্ত কর ও তাকে মান্য কর।' এই নির্দেশের নানা ভাষ্য দিতেন উলেমারা। উলেমারা প্রচার করতেন যে দিল্লির সুলতান হলেন সেই আল্লাহ্ নির্দেশিত যোগ্য ব্যক্তি, সুলতান হলেন ইমাম। তাঁর আদেশ পালনের অর্থ হলো আল্লার আদেশ ও বিধান মেনে চলা। উলেমারা সহজ যুক্তি দিয়ে প্রজাদের কাছে সুলতানকে আল্লার

প্রতিভূ হিসেবে তুলে ধরতেন। এরই ভিত্তিতে সুলতান প্রজাদের কাছ থেকে আনুগত্য দাবি করতেন। উলেমারা আরো প্রচার করেন যে সুলতানের আদেশ অমান্য করা হলো পাপ। ধর্মশাস্ত্র ব্যাখ্যা করে উলেমারা বোঝাতেন যে সুলতান নির্বাচনে মুসলমানদের কোনো ভূমিকা নেই। সুলতান ক্রীতদাস, নিগ্রো বা বিকলাঙ্গ হতে পারেন তাতে কিছু আসে যায় না। সুলতানের কাজ হলো মহম্মদের কাজের পরিপূরক। উলেমারা প্রচার করেন যে সুলতানের বিরোধিতা করা হলো আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। অন্যায়কারী, অত্যাচারী সুলতানের বিরোধিতা করাও হলো পাপ। ইসলাম শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা স্বীকার করে নেন যে রাষ্ট্র জরুরি প্রয়োজন হলে যে-কোনো ব্যক্তির সম্পত্তি অধিগ্রহণ করতে পারে। এই অর্থ ইসলামের সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন হলো বিধিসম্মত। সুলতান ধর্মের প্রধান হিসেবে কাজ করবেন, ধর্মীয় বিরোধে তাঁর সিদ্ধান্ত হবে চূড়ান্ত, কোরান অনুযায়ী ভাষ্যদানের অধিকার তাঁর আছে।

উলেমারা হাদিস থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে সুলতানির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতেন। 'সুলতানের অস্তিত্ব না থাকলে মানুষে মানুষে ভক্ষ্য-ভক্ষকের সম্পর্ক হবে।' এই ঘোষণাটি ভারতে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। মহম্মদ বিন তুঘলক এই নীতিবাক্য খোদিত মুদ্রা চালু করেছিলেন। উলেমাদের সমর্থন নিয়ে দিল্লির সুলতানরা নিরঙ্কুশ স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। ইসলাম শুধু স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র মেনে নেয়নি, স্পষ্টত স্বমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে রাষ্ট্রের দাসত্ব করতে থাকে। বদায়ুনীর মতো গোঁড়া ধর্মজ্ঞানীরা ছিলেন ব্যতিক্রম।

দিল্লি সুলতানির বিকাশধারায় উলেমাদের প্রাধান্য লাভ হলো একটি স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত ঘটনা। সুলতানি ব্যবস্থার সহযোগী হিসেবে উলেমারা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল, রাষ্ট্র, প্রশাসন বিচার ও আইনের ক্ষেত্রে এদের প্রাধান্য ছিল। উলেমারা নিজেদের রাষ্ট্রব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে ধরে নিয়েছিল, ধর্ম ও ধর্ম-নিরপেক্ষ সব বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার অধিকার দাবি করত। দিল্লি সুলতানির শুরু থেকে আলাউদ্দিন পর্যন্ত সব সুলতান উলেমাদের নির্দেশ ও পরামর্শ অনুযায়ী চলতেন। সুলতান আলাউদ্দিন হলেন প্রথম সুলতান যিনি এঁদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য বা জরুরি প্রয়োজন দেখা দিলে তিনি আইন প্রণয়ন করেন। শাস্ত্রের সমর্থন আছে কিনা তিনি বিচার করেন না। আলাউদ্দিন উলেমাদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের সাহস দেখিয়েছিলেন। তিনি মনে করেন যে উলেমাদের কাজ হলো দুটি—বিচার্য মামলার রায়দান এবং ধর্মীয় ব্যাপারে সালিশী করা। উলেমাদের এক্তিয়ার নির্দিষ্ট করে তিনি কঠোরভাবে তা কার্যকর করার নির্দেশ দেন। তিনি অভিজাত ও উলেমাদের দমন করে সব ক্ষমতা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করেন। পরিস্থিতি অনুযায়ী তিনি রাষ্ট্রনীতি ঠিক করে নিতেন।

মহম্মদ বিন তুঘলক আরও একধাপ এগিয়েছিলেন। তিনি ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর রাষ্ট্রনীতিতে উলেমাদের বিশেষ কোনো ভূমিকা ছিল না। তাঁরা আর সকলের সমপর্যায়ভুক্ত ছিলেন, সেই অনুযায়ী তাঁরা সুলতানের কাছ থেকে ব্যবহার পেতেন। ফিরুজ তুঘলকের ক্ষমতালাভের সঙ্গে সঙ্গে উলেমারা আবার অধিকার ও প্রতিপত্তি ফিরে পেয়েছিল। রাষ্ট্রের কাজকর্মে তাঁরা আবার উপদেশ ও নির্দেশ দিতে থাকে। ইসলামী আইনের গ্রন্থ সংকলন, ধর্মীয় বিদ্যালয় ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন উৎসাহ পেয়েছিল। ইতিমধ্যে দিল্লির সুলতানি রাষ্ট্র সুসংগঠিত রূপ নিয়েছিল, গৌণ ব্যাপার ছাড়া রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে উলেমাদের হস্তক্ষেপ সহ্য করত না। আফগান শাসকরা উলেমাদের প্রতি সশ্রদ্ধ ছিলেন, কিন্তু শাসন ব্যাপারে তাদের মতামতের কোনো মূল্য ছিল না। জনজীবনের ওপর উলেমাদের ধর্মীয় প্রভাব তারা নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির কাজে ব্যবহার করতেন।

ইসলাম ধর্মে মুসলমানদের পালনীয় অনেক নীতি-নিয়ম আছে, এসব সম্পর্কে বিস্তৃত নির্দেশ আছে। উলেমাদের কাজ ছিল ভারতীয় মুসলমানদের আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে যথাযথ নেতৃত্ব দান। একাজে তারা ব্যর্থ হন। মুসলমান সমাজে নৈতিক সদ্‌গুণ ও ধর্মানুরাগের অনুশীলনের পরিবেশ তারা তৈরি করতে পারেননি। বলবন উলেমাদের মধ্যে সত্যনিষ্ঠা ও নৈতিক সাহসের অভাবের কথা উল্লেখ করেন। বুঘরা খান বলেছিলেন যে উলেমারা টাকার লোভে ইচ্ছাকৃতভাবে কোরানের অপব্যাখ্যা করেন। এদের তিনি অর্থগৃধ্নু, প্রবঞ্চক ও ভোগী বলে উল্লেখ করেন। মহম্মদ বিন তুঘলক উলেমাদের সম্পর্কে এধরনের অভিমত পোষণ করতেন। আমীর খসরু লিখেছেন যে উলেমারা ছিলেন ইসলামী শাস্ত্রে অজ্ঞ এবং রাষ্ট্রের কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হবার অযোগ্য। খসরুর মতে, এদের কোনো গুণ বা যোগ্যতা ছিল না। স্বৈরাচারী, প্রজাপীড়ক সুলতানকে সমর্থন করা এদের একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ব্যক্তিগত জীবনে এরা ধর্মীয় অনুশাসন মানত না, নির্ভয়ে এরা একের পর এক পাপ কাজ করে যেত। খসরু এদের আত্মম্ভরিতা, অন্তঃসারশূন্যতা ও ভণ্ডামির কথা উল্লেখ করেছেন। খসরু নিজে উলেমা পরিবারের লোক ছিলেন, উলেমাদের একজন তাদের সম্পর্কে এই কঠোর মন্তব্যগুলি করেছেন। এর মধ্যে অবশ্যই সত্য আছে।

কে. এম. আশরাফ লিখেছেন যে হিন্দুস্তানের শিশু মুসলিম সমাজের পক্ষে উলেমাদের ভূমিকা একেবারে নগণ্য ও নেতিবাচক ছিল না। সুলতানি শাসনের গোড়ার দিকে তাঁরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিলেন। রাজনীতির সংস্পর্শে এসে তাদের ধর্মীয় গোঁড়ামি অনেকখানি দূর হয়েছিল, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতা দূর হয়ে যায়, তাঁরা উদার হতে শিখেছিলেন। তাঁরা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থার তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলেন, তবে সুলতানি স্বৈরাচারকে তাঁরা প্রতিহত করতে পারেননি।

সুলতানকে তাঁরা তাঁর রাজকীয় কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেন। বিদেশে মুসলিম সংস্কৃতি গড়ে তোলার কাজে তাঁদের অবদান অস্বীকার করা যায় না। ভারতের মুসলমান সমাজ ইসলামী সংস্কৃতি থেকে বঞ্চিত হয়নি। তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে তাঁদের রাজনৈতিক উপদেশ রাষ্ট্রকে অনেক সময় বিপথে পরিচালিত করত। বিধর্মী ও ইসলামের অন্যান্য সম্প্রদায় সম্পর্কে তাঁরা অসহিষ্ণুতার পরিচয় দেন। ফিরুজ তুঘলকের মতো শাসকরা উলেমাদের পরামর্শ অনুযায়ী চলে রাষ্ট্রের ভিত্তিকে দুর্বল করে দেন।

কেন্দ্রীয় শাসন ও সামরিক সংগঠন

আব্বাসীয় শাসক, গজনির সুলতান ও সেলজুকদের অনুকরণে ভারতে সুলতানি শাসন কাঠামো গড়ে উঠেছিল। এর ওপর ইরানী শাসন ও ভারতীয় শাসনতন্ত্রের প্রভাব পড়েছিল। পশ্চিম এশিয়া, বিশেষ করে ইরান ও ভারতে, রাজকীয় শাসনের ঐতিহ্য ছিল, রাজাদের মন্ত্রীপরিষদ ছিল। তুর্কি আমলে পুরনো শাসন নতুন নাম নিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। তুর্কিরা ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের স্বার্থে কিছু চিন্তাভাবনা ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে এসেছিল যা ভারতে ছিল না। ইসলামী চিন্তাবিদ্‌দের মতানুযায়ী রাজতন্ত্র ইসলামী প্রতিষ্ঠান নয়, পরিস্থিতির জন্য এই ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল। ইসলামী সরকার প্রধান হবেন ইমাম, তিনি নির্বাচিত হবেন, রাষ্ট্র ও ধর্মের প্রধান হিসেবে কাজ করবেন। আব্বাসীয় খলিফাতন্ত্রের পতনের পর সুলতানদের উদ্ভব হয় এবং এঁরা ছিলেন রাষ্ট্র-প্রধান। কালক্রমে সুলতানের পদ গুরুত্বলাভ করে, মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়। তিনি শাসনব্যবস্থার প্রধান, প্রধান সেনাপতি এবং বিচার বিভাগের প্রধান। তিনি রাষ্ট্র ও সমাজের কেন্দ্রস্থিত শক্তি, তাঁর ছিল জাঁকজমকপূর্ণ রাজসভা। সুলতানি ছিল সম্মানিত পদ, তাঁর হাতে ছিল অজস্র পৃষ্ঠপোষণ, পণ্ডিত, সঙ্গীতজ্ঞ, কবি, দরবেশ সকলে তাঁর দরবারে স্থান পেত। তাঁর বিরাট সম্মান ও ক্ষমতার জন্য তাঁর ওপর দেবত্ব আরোপ করা হতো। ইরানীয় ধারণা অনুযায়ী রাজার শক্তি হলো দৈবানুগৃহীত। বারানি লিখেছেন যে রাজার হৃদয় হলো ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব (the heart of a monarch was a mirror of God)। রাজার মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে, রাজার কাজকর্ম প্রশ্নাতীত। বলবন জিল্লুলাহ্ (shadow of God) উপাধি নেন, দরবারে সিজ্‌দা ও পাইবস প্রথার প্রবর্তন করেন। সুলতানি রাষ্ট্রের দুটি বৈশিষ্ট্য হলো স্বৈরাচার ও শাসকগোষ্ঠী। কোনো শাসকের পক্ষে এককভাবে নিরঙ্কুশ স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না, অনুগামী ও জনগণের সমর্থন তাকে পেতে হয়। ধর্ম প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতার কাজ করে, ধর্ম, নৈতিকতা, প্রথা ইত্যাদির মধ্যে থেকে তাকে শাসন করতে হয়। ধর্ম, নৈতিকতা ইত্যাদি ভঙ্গ করলে জনগণ বিদ্রোহী হতে পারে, উলেমারা

তাদের নেতৃত্ব দিতে পারে। ধর্মশাস্ত্র মেনে চললে সুলতান স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন। অনেকে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু ধর্মের প্রভাব তারা অস্বীকার করতে পারেননি।

পশ্চিমী রাষ্ট্রব্যবস্থায় বংশানুক্রমিক অভিজাততন্ত্র রাজতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করত। চার্চ ও অভিজাতদের জন্য রাজা পূর্ণ স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন না। তুর্কিদের এধরনের বংশানুক্রমিক অভিজাত সম্প্রদায় ছিল না। সুলতান অভিজাতদের ইক্‌তা দিতেন, ইক্‌তাদার প্রশাসনিক ও সামরিক কর্তৃত্ব পান। কিন্তু ভূমিতে তাঁর স্থায়ী স্বত্ব তৈরি হতো না, সুলতান ইচ্ছামতো তাঁকে বদলি করতে পারতেন। সুলতানের মৃত্যু হলে ইক্‌তাদারদের পরিবর্তন হতো, রাজবংশের পরিবর্তন ঘটলে ইক্‌তাদারি ব্যবস্থায় ব্যাপকভাবে পরিবর্তন ঘটে যেত। জালালুদ্দিন খল্‌জি পুরনো অভিজাতদের সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে জানতে পারেন যে বলবনের আমলের অভিজাতরা দুর্দশার মধ্যে আছেন। এদের সরকারি পদ বা ইক্‌তা কোনোটাই নেই। ক্রীতদাস ব্যবস্থা সুলতানের শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করত, সুলতান অনুগতদের প্রশাসনের উচ্চপদে বসাতেন। ইলতুৎমিসের মৃত্যুর পর চিহলগনি ও অন্যান্যদের মধ্যে বিরোধ শুরু হলে এই প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অনেকখানি কমে যায়। ফিরুজ তুঘলক এই ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করেন তবে রাজনীতিতে এর ভূমিকা ছিল নেতিবাচক, ইতিবাচক নয়। ব্যক্তিগত ক্রীতদাস ব্যবস্থা টিকে ছিল, কিন্তু এর রাজনৈতিক ভূমিকা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। গোড়ার দিকে এর গুরুত্ব যতখানি ছিল, শেষের দিকে তা ছিল না।

বলবন ও আলাউদ্দিনের মতো সুলতানের বিরাট ব্যক্তিগত ক্ষমতা ছিল। দুটি সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করতে হয়। ইসলামী জগতে বিশ্বজনীন কোনো উত্তরাধিকার আইন ছিল না। একজন শাসক তার উত্তরাধিকারী মনোনীত করতেন, নির্বাচন প্রথা ছিল না। মনোনীত ব্যক্তির ক্ষমতায় আরোহণ নির্ভর করত দুটি বিষয়ের ওপর—অভিজাতদের সমর্থন ও সামরিক শক্তি। জ্যেষ্ঠপুত্রের উত্তরাধিকার আইন ছিল না, সুলতান একজনকে মনোনীত করলেও উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা রয়ে যেত। অনেকক্ষেত্রে দেখা যেত রাজপুত্রদের দাবি নস্যাৎ করে শক্তিশালী অভিজাত ক্ষমতা দখল করেছেন, অন্যান্য অভিজাতরা তা মেনে নিতেন। এরকম ঘটনা ঘটলে রাজতন্ত্র তার মহিমা ও মর্যাদা হারাত। তবে তুর্কিদের ইতিহাস থেকে বলা যায় উত্তরাধিকার সমস্যা তুর্কি শাসনকে দুর্বল করে দেয়নি, কারণ দুর্বল শাসক অল্পকাল পরে শক্তিশালী শাসকের কাছে পরাস্ত হতেন। রাজতন্ত্রের দ্বিতীয় সীমাবদ্ধতা হলো অভিজাততন্ত্রের সঙ্গে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। বলবন যখন ক্ষমতা দখল করেন এই দ্বন্দ্ব প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। বিশেষ কারণে মহম্মদ বিন তুঘলকের অভিজাতরা বিদ্রোহ করেছিল। এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও রাজতন্ত্র ছিল সুলতানি যুগে ক্ষমতা ও শাসনের উৎস।

শাসনের ক্ষেত্রে সুলতানকে সাহায্য করতেন মন্ত্রীরা। সরকারি মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল না। বুঘরা খান তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন যে শাসনের জন্য একজন পরামর্শদাতার ওপর নির্ভর করা ঠিক হবে না। বারানির লেখা থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়। বারানি চারটি বিভাগ এবং চারজন মন্ত্রণাদাতার কথা উল্লেখ করেছেন, সম্ভবত সরকারি বিভাগের সংখ্যা বেশি ছিল। পছন্দমতো সুলতান একজন পরামর্শদাতার ওপর নির্ভর করতেন, মন্ত্রীদের বাইরে কারো সঙ্গে পরামর্শ করার প্রথা ছিল। বলবন ও আলাউদ্দিনের প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন দিল্লির কোতোয়াল ফকরুদ্দিন। মন্ত্রীরা মন্ত্রীসভা গঠন করত না, যৌথ দায়িত্বের ধারণা ছিল না। সুলতান স্বতন্ত্রভাবে মন্ত্রীদের নিযুক্ত করতেন এবং সুলতানের ইচ্ছার ওপর তাঁদের স্থায়িত্ব নির্ভর করত। উজির ছিলেন সুলতানের প্রধান পরামর্শদাতা, তিনি সমগ্র প্রশাসনের তদারকি করতেন কিন্তু তাঁর দায়িত্ব ছিল অর্থদপ্তরের। নিজামুল মুলক তুসির *সিয়াসতনামায়* বলা হয়েছে যে উজির হবেন একজন বুদ্ধিজীবী, অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তি। সুলতান রাষ্ট্রের সব বিষয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন। তিনি একজন বিচক্ষণ, কৌশলী ব্যক্তি হবেন, অভিজাতদের ক্ষুণ্ণ না করে তিনি তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করবেন।

শক্তিশালী উজির শুধু শাসন পরিচালনা করতেন না, যুদ্ধে তিনি সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করতেন। সুলতানি রাষ্ট্রের চরিত্র ছিল সামরিক, এজন্য উজিরকে সমর বিশারদ হতে হতো। শক্তিশালী সুলতান ক্ষমতায় থাকলে তিনি শুধু সেইটুকু ক্ষমতা পেতেন যেটুকু সুলতান তাকে দিতেন (under a powerful ruler, the Wazir exercised such power as the ruler allowed)। মুসলিম চিন্তানায়করা জানাচ্ছেন যে উজির ছিল দুই শ্রেণীর—উজির ই তাফ্‌বিজ (Wazir-i-Tafwiz) এবং উজির-ই-তানফিজ (Wazir-i-Tanfiz)। উজির-ই-তাফ্‌বিজ সীমাহীন ক্ষমতা ভোগ করতেন, শুধু তিনি নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করতে পারতেন না। উজির-ই-তানফিজ শুধু সেটুকু ক্ষমতা পেতেন যেটুকু সুলতান তাঁকে দিতেন। এতে কিন্তু সুলতানের সমস্যার সমাধান হয়নি। সুলতানদের পছন্দ ছিল এমন উজির যিনি দৈনন্দিন শাসনের ভার নেবেন, কিন্তু তাঁকে সরানোর মতো শক্তিধর হবেন না। এই সমস্যার সমাধানের জন্য অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছিল। মাঝে মাঝে উজির পদ শূন্য রেখে দেওয়া হতো, তাঁর কাজ একাধিক মন্ত্রীর মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হতো। নতুন বিভাগ গঠন করে উজিরকে ক্ষমতাহীন করে রাখা হতো। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত এই পরীক্ষাপর্ব চলেছিল, তুঘলকদের আমলে উজির তাঁর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ফিরে পান।

ইলতুৎমিসের উজির ছিলেন ফকরুদ্দিন ইসামী। তিনি বাগদাদে ত্রিশ বছর উচ্চপদে ছিলেন, তাঁর উত্তরাধিকারী হলেন মহম্মদ জুনাইদি, তাঁর উপাধি ছিল নিজাম-উল-

মুল্‌ক। জুনাইদি ছিলেন একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি, রাজিয়ার বিরোধিতা করে তিনি উচ্চপদ ও জীবন দুই-ই খুইয়েছিলেন। রাজিয়ার মৃত্যুর পর মুহাজজাব ঘানাবি অল্পকালের জন্য ক্ষমতা লাভ করেন, বলবন ক্ষমতা অধিকার করলে তাঁর পতন ঘটে। শক্তিশালী অভিজাত হিসেবে বলবন 'নায়েব-উস-সুলতানাত' পদটি পান। এই পদটি ছিল উজিরের ওপরে, বলবন সুলতান হয়ে নায়েবের পদটি তুলে দেন। বলবনের ব্যক্তিত্ব এত প্রখর ছিল যে কোনো শক্তিশালী উজির তৈরি হয়নি। বলবনের উজির ছিলেন খাজা হাসান, তিনি রাজস্ব বিষয়টি ভালো বুঝতেন না। বলবন তাঁর প্রিয়পাত্র আহম্মদ আয়াজকে 'আরিজ-ই-মামালিক' নিযুক্ত করেন। তিনি সৈন্যবাহিনীর বেতন ও শিক্ষার তদারকি করতেন, উজিরের ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছিল। বলবন একজন ডেপুটি উজির নিযুক্ত করেন। আলাউদ্দিনের শাসনের শেষ অবধি উজিরের পদ শক্তিশালী ছিল না। জালালুদ্দিন রাজস্ব-বিশেষজ্ঞ খাজা খতিরকে তাঁর উজির নিযুক্ত করেন। অল্পকাল তিনি আলাউদ্দিনের অধীনে উজির হিসেবে কাজ করেন। আলাউদ্দিন তাঁর ভ্রাতা নসরত খানকে উজির নিযুক্ত করেন, নসরত খানের মৃত্যুর পর উজির পদ পান সেনাপতি মালিক কাফুর। মালিক কাফুর 'নায়েব-উস-সুলতানাত' ও উজির পদ দুটোই নিজের অধীনে রেখেছিলেন। আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর মালিক কাফুর সুলতান নির্বাচন করতেন, তাঁকে সরিয়ে খসরু মালিক ক্ষমতা হস্তগত করেন। তিনি প্রথমে হন নায়েব এবং পরে সুলতান।

তুঘলকরা ক্ষমতা দখল করে নায়েব পদ তুলে দেন। পঞ্চদশ শতকে সৈয়দ শাসকরা এই পদটি 'উকিল-উস-সুলতানাত' নামে ফিরিয়ে আনেন, মুঘলদের আগমন পর্যন্ত পদটি চলেছিল। তুঘলক যুগে উজিরের পদটি সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছিল। মহম্মদ বিন তুঘলক আহম্মদ আয়াজকে খান-ই-জাহান উপাধি দিয়ে উজির পদে বসান। তিনি ছিলেন একজন বয়স্ক ব্যক্তি, গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের রাজত্বকালে তিনি জন-পরিষেবা বিভাগের ডেপুটি ছিলেন। তিনি দক্ষ ও কঠোর প্রকৃতির শাসক ছিলেন। সুলতানের অনুপস্থিতির সময়ে তিনি ছিলেন প্রধান প্রশাসক। মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে তিনি দীর্ঘ আটাশ বছর উজির ছিলেন কিন্তু রাষ্ট্রনীতির ওপর তাঁর প্রভাব কতখানি ছিল সঠিক বলা যায় না। তাঁর নিজস্ব সমর্থক গোষ্ঠী ছিল না, এজন্য মহম্মদ বিন তুঘলকের মৃত্যুর পর তিনি নিজের মনোনীত প্রার্থীকে সিংহাসনে বসাতে পারেননি। ফিরুজ তুঘলক একজন ধর্মান্তরিত ব্রাহ্মণকে উজির পদে নিযুক্ত করেন। খান-ই-জাহান মকবুল ডেপুটি উজির থেকে উজির হন। তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ প্রশাসক এবং সুলতান শাসন ব্যাপারে তাঁর ওপর নির্ভর করতেন। সুলতানের অনুপস্থিতির সময়ে প্রশাসনিক সব কাজ তিনি সমাধা করতেন। তবে সুলতান ফিরুজ শাসন ব্যাপারে মন দিতেন না একথা ঠিক নয়। উজির ও প্রধান হিসাব পরীক্ষক আইন-ই-মাহরুর

মধ্যে বিরোধ বাধলে ফিরুজ হস্তক্ষেপ করে বিরোধ মিটিয়ে দেন। মকবুল সুলতানের আস্থা অর্জন করেন, তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিকেন্দ্র গঠনের প্রয়াস চালাননি। আঠারো বছর উজির হিসেবে কাজ করার পর খান-ই-জাহান মারা যান। তাঁর পুত্র জৌনা খান উজির হন, তিনিও পিতার মতো দক্ষ শাসক ছিলেন। তবে তাঁর সামরিক দক্ষতা কম ছিল, এজন্য উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব শুরু হলে তিনি পরাস্ত হন।

তুঘলকদের শাসনকালে উজির পদের শুধু সম্মান বাড়েনি, তাঁদের বেতনবৃদ্ধি ঘটেছিল। মহম্মদ বিন তুঘলকের শাসনকালে একজন অভিজাত বার্ষিক কয়েক লক্ষ টাকা পেতেন। খান-ই-জাহান যে বেতন পেতেন তা ছিল সমগ্র ইরাকের আয়ের সমান। ফিরুজ তুঘলকের উজির খান-ই-জাহান মকবুল বার্ষিক তের লক্ষ টাকা ও অন্যান্য ভাতা পেতেন। উজিরের বিভাগের দুটি দিক ছিল—আয় ও ব্যয়। মুসরিফ ছিলেন ব্যয় বিভাগের অধ্যক্ষ, মুস্তাফি ছিলেন আয় বিভাগের প্রধান। ইলতুৎমিস এইসব পদ বজায় রেখেছিলেন। উজিরের কর্মভার লাঘব করার জন্য তিনি ডেপুটি উজিরের পদ তৈরি করেন। বলবন 'আরিজ-ই-মামালিক' নামে যুদ্ধ বিভাগের সৃষ্টি করেন, এতে দেওয়ান-ই-উজিরাতের বেসামরিক চরিত্র স্পষ্ট হয়ে যায়। তবে উজির সমগ্র বেসামরিক শাসনের প্রধান ছিলেন না। প্রয়োজন হলে উজিরকে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করতে হতো। ধর্মীয় ও বিচার বিভাগীয় কাজ ছাড়া আর সব কর্মচারীকে সামরিক ও বেসমারিক সব কাজ করতে হতো। আলাউদ্দিন খল্‌জি দোয়াব অঞ্চলে সরাসরি রাজস্ব ধার্য ও সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। এজন্য তাঁর বহু আমিন, মুতাশরিফ প্রভৃতি রাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারীর প্রয়োজন হয়। এঁদের নিয়ন্ত্রণের জন্য তিনি নতুন বিভাগ দেওয়ান-ই-মুস্তাখারাজ গঠন করেন। এই বিভাগের কাজকর্ম এত কঠোর ছিল যে এর দুর্নাম হয়ে যায়। আলাউদ্দিনের পর তুঘলকরা এই বিভাগের কর্মচারীদের কৃষি উন্নতির কাজে লাগিয়েছিলেন, এর নতুন নাম হলো 'দেওয়ান-ই-কোহি'। ফিরুজ রাজস্ব বিভাগের আরো পরিবর্তন করেন। মুসরিফ ও মুস্তাফির কাজ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়, সুলতান এদের নিযুক্ত করতেন, তবে তারা উজিরের অধীনে ছিল। উজির এই ধরনের 'নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের ব্যবস্থা' (checks and balance) পছন্দ করেননি। সুলতানকে মাঝে মাঝে মধ্যস্থ করতে হতো। ফিরুজ ক্রীতদাসদের জন্য একটি পৃথক বিভাগ গঠন করেন। সুলতানের 'ইমলাক' নামে একটি স্বতন্ত্র আয় বিভাগ ছিল।

বারানি যে চারটি বিভাগের কথা উল্লেখ করেছেন তার একটি হলো দেওয়ান-ই-ইন্‌শা। এটি পররাষ্ট্র বিভাগ নয়। সেযুগে বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, সেজন্য স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল না। উজির পার্শ্ববর্তী দেশগুলির পরিস্থিতি সম্পর্কে সুলতানকে অবহিত রাখতেন। উজির পত্র মারফত পার্শ্ববর্তী দেশগুলিকে তাঁর দেশের নতুন ঘটনা জানাতেন। সুলতানের সিংহাসনারোহণ, যুদ্ধ জয় ইত্যাদি

পাশের দেশের রাজাদের জানানো হতো। খুব সুন্দর করে এই চিঠিগুলি লেখা হতো। এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অফিসার ছিলেন দবির বা দবির-ই-খাস। দবির ইক্‌তাদারদের ও রাজাদের চিঠি পাঠাতেন। এই বিভাগটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই বিভাগের প্রধান সুলতানের কাছের মানুষ হতেন। দবির পরবর্তীকালে উজিরের পদে উন্নীত হতেন। বারানি দেওয়ান-ই-রিসালত-এর কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু এই বিভাগের কার্যাবলীর পরিচয় দেননি। আধুনিক ঐতিহাসিকরা এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন—পররাষ্ট্র বিভাগ, দ্রব্যমূল্য ও নৈতিক কাজকর্ম তদারকি বিভাগ ও জনগণের অভাব-অভিযোগ বিচারকারী বিভাগ। সম্ভবত রসুল থেকে রিসালত বিভাগের নামের উৎপত্তি হয়েছে। এজন্য অনেকে মনে করেন এই দপ্তর ধর্মীয় কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিল। সুলতানি রাজ্য পণ্ডিত, দরবেশ, ছাত্র প্রভৃতিকে নিষ্কর ভূমি দান করত (ইমলাক)। এই বিভাগের প্রধানকে বলা হতো সদর-ই-জাহান, ভকিল-ই-দার বা রসুল-ই-দার। সদর-ই-জাহান ছাড়া অন্য গুরুত্বপূর্ণ পদ হলো প্রধান কাজী (কাজী-উল-কাজজাত)। সদর-ই-জাহান ও প্রধান কাজীর পদ অনেক সময় একই ব্যক্তি পেতেন। সদর-ই-জাহান ভাতা ও নিষ্কর ভূমিদান ছাড়াও মুহতাসিব নিযুক্ত করতেন। এঁদের কাজ ছিল জনগণের নৈতিক মান বজায় রাখা। এঁরা জুয়া, পতিতাবৃত্তি ও অন্যান্য অপরাধমূলক কাজ নিয়ন্ত্রণ করত। এরা মুসলমানদের শরিয়ত বিরোধী কাজকর্মে বাধা দিত, রোজা, নামাজ ইত্যাদি পালনে উৎসাহ দিত। এই বিভাগ বাজারের পরিমাপ ও ওজনের ওপর নজর রাখত, দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার চেষ্টা করত।

দেওয়ান-ই-রিসালত-এর অধীনে ছিল এইসব বিভাগ। আলাউদ্দিন এই বিভাগের অধীনে শাহনা নামক কর্মচারীদের নিয়োগ করেন, একজন আমীর এই বিভাগ পরিচালনা করতেন। একে দেওয়ানি রিসালত বলা হতো। আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর এই বিভাগের কথা আর শোনা যায় না। ফিরুজ ধর্মভীরু শাসক ছিলেন, তিনি ছাত্র ও শিক্ষকদের ভাতা বৃদ্ধি করেন। কিন্তু শরিয়তের নির্দেশমতো তিনি অঙ্গচ্ছেদের বিরোধিতা করেন। তিনি দয়ালু ও মানবতাবাদী শাসক ছিলেন, তিনি সদর ও প্রধান কাজীর পদ দুটি পৃথক করে দেন। তিনি জনগণের অভাব-অভিযোগ শোনার জন্য একটি পৃথক বিভাগ গঠন করে নাম দেন দেওয়ান-ই-রিসালত। ভকিল-ই-দার এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। রাজপুত্র ও উচ্চপদস্থরা এই বিভাগের কাছে অভিযোগ জানাতে পারত। বিভিন্ন শাসকের অধীনে দেওয়ান-ই-রিসালত-এর ছিল বিভিন্ন রূপ। এই বিভাগের একটি কাজ স্থায়ী রূপ পেয়েছিল—এই বিভাগ সব সময় নিষ্কর জমি, ভাতা, পেনশন ইত্যাদি দানের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

সুলতানের দেওয়ান-ই-আরজ্ নামে প্রতিরক্ষা বিভাগ ছিল। এই বিভাগের মন্ত্রীর কাজ ছিল সৈন্য সংগ্রহ, শিক্ষাদান ও বেতনদান। এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী প্রধান

সেনাপতি ছিলেন না, সুলতান স্বয়ং ছিলেন প্রধান সেনাপতি। তবে আরিজ হতেন একজন প্রভাবশালী অভিজাত এবং অভিজ্ঞ যোদ্ধা, তিনি সৈন্যদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করতেন। আব্বাসীয় খলিফাদের আরিজ ছিল, *সিয়াসতনামায়* এই পদের উল্লেখ আছে। ইলতুৎমিসের সময় থেকে এই পদ চালু হয়েছিল। আহম্মদ আয়াজ রাবাত-ই-আরজ বলবনের যুদ্ধমন্ত্রী ছিলেন। ইলতুৎমিসের বংশধরদের আমলে তিনি এই পদে ছিলেন। বলবন উজিরের চেয়ে এই পদটিকে অধিক গুরুত্ব দেন। আহম্মদ আয়াজ ঘোষণা করেন যে তিনি হলেন শাসনের প্রকৃত রক্ষক। আলাউদ্দিন এই বিভাগটিকে সুগঠিত রূপ দেন। তিনি অশ্বারোহী বাহিনীর ওপর জোর দেন, 'দাগ' ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। ঘোড়ার বাজারে নির্দিষ্ট মূল্য ধার্য করে দেন। সৈন্যদের জন্য তিনি 'হুলিয়া' ব্যবস্থা (চেহরা) প্রবর্তন করেন, সৈন্যদের সব পরিচয় নথিবদ্ধ করে রাখা হয়। ফিরুজ তুঘলকের শাসন পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চলেছিল। তবে সৈন্যবাহিনীতে দুর্নীতি একেবারেই ছিল না একথা বলা যাবে না। বারানি ফিরুজ তুঘলকের রাজত্বকালের একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। সুলতান তাঁর এক অশ্বারোহী সৈনিককে একটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে বলেছিলেন যে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে উৎকোচ দিয়ে তার নিম্নমানের অশ্বটিকে যেন অনুমোদন করে নেয়।

আরিজের পদ যতদিন ছিল না মীর হাজিব (অশ্বশালার প্রধান) এবং দারোগা-ই-পিল (হাতিশালার প্রধান) ছিল গুরুত্বপূর্ণ পদ। পরে এই দুটি পদের কথা আর শোনা যায় না। ঠিক কিভাবে সৈন্য সংগ্রহ করা হতো বা কি ধরনের শিক্ষা দেওয়া হতো নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। ইবন বতুতা মহম্মদ বিন তুঘলকের সময়কার সৈন্য সংগ্রহ পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন। অশ্বারোহী, তীরন্দাজ, পদাতিকদের নৈপুণ্য পরীক্ষা করে সৈন্যবাহিনীতে গ্রহণ করা হতো। নিয়োগের পরও সৈনিকদের নিয়মিতভাবে শিক্ষাদানের কাজ চলত। সুলতানের অধীনে ছিল কেন্দ্রীয় সৈন্যবাহিনী, সুলতানের দেহরক্ষী বাহিনী ছিল এর অঙ্গ। আলাউদ্দিনের তিন লক্ষ এবং মহম্মদ বিন তুঘলকের প্রায় পাঁচ লক্ষ সৈন্য ছিল। এই সৈন্যদের সকলে দিল্লিতে থাকত না। বড় ইক্‌তাদাররা নিজেদের সৈন্য সংগ্রহ করতেন, প্রধানদের নিজস্ব সৈন্য ছিল। সুলতানের প্রয়োজন হলে এরা তার বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হতো। বলবন বাংলা আক্রমণকালে পূর্ব-উত্তর প্রদেশের প্রধানদের সৈন্যবাহিনীর সাহায্য নেন, নিজে দুলক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করেন। মোঙ্গল আক্রমণের পর পশ্চিম এশিয়া থেকে সৈন্যদের আগমন বন্ধ হয়েছিল। তুর্কি শাসকরা ভারতীয় মুসলমান ও আফগানদের সৈন্যবাহিনীতে গ্রহণ করেন। সুলতানদের সৈন্যবাহিনীতে ছিল তুর্কি, অতুর্কি, হিন্দুস্তানি মুসলমান, আফগান ও হিন্দুরা। এই বিশাল সৈন্যবাহিনীর বেতনদান সেযুগে খুব সহজ কাজ ছিল না। তুর্কিরা ভূমি রাজস্ব ছাড়াও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল লুঠ করে অর্থসংগ্রহ করত। হিন্দু রাজাদের বিরুদ্ধে জেহাদ

হতো। আলাউদ্দিন সৈন্যদের নগদ বেতন দিতেন, আলাউদ্দিন একজন অশ্বারোহীকে বার্ষিক ২৩৮ টাকা বেতন দিতেন। পরবর্তীকালে বেতনের হ্রাস-বৃদ্ধি কেমন ছিল বলা যায় না। সৈন্যবাহিনীর শক্তি ও দক্ষতা সুলতানি রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করত। আরিজ ছিলেন সবচেয়ে শক্তিশালী মন্ত্রী, উজিরের ক্ষমতা তাঁর কাছে ম্লান হয়ে যেত। এজন্য উজিররা শক্তিশালী সামরিক নেতা হতে পারতেন না, নিজেদের পছন্দমতো রাজপুত্রকে সিংহাসনে বসাতে পারতেন না। এই স্থিতিশীল শাসনব্যবস্থা ভেঙে যায় রাজপরিবারে দ্বন্দ্ব শুরু হলে। ফিরুজের মৃত্যুর পর এরকম পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। তৈমুরের আক্রমণ সুলতানি শাসনকে অবশ্যই দুর্বল করে দিয়েছিল।

সুলতান ছিলেন ক্ষমতার কেন্দ্র, তাঁর দরবার ও প্রাসাদ ছিল শাসনের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। মুঘলদের মতো একজন অফিসার দরবার ও প্রাসাদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করত না। ভকিল-ই-দার ছিলেন প্রাসাদের তত্ত্বাবধায়ক। সুলতানের ব্যক্তিগত কর্মচারীদের বেতন, পানশালা, অশ্বশালার কর্মচারীদের বেতনদান ছিল তাঁর কাজ। রাজপুত্রদের লেখাপড়া শেখানোর দায়িত্ব ছিল তাঁর। দরবারের সভাসদ্, রাজপুত্র এমনকি রানীরাও অনেক সময় তাঁর দ্বারস্থ হতেন। এই পদটি নানাদিক দিয়ে ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ। একজন অভিজাত ব্যক্তিকে এই পদটি দেওয়া হতো। আমীর হাজিব ছিল এধরনের আরো একটি প্রধান পদ, তাকে বারবেকও বলা হতো। তিনি ছিলেন রাজদরবারে আদবকায়দা তত্ত্বাবধানের ভারপ্রাপ্ত অফিসার। পদমর্যাদা অনুযায়ী অভিজাতদের তিনি রাজসভায় বসার ব্যবস্থা করতেন। তাঁর অধীনস্থ হাজিবদের মাধ্যমে সুলতানের কাছে আবেদনপত্রগুলি পেশ করা হতো। এই পদটি এমন স্পর্শকাতর ছিল অনেক সময় রাজপুত্রদের এই পদে নিযুক্ত করা হতো। সুলতানের নিজস্ব কর্মচারীদের মধ্যে ছিল বারিদ-ই-খাস—গুপ্তচর বিভাগের প্রধান। সারাদেশে বারিদ বা গুপ্তচররা ছিল, এরা সারা দেশে কি ঘটছে তা সুলতানকে জানাত। বলবন ও আলাউদ্দিন খল্‌জি এদের মাধ্যমে দেশের সংবাদ সংগ্রহ করতেন। সুলতানের শিকার-প্রধান, মজলিশ-প্রধান নামের অফিসাররা ছিলেন। সুলতানের কারখানাগুলি দেখাশোনার জন্য একটি দপ্তর ছিল। জনসেবামূলক কাজের তত্ত্বাবধানের জন্য (public works) স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল। সুলতান ও প্রাসাদের প্রয়োজনীয় পণ্য এসব কারখানায় উৎপন্ন হতো। ফিরুজের ক্রীতদাসরা এসব রাজকীয় কারখানায় কাজ পেত, দামি পশম ও রেশমের বস্ত্র তৈরি হতো। একজন অভিজাত তাঁর অধীনস্থদের নিয়ে সরকারি কারখানাগুলির তত্ত্বাবধান করতেন। দেওয়ানি আমিরাত ছিল জনকল্যাণ বিভাগ, আলাউদ্দিন এই বিভাগটিকে গুরুত্ব দেন। নির্মাণকার্যে ফিরুজ ছিলেন সুলতানি যুগে অতুলনীয়, অসংখ্য অট্টালিকা, স্মৃতিসৌধ, মসজিদ, শহর ইত্যাদি তিনি নির্মাণ করেন। ফিরুজ মালিক গাজির নেতৃত্বে মীর-ই-ইমারত নামে নতুন বিভাগ স্থাপন করেন।

সুলতানি যুগের গোড়ার দিকে শাসন ছিল অনেকটা সামরিক ধাঁচের। সেনাপতিরা অঞ্চলগুলি শাসন করতেন, রাজস্ব আদায় করতেন, হিন্দু রাজাদের সঙ্গে লড়াই করতেন। সারা দেশজুড়ে বেসামরিক শাসন কাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীকালে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়, খল্‌জি শাসন থেকে নতুন ধারার সূচনা হয়েছিল। খল্‌জিদের সময়ে ওয়ালি ও মুক্‌তিরা ছিলেন ইক্‌তা বা বিলায়েতের শাসক। এগুলি আধুনিককালের প্রদেশের সমতুল্য, শাসকরা হলেন গভর্নর। পরিস্থিতি অনুযায়ী ইক্‌তাদারের ক্ষমতার হেরফের হতো। লক্ষ্মণাবতীর গভর্নর ছিলেন প্রায় স্বাধীন, একাধিকবার তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, তাকে দমনের জন্য সৈন্যবাহিনী পাঠাতে হয়। কেন্দ্রীয় শাসন গড়ে উঠলে প্রদেশগুলি স্বতন্ত্রভাবে শাসনের ব্যবস্থা হয়। মুক্‌তি ইক্‌তা শাসনের অধিকার পান, সৈন্যবাহিনী গঠন করেন, সুলতানের প্রয়োজনে তা সরবরাহ করেন। তিনি রাজস্ব সংগ্রহ করে নিজের ব্যয় মেটান, সৈন্যবাহিনীর ব্যয় নির্বাহ করেন, বাকি অর্থ কেন্দ্রীয় রাজকোষে পাঠিয়ে দেন। নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ তাঁকে সুলতানের কোষাগারে দিতে হতো না। কেন্দ্রীয় হিসাবরক্ষকরা ইক্‌তার আয় ও ব্যয়ের হিসেব তৈরি করতেন, আলাউদ্দিন কঠোরভাবে এই হিসেব পরীক্ষার কাজ করতেন। আলাউদ্দিনের খালসা জমিতে যেভাবে রাজস্ব ধার্য হতো ইক্‌তাতে সেভাবে রাজস্ব নির্ধারণের নির্দেশ দেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ বাড়লে মুক্‌তির ওপর নিয়ন্ত্রণ বেড়েছিল। নায়েব দেওয়ান (খাজা) প্রদেশগুলিতে পাঠানো হয়, এরা হিসেব পরীক্ষকের কাজ করত। প্রদেশগুলিতে বারিদরা থাকতেন, তাঁরা সুলতানকে প্রদেশের সংবাদ পাঠাতেন। মুক্‌তির নিজের সৈন্যবাহিনী ছিল, তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তিনি দিল্লীতে একজন নায়েব-আরিজ বা সামরিক প্রতিনিধি রাখতেন। সম্ভবত ইক্‌তার কাজীদের সুলতান নিযুক্ত করতেন। কাজী ও গভর্নরদের বিরুদ্ধে সুলতানের কাছে আপিল করা যেত। ইক্‌তার মালিকরা নিষ্কর ভূমিদানের অধিকারী ছিলেন। মহম্মদ বিন তুঘলক কয়েকজনকে প্রদেশ থেকে রাজস্ব আদায়ের অধিকার দেন (revenue farming)। এর ফলে প্রদেশের রাজস্ব ব্যবস্থার ওপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়েছিল। এইসব ইজারাদাররা কেন্দ্রের জন্য সৈন্যবাহিনী গঠন করত না, এই কাজ একজন অফিসারের অধীনে স্থাপন করা হয়। ফিরুজ এই দ্বৈতব্যবস্থা তুলে দেন। বারানি জানিয়েছেন যে দক্ষিণাঞ্চল বাদ দিয়ে সুলতানি রাজ্যে বিশটি প্রদেশ ছিল। আকবরের সুবার সঙ্গে তুলনায় এগুলি অবশ্যই আয়তনে ছোট ছিল। উত্তরপ্রদেশে ছিল তিনটি প্রদেশ—মীরাট, বরন ও কোয়েল। উত্তর-পশ্চিমে আরও তিনটি প্রদেশ ছিল। মহম্মদ বিন তুঘলক মুঘলদের মতো প্রদেশ গঠন করেন। একজন আরব লেখকের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর সময়ে দেশে চব্বিশটি প্রদেশ ছিল। সুলতানি যুগে ডিভিশন বা জেলা

ছিল কিনা সঠিকভাবে জানা যায় না। লোদি ও শূরদের আমলে ভারতে শিক ও সরকার ছিল, সম্ভবত এগুলি ছিল প্রশাসনিক স্তর। পরগণা, সাদি ও চৌরাশির কথা জানা যায়, অনেকগুলি গ্রাম নিয়ে এগুলি গঠন করা হতো। সম্ভবত এসব স্তরে চৌধুরী ও আমিলরা রাজস্ব সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত ছিল, খুত ও মুকাদ্দমদের কথা জানা যায়। প্রথমজন ছিলেন ছোট জমিদার, দ্বিতীয়জন গ্রাম প্রধান, গ্রামে হিসেবরক্ষক পাটোয়ারিরা ছিলেন। এভাবে সুলতানি যুগে কেন্দ্র থেকে গ্রাম পর্যন্ত শাসন কাঠামো গড়ে উঠেছিল, কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা ছিল। কেন্দ্রীয় শাসন শক্তিশালী হলে প্রদেশ এবং নিম্নস্তরে কর্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা হয়েছিল, গ্রামের প্রধানদের ক্ষমতা কমেছিল। কেন্দ্রের সঙ্গে স্থানীয় শাসনের সংঘাত শুরু হয়েছিল, সুলতানি শাসনের শেষ অবধি তা চলেছিল।

ইক্‌তা ব্যবস্থা

ডব্লিউ. এইচ. মোরল্যান্ড লিখেছেন যে সুলতানি যুগে ছোট বা বড় ভূমিখণ্ড থেকে ভূমি রাজস্ব আদায়ের অধিকার হলো ইক্‌তা (territorial assignment)। এর বিনিময়ে ইক্‌তার অধিকারী মুক্‌তিকে (Muqti) সামরিক দায়িত্ব পালন করতে হতো।[১] সুলতানি যুগে কর-ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষকের উদ্বৃত্তের একাংশ সংগ্রহের ব্যবস্থা হয়। কৃষকের কাছ থেকে উদ্বৃত্ত আহরণের জন্য একটি কাঠামোর দরকার হয়, শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই উদ্বৃত্ত বণ্টনের ব্যবস্থা করতে হয়। উদ্বৃত্ত আহরণ ও বণ্টনের জন্য একটি সরকারি যন্ত্রের প্রয়োজন হয়, এই যন্ত্রের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ হলো ইক্‌তা। সুলতানি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাঠামোর কোনো ক্ষতি না করে ইক্‌তার মাধ্যমে কর সংগ্রহ ও বণ্টনের ব্যবস্থা হয়। ইক্‌তা হলো ভূমিরাজস্বের বন্দোবস্ত এবং ইক্‌তার অধিকারী হলেন মুক্‌তি। দ্বাদশ শতকের একজন রাষ্ট্রনেতা আদর্শ ইক্‌তা ব্যবস্থার নিম্নলিখিত বর্ণনা দিয়েছেন—'ইক্‌তা'র মালিক মুক্‌তি তাঁর অধীনস্থ কৃষক বা রায়তের কাছ থেকে নির্ধারিত 'মাল' বা ভূমিরাজস্ব আদায় করবেন। কৃষকের ওপর তাঁর কোনো অধিকার নেই। কৃষকের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের পর তার স্ত্রী, পুত্র, সম্পত্তি ও পণ্যের ওপর মুক্‌তির কোনো অধিকার থাকে না। কৃষকের ওপর মুক্‌তির অন্য কোনো অধিকার নেই। প্রজা বা কৃষক প্রয়োজনবোধ করলে সুলতানের দরবারে এসে তাঁদের অবস্থা জানাতে পারে। মুক্‌তি তাদের বাধা দিতে পারেন না। মুক্‌তি ইক্‌তার নিয়মবিধি ভঙ্গ করলে সুলতান তাঁর ইক্‌তা অধিগ্রহণ করতে পারেন, তাঁকে শাস্তি দিতে পারেন। এভাবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সুলতান অন্যদের নিরুৎসাহিত করেন। মুক্‌তির মনে রাখা

১. মোরল্যান্ড, *দ্য এগ্রারিয়ান সিস্টেম অব মোসলেম ইন্ডিয়া*, পৃ. ৩৩।

উচিত দেশ ও প্রজা (রায়ত) হলো সুলতানের। মুক্তি তাদের দেখাশোনার ভারপ্রাপ্ত হয়েছেন মাত্র'।[২]

সমকালীন রাষ্ট্রনেতা নিজাম-উল-মুল্‌ক ইক্‌তা ব্যবস্থার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। সুলতান হলেন ইক্‌তার মালিক, তিনি খুশীমতো ইক্‌তা দেন, ইক্‌তার অধিকারী ততদিন ইক্‌তা ভোগ করেন যতদিন সুলতান তা চান। মুক্‌তি ইক্‌তার কর আদায় ও ভোগের অধিকারী, তবে এসব সুলতানের প্রাপ্য। ইক্‌তার রাজস্ব ভোগ করার জন্য ইক্‌তার অধিকারীকে কয়েকটি অবশ্য পালনীয় শর্ত পালন করতে হতো। প্রধান শর্তটি হলো তিনি ইক্‌তার আয় থেকে সৈন্যবাহিনী পোষণ করবেন, সুলতানের প্রয়োজনমতো তা সরবরাহ করবেন। ইক্‌তার রাজস্ব তাকে দেওয়া হয় প্রধানত সৈন্যবাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্য। নিজাম-উল-মুল্‌ক জানিয়েছেন যে ইক্‌তার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের সৈন্যবাহিনী পোষণ ছিল স্বাভাবিক, যদিও আগের দিনে সুলতানরা রাজকোষ থেকে সরাসরি নগদ অর্থ দিয়ে সৈন্য পুষতেন। মুক্‌তির পালনীয় কর্তব্য ছিল প্রধানত দুটি—তিনি কর সংগ্রাহক এবং সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষ ও বেতনদাতা। সুলতানির যে অঞ্চল সুলতানের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ছিল তার নাম খালিসা। এখানে সুলতানের রাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারী আমিলরা সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করত।

দিল্লিতে সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর রাজস্ব ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। সুলতানরা সৈনাধ্যক্ষদের মধ্যে বিজিত অঞ্চল ভাগ করে দিয়েছিলেন। তাঁরা এসব অঞ্চল থেকে লুঠপাট করে বা থোক অর্থ আদায় করে তাঁদের ব্যয় নির্বাহ করতেন। বিজয়ী তুর্কিদের কাছে ইক্‌তা ব্যবস্থা ছিল অতি পরিচিত। সামরিক নেতাদের নাম হলো মুক্‌তি (ইক্‌তাদার) এবং তাদের অধীনস্থ ভূমির নাম ইক্‌তা। মাঝে মাঝে ইক্‌তাকে 'বিলায়েত' এবং মুক্‌তিকে 'ওয়ালি' বলা হয়েছে।[৩] সুলতানি শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে ইক্‌তার চরিত্রে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। যেসব অঞ্চল ছিল স্বশাসিত সেগুলি ক্রমশ স্বশাসনের অধিকার হারিয়ে ইক্‌তায় পরিণত হয়। সুলতান ইলতুৎমিস থেকে শুরু করে দিল্লির সুলতানরা মুক্‌তিদের এক ইক্‌তা থেকে অন্য ইক্‌তায় বদলি করে দিতেন। এজন্য প্রথমদিকে ইক্‌তা ঘিরে কায়েমী স্বার্থ বা বংশানুক্রমিকতা গড়ে উঠতে পারেনি। মুক্‌তিদের ওপর পরিষ্কার নির্দেশ ছিল যে সুলতানের আদেশ পাওয়ামাত্র তাদের সৈন্যবাহিনী নিয়ে হাজির হতে হবে। ইক্‌তা ব্যবস্থার গোড়ার দিকে মুক্‌তিকে

২. তপন রায় চৌধুরী ও ইরফান হাবিব সম্পাদিত, *কেম্ব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৮।
৩. মোরল্যান্ড এ ধরনের বক্তব্য রেখেছেন। দেখুন লেখকের গ্রন্থ *মধ্যযুগে ভারতের অর্থনৈতিক জীবন*।

নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য রাখতে হতো না। সুলতানের কোষাগারে বার্ষিক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা দেওয়ারও কোনো দায় ছিল না। মুক্‌তি তাঁর ইচ্ছামতো তাঁর ইক্‌তার একাংশে অন্য কোনো ব্যক্তিকে পত্তনি দিতে পারতেন। সাধারণত এই পদ্ধতি অনুসরণ করে অনেক ইক্‌তাদার তার অধীনস্থ সৈন্যদের বেতন দিতেন।

সুলতানি যুগের প্রথম থেকে সুলতানরা খালিসা ও ইক্‌তার পার্থক্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। ইলতুৎমিস তাঁর ভাতিগুার খালিসা জমি তত্ত্বাবধানের জন্য একজন বিশ্বস্ত ক্রীতদাসকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। দিল্লি ও দোয়াব সুলতানের খালিসা জমির অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইলতুৎমিস সম্ভবত তাঁর কেন্দ্রীয় অশ্বারোহী বাহিনীর সৈনিকদের ব্যয় নির্বাহের জন্য কয়েকটি গ্রাম নির্দিষ্ট করে দেন। এগুলিও ইক্‌তা নামে পরিচিতি লাভ করে। গিয়াসউদ্দিন বলবন ইক্‌তা ব্যবস্থার মধ্যে অনেক ত্রুটি ও দুর্নীতি লক্ষ করেছিলেন। যেসমস্ত সৈনিক সামরিক দায়িত্ব পালন করত না বা অসমর্থ হয়ে পড়েছিল তিনি তাদের ইক্‌তা কেড়ে নেন। বংশানুক্রমিক নীতি যাতে ইক্‌তা ব্যবস্থার মৌলিক চরিত্র ক্ষুণ্ণ না করে সেদিকে তিনি লক্ষ রেখেছিলেন। বলবনের সংস্কারের ফলে ইক্‌তা ব্যবস্থা শক্তিশালী হয়েছিল, তিনি এ ব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন না। বারানির লেখা থেকে জানা যায় ত্রয়োদশ শতক শেষ হবার আগেই ইক্‌তা ব্যবস্থার চরিত্রে আরো একটি পরিবর্তন ঘটেছিল। সুলতানরা নির্দেশ দেন ইক্‌তার উদ্বৃত্ত রাজস্ব রাজকোষে জমা দিতে হবে (excess amounts)। ইক্‌তার সম্ভাব্য আয় এবং সৈন্যবাহিনীর জন্য ব্যয় হিসেব করা হতো। বলবন ইক্‌তার হিসেব রাখার জন্য মুক্‌তির সঙ্গে একজন করে হিসেবরক্ষক 'খাজা' নিযুক্ত করেন। সরকার জানতে চান ইক্‌তার আয় কত এবং কিভাবে সে অর্থ ব্যয় হয়।

আলাউদ্দিনের শাসনকালে ইক্‌তা ব্যবস্থার গঠন ও চরিত্রে আরও পরিবর্তন ঘটেছিল। সুলতান নতুন নতুন অঞ্চল জয় করে রাষ্ট্রের আয়তন বাড়িয়েছিলেন। আবার সেই সঙ্গে পুরনো অঞ্চলে সমস্ত শ্রেণীর কৃষকের ওপর কর ধার্য ও আদায়ের ব্যবস্থা করেন। সাম্রাজ্যের সম্পদের বিস্তার ইক্‌তা ব্যবস্থায় পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল। ইক্‌তার গঠন সম্পর্কে কয়েকটি ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সুলতান তাঁর অফিসারদের দূরবর্তী অঞ্চলে ইক্‌তা দেন, নিকটবর্তী অঞ্চলগুলি খালিসার অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়। মধ্য দোয়াব ও রোহিলখণ্ড অঞ্চল খালিসার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। সুলতানের নিজস্ব অশ্বারোহী সৈনিকদের বেতনের পরিবর্তে ইক্‌তা দানের ব্যবস্থা বাতিল হয়ে যায়। খালিসা থেকে সমস্ত আয় রাজকোষে জমা হয় এবং সৈনিকদের নগদ বেতন দেওয়া হয়। মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বের শেষ অবধি এ ব্যবস্থা চলেছিল। তবে আলাউদ্দিন খলজি তাঁর সৈন্যবাহিনীর অফিসারদের ইক্‌তা দানের ব্যবস্থা বজায় রেখেছিলেন। আলাউদ্দিন ইক্‌তা ব্যবস্থায় আর যে পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন তা হলো

সরকারি আমলারা ইক্তার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে থাকেন। সুলতান ইক্তার জমি জরিপ করে কর ধার্য ও আদায়ের আদেশ দেন। দেওয়ান-ই-উজিরাৎ বা রাজস্ব বিভাগ প্রত্যেক ইক্তার রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছিল।

আলাউদ্দিনের রাজস্ব বিভাগ সর্বদা সম্ভাব্য রাজস্বের পরিমাণ বাড়ানোর চেষ্টা করত। এই সম্ভাব্য রাজস্বের হিসেব থেকে একাংশ মুক্তির অধীনস্থ সৈন্যদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হতো। যে অঞ্চল থেকে সৈন্যদের জন্য নির্দিষ্ট অর্থ আদায় করা হবে তাও পৃথকভাবে দেখানো হতো। বাকি অঞ্চলের আয় থেকে মুক্তির নিজস্ব ব্যয় ও তার অধীনস্থ কর্মচারীদের ব্যয় নির্বাহ করা হতো। এই দুইখাতে ব্যয় মেটানোর পর যে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকত তা রাজকোষে জমা দিতে হতো। এই পরিস্থিতিতে মুক্তিরা ইক্তা থেকে তাদের আয় কম করে দেখানোর চেষ্টা করতেন। উদ্বৃত্ত রাজস্ব যা রাজকোষে জমা দেওয়ার কথা তাও কম করে দেখানো হতো। আলাউদ্দিনের সংস্কারের ফলে ইক্তাগুলিতে আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা, অবিশ্বাস ও দুর্নীতি দেখা দিয়েছিল। মুক্তিরা নিজেদের আয় বাড়ানোর জন্য অধীনস্থ অফিসারদের ওপর কড়া নজর রাখতেন, আবার সুলতান মুক্তিদের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ রেখেছিলেন। প্রয়োজনবোধ করলে সুলতান মুক্তিকে বন্দী, এমনকি দৈহিক নির্যাতনও করতেন। মুক্তিরা অধীনস্থদের ওপর একই নীতি প্রয়োগ করতেন। বারানি জানিয়েছেন যে আলাউদ্দিনের রাজস্ব মন্ত্রী শরফ কাইনি জালিয়াতি ও গোপনীয়তা ধরার জন্য গ্রামের হিসেবরক্ষক পাটোয়ারিদের হিসেবপত্র কঠোরভাবে পরীক্ষা করেন। কোনোরকম ত্রুটি ধরা পড়লে তাদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হতো। আফিফ মন্তব্য করেছেন যে এই মন্ত্রী ইক্তার ধার্য রাজস্বের ওপর বাড়তি কর চাপিয়েছিলেন সম্ভবত এই ধারণা থেকে যে ভূমির প্রকৃত আয় গোপন করা হয়েছে। এর ফলে অবশ্য সমগ্র রাজ্যে দুর্ভাগ্য ও ধ্বংস নেমে এসেছিল।

গিয়াসউদ্দিন তুঘলক ইক্তা ব্যবস্থায় বড় ধরনের মৌলিক পরিবর্তন ঘটাননি। বরং এব্যবস্থায় দ্রুত পরিবর্তনের ফলে যেসমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ঢুকে পড়েছিল তিনি সেগুলি দূর করে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি নির্দেশ দেন যে অর্থদপ্তর মুক্তির বার্ষিক জমা কখনো $\frac{১}{১০}$ বা $\frac{১}{১১}$ অংশের বেশি বাড়াতে পারবে না। মুক্তির ওপর স্থাপিত বাড়তি কর শেষপর্যন্ত কৃষকের কাঁধে গিয়ে চাপে। মুক্তি তাঁর অধীনস্থ সৈন্যদের জন্য নির্দিষ্ট ইক্তার অর্থের কোনো অংশ নিতে পারবেন না। মুক্তির অধীনস্থ কর্মচারীরা তাঁদের বেতনের ওপর ০.৫ থেকে ১ শতাংশ বাড়তি নিলে শাস্তি দেওয়া যাবে না। মহম্মদ বিন তুঘলকের শাসনকালে ইক্তা ব্যবস্থার ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ আরও সম্প্রসারিত হয়। ইক্তা শাসনের দুটি বৈশিষ্ট্য কর সংগ্রহ ও সৈন্যবাহিনী পোষণ—পৃথকীকরণের কাজ শুরু হয়। সম্ভবত রাষ্ট্রীয় আয় বাড়ানোর

জন্য পৃথকীকরণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল। বারানি জানিয়েছেন যে কন্ট্রাক্টর ও বণিক নিজাম মাইন ও নসরত খান কারা ও বিদরের ইক্‌তার রাজস্ব আদায়ের অধিকার পেয়েছিলেন। এজন্য তাঁরা রাজকোষে মোটা টাকা (এক কোটি কয়েক লক্ষ) জমা দেন। শরণ নামে এক হিন্দু গুলবর্গা ও গোবার অঞ্চলের ইজারা নিয়েছিলেন। এদের সৈন্য রাখার কোনো দায়দায়িত্ব ছিল না। ইবন বতুতা আমরোহা অঞ্চলের ওয়ালির যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে দেখা যায় তাঁর কাজ ছিল শুধু রাজস্ব আদায়ের। এখানকার ওয়ালি বা মুক্‌তি ১৫০০ গ্রাম থেকে প্রায় ছয় মিলিয়ন টাকা রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করেন। আদায়ীকৃত অর্থের বিশ ভাগের একভাগ ($\frac{১}{২০}$) তিনি নিজের জন্য রেখে বাকি অংশ রাজকোষে জমা দিতেন। এই অঞ্চলে একজন সামরিক অফিসার ছিলেন যিনি সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দিতেন।

মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে ইক্‌তা ব্যবস্থার সর্বোত্তম বর্ণনা পাওয়া যায় *মাসালিক-অল-অবসর*-এ (Masalik-al-absar)। দশ হাজার সৈন্যের অফিসার 'খান' থেকে একশো সৈন্যের সিপাহশালার সকলেই বেতনের পরিবর্তে ইক্‌তা ভোগ করত। ইক্‌তার সম্ভাব্য আয়ের যে হিসেব করা হতো তা সবসময় ব্যয়ের সমান হতো না। অনেক সময় দেখা যেত সৈন্যরা রাজকোষ থেকে বেতন পায়, আর অফিসারদের বেতন হয় ইক্‌তার আয় থেকে। খল্‌জিদের সময় থেকে গিয়াসউদ্দিনের শাসন পর্যন্ত সৈন্য ও অফিসারদের বেতনের পুরোটাই আসত ইক্‌তার আয় থেকে। মহম্মদ বিন তুঘলকের সময় থেকে ইক্‌তার একটি নির্দিষ্ট অংশের আয় শুধু অফিসারদের জন্য বরাদ্দ হতো। ইক্‌তার বাকি অংশের শাসন ও রাজস্বের ওপর মুক্‌তির কোনো এক্তিয়ার ছিল না। ইবন বতুতার বর্ণনা থেকে মনে হয় এই বাকি অংশের আয় থেকে সৈন্যদের বেতন মেটানো হতো। সম্ভবত একারণে মহম্মদ বিন তুঘলকের অফিসাররা তাঁর ওপর ক্ষুণ্ণ হন। ভূমি রাজস্ব আদায়ের নতুন পদ্ধতির প্রচলন করে মহম্মদ বিন তুঘলক তাঁর আমিরান-ই-সদার (আর্মি অফিসার) ক্ষোভের কারণ হন।

এক রাজনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে ফিরুজ তুঘলক ক্ষমতা লাভ করেন। এজন্য অভিজাতদের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তিনি তাঁর শাসন শুরু করেন। তিনি সুলতানি রাজ্যের জন্য রাজস্বের নতুন হিসেব প্রস্তুত করেন। তাঁর সময়ে জমার মোট পরিমাণ হল ৬.৭৫ থেকে ৬.৮৫ কোটি টাকা। ফিরুজ তুঘলকের শাসনকালে এই জমার কোনো পরিবর্তন হয়নি। জমা স্থায়ীভাবে নির্ধারিত হওয়ায় মুক্‌তিদের আর কখনো বাড়তি রাজস্ব দিতে হয়নি, মুক্‌তিদের রাজস্বের হিসেব নিয়েও কোনো ঝামেলা ছিল না। হিসেব পরীক্ষার ক্ষেত্রে কড়াকড়ির অবসান হয়। ফিরুজ তুঘলক তাঁর বিশিষ্ট অভিজাতদের বেতন অনেকখানি বাড়িয়ে দেন, এদের গড় আয় ছিল বার্ষিক চার থেকে

আট লক্ষ টাকা। নগদ অর্থের পরিবর্তে এদের ইক্‌তা ও পরগণা দেওয়া হয়। আফিফের বর্ণনা থেকে মনে হয় ইক্‌তার মধ্যে মুক্‌তির ব্যক্তিগত বেতন এবং সৈন্যদের বেতনের জন্য পৃথক অঞ্চল নির্দিষ্ট করা ছিল। ফিরুজ তুঘলকের শাসনকাল থেকে ইক্‌তার ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ শিথিল হতে থাকে। ইক্‌তার দুই অংশের মধ্যে বিভাজন রেখাটিও ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আসে। ফিরুজ তুঘলকের রাষ্ট্রনীতি ছিল ইক্‌তা ব্যবস্থার মাধ্যমে জমি অভিজাত ও সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে বণ্টন করা। ইক্‌তা বণ্টনের ব্যাপারে তিনি ছিলেন সুলতানদের মধ্যে সবচেয়ে উদার। সুলতানের উদার নীতির ফলে ইক্‌তার পরিমাণ বাড়ে, সেই হারে খালিসার পরিমাণ কমে যায়। আবার খালিসার মধ্য থেকে তিনি সৈন্যদের বেতনের জন্য জমি দেন (ওয়াঝ)। যেসব সৈনিকদের জমি দেওয়া যায়নি তাদের নগদ অর্থে বেতন দানের ব্যবস্থা হয় অথবা ইক্‌তার উদ্বৃত্ত রাজস্ব থেকে তাদের বেতন দেওয়া হতো। আফিফ জানিয়েছেন ফিরুজ তুঘলকের এই ব্যবস্থার ফল ভালো হয়নি। ইক্‌তা থেকে সৈন্যরা তাদের নির্দিষ্ট বেতনের মাত্র অর্ধেক পেত। সৈন্যরা তাদের বেতনপত্র (ইত্‌লাক) ইজারাদারদের কাছে বেতনের এক-তৃতীয়াংশ মূল্য বিক্রি করে দিত, ইজারাদাররা ইক্‌তা থেকে বেতনের অর্ধেকমাত্র আদায় করতে পারত।

ইক্‌তা ব্যবস্থার বিবর্তনের ইতিহাসে ফিরুজ তুঘলকের রাজত্বকাল আরো একদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর সময়ে ইক্‌তা ব্যবস্থায় বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার নীতি স্বীকৃতি লাভ করে। বারানির মতে, খল্‌জি বিপ্লবের পর থেকে সুলতানি অভিজাত-তন্ত্রের কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটেছিল, সাধারণ মানুষ অভিজাত শ্রেণীতে স্থান লাভ করে। ফিরুজ তাঁর কোনো অভিজাত মারা গেলে তার সন্তানকে সব সুযোগ-সুবিধা দেন। শুধু উচ্চপদ নয়, অভিজাতের সন্তান তার পিতার ইক্‌তাও পেত। সৈন্যদের সাধারণ ওয়াঝের ক্ষেত্রেও এই নীতি অনুসরণ করা হতো। ফিরুজ তুঘলকের বংশধররা ইক্‌তা ব্যবস্থার ওপর কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। মুবারক শাহ্ এক অভিজাতকে লাহোরের ইক্‌তা দেন, তাঁর অধীনে দু'হাজার সৈন্য ছিল। ইক্‌তা ব্যবস্থার সঙ্গে সামরিক দায়িত্ব তখনও যুক্ত ছিল। সুলতানরা ইচ্ছা করলে এক ব্যক্তির কাছ থেকে ইক্‌তা কেড়ে নিয়ে অন্য ব্যক্তিকে দিতে পারতেন। তবে এগুলি ছিল সব ব্যতিক্রম, আসল চিত্র হলো মুক্‌তি ইক্‌তা ও পরগণা ভোগ করত, তাকে সামরিক দায়িত্ব পালন করতে হতো। কৃতী, দক্ষ মুক্‌তি একাধিক ইক্‌তা পেত, তাঁর হাতে দুর্গরক্ষার ভার দেওয়া হতো। মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইক্‌তা, পরগণা ও সরকারি পদ পেত। ইয়াহিয়া সিরহিন্দি লিখছেন ঃ 'সৈয়দ সলিম খিজরখানের অধীনে ত্রিশ বছর কাজ করেন। মধ্য দোয়াবের বহু পরগণা, ইক্‌তা ও তবরহিন্দা দুর্গ তাঁর অধীনে ছিল। মুবারক শাহ্ তাকে আরও সরসুতির খিত্তা জেলা এবং আমরোহার

ইক্‌তা দেন। মৃত্যুর পর (১৪৩০) সৈয়দের ইক্‌তা ও পরগণা তাঁর পুত্রদের দেওয়া হয়।'

লোদিদের শাসনকালে ইক্‌তা ব্যবস্থার চরিত্রে মৌল পরিবর্তন ঘটেনি, শুধু ইক্‌তা শব্দের স্থান নিয়েছিল সরকার ও পরগণা। প্রত্যেক সরকারের মধ্যে ছিল কয়েকটি পরগণা, সরকার ছিল মুক্‌তির সদর কার্যালয়। প্রত্যেক সরকারের রাজস্ব স্বতন্ত্রভাবে নির্ধারিত হতো। যে অভিজাত সরকারের দায়িত্ব পেতেন তাকে কয়েকটি সামরিক ও বেসামরিক কর্তব্য পালন করতে হতো। সিকান্দর লোদী সরকারের উদ্বৃত্ত রাজস্বের ভাগ নিতে চাননি। সরকার-প্রধান তাঁর সরকারকে খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করে অধীনস্থ ইক্‌তাদার বসাতেন। অধীনস্থ ইক্‌তাদার আবার তাঁর অংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বন্দোবস্ত দিয়ে রাজস্ব আদায় করে সৈন্যদের বেতন মেটাত। ইক্‌তাদার সুলতানদের মতো বিদ্বান, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে ভূমিদান করত। এগুলির নাম হলো মিলক, ইনাম বা ইদরার। দানগ্রহীতা সারাজীবন বা বংশানুক্রমিকভাবে এগুলি ভোগ করার অধিকার পেত। অনেক সময় সুলতানরা ইক্‌তার একাংশ এভাবে দান করে দিতেন। এক্ষেত্রে ইক্‌তাদারের আয় কমে যেত, প্রশাসনিক জটিলতাও দেখা দিত। ইক্‌তাদার নিজে যে জমি দান করতেন ইক্‌তাদারের পরিবর্তন হলে তাঁর কি হতো নিশ্চিত করে বলা যায় না। লোদি যুগে ইক্‌তা ব্যবস্থার ওপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়েছিল, বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার নীতি স্বীকৃতি পেয়েছিল। সুলতানরা ইক্‌তার শাসন, রাজস্ব আদায় ইত্যাদি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতেন না, হিসেব পরীক্ষার কড়াকড়ি ছিল না। বলা যায় সুলতানি যুগের শেষ অবধি ইক্‌তা ব্যবস্থার মূল চরিত্র এবং এর বৈশিষ্ট্যগুলি অক্ষুণ্ণ ছিল। মুঘলরা সুলতানি যুগের ইক্‌তা ব্যবস্থার ওপর আরও বিস্তারিত ও জটিল জাগির ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল।

ওয়াঝদারি ব্যবস্থা

আরবি গ্রন্থ *মাসালিক-অল-অবসর* থেকে জানা যায় যে মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকাল থেকে ইক্‌তা ব্যবস্থার চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটেছিল। সৈন্যবাহিনীর অফিসাররা সকলে ইক্‌তা পেতেন, তবে ইক্‌তার সম্ভাব্য রাজস্বের যে হিসেব করা হতো বাস্তবে তা আদায় করা সম্ভব হতো না। সৈন্যদের রাজকোষ থেকে নগদে বেতন দেওয়া হতো। সৈন্যদের জন্য ইক্‌তার যে অংশ নির্দিষ্ট ছিল তা ইক্‌তাদারদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে যায়। তাঁর বেতনের জন্য যেটুকু ইক্‌তার প্রয়োজন সেটুকুর নিয়ন্ত্রণ শুধু তাঁর হাতে থাকত। ইবন বতুতা আমরোহাতে এধরনের ইক্‌তা বন্দোবস্ত লক্ষ করেছিলেন। মহম্মদ বিন তুঘলকের সঙ্গে তাঁর সৈন্যবাহিনীর অফিসারদের যে বিরোধ বেধেছিল তার একটি কারণ হলো তারা সমগ্র ইক্‌তার ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিল। বারানি জানিয়েছেন যে আমিরান-ই-

সদার সঙ্গে দৌলতাবাদে তাঁর যে বিরোধ হয়েছিল তার কারণ হলো ভূমি রাজস্ব সংগ্রহের নতুন ব্যবস্থা। ১৩৫১ খ্রিস্টাব্দে ফিরুজ তুঘলক এক ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখল করেন। তিনি সুলতানি রাজ্যের মোট ভূমি রাজস্ব (মাহ্‌শুল) নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নেন। চার বছরের মধ্যে মোট ভূমিরাজস্ব ধার্য হলো ৬.৭৫ থেকে ৬.৮৫ কোটি টাকা। একে বলা হলো জমা এবং ফিরুজ তাঁর রাজত্বকালে এর কোনো পরিবর্তন করেননি। এর অর্থ হলো মুক্‌তিকে আর কখনো বাড়তি রাজস্ব রাজকোষে জমা দিতে হবে না, হিসেব পরীক্ষা নিয়েও ফিরুজ কড়াকড়ি করেননি। ফিরুজ তাঁর অভিজাতদের বেতন ও ভাতা অনেকখানি বাড়িয়ে দেন, এজন্য তাঁদের ইক্‌তা ও পরগণা দেওয়া হয়।

আফিফ ফিরুজ তুঘলকের রাজস্বব্যবস্থার যে বিস্তৃত বর্ণনা রেখেছেন তা থেকে জানা যায় যে মুক্‌তির বেতনের জন্য ইক্‌তার একাংশ নির্দিষ্ট হয়। বাকি অংশের মধ্যে একাংশ সৈন্যদের বেতনের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল। যেহেতু ফিরুজ কঠোরভাবে ইক্‌তা নিয়ন্ত্রণ করতেন না, পৃথকীকরণ ছিল নামমাত্র। ফিরুজ ঈশ্বরের ইচ্ছায় ইক্‌তা বন্দোবস্ত দেন, সব পরগণা ও ইক্‌তা তাঁর কর্মচারীদের মধ্যে বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। খালিসার পরিমাণ অবশ্যই কমেছিল। যে খালিসা জমি তাঁর অধীনে ছিল তার মধ্যে তিনি সৈনিকদের বেতনের পরিবর্তে গ্রামের রাজস্ব 'ওয়াঝ' হিসেবে দেন। তারা 'মাওয়াজিব' বা বেতন পেত না। আফিফ জানাচ্ছেন যে যেসব সৈনিক বেতনের পরিবর্তে গ্রামের রাজস্বের বরাত পেতেন তাঁদের ওয়াঝদার বলা হতো। অন্য সৈনিকদের বলা হতো 'ঘায়ির ওয়াঝ', এরা নগদে বেতন পেত। অথবা ইক্‌তার উদ্বৃত্ত রাজস্বের ওপর এদের ইত্‌লাক (বেতনপত্র) বা বরাত দেওয়া হতো। আফিফ আরও জানিয়েছেন যে ইক্‌তা থেকে যাদের বেতন দেওয়া হতো তাঁরা মাত্র বেতনের অর্ধেক পেতেন। তাঁরা তাঁদের ইত্‌লাক ফাটকাবাজদের (speculators) কাছে বিক্রি করে দিতেন বেতনের এক-তৃতীয়াংশ মূল্যে। ফাটকাবাজরা ইক্‌তা থেকে বেতনের অর্ধেকের বেশি আদায় করতে পারত না।

ফিরুজ তুঘলক রাজস্ব ব্যবস্থায় বংশানুক্রমিক নীতি প্রবর্তন করেন। খল্‌জিদের শাসনের শুরু থেকে (১২৯০) অভিজাততন্ত্রের গঠনে মৌল পরিবর্তন ঘটেছিল। বহু জাতিগোষ্ঠীর লোক অভিজাত শ্রেণীতে স্থান পেয়েছিল। বারানি লিখেছেন যে সাধারণ মানুষরা অভিজাততন্ত্রে স্থান পেয়েছিল (to open its doors to plebian elements of all kinds)। ফিরুজ নিজেই দাবি করেছেন যে তাঁর কর্মচারীদের সন্তানরা পিতার পদ পেত, আফিফ এই নীতির কথা উল্লেখ করেছেন। অনুমান করা হয় যে ইক্‌তাদারের মৃত্যু হলে তার পুত্র পিতার ইক্‌তার অধিকারী হতো। ওয়াঝের ক্ষেত্রে এই নীতি অনুসরণ করা হতো। একজন ওয়াঝদারের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র, জামাতা, ক্রীতদাস

এমনকি তার বিধবা ওয়াঝের অধিকারী হতো। ওয়াঝ কোনো অবস্থাতে রাষ্ট্রের অধীনে স্থাপিত হতো না। আফিফ বলেছেন যে সুলতান সাধারণ সৈনিককে বেতনের পরিবর্তে গ্রামের রাজস্বের বরাত দিয়ে শুধু ওয়াঝদারি ব্যবস্থার বিস্তার করেননি। যারা ইক্‌তার রাজস্বের ওপর ইত্‌লাক (বেতনপত্র) পেত তাদেরও তিনি ওয়াঝদার বলে উল্লেখ করেছেন। ফিরুজ তুঘলকের ব্যবস্থার ফলে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় অবশ্যই জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল। ফাটকাবাজ ও ইজারাদার ওয়াঝদারের হয়ে গ্রাম ও ইক্‌তা থেকে রাজস্ব আদায় করতেন। এতে কৃষকের ওপর অবশ্যই বাড়তি চাপের সৃষ্টি হয়েছিল। সুলতানি রাজস্ব বিভাগের নিয়ন্ত্রণ কমেছিল। আলাউদ্দিন যে কঠোর শৃঙ্খলা রাজস্ব বিভাগে স্থাপন করেছিলেন তা আর ছিল না। অনুমান করা যায় যে কৃষকের ওপর ইজারাদারদের অত্যাচার বেড়েছিল। ওয়াঝদারি ব্যবস্থা ভূমি রাজস্ব ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা নিয়ে এসেছিল। ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় ইজারাদার ও ফাটকাবাজদের অনুপ্রবেশ জটিলতা সৃষ্টি করেছিল।

ফিরুজ তুঘলকের রাজত্বকাল থেকে তুঘলক শাসনের শেষ অবধি (১৩৫১-১৪১৪) সুলতানি রাজ্যের ভূমি ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটেছিল। কৃষি উদ্বৃত্তের সংগ্রহ ও বণ্টনের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন ঘটানো হয়। খালসা ও ইক্‌তা জমির একাংশে ওয়াঝ দেওয়া হয়। সৈনিকদের নগদ বেতন দেওয়া হতো না, একটি গ্রামের রাজস্বের ওপর তাকে বরাত দেওয়া হতো। সম্ভবত একটি গ্রামের রাজস্বের ওপর একাধিক সৈনিককে ওয়াঝ দেওয়া হয়। শুধু খালসা জমিতে নয়, ইক্‌তা জমির একাংশে চিহ্নিত অংশে সৈনিকদের ওয়াঝ দেওয়া হতো। এই ব্যবস্থার নাম হলো ওয়াঝদারি ব্যবস্থা। খালসা ও ইক্‌তা জমিতে সৈনিকরা ওয়াঝ পেলেও তাঁরা কিন্তু রাজস্ব আদায় করত না। তারা রাজস্ব আদায়ের অধিকার দিত ইজারাদার বা ফাটকাবাজদের। ইজারাদার ইত্‌লাক বা বেতনপত্রে উল্লিখিত বেতনের এক-তৃতীয়াংশ দামে এগুলি কিনে নিত। তারা বরাতী অঞ্চল থেকে বেতনের মাত্র পঞ্চাশ শতাংশ আদায় করতে পারত। তাহ্‌লে দেখা যায় একজন সৈনিক তার নির্দিষ্ট বেতনের মাত্র ৩৩ শতাংশ পেত, এতে অবশ্যই তার অসুবিধা হতো। ফিরুজের সৈন্যবাহিনী এজন্য দুর্বল হয়ে পড়েছিল। আবার ইজারাদারি ব্যবস্থার পত্তন হওয়ায় ভূমিব্যবস্থায় জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল, কৃষকের ওপর বাড়তি চাপ ছিল। ইজারাদার সাধারণত ভূমি রাজস্বের সঙ্গে বাড়তি কিছু আদায় করে নিত।

এই ব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো বংশানুক্রমিকভাবে ওয়াঝগুলি ভোগ করা যেত। কোনো সৈনিক মারা গেলে তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এমনকি ক্রীতদাসও তার ওয়াঝের অধিকারী হতে পারত। এতে ভূমিব্যবস্থায় কায়েমী স্বার্থের সৃষ্টি হয়েছিল, মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা বেড়েছিল। আলাউদ্দিন সরকারের অধীনে যে সুশৃঙ্খল ভূমি

ও রাজস্বব্যবস্থা গঠন করেন তাতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। রাষ্ট্র ও কৃষকের মাঝে ওয়াঝদার ও ইজারাদাররা ভূমির সঙ্গে যুক্ত হয়ে উদ্বৃত্তের একাংশ দাবি করেছিল। ফিরুজ তুঘলক প্রবর্তিত ওয়াঝদারি ব্যবস্থা কৃষি ও কৃষক কারও পক্ষে মঙ্গলজনক হয়নি, রাষ্ট্র বর্ধিত রাজস্বের অংশ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। সমকালীন সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে ফিরুজ তুঘলকের শাসনকালে চাষ-আবাদ বেড়েছিল, কৃষিজ উৎপাদন বেড়ে গিয়েছিল। এই বাড়তি উৎপাদনের বেশিরভাগ গ্রাস করেছিল ফাটকাবাজ ও ইজারাদার, রাষ্ট্র বা ওয়াঝাদার এর ভাগ পায়নি।

রাষ্ট্রের সঙ্গে মধ্যস্বত্বভোগীদের সম্পর্ক

রাজস্থান, হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চল ও বুন্দেলখণ্ড ছাড়া রাজপুতরা আর সর্বত্র তুর্কিদের কাছে রাজনৈতিক ক্ষমতা হারিয়েছিল। তবে উত্তর ভারতের সর্বত্র রাজপুতরা স্থানীয় শাসন ও রাজস্বব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিল। তুর্কি শাসনের কেন্দ্রস্থল পাঞ্জাব, দোয়াব, বিহার ও গুজরাটেও তাদের প্রাধান্য ছিল। তাদের বলা হতো রায়, রাণা, রাবাত, মাঝে মাঝে এই রাজপুতদের প্রধান বা সর্দার (Chief) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এইসব রাজপুত সর্দারদের সশস্ত্র অনুচর বাহিনী ছিল, গ্রামে দুর্গের মধ্যে এরা বাস করত। এদের সংখ্যা কত এবং তাদের সঙ্গে কত সৈন্য ছিল সঠিক বলা যায় না। তবে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে তুর্কি শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও দেশের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক জীবনে তাদের প্রাধান্য ছিল। সমকালীন মুসলমান ঐতিহাসিকরা এদের রাষ্ট্রের শত্রু বলেছেন, এদের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' করার কথা বলেছেন। কিন্তু তুর্কি শাসকগোষ্ঠী এদের সঙ্গে স্থায়ী শত্রুতার সম্পর্ক চাননি, এরা অনুগত থেকে নিয়মিতভাবে কর দিলে শাসকগোষ্ঠী এদের শাসনের অধিকার কেড়ে নিতেন না।

তুর্কি শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে রাজপুত মধ্যস্বত্বভোগীদের রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল এবং এই সম্পর্ক ক্রমশ বেড়ে চলেছিল। সমকালীন লেখকরা জানিয়েছেন যে একশ ক্রোশ দূর থেকে হিন্দু রায়রা বলবনের দরবারের জাঁকজমক দেখার জন্য আসতেন। বলবন বাংলার বিদ্রোহী শাসক তুঘ্রিলকে দমন করে অযোধ্যায় এলে অনেকের সঙ্গে হিন্দু প্রধানরা তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। ফিরুজ তুঘলকের বাংলা আক্রমণের সময় পূর্ব উত্তরপ্রদেশের রায়রা তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন উদয় সিংহ। তিনি গোরখপুর ও চম্পারণের রায় ছিলেন এবং এই সময় তিনি সুলতানকে বিশ লক্ষ টাকা বকেয়া রাজস্ব প্রদান করেন। জালালুদ্দিন খল্‌জির শাসনকালে কারার গভর্নর মালিক ছজ্জু বিদ্রোহ করেন। তার সঙ্গে যোগ দেন ঐ এলাকার অসংখ্য রায় ও রাবাত ও তাদের অনুগামী সৈনিকরা। পিপীলিকা ও পঙ্গপালের মতো বহু পাইক ছিল এসব রায় ও রাবাতদের সঙ্গে (swarmed around

with their forces like ants and locusts)। জালালুদ্দিন এদের পরাস্ত করেন, ছজ্জুর বিদ্রোহ দমিত হয়। এরপর থেকে হিন্দু প্রধানরা জালালুদ্দিনের দরবারে স্থান লাভ করেন। ফিরুজ তুঘলকের শাসনকালে কয়েকজন প্রভাবশালী হিন্দু প্রধানের নাম পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য নামগুলি হল অনিরাথু, রায় মদরদেব, রায় সুমের ও রাবাত অধিরাম। অনিরাথু ছিলেন দুখানি রাজকীয় চাঁদোয়ার অধিকারী (lord of two royal canopies)। এরা সব ফিরুজের রাজসভায় যেতেন, দরবারে আসন গ্রহণের অধিকার ছিল এঁদের।

সুলতানি রাজ্য হিন্দু প্রধানদের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। তবে হিন্দু প্রধানদের অবস্থান ছিল অনিশ্চিত, সুলতানরা হিন্দু প্রধানদের উৎখাতের চেষ্টা করতেন। তাদের সুযোগ-সুবিধা কমিয়ে দিতেন, তাদের শাসিত অঞ্চলে সুলতানি রাজস্বব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটাতেন। সুলতানি রাজস্বব্যবস্থা সম্প্রসারিত হলে কৃষকদের যে সুবিধা হতো তা নয়, শুধু ভূস্বামীদের সুযোগ সুবিধা বাতিল হয়ে যেত। বিভিন্ন ধরনের মধ্যস্বত্বভোগীরা ছিলেন, এদের খুত, মুকাদ্দম ও চৌধুরী বলা হয়েছে। এরা হলো বিভিন্ন স্তরের মধ্যস্বত্বভোগী। চতুর্দশ শতকের শুরুতে জমিদারদের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতের বাইরে এই জমিদার শব্দটির অস্তিত্ব নেই। বংশানুক্রমিক মধ্যস্বত্বভোগীদের বোঝানোর জন্য এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়। আমীর খসরু সম্ভবত প্রথম এই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। পরবর্তীকালে খুত, মুকাদ্দম ও চৌধুরীদের জমিদার বলা হতো। যেসব প্রধান থোক রাজস্ব নয়, ভূমির উৎপন্ন ফসল অনুযায়ী ধার্য রাজস্ব দিতেন তাদেরও জমিদার আখ্যা দেওয়া হয়। মুঘলদের সময়ে সব বংশানুক্রমিক মধ্যস্বত্বভোগীকে জমিদার বলা হতো। অনেকে জমির মালিক ছিলেন, আবার অনেকে বংশানুক্রমিকভাবে রাজস্বের অংশ ভোগ করতেন। অঞ্চল প্রধানদেরও জমিদার বলা হতো (ওয়াতন জমিদার)। মধ্যস্বত্বভোগীদের জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না, সাধারণত তারা স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থাকতেন। কৃষকরা ছিল দারিদ্র্যের মধ্যে। বারানি আলাউদ্দিনের সময়কার মধ্যস্বত্বভোগীদের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে আলাউদ্দিনের রাজস্ব নীতির ফলে এরা অর্থনৈতিক দুর্দশার মধ্যে পড়েছিল। এরা নিষ্কর জমি ভোগ করত, এই অধিকার আর তাদের ছিল না।

পঞ্চম অধ্যায়

সুলতানি যুগে ভারতে মোঙ্গল আক্রমণ

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে যুগে যুগে বিদেশীরা ভারতে প্রবেশ করেছে। আফগানিস্তান থেকে খাইবার ও বোলান গিরিপথ দিয়ে সহজে ভারতে প্রবেশ করা যায়। গজনি ও ঘুরের শাসকরা এই পথ ধরে ভারতে প্রবেশ করেছিল। মধ্য এশিয়ার খাওয়ারিজম শাসকরা গজনি ও ঘুর দখল করলে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত আবার অনিশ্চিত হয়ে উঠেছিল, ভারতের সঙ্গে এই অঞ্চলের রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছিল। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে মোঙ্গলরা সারা পৃথিবীতে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। বিভিন্ন দেশে এই ধারণা গড়ে উঠেছিল যে মোঙ্গলরা হলো অজেয় ও অপ্রতিরোধ্য। ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে মোঙ্গলরা মধ্য এশিয়ায় তাদের প্রাধান্য স্থাপন করেছিল। এখানকার খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য মোঙ্গল আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়েছিল। ইরাক, ইরান, সিরিয়া ও মিশরের ওপর মোঙ্গলরা আক্রমণ চালিয়েছিল। মোঙ্গল আক্রমণের ফলে বাগদাদের খলিফা নিহত হন, ইরান ও আফগানিস্তানের ওপর মোঙ্গলদের অধিকার স্থাপিত হয়। ভারতে সুলতানি রাজ্য মোঙ্গল আক্রমণের আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। ইলতুৎমিসের শাসনকালে মোঙ্গলদের দুর্ধর্ষ নেতা চিঙ্গিজ খান খাওয়ারিজম শাসক জালালুদ্দিন মঙ্গবর্নীর পশ্চাদ্ধাবন করে সিন্ধুতীরে এসে হাজির হন। জালালুদ্দিন পাঞ্জাবের পশ্চিমাঞ্চলের খোক্কর উপজাতিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন। তিনি এবং চিঙ্গিজ দুজনেই ইলতুৎমিসের সাহায্য প্রার্থনা করেন। চিঙ্গিজ সম্ভবত উত্তর ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিলেন, পরে তিনি ঐ পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। সম্ভবত ইলতুৎমিস জালালুদ্দিনকে সাহায্য দিতে রাজী হননি এবং মধ্য এশিয়ার তুর্কিস্থানে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। এজন্য চিঙ্গিজ ভারত ত্যাগ করে চলে যান। ইলতুৎমিস এই সময়ে কূটনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দেন, তিনি জালালুদ্দিনকে বাধাদানের জন্য প্রস্তুতি নেন।

১২২৪ খ্রিস্টাব্দে জালালুদ্দিন ভারত ত্যাগ করে চলে যান, ঐ সময় থেকে দিল্লির ওপর মোঙ্গল আক্রমণের আশঙ্কাও কমেছিল। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে খোক্কর উপজাতি ও জালালুদ্দিনের অনুগামীদের মধ্যে আরও কিছুকাল ধরে লড়াই চলেছিল। ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে চিঙ্গিজ খানের মৃত্যু হলে মোঙ্গলরা অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল, খোরাসান ও ইরান জয় নিয়ে ব্যস্ত ছিল, ভারতের ওপর মোঙ্গলদের সামরিক চাপ কমেছিল। ১২৩৪ খ্রিস্টাব্দে মোঙ্গল নেতা ওকতাই (Oktai) হিন্দ ও কাশ্মীর আক্রমণের

সিদ্ধান্ত নেন। তাকে প্রতিরোধ করার জন্য ইলতুৎমিস পশ্চিম পাঞ্জাবে বুনিয়ান পর্যন্ত অগ্রসর হন। এই অভিযানের সময় ইলতুৎমিস অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং দিল্লিতে ফিরে আসার পর মারা যান। ইলতুৎমিসের মৃত্যুর পর কারলুগ বংশীয় গজনির শাসক ওয়াফা মালিক সল্ট রেঞ্জ (Koh-i-jud) দখল করেন। মোঙ্গলরা তাঁকে পরাস্ত করে এই অঞ্চল দখল করেছিল। কারলুগদের সঙ্গে সিন্ধু, মুলতান, পশ্চিম পাঞ্জাব নিয়ে মোঙ্গলদের লড়াই চলেছিল। ১২৪৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এই অঞ্চলে মোঙ্গল প্রাধান্য স্থাপিত হয়, কারলুগরা পরাজিত ও বিতাড়িত হয়। ১২৪০ খ্রিস্টাব্দে হেরাত, গজনি ও আফগানিস্তানের মোঙ্গল নেতা তায়ির বাহাদুর লাহোর আক্রমণ করেন। লাহোরের তুর্কি গভর্নর মোঙ্গলদের প্রতিরোধ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। দিল্লি সুলতানি তখন অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে বিধ্বস্ত ছিল, শহরের নাগরিকরা বাধা দিয়েছিল। মোঙ্গল নেতা তায়ির বাহাদুর নিহত হন, এজন্য মোঙ্গলরা নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নিয়েছিল। মোঙ্গলদের নেতা ওকতাইয়ের মৃত্যু হলে মোঙ্গলরা আকস্মিকভাবে শহর ত্যাগ করে চলে যায়। দিল্লি সুলতানি লাহোর অধিকার করেছিল, কিন্তু মাঝে মাঝে মোঙ্গল ও খোক্করররা এসে শহরে লুঠতরাজ চালাত।

মোঙ্গলরা পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু ও মুলতান অধিকার করেছিল, আফগানিস্তানে তাদের অধিকার ছিল। পাঞ্জাবের বিপাশা নদী পর্যন্ত মোঙ্গল অধিকার সম্প্রসারিত হয়েছিল। ১২৪৬ খ্রিস্টাব্দে নাসিরুদ্দিন মাহমুদের শাসনের শুরুতে উত্তর-পশ্চিমে মোঙ্গলদের এরকম অবস্থান ছিল। বলবন ছিলেন নাসিরুদ্দিনের নায়েব, রাষ্ট্রের প্রকৃত কর্ণধার। তিনি মোঙ্গল ও খোক্করদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে পশ্চিম পাঞ্জাব পর্যন্ত দিল্লি সুলতানির অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি কারণ তুর্কি শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। মুলতান ও সিন্ধু অঞ্চলের সামরিক অফিসাররা কেন্দ্র থেকে সহায়তা পায়নি। অনেকে মোঙ্গল নেতাদের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়ে স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। বলবনের আত্মীয় শের খান মোঙ্গল নেতা মাঙ্গু খানের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে ভারত আক্রমণের জন্য আমন্ত্রণ জানান। মোঙ্গলরা ইরাক, সিরিয়া, মিশর ও চীন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। স্থানীয় মোঙ্গল নেতারা লুণ্ঠনের জন্য ভারতে অভিযান চালাত। দিল্লি সুলতানি মোঙ্গল আক্রমণ থেকে রেহাই পেয়েছিল।

মোঙ্গলদের লুঠতরাজ বন্ধ করার জন্য বলবন সামরিক ও কূটনৈতিক ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। তিনি মোঙ্গল নেতা হালাকুর (Halaku) কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন। হালাকু বলবনের কাছেও দূত পাঠিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং ভারত আক্রমণ না করার সিদ্ধান্ত জানান। হালাকু ইরাক, সিরিয়া ও মিশর নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। দক্ষিণ রাশিয়ার মোঙ্গল নেতা বরকা খান দিল্লিতে দূত পাঠিয়েছিলেন। হালাকু মিশর ও

সিরিয়ায় প্রতিহত হয়ে সিন্ধু ও পশ্চিম পাঞ্জাবে তার অধিকার দাবি করেন। ১২৬৫ খ্রিস্টাব্দে বলবন সুলতান হন, হালাকু মারা যান, সুলতানি ও মোঙ্গলদের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কও শেষ হয়ে যায়। বলবনের আত্মীয় শের খান দিল্লি সুলতানির হয়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধের কাজ করতেন। তিনি লাহোর, সুনাম ও দিপালপুরের ইক্‌তাদার ছিলেন। তাঁর সতর্ক পাহারা সত্ত্বেও মোঙ্গলরা বিপাশা অতিক্রম করত। গোড়ার দিকে বলবন মোঙ্গলদের বিতাড়িত করার কথা ভেবেছিলেন (forward policy)। তিনি সৈন্যবাহিনী নিয়ে পাঞ্জাবের সল্টরেঞ্জের দিকে এগিয়ে যান, লাহোরে দুর্গ পুনর্নির্মাণ করেন। শের খান স্বাধীন হবার বাসনা পোষণ করছেন ধরে নিয়ে বলবন তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন। বলবন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদকে উত্তর-পশ্চিমের প্রতিরক্ষার ভার দেন, তিনি মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করেন। মুলতান ও লাহোরে সৈন্য সন্নিবেশ করা হয়, বিপাশা নদী বরাবর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। বারানি জানিয়েছেন যে বলবনের সামরিক ব্যবস্থার পর মোঙ্গলরা বিপাশা নদী অতিক্রম করে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশের চেষ্টা করেনি। তিনি আরও জানিয়েছেন যে সত্তর-আশি হাজারের মোঙ্গল বাহিনী মুলতানে মহম্মদ, সামানায় বুঘরা খান এবং দিল্লিতে মালিক বারবকের সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হতে সাহস করত না। ১২৮৫ খ্রিস্টাব্দে মোঙ্গলদের এক অতর্কিত আক্রমণে মহম্মদ নিহত হন, এজন্য তিনি 'শহীদ রাজপুত্র' নামে পরিচিত হন। মহম্মদের মৃত্যু হলেও মোঙ্গলরা আঞ্চলিক বা সামরিক কোনো সুবিধা পায়নি। ১২৮৮ খ্রিস্টাব্দে বলবনের মৃত্যুর পর মোঙ্গল নেতা তামার খানের নেতৃত্বে লাহোর থেকে মুলতান পর্যন্ত সব অঞ্চল অধিকৃত হয়। দিল্লির বাহিনীর আগমনের খবর পেয়ে মোঙ্গলরা এই অঞ্চল ত্যাগ করে চলে যায়।

১২৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোঙ্গলরা পশ্চিম পাঞ্জাবের ওপর আধিপত্য বজায় রেখেছিল। মোঙ্গল অধিকৃত অঞ্চল ও দিল্লি সুলতানির মধ্যে সীমারেখা ছিল বিপাশা নদী। সিন্ধু ও মুলতানের ওপর তারা ক্রমাগত আক্রমণ চালাত, দিল্লি অধিকারের জন্য কোনো পরিকল্পনা ছিল না। সুলতানি রক্ষা পেয়েছিল, সুলতানরা সতর্ক ছিলেন, সামরিক প্রস্তুতি বজায় ছিল। ১২৯২ খ্রিস্টাব্দে হালাকুর পৌত্র আবদুল্লাহ্ দেড় লক্ষ সৈন্যসহ ভারত আক্রমণ করেন। সুলতান জালালুদ্দিন খল্‌জি মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। তিনি সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলে মোঙ্গলরা চুক্তি করে ভারত থেকে সরে যায়, এরা দিল্লির উপকণ্ঠে বাস করার অনুমতি পেয়েছিল। হালাকুর পৌত্র উলাগু ও তাঁর অনুগামীরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, এরা নব মুসলমান নামে পরিচিত হন। মোঙ্গলরা পশ্চিম পাঞ্জাবের ওপর তাদের অধিকার বজায় রেখেছিল। মোঙ্গলদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে পরিবর্তন ঘটলে তারা নতুন করে দিল্লি সুলতানির

আতঙ্কের কারণ হয়েছিল। মধ্য এশিয়ার মোঙ্গল নেতা দবা খানের (Dawa) সঙ্গে ইরানের মোঙ্গল নেতার বিরোধ ছিল। দবা খান আফগানিস্তান অধিকার করে পাঞ্জাবে প্রবেশ করেন।

আলাউদ্দিনের শাসনকালে মোঙ্গলরা দিল্লি সুলতানির ওপর তীব্রতম আক্রমণ চালিয়েছিল। মোট সাতবার মোঙ্গলরা সুলতানি রাজ্য আক্রমণ করেছিল। দ্বিতীয় পর্বের আক্রমণ চলেছিল ১৩২৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। আগে মোঙ্গলরা শুধু লুঠতরাজের জন্য ভারতে প্রবেশ করত, এইসময় তারা আক্রমণের লক্ষ্য পাল্টেছিল। ভারত জয় বা পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ ছিল তাঁদের অভিযানের নতুন উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হলে কৌশলও পাল্টে যায়। তারা সিন্ধু ও পাঞ্জাব লুঠ করে মধ্য এশিয়ায় ফিরে যেত না, জনবিরল পার্বত্য পথ ধরে অতর্কিতে দিল্লিতে এসে হাজির হতো। ভারতের সমৃদ্ধ দোয়াব অঞ্চলের ওপর তাদের নজর পড়েছিল। ভারতে প্রবেশের সময় তারা উত্তর-পশ্চিমের পার্বত্য উপজাতিদের সাহায্য নিত। লুণ্ঠিত সম্পদের ভাগ পাওয়ার লোভে তারা মোঙ্গলদের সহযোগী হতো। সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থিত সুলতানি অভিজাতরা মোঙ্গল নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলত। রাজনৈতিক সুবিধালাভের আশায় এরা মোঙ্গলদের ভারত আক্রমণে উৎসাহ দিত। ১২৯৭-৯৮ খ্রিস্টাব্দে মোঙ্গল নেতা দবা খান তাঁর সেনাপতি কাদারের নেতৃত্বে এক লক্ষ সৈন্য ভারতে পাঠিয়েছিলেন। শতদ্রু অতিক্রম করে কাদার দিল্লির দিকে এগোলে আলাউদ্দিনের সেনাপতি উলুগ খান তাঁকে জলন্ধরের কাছে পরাস্ত করেন। পরের বছর সলদির নেতৃত্বে মোঙ্গলরা আবার ভারতে অভিযান পাঠিয়েছিল, নিম্ন সিন্ধু উপত্যকায় এরা পরাস্ত হয়। ১২৯৯ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয়বার মোঙ্গল আক্রমণের ঘটনা ঘটেছিল। দবা খানের পুত্র কুতলুগ খান ছিলেন এই অভিযানের নেতা, তাঁরা দিল্লি জয় করে মোঙ্গল শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। আলাউদ্দিন এই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি সিরি দুর্গের সামনে মোঙ্গলদের প্রতিরোধ করেন, জাফর খানের সঙ্গে সংঘর্ষের পর কুতলুগ খান দেশে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। আলাউদ্দিন পলায়মান মোঙ্গলদের পশ্চাদ্ধাবন করেননি।

দিল্লির অধিবাসীদের কাছে শুধু নয়, আলাউদ্দিনের কাছেও মোঙ্গল আক্রমণের ঘটনাটি ছিল আকস্মিক ও বিভ্রান্তিকর। তিনি মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধমূলক অনেকগুলি ব্যবস্থা নেন। দিল্লির চারপাশে তিনি শক্তিশালী প্রাকার নির্মাণ করেন, দিল্লি থেকে সীমান্ত পর্যন্ত সমস্ত পুরনো দুর্গ তিনি সংস্কার করেন। সামানা ও দিপালপুরে তিনি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করেন। অভ্যন্তরীণ শাসনের পুনর্গঠন করে তিনি বৈদেশিক আক্রমণ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হন, নতুন করে সৈন্য সংগ্রহ করেন। এইসব ব্যবস্থা নিয়ে তিনি মোঙ্গলদের প্রতিরোধ করেন, যদিও দিল্লি সুলতানির ওপর

মোঙ্গল আক্রমণের আশঙ্কা আরও কিছুকাল ধরে চলেছিল। ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে চতুর্থবার মোঙ্গল আক্রমণের ঘটনা ঘটেছিল, এবার মোঙ্গলদের নেতৃত্ব দেন তারঘি (Targhi)। বারানি বলেছেন যে এই বাহিনীতে ছিল তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার সৈন্য। মোঙ্গলরা দ্রুত দিল্লির দিকে ছুটে চলেছিল, পথে কোথাও বাধা পায়নি। আলাউদ্দিন অপ্রস্তুত ছিলেন, তিনি একমাস আগে চিতোর থেকে ফিরেছিলেন, সৈন্যরা ছিল শ্রান্ত ও ক্লান্ত, আর একটি বাহিনী বরঙ্গল থেকে সদ্য ফিরেছিল। মোঙ্গলরা যমুনার ঘাটগুলি দখল করেছিল, দোয়াব থেকে দিল্লিতে সৈন্য ও রসদ আনার উপায় ছিল না। আলাউদ্দিন সিরি দুর্গ থেকে বেরিয়ে যমুনাতীরে মোঙ্গলদের বাধাদানের সিদ্ধান্ত নেন। চারদিকে পরিখা খনন করে তিনি নিজের অবস্থানকে সুরক্ষিত করেন, কাঠের গুঁড়ি সাজিয়ে তিনি প্রায় একটি কাঠের দুর্গ বানিয়ে ফেলেন। মোঙ্গলরা তাঁকে আক্রমণ করার সাহস করেনি। দিল্লির পার্শ্ববর্তী অঞ্চল লুঠ করে, নাগরিকদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করে তারা শেষপর্যন্ত ফিরে যায়। দিল্লিতে খাদ্য ও জ্বালানির অভাব দেখা দিয়েছিল।

১৩০৫ খ্রিস্টাব্দে মোঙ্গলরা পঞ্চমবার ভারত আক্রমণ করেছিল, এবার ভারত জয় ছিল তাঁদের লক্ষ্য। সিন্ধু অতিক্রম করে তীরবেগে (like an arrow) তাঁরা দিল্লির দিকে ছুটে গিয়েছিল, পথে শহরগুলি তারা জ্বালিয়ে দেয়, দিল্লি এড়িয়ে তারা দোয়াব অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল। মোঙ্গলদের সঙ্গে ছিল তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার সৈন্য। আলাউদ্দিন তাঁর হিন্দু সেনাপতি মালিক নায়কের নেতৃত্বে মোঙ্গলদের প্রতিরোধ করার জন্য তিরিশ হাজার সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। নায়ক এর আগে সামানা ও সুনামের গভর্নর ছিলেন, আমরোহার কাছে তিনি মোঙ্গলদের বাধা দেন, মোঙ্গলরা পরাস্ত হয়। মোঙ্গলদের নেতা আলি বেগ ও তারতাগ বন্দী হন, অনুগামীদের সঙ্গে নেতাদেরও হত্যা করা হয়। এই পরাজয়ের পর মোঙ্গলদের সামরিক মর্যাদা অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হয়, তাঁদের অপরাজেয় ভাবমূর্তি আর ছিল না। ১৩০৬ খ্রিস্টাব্দে দবা খানের মৃত্যুর পর মোঙ্গলরা ভারত সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিল। দিল্লি জয়ের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়, তবে ভারতের ওপর আক্রমণ বন্ধ হয়নি। কতেহার-শিবালিক অঞ্চলে তারা আক্রমণ চালিয়েছিল। বারানি জানাচ্ছেন যে এরপর যতবার মোঙ্গলরা দিল্লি ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল আক্রমণ করেছে, পরাস্ত হয়েছে। মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে মুসলমান সৈন্য আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছিল। মোঙ্গলরা যেসব অঞ্চল বিধ্বস্ত করেছিল সেসব অঞ্চলে আবার চাষাবাদ বসেছিল। লাহোর ও দিপালপুরে দুর্ভেদ্য দুর্গ বানিয়ে মোঙ্গলদের প্রতিহত করা হয়, এই দুর্গগুলিকে বলা হতো 'চীনা প্রাচীর' (Chinese Wall) সীমান্তের ভারপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার তুঘলক শাহ (গাজি মালিক) পশ্চিম পাঞ্জাব ও আফগানিস্তানের মোঙ্গল ঘাঁটিগুলির ওপর আক্রমণ চালাতেন। এই অঞ্চলের ওপর

থেকে মোঙ্গল আক্রমণের ভীতি দূর হয়ে যায়। বারানি লিখেছেন যে মোঙ্গলরা আর সিন্ধু অতিক্রম করার সাহস দেখাত না, এটা সম্ভবত তাঁর অতিরঞ্জন।

আলাউদ্দিন শুধু দিল্লি ও দোয়াব অঞ্চল মোঙ্গল আক্রমণ থেকে রক্ষা করেননি, তিনি উত্তর-পশ্চিমে এমন সব ব্যবস্থা নিয়েছিলেন যাতে লাহোর ও বিপাশা থেকে সুলতানি সীমান্ত সিন্ধুনদ পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। তবে সীমান্ত সুরক্ষিত হলেও আফগানিস্তানে মোঙ্গলদের ঘাঁটি ছিল, আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর মোঙ্গলরা আবার ভারতের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। ১৩২০ খ্রিস্টাব্দে দালুচা খান সত্তর হাজার অশ্বারোহী নিয়ে কাশ্মীর উপত্যকায় প্রবেশ করে নৃশংস তাণ্ডব চালিয়েছিল। সমস্ত পুরুষকে হত্যা করা হয়, নারী ও শিশুদের ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করা হয়, শহর ও গ্রামের সব গৃহ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। দেশে ফেরার পথে তুষারঝড়ে এই বাহিনী সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। ১৩২০ খ্রিস্টাব্দে গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের শাসনের শুরুতে দুটি মোঙ্গল বাহিনী সুনাম ও সামানা পৌঁছেছিল, এরা মীরাটে গিয়ে হাজির হয়। এরা সুলতানি বাহিনীর কাছে পরাস্ত হয়, অনেক মোঙ্গল সৈন্য নিহত হয়। ১৩২৬-২৭ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে মোঙ্গল নেতা তারমাশিরিন খান ভারত আক্রমণ করেন। মহম্মদ বিন তুঘলক এই আক্রমণ শুধু প্রতিহত করেননি, তিনি পেশোয়ার ও কালানোর পর্যন্ত এগিয়েছিলেন। এখানে ঘাঁটি বানিয়ে তিনি ভবিষ্যতে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেন। কিছুকাল পরে ভারতীয় সৈন্য সিন্ধুনদকে সীমান্ত হিসেবে গণ্য করতে থাকে। মহম্মদ কাবুল, গজনি ইত্যাদি অধিকার করে স্থায়ীভাবে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধের কথা ভেবেছিলেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের প্রতিরক্ষা সম্পর্কে তাঁর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি ছিল, এশিয়ার ভূ-প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর বিশদ জ্ঞান ছিল। এসব অগ্রাহ্য করার জন্য ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে তৈমুর সহজে ভারতে প্রবেশ করতে পারেন।

ভারতে প্রায় একশ বছর ধরে মোঙ্গল আক্রমণের আতঙ্ক ছিল। আলাউদ্দিনের শাসনকালে (১২৯৬-১৩১৬) এই আক্রমণ চরম আকার ধারণ করেছিল। মোঙ্গল আক্রমণের ফলে পশ্চিম পাঞ্জাব দিল্লি সুলতানির হস্তচ্যুত হয়, দিল্লির নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হয়। দিল্লির সুলতানরা মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধের যথাযথ ব্যবস্থা করেছিলেন। এই আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য তাঁরা অর্থসংগ্রহ করেন, শাসন সংস্কার করেন, তবে আফগানিস্তান অধিকার করে স্থায়ী প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেননি। মুঘলরা পরবর্তীকালে এই ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে মোঙ্গলরা সারা পৃথিবীতে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল। মোঙ্গল আক্রমণের কাছে সিরিয়া, ইরাক, ইরান ও আফগানিস্তান আত্মসমর্পণ করেছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে মোঙ্গলদের প্রতিরোধ করে লাভ নেই, তারা অপরাজেয়। দিল্লি সুলতানি—

ইলতুৎমিস থেকে মহম্মদ বিন তুঘলক—মোঙ্গল আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছিল। কখনো কূটনৈতিক পথে, কখনো অস্ত্রবলে সুলতানরা মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করেন। অন্যত্র মোঙ্গল আক্রমণের সাফল্যের পটভূমিকায় ভারতে তাদের ব্যর্থতা বেশ আশ্চর্যজনক ঘটনা। ঐতিহাসিকরা দুটি কারণকে মোঙ্গলদের ব্যর্থতার জন্য দায়ী করেছেন। প্রথমটি হলো মোঙ্গলদের দুর্বলতা, দ্বিতীয়টি হলো সুলতানদের দৃঢ়তা। চেঙ্গিস খানের মৃত্যুর পর মোঙ্গলদের মধ্যে গৃহবিবাদ শুরু হয়েছিল। অধ্যাপক মহম্মদ হাবিব মনে করেন যে মোঙ্গলদের গৃহবিবাদের জন্য দিল্লি সুলতানি রক্ষা পেয়েছিল।

এই একশ বছরের বেশিরভাগ সময় মোঙ্গলদের ভারতে প্রবেশের উদ্দেশ্য ছিল লুঠপাট করা। ভারত জয় করে এদেশ শাসনের ইচ্ছা মোঙ্গলদের ছিল না। চতুর্দশ শতকে মোঙ্গল নেতা দবা খান এধরনের পরিকল্পনা নেন। মোঙ্গলরা তখন শৌর্য-বীর্য হারিয়ে ফেলেছে, মিশরে তারা পরাস্ত হয়েছে, সিরিয়া তাদের হাতছাড়া হয়েছে। দিল্লির সুলতানরা শুধু মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করেননি, উত্তর-পশ্চিমে দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রাকার নির্মাণ করে তাঁরা প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করেন, সেরা সৈন্যবাহিনী তাঁরা সীমান্তে মোতায়েন করেন। এই ঘাঁটিগুলি থেকে সীমান্তের অপরপারে মোঙ্গলদের ঘাঁটিগুলির ওপর আক্রামণ চালানো হতো। আলাউদ্দিন আফগানিস্তানে মোঙ্গলদের ঘাঁটিগুলি আক্রমণ করে ধ্বংস করে দেন। আলাউদ্দিনের ধৈর্য, সাহস ও অনমনীয় মনোভাব মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে তাঁকে সাফল্য এনে দিয়েছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বৈধকরণ, নরপতিত্বের আদর্শ—প্রতীক ও প্রতিষ্ঠানসমূহ—সুফি ও ভক্তদের সঙ্গে সম্পর্ক—দিল্লি সুলতানির রাজতান্ত্রিক আদর্শের বিবর্তন—সুলতানি যুগে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক

রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বৈধকরণ

পবিত্র কোরানে খিলাফতের (ধর্মরাজ্য) কথা আছে, সুলতানের কথা নেই। বাগদাদের খলিফার প্রাক্তন প্রাদেশিক শাসকরা স্বাধীন হয়ে সুলতান উপাধি নেন। ইসলামী রাষ্ট্রতত্ত্বে ঐক্যের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু খলিফাদের শাসনকালে রাজনৈতিক ঐক্য বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। খলিফা ধর্মগুরুর চেয়ে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব হিসেবে গুরুত্ব লাভ করেন।[১] আরবরা পারস্য জয় করার পর পারস্যের রাষ্ট্রতত্ত্ব ও শাসন-ব্যবস্থার খুঁটিনাটি সব কিছু গ্রহণ করেছিল, বাগদাদ থেকে এই ভাবধারা সমগ্র মুসলিম জগতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই রাষ্ট্রতত্ত্বের মূলকথা হলো রাজা ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী। বাগদাদ থেকে এই রাষ্ট্রতত্ত্ব গজনিতে আসে, গজনি থেকে ভারতে প্রবেশ করেছিল। পারস্যের সাসানীয় নরপতিদের রাজতন্ত্রের আদর্শ হলো শাসক শাসিত জনগণের প্রভু ও মালিক, আইন ও ন্যায়ের রক্ষাকর্তা, অভ্রান্ত, দায়-দায়িত্বহীন। রাষ্ট্রের সকলে তাঁর অধীন, সকলে তাঁর প্রতি অনুগত। তত্ত্বগতভাবে দিল্লির সুলতানরা অবাধ সার্বভৌম শাসক ছিলেন। তবে দিল্লির সুলতানরা আব্বাসীয় খলিফাদের সার্বভৌমত্ব মানতেন, খুৎবায় খলিফার নাম উচ্চারিত হতো, মুদ্রায় তাঁর নাম উৎকীর্ণ হতো। মোঙ্গলরা বাগদাদ আক্রমণ করে খলিফা মুস্তাসিম বিল্লাকে হত্যা করলেও সুলতানরা খলিফাকে স্বীকার করতেন। সুলতানরা নিজেদের খলিফার সহকারী রূপে পরিচয় দিতেন। সুলতান ইলতুৎমিস খলিফার স্বীকৃতি পেয়েছিলেন, বলবন খলিফার প্রতি বশ্যতা স্বীকার করেন। মহম্মদ বিন তুঘলকের সময় খলিফার প্রতিনিধি দিল্লিতে এসে তাঁকে সুলতান হিসেবে স্বীকৃতি দেন। একমাত্র ব্যতিক্রম হলেন কুতুবুদ্দিন মুবারক শাহ, তিনি নিজেকে খলিফা বলে ঘোষণা করেন।

নৈরাজ্যের আশঙ্কায় মুসলিম রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সুলতানের কর্তৃত্বকে মেনে নেন। সুলতানির সূচনা থেকে ভারতে একটি বাক্য বহুল প্রচলিত ছিল। শাসক না থাকলে

---

১. The Caliphate, therefore, is a political institution so far as its functions are concerned, though its basis and sanction are canonical, R. C. Majumder, *Delhi Sultanate*, p. 441.

'মানুষে মানুষে ভোক্ষ্য-ভক্ষকের সম্পর্ক হবে'। এই বাক্যটি পয়গম্বরের বলে প্রচার করা হতো। উলেমারা প্রচার করতেন যে, সুলতানের অনুগত হওয়া হলো ঈশ্বরের বিধান। মুসলিম পণ্ডিত গজজালি এধরনের অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁর বক্তব্য হলো শাসকের অভাবে শৃঙ্খলা ভেঙে পড়বে, মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে (without a ruler to guide the affairs of mankind, all order would vanish and the very existence of human race would be endangered.)। ধর্মপ্রাণ শাসক হলেন ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব (the righteous monarch was the vicegerent of God and his shadow on the earth)। দিল্লির সুলতানরা নামমাত্র খলিফার বশ্যতা স্বীকার করতেন, কার্যত তাঁরা সবদিক দিয়ে স্বাধীন ছিলেন। ইসলামী রাষ্ট্রতত্ত্বে ধর্মীয় আইন 'শরা' হলো সার্বভৌম। সুলতানরা ধর্মীয় আইন ও উলেমাকৃত এর ব্যাখ্যা সব সময় মানতেন না। মুসলিম রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা লিখেছেন যে সুলতান কয়েকটি নির্দিষ্ট কর্তব্য পালন করবেন, তাহলে তিনি হবেন বৈধ শাসক। এগুলি হলো—তিনি হবেন ধর্মের রক্ষক, প্রজাদের বিরোধ মেটাবেন, ইসলামী রাজ্য রক্ষা করবেন। দস্যু ও তস্করের হাত থেকে রাস্তাঘাট ও পথিকের নিরাপত্তা বজায় রাখবেন ; আইনবিধির প্রয়োগ করে তিনি শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করবেন ; বিধর্মীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা বজায় রাখবেন। কর আদায় এবং করের বণ্টন হলো তাঁর কাজ। শাসনকাজের জন্য কর্মচারী নিয়োগ করবেন, শাসনের তদারকি করা হলো তাঁর অন্যতম কর্তব্য। এসব কাজ করলে তিনি হবেন বৈধ রাজা। অমুসলমানদের কাছ থেকে কর নিয়ে তিনি তাদের রক্ষা করবেন। দিল্লির সুলতানরা নিরঙ্কুশ স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। শরা, অভিজাততন্ত্র, উলেমা ও জনসমর্থন তাঁদের কর্তৃত্বকে সীমিত করে রেখেছিল। সুলতানের মৃত্যু হলে অভিজাতরা আলোচনার মাধ্যমে পরবর্তী সুলতান নিযুক্ত করতেন। সব সময় উত্তরাধিকার নীতি মানা হতো না, বাহ্যত নির্বাচনের তত্ত্বকে সক্রিয় রাখা হয়েছিল (Generally the form of an election was maintained by the Sultans of Delhi.)। সুলতান অপদার্থ হলে তাকে পদচ্যুত করার অধিকার ছিল। দিল্লির কয়েকজন সুলতান ক্ষমতাচ্যুত হন, মুসলিম রাষ্ট্রতত্ত্বে তা অস্বীকার করা হয়নি।

বলবনের নরপতিত্বের আদর্শ

গিয়াসউদ্দিন বলবন হলেন দিল্লি সুলতানির একমাত্র শাসক যিনি সবিস্তারে রাজতন্ত্র সম্পর্কিত মতবাদ গড়ে তুলেছিলেন। যখনই সুযোগ পেতেন তিনি রাষ্ট্রব্যবস্থায় সুলতানের স্থান এবং জনগণের প্রতি তাঁর কর্তব্য সম্পর্কে কিছু বলতেন। সেই অশান্ত যুগে রাজতন্ত্রকে উচ্চস্থানে বসানোর রাজনৈতিক প্রয়োজন ছিল। সেযুগে সিংহাসনের

দাবিদারের অভাব ছিল না, রাজবংশের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে অবিরাম দ্বন্দ্ব চলেছিল। তুর্কি অভিজাত সম্প্রদায় সিংহাসন নিয়ে শক্তির দ্বন্দ্বে মেতেছিল। ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে রাজতন্ত্র সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করার পেছনে বলবনের দুটি ব্যক্তিগত কারণ ছিল। একটি হলো তার নিজের হীনমন্যতাবোধ (inferiority complex), অপরটি হলো বিবেকের দংশন (guilty conscience)। জামাতা নাসিরুদ্দিন মাহমুদের মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসন দখল করেন। তাঁর সমপর্যায়ভুক্ত তুর্কি অভিজাতদের থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার দরকার ছিল। তিনি এজন্য প্রায়ই বলতেন যে রাজতন্ত্র হলো ঈশ্বরের অংশ, ঈশ্বরের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তি রাজা হন। রাজতন্ত্রের উচ্ছেদকারীরূপে বলবনের কুখ্যাতি ছিল, এই ধারণা তিনি মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন। বলবন প্রচার করেন যে ঈশ্বরের ইচ্ছায় তিনি সিংহাসনে বসেছেন, আততায়ীর ছুরি বা বিষপাত্রের সাহায্য নিয়ে তিনি সিংহাসন অধিকার করেননি। বলবনের আরও একটি দুর্বলতা ছিল, তিনি ছিলেন একজন ক্রীতদাস। দিল্লি সুলতানির প্রথম দিককার সুলতানদের অনেকেই ক্রীতদাস ছিলেন। সুলতান হবার আগে তাঁরা অনেকেই প্রভুর কাছ থেকে মুক্তিপত্র পান। মিনহাজ বা বারানি কেউ বলেননি যে বলবন ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। ইসলামী ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী একজন ক্রীতদাস জনগণের শাসক হতে পারে না। রাজতন্ত্রের ওপর দেবত্ব আরোপ করে বলবন এই দুর্বলতা ঢাকতে চেয়েছিলেন।

বলবন যে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন তার ধাঁচটি পেয়েছিলেন পারস্যের সাসানীয় বংশের শাসকদের কাছ থেকে। পারস্যের শাসকরা রাজতন্ত্রকে সর্বোচ্চ আসনে বসিয়েছিলেন। তাঁরা রাজতন্ত্রের ওপর আরোপ করেন অতিপ্রাকৃত দৈব শক্তি, শাসিত জনগণ তা মেনে নিয়েছিল। ভারতে দৈবানুগৃহীত রাজতন্ত্রের ঐতিহ্য ছিল। রাজবংশে জন্ম না হলে কেউ রাজা হতে পারে না। বলবন নিজের রাজরক্ত প্রমাণ করার জন্য পারস্যের প্রবাদ পুরুষ আফ্রাসিয়াবের বংশধর বলে নিজের পরিচয় দেন। ইংল্যান্ডের স্টুয়ার্ট রাজাদের মতো বলবনের চোখে রাজা হলেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি (নিয়াবত-ই-খুদাই)। পার্থিব জগতে রাজার স্থান হলো ঠিক পয়গম্বরের পরে। বলবন দাবি করেন যে রাজা ঈশ্বরের আলোকে আলোকিত হয়ে (জিল্লুলাহ্) পৃথিবীকে আলোকিত করেন। ঈশ্বরের নিয়মবিধি রাজার মাধ্যমে প্রকাশ পায়, ঈশ্বর কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে রাজা তাঁর কর্তব্য পালন করেন। রাজতান্ত্রিক ক্ষমতার এধরনের ব্যাখ্যার তাৎপর্য হলো রাজা অভিজাত বা জনগণের কাছ থেকে নয়, ঈশ্বরের কাছ থেকে ক্ষমতা লাভ করেন। রাজার ক্ষমতা হলো সীমাহীন, তাঁর কোনো দায়বদ্ধতা নেই। ধর্মের আবরণের মধ্য দিয়ে বলবন নিরঙ্কুশ স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

বলবন মনে করেন যে রাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে হলে রাজা তাঁর আচার-আচরণে সবসময় মর্যাদা ও গাম্ভীর্য রক্ষা করে চলবেন। বলবন তাঁর দীর্ঘ রাজত্বকালে জনগণের কাছ থেকে সবসময় তাঁর দূরত্ব বজায় রেখে চলেছিলেন। তিনি কখনো সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলতেন না, পূর্ণ রাজকীয় পোশাক না পরে তিনি দরবারে আসতেন না। উচ্চ রাজকীয় আদর্শ বজায় রাখার জন্য তিনি দরবারে নতুন নিয়ম, আদব-কায়দার প্রবর্তন করেন। রাজার মর্যাদা ও প্রশাসনের সততা বজায় রাখার জন্য বলবন কখনো নিম্নবর্গের মানুষকে উচ্চপদে বসাননি। সব মানুষকে তিনি দুভাগে ভাগ করেন—অভিজাত ও অনভিজাত। তিনি মনে করেন যে-কোনো নিম্নবংশজাত ব্যক্তি প্রশাসনে নিযুক্ত হলে রাজার সম্মান ও মর্যাদা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষমতালাভের পর প্রশাসনের সব নিম্নবংশজাত ব্যক্তিকে তিনি পদচ্যুত করেন। তিনি বলতেন যে-কোনো নিম্নবংশজাত ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করলে তাঁর সমস্ত স্নায়ুতে উত্তেজনা দেখা দেয়। বলবন বংশ তালিকা নিয়ে খুব মাতামাতি করেছিলেন। তিনি নিজেকে আফ্রাসিয়াবের বংশধর বলে দাবি করেন, তাঁর কর্মচারীদের বংশতালিকা তৈরি করান। তিনি মনে করেন যে পারস্যের রাজতন্ত্রের নিয়ম-কানুন, আদব-কায়দা অনুসরণ করা না হলে ভারতে রাজতন্ত্র স্থায়ী হবে না। তিনি নিজের পারিবারিক জীবনে এবং রাজকার্যে পারস্যের ঐতিহ্য অনুসরণ করেন। পুত্র ও পৌত্রদের পারস্যের বিখ্যাত রাজাদের নামে নামকরণ করেন।

সুলতান হিসেবে বলবন বিচারব্যবস্থার প্রধান ছিলেন, এটিকে তিনি রাজার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে মনে করতেন। স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্য বলবন পরিকল্পিতভাবে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালিয়েছিলেন। তাঁর এই উদ্যোগ জনগণের প্রশংসা অর্জন করেছিল, অন্যায় ও অবিচারের ঘটনা জানতে পারলে তিনি দোষীকে শাস্তি দিতেন। বদায়ুন ও অযোধ্যার শাসক ও নিকট আত্মীয়দের শাস্তি দিয়ে তিনি রাজকর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। তবে রাষ্ট্র ও বংশের স্বার্থে তিনি ন্যায়নীতি বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হতেন না। বলবন মনে করেন যে খলিফার স্বীকৃতি না পেলে কোনো ইসলামী শাসক বৈধ হন না। এসময়ে মোঙ্গল আক্রমণে খলিফার পতন ঘটেছিল, তা সত্ত্বেও তিনি খলিফার স্বীকৃতি পাবার জন্য খুব আগ্রহী ছিলেন। তিনি মুদ্রায় মৃত খলিফার নাম উৎকীর্ণ করেন এবং প্রার্থনায় (খুৎবায়) খলিফার নাম উচ্চারিত হয়। পারস্যের সাসানীয় বংশীয় রাজাদের অনুকরণে বলবন রাজসভা গঠন করেন। পারস্যের নিয়ম-রীতি, আদব-কায়দা তিনি দিল্লিতে প্রবর্তন করেন। পারস্যের রাজাদের মতো বিশাল রাজমুকুট পরে তিনি দরবারে আসতেন। তাঁর গাম্ভীর্য, ব্যক্তিত্ব ও রাজসভার জাঁকজমক, কঠোর নিয়ম-রীতি তাঁর দরবারকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিল।

চারপাশে রাজসভার কর্মচারী, হাজিব, সালাদার, জানদার, চৌসে, নকিব তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকত। রাজসভায় উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তিকে সিজ্‌দা ও পাইবস (আভূমি নত হয়ে কুর্নিশ ও পদচুম্বন) করতে হতো। সুলতানের সামনে কেউ হাসি-ঠাট্টা করতে পারত না। রাজসভায় কয়েকজন মালিক ও আমীর ছাড়া আর কারও বসার অধিকার ছিল না। রাজসভায় বলবনকে কেউ হাসতে দেখেনি, বলবনের প্রিয় জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদ মারা গেলেও তাঁকে কেউ কাঁদতে দেখেনি, তাঁর দৈনন্দিন কর্মসূচির কোনো পরিবর্তন হয়নি। উৎসবের সময় বলবনের দরবার নতুন সাজে সজ্জিত হতো। দামি কার্পেট, পর্দা, সোনা-রুপোর বাসনপত্র দরবারে আনা হতো, দর্শকরা বিস্ময়ে অভিভূত হতো। বারানি লিখেছেন যে উৎসব শেষ হবার অনেক পরেও এই ঐশ্বর্যের কথা অনেকদিন লোকমুখে ঘুরত। বিদেশী রাষ্ট্রদূতরা বলবনের রাজসভার জাঁকজমক দেখে বিস্মিত হন। সুলতান যখন রাস্তায় বেরোতেন দুর্ধর্ষ দেহরক্ষীরা উন্মুক্ত তরবারি হাতে তাঁর সঙ্গে থাকত। এসবের মধ্য দিয়ে বলবন তাঁর ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা করেন, রাজানুগত্য সম্পর্কে যাদের বিন্দুমাত্র শৈথিল্য ছিল তারা বশীভূত হয়। প্রজাদের মনে বিস্ময় ও ভয় সৃষ্টি করে তিনি রাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করেন।

বলবন নিজে ‘চল্লিশার’ সদস্য ছিলেন। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে তাঁর মৃত্যুর পর তুর্কি অভিজাতরা তাঁর রাজতন্ত্রকে দুর্বল করে ফেলবে, সিংহাসন নিয়ে নতুন করে দ্বন্দ্ব দেখা দেবে। সীমান্তে অভিজাতরা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এজন্য তিনি ইলতুৎমিসের পরিবারের সকলকে হত্যা করেন, অভিজাতদের অনেককে তিনি গোপনে বিষপ্রয়োগ বা গুপ্তহত্যার মাধ্যমে সরিয়ে দেন। নিজ পরিবারের স্বার্থকে সুরক্ষিত করতে গিয়ে তিনি তুর্কি শাসকশ্রেণীকে দুর্বল করে দেন। পরবর্তীকালে খল্‌জিদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এরা পরাস্ত হয়েছিল। বলবন ইচ্ছাকৃতভাবে স্বৈরাচারী, নিরঙ্কুশ দৈবানুগৃহীত রাজতন্ত্রের আদর্শ প্রচার করেন। তিনি মনে করেন যে ইহজগতে শুধু পয়গম্বর ও খলিফা তাঁর ওপরে আছেন, এদের পরেই সুলতানের স্থান। এই ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ রাজতন্ত্র তিনি গড়ে তোলেন। এই রাজতন্ত্রের ওপর অভিজাততন্ত্র ও উলেমাদের বিশেষ প্রভাব ছিল না, এই দুই সামাজিক গোষ্ঠীকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। রাজতন্ত্রের অধীনে শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন করে তিনি দূরবর্তী প্রদেশগুলির ওপর কর্তৃত্ব বজায় রাখেন। সৈন্যবাহিনীর সাহায্য নিয়ে তিনি অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দমন করেন, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করেন। স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের স্বার্থে তিনি বিচারের ক্ষেত্রে সকলের সমতা প্রতিষ্ঠা করেন, এতে রাজার কর্তৃত্ব সারা দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। পারস্যের রাজবংশের অনুকরণে রাজসভা গঠন করে তিনি স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রকে ভারতের মাটিতে বাস্তবায়িত করতে চেয়েছিলেন।

আলাউদ্দিনের নরপতিত্বের আদর্শ

বলবন স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠা করলেও বংশগত গোঁড়ামি ও জাত্যভিমানের জন্য তিনি রাজতন্ত্রকে যথেষ্ট শক্তিশালী করতে পারেননি। আলাউদ্দিন খল্‌জি রাজার নিরঙ্কুশ ক্ষমতাকে ব্যাপক ও দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে রাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছিলেন। কোনো বংশগত গোঁড়ামি বা জাত্যভিমান তাঁর ছিল না। তিনি তুর্কি, অতুর্কি, হিন্দু, মুসলমান সকলকে অভিজাততন্ত্রে স্থান দেন, এজন্য তাঁর শক্তির উৎস হয় বিস্তৃত, ব্যাপক ও শক্তিশালী। কোনো এক বিশেষ গোষ্ঠী বিদ্রোহ করে তাঁর রাজতন্ত্রকে দুর্বল করে দিতে পারত না। বলবন অভিজাততন্ত্রের আর্থিক সম্পদ ও ক্ষমতা খর্ব করেননি। অর্থনৈতিক দিক থেকে অভিজাতরা যথেষ্ট শক্তিশালী ও বিপজ্জনক ছিল। আলাউদ্দিন অভিজাতদের অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে খর্ব করে তাদের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেন। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে একটি বিশাল শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন করেন, এটি ছিল তাঁর রাজতন্ত্রের ক্ষমতার একটি উৎস। সামরিক শক্তি গঠন করলেও আলাউদ্দিনের স্বৈরতন্ত্র শুধু তার ওপর স্থাপিত হয়নি। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে শুধু সামরিক শক্তির ওপর রাজতন্ত্র নির্ভরশীল হতে পারে না। মধ্যযুগের সাধারণ মানুষ রাজার ক্ষমতা সম্পর্কে খুব সচেতন ছিল না। আলাউদ্দিন প্রশাসনিক ও সামাজিক সংস্কারের মাধ্যমে জনগণের আনুগত্য লাভ করেন। তাঁর অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্য জনগণ অর্থনৈতিক নিরাপত্তা পেয়েছিল। গ্রামের খুত, মুকাদ্দম ও চৌধুরীদের ক্ষমতা খর্ব করে তিনি জনগণকে খানিকটা স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য দেন।

আলাউদ্দিনের সংস্কারগুলি অবশ্যই তাঁর স্বৈরাচারকে শক্তিশালী করেছিল। আলাউদ্দিনের স্বৈরাচার ছিল সামরিকতন্ত্র ও প্রজাহিতৈষণার এক মিশ্রণ। আলাউদ্দিন তাঁর পূর্ববর্তী শাসকদের মতো উত্তরাধিকারী মনোনীত করে রাজতন্ত্রকে বংশানুক্রমিক চরিত্র দেন। তিনি মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ করেন, অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করে দেশে শান্তি স্থাপন করেন। প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। সমকালীন লেখকরা তাঁকে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব, মহান খলিফা, বিশ্ববিজেতা প্রভৃতি আখ্যা দিয়েছেন। আলাউদ্দিন নিজে কখনো খলিফা উপাধি নেননি। বাস্তবে খলিফার অস্তিত্ব না থাকলেও তিনি নিজেকে খলিফার সহকারী বলেছেন। খুৎবায় ও মুদ্রায় খলিফার নাম উচ্চারিত হয়েছে। খুৎবা ও মুদ্রায় তিনি নিজেকে 'সিকান্দার সানি' (দ্বিতীয় আলেকজান্ডার) বলেছেন। আলাউদ্দিন ছিলেন একজন বিচক্ষণ রাষ্ট্রনেতা। তিনি জানতেন মুসলমানদের কাছে খলিফার তাৎপর্য ও গুরুত্ব আছে, মুসলমানদের এই ঐতিহ্যকে তিনি আঘাত করতে চাননি। তবে রাষ্ট্র পরিচালনায় তিনি কখনো শরিয়তকে পুরোপুরি মেনে চলেননি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় গোঁড়ামি তাঁকে প্রভাবিত

করতে পারেনি। তিনি মনে করেন রাষ্ট্র হলো একটি রাজনৈতিক সংস্থা, ধর্মীয় নয়। বারানি জানাচ্ছেন যে সিংহাসন লাভের পর তিনি এই সিদ্ধান্ত নেন যে রাষ্ট্র ও নীতি হলো স্বতন্ত্র, শরিয়ত ও ধর্মীয় বিধি-বিধান হলো ভিন্ন ধরনের। রাজা রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করবেন, কাজী ও মুফ্‌তি শরিয়ত ও আইন ব্যাখ্যা করবেন (Policy and government are one thing, and the rules and decress of law are another. Royal commands belong to the king, legal decrees rest upon the judgment of Qazis and Muftis.)। কাজী মুঘিশউদ্দিনের সঙ্গে আলোচনাকালে আলাউদ্দিন তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্ব সম্পর্কে ধারণা প্রকাশ করেন। তিনি রাষ্ট্রের ব্যাপারে ধর্মীয় আইন ও উলেমাদের প্রাধান্য পছন্দ করেননি। তিনি কাজীকে বলেছিলেন যে কোন্‌টি আইন, কোন্‌টি বেআইন তিনি বোঝেন না। রাষ্ট্রের মঙ্গল ও জরুরি প্রয়োজন দেখা দিলে তিনি ব্যবস্থা নেন (he did not know what was lawful or unlawful, but followed what he thought to be for the good of the state or suitable for the emergency.)। রাষ্ট্রের স্বাধীন, স্বতন্ত্র সত্তার কথা তিনি বলেছিলেন। পরবর্তীকালে ইউরোপে যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রসত্তার প্রতিষ্ঠা হয় (statism) আলাউদ্দিনের রাজতান্ত্রিক আদর্শের মধ্যে তার আভাস পাওয়া যায়। রাষ্ট্রকে শরিয়তের গণ্ডির মধ্যে তিনি আবদ্ধ রাখেননি, উলেমাদের প্রভাবমুক্ত করে তিনি রাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করেন। রাষ্ট্রের নিজস্ব সত্তার প্রতিষ্ঠা হয় (statism)। আলাউদ্দিন প্রমাণ করেছিলেন যে রাষ্ট্র হলো ধর্মনিরপেক্ষ, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য বা অস্তিত্বের জন্য ধর্মের সমর্থনের প্রয়োজন নেই। বংশগরিমা, জাত্যভিমান, ধর্মের সমর্থন, নির্বাচন বা খলিফার অনুমোদন রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজন হয় না।

রাষ্ট্রের প্রতীক ও প্রতিষ্ঠানসমূহ

দিল্লি সুলতানির ছিল দুই রূপ—ব্যক্তিগত ও সরকারি। কে. এম. আশরাফ জানিয়েছেন যে এই যুগে সুলতান ও রাষ্ট্র সমার্থক ছিল, সুলতানের প্রভাব ছিল সমাজের ওপর। অভিজাততন্ত্র অবশ্যই সুলতানি আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হতো। দিল্লির সুলতানরা সাসানীয় রাজাদের মতো বিশাল প্রাসাদ বানিয়ে তাতে বাস করতে ভালোবাসতেন, বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁরা পোষণ করতেন। পোষ্য, অনুচর, পরিচারক, ক্রীতদাস ও হারেম নিয়ে তাঁরা গৃহস্থালি রচনা করতেন। রাজকীয় সমারোহ তাঁরা পছন্দ করতেন, গজনি থেকে এই ঐতিহ্য তাঁরা লাভ করেছিলেন। সুলতান মামুদের আদর্শ দিল্লির সুলতানিকে প্রভাবিত করেছিল। সুলতানের গৃহস্থালি ছিল দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড়, এতে তাঁর রাজকীয় মর্যাদা বজায় থাকত। সুলতানরা বড় বড় প্রাসাদ বানাতেন। দুধরনের প্রাসাদের কথা জানা যায়—সুলতানের ব্যক্তিগত আবাসস্থল দৌলতখানা (সৌভাগ্য নিবাস) এবং কর্মস্থল কসর-এ-ফিরুজি (বিজয় প্রাসাদ), কসর-

এ-সফিদ (শ্বেত প্রাসাদ) কুস্‌ক্‌-এ-সব্‌জ (সুবজ প্রাসাদ) প্রভৃতি। নতুন রাজবংশ নতুন রাজধানী স্থাপন করত, কোনো কোনো শাসক নিজের পছন্দমতো রাজধানী স্থাপন করতেন। কায়কোবাদ নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। এইসব নগরে থাকত রাজপ্রাসাদ, বাজার, উদ্যান, মস্‌জিদ, রাস্তা ও কেল্লা। প্রাচীনকালের একডজন রাজধানী নিয়ে বর্তমান দিল্লি গড়ে উঠেছে। সিরি, কিলোঘিরি, শহ্‌র-ই-নও, তুঘলকাবাদ, ফিরোজাবাদ হলো সুলতানি যুগের রাজধানী। ফিরুজ তুঘলকের তিনখানা প্রাসাদ ছিল। সুলতানদের হারেম ছিল, এইসব হারেমে পত্নী ও উপপত্নীরা থাকতেন। সুলতানদের একজন করে প্রধান বেগম থাকতেন, তাঁর গর্ভজাত পুত্র সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হতেন। শাসক নাবালক হলে তাঁর মাতা অভিভাবিকা হতেন। বিজিত সুলতানের হারেমের অধিকারী হতেন বিজয়ী সুলতান। হারেমে সুলতানের মাতা, ভগিনী ও কন্যারাও থাকতেন। সুলতান ছিলেন প্রাসাদের সর্বময় কর্তা। খোজারা হারেম পাহারা দিতো, একজন সম্ভ্রান্তবংশীয়া রমণী হারেমের তত্ত্বাবধান করতেন, তিনি হাকিম নামে অভিহিত হতেন। হারেম দেখাশোনার জন্য একাধিক মহিলা কর্মচারী থাকত।

সুলতানের খাস ক্রীতদাস (বন্দগান-ই-খাস) থাকত, সুলতান শাসন ব্যাপারে এদের ওপর অনেকখানি নির্ভর করতেন। সুলতানের ক্রীতদাসের সংখ্যা নেহাত কম হতো না, ফিরুজ তুঘলকের এক লক্ষ আশি হাজার ক্রীতদাস ছিল। তিনি ছিলেন দাসদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। সুলতান ও ক্রীতদাসদের মধ্যে সুসম্পর্ক ছিল। সুলতানের ক্রীতদাসরা তাঁর দেহরক্ষী ও প্রাসাদরক্ষীর কাজ করত, সুলতানের কারখানায় এরা পণ্য উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত হতো। এরা সুলতানের কাছের মানুষ হতো এবং সমাজে এজন্য এরা প্রতিপত্তি লাভ করেছিল। সুলতানরা হিন্দু রাজাদের মতো জ্যোতিষে বিশ্বাস করতেন, জীবনের ছোট-বড় সব ব্যাপারে তাঁরা জ্যোতিষির মতামত নিতেন। সুলতানের দরবারে সভাকবি ও গায়করা স্থান পেতেন। এরা ফার্সি কবিতার সমাদর করতেন এবং নিজেরাও কবিতার দু-এক চরণ রচনা করতে পারতেন। গায়করা সুলতানকে গান শোনাতেন, এই ঐতিহ্য পারস্য থেকে এসেছিল। সুলতানের দরবারে পারিষদরা ছিলেন, এদের নির্দিষ্ট কোনো কাজ ছিল না, এরা সব সময় মার্জিত বা রুচিসম্পন্ন হতো না। সুলতানের পার্শ্বচররা 'নাদিম' নামে পরিচিত ছিল, এরা নানা রঙ্গ-কৌতুকের মাধ্যমে সুলতানের মনোরঞ্জন করত। এরা সরকারি পদে ছিল না এবং সুলতানকে শাসন ব্যাপারে কোনো পরামর্শ দিত না। নাদিমদের বেশিরভাগ হতো মার্জিত, রুচিসম্পন্ন ও বুদ্ধিদীপ্ত, এরা বাদ্যযন্ত্র বাজাতে জানত, খেলাধুলায় পারদর্শী ছিল।

সুলতানের গৃহস্থালি দেখাশোনার জন্য একদল কর্মচারী ছিল, সুলতান এদের বেতন দিতেন, এরা কাজের জন্য সুলতানের কাছে দায়বদ্ধ থাকত। এরা সুলতানের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করত এবং তাঁর আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করাও ছিল এদের কাজ।

সরজনদার ও সরসিলাদার নামে দুজন পদস্থ কর্মচারী এই কাজের তত্ত্বাবধান করত। সরজনদার সুলতানের দেহরক্ষী বাহিনীর প্রধান ছিলেন, সরসিলাদার ছিলেন সুলতানের অস্ত্রাগারের প্রধান। সুলতানের নিত্যক্রিয়ার তত্ত্বাবধান করতেন 'সর-আবদার'! খরিতদার সুলতানের লেখার সরঞ্জামের দায়িত্বে ছিল, তহবিলদার সুলতানের অর্থের দায়িত্ব নিত। চাশনিগির পাকশালার তদারকি করত, ঘরজমাদার সুলতানের পোশাক-পরিচ্ছদের দায়িত্বে ছিল, সাকি-এ-খাস তাঁর সুরার ও পানীয়ের ভারপ্রাপ্ত ছিল। মশালদার প্রাসাদ আলোকিত রাখার দায়িত্বে ছিল। সুলতানের অশ্বশালার রক্ষক ছিলেন আমির-এ-আখুর, হাতিশালার অধ্যক্ষ হলেন শাহানা-এ-পিল, শাহানা-এ-বহর ছিল রাজতরণীর তত্ত্বাবধায়ক। সুলতানের গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় সামগ্রী সুলতানের কারখানায় তৈরি হতো। এখান থেকে সুলতানের প্রয়োজনীয় পণ্য ছাড়াও অভিজাতদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ্ করা হতো। সুলতানের ধ্বজা সরবরাহের জন্য ছিল অলমখানা, গ্রন্থাগারের জন্য কিতাবখানা, ঘণ্টার জন্য ঘড়িয়ালখানা এবং মণিমুক্তোর জন্য জহরখানা। সুলতানের সম্পদ কম ছিল না, সারাদেশে সুলতানের প্রচুর খাসজমি ছিল যার আয় সরাসরি রাজকোষে জমা হতো। তাঁর খাসজমি দেখাশোনার জন্য পদস্থ কর্মচারীরা ছিলেন। *মাসালিক-অল-অবসরে* মহম্মদ বিন তুঘলকের গৃহস্থালির যে বর্ণনা আছে তা এককথায় ছিল বিস্ময়কর।

দিল্লির শাসকরা দৈবানুগৃহীত রাজতন্ত্রের ধারণা গ্রহণ করেন, জাঁকজমকপূর্ণ রাজসভা গঠন করেন। জনগণের মনে ত্রাস ও বিস্ময় সৃষ্টি করে তাঁরা রাজতন্ত্রকে সংহত করতে চেয়েছিলেন। এজন্য তাঁরা রাজকীয় খেতাব, খুৎবা ও সিক্কার মাধ্যমে রাজকীয় মহিমাকে তুলে ধরেন। সুলতান যখন বাইরে যেতেন বিরাট শোভযাত্রা তাঁর সঙ্গে যেত, এতে রাজকীয় মহিমার প্রকাশ ঘটত। সুলতানরা নানা ধরনের খেতাব গ্রহণ করতেন। সৈয়দরা 'মসনদ-এ-আলি' উপাধি নেন, শেরশাহ্ হজরত আলা ও সুলতান উপাধি নেন। সুলতানরা নিজেদের ইমাম বলতেন এবং মুসলমানরা তাদের 'খোদাবন্দ-এ-আলম' (দুনিয়ার মালিক) বলে সম্বোধন করত। সুলতান ক্ষমতা গ্রহণ করে বিশেষ প্রার্থনার ব্যবস্থা করতেন (খুৎবা), এখানে সুলতানের নামে প্রার্থনা করা হতো। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে খুৎবা পাঠ করা হতো। সুলতান ক্ষমতা লাভ করে নিজের নামে মুদ্রা চালু করতেন, এই অনুষ্ঠানের নাম হলো সিক্কা। কোনো বিশেষ উপলক্ষ্যে মুদ্রা প্রচলনের রীতি ছিল। রাজমুকুট ও সিংহাসন ছিল রাজকর্তৃত্বের প্রতীক। বলবন একখানি বিশাল মুকুট পরে দরবারে আসতেন। সুলতানরা সোনার পাতে মোড়া কাঠের সিংহাসন ব্যবহার করতেন। তাঁরা সিংহাসনের চারপাশ মহার্ঘ জমকালো সামিয়ানা দিয়ে ঘিরে রাখতেন। রাজক্ষমতার প্রতীক ছিল ছত্র ও রাজদণ্ড (দূরবাশ)। সুলতানের রুচি অনুযায়ী ছাতার রঙ হতো। তুঘলকরা আব্বাসীয়দের মতো কালো

ছাতা ব্যবহার করতেন। ছাতার ওপর শুভচিহ্ন হিসেবে বিশাল এক সোনার জুমা পাখি চিত্রিত থাকত।

সুলতান ছাড়া আর কারও ছত্র ব্যবহারের অধিকার ছিল না। অন্য কেউ ছত্র ব্যবহার করতে পারত সুলতানের অনুমতি নিয়ে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন শুধু ছত্র ব্যবহারের অনুমতি পেত। তবে সুলতানের ছত্র ও তাদের ছত্রের মধ্যে পার্থক্য থাকত। কাঠের দণ্ড সোনা দিয়ে মুড়ে রাজদণ্ড তৈরি করা হতো। রাজকীয় কর্তৃত্বের আরও তিনটি প্রতীক হলো লাল সামিয়ানা (সাইবান), ঐকতান বাদ্য (নৌবত) ও রাজকীয় ধ্বজা (অলম)। সুলতান শুধু তাঁর অনুগৃহীত ব্যক্তিদের এগুলি ব্যবহারের অনুমতি দিতেন। সুলতানের নৌবতে ছিল ভেরি, তুরি, বাঁশী, ভেঁপু, ডঙ্কা ইত্যাদি। প্রতিদিন নির্ধারিত সময়ে প্রাসাদে এই বাদ্য বাজানো হতো। সুলতান যখন বাইরে যেতেন তাঁর দুইপাশে ধ্বজাধারীরা থাকতেন। সুলতানের ধ্বজায় প্রতীক চিহ্ন ছিল মৎস্য ও অর্ধচন্দ্র। পতাকা ছাড়াও অন্য অনেক নিশান রাজার শোভাযাত্রায় স্থান পেত। সুলতানের অধিকারে ছিল হাতি ও সোনা-রুপোর সঞ্চয়। সুলতানের অনুমতি ছাড়া এগুলি রাখা যেত না। বুঘরা খান তাঁর পুত্রকে ধনসঞ্চয়ের উপদেশ দেন। সুলতানদের ঐশ্বর্যশালী রাজসভা ছিল। বিভিন্ন সময়ে বা উৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ অধিবেশন বসত। রাজ্যাভিষেকের সময়, সুলতানের জন্মদিনে এবং ধর্মীয় উৎসবে রাজসভা বিশেষভাবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠত। এইসব সময়ে রাজকীয় শোভাযাত্রা বার হতো। পারস্যের বসন্তোৎসব নওরোজ বিশেষ উদ্দীপনা সহকারে পালন করা হতো। দরবারের আদব-কায়দা নির্দিষ্ট ছিল, অভিজাতরা পদমর্যাদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট আসনে বসতেন। দরবারের জন্য বিশেষ পোশাক নির্দিষ্ট ছিল, দরবারের কর্মচারীদের জন্যও নির্দিষ্ট পোশাক ছিল, দরবারের আদব-কায়দা বজায় রাখার জন্য কর্মচারীরা ছিল। বারবকরা দরবারীদের দরবারে এনে বসাতেন, কুর্নিশ ও তসলিম প্রথা ছিল। এটি হলো অভিবাদন জানানো ও ভূমিচুম্বন।

সুলতানের দরবারে নজর ও নিসার নামে দুটি অনুষ্ঠান ছিল। দর্শনার্থী সুলতানকে মূল্যবান বস্তু নজর হিসেবে দিত, নিসার হলো একটি শুভ অনুষ্ঠান। সোনা, রুপো ও মূল্যবান ধাতু সুলতানের মাথার ওপর দিয়ে কয়েকবার ঘুরিয়ে দুঃস্থ ও দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করা হতো। কোনো অশুভ শক্তির প্রভাব থেকে রক্ষা পাবার জন্য এই উৎসব পালন করা হতো। সুলতানের দরবারি কাজকর্ম পরিচালনার জন্য তিনজন বিশিষ্ট কর্মচারী ছিলেন। এরা হলেন বারবক, হাজিব ও ভকিল-ই-দার। আবেদন-কারীরা বারবকের কাছে তাঁদের আবেদনপত্র জমা দিতেন, তিনি সুলতানের কাছে সেগুলি পেশ করতেন। হাজিবের কাজ ছিল দরবারি নিয়ম-কানুন যথাযথভাবে বজায় রাখা। হাজিব দর্শনার্থীকে সুলতানের কাছে হাজির করতেন। ভকিল-এ-দার

দরবারের সচিব হিসেবে কাজ করতেন, সবরকম রাষ্ট্রীয় দলিলপত্রের তিনি হিসেব রাখতেন। দরবারের বিভিন্ন কাজকর্মের জন্য আরও কিছু আমলা ছিল, শহ্‌ন-এ-বরগাহ দরবারের তত্ত্বাবধান করতেন। দাবাতদার ও মুহরদার সুলতানের লিখনাধার ও সীলমোহরের তত্ত্বাবধায়ক ছিল। নকিব ও তার সহকারীরা দর্শনার্থীদের পথ দেখিয়ে দরবারে নিয়ে যেত, রাজকীয় মিছিলের আগে আগে নকিবরা যেত। দরবারকক্ষে সুলতান উজির, সচিব ও করণিকদের নিয়ে বসতেন, সুলতানের চারপাশে উলেমা, ওমরাহ ও সুলতান পরিবারের সদস্যরা থাকতেন। দর্শনার্থীকে নকিব দরবার কক্ষে নিয়ে যেত। আবেদনপত্র তিনি বারবকের হাতে দিতেন, বারবক সেখানি সুলতানের কাছে পেশ করত। সুলতান দরবার কক্ষ ত্যাগ করলে হাজিব সব কাগজপত্র ভকিল-এ-দারের হাতে দিত। সুলতানের নির্দেশ অনুযায়ী ভকিল-এ-দার যথাবিহিত ব্যবস্থা নিত।

সুফি ও ভক্তদের সঙ্গে সম্পর্ক

চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে ভারতে ভক্তি ধর্ম ও সুফি মতবাদ বিস্তারলাভ করেছিল। ভক্তিবাদীরা ভক্তিকে মুক্তির উপায় বলে মনে করেন, জাতিভেদ প্রথা, পুরোহিত তন্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি মানতেন না। এঁরা সকল মানুষের সমতায় বিশ্বাসী ছিলেন, সামাজিক ন্যায় ও সাম্যের কথা বলেন। রামানন্দ, কবীর, নানক, চৈতন্যদেব, জ্ঞানদেব, নামদেব প্রমুখ সন্তরা সারাদেশে ভক্তি ধর্মের অনুকূলে জনমত গঠন করেন, সাধারণ মানুষ এঁদের প্রভাবে প্রভাবিত হন। সুফিরা একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন, এঁরাও যাজকতন্ত্র, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি মানতেন না। এঁরা খান্‌কায় থাকতেন, পবিত্র, নির্মল জীবনযাপন করতেন। মৈনুদ্দিন চিশ্‌তি, নিজামুদ্দিন আউলিয়া, ফরিদউদ্দিন, শেখ জালালুদ্দিন সকলে ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন সুফি সাধক, হিন্দু ও মুসলমান সকলে এঁদের শ্রদ্ধা করতেন। সাধারণ মানুষের ওপর এদের প্রভাব লক্ষ করে সুলতানরা রাজনৈতিক স্বার্থে এঁদের সমর্থন কামনা করতেন।

সুফি ও ভক্তরা কিন্তু সুলতানদের সান্নিধ্য পছন্দ করতেন না, পার্থিব সম্পদ ও পদের মোহ এদের ছিল না। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে এঁরা মাথা ঘামাতেন না। সুলতানরা দৈবানুগৃহীত রাজতন্ত্রের আদর্শ প্রচার করলে সুফি ও দরবেশরা তার বিরোধিতা করেন। সুলতানরা এঁদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, মহম্মদ বিন তুঘলক নিজামুদ্দিন আউলিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। কিন্তু দরবেশ ও সুফিরা তাঁকে পছন্দ করত না। অনেক দরবেশকে তিনি উচ্চপদে বসিয়েছিলেন কিন্তু তাঁরা সুলতানের কাজকর্মকে সমর্থন করেননি। এজন্য কয়েকজনকে তিনি কঠোর শাস্তি দেন। সুফিরা মনে করতেন যে, শয়তান কবলিত ব্যক্তিরা শুধু পার্থিব ভোগসুখের সন্ধান করে।

ধর্মনিষ্ঠ দীন ব্যক্তিরা আত্মার অমলিন শুদ্ধতা নিয়ে পবিত্র জীবনযাপন করে। দিল্লির সুলতান ও প্রাদেশিক শাসকরা ভক্তদেরও সম্মান করতেন। বাংলার শাসক আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্ চৈতন্যদেবের প্রতি শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। মহম্মদ বিন তুঘলক হিন্দু সন্ত ও জৈন সাধুদের সম্মান করতেন। জৈন গুরু জীনসেন সুরিকে তিনি দরবারে এনে সম্বর্ধনা দেন। জৈন সাধুদের জন্য তিনি অর্থ ও নিষ্কর ভূমিদান করেন। সুফি ও ভক্তরা সুলতানদের অর্থ ও প্রতিপত্তির দিকে তাকাননি, রাজকীয় টাঁকশালে তৈরি অর্থকে তাঁরা অপবিত্র মনে করতেন। তা সত্ত্বেও সুলতানরা এঁদের সঙ্গ কামনা করতেন, ভক্ত ও সুফিদের সঙ্গে মিশতেন, এঁদের কাছ থেকে উপদেশ নিতেন। এঁদের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হয়ে তাঁরা তাঁদের অবস্থানকে দুর্বল করতে চাননি। সেযুগে ভক্ত ও সুফিরা ছিল জনগণের স্বাভাবিক নেতা। সর্বস্তরের মানুষকে এরা প্রভাবিত করেন।

দিল্লি সুলতানির রাজতান্ত্রিক আদর্শের বিবর্তন

১২০৬ খ্রিস্টাব্দে সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবক ভারতে সুলতানির প্রতিষ্ঠা করেন। মৈজুদ্দিন মহম্মদ ঘুরির মৃত্যুর পর তিনি লাহোরে নিজেকে সুলতান বলে ঘোষণা করেন। লাহোরের অধিবাসীরা তাঁর এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছিল। গজনির শাসক তাজউদ্দিন ইলদুজ তাঁকে স্বাধীন সুলতান হিসেবে মেনে নিতে চাননি। তাঁকে ইলদিজের বিরুদ্ধে লড়াই করে স্বাধীন সুলতান হিসেবে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয়। গজনি ও ঘুরের শাসকেরা সেই মুহূর্তে দিল্লির স্বাধীন সুলতানিকে স্বীকার করে নিতে চাননি। সুলতান হিসেবে কুতুবুদ্দিন নিজের নামে খুৎবা পাঠ করেছিলেন কিন্তু তাঁর নাম উৎকীর্ণ করা কোনো মুদ্রা পাওয়া যায়নি। তবে সমকালীন ঐতিহাসিকরা জানাচ্ছেন যে কুতুবুদ্দিন মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন। ইবন বতুতা কুতুবুদ্দিনকে স্বাধীন সুলতান হিসেবে স্বীকার করে নেননি। ফিরুজ তুঘলক দিল্লির স্বাধীন সুলতানদের যে তালিকা তৈরি করেছিলেন এবং যে তালিকা অনুযায়ী খুৎবায় পূর্ববর্তী সুলতানদের নাম উচ্চারিত হতো তাতে কুতুবুদ্দিনের নাম ছিল না। ঘুরির অধীনস্থ সেনাপতিরা তাঁকে সুলতান হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন কিনা সেবিষয়ে সন্দেহ আছে। অধ্যাপক শ্রীবাস্তব তাঁকে দিল্লির প্রথম স্বাধীন সুলতান হিসেবে মেনে নিয়েছেন কিন্তু অধ্যাপক ত্রিপাঠী তাঁকে প্রথম সার্বভৌম সুলতান হিসেবে স্বীকার করে নেননি।

কুতুবুদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা ইলতুৎমিস দিল্লির সুলতান হন। কুতবি আমীররা তাঁর বিরোধিতা করেছিল। তিনি কুতুবুদ্দিনের পুত্রের দাবিকে নস্যাৎ করে সিংহাসন অধিকার করেন। ইলতুৎমিস নিজের প্রতিভাবলে সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটান ইলতুৎমিস সিংহাসন অধিকার করে বাগদাদের খলিফার অনুমোদন আনিয়েছিলেন এতে তাঁর রাজবংশের শাসনের অধিকার শক্তিশালী হয়েছিল। তবে ইলতুৎমিস তুর্কি

অভিজাতদের যথেষ্ট সম্মান করতেন। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠদের সামনে সিংহাসনে বসতে অস্বস্তি বোধ করতেন। দিল্লি সুলতানির ওপর মৈজুদ্দিনের দুই সহকারী গজনির ইলদুজ ও মুলতানের নাসিরুদ্দিন কুবাচা দাবি রেখেছিলেন। ইলতুৎমিস এদের পরাস্ত ও নিহত করে দিল্লিকে মধ্য এশিয়ার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করেন। কে. এ. নিজামী মনে করেন যে ইলতুৎমিস হলেন স্বাধীন দিল্লি সুলতানির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। খলিফার অনুমোদন নিয়ে সুলতানি প্রতিষ্ঠা করলেও রাজনীতিতে তিনি উলেমাদের প্রভাব বিস্তার করতে দেননি। তিনি সুলতানির লক্ষ্য ও নীতি নির্ধারণ করে দেন। নিজামীর মতে আইবক শুধু দিল্লি সুলতানির রূপরেখাটির কথা ভেবেছিলেন, ইলতুৎমিস একে দেন ব্যক্তিত্ব, মর্যাদা, লক্ষ্য, পথ, শাসন ও শাসকগোষ্ঠী।

গণতান্ত্রিক আদর্শের মধ্য থেকে ইসলামের যাত্রা শুরু হয়েছিল। মক্কা ও মদিনার ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিল সাম্য ও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র। খলিফারা 'বিশ্বাসীদের প্রধান' হিসেবে কাজ করতেন। এদের আদব-কায়দা, জীবনযাত্রা সব ছিল অত্যন্ত সাধারণ, সহজ-সরল, অনাড়ম্বর। ভারতে যে সুলতানি রাষ্ট্র গড়ে ওঠে তা আরব আদর্শ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল। ভারতের সুলতানি যুগের রাজতান্ত্রিক আদর্শের মধ্যে তুর্কি, ইরানি ও মোঙ্গল আদর্শের মিশ্রণ ঘটেছিল। তুর্কি ও মোঙ্গল নেতাদের মধ্যে শক্তিশালী ব্যক্তি আমীর বা প্রধান হিসেবে কাজ করতেন। সামরিক শক্তি ছিল রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তি। এই আদর্শের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পারস্যের সাসানীয় রাজাদের আদর্শ। ভারতের সুলতানরা এই আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সুলতানকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে ভাবতে থাকেন। রাজা সাধারণ মানুষ নন, তিনি ঈশ্বরের আশীর্বাদপুষ্ট ব্যক্তি, দৈব কর্তৃত্বের অধিকারী। তাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে। সুলতানির ওপর দেবত্ব আরোপ করে একে মহিমান্বিত ও মর্যাদাপূর্ণ করে গড়ে তোলা হয়।

ইলতুৎমিস বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে প্রথম পদক্ষেপ নেন। তিনি তাঁর কন্যাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। তিনি মনে করেন তাঁর পুত্র-কন্যাদের মধ্যে কন্যা রাজিয়া হলেন শাসক হবার উপযুক্ত। তিনি সুলতানি রাজতন্ত্রের সঙ্গে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেন। শাসকের শাসনের যোগ্যতা থাকলে তিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হবেন। অভিজাতদের একাংশের বিরোধিতা সত্ত্বেও রাজিয়া সিংহাসনে বসেন এবং অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। কিন্তু সমকালীন উলেমারা এবং ষড়যন্ত্রপ্রিয় অভিজাতদের একাংশ তাঁর বিরোধিতা করলে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন। রাজিয়ার ভ্রাতা সুলতান হন। এই ঘটনা থেকে একটি তত্ত্ব পরিষ্কার হয়ে যায়—তুর্কি অভিজাতরা বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার নীতিকে মেনে নেন। কিন্তু ক্ষমতার অংশীদারত্ব তাঁরা ছাড়তে চাননি। ঠিক হয় অভিজাতদের মধ্যে

একজন নায়েব পদ পাবেন এবং সুলতানের কার্যাবলীর সঙ্গে যুক্ত থাকবেন। বাহ্‌রাম শাহের শাসনকালে এই নায়েব পদ তৈরি হয়েছিল। পরে ইলতুৎমিসের পুত্র নাসিরুদ্দিন সুলতান হলে তাঁর শ্বশুর নায়েব হিসেবে কাজ করেন। তিনি ছিলেন রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসক, নাসিরুদ্দিন শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করতেন না, ধর্ম-কর্ম নিয়ে দিন কাটাতেন। নাসিরুদ্দিন মাহমুদের মৃত্যুর পরে গিয়াউদ্দিন বলবন সুলতান হন। বলবন বহুকাল ধরে দিল্লি সুলতানির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি দেখেছিলেন সুলতানির ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে অভিজাত ও উলেমারা।

সুলতান হয়ে বলবন এক নতুন রাষ্ট্রাদর্শ প্রবর্তন করেন। বলবন নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলেও খলিফার কর্তৃত্ব অস্বীকার করেননি। তাঁর খুৎবায় মৃত খলিফার নাম উচ্চারিত হতো এবং মুদ্রায় তাঁর নাম ছিল। মডেলটি তিনি পেয়েছিলেন পারস্য থেকে। তিনি নিজেকে পারস্যের প্রবাদ পুরষ আফ্রাসিয়াবের বংশধর বলে পরিচয় দিতেন। পারস্যের আদব-কায়দা তিনি তাঁর রাজসভায় প্রবর্তন করেন। পারস্যের রাষ্ট্রতত্ত্বের মূল কথা সুলতানের দেবত্বের ধারণা তিনি প্রচার করেন। সুলতান সাধারণ মানুষ নন, তিনি হলেন 'ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব', তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়। বলবন রাজতন্ত্রকে অভিজাততন্ত্রের ওপর স্থাপন করেন। দরবারে সিজ্‌দা ও পাইবস প্রথার প্রবর্তন করে তিনি সুলতানের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ দরবারে বসতে পারত না, দরবারে হাসি-ঠাট্টা চলত না। তিনি বংশতালিকা দেখে উচ্চবংশীয় তুর্কি অভিজাতদের রাজকার্যে নিযুক্ত করেন। ঐশ্বর্য ও সম্পদের প্রকাশ ঘটিয়ে তিনি রাজতন্ত্রের শক্তি ও সম্পদের প্রচার করেন। রাজতন্ত্রের ভিত্তি হিসেবে তিনি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। তিনি রাজতন্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি অভিজাতদের দুর্বল করে রাখেন। অনেক অভিজাত তাঁর গুপ্তহত্যার শিকার হয়েছিল, উলেমাদের তিনি গুরুত্ব দেননি। তাঁর মৃত্যুর পর ইলবারি তুর্কি রাজবংশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তাঁর প্রপৌত্রকে সরিয়ে খল্‌জিরা ক্ষমতা দখল করেছিল।

খল্‌জি বিপ্লব ভারতের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ও রাষ্ট্রতত্ত্বে বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিল। খল্‌জিরা সামরিক শক্তিবলে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছিল এবং সুলতানির ভিত্তি হিসেবে সামরিক বাহিনী গড়ে তুলেছিল। আলাউদ্দিন খলিফাকে অস্বীকার করেননি, তিনি নিজেকে 'খলিফার ডান হাত' বলে পরিচয় দিতেন। তবে দিল্লি সুলতানির ওপর খলিফার প্রভাব ক্রমশ কমতে থাকে। তাঁর পুত্র মুবারক শাহ নিজেকে খলিফা বলে ঘোষণা করেন, আলাউদ্দিন উলেমাদের পরামর্শ অনুযায়ী দেশ শাসন করেননি। তিনি কাজী মুঘিশউদ্দিনকে বলেছিলেন যে দেশের পক্ষে যা মঙ্গলকর তাই তিনি করেন, এতে শরিয়তের সমর্থন আছে কিনা দেখেন না। রাষ্ট্র ও ধর্মনীতিকে তিনি পৃথক করেছিলেন। ধর্মের সমর্থন ছাড়াই যে দেশ শাসন করা যায় তা তিনি মুসলিম বিশ্বকে দেখিয়েছিলেন।

খল্‌জিদের অনুচরদের সংখ্যা খুবই কম ছিল, এজন্য আলাউদ্দিন এদেশীয়দের নিয়ে তাঁর শাসন পরিচালনা করেন, তুর্কি অভিজাতদের ওপর নির্ভরতা কমেছিল। অভিজাত ও উলেমারা খল্‌জি শাসনের ওপর তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। খল্‌জিদের শাসনকালে ভারতে নিরঙ্কুশ স্বৈরাচারী শাসন স্থাপিত হয়েছিল।

খল্‌জিদের পতন ঘটলে গিয়াসউদ্দিন তুঘলক ক্ষমতা দখল করে খল্‌জিদের মতো রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। সামরিক শক্তি ছিল এই শাসনের ভিত্তি, সুলতান ছিলেন নিরঙ্কুশ স্বৈরাচারী শাসক। তুঘলকরা ছিলেন করুণা উপজাতির লোক, এদের অনুগামীদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। এজন্য দেশের মধ্যে থেকে কর্মচারীদের সংগ্রহ করে শাসনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। মহম্মদ তুঘলক এদেশের হিন্দুদেরও শাসনের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। প্রথমদিকে তুঘলকরা খলিফা সম্পর্কে নীরব ছিলেন, পরে মহম্মদ তুঘলক খুৎবা ও মুদ্রায় মিশরের খলিফার নাম অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তিনি মিশরের খলিফার কাছ থেকে অনুমোদন পত্র আনিয়েছিলেন। মহম্মদ তুঘলকের শাসনকালে নিরঙ্কুশ স্বৈরাচার অটুট ছিল, অভিজাত ও উলেমাদের মহম্মদ দমন করে রেখেছিলেন। ফিরুজ অভিজাত ও উলেমাদের সমর্থন নিয়ে সিংহাসন লাভ করেন। অভিজাতদের তিনি প্রচুর ভূসম্পত্তি দেন, উলেমাদের পরামর্শ মতো দেশ শাসন করতেন। কার্যত তাঁর প্রধানমন্ত্রী শাসনক্ষেত্রে সর্বেসর্বা ছিলেন, তিনি নিজে শাসনের ব্যাপারে বিশেষ হস্তক্ষেপ করতেন না। ফিরুজের সিংহাসন প্রাপ্তি একটি সত্যকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। অভিজাত ও সৈন্যবাহিনী শাসক নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। দিল্লিতে মহম্মদের মন্ত্রী খাজা জাহান মহম্মদের শিশু পুত্রকে সিংহাসনে বসালেও তা শেষপর্যন্ত সফল হয়নি। তুঘলক রাজবংশের প্রতি জনগণের একধরনের আনুগত্য তৈরি হয়েছিল। তৈমুরলঙের প্রত্যাবর্তনের পর মাহমুদ তুঘলক আবার ক্ষমতা ফিরে পান। খিজির খান সৈয়দ বংশ প্রতিষ্ঠা করে কখনো সুলতান উপাধি নেননি, তিনি মোঙ্গলদের প্রতিনিধি হিসেবে দিল্লি শাসন করতেন। তিনি মুদ্রায় তুঘলকদের নাম রেখেছিলেন, খুৎবায় মোঙ্গল ও শেষে তাঁর নাম থাকত। খিজির খানের পুত্র সুলতান উপাধি নেন, নিজের নামে মুদ্রা চালু করেন। নায়েব-ই-আমির-উল-মুমিনিন উপাধি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

লোদীরা হলো আফগান, তারা তাদের উপজাতি ঐতিহ্যসহ ভারতে প্রবেশ করেছিল। উপজাতি ঐতিহ্য অনুযায়ী সব আফগান সর্দার হলো সমান কর্তৃত্বের অধিকারী। আফগানদের ঐতিহ্য মনে রেখে এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা বহলুল লোদী নিজেকে অভিজাতদের একজন বলে মনে করতেন। তার সময়ে সুলতানি রাজ্য ছিল একটি শিথিল যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মতো। বহলুল সিংহাসনে বসতেন না এবং আফগান অভিজাতদের অত্যন্ত সম্মান করতেন। কিন্তু আফগান যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা

শেষপর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়। সিকান্দর লোদী ও ইব্রাহিম লোদী পুরোপুরি স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র স্থাপন করেন। আফগান ঐতিহ্য থেকে সরে এসে এরা অভিজাতদের ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেন। আফগান উপজাতি শূর, নিয়াজি, ফারমুলিরা স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র মানতে রাজি না হওয়ায় এদের দমন করে শক্তিশালী রাজতন্ত্র গড়ে তুলতে হয়। সিকান্দর লোদী ও শেরশাহ শূর বংশানুক্রমিক স্বৈরাচারী সার্বভৌম রাজতন্ত্র গঠনের প্রয়াস চালিয়েছিলেন। দিল্লির সুলতানি শাসকেরা মধ্য এশিয়ার তুর্কি আদর্শ অনুসরণ করে গড়ে তোলেন তাঁদের শাসনব্যবস্থা। এর ভিত্তি ছিল ইক্‌তা। মোঙ্গলদের সামরিক ব্যবস্থা অনুযায়ী গড়া হয় সৈন্যবাহিনী, আর পারস্যের রাজতন্ত্রকে অনুসরণ করে গড়ে তোলা হয় রাজকীয় আদব-কায়দা, দরবার এবং দৈবানুগৃহীত বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের আদর্শ। ইসলামী গণতান্ত্রিক আদর্শ ও মূল্যবোধ থেকে সুলতানি রাজতান্ত্রিক আদর্শ অনেক দূর সরে এসেছিল। সুলতানি শাসনের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী অভিজাত ও উলেমাদের দমন করে নিরঙ্কুশ স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র গড়ে তোলা হয়। সামরিক শক্তি ছিল ক্ষমতার ভিত্তি, ইসলামী আবরণের মধ্য দিয়ে তাঁরা শক্তির রাজনীতি ও কাঠামো গড়ে তোলেন।

সুলতানি যুগে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক

যুগে যুগে ভারতবর্ষে বিদেশীদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। পারসিক, গ্রীক, শক, হূণ প্রভৃতি বিদেশীরা ভারতে প্রবেশ করে স্থায়ীভাবে এদেশে বাস করতে শুরু করে এবং হিন্দু ধর্মের মধ্যে মিশে যায়। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে তা হয়নি। সুলতানি যুগে হিন্দু ও মুসলমানের সম্পর্ক নিয়ে পরস্পরবিরোধী মত ঐতিহাসিকরা ব্যক্ত করেছেন। একদল ঐতিহাসিকের মতে, ভারতে সুলতানি শাসন ধর্মীয়ক্ষেত্রে অসহিষ্ণু ছিল না। সুলতানরা রাজনৈতিক কারণে হিন্দু প্রধানদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও সামরিকব্যবস্থা নেন। তুর্কি শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে হিন্দু শাসকদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়, পরস্পরের মধ্যে ভাববিনিময় চলতে থাকে, একে অপরকে প্রভাবিত করতে থাকে। সুলতান যদি হিন্দুদের ওপর উৎপীড়ন করতেন বা অসহিষ্ণু হতেন তাহলে এদের মধ্যে আদান-প্রদান স্থায়ী হতো না। ড. রশিদ লিখেছেন যে সুলতানি যুগে দুই সম্প্রদায়ের সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে সমন্বয় শুরু হয়েছিল, ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভাববিনিময় চলেছিল। অন্যদল মনে করেন যে সুলতানি যুগে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মিলনের চেয়ে দ্বন্দ্ব বেশি ছিল। ড. শ্রীবাস্তব লিখেছেন যে তুর্কি শাসন যে উৎপীড়নমূলক ছিল তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন যে হিন্দুরা সুলতানি শাসনের নিম্নস্তরে কাজ করত, শেষদিকে কিছু উচ্চপদ লাভ করেছিল (মাল্লু, হিমু, ব্রহ্মজিৎ গৌড় প্রভৃতি)। সবচেয়ে অসুবিধা হলো হিন্দুদের রাজনৈতিক মর্যাদা ছিল না। সুলতানি

রাজ্য ছিল একটি মুসলিম রাজ্য এবং হিন্দুরা ছিল জিম্মি, কর ও সেবার বিনিময়ে তারা জীবন ও সম্পত্তির অধিকার পেত।

ড. কিশোরীশরণ লাল তিনটি কারণকে হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বের জন্য চিহ্নিত করেছেন। এগুলি হলো তুর্কিদের ভারত জয়ের চরিত্র, বিজয়ী ও বিজিতের মধ্যে বিদ্বেষ এবং অমুসলিম দেশে মুসলিম আইনের প্রয়োগ। তুর্কি বিজেতারা শুধু রাজনৈতিক ও আর্থিক কারণে ভারত আক্রমণ করেননি, তাঁরা ধর্মকে ব্যবহার করেছেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতি কোনো বিষয়ে মিল ছিল না, এজন্য পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস ছিল। সুলতানরা হিন্দুদের দেশে ইসলামী আইনকানুন প্রবর্তন করলে বিদ্বেষ ও বিরোধিতার সৃষ্টি হয়েছিল। হিন্দুরা ইসলামী রাষ্ট্রে ন্যায় ও সাম্য আশা করতে পারত না। আলাউদ্দিন ও মহম্মদ বিন তুঘলক ছাড়া আর সকল সুলতান কমবেশি উলেমাদের পরামর্শ অনুযায়ী চলতেন। সুলতানি রাষ্ট্রে মুসলমানরা ছিল সুবিধাভোগী, হিন্দুরা ছিল সুবিধাহীন। এসব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে নানা কারণে সমঝোতা হয়েছিল। শাসকগোষ্ঠীর বাইরে সাধারণ হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করত। শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগ বেড়েছিল। নানা কারণে হিন্দুদের একাংশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও এদের আচার-আচরণে হিন্দু প্রভাব রয়ে যায়। সুফি দরবেশ ও ভক্তিবাদী আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে মিল হয়েছিল। এরা পুরোহিততন্ত্র ও জাতিভেদ প্রথার বিরোধী ছিলেন ; একেশ্বরবাদ ও সব মানুষের সমান অধিকারের কথা প্রচার করতেন। হিন্দুরা মুসলমান দরবেশদের শ্রদ্ধা করতেন, আবার দরবেশরা হিন্দুদের যোগ, জ্যোতিষী ও বেদান্ত দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। নিম্নবর্গের হিন্দু ও মুসলমান সত্যপীরের মতো লোকধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছিল।

সুলতানি যুগে সব শাসক অত্যাচারী বা ধর্মদ্বেষী ছিলেন না। বাংলার হুসেন শাহ্ ও নসরত শাহ্ এবং বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার শাসকরা হিন্দুদের উচ্চপদে বসিয়েছিলেন। কাশ্মীরের শাসক জয়নাল আবেদিন সংস্কৃত ভাষার চর্চায় উৎসাহ দেন। ফিরুজ তুঘলকের মতো গোঁড়া ধর্মভীরু শাসক সংস্কৃত গ্রন্থের ফার্সি অনুবাদ করান, অশোকের দুটি স্তম্ভ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। চিকিৎসা ও রসায়ন শাস্ত্রে হিন্দুরা মুসলমানদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। উর্দুভাষার উৎপত্তিতে ভারতীয় ভাষাগোষ্ঠীর অবদান আছে। আমীর খসরু ভারতকে তাঁর মাতৃভূমি বলে গর্ব করতেন, মুসলমান কবি ও সাহিত্যিকরা হিন্দি ভাষায় কাব্য রচনা করেন। হিন্দুরা ফার্সি ভাষা আয়ত্ত করেন, উর্দুতে কাব্য রচনা করেন। সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প ও স্থাপত্যে সমন্বয়ের ধারা গড়ে উঠতে থাকে। সামাজিক

জীবনেও মেলামেশা বেড়েছিল! অভিজাত পরিবারে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। সুলতানি যুগের জীবনযাত্রা, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং অর্থনৈতিক কাজকর্মে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য ছিল না। বাবর ভারতে ইসলামের পরিবর্তন দেখে অবাক হয়েছিলেন, ইসলামের ওপর হিন্দুধর্মের প্রভাব পড়েছিল। মার্শাল এজন্য মন্তব্য করেছেন যে মানবজাতির ইতিহাসে বিপরীতমুখী দুই সভ্যতার এমন সংমিশ্রণ কদাচিৎ দেখা যায়।

হিন্দুসমাজের ওপর ইসলামের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। ধর্মান্তরকরণ শুরু হলে হিন্দু সমাজে প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রবণতা দেখা যায়। জাতিভেদ প্রথা জোরদার হয়েছিল। স্মৃতিকাররা আবার নতুন করে (মাধব, বিশ্বেশ্বর, কুল্লুক এবং রঘুনন্দন) স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করেন। ইসলামের একেশ্বরবাদ, সাম্যবাদ ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের ধারণা হিন্দু ভক্তিবাদী আন্দোলনকে অবশ্যই অনুপ্রাণিত করেছিল। মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা হিন্দুশাস্ত্র ও সাহিত্যে চর্চায় অনীহা দেখায়নি। তবে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের ক্ষেত্রে যতখানি উন্নতি হওয়ার কথা ছিল তা হয়নি। দুই সম্প্রদায় পাশাপাশি বাস করলেও তাদের মধ্যে ব্যবধান রয়ে যায়। দুই সম্প্রদায় নিজ নিজ বৃত্তের মধ্যে চলতে থাকে, মিলনের ক্ষেত্র ছিল সংকীর্ণ, সীমাবদ্ধ (moved each in its own orbit, and there was as yet no sign that the twain shall ever meet)। সমকালীন মুসলমান ঐতিহাসিক বারানি, আফিফ, ইসামী ও ইবন বতুতা হিন্দুদের ওপর উৎপীড়নের কথা এমন গর্বের সঙ্গে লিখেছেন যে উলেমা ও শাসক সম্প্রদায় যে হিন্দুদের প্রতি উদার মানবিক ব্যবহার করত না তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। উলেমা সম্প্রদায় ছিল শাসক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। হিন্দুদের মন্দির ভাঙা হলে এরা উল্লাস প্রকাশ করেছেন। সারা হিন্দুস্তান ইসলাম ধর্মাবলম্বী হলো না বলে তারা দুঃখ প্রকাশ করেছেন, সুলতানদের বিধর্মীদের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে পরামর্শ দিয়েছেন, হিন্দুদের পূজার্চনার স্বাধীনতা কেড়ে নিতে বলেছেন। এই রকম জাগতিক ও বৌদ্ধিক পরিবেশে হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয়ের ধারা বেশিদূর এগোতে পারেনি। সেটাই ছিল ঐতিহাসিক ধারার স্বাভাবিক পরিণতি। হিন্দুরাও মুসলমানদের আপন করে নিতে পারেনি। তাদের সমাজে জাতিভেদ প্রথা ছিল, রক্ষণশীলতা ও অস্পৃশ্যতা ছিল। মুসলমানদের তারা ম্লেচ্ছ বলত, অস্পৃশ্য গণ্য করত। হিন্দুদের সামাজিক আচার-আচরণ দুই সম্প্রদায়ের সমন্বয়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেকার ব্যবধানকে সবচেয়ে সহজ করে প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন যে হিন্দুরা ধর্মের ব্যাপারে ছিল উদার কিন্তু সামাজিক আচরণে গোঁড়া। অপরদিকে মুসলমানরা ধর্মের ক্ষেত্রে গোঁড়া, সামাজিক আচরণে উদার। এই মৌল পার্থক্যের জন্য এদের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারেনি।

অস্বীকার করার উপায় নেই হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান ছিল। হিন্দু ও মুসলমানের কতকগুলি ধর্মীয় ও সামাজিক বিধি-বিধান ছিল যেগুলি এদের মিলনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মুসলমানের সমগ্র জীবনধারা ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলাম মুসলমানের রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ধর্মের বাইরে বা ধর্মনিরপেক্ষ জীবন ইসলাম অনুমোদিত নয়। ইসলাম একেশ্বরবাদী, হিন্দুদের কাছে একেশ্বরবাদ অপরিচিত না হলেও বাস্তবক্ষেত্রে অধিকাংশ হিন্দু মূর্তি পূজায় বিশ্বাসী। তুর্কি অভিযাত্রীরা হিন্দুদের মূর্তি পূজা ও মন্দিরকে একেবারেই সহ্য করতে পারেনি। ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা মুসলমানের জীবনধারার সঙ্গে হিন্দুর ঈশ্বর-ভাবনা ও জীবনধারার একেবারে মিল ছিল না। উভয়ের ক্ষেত্রে ধর্ম থেকে গড়ে উঠেছিল সামাজিক বিধি-বিধান ও আচার-আচরণ। ইসলামের সামাজিক আচার-আচরণ হিন্দুদের চেয়ে অনেকবেশি উদার ও মানবিক। ইসলামে জাতিভেদ নেই, নেই অস্পৃশ্যতা। হিন্দুসমাজে জাতিভেদ প্রথা ছিল, ছিল অস্পৃশ্যতা। এক জাতির মানুষ অন্য জাতির লোকের সঙ্গে খেত না, এদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কও গড়ে উঠত না। হিন্দুসমাজ ছিল বিভক্ত, ঐক্যহীন, অপরদিকে মুসলমান সমাজ ছিল ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী। অনেকটা জঙ্গী মনোভাবাপন্ন। হিন্দু ও মুসলমান ছিল দুই ভিন্ন জগতের লোক, এদের মধ্যে পারস্পরিক ভাব-বিনিময় ছিল খুবই কম। হিন্দুদের বিবাহ বিধি, উত্তরাধিকার আইন, সৎকার ব্যবস্থা, আহার-বিহার ইত্যাদির সঙ্গে মুসলমান রীতির মিল ছিল না। মুসলমানদের সামাজিক আচার-আচরণ ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত ধারার, ভিন্ন ধরনের। মুসলমানদের আরবি নাম, বর্ষ গণনা এবং পোশাক-পরিচ্ছদও হিন্দুদের থেকে পৃথক ছিল। হিন্দুদের পুজো-অর্চনার সঙ্গে মুসলমানদের প্রার্থনারও কোনো মিল নেই। মুসলমানরা সঙ্গীত পছন্দ করে না, হিন্দুরা গান ও নাচ ভালোবাসে। মুসলমান সংস্কৃতির উৎস হল আরবি ও ফার্সি ভাষা ও সংস্কৃতি, অপরদিকে হিন্দু সংস্কৃতির উৎসে রয়েছে সংস্কৃত ভাষা, বৈদিক দর্শন ও সংস্কৃতি।

তুর্কি আক্রমণের প্রথম পর্বটি হল 'তুর্কানা তরিকা'। আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন।[২] এর অর্থ হল তুর্কি অভিযাত্রীরা ইসলামের সৈনিক হিসেবে ভারতে প্রবেশ করেছিল। মধ্য এশিয়ায় গাজি মানসিকতার বিস্তার ঘটেছিল। অত্যুৎসাহী ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা সামরিক শিক্ষা নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে বিধর্মীদের আক্রমণের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়েছিল। এদের আবেগ ও উৎসাহকে ব্যবহার করেছিল তুর্কি শাসকরা। নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে এরা ভারতে প্রবেশ করে মন্দির ও বিগ্রহ ভেঙেছে, লুটপাট চালিয়েছে, নির্বিচারে হত্যাকাণ্ডও চালানো হয়েছে। প্রথম

২. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, *ভারত সংস্কৃতি*, পৃ. ৯৯।

দিককার মুসলিম ঐতিহাসিকরা—মিনহাজ থেকে ইবন বতুতা এর বিবরণ রেখে গেছেন (The wilful destruction of images and temples which the Muslims, perhaps naturally and justly looked upon as a glory of Islam, outraged the most cherished and deep-rooted sentiments of the Hindus)। তুর্কি আক্রমণের পর হিন্দুসমাজ আতঙ্কিত, ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। নিজেদের জাতি ও ধর্ম রক্ষার জন্য তারা সামাজিক বিধি-নিষেধের কঠোরতা বাড়িয়েছিল, খুঁজেছিল মানসিক শক্তি।

মুসলিম সুলতানি রাষ্ট্র কখনো একথা গোপন করেনি যে রাষ্ট্রটি হল ইসলামী রাষ্ট্র। ইসলামী রাষ্ট্রতত্ত্বের মধ্যে রয়েছে একজাতি, একধর্ম ও এক কর্তৃত্বের ধারণা (one faith, one people and one all-overriding authority)। ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলমানদের অবস্থান নিয়ে মুসলিম পণ্ডিতরা একমত হতে পারেননি। হানাফি মত হল অমুসলমান জিম্মি হিসেবে থাকতে পারেন তবে তাকে ধর্মীয় কর জিজিয়া দিতে হবে এবং রাষ্ট্রের প্রতি সর্বদা অনুগত থাকতে হবে। পাশাপাশি ইমাম সাফি যে মতবাদ দেন তার অর্থ হল ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলমান হয় ধর্ম পরিবর্তন করবেন অথবা মৃত্যুবরণ করবেন, অন্য কোনো বিকল্প নেই। সুলতানি শাসকরা হানাফি মতকে অনুসরণ করেন কারণ এদেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ছিল হিন্দু। বলাবাহুল্য, সুলতানি যুগের ঐতিহাসিকরা সুলতানদের উদার হানাফি মতের অনুসরণ পছন্দ করেননি, উলেমারাও সুলতানদের হিন্দুদের বিরুদ্ধে কঠোর হওয়ার উপদেশ দিতেন। ইবন বতুতা দিল্লিতে দশবছর ছিলেন, তিনি উদার মহম্মদ তুঘলকের অধীনে হিন্দুদের দুর্দশা দেখেছিলেন। হিন্দুদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান নিম্নস্তরের ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। পঞ্চদশ শতকের মিথিলার বিখ্যাত কবি বিদ্যাপতি হিন্দুদের দুর্দশার কথা উল্লেখ করেছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে, চৈতন্য চরিতামৃতে ও চৈতন্য ভাগবতে হিন্দুধর্ম ও সমাজব্যবস্থার ওপর মুসলিম আক্রমণের বিবরণ আছে।

তুর্কানা তরিকা শেষ হলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের দূত হিসেবে এসেছিল দরবেশ তরিকা ও ভক্তিবাদ। সুফি দরবেশরা ছিলেন ভক্তি মার্গের লোক, মুসলমান আধ্যাত্মিকতার চরম বিকাশ ঘটেছে সুফি দর্শন ও চিন্তায়। সুফি দর্শনের মধ্যে এমনসব উপাদান আছে কোরানের অনুমোদিত নিয়ম রীতির সঙ্গে যার মিল নেই। সুফি সন্তরা সব মানুষের সমতার কথা বললেন, বললেন সব ধর্মের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর লাভ হয়। সুফিরা মুসলমান ও অমুসলমান এভাবে মানুষকে ভাগ করেননি। এরা ধর্মের সব আচার-আচরণ মানতেন না, হিন্দুদের ওপর এদের প্রভাব পড়েছিল, সম্ভবত ভক্তিধর্ম এদের দ্বারা উৎসাহিত হয়েছিল। সুফিদের নিম্নস্তরের বেশকিছু দরবেশ হিন্দুদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এই 'সুফিয়ানা তরিকার' হাত

থেকে হিন্দুধর্ম ও সমাজকে বাঁচাতে এগিয়ে এলেন ভক্তিবাদী রামানন্দ, কবীর, নানক, দাদু প্রমুখ সাধকরা। এরা মানুষের সমতার কথা বলেন, ঈশ্বরের সন্তান হল সব মানুষ। ঈশ্বর শুধু মুসলমানদের নয়, সকলের। এদের বাণীর মূল কথা হল বিশ্বজনীনতা, মানবিকতা ও আচার বিরোধিতা, জাতিভেদ ও পুরোহিততন্ত্র বিরোধিতা। কবীরের একটি দোঁহায় রয়েছে ঃ হরি পুবে নেই, আল্লাহ্ পশ্চিমে নেই, তোমার হৃদয়ে করিম ও রামের অবস্থান (Hari is in the East, Allah is in the West, look within your heart, for there you will find both Karim and Ram)। কবীর আরো বলছেন যে পৃথিবীর সব মানব-মানবী হল তাঁর প্রতিচ্ছবি।

সমকালীন মুসলমান ঐতিহাসিকদের রচনা এবং ভারতীয় সাহিত্য থেকে যেসব তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় তা থেকে বলা যায় যে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের অনেক ক্ষেত্র ছিল, দুই সম্প্রদায়ের বুদ্ধিজীবী ও সন্তরা এই বিরোধ দূর করে মানবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালিয়েছিলেন কিন্তু ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে বেশিদূর এগোনো সম্ভব হয়নি। দুই সম্প্রদায়ের মানুষ পাশাপাশি বসবাস করতে থাকে, বিদ্বেষ দূর হয়ে সহযোগিতা ও সহমর্মিতা গড়ে উঠতে থাকে, উভয় সম্প্রদায় পরস্পরকে প্রভাবিত করতে থাকে, চিন্তা, ভাবনায় ও কাজে মিলন ও সমন্বয়ের ক্ষেত্র পাওয়া যায়। সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মৌল পার্থক্য রয়ে যায়।

সপ্তম অধ্যায়	কৃষি, নগরায়ণ ও শিল্পোৎপাদন

প্রাকৃতিক পরিবেশ

উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা এবং তার পূর্ব ও পশ্চিম দিকের পর্বতশ্রেণী ভারতকে এশিয়ার অন্যান্য দেশ থেকে পৃথক করে রেখেছে। ভারতের ভূ-প্রকৃতি দুভাগে বিভক্ত—গাঙ্গেয় সমতলভূমি এবং দক্ষিণের উপদ্বীপীয় অঞ্চল। গাঙ্গেয় সমতলভূমি আবার দুভাগে বিভক্ত—সিন্ধু ও তার শাখানদীগুলি একটি পৃথক সমতল অঞ্চল গঠন করেছে। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও তাদের শাখানদীগুলি দ্বিতীয় সমভূমি অঞ্চল সৃষ্টি করেছে। বেশিরভাগ নদীর উৎস হলো হিমালয়, ব্যতিক্রম হলো চম্বল, সোন প্রভৃতি নদীগুলি। গাঙ্গেয় সমতলভূমির পূর্বদিকে প্রচুর বৃষ্টি হয়, মাটি পলি দিয়ে গড়া। পশ্চিমদিকে নদী থেকে জল তুলে সেচের কাজ চালানো হয়। পশ্চিমাঞ্চলে যেখানে নদী নেই মরুভূমি সৃষ্টি হয়েছে, সিন্ধু ও পশ্চিম রাজস্থান হলো শুষ্ক মরুভূমির দেশ। সারা উপমহাদেশের এক-তৃতীয়াংশের কম হলো গাঙ্গেয় সমতলভূমি অথচ এই অঞ্চলে বাস করে অর্ধেকের বেশি লোক। পূর্বাঞ্চলে যেখানে বৃষ্টি সর্বাধিক সেখানে লোক-সংখ্যার ঘনত্বও সর্বাধিক, সবুজের সমারোহ সর্বাধিক। গাঙ্গেয় সমভূমির দক্ষিণে হলো মধ্য ভারত, দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারত। এই অঞ্চলে আছে পর্বতশ্রেণী, মালভূমি ও উপত্যকা, মাঝে মাঝে আছে পলি দিয়ে গড়া উর্বর অঞ্চল। গুজরাট, ওড়িশা, অন্ধ্র উপকূল, তামিলনাড়ু ও কেরালায় এই ধরনের উর্বর সমতলভূমি দেখা যায়। দক্ষিণের উর্বর সমভূমি অঞ্চলে লোকসংখ্যার ঘনত্বও বেশি, বাকি অঞ্চলে জনসংখ্যা কম। ভারতের দক্ষিণের উপদ্বীপ অঞ্চলে অনেকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ভৌগোলিক অঞ্চল তৈরি হয়েছে। উত্তরের সমভূমির চেয়ে এই অঞ্চলগুলির স্বাতন্ত্র্য অনেক বেশি। উত্তর ও দক্ষিণের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য হলো তাদের পরিবেশের দান। উত্তরের সমভূমিতে সহজে সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছে, দক্ষিণে তা হয়নি। সেখানে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা অনেক বেশি দুরূহ ছিল।

ঐতিহাসিক কালে ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশ সবসময় এক ছিল না। উপকূলের সীমারেখায় এবং বৃষ্টিপাতের হেরফের লক্ষ করা যায়। নদীর গতিপথে পরিবর্তন এবং সেকারণে ভূ-প্রকৃতিতেও পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। র‍্যাভারটি (Raverty) জানিয়েছেন যে দক্ষিণ পাঞ্জাব অঞ্চল থেকে মৌসুমী বায়ু সরে গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে তৈমুরের সময় থেকে। কসেনস (Cousens) লিখেছেন যে এক হাজার বছর আগে সিন্ধুর থাট্টা

ছিল একটি সমুদ্র বন্দর। তারপর থেকে সমুদ্র স্থলভাগ থেকে অনেকখানি দূরে সরে গেছে। হেগ দেখিয়েছেন যে সিন্ধুনদের ব-দ্বীপ অঞ্চলে প্রতিবছর গড়ে চার গজ করে ভূমি তৈরি হয়েছে। অস্বীকার করা যায় না যে ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, উপকূল রেখা বরাবর প্রাকৃতিক পরিবর্তন ঘটেছে। পাঞ্জাবের শতদ্রু ও বিপাশা নদী গতিপথ পরিবর্তন করেছে। বিপাশা শতদ্রুর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, ইরাবতী ও চন্দ্রভাগাও মিলিত হয়েছে। সিন্ধু প্রদেশে সিন্ধুনদ ভাক্করের মতো দ্বীপ তৈরি করেছে, ভাক্করের দক্ষিণে সিন্ধু তার গতিপথ পরিবর্তন করেছে। মুঘলদের সময়ে হায়দ্রাবাদের পূর্বদিকে এই নদ প্রবাহিত হতো। গাঙ্গেয় অববাহিকায় এধরনের ঘটনা ঘটেছে। ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ অযোধ্যার কাছে সরযূ ঘর্ঘরার সঙ্গে মিলিত হতো। বাংলায় তিস্তা ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়নি, দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। ব্রহ্মপুত্র বাংলায় প্রবেশ করে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়েছে। রেনেল তাঁর মানচিত্রে ঢাকার কাছে এই নদীকে দেখিয়েছেন। নদীপথের পরিবর্তন হলে সেই অঞ্চলের অর্থনীতি প্রভাবিত হয়। পশ্চিমের শুষ্ক অঞ্চলে এর প্রভাব পড়েছিল অনেক বেশি। যমুনার জলবহন ক্ষমতা কমলে হরিয়ানা দুর্দশার মধ্যে পড়েছিল, চতুর্দশ শতকে সমগ্র অঞ্চল শুষ্ক ও জলহীন হয়ে যায়। ফিরুজ তুঘলক খাল কেটে হান্সি ও হিসার পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে এই অঞ্চলে সেচের ব্যবস্থা করে দেন। দক্ষিণ সিন্ধুপ্রদেশে এক বিস্তৃত অঞ্চল দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল সিন্ধুনদ তার গতিপথ পরিবর্তন করার জন্য।

রেলপথ, খাল; বাঁধ, সেতু ইত্যাদি নির্মাণের আগে উত্তর ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশ ভিন্ন রকমের ছিল। বিভিন্ন নদীর অনেকগুলি করে শাখানদী ছিল, অনেক জলাভূমি ও হ্রদ ছিল। আধুনিক খাল ও ইলেকট্রিক পাম্প পুরনো নদীপথগুলির জল কমিয়ে দিয়েছে। অনেক নদী শুকিয়ে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে, জলের স্তর অনেক নীচে নেমেছে। হিমালয়ের সন্নিহিত অঞ্চলে অনেক অরণ্য ছিল। এজন্য শিবালিক ও তরাই অঞ্চলে যেসব নদী ছিল তারা অনেক জল পেত। এখন অরণ্য কমে যাওয়ার ফলে তারা আর তেমন জল পায় না। শুধু নদীর জল কমেনি বায়ুর আর্দ্রতাও কমেছে। রেনেল তাঁর মানচিত্রে যে অরণ্য দেখিয়েছেন তার অনেকখানি অদৃশ্য হয়েছে, প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। রেনেলের সময়েও (১৭৮০) আগেকার অরণ্য অনেকখানি ধ্বংস করা হয়েছিল। গত সাতশো-আটশো বছরে উত্তর ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। যে অরণ্যে হাতি ও বাঘের সাক্ষাৎ পাওয়া যেত আজ সেখানে অরণ্য নেই। ত্রয়োদশ শতকে একজন পর্যটক মধ্য দোয়াব অঞ্চলে বাঘের ভয়ে ভীত ছিলেন। ত্রয়োদশ শতকে দোয়াব অঞ্চলে কিছু কিছু স্থানে জঙ্গল ছিল, যমুনা ও গঙ্গার তীরে তীরে অরণ্য ছিল। সপ্তদশ শতকে গুজরাটের রাজপিপলার অরণ্যে হাতি ঘুরে বেড়াত। জঙ্গল পরিষ্কার করে বসতি স্থাপিত হলে মধ্য ভারত থেকে এখানে আর হাতির দল আসত না। সিন্ধু উপত্যকায় বন্যাপ্লাবিত অঞ্চল ও জলাভূমিতে অরণ্য

তৈরি হয়েছিল। দিপালপুরের আশেপাশে 'লাখি' জঙ্গল ছিল, শতদ্রু ও বিপাশা নদীর মধ্যস্থলে ছিল এর অবস্থান। মধ্যযুগের ভারতে বিশাল অরণ্য ছিল, অরণ্য থেকে জ্বালানি, নৌকা, জাহাজ ও বাড়ির জন্য কাঠ পাওয়া যেত। পশুচারণের জন্য অঢেল জমি পাওয়া যেত। মানুষ ও ভূমির মধ্যে সুবিধাজনক অনুপাত ছিল, একজন মানুষের চাষের জন্য বেশি জমি মিলত। অনেক স্থলে'ঝুম' চাষ হতো (shifting cultivation), বেশি অরণ্যের জন্য বৃষ্টির পরিমাণ একটু বেশি হতো।

মধ্যযুগে বেশি অরণ্যভূমি ছিল, জনসংখ্যা কম ছিল, কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল ছিল মানুষ। জলসরবরাহের ওপর কৃষির একর প্রতি উৎপাদন নির্ভর করত। বৃষ্টিপাত অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্বে তারতম্য দেখা দিত। যেসব অঞ্চলে অনেক খাল বা কূপ ছিল সেখানে চাষ ভালো হতো, জনসংখ্যাও বেশি হতো। মধ্যযুগে মাঝারি বা ভারী বৃষ্টি হয় এমন সব অঞ্চলে ঘন অরণ্য ছিল, এসব অঞ্চলে কম লোক বাস করত। জঙ্গল পরিষ্কার করে এসব অঞ্চলে চাষ বসালে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হতো। মুঘল যুগে গোরখপুর ছিল এমন একটি অঞ্চল। মধ্যযুগের সঙ্গে তুলনায় জনসংখ্যার বণ্টনে বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। রেলপথ, খনি, শিল্প নগরায়ণ নিয়ে এসেছে। উত্তরপ্রদেশের পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে অনেক শহর ছিল, উত্তর-পূর্বদিকে শহর অনেক কম ছিল। বার্নিয়ের জানিয়েছেন যে ভারতের শহরগুলি ছিল অস্থায়ী, সামরিক ছাউনি ঘিরে শহর হতো, বাহিনী অন্যত্র চলে গেলে শহরও উঠে যেত। এমন্তব্য ঠিক নয়, গাঙ্গেয় উপত্যকায় বহুবছর ধরে একই স্থানে শহর ছিল। প্রাকৃতিক কারণে দিল্লি গড়ে উঠেছিল, আরাবল্লী পর্বত ও গঙ্গা-যমুনা নদী রাজধানীর উপযোগী পরিবেশ গড়ে দিয়েছিল। প্রয়াগ-এলাহাবাদ এবং অযোধ্যা-ফৈজাবাদ ছিল নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। উচ্চভূমি বেছে নিয়ে মানুষ যুগে যুগে নিজেদের প্রয়োজনমতো শহর গড়েছে। পাঞ্জাবে লাহোর ও মুলতান এবং মীরাট, বরন ও কোল হলো দোয়াব অঞ্চলের শহর। মথুরা, অযোধ্যা ও বারাণসী তীর্থস্থান হিসেবে শহরে পরিণত হয়েছে। ইক্‌তার সদর কার্যালয়গুলি শহরে পরিণত হয়েছে। আজমীর হলো বাণিজ্যকেন্দ্র, সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং তীর্থস্থান। বালাঘাট মালভূমিতে অবস্থিত দেবগিরি (দৌলতাবাদ) ছিল প্রাকৃতিকভাবে সুরক্ষিত শহর।

ভারতের পথগুলিও নানাকারণে পরিবর্তিত হতো, এর একটি হলো বাণিজ্যিক গুরুত্ব। কোনো অঞ্চলের গুরুত্ব কমলে বা বাড়লে রাজপথের পরিবর্তন ঘটানো হতো। চতুর্দশ শতকে গজনি ও কাবুল থেকে রাস্তা ছিল মুলতান পর্যন্ত, সেখান থেকে পাঞ্জাবের মধ্যে দিয়ে দিল্লিতে পৌঁছানো যেত। সপ্তদশ শতকে আফগানিস্তান থেকে দুটি রাস্তা বেরিয়ে লাহোরে এসে মিলিত হয়, লাহোর থেকে হরিয়ানা হয়ে দিল্লি পৌঁছানোর রাস্তা ছিল। চতুর্দশ শতকে লাহোর ছিল মোঙ্গল আক্রমণের ফলে এক

ক্ষতিগ্রস্ত শহর। দিল্লির পরে সবচেয়ে বড় শহর ছিল মুলতান। মুঘলদের সময় লাহোর তার গুরুত্ব ফিরে পেয়েছিল, মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্য এখান থেকে পরিচালিত হতো। মুলতানের প্রাধান্য কমেছিল। রাজনৈতিক কারণে পথেরও গুরুত্ব বাড়ত বা কমত। দিল্লি থেকে দাক্ষিণাত্যে যাওয়ার নতুন পথ তৈরি হয়েছিল। দিল্লি-হাণ্ডিয়া-দাক্ষিণাত্য পথ দিল্লি-উজ্জয়িনী পথের স্থান নিয়েছিল। মধ্যযুগে বন্দরের স্থায়িত্ব নির্ভর করত প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক কারণের ওপর। বন্দরের মুখে পলি পড়লে বন্দর নষ্ট হয়ে যেত। সিন্ধুতে লাহোরি বন্দর থাট্টার স্থান নিয়েছিল, বাংলায় হুগলি নদীর নাব্যতা কমলে সপ্তগ্রাম নষ্ট হয়ে যায়, হুগলি বন্দর গড়ে ওঠে। ভারতের পূর্বদিকে প্রাকৃতিক কারণে প্রায়ই বন্দরের পরিবর্তন হতো। গুজরাটে খামবয়াত (ক্যাম্বে) ছিল বড় বন্দর। সৌরাষ্ট্র উপকূলে ঘোঘা ছিল কর্মচঞ্চল বন্দর। ক্যাম্বের পতন হলে সুরাট প্রধান বন্দর হয়, উত্তর ভারতে যাতায়াতের ভালো পথ ছিল, বন্দরের নাব্যতা ছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হলে তাদের সেরা বন্দরের পতন ঘটেছিল।

কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল হলো দক্ষিণ ভারত। কৃষ্ণার উত্তরে বিন্ধ্য পর্যন্ত অঞ্চলকে দাক্ষিণাত্য বলা হয়। বার্টন স্টেইন একে তিনভাগে ভাগ করেছেন—উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চল। উত্তরাঞ্চল মালভূমি, মধ্যাঞ্চলে রয়েছে পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্বতমালা, রুক্ষ, শুষ্ক, পাহাড়ি অঞ্চল, এর দক্ষিণে রয়েছে কাবেরী, গোদাবরী, পেন্নার, পালার, তাম্রপর্ণী ও বৈগাই। তামিল সমভূমি হলো দক্ষিণের সবচেয়ে উর্বর অঞ্চল। উত্তরদিকে তোণ্ডাইমণ্ডলম, এরপর নাড়ুভিলনাড়ু, চোলমণ্ডলম ও পাণ্ডিমণ্ডলম। এই অঞ্চলে চারটি বড় রাজ্য—অন্ধ্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু ও কেরালা, ছোট রাজ্যটি হলো পণ্ডিচেরী। দ্রাবিড় ভাষাভাষী মানুষ এখানে বাস করে। তিনদিক সমুদ্রবেষ্টিত এই অঞ্চলে বিদেশ থেকে লোকজন এসেছে, আবার উত্তরাঞ্চল থেকে ভারতীয়রা এখানে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছে। কাঞ্চী, কাবেরীপত্তনম, পণ্ডিচেরী, মার্কানাম ও মসুলিপত্তম হলো বড় বাণিজ্যকেন্দ্র ও বন্দর। করমণ্ডল ও মালাবার হলো সমৃদ্ধ অঞ্চল, উপকূলভাগে ভালো বৃষ্টিপাত হয়, বছরে দুবার শস্য ফলানো সম্ভব হয়। অভ্যন্তরের উন্নত কৃষিজ পণ্য, বস্ত্রশিল্প ও মালাবারের মশলা হলো বাণিজ্য পণ্য। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে এই অঞ্চলের বাণিজ্য চলেছে। বিভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের মানুষ এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছে, গড়ে উঠেছে মিশ্র সংস্কৃতি। তামিল সংস্কৃতির পুষ্টিতে উত্তরের সংস্কৃতি অবদান জুগিয়েছে। চোলরা নৌসাম্রাজ্য স্থাপন করেছে। মালদ্বীপ, সিংহল এবং ইন্দোনেশিয়ার শ্রীবিজয় চোল রাজাদের আধিপত্য মেনে নিয়েছে। দক্ষিণ ভারতের ভূ-প্রকৃতি, পরিবেশ, সমুদ্র, পাহাড় ইত্যাদি সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি ও ধর্মীয় জীবনকে প্রভাবিত করেছে। পরিবেশগত কারণে দক্ষিণে সাম্রাজ্য গড়ে ওঠেনি, উত্তরের সমতল ভূমিতে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হয়েছে।

কৃষি উৎপাদন ঃ প্রযুক্তি

১৩৫৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ নিজামী লিখছেন যে কৃষকের অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যগুলি হলো বীজ, একজোড়া বলদ এবং যন্ত্রপাতি, কৃষকের জমির কথা বলা হয়নি। সম্ভবত জমি ছিল অঢেল সেজন্য আলাদা করে জমির কথা উল্লেখ করেননি। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকের আকর থেকে জানা যায় যে গাঙ্গেয় অববাহিকার বিস্তৃত অঞ্চলে অরণ্য ছিল। বদায়ুন ও দিল্লির মধ্যে পথিককে বাঘের কথা ভাবতে হতো। চতুর্দশ শতকে মধ্য দোয়াবে এত জঙ্গল ছিল যে কৃষকরা বিদ্রোহ করে আশ্রয় নিতে পারত। ষোড়শ শতকে এসব জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষ বসানো হয়েছিল। সুলতানি যুগে কৃষি অর্থনীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন হয়নি। গ্রামে বসবাসকারী কৃষকরা জমি চাষ করত, এক একটি গ্রামে দুশো থেকে তিনশো লোক বাস করত। একজন কৃষক নিজের জমি চাষ করত (individual peasant farming), কৃষকের চাষজমির আয়তন ছিল বিভিন্ন ধরনের। গ্রামের খোত বা প্রধানের কৃষিক্ষেত্রের আয়তন অবশ্যই বড় ছিল, দরিদ্র বলাহর বা পেশাদার মানুষের (menial) অধীনস্থ জমির পরিমাণ অবশ্যই কম ছিল। কৃষকের নীচে অবশ্যই ভূমিহীন কৃষকরা ছিল। এদের বেশিরভাগ ছিল যজমান (নাপিত, কামার, কুমোর, ধোপা ইত্যাদি)। কৃষকরা কী ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করত সঠিক জানা যায় না, সম্ভবত বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন হয়নি। অল্প পরিমাণে লোহার ব্যবহার করা হতো।

কূপ থেকে বেশিরভাগ জমিতে জল সরবরাহ করা হতো। মহম্মদ বিন তুঘলক কৃষকদের কূপ খননের জন্য রাষ্ট্র থেকে অগ্রিম দেন। পাকা ও কাঁচা দুধরনের কূপ ছিল, তবে কাঁচা কূপের সংখ্যা ছিল বেশি। নদীতে বাঁধ দিয়ে জলসেচের ব্যবস্থা করা হতো। সরকার ও জনগণ এধরনের জলসেচের উদ্যোগ গ্রহণ করত। চতুর্দশ শতকে জলসেচের জন্য খাল খনন করা হয়। সম্ভবত মধ্য এশিয়া থেকে খাল কেটে চাষের জমিতে জলসেচের ধারণা এসেছিল। গিয়াসউদ্দিন তুঘলক প্রথম খাল কেটে জলসেচের ব্যবস্থা করেন। ফিরুজ তুঘলক হলেন সবচেয়ে বিস্তৃত জলসেচ ব্যবস্থার স্রষ্টা। যমুনা থেকে হিসার পর্যন্ত তিনি দুটি খাল কেটেছিলেন (রজবওয়া ও উলুগখানি)। শতদ্রু ও ঘর্ঘরা থেকে তিনি আরও দুটি খাল খনন করেন। তিনি কালী নদীকে যমুনার সঙ্গে যুক্ত করে সেচের ব্যবস্থা করেছিলেন। ফিরুজ তুঘলকের ব্যবস্থার ফলে হিসার অঞ্চলে খরিফ ও রবি শস্য উৎপাদন সম্ভব হয়। আগে শুধু বর্ষার জলে শরৎকালীন খরিফ শস্য উৎপাদিত হতো। গম চাষ বেড়েছিল। এইসব বড় খাল ছাড়াও অনেকগুলি ছোট ছোট সেচখাল খনন করা হয়েছিল। মুলতান অঞ্চলে কৃষকরা নিজেদের উদ্যোগে খাল খনন করেছিল। ফিরুজ তুঘলকের প্রাদেশিক গভর্নর তাঁকে জানিয়েছিলেন যে বড় নদীর পলি সরানোর কাজ সরকার করে, খালগুলির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব হলো ভূস্বামী ও স্থানীয় জনগণের। এই গভর্নর গ্রাম প্রধানদের ও কৃষকদের বিনা ব্যয়ে খাল খননের নির্দেশ দেন।

কূপ ও খাল থেকে কৃষকরা নানাভাবে জমিতে সেচ দিত। জলসেচের প্রযুক্তিগত পরিবর্তন হয়েছিল। ভারতে চাকার সঙ্গে ঘট লাগিয়ে জমিতে সেচ দেবার প্রথা ছিল (অরঘট্ট)। তুর্কিরা ভারতে আসার পর পিন-ড্রাম-গিয়ারিং দিয়ে যন্ত্রটি এমনভাবে নির্মাণ করা হয় যে জলসেচের জন্য মানুষের প্রয়োজন হতো না। পশুশক্তি ব্যবহার করে জমিতে সেচ দেওয়া যেত। বাবর এই যন্ত্রটির পরিপূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন, পারসিক চক্রের এটি ছিল আগেকার অবস্থা। কাঠ ও মাটির পাত্র দিয়ে যন্ত্রটি বানানো হতো। সিন্ধু উপত্যকায় বহু জমিতে এভাবে জলসেচ করা হতো। সুলতানি যুগের কৃষকরা বহু শস্যের চাষ করত। ইবন বতুতা ভারতে উৎপন্ন শস্য, ফল ও ফুলের কথা উল্লেখ করেছেন। শরৎ ও বসন্তের শস্য খরিফ ও রবি শস্যের কথা উল্লেখ করেছেন। ভারতে এক জমিতে বছরে দুবার চাষ হয় এমন জমির পরিমাণ ছিল কম। তবে কৃষক বছরে একাধিক শস্য চাষ করত। দিল্লির থাক্কুরা ফেরু (১২৯০) পঁচিশরকম কৃষিজ পণ্যের উল্লেখ করেছেন। বিঘা প্রতি কত মণ শস্য উৎপন্ন হতো তারও হিসেবে দিয়েছেন। বাজরা, আলু, তামাক, চিনাবাদাম, লঙ্কা ও টমাটোর চাষ ছিল না। ফেরু নীল ও পপি উৎপাদনের কথা বলেননি। ভারত নীল বিদেশে রপ্তানি করত। ধান, গম, আখ, তুলো, তৈলবীজ, যব, জোয়ার, ডাল ছিল প্রধান কৃষিজ পণ্য। বারানি এযুগের উৎপন্ন কৃষিজ পণ্যের দাম উল্লেখ করেছেন। আবুল ফজলের *আইন-ই-আকবরী*-তে উৎপন্ন শস্যের দাম পাওয়া যায়। রবিশস্যের মধ্যে ডাল ও যবের দাম তুলনামূলকভাবে বেড়েছিল, গমের অর্ধেক দামে এগুলি পাওয়া যেত। খরিফ শস্যের মধ্যে ধান ও ডাল ছিল কমদামী, সাধারণ চিনির দাম বাড়েনি। আফিফ এসব তথ্য সরবরাহ করেছেন।

যেসব জমিতে সেচের জল পাওয়া যেত সেখানে দামি শস্য উৎপন্ন হতো। বৃষ্টির জলে যেসব পণ্য উৎপন্ন হতো তার দাম কম থাকত। ডাল ও যব, গম ও চিনির চেয়ে কম দামী ছিল। এযুগে কৃষকের জমির অভাব ছিল না, সেজন্য কৃষক ইচ্ছামতো কৃষির সম্প্রসারণ ঘটাতে পারত। বৃষ্টির জল দিয়ে বেশিরভাগ চাষের কাজ চালানো হতো। সেচসেবিত অঞ্চলের কৃষিজ পণ্যের দাম বেশি হতো। দেশে বহু পতিত, অনাবাদী ও জঙ্গল জমি ছিল, এজন্য পশুচারণের কোনো অসুবিধা হতো না। আফিফ জানাচ্ছেন যে বহু গ্রামে কৃষকের খোয়াড় ছিল (খড়ক)। *মাসালিক-অল-অবসর*-এ বলা হয়েছে যে ভারতে প্রচুর পশু পাওয়া যেত, দামও কম ছিল। বলদের পিঠে চাপিয়ে পণ্য স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া হতো। গ্রামে প্রচুর পরিমাণে ঘি উৎপন্ন হতো, এই পণ্যের বাণিজ্য ছিল। কৃষিজ পণ্যের ওপর ভিত্তি করে গ্রামীণ শিল্প গড়ে উঠেছিল। গুড়, নীল, তৈল নিষ্কাশন, সুতোকাটা, বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি শিল্প ছিল। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে ভারতে রেশম উৎপাদন শুরু হয়েছিল, তুঁতে গাছের চাষ ও গুটি পোকা পালন করতে শিখেছিল ভারতীয় কৃষক। তসর, এরি, মোগা ভারতে উৎপন্ন হতো। চীন থেকে পারস্য হয়ে রেশম চাষ ভারতে পৌঁছেছিল। ইবন বতুতা রেশমের কথা উল্লেখ

করেননি। ১৪৩২ খ্রিস্টাব্দে মাহুয়ান লিখছেন : 'তুঁতে গাছ, গুটি পোকা এবং রেশম উৎপাদন সর্বত্র ছড়িয়ে আছে', ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে কাশ্মীরে রেশম চাষের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহম্মদ বিন তুঘলক ও ফিরুজ তুঘলক বহু উদ্যান নির্মাণ করেন। ফিরুজ তুঘলক মোট বারোশো উদ্যান বসিয়েছিলেন, বহুধরনের ফল উৎপন্ন হতো, এগুলির মধ্যে আঙুর ও ডালিম প্রধান। যোধপুরে ভালো ডালিম উৎপন্ন হতো। আমের সবচেয়ে বেশি কদর ছিল। মহম্মদ বিন তুঘলক কৃষকদের ফলচাষের জন্য উৎসাহ দেন, ফলের উৎপাদন বাড়ার জন্য দাম কমেছিল।

জমির উৎপাদন ক্ষমতা কেমন ছিল নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। কৃষি-যন্ত্রপাতির বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে জমিতে সারের ব্যবহার জানা ছিল। বানজারা বণিকরা বহু পশু নিয়ে স্থানান্তরে যেত। আবাদি জমিতে অবস্থানের জন্য এবং পশুচারণের জন্য জমির উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে যেত। বৃষ্টির জল, কূপ ও সেচের জল দিয়ে কৃষিকাজ চালানো হতো।

গ্রামীণ সমাজ : রাজস্বব্যবস্থা

গ্রামীণ সমাজ

সুলতানি যুগে গ্রামীণ সমাজ দুভাগে বিভক্ত ছিল—রাজস্ব সংগ্রহকারী শ্রেণী ও রাজস্ব প্রদানকারী কৃষক শ্রেণী। রাজস্ব আদায়ের জন্য ছিল রায়, রানা, রাবাতরা। তুর্কি শাসকগোষ্ঠী উত্তর ভারত জয় করে নিজেদের রাজস্বব্যবস্থা স্থাপন করেনি। তারা রাজস্ব সংগ্রহকারী রায়, রায়ানদের কাছ থেকে থোক অর্থ নিত, তারা কৃষকদের কাছ থেকে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী অর্থ সংগ্রহ করত। মিনহাজ সিরাজ রায় ও রায়ানদের কথা উল্লেখ করেছেন। আলাউদ্দিন জমি জরিপ করে রাজস্ব ধার্য করলেও অনেক অঞ্চলে পুরনো রাজস্ব সংগ্রাহকরা ছিল। ত্রয়োদশ শতকের শেষদিক থেকে এই শ্রেণীর গঠনে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। পুরনো রায়, রায়ান, রাবাতরা সরে যায়, তাদের স্থান নিয়েছিল চৌধুরী, খুত ও মুকাদ্দমরা। এরাই ছিল তুর্কি ও আফগান আমলের কর সংগ্রাহক শ্রেণী। এদের মধ্যে আবার চৌধুরীরা ছিল প্রধান (The Chaudhuri seems to have been the first and possibly the foremost representative of this new emerging class.)। মিনহাজ এই চৌধুরীদের কথা উল্লেখ করেননি। প্রথমদিককার ফার্সি আকরগুলিতে এদের কথা নেই। চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে বারানি চৌধুরীদের রাজস্ব সংগ্রাহকদের মধ্যে প্রধান বলে উল্লেখ করেছেন। ইবন বতুতা চৌধুরীদের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে চৌধুরী ও মুতাশরিফ রাজস্ব আদায়ের কাজ করে থাকে।

চতুর্দশ শতকে রাজস্ব আদায়কারী শ্রেণীকে জমিদার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আমীর খসরু 'জমিদার' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে

চৌধুরী হলো বংশানুক্রমিক জমিদার, পুরনো অভিজাততন্ত্রের স্থান নিয়েছিল জমিদাররা। এরা গ্রামীণ উদ্বৃত্তের একাংশ ভোগ করত। ১৩৫৩ খ্রিস্টাব্দে ফিরুজ তুঘলক একটি ঘোষণায় মুকাদ্দম, মাফরোজি ও মালিকদের কথা উল্লেখ করেন। মুকাদ্দম ও খুতরা ছিল একই শ্রেণীভুক্ত, এরা সকলে ছিল রাজস্ব সংগ্রাহক এবং গ্রামীণ উদ্বৃত্তের অংশীদার। ভূমির ওপর অধিকার আছে এমন ব্যক্তিদের মালিক বলা হতো। ইরফান হাবিব জানিয়েছেন যে জমির ওপর বহুধরনের অধিকার আছে এমনসব ব্যক্তিকে জমিদার বলা হতো (Zamindars tended to form a comprehensive category embracing all kinds of superior right-holders.)। চতুর্দশ শতকের রাজস্ব সংগ্রাহক শ্রেণীর এই চরিত্র পঞ্চদশ শতকে এসে পরিবর্তিত হয়ে যায়। সুলতানি ভাঙতে শুরু করে, প্রাদেশিক শাসকরা অনেকে স্বাধীন হয়ে যায়। সুলতানি রাজ্যের মধ্যে বংশানুক্রমিক কর সংগ্রাহক শ্রেণীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। পাঞ্জাবে খোক্করর‍া, মেবাতে খানজাদারা এবং গোয়ালিয়রে প্রধানরা শক্তিশালী হয়ে বিস্তৃত অঞ্চলের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। সম্ভবত তুর্কি আগমনের আগেকার অভিজাততন্ত্র অনেকখানি পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল।

সুলতানি যুগে কৃষক হল মুজারি। কৃষক জমির মালিক ছিল কিনা প্রশ্নটি অবান্তর কারণ জমি ছিল অঢেল, কৃষক ছিল কম। বীজ, বলদ ও যন্ত্রপাতির ওপর কৃষকের মালিকানা ছিল। কর সংগ্রাহক শ্রেণী তার উৎপন্ন ফসল ও তার ওপর নিয়ন্ত্রণ দাবি করত। ইরফান হাবিব সুলতানি যুগের কৃষকদের ভূমিদাসদের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করেছেন (They were no better than semi-serfs.)। তবে কৃষকদের উৎপন্ন শস্যের ওপর অধিকার ছিল, নগদ মুদ্রায় তারা রাজস্ব দিত। এসব কারণে কৃষকদের মধ্যে নানাস্তর তৈরি হয়েছিল। সতীশচন্দ্র সুলতানি যুগের কৃষকদের চারভাগে ভাগ করেছেন—কর্ষক হলো বর্গাদার (অর্ধিক), কৃষি শ্রমিক হালবাহক (কিনস), জমির মালিক কৃষক হলো মালিক-ই-জমিন (খুদকস্ত) এবং গ্রামের কারিগর-কৃষক (চর্মকার, কর্মকার, কুম্ভকার), এদের একাংশ ছিল অস্পৃশ্য (স্বপচ)। *ধর্মশাস্ত্র* ও *পদ্ম পুরাণ*-এ কৃষকদের অবর্ণনীয় দুর্দশার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কৃষকদের ওপর শাসকগোষ্ঠী এত উৎপীড়ন চালাত যে তাদের জীবিকানির্বাহ করা শক্ত হতো। অপরদিকে গ্রামীণ অভিজাতরা খোত, মুকাদ্দম, চৌধুরী অনেকখানি স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করত। সুলতানি যুগে গ্রামীণ সমাজে অসাম্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। সুলতান ও শাসকগোষ্ঠী গ্রামীণ উদ্বৃত্তের অধিকাংশ অধিকারের প্রয়াস চালালে গ্রামীণ সমাজের ওপর তার প্রভাব পড়েছিল। ইরফান হাবিব পুরনো আকর থেকে তথ্য সংগ্রহ করে হিসেব করে দেখিয়েছেন যে খোত ও মুকাদ্দম শ্রেণী গ্রামীণ রাজস্বের প্রায় অর্ধেক আত্মসাৎ করত।

রাজস্ব ব্যবস্থা

তুর্কিদের আগমনের আগে উত্তর ভারতের রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কৃষকরা ভাগ, ভোগ, কর প্রভৃতি দিত, এগুলি উৎপন্ন শস্যের কতখানি বা শাসকদের মধ্যে এই কর কীভাবে ভাগ হতো তাও জানা যায় না। ধর্মশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে রাজা উৎপন্ন শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ কর হিসেবে নেবেন। দক্ষিণ ভারতে রাজারা উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ বা দুই-তৃতীয়াংশ দাবি করতেন। একজন চোল রাজা তাঁর সামন্তকে উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক রাজস্ব হিসেবে সংগ্রহের নির্দেশ দেন। প্রকৃতপক্ষে, রাজস্বের হারের কোনো বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। কৃষক কতখানি দিতে পারে তার ওপর রাজস্বের হার অনেকখানি নির্ভরশীল ছিল (In actual practice, the land revenue demand must have depended upon what the peasants could be made to pay.)। ঘুরিরা উত্তর ভারত জয় করে নতুন কোনো রাজস্ব ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়নি, পুরনো ব্যবস্থা চলেছিল। পুরনো গ্রামীণ অভিজাত রায়-রায়ানরা শাসকগোষ্ঠীকে থোক অর্থ দিয়ে রাজস্ব আদায়ের অধিকার বজায় রেখেছিল। গ্রামীণ অভিজাতরা প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী রাজস্ব ধার্য ও সংগ্রহের কাজ করত। কৃষকদের কাছ থেকে ঠিক কত রাজস্ব আদায় করা হতো তা জানা যায় না। মিনহাজ লিখেছেন যে শান্তিপূর্ণ অঞ্চলে এভাবে রাজস্ব আদায় করা হতো। বিদ্রোহপ্রবণ অঞ্চলে (মাওয়াস) ব্যবস্থা ছিল অন্যরকম। সৈন্যবাহিনী সেখানে লুঠপাট করত, গবাদিপশু ও ক্রীতদাস সংগ্রহ করত। সম্ভবত পাঞ্জাব অঞ্চলে ইসলামী করব্যবস্থার পত্তন হয়েছিল (the Islamic taxation system was already in operation)। সুলতান আলাউদ্দিন খল্‌জি (১২৯৬-১৩১৬) সুলতানি ভারতে প্রথম রাজস্ব ব্যবস্থা গঠন করেন। বলবন রাজস্ব ক্ষেত্রে সহনশীল, নরমপন্থী ব্যবস্থা বজায় রাখেন। তিনি তাঁর পুত্র বুঘরা খানকে মধ্যপন্থা অনুসরণ করে রাজস্ব ব্যবস্থা পরিচালনা করতে বলেন।

বারানি আলাউদ্দিনের রাজস্ব ব্যবস্থার বর্ণনা রেখে গেছেন। সুলতান খারাজ (ভূমিকর), চরাই (চারণকর) ও ঘরি (গৃহকর) কৃষকদের ওপর স্থাপন করেন। বিসওয়া প্রতি (একবিঘার কুড়ি ভাগের একভাগ) উৎপন্ন ফসলের হিসেব করে তিনি রাজস্ব ধার্যের নির্দেশ দেন। উৎপন্ন ফসলের ৫০ শতাংশ রাজস্ব ধার্য করা হয়েছিল, জমি জরিপের ব্যবস্থা হয়েছিল। আকবরের কানকুত ব্যবস্থার সঙ্গে আলাউদ্দিনের রাজস্ব-ব্যবস্থা অনেকাংশে তুলনীয়। বারানি আরও জানিয়েছেন যে আলাউদ্দিন নগদে রাজস্ব আদায়ের নির্দেশ দেন। সম্ভবত খালিসার অন্তর্গত দোয়াবের কিছু অঞ্চল থেকে তিনি শস্যে রাজস্ব আদায় করেছিলেন। খাদ্যশস্যের মজুত ভাণ্ডার গঠনের জন্য তাঁকে এব্যবস্থা করতে হয়েছিল। আলাউদ্দিনের বিস্তৃত সাম্রাজ্যে এই রাজস্ব-ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। পাঞ্জাবে দিপালপুর থেকে কারা, নগর থেকে ছাইন (রাজস্থান) তাঁর রাজস্ব নীতি কার্যকরী হয়। তবে আলাউদ্দিনের জমি জরিপ ব্যবস্থা নতুন নয়, ভারতের বিভিন্ন

অঞ্চলে এব্যবস্থা চালু ছিল। আলাউদ্দিন কঠোরভাবে তাঁর রাজস্ব নীতি প্রয়োগ করেন (the measure itself was surely an extension of what was actually in force already in some areas rather than a totally new system.)।

বারানি লিখেছেন যে আলাউদ্দিনের রাজস্ব ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল সবলের অত্যাচার থেকে দুর্বলকে রক্ষা করা (to prevent the burden of the strong falling upon the weak)। সুলতান খুত ও মুকাদ্দমদের খারাজ, চরাই ও ঘরি দিতে বাধ্য করেন। তারা 'কিসমত-ই-খোতি' নামে যে বাড়তি কর আদায় করত তা তিনি বন্ধ করে দেন। আফিফ জানাচ্ছেন যে কৃষকের ওপর যে অত্যাচার হোক না কেন কারও টুঁ শব্দ করার জো ছিল না (dared make any babble or noise)। এই সময় থেকে খারাজ হলো স্থায়ী ভূমিরাজস্ব (মাল)। গিয়াসউদ্দিন তুঘলক (১৩২০-২৫) খোত ও মুকাদ্দমদের কয়েকটি সুযোগ-সুবিধা ফেরত দেন। তাদের কিসমত আদায়ের অধিকার দেননি, তবে নিষ্কর জমি দেন এবং চরাই কর থেকে অব্যাহতি দেন। এরা কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করত, পারিশ্রমিক হিসেবে উপরোক্ত সুবিধাগুলি পেত। গিয়াসউদ্দিন কৃষকদের ওপর নির্বিচারে বাড়তি কর স্থাপনের ব্যবস্থা বাতিল করে দেন। জরিপের ব্যবস্থা তুলে দেন, বাঁটাই চালু করেন, এতে কৃষকদের অবশ্যই সুবিধা হয়েছিল। মহম্মদ বিন তুঘলক গুজরাট, বাংলা, মালব ও দাক্ষিণাত্য সহ সমগ্র সুলতানি রাজ্যে তাঁর রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তিনি রাজস্ব বৃদ্ধির পরিকল্পনা করলে বিপর্যয় দেখা দেয়। বারানি লিখেছেন যে সুলতান বাড়তি কর 'আবওয়াব' ধার্য করেন। ইয়াহিয়া লিখেছেন যে সুলতান তিনটি প্রচলিত কর খারাজ, ঘরি ও চরাই কঠোরভাবে আদায় করেছিলেন, এতে সমস্যা দেখা দেয়। ইয়াহিয়া আরও জানিয়েছেন যে সরকারি হিসেবমতো উৎপাদনের পরিমাণ ও দাম নির্ধারণ করা হতো। বাস্তবক্ষেত্রে উৎপন্ন ফসল এবং বাজারদামের চেয়ে তা সবসময় বেশি ছিল (the officially decreed yields and prices were probably much higher than the actual in most localities.)।

মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজস্ব নীতির জন্য দিল্লি ও দোয়াব অঞ্চলে ভয়ঙ্কর কৃষক বিদ্রোহ ঘটেছিল। বারানি এই কৃষক বিদ্রোহের বিস্তৃত বর্ণনা রেখেছেন। রাজস্বের দাবি এবং বাড়তি আবওয়াবের কারণে কৃষকরা বিদ্রোহ করেছিল। সমস্ত অঞ্চল ছেড়ে কৃষকরা পালিয়ে গিয়েছিল, চাষবাস বন্ধ হয়েছিল। সুলতান শিকদার ও ফৌজদারদের ঐ অঞ্চল আক্রমণের নির্দেশ দেন, কৃষকরা পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। সুলতান জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল আক্রমণ করে কৃষকদের নির্বিচারে হত্যা করেন। খোত ও মুকাদ্দমরা এই কৃষক বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিল। ১৩৩২-৩৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই কৃষক বিদ্রোহের ঘটনা ঘটেছিল, প্রায় দশবছর ধরে এই বিদ্রোহ চলেছিল। ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে ইবন বতুতা আলিগড় (কোল) অঞ্চলে বিদ্রোহীদের

অস্তিত্ব লক্ষ করেছিলেন। দোয়াব অঞ্চলে কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত হলে দিল্লিতে খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছিল। খরা শুরু হলে অন্যান্য অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ে, এই দুর্ভিক্ষ প্রায় সাতবছর ধরে চলেছিল (১৩৩৪-৪২)। বারানি এই দুর্ভিক্ষের জন্য উচ্চ ভূমিরাজস্ব হারকে দায়ী করেছেন। ভূমিরাজস্বের সঙ্গে কৃষির সম্পর্কের কথা বারানি উল্লেখ করতে ভোলেননি। ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধির ফলে কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কৃষির ক্ষতি হলে সরকারের আয় কমেছিল। মহম্মদ বিন তুঘলক তাঁর ভুল বুঝতে পারেন। দোয়াব অঞ্চলের কৃষির পুনর্গঠনের জন্য তিনি ব্যবস্থা নেন। কৃষকদের কূপ খননের জন্য রাষ্ট্রীয় ঋণ 'সোন্ধর' দেন। কৃষির বিস্তার ও উন্নতির জন্য সুলতান অনেকগুলি আদেশ জারি করেন (উসলুব)। দেওয়ান-ই-আমির-ই-কোহি নামে নতুন কৃষিবিভাগ গঠন করা হয়। কৃষির সম্প্রসারণ এবং দামি শস্য উৎপাদনের জন্য তিনি রাজকোষ থেকে প্রায় দুকোটি টাকা অগ্রিম দেন, এই টাকা সরকার আদায় করতে পারেনি।

বারানি মহম্মদ বিন তুঘলকের কৃষি পরিকল্পনাকে ব্যর্থ বলে উল্লেখ করেছেন। তবে পরবর্তীকালে ভূমিব্যবস্থার ওপর এর প্রভাব পড়েছিল। কৃষির সম্প্রসারণ ঘটানো হয়, এবং যেসব শস্যের বাজারে দাম বেশি তাদের উৎপাদনে উৎসাহ দেওয়া হয়। কৃষির সম্প্রসারণ বা উন্নত শস্যের চাষ হলে রাষ্ট্র লাভবান হতো। ফিরুজ তুঘলক তাঁর পূর্বসূরির মহান পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হননি। তিনি জনগণকে কিছু রাজস্ব সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা দিতে চেয়েছিলেন। আফিফ জানাচ্ছেন যে তিনি ঘরি ও চরাই কর তুলে দেন, ভূমিকর খারাজ চার শতাংশের বেশি বৃদ্ধি করা যাবে না বলে নির্দেশ দেন। তিনি অমুসলমানদের ওপর ধর্মীয় কর জিজিয়া স্থাপন করেন। তার আগে এই কর 'খারাজ-জিজিয়া' নামে পরিচিত ছিল, পৃথকভাবে জিজিয়া সংগ্রহ করা হতো না। ফিরুজ পৃথকভাবে জিজিয়া আদায়ের ব্যবস্থা করেন। তিনি দশ শতাংশ সেচকর আদায় করেন। উৎপাদনের দশ শতাংশ জিজিয়া হিসেবে দিতে হতো। আফিফ লিখেছেন যে ফিরুজের সময়ে কৃষকদের অবস্থার উন্নতি হয়েছিল। সব কৃষকের স্বাচ্ছন্দ্য বেড়েছিল একথা স্বীকার করা যায় না। আফিফ লিখছেনঃ 'কৃষকের (রায়ত) ঘরে এত শস্য, সম্পদ, ঘোড়া ও দ্রব্য মজুত হয়েছে যে বলার নয়। প্রত্যেক গৃহে আছে অনেক সোনা ও রুপো এবং অসংখ্য দ্রব্য। এমন কোনো কৃষক রমণী নেই যার গায়ে অলংকার নেই। কৃষকের গৃহে রয়েছে পরিচ্ছন্ন শয্যা, বিছানা, অনেক দ্রব্য ও অনেক সম্পদ।'[১]

১. 'In the houses of raiyat (peasantry) so much grain, wealth, horses and goods accumulated that one cannot speak of them. Every one had large amount of gold and silver and countless goods. None of the women-folk of peasantry remained without ornaments. In every peasant's house, there were clear bed-sheets, excellent bed-cots, many articles and much wealth.'—Afif.

সম্ভবত ধনী সম্পদশালী কৃষক ও রাজস্ব সংগ্রহকারী খুত ও মুকাদ্দমদের সম্পর্কে তিনি একথা বলেছেন।

ফিরুজ তুঘলকের পর ভূমিরাজস্ব সম্পর্কে বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না। কৃষকদের কাছ থেকে ভূমিরাজস্ব আদায় করা হতো। লোদি সুলতানরা কৃষিজ পণ্যের দাম অত্যন্ত কমে যাওয়ায় নগদ অর্থের পরিবর্তে উৎপন্ন শস্যে রাজস্ব নিতেন। একটি বহলোলি টাকা দিয়ে দশ মণ শস্য কেনা যেত, কৃষকরা দুর্দশার মধ্যে পড়েছিল। এই দুর্দশা থেকে তাদের বাঁচানোর জন্য সুলতান ইব্রাহিম লোদি শস্যে রাজস্ব আদায়ের নির্দেশ দেন। ইউরোপ থেকে রুপোর আমদানি বাড়লে কৃষিজ পণ্যের দাম বেড়েছিল। শেরশাহ্ ও আকবর আবার নগদে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করেন। সুলতানি যুগে গ্রামীণ উদ্বৃত্তের একটি বড় অংশ শাসকগোষ্ঠীর জন্য সংগ্রহ করা হয়। গ্রামীণ সমাজে অসাম্য ছিল। সুলতানরা কৃষির উন্নতির যে প্রয়াস চালিয়েছিলেন তাতে গ্রামের দরিদ্র কৃষক নয়, সম্পন্ন কৃষক এবং সুবিধাভোগী খোত ও মুকাদ্দমরা লাভবান হয়েছিল।

সুলতানি যুগে কৃষক—শ্রেণীভেদ ও বৈষম্য

দ্বাদশ শতকের জৈন লেখক হেমচন্দ্র জানিয়েছেন যে এযুগের কৃষকেরা ছিল চারভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে ছিল বর্গাদার কৃষক যাদের বলা হত কর্ষক বা অর্ধিক। এরা চাষ করে উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশ পেত। দ্বিতীয় ভাগে ছিল কৃষি শ্রমিক যাদের পরিচয় হল হালবাহক বা কিষাণ। এই দুই গোষ্ঠী ছিল কৃষক সমাজের একেবারে নিম্নস্তরে, এরা ছিল সম্পন্ন কৃষকদের ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। সংখ্যায় এরা হল কৃষক সমাজের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। তৃতীয় গোষ্ঠীতে ছিল সম্ভবত স্বাধীন কৃষকরা, অনেকে মনে করেন এরা ছিল জমির মালিক কৃষক (মালিক-ই-জমিন)। এরা বংশানুক্রমিকভাবে সম্পত্তির অধিকার ভোগ করত, এদের নিজেদের বসতবাটি ছিল। এরা হল স্থায়ী কৃষক, পরবর্তীকালে এরা খুদকস্ত নামে পরিচিতি লাভ করে। গ্রামের সাধারণ পতিত জমি এরা ব্যবহার করতে পারত। এদের বেশিরভাগ ছিল বিভিন্ন বর্ণ বা জাতিকেন্দ্রিক মানুষ। চতুর্থ শ্রেণীতে পাওয়া যায় কারিগর কৃষকদের। এদের মধ্যে ছিল চর্মকার, কর্মকার, ধোপা, পাহারাদার প্রভৃতি শ্রেণীর মানুষ, এরা চাষের কাজের সঙ্গে যুক্ত হত। এদের একাংশ অবশ্যই ছিল অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ, সাহিত্যে এদের 'অধম' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

তুর্কি বিজয়ের প্রথমপর্বে এদেশে নতুন ধরনের রাজস্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়নি। এদেশের সামন্তশ্রেণী রায়, রায়াত, রাবাতদের কাছ থেকে তুর্কি শাসকরা জবরদস্তি করে থোক রাজস্ব আদায় করত। পাঞ্জাবে প্রথম মুসলিম কর নীতি অনুযায়ী রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা হয়েছিল। আলাউদ্দিন খলজি হলেন প্রথম সুলতান যিনি জমি জরিপ

করে রাজস্ব ধার্যের ব্যবস্থা করেন এবং নিয়মিতভাবে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা হয়। উৎপন্ন ফসলের ৫০ শতাংশ রাজস্ব হিসেবে দাবি করা হয়। আলাউদ্দিন কঠোরভাবে রাজস্ব আদায় করতেন, এজন্য কৃষকরা ফসল ওঠানোর সময় সস্তায় তাদের শস্য বিক্রি করতে বাধ্য হত। বারানি লিখেছেন যে আলাউদ্দিনের রাজস্ব ব্যবস্থা ছিল বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে—পাঞ্জাব থেকে উত্তরপ্রদেশ এবং সেখান থেকে রাজস্থান পর্যন্ত এই ব্যবস্থার চলন হয়। বারানি আরো জানিয়েছেন যে আলাউদ্দিন কৃষক সমাজে দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা নেন। কৃষক সমাজে খুত ও মুকাদ্দমরা ছিল বেশ সচ্ছল, তাদের জমি ছিল, তারা কর থেকে অব্যাহতি ভোগ করত, তাছাড়া তারা কৃষকের কাছ থেকে কিসমত-ই-খোতি নামে এক স্থানীয় কর আদায় করত। এসব কারণে এরা কৃষক সমাজে হয়ে উঠেছিল সুবিধাভোগী শ্রেণী, বেশ সচ্ছল, ঘোড়ায় চড়ত, দামি পোশাক পরত, পান খেত। আলাউদ্দিন এদের কর থেকে অব্যাহতি বাতিল করে দেন, সকলকে সমানহারে ভূমিকর খারাজ দিতে বাধ্য করেন। আলাউদ্দিনের সময়ে খুত ও মুকাদ্দমরা আর আগের মতো সচ্ছল ছিল না, এদের জীবনে দুর্দশা নেমে আসে, এদের অবস্থার এত অবনতি ঘটেছিল যে মুসলমানদের গৃহে এদের মহিলারা পরিচারিকার কাজ নিতে বাধ্য হয়েছিল।

গিয়াসউদ্দিন তুঘলক এদের ওপর থেকে কয়েকটি বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করে নেন। তারা কর বসানোর অধিকার হারিয়েছিল কিন্তু নিজেদের অধীনস্থ জমি ও পশুর ওপর স্থাপিত কর থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল। গিয়াসউদ্দিন ভূমির ওপর স্থাপিত কয়েকটি কর তুলে দেন। মহম্মদ তুঘলক ভূমিকর বৃদ্ধির দিকে নজর দেন। বারানি ও ইয়াহিয়া উভয়ে জানিয়েছেন যে মহম্মদ কৃষকদের ওপর বাড়তি কর চাপিয়েছিলেন। আলাউদ্দিনের খারাজ, ঘরি (ঘরের ওপর স্থাপিত কর) ও চরাই (পালিত পশুর ওপর স্থাপিত কর) তিনটিই তিনি রেখেছিলেন। আর একটি সমস্যার কথা ইয়াহিয়া উল্লেখ করেছেন। সরকারি কর্মচারীরা উৎপাদনের যে হিসেব করতেন বাস্তব উৎপাদন ও শস্যের বাজার দামের সঙ্গে তার মিল হত না। এসবের ফলে কৃষকদের অবস্থার চরম অবনতি ঘটে, তারা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। দিল্লি ও দোয়াবের কৃষকরা এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। সরকারি সৈন্যবাহিনী এই অঞ্চল আক্রমণ করে বহু কৃষককে হত্যা করেছিল। সম্পন্ন কৃষক খুত ও মুকাদ্দমরা অনেকে নিহত হয়। ইবন বতুতা ১৩৪২ সনে আলিগড় অঞ্চলে বিদ্রোহী কৃষকদের দেখেছিলেন। বারানি জানাচ্ছেন যে বিদ্রোহের ফলে দোয়াবের কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কৃষক সমাজে দুরবস্থার শেষ ছিল না। দিল্লিতে শস্য সরবরাহ বন্ধ হয়েছিল, দোয়াব অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ চলেছিল। প্রায় আট বছর ধরে (১৩৩৪-৩৫—১৩৪২) এই দুর্ভিক্ষ চলেছিল। ভূমিকরের উচ্চহার যে দুর্ভিক্ষের কারণ হতে পারে তা বুঝতে বারানির দেরি হয়নি। সুলতানও তাঁর ভুল বুঝতে পেরে কৃষি ঋণ সোন্ধর, বলদ ও বীজ কৃষকদের সরবরাহ করেন, সেচের

ব্যবস্থা করে দেন তবে সরকারি ব্যবস্থার সুযোগ নিতে বেশি কৃষক বেঁচে ছিল না। সরকারি কর্মচারীরা সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করেছিল, দুর্দশাগ্রস্ত কৃষকের কাছে পৌঁছয়নি।

ফিরুজ তুঘলক কৃষকদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে উদারনীতি অনুসরণ করেন। হরিয়ানা অঞ্চলে খাল খনন করে তিনি জলসেচের ব্যবস্থা করে দেন। মহম্মদ তুঘলকের স্থাপিত আবওয়াব, ঘরি ও চরাই তিনি তুলে দেন। খারাজের ওপর মাত্র ৪ শতাংশ বাড়তি কর আদায়ের ব্যবস্থা করেন। তিনি অমুসলমানদের ওপর জিজিয়া কর ধার্য করেন, সেচ সেবিত অঞ্চলের ওপর বাড়তি ১০ শতাংশ সেচকর স্থাপন করেন। সুলতান ইব্রাহিম লোদি উৎপন্ন পণ্যে রাজস্ব আদায়ের নির্দেশ দেন। এঁর কারণ হল পণ্য মূল্যের দাম অস্বাভাবিক নেমে যাওয়ায় কৃষক নগদ অর্থ সংগ্রহ করতে গিয়ে বিপদের মধ্যে পড়ে যেত। নতুন মহাদেশ থেকে রুপোর সরবরাহ বাড়লে শেরশাহের সময় আবার নগদে রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হয়। আফিফ লিখেছেন যে ফিরুজের শাসনকালে খুত ও মুকাদ্দমদের অবস্থার উন্নতি ঘটে। তাদের গৃহগুলি ছিল শস্যপূর্ণ, গৃহে আসবাবপত্র বেড়েছিল, মহিলাদের অলংকারের অভাব ছিল না। সম্ভবত এই বর্ণনা শুধু উচ্চশ্রেণীর জমির মালিকদের পরিচয় দিয়েছে, সাধারণ কৃষক সম্ভবত দুর্দশার মধ্যে ছিল। সাধারণ কৃষক মুজারিয়া বা বর্গাদারদের অবস্থার উন্নতির কোনো বর্ণনা নেই। কৃষক সমাজে বৈষম্য বেড়েছিল। এযুগে জমির মালিকানা বড় কথা নয়, জমি ছিল অঢেল, কৃষক ছিল কম। বলদ, বীজ ও কৃষি যন্ত্রপাতির ওপর মালিকানা অবশ্যই কৃষকের ছিল কিন্তু পরিপূর্ণ স্বাধীনতা বোধহয় কৃষকের ছিল না। ইরফান হাবিব সুলতানি যুগের কৃষকদের অর্ধ-ভূমিদাস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। নিজের বাসস্থান, ব্যক্তিসত্তা বা উৎপাদনের ওপর কৃষকের সম্ভবত পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল না (The peasants were thus not masters of their domicile, and were, in effect not better than semi-serfs)।[২] কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের একাংশ বাজারে বিক্রি করে নগদে রাজস্ব দিত। এসব কারণে সুলতানি যুগের কৃষকদের মধ্যে স্তরভেদ বা শ্রেণী বৈষম্য ছিল অবশ্যম্ভাবী। বারানি প্রথম স্তরকে বলেছেন খুত ও মুকাদ্দম, এদের মধ্য থেকে পরবর্তীকালে চৌধুরী বা জমিদারতন্ত্রের উদ্ভব হয়। সাধারণ কৃষক মুজারিয়া বা রায়ত, এদের মধ্যে ছিল জমির মালিক সম্পন্ন কৃষক, ভাগচাষি ও কৃষি শ্রমিক। পাঞ্জাবে খোক্কর, মেবাতে খানজাদা, গোয়ালিয়র ও কতেহার অঞ্চলের সর্দাররা হলেন কৃষক সমাজের নতুন অভিজাততন্ত্র। এদের মধ্যে প্রাচীন খুত, মুকাদ্দম ও চৌধুরীরা স্থান করে নিয়েছিলেন।

সুলতানি যুগে সাধারণ কৃষক মুজারিয়া বা রায়তের অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। ধর্মশাস্ত্র বা পুরাণে এদের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে এদের চরম দারিদ্র্য ও

২. *কেম্ব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৪।

হতাশালাঞ্ছিত জীবনের কথা আছে। পদ্মপুরাণে কর্ষকদের দুরবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। শাসক শ্রেণী এদের উপর এমন অত্যাচার ও শোষণ চালাত যে এদের জীবনযাপনের কোনো পথ খোলা থাকত না। এই পুরাণে বলা হয়েছে যে সামন্তরা বিলাস ও ব্যসনের মধ্যে থাকত আর কৃষকরা চরম দারিদ্র্য ও হতাশার মধ্যে থাকতে বাধ্য হতো। কৃষি শ্রমিকদের অবস্থাও ভাল ছিল না। সুলতানরা ভূমি থেকে সর্বাধিক রাজস্ব আদায়ের দিকে নজর দেন, কৃষির উদ্বৃত্ত হল শাসক শ্রেণী ও প্রশাসনের প্রয়োজনীয় অর্থের প্রধান উৎস। বাণিজ্য ও শিল্প থেকে আয় বাড়িয়ে কৃষক শ্রেণীকে উৎসাহ দানের নীতি ছিল না। অনিবার্যভাবে সরকারি রাজস্ব নীতির প্রভাব পড়েছিল গ্রামীণ কৃষক সমাজ ও অর্থনীতির ওপর।

নগরায়ণ, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ও শিল্প উৎপাদন

খ্রিস্টীয় দশম শতক থেকে ভারতে নতুন করে নগরায়ণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। নানা কারণে শহর গড়ে উঠেছিল। শহর গড়ে ওঠার প্রধান কারণ কৃষি উদ্বৃত্তের জোগান, প্রশাসনিক কেন্দ্র গঠন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার এযুগে লক্ষণীয়ভাবে বেড়ে চলেছিল। ভারতে তীর্থস্থানগুলি ছিল শহর। বার্টন স্টেইন জানাচ্ছেন যে দক্ষিণের বড় শহরগুলি মন্দির, বাণিজ্য ও প্রশাসনকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল। তিনি আরো লিখেছেন যে শিল্পপণ্যের উৎপাদন বেড়েছিল। নগরত্তর (বণিকগোষ্ঠী) যেখানে বাস করত সেখানে পত্তন ও পুরম তৈরি হয়ে যেত। ছোট কারিগর ও বণিকদের সভা হলো 'শংকর পাদিয়ার'। ব্রহ্মদেয়কে ঘিরে (ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত গ্রাম) শহর স্থাপিত হয়, প্রশাসনিক কেন্দ্রগুলিকে কেন্দ্র করে শহর স্থাপিত হতো। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে মেলাকেন্দ্রিক শহর ছিল। ত্রয়োদশ শতক থেকে উত্তর ভারতে নগরায়ণ প্রক্রিয়া দ্রুতগতিতে এগিয়েছিল। এর কারণ হলো তুর্কি শাসকরা শাসনকে কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করেন, এতে প্রশাসনিক কেন্দ্র শহরে পরিণত হয়। দ্বিতীয়ত, তুর্কি শাসকগোষ্ঠী শহরে বাস করতে ভালোবাসত। ইবন বতুতা দিল্লিকে ইসলামী প্রাচ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ শহর বলে উল্লেখ করেছেন। সেযুগে দাক্ষিণাত্যে দৌলতাবাদ (দেবগিরি) ছিল দিল্লির মতো বড় শহর, রাজস্থানে যোধপুর শহর গড়ে উঠেছিল। ত্রয়োদশ শতকের বড় শহর হলো মুলতান, লাহোর, কারা, লক্ষ্মণাবতী ও খামবয়াত (ক্যাম্বে)।

ইলতুৎমিস থেকে শেরশাহ্ পর্যন্ত দিল্লির সব শাসক কম-বেশি শহর নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ইলতুৎমিস অনেকগুলি অট্টালিকা, সৌধ, মাদ্রাসা, খান্‌কা নির্মাণ করেন। আলাউদ্দিনের সময় নির্মাণকার্য চলেছিল, তিনি কয়েকটি দুর্গ ও প্রাসাদ নির্মাণ করেন। মুহম্মদ বিন তুঘলক ও ফিরুজ তুঘলক ছিলেন বড় নির্মাতা। ফিরুজ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তিনি তিনশো শহর নির্মাণ করেন। সম্ভবত এগুলি আলাদা শহর নয়, তিনি অনেকগুলি উপনিবেশ গড়ে তোলেন। তিনি পাঁচটি শহর নির্মাণ করেন, এগুলি হলো

ফতেহাবাদ, হিসার, ফিরুজপুর, জৌনপুর ও ফিরুজাবাদ। দিল্লির ফিরুজাবাদে তিনি বাস করতেন। ফিরিস্তা জানাচ্ছেন যে ফিরুজ পঞ্চাশটি সেতু, চল্লিশটি মসজিদ, তিরিশটি কলেজ, কুড়িটি প্রাসাদ, একশো সরাই, দুশো শহর, একশো হাসপাতাল ইত্যাদি নির্মাণ করেন। এইসব শহরে বাস করত অভিজাত, তাদের অনুচর, বণিক, কারিগর, সৈনিক, ক্রীতদাস, সঙ্গীতজ্ঞ, ফেরিওয়ালা, নর্তকী, অভিনেতা ও ভিখারীরা। বহু সামাজিক গোষ্ঠীর মানুষ শহরগুলিতে একসঙ্গে বাস করত। শহরের নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করত কোতোয়াল, শান্তি রক্ষার দায়িত্বও সে পালন করত। শহরের বাণিজ্য, বাজার, ওজন, পরিমাপ ইত্যাদির তদারকি ছাড়াও কোতোয়াল জুয়া, পতিতাবৃত্তি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের ভার পেত।

সেকালের শহরগুলিতে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর জন্য বিভিন্ন মহল্লা ছিল। রাত্রিবেলা শহরের দরজা বন্ধ করে রাখার রীতি ছিল। রাজা, সুলতান ও অভিজাতরা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বাস করতেন, শহরের উপকণ্ঠে স্থান পেত মেথর, চর্মকার প্রভৃতি অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ। দিল্লি শহরে প্রচুর ভিখারী ছিল, এরা ধনীদের গৃহ, খান্‌কা, সমাধিস্থলে গিয়ে ভিড় করত। সাধারণ নাগরিকরা অস্ত্র বহনের অধিকারী ছিল, এজন্য শহরে মাঝে মাঝে শান্তিশৃঙ্খলার অবনতি ঘটত। শহরগুলিতে অনেক শিল্পকারখানা থাকত, এগুলি ছিল শিল্পপণ্য উৎপাদনের কেন্দ্র। বয়ন, বস্ত্র রঙ করা ও সূচিশিল্প ছিল, সরকারি কারখানায় সুলতান ও অভিজাতদের প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা ছিল। সরকারি কারখানায় সূক্ষ্ম বহুমূল্য বস্ত্র, রেশম বস্ত্র ইত্যাদি উৎপন্ন হতো। বেশিরভাগ শিল্পী ও কারিগর নিজের বাড়িতে পণ্য উৎপাদন করত, এদের জাতিভিত্তিক গিল্ড ছিল। তবে বেশিরভাগ শিল্প উৎপাদনের কাজ হতো গ্রামে বা আধাশহরে। দক্ষিণ ভারত ও গুজরাটের গ্রামে বহু বস্ত্র উৎপন্ন হতো। গ্রাম থেকে কারিগররা শহরে গিয়ে শিল্প উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত হতো। রামশরণ শর্মা ও তাঁর অনুগামীরা দেখিয়েছেন অষ্টম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে ভারতীয় শহরগুলির অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল, বাণিজ্য কমেছিল, শিল্প উৎপাদন ব্যাহত হয়, মুদ্রার অভাব দেখা দিয়েছিল। একাদশ শতক থেকে ভারতের শহরের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। মহম্মদ হাবিব একে 'দ্বিতীয় শহর বিপ্লব' বলেছেন। আসলে এটি হল তৃতীয় শহর বিপ্লব। এই নাগরিক বিপ্লবের পশ্চাতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ হল প্রধান। তুর্কিরা এদেশ জয় করে শহরে ও দুর্গে বসবাস করতে শুরু করে। নিজেদের প্রয়োজনে প্রাসাদ, মসজিদ, খানকা, মাদ্রাসা, হাসপাতাল, সরাইখানা ইত্যাদি তৈরি করেছিল। বিজয়ী তুর্কিরা শহরে বাস করতে ভালোবাসত। তুর্কিরা নতুন স্থাপত্য শৈলী ও আঙ্গিক নিয়ে ভারতে এসেছিল। খিলান, গম্বুজ, মিনার, ডোম ইত্যাদি শৈলী তারা ব্যবহার করতে থাকে। চুন ও সুরকির ব্যবহার শুরু হয়েছিল। স্থাপত্যে অলংকরণ রীতিও অনেকখানি পাল্টে যায়। তুর্কি অভিজাতরা শহরে বসবাস শুরু করলে ভোগপণ্যের

চাহিদা বেড়েছিল, শহরে কারিগর ও বণিকরা এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। এদের সঙ্গে ছিল মহাজন ও ব্যাঙ্কাররা। অভিজাতদের পাহারা দেবার জন্য শহরে সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করার দরকার হয়। অভিজাতদের বিলাসবহুল জীবনের প্রয়োজনে বহু দাসদাসীর দরকার হয়। শহরগুলি জনবহুল হয়ে উঠতে থাকে। শহরে গ্রামের উদ্বৃত্ত সম্পদ চলে এসেছেল রাজস্বের মাধ্যমে, ইকতা কেন্দ্রিক শাসন থেকে শহরের সূচনা হয়। ছোট ছোট শহর বা কসবা স্থাপিত হয়।

সুলতানি যুগে দিল্লি শহরের বিস্তার ঘটেছিল অনেকখানি। বলবনের পৌত্র কায়কোবাদ যমুনাতীরে কিলুঘরিতে নতুন প্রাসাদ তৈরি করেছিলেন, তাঁর অভিজাতরা এখানে অট্টালিকা বানিয়ে বাস করতে শুরু করলে একটি স্বতন্ত্র শহর গড়ে ওঠে। জালালুদ্দিন খল্‌জির সময় শহর সম্প্রসারিত হয়, বাজার বসানো হয়। আলাউদ্দিন খলজি সিরিতে নতুন রাজধানী ও দুর্গ বানিয়ে নিজেকে সুরক্ষিত করেন। ইলতুৎমিস ও আলাউদ্দিন দিল্লিতে জল সরবরাহের জন্য হাউজ-ই-শামসি ও হাউজ-ই-আলাই নির্মাণ করেন। আলাউদ্দিন দিল্লির বাজারগুলি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেছিলেন। গিয়াসউদ্দিন তুঘলক কুতুবমিনার থেকে আট কিলোমিটার দূরে একটি নতুন শহরের পত্তন করেন। এর নাম হল তুঘলকাবাদ, এখানে মহম্মদ তুঘলকের জাহানপনা নামক নতুন শহরের অবস্থান। ফিরুজ তুঘলক যমুনার তীরে নতুন শহর বসালেন যার নাম হল ফিরোজাবাদ। ফিরোজশাহ কোটলা নামে যা আজও জনমানসে টিকে আছে। ফিরোজ এখানে বিশাল জামা মসজিদ বানিয়েছিলেন। সম্ভবত তার স্থাপত্য পরিকল্পনার ওপর রোমান ও বাইজান্টাইন রীতির প্রভাব পড়েছিল। মধ্য এশিয়া থেকে এসব স্থাপত্য ও শিল্পরীতি ভারতে প্রবেশ করেছিল। স্যারাসেন শৈলীর পাশাপাশি সুলতানি যুগে ভারতীয় শৈলীতে নির্মিত শহর ছিল। এধরনের শহর হল রাজস্থানের যোধপুর, পোখরান, নাগোর ও জালোর। রাজস্থানের শহরগুলির কেন্দ্রস্থলে ছিল দুর্গ, পাশে ছিল বাজার ও সাধারণ লোকজনের বাসস্থান। গোয়ালিয়র দুর্গের দুটি প্রাসাদ (মানসিংহ ও বিক্রমজিৎ) মধ্যযুগে খ্যাতিলাভ করেছিল।

গুজরাটের আহম্মদ শাহ আমেদাবাদ শহরটি নির্মাণ করেন। খাম্বাজ হল বন্দর শহর। মধ্যভারতে ধর ও মাণ্ডু শহর সুলতানরা বানিয়েছিলেন। পর্তুগিজরা গোয়া ও দিউতে শহর বানিয়ে শাসন ও বাণিজ্য পরিচালনা করত। পর্যটক দুয়ার্তে বারবোসা চম্পানির শহরের কথা উল্লেখ করেছেন। বারবোসা একে সুন্দর শহর হিসেবে অভিহিত করেছেন। গুজরাটে হিন্দু ও মুসলমান রীতির মিশ্রণ ঘটেছে। দক্ষিণ ভারতের একটি বড় শহর কালিকট। চিনা মহানাবিক চেং হো কালিকটে এসেছিলেন, পরে মাহুয়ান এই বন্দর-শহর পরিভ্রমণ করে এর বর্ণনা রেখে গেছেন। দুয়ার্তে বারবোসা এই শহরের বর্ণনা দিয়েছেন, শহরের বাইরে রাজার প্রাসাদ ছিল। দক্ষিণ ভারতের বড় শহরগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল গুলবর্গা, বিদর, বিজয়নগর, মসুলিপত্তনম, নেগাপত্তম প্রভৃতি। মসুলিপত্তম হল বন্দর-শহর, পূর্ব উপকূলে এই বন্দর-শহরটি গড়ে উঠেছিল।

আবদুর রজ্জাক বিজয়নগর শহরের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। বাংলার শহরগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল লক্ষ্মণাবতী, বিক্রমপুর, নবদ্বীপ, চট্টগ্রাম, গৌড়-পাণ্ডুয়া, সপ্তগ্রাম, ফুলিয়া প্রভৃতি। নবদ্বীপ ছিল তীর্থস্থান, লক্ষ্মণাবতী রাজধানী শহর, চট্টগ্রাম বন্দর শহর, ইবন বতুতা একে সুদকাওয়ান বলে উল্লেখ করেছেন। গৌড়-পাণ্ডুয়া বহুকাল রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকেন্দ্র ছিল। গোলাম হোসেন জানিয়েছেন যে গৌড়-পাণ্ডুয়ায় বহু জনসমাগম হয়েছিল। পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে গৌড় হল বাংলার রাজধানী। সপ্তগ্রাম হল বাংলার শিল্পবাণিজ্য কেন্দ্র, ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে এই শহরের সমৃদ্ধি দেখা দিয়েছিল। মুকুন্দরামের রচনায় এর বিশাল বাজারের কথা জানা যায়। সিজার ফ্রেডারিকি এই বন্দর-শহরের কথা উল্লেখ করেছেন। বাংলার নবদ্বীপ ছিল তীর্থস্থান, শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র। বাংলার সেন রাজারা এখানে এসে থাকতেন, এটা ছিল কার্যত তাদের দ্বিতীয় রাজধানী। মিনহাজের লেখায় এই শহরের উল্লেখ আছে। মধ্যযুগের শহরগুলি একরকমের নয়, বিভিন্ন শহরের গঠন চরিত্র ও কাজকর্মের মধ্যে দুস্তর ফারাক ছিল। কোনোটি ছিল রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কেন্দ্র, কোনোটি শিল্প-বাণিজ্যের ঘাঁটি, আবার কোনোটি তীর্থস্থান বা ধর্মস্থান। সব শহরের আয়তন এক নয়, বেশিরভাগ শহর ছিল মাঝারি বা ছোট আয়তনের। শহরগুলির বিভিন্ন পল্লিতে বিভিন্ন পেশাদার গোষ্ঠীর লোকজন স্বতন্ত্রভাবে বাস করত। সুলতানি যুগের শহরগুলি ছিল কর্মচঞ্চল, সজীব ও বৈচিত্র্যময়।

সুলতানি যুগের শিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো প্রযুক্তিগত পরিবর্তন। বস্ত্রশিল্প, কাগজ, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনীর ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ হয়েছিল। সুতো তৈরির জন্য ভারতে হাতে ঘোরানো লাটাই ও তকলি (টাকু) ব্যবহার করা হতো, চরকার উল্লেখ পাওয়া যায় না। ইসামী *ফুতু-উস-সালাতিন*-এ (১৩৫০) চরকার উল্লেখ করেছেন। ঐ গ্রন্থে এইরকম একটি বাক্য আছে : 'একমাত্র সেই রমণীই উত্তম যিনি সর্বদা চরকা-কর্মে রত থাকেন।' এ থেকে অনুমান করা যায় চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে ভারতের মহিলারা চরকার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। ইউরোপ, চীন ও ইসলামী সাম্রাজ্যে প্রায় একই সময়ে সুতোকাটা চরকার আবির্ভাব হয়। ইসলামী সাম্রাজ্য থেকে চরকা ভারতে এসেছিল। চরকায় সুতো তাড়াতাড়ি কাটা যায়, তবে উন্নতমানের সুতো তৈরি হয় না। নাটাই ও তকলিতে উৎকৃষ্ট সুতো তৈরি হতো। তুলো থেকে মোটা সুতো কাটার জন্য চরকার ব্যবহার করা হতো। চরকার-ব্যবহারের ফলে মাথাপিছু উৎপাদন বেড়েছিল ছয়গুণ, চরকা ছিল শ্রম সাশ্রয়কারী একটি যন্ত্র। আরও দুটি যন্ত্র বস্ত্রশিল্পের উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। একটি হলো চরকি (বেলনা, রস্তা), অপরটি তুলো ধোনার ধনুক। এসব ব্যবহার করে শ্রমের কিছুটা সাশ্রয় হতো, উৎপাদন বেশি হতো। খালি হাতে তুলো ধুনে এক ব্যক্তি যতখানি তুলো পরিষ্কার করতে পারত চরকির ব্যবহার করে তার চার থেকে পাঁচগুণ

বেশি তুলো পরিষ্কার করা সম্ভব হতো। চরকিতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ যান্ত্রিক কৌশল ছিল—সমান্তরাল প্যাঁচ ও আগুপিছু করার হাতল (ক্র্যাঙ্ক)। ইসলামী সাম্রাজ্য থেকে তুলো পেঁজার ধনুক ভারতে এসেছিল। ধুনুরিরা বেশিরভাগ ছিল মুসলমান, মুসলমানরা সম্ভবত এই যন্ত্রটিকে ভারতে এনেছিল।

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে ভারতে চরকা ও ধনুক এসেছিল। এতে সুতো উৎপাদনের খরচ কমেছিল, উৎপাদন বেড়েছিল। তুলো উৎপাদন এবং সুতোর উৎপাদন বেড়েছিল। ভারতে মোটা ও মাঝারি মানের বস্ত্র উৎপাদন বেড়েছিল। এসব যন্ত্রের ব্যবহারের জন্য ভারতের মানুষের পরিধেয় বস্ত্রের জোগান বেড়েছিল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে ভারতীয়রা বেশি পরিমাণে বস্ত্র ব্যবহার করত। চরকা ও ধুনচি এই বস্ত্র জোগানের ক্ষেত্রে অবদান রেখেছিল। সুতো উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত কারিগরদের সংখ্যা বেড়েছিল, বিভিন্ন বর্ণের মানুষ সুতো উৎপাদনকে তাদের জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। ভারতে ত্রয়োদশ শতকের আগে কাগজের প্রযুক্তি জানা ছিল না। ১২২৩-২৪ খ্রিস্টাব্দে গুজরাটে কাগজে লেখা পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। কাগজের প্রবর্তন হলো সভ্যতার ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এতে নথিপত্র সংরক্ষণ সহজ হয়, বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়, শিক্ষার প্রসার ঘটে। আমীর খসরু কাগজের প্রচলনের কথা উল্লেখ করেন। মুসলমানদের কাছ থেকে ভারতীয়রা কাগজ তৈরি শিখেছিল। আলবেরুনি লিখেছেন যে মুসলমানরা পুরোপুরি কাগজ ব্যবহার করছে, ভারতীয়রা তা এখনও আয়ত্ত করতে পারেনি।

সুলতানি যুগে আরও দুটি প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ঘটেছিল। একটি ছিল নৌপরিবহনের ক্ষেত্রে। ভারতীয় বাণিজ্য জাহাজে কম্পাসের ব্যবহারের চলন হয়েছিল। ভাসমান একটি চুম্বকশলাকা দিয়ে দিক নির্ণয় করা হতো। মহম্মদ আওয়ফি *জামিউল হিকারত*-এ (১২৩২) ক্যাম্বের জাহাজে কম্পাসের ব্যবহার দেখেছিলেন বলে জানিয়েছেন। কনজুল তৈজার এই কম্পাসের বিবরণ দিয়ে লিখেছেন যে ভারতের সমুদ্রে ও ভূমধ্যসাগরে কম্পাসের ব্যবহার হতো। সময়মাপক যন্ত্র এ্যাস্ট্রোল্যাবের ব্যবহার ভারতে শুরু হয়েছিল। ফিরুজ তুঘলক কয়েকটি এ্যাস্ট্রোল্যাব ও সূর্যঘড়ি স্থাপন করেন। সম্ভবত মেঘলার দিনে সময় নির্ধারণের জন্য একটি ক্লেপসিড্রাও নির্মাণ করেন। দিল্লির নাগরিকদের কাছে সেযুগে শহর ঘড়ি ছিল এক আশ্চর্য বস্তু। ঘণ্টাধ্বনি করে শহরবাসীদের সময় জানানো হতো। তুর্কিদের ভারত বিজয়ের কারণ হলো তাদের উন্নত অশ্বারোহী বাহিনী। ঘোড়ার জিনের সঙ্গে রেকাবের ব্যবহার সম্ভবত ভারতীয়দের জানা ছিল। দড়ি বা কাঠ দিয়ে এগুলি বানানো হতো, এগুলি তেমন মজবুত হতো না, এর ওপর দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করা যেত না। তুর্কিরা লোহার রেকাব সৈন্যবাহিনীতে প্রবর্তন করেছিল। ঘোড়ার খুরে লোহার নাল পরানোর প্রযুক্তি তুর্কিরা ভারতে এনেছিল। এতে অশ্বারোহী বাহিনীর ভেদশক্তি ও সহনক্ষমতা অনেক বেড়েছিল। নির্মাণের ক্ষেত্রে তুর্কিরা চুনের ব্যবহার ও চুন-বালির প্রলেপ, গম্বুজাকৃতি

ছাদ ইত্যাদি প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করেছিল। কাটা ও ছিদ্র করার যন্ত্র এসেছিল। এসবের ফলে কৃষি উৎপাদন বেড়েছিল। পারসিক চক্রের সাহায্যে জলসেচ করে পাঞ্জাব অঞ্চলে কৃষিতে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয়। কারিগরি উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বাণিজ্য বেড়েছিল। নতুন প্রযুক্তির জন্য আরও দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়, ক্রীতদাস প্রথা আর্থ-সামাজিক জীবনে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রযুক্তিগত বিকাশ সবসময় সামাজিক মুক্তি ঘটায় না। আমেরিকায় তুলো ঝাড়াইয়ের কল এলেও দাসদের মুক্তি আসেনি।

আবুল ফজল মুঘল যুগের শিল্প ও শিল্পপণ্যের বিস্তৃত বিবরণ রেখে গেছেন। সুলতানি যুগের জন্য এধরনের বর্ণনা কোনো ঐতিহাসিক রেখে যাননি। তবে সমকালীন সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে সুলতানি যুগের শিল্প উৎপাদন ও শিল্প সংগঠনের পরিচয় দেওয়া যায়। খনিজ দ্রব্যের ওপর নির্ভরশীল শিল্পগুলির মধ্যে লবণ ছিল প্রধান। উত্তর ভারতের সম্বর হ্রদ থেকে এই লবণ সংগ্রহ করা হতো, এযুগে লবণের সঙ্গে সম্বর নামটিও যুক্ত হয়েছিল। সুলতানি যুগের কাগজপত্রে পাঞ্জাবের পাহাড়ি লবণখনির (কোহ্-ই-জুদ) উল্লেখ নেই। আবুল ফজল এই খনিলবণের উল্লেখ করেছেন। হিউয়েন সাঙ এই লবণখনিগুলি এবং এসমস্ত পাহাড়ি খনি থেকে নিষ্কাশিত লবণের কথা উল্লেখ করেছেন। অনুমান করা যায় সুলতানি যুগে এসমস্ত খনি থেকে নিয়মিতভাবে লবণ উত্তোলন করা হতো। ধাতুর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল আকরিক লোহা। ভারতে উৎপন্ন উন্নতমানের আকরিক লোহা থেকে উন্নত মানের ইস্পাত তৈরি হতো যার সমাদর ছিল সারা পৃথিবীতে। আকরিক লোহা পাওয়া যেত মধ্য ভারতের পাহাড়ি অঞ্চলে। গোয়ালিয়রের আশপাশ থেকে শুরু করে দক্ষিণ ভারতের প্রবেশমুখ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে লোহার আকর পাওয়া যেত। কচ্ছে উন্নত মানের ভালো লোহা পাওয়া যেত, এই ভালো লোহার জন্য 'করিজ তরবারি' এত খ্যাতি লাভ করেছিল। দক্ষিণ ভারত ছিল লোহা ও ইস্পাত শিল্পের আর একটি প্রধান কেন্দ্র। এখান থেকে লোহা ও ইস্পাত মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানি করা হতো। *আইন-ই-আকবরী* ও অন্যান্য গ্রন্থ থেকে খনিজ দ্রব্য উত্তোলনের আরও কেন্দ্রের কথা জানা যায়। সুলতানি যুগে রাজস্থানের খনি থেকে তামা উত্তোলিত হতো, মুঘল যুগে এব্যবস্থা চালু ছিল।

সুলতানি যুগে ভারতে সোনা ও রুপোর উৎপাদন ছিল খুব কম। কর্ণাটকের স্বর্ণখনি থেকে খুব কম সোনা সংগ্রহ করা যেত। হিমালয় থেকে যেসব নদী সমতলে নেমে এসেছে তাদের বালিতে অল্প সোনা পাওয়া যেত। সুলতানি যুগে নামকরা কোনো রুপোর খনির কথা জানা যায় না। অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে বিদেশ থেকে সোনা ও রুপো আমদানি করতে হতো। সুলতানি যুগে বিদেশীরা এমন ধারণা করেছিল যে ভারত শুধু তাল তাল সোনা-রুপো গ্রহণ করে থাকে, এদেশ থেকে বিন্দুমাত্র সোনা-

রুপো বিদেশে যায় না। দামি পাথরের মধ্যে হীরে দক্ষিণ ভারতে উৎপন্ন হতো। পঞ্চদশ শতকে মধ্য ভারতের গণ্ডোয়ানায় হীরের খনি ছিল। *আইন-ই-আকবরী*-তে কালিঞ্জর ও অন্যান্য স্থানে হীরক খনির কথা আছে। সুলতানি যুগে এসব খনির কথা জানা ছিল কিনা নিশ্চিত করে বলা যায় না। মার্কোপোলো জানিয়েছেন যে দক্ষিণ ভারতের তুতিকোরিনে মুক্তো সংগ্রহের কেন্দ্র ছিল।

সুলতানি যুগে এদেশের সবচেয়ে বড় শিল্প ছিল বয়ন, আবার বয়নশিল্পের মধ্যে বস্ত্র প্রধান। বস্ত্রবয়নের জন্য প্রয়োজন হয় প্রচুর সুতোর। সুলতানি যুগে সুতো কাটার ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ঘটেছিল। আগে এদেশের মহিলারা হাতের টাকু (তকলি) দিয়ে সুতো কাটত, এতে পরিশ্রম হতো বেশি, উৎপাদন ছিল কম। সুলতানি যুগে টাকুর পরিবর্তে চরকার ব্যবহার শুরু হয়। ঐতিহাসিক ইসামী রাজিয়ার রাজত্বকালের আলোচনা প্রসঙ্গে চরকা-কাটা মহিলাদের কথা উল্লেখ করেছেন। ইরানে আগেই চরকার চলন হয়েছিল। চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে ভারতে চরকার সাহায্যে সুতোকাটা শুরু হয়ে যায়। তুর্কিদের সঙ্গে চরকা ভারতে এসেছিল। চরকার প্রচলনের ফলে বয়নশিল্পে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটে যায়। একজন সুতো কাটুনি চরকা দিয়ে ছগুণ বেশি সুতো কাটতে পারত, বলা যায় সুতোর উৎপাদন ছগুণ বেড়েছিল। মুসলিম শাসকরা ভারতে আরও একটি বয়ন প্রযুক্তিকৌশল নিয়ে এসেছিলেন। এটি হলো তুলো বয়নোপযোগী করার ধনুক (cotton carder's bow)। আগে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে দানা ছাড়িয়ে তুলো বয়নোপযোগী করা হতো। ধুনুরির ধনুক প্রচলিত হলে অনেক অল্পসময়ে বেশি পরিমাণে তুলো বয়নের উপযোগী করে তোলা সম্ভব হয়। চরকা ও ধনুকের প্রচলন হলে সুতোর উৎপাদন বেড়েছিল, সুতোর দাম কমেছিল। সম্ভবত সুলতানি যুগে তাঁতযন্ত্রেও কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল। একাধিক মাকুর ব্যবহার এবং দ্রুত তাঁত চালানোর পদ্ধতির চলন হয়। সুতোর উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহু লোক বয়নশিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। অনুমান করা যায় সুলতানি যুগে ভারতে বস্ত্রের উৎপাদন বেড়েছিল, মাথাপিছু বস্ত্রের জোগান বেড়েছিল। ষোড়শ শতক থেকে ভারতীয়রা মাথাপিছু বেশি পরিমাণে বস্ত্র ব্যবহার করতে থাকে।

ভারতে বহুধরনের বস্ত্র উৎপন্ন হতো। দরবেশ ও দরিদ্র মানুষের পরিধেয় মোটা বস্ত্র 'কামিনা', 'পট' থেকে সূক্ষ্ম বস্ত্র 'মাহিন' পর্যন্ত সব তৈরি হতো। সূক্ষ্মবস্ত্র কিনত তুর্কি অভিজাতরা। কিরপা ছিল ক্যালিকো বা উন্নতমানের সুতিবস্ত্র। বাংলা ও দাক্ষিণাত্যে বহুধরনের মস্‌লিন ও সূক্ষ্মবস্ত্র উৎপন্ন হতো। এগুলির নাম হলো শিরিনবাফ্‌ত, সলাবতী (শ্রীহট্টের মস্‌লিন), ভৈরো ও দেবগিরির মস্‌লিন। শেষের দুই শ্রেণীর মস্‌লিন ছিল অতিসূক্ষ্ম ও অতিদামী, এগুলি শুধু ধনী ও অভিজাতরা ব্যবহার করতে পারত। বাংলা ও দেবগিরি ছিল মস্‌লিন উৎপাদনের সেরা কেন্দ্র, এখান থেকে এগুলি বিদেশে রপ্তানি করা হতো। মাহুয়ান (১৪৩২) এদেশে উৎপন্ন বহুধরনের বস্ত্রের কথা উল্লেখ

করেছেন, এগুলির মধ্যে শানাবাদ ও চৌতার প্রধান। পশ্চিম উপকূলে গুজরাট বস্ত্রশিল্পের একটি বড় কেন্দ্র ছিল, এখানে উন্নতমানের বহু সুতিবস্ত্র উৎপন্ন হতো।

দিল্লি ছিল রেশমবস্ত্র উৎপাদনের একটি প্রধান কেন্দ্র। এখানে যেমন খাঁটি রেশমের বস্ত্র উৎপন্ন হতো তেমনি সুতো ও রেশমের মিশ্রণে এক নতুন ধরনের বস্ত্র উৎপাদনের ব্যবস্থা ছিল। রেশমী বস্ত্রের নাম হলো 'পুজ', আর মিশ্র বস্ত্রের নাম 'মাশরু'। ইরান ও আফগানিস্তান থেকে স্থলপথে ভারতে রেশম আসত। রেশমী বস্ত্র ও রেশমশিল্পের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রটি ছিল গুজরাট। এখানে 'পাতোলা' পদ্ধতিতে বিচিত্র রঙ ও নকশায় সুশোভিত রেশমী বস্ত্র উৎপন্ন হতো। গুজরাটের এই রেশমী বস্ত্র এত উন্নতমানের ও দামি ছিল যে বারানি আলাউদ্দিনের লুণ্ঠিত দ্রব্যের তালিকায় এর উল্লেখ করেছেন। চতুর্দশ শতকের সুফি কবি মুল্লা দাউদ ছাপা কাপড় 'খণ্ডচাপের' উল্লেখ করেছেন। গুজরাট শুধু রেশমশিল্প নয়, হস্তশিল্প ও সূক্ষ্ম কারুকাজের পীঠস্থান ছিল। এ অঞ্চলের সোনা-রুপোর এমব্রয়ডারি কাজের খ্যাতি দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এযুগে বিজয়নগর ছিল শিল্প-বাণিজ্যের আর একটি বড় কেন্দ্র, এখানে বহু কারিগর বাস করত। তারা নানা ধরনের অলঙ্কার, হাতির দাঁতের কাজ ও শৌখিন দ্রব্য নির্মাণে দক্ষতা অর্জন করেছিল। বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনায় বিজয়নগরের উন্নত কারুশিল্পের উল্লেখ আছে। বিজয়নগরের রাজারা শিল্পী ও কারিগরদের নানাভাবে উৎসাহ দিতেন। শিল্পীদের নিজস্ব গিল্ড ছিল, তাদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারও গড়ে উঠেছিল। বিদেশী বণিকরা তাদের শিল্পপণ্য কিনে নিয়ে যেত।

এযুগে কাশ্মীরে শাল শিল্প বেশ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। মহম্মদ বিন তুঘলক কাশ্মীরী শাল চীন সম্রাটকে উপহার হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। নিশ্চয় এই শিল্প গুণগত মানে খুব উন্নতস্তরে পৌঁছেছিল নাহলে সুলতান বিদেশী সম্রাটকে এ উপহার পাঠাতেন না। সুলতানি যুগের অভিজাতরা পশমী দ্রব্য, কার্পেট ইত্যাদি খুব পছন্দ করতেন, পারস্য ও মধ্যপ্রাচ্যে এসব পণ্যের কদর ছিল। এজন্য ভারতে এসব পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল। বস্ত্রশিল্পে রঙের ব্যবহার বা ছাপ দেবার প্রযুক্তি কতখানি উন্নত ছিল নিশ্চিত করে বলা যায় না। ছাপ দেবার কাজে কাঠের ব্লক ব্যবহার করা হতো। সম্ভবত ভারতীয়রা এ প্রযুক্তি ভালোভাবে আয়ত্ত করেছিল, নাহলে তাদের পণ্য বিদেশের বাজারে বিক্রি হতো না। বয়নশিল্পের সঙ্গে বহুধরনের শ্রমিক ও সংগঠন যুক্ত হয়ে পড়েছিল। ধুনুরি বা 'নাদ্দাফ' মজুরির বিনিময়ে তার শ্রম বিক্রি করত। এযুগে মহিলারা সাধারণত সুতো কাটার কাজ করত, তাঁতিরা বাড়িতে বস্ত্র বয়ন করে বাজারে বিক্রি করত। অনেকসময় মজুরি নিয়ে তাঁতি অন্যের সুতো দিয়ে বস্ত্র বয়ন করে দিত। সুলতান ও অভিজাতদের কারখানায় রেশম, পশম ও সোনা-রুপোর কাজ করা বস্ত্র উৎপন্ন হতো। মহম্মদ বিন তুঘলকের কারখানায় চার হাজার বস্ত্রশ্রমিক ছিল যারা বহুমূল্য রেশমের পোশাক তৈরি করত। ফিরুজ তুঘলকের বস্ত্র কারখানায় এক

শীতকালে ছ'লক্ষ টাকার বস্ত্র উৎপন্ন হতো। কার্পেট উৎপাদন কেন্দ্রে (ফরাসখানা) প্রতিবছর দু'লক্ষ টাকার কার্পেট উৎপন্ন হতো।

সুলতানি যুগের শিল্পের একটি দিক হলো নানাধরনের নির্মাণ কাজ। শহরে বহু লোক নির্মাণ কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। অভিজাতরা ইট ও পাথর দিয়ে তৈরি পাকা বাড়িতে বাস করতে ভালোবাসত। স্যারাসেন স্থাপত্যের আবির্ভাব, নতুন শৈলী, চুনের ব্যবহার, আর্চ, ডোম, মিনার ইত্যাদি আঙ্গিক ভারতে নির্মাণশিল্পের ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল। রাজস্থান, গুজরাট ও দক্ষিণ ভারতে অনেক মন্দির নির্মিত হয়। সুলতানি আমলে দিল্লিতে ইট ও পাথর দিয়ে পাকাবাড়ি, প্রাসাদ, দুর্গ, মসজিদ, সমাধি ইত্যাদি নির্মিত হয়। বারানি জানিয়েছেন যে আলাউদ্দিন খল্‌জি নির্মাণ কাজের জন্য সত্তর হাজার শিল্পী ও কারিগর নিয়োগ করেন। আমীর খসরু জানিয়েছেন যে দিল্লির রাজমিস্ত্রি ও পাথর কাটার মিস্ত্রিরা ছিল ইসলামী জগতে সেরা। তৈমুর তাঁর রাজধানী বানানোর জন্য দিল্লি থেকে শিল্পী ও কারিগরদের নিয়ে যান। মহম্মদ বিন তুঘলক ও ফিরুজ তুঘলক ছিলেন মহান নির্মাতা, এঁদের আমলে বহু নগর, প্রাসাদ, দুর্গ, মসজিদ ও সমাধি সৌধ নির্মিত হয়। বহু কারিগর ও শিল্পী এসব নির্মাণ কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বাবর ভারত জয় করে তাঁর প্রাসাদ নির্মাণের জন্য পনেরেশো পাথর কাটার মিস্ত্রি নিয়োগ করেন। দক্ষিণ ভারতে বাহমনী সুলতান এবং বিজয়নগরের হিন্দু রাজারা এধরনের নির্মাণ কাজকে উৎসাহ দেন। সুলতানি যুগে দক্ষিণ ভারতে বহু মন্দির, মসজিদ, দুর্গ, প্রাসাদ, সরকারি ভবন ইত্যাদি নির্মিত হয়েছিল।

সুলতানি যুগে ভারতে ধাতুশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। এদেশে তৈরি উন্নত-মানের ইস্পাতের তরবারি বিদেশে সমাদর পেয়েছিল। কোনো কোনো পর্যবেক্ষকের মতে, ভারতে তৈরি তরবারি ছিল সেযুগে পৃথিবীর মধ্যে সেরা। দক্ষিণ ভারতে ব্রোঞ্জ ও পিতল শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, এখানে উৎপন্ন পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হতো। এই শিল্পের প্রয়োজনে বিদেশ থেকে তামা ও সীসা আমদানি করতে হতো। ত্রয়োদশ শতকে এদেশে উন্নতমানের ধাতুমুদ্রার প্রচলন প্রমাণ করে যে এদেশে ধাতুশিল্প, শিল্পী ও কারিগররা উন্নতস্তরে পৌঁছেছিল। সুলতানি শাসকরা এদেশে কাগজশিল্পের প্রচলন করেন। ত্রয়োদশ শতকের আগে ভারতে কাগজের ব্যবহার জানা ছিল না। চতুর্দশ শতকে ভারতে কাগজের উৎপাদন ও ব্যবহার চালু হয়েছিল। কাগজ তৈরি হলে গ্রন্থ রচনা ও শিক্ষা বিস্তারের কাজ সহজ হয়। গ্রন্থ কপি করার জন্য 'নাসাখ' নামে এক-শ্রেণীর লেখকের আবির্ভাব হয়। তবে একজন বিদ্বান ব্যক্তিকে একখানি গ্রন্থ সংগ্রহ করতে বহু অর্থ ব্যয় করতে হতো। বাংলাদেশে একধরনের সাদা কাগজ পাওয়া যেত। ভারতীয়রা সম্ভবত তুলোট কাগজের ব্যবহার জানত। নিকোলো কন্টি জানিয়েছেন যে গুজরাটে কাগজের চলন ছিল। আমীর খসরু জানিয়েছেন যে দিল্লিতে দামি সিরীয় কাগজের ব্যবহার হতো। একাগজ দুরকমের হতো—সাধারণ ও রেশমী। সুলতানি

যুগের কিছু পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। এগুলি পরীক্ষা করে পণ্ডিতরা জানিয়েছেন যে সাধারণ ও ঝকমকে দুধরনের কাগজের ব্যবহার ছিল।

হিন্দুস্তানে ভালো আখের চাষ ছিল, আখ থেকে গুড় ও চিনি দুই-ই বানানো হতো। চিনি হতো নানারকমের। কন্দ ছিল নরম চিনি, একে পরিশোধিত করে সাদা চিনিতে রূপান্তরিত করা যেত। হিন্দুস্তানে চিনির উৎপাদন কম ছিল না। বাংলাদেশে এত চিনি উৎপন্ন হতো যে অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত হতো। উদ্বৃত্ত চিনি বিদেশে রপ্তানি হয়ে যেত। বাংলাদেশে একধরনের দানামোটা চিনি উৎপন্ন হতো, সারা দেশে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলে চিনি ব্যবহার করত। মধ্যযুগের সাহিত্যে বহুধরনের মিষ্টান্নের উল্লেখ আছে, চিনি ও শরবত ব্যবহারের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। সুলতানি যুগের একটি অপ্রধান শিল্প হলো চামড়ার কাজ। চর্মজাত জিনিসের বিপুল চাহিদা ছিল, চামার শ্রেণীর কারিগররা এই চাহিদা মেটাত। ঘোড়ার জিন, তরবারির খাপ, জুতো, চিনির পাত্র ইত্যাদি চামড়া দিয়ে তৈরি হতো। গুজরাটের চর্মশিল্পীরা চামড়া দিয়ে নকশাখচিত মাদুর বানাত। গুজরাটে এত চামড়া পাওয়া যেত যে এর একাংশ আরব ও অন্যান্য দেশে রপ্তানি হয়ে যেত।

সুলতানি যুগে শিল্পী ও কারিগরদের জাতিকেন্দ্রিক সংঘ গড়ে উঠেছিল। শিল্পীদের যন্ত্রপাতি ছিল স্থূল, প্রযুক্তিও খুব উন্নতমানের ছিল না। তবে তাদের হাতের কাজ ছিল শিল্পসুষমামণ্ডিত, উন্নতমানের। উৎপাদনের পরিমাণ ছিল কম। উন্নতমানের শিল্পপণ্য শুধু ধনীরা ব্যবহার করত, সেজন্য এসব পণ্যের চাহিদাও ছিল কম। কারিগররা সমগ্র সমাজের বৃহত্তর প্রয়োজনের কথা ভেবে উৎপাদন করত না। সুলতান ও অভিজাতরা শিল্পী ও কারিগরদের স্বার্থরক্ষার জন্য বিশেষ কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিল্পী ও কারিগররা ছিল অসংগঠিত। সরকারি কারখানাগুলির কথা স্বতন্ত্র। কারিগরি দক্ষতা ছিল বংশানুক্রমিক, এই দক্ষতা সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল কম।

মুদ্রানির্ভর অর্থনীতি

সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর দিল্লির মুদ্রাব্যবস্থায় বড় রকমের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। প্রথমদিককার মুদ্রা সম্পর্কে বিশেষ তথ্য নেই। কলচুরি, চান্দেল্ল বা গহড়বল শাসকদের মতো মৈজুদ্দিন মহম্মদ ঘুরি ৪০ রতির স্বর্ণমুদ্রা চালু রেখেছিলেন। দ্বাদশ শতকে রুপো দুষ্প্রাপ্য ছিল, বাংলাদেশে রুপোর মুদ্রার প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। ব্রহ্মদেশ, তিব্বত, নেপাল ও চীন থেকে বাংলায় রুপোর সরবরাহ আসত। বখতিয়ার খল্‌জি বাংলা অধিকার করলে বাংলার স্বর্ণ ও রৌপ্যভাণ্ডার সুলতানি শাসকদের অধিকারে চলে আসে। এই সোনা ও রুপো দিয়ে সুলতানি যুগের প্রথমদিককার সোনা ও রুপোর টাকা মুদ্রিত হয়, সোনা ও রুপোর টাকায় ধাতুর পরিমাণ বেড়েছিল।

এগুলির ওজন হয় ৯৬ রতি (১৭০-১৭২ গ্রেন) বা এক তোলা। সুলতানি যুগের প্রথম দিকে সোনা ও রুপোর টাকার বিনিয়ম হার ছিল ১ : ১০। পরবর্তীকালে এই বিনিময় হারে পরিবর্তন ঘটে। বেসরকারিভাবে একটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে সাতটি রুপোর টাকা পাওয়া যেত। নেলসন রাইট (H. Nelson Wright) লিখেছেন যে সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিস দিল্লি সুলতানির মুদ্রাব্যবস্থাকে সুগঠিত রূপ দেন। তাঁর আমলে রুপোর 'তঙ্কা' এবং রুপো ও তামার মিশ্র ধাতুর তৈরি 'জিতল' দেশে প্রচলিত মুদ্রার স্বীকৃতি পেয়েছিল। রুপোর তঙ্কা ও জিতলের বিনিময় হার ছিল ১ : ৪৮। ইলতুৎমিসের এই ব্যবস্থাকে আদর্শ হিসেবে ধরে নিয়ে পরবর্তীকালে সুলতানরা তা অনুসরণ করেন।

বারানি দিল্লিতে প্রচলিত খুচরো পয়সার কথা বারবার উল্লেখ করেছেন। বারানি উল্লিখিত দাঙ্ ও দিরাম ছিল জিতলের ভগ্নাংশ। বিনিময় হার ছিল সম্ভবত এরকম ঃ ১ তঙ্কা = ৪৮ জিতল = ১৯২ দাঙ্ = ৪৮০ দিরাম। জিতল তৈরি হতো রুপো ও তামা মিশিয়ে, কিন্তু দাঙ্ ও দিরাম ছিল খাঁটি তামার। সুলতানরা তিন ধরনের ধাতু মুদ্রা সোনা, রুপো ও তামা চালু করেছিলেন, তাছাড়া মালদ্বীপের কড়ি বাজারে বেচা-কেনায় ব্যবহৃত হতো। বাংলা ও দক্ষিণ ভারত থেকে সুলতানরা সোনা ও রুপো সংগ্রহ করতেন। পশ্চিম-এশিয়া, ইউরোপ, পশ্চিম-আফ্রিকা ও চীন থেকে এসব ধাতু ভারতে আসত। দক্ষিণ-ভারত লুণ্ঠন করে সুলতান আলাউদ্দিন প্রচুর সোনা-রুপো সংগ্রহ করেন। শুধু দেবগিরির রাজা রামচন্দ্রদেবের কাছ থেকে পেয়েছিলেন ৭.৭ টন সোনা এবং ১২.৮ মেট্রিক টন রুপো। বারানি জানিয়েছেন যে আলাউদ্দিনের সেনাপতি মালিক কাফুর দক্ষিণের পাণ্ড্যরাজ্য থেকে নিয়ে এসেছিলেন ২৪১ মেট্রিক টন সোনা। মুবারক খল্‌জি ও গিয়াসউদ্দিন তুঘলকও দক্ষিণ ভারত থেকে সোনা ও রুপো নিয়ে এসেছিলেন। দিল্লি সুলতানির মুদ্রাব্যবস্থা এবং মুদ্রানির্ভর অর্থনীতি গঠনে তা অবশ্যই সহায়ক হয়েছিল। আলাউদ্দিন প্রচুর সোনা ও রুপোর টাকা মুদ্রিত করে বাজারে ছেড়ে দেন। চতুর্দশ শতকের শেষে ভারত লুণ্ঠনের সময় তৈমুরলঙ এই সম্পদের একাংশ সমরকন্দে নিয়ে যান।

মহম্মদ বিন তুঘলক মুদ্রাব্যবস্থা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মেতেছিলেন। প্রথমে তিনি সোনা ও রুপোর টাকায় ধাতুর পরিমাণ খানিকটা কমিয়ে দেন। তিনি নানাকাজে, দানধ্যানে প্রচুর ব্যয় করতেন, এজন্য তাঁর প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। তবে ইংল্যান্ডের টিউডর রাজাদের মতো সোনা-রুপোর টাকায় খাদ মিশিয়ে তিনি রাষ্ট্রীয় আয় বাড়ানোর চেষ্টা করেননি। দেশে রুপোর সরবরাহ কমেছিল কারণ এসময় সারা পৃথিবীতে রুপোর সরবরাহ কম ছিল। এসমস্যা সমাধানের জন্য তিনি পিতল, ব্রোঞ্জ ও তামার প্রতীক মুদ্রার প্রচলন করেন। তাঁর আগে চীনের সম্রাটরা রেশম বা কাগজের প্রতীক মুদ্রা চালু করেছিলেন। প্রতীক মুদ্রাকে রক্ষার জন্য যে ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে হয় মহম্মদ বিন তুঘলক তা নেননি। তার ফলে প্রত্যেক হিন্দুর গৃহ টাঁকশালে

পরিণত হয়, জাল মুদ্রার সংখ্যা বেশি হয়ে যায়। বণিকরা এ মুদ্রা নিতে অস্বীকার করলে সুলতান দুবছর পরে প্রতীক মুদ্রাব্যবস্থা বাতিল করে দেন। তবে এজন্য দিল্লির মুদ্রাব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়নি, সুলতানের প্রচুর সঞ্চিত সম্পদ ছিল। সমস্যা ছিল রুপোর জোগানের। বাংলা দিল্লি সুলতানের হাতছাড়া হলে সমস্যা আরও জটিল হয়েছিল। ফিরুজ তুঘলকের রাজত্বকালেও রুপোর এই সরবরাহ সমস্যা রয়ে যায়।

ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে দিল্লির সুলতানরা যে মুদ্রাব্যবস্থা এবং মুদ্রানির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলেন চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে সে ব্যবস্থায় অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল। আগের দিককার বিশুদ্ধ রুপোর টাকার স্থান নিয়েছিল মিশ্রধাতু মুদ্রা, এর সঙ্গে কড়ি ছিল বাজারে বিনিময় মাধ্যম। সোনার টাকা শুধু বিশেষ অনুষ্ঠানের স্মারক হিসেবে মুদ্রিত হতো, বাজারে লেনদেনের জন্য এর ব্যবহার ছিল না। সৈয়দ সুলতানদের সোনা ও রুপোর টাকার সংখ্যা খুব কম ছিল। পঞ্চদশ শতকে বাংলা ও গুজরাট ছাড়া আর সর্বত্র মিশ্রধাতুর তঙ্কা, তাম্রমুদ্রা ও কড়ি বাজারে বিনিময় মাধ্যম ছিল। লোদি সুলতানদের সোনা ও রুপোর টাকা পাওয়া যায়নি।

মূল্যস্তর, মজুরি ও জীবনযাত্রার মান

সুলতানি যুগে নানা কারণে মূল্যস্তরে উন্নতি বা অবনতি ঘটত। বারানি মূল্যস্তরের ওঠা-নামা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। আইন-উল-মুল্‌ক, মাহ্‌রু বা দিল্লির নাসিরুদ্দিন যাঁরা সুলতানি যুগের দ্রব্যমূল্য বা মূল্যস্তর সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করেছেন তাঁদের লেখায় এর ইঙ্গিত আছে। শাম্‌স-ই-সিরাজ আফিফ জানিয়েছেন যে ফিরুজ তুঘলকের শাসনকালে জিনিসের দাম কমার কারণ হলো ঐসময় পরপর কয়েকবছর ধরে ভালো ফসল হয়েছিল। এজন্য সুলতানের কোনো কৃতিত্ব ছিল না। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা বা অস্থিরতার জন্য জিনিসের দাম বেড়ে যেত। তৈমুরলঙের ভারত আক্রমণের পর (১৩৯৯) এদেশে জিনিসপত্রের দাম বেড়েছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সরবরাহ বিপর্যস্ত হওয়ার ফলে এরকম অবস্থার সৃষ্টি হয়। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে রুপোর দুষ্প্রাপ্যতা বাজারে জিনিসের দাম নিম্নমুখী করে রেখেছিল। লোদি শাসকদের আমলে দেশে খাদ্যশস্য ও ভোগ্যপণ্যের দাম সস্তা হবার কারণ হলো রুপোর দুষ্প্রাপ্যতা, মুদ্রার অভাব। এসমস্ত ছাড়াও অন্য অনেক কারণে মূল্যস্তরে ওঠানামা দেখা দিত। সেযুগে রাস্তাঘাট, যানবাহন তেমন উন্নত ছিল না। কোনো কোনো উৎপাদন-অঞ্চল দেশের অন্যান্য স্থান থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল, ঐসমস্ত অঞ্চলে প্রচুর ফসল ফললেও তা বাইরে পাঠানো সম্ভব হতো না। এজন্য জিনিসের দাম সস্তা থাকত। আবার কোনো অঞ্চলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দিলে—বন্যা, খরা, মহামারী—জিনিসের দাম বেড়ে যেত, যোগাযোগের অভাবে ঐ সমস্ত অঞ্চলে দ্রুত খাদ্য বা পণ্য পাঠানো সম্ভব হতো না।

মধ্যযুগে জিনিসপত্রের দাম বা মূল্যস্তরের হিসেব হতো একটাকা বা কয়েকটি জিতল-এ কতখানি খাদ্যশস্য বা পণ্য পাওয়া যায় তা দিয়ে। সেযুগে আধুনিক মেট্রিক পদ্ধতি ছিল না, প্রচলিত পদ্ধতির হিসেব বেশ জটিল ছিল। এই পদ্ধতিতে এক টাকায় ধরা যাক দু'মণ খাদ্যশস্য কেনা যায়। যদি এক টাকায় এক মণ খাদ্যশস্য পাওয়া যায় তবে ধরে নিতে হবে খাদ্যশস্যের দাম দুগুণ বেড়েছে বা ১০০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার এক টাকায় যদি দু'মণ খাদ্যশস্যের বাজারে হঠাৎ করে তিন মণ টাকায় বিক্রি হয় ধরে নিতে হবে খাদ্যশস্যের দাম বেশ সস্তা হয়েছে, মূল্য হ্রাস পেয়েছে ৩৩ শতাংশ। কে. এম. আশরাফ দেখিয়েছেন যে সুলতানি আমলে মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে দেশে জিনিসপত্রের দাম সবচেয়ে বেশি ছিল। জালালুদ্দিন খল্‌জির রাজত্বকালে দেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, ঐসময় একসের খাদ্যশস্যের দাম হয় এক জিতল। মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে সারা দেশ জুড়ে অসাধারণ সংকট দেখা দিয়েছিল। ঐ সময় প্রতিসের খাদ্যশস্যের দাম দাঁড়িয়েছিল ১৬-১৭ জিতল, বহুলোক অনাহারে প্রাণ হারিয়েছিল। ফিরুজ তুঘলক যখন সিন্ধুদেশ আক্রমণ করেন তখন সেখানে দুর্ভিক্ষের মতো অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। প্রতিমণ খাদ্যশস্যের দাম দাঁড়িয়েছিল ২-৩ টাকা। তাঁর দ্বিতীয়বার সিন্ধু আক্রমণের সময় প্রতি পাঁচ সের খাদ্যশস্যের দাম ছিল ৮-১০ জিতল, এক মণ ডালের দাম বেড়ে হয়েছিল ৪-৫ তঙ্কা।

সুলতানি যুগে ভোগ্যপণ্য সবচেয়ে সস্তা ছিল লোদিদের আমলে। ইব্রাহিম লোদির শাসনকালে জিনিসের দাম খুব সস্তা হয়েছিল। একটিমাত্র 'বহলোলী রুপোর টাকা' দিয়ে দশ মণ খাদ্যশস্য, পাঁচ সের তেল ও দশ গজ মোটাকাপড় কেনা যেত। ঐ একটি বহলোলী মুদ্রা সম্বল করে একজন লোক অনুচর ও ঘোড়াসহ স্বচ্ছন্দে দিল্লি থেকে আগ্রায় যেতে পারত। বারানি জানিয়েছেন যে ঐ যুগে মাত্র পাঁচ টাকায় একটি মাঝারি পরিবারের এক মাসের ভরণপোষণ চলে যেত। খাদ্যশস্যের দাম নেমে গেলে কৃষকদের পক্ষে অর্থসংগ্রহ করা বেশ দুরূহ হয়ে দাঁড়াত। জে. এন. গুপ্তের গবেষণায় দেখা যায় যে বাংলাদেশে জিনিসপত্রের দাম খুব সস্তা ছিল, ইবন বতুতাও বাংলাদেশে জিনিসের দাম খুব সস্তা ছিল বলে জানিয়েছেন। এখানে সাড়ে পাঁচ জিতল-এ এক মণ চাল পাওয়া যেত। সুলতান আলাউদ্দিনের সময়ে যে মূল্যস্তর পাওয়া যায় তাকে সুলতানি যুগের স্বাভাবিক অবস্থা বলে ধরে নেওয়া যায়। মুবারক খল্‌জির সময় থেকে জিনিসপত্রের দাম আবার বাড়তে শুরু করেছিল। মহম্মদ বিন তুঘলকের সময় মূল্যস্তর ঊর্ধ্বমুখী ছিল, ফিরুজ তুঘলকের সময়ে তা আবার স্বাভাবিক হয়েছিল।

আলাউদ্দিনের শাসনকালের দ্রব্যমূল্যের তালিকা থেকে সুলতানি যুগের মূল্যস্তরের হিসেব পাওয়া যায়। প্রতিমণ গমের দাম ছিল ৭.৫ জিতল, ভেড়ার মাংস ১০-১২ জিতল, ঘি ১৬-২৬ জিতল, লবণ ২ জিতল। উট ১২-৩৪ তঙ্কা, মাংসের গরু ১.৫-২ তঙ্কা, দুধেলা গাই ৩-৪ তঙ্কা, মোষ ১২-১৪ তঙ্কা। পরিধেয় বস্ত্রের মধ্যে দিল্লির

মস্‌লিন ১৭, আলিগড়ের ৬ তঙ্কা। সর্বোৎকৃষ্ট মস্‌লিনের প্রতিগজের দাম পড়ত ৬ জিতল, আর উৎকৃষ্ট পাতলা কম্বলের দাম ছিল ৩৬ জিতল। এক টাকায় কুড়ি গজ রেশমী কাপড় পাওয়া যেত। একটু মোটা ধরনের রেশমী কাপড়ের দাম ছিল টাকায় চল্লিশ গজ, একখানা চাদর দশ জিতল। দাস-দাসী, উপপত্নী বাজারে বিক্রি হতো, তবে তাদের জন্য কোনো নির্দিষ্ট মূল্য ছিল না, ক্রেতার পছন্দের ওপর দাস-দাসী বা উপপত্নীর দাম নির্ভর করত। *মাসালিক-অল-অবসর*-এ একটি ব্যতিক্রমী ঘটনার উল্লেখ আছে। একজন ক্রেতা বিশ হাজার টাকা দিয়ে একজন দাস কিনেছিলেন। সাধারণত একজন সুদক্ষ ক্রীতদাসের দাম পড়ত ১২০ টাকা। যুদ্ধ বা দুর্ভিক্ষের সময় দাসের বাজারে দাম নেমে যেত, সরবরাহ বাড়ার জন্য দাম কমত। আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে গৃহস্থালির একজন পরিচারিকার মূল্য ছিল ৫-১২ টাকা, একজন উপপত্নীর জন্য দিতে হতো ১০-১৫ টাকা, একজন সুশ্রী দাসের দাম পড়ত ২০-৪০ টাকা।

সুলতানি যুগে বিদেশী বণিকরা মনে করত 'বাংলা হলো উৎকৃষ্ট ও লোভনীয় জিনিসে পরিপূর্ণ নরক'। বাংলাদেশে জিনিসপত্র খুব সস্তা ছিল, জীবনযাত্রার ব্যয় কম ছিল, কিন্তু জলহাওয়া ছিল অস্বাস্থ্যকর। ইবন বতুতা জানিয়েছেন যে বাংলায় আট জিতল-এ এক মণ চাল পাওয়া যেত, ৩২ জিতল-এ এক মণ চিনি আর ত্রিশ হাত লম্বা ভালো কাপড় পাওয়া যেত দু'টাকায়। গুলবদন বেগম জানিয়েছেন যে সিন্ধুর অমরকোটে জীবনযাত্রার ব্যয় খুব কম ছিল, সেখানে একটি টাকা দিয়ে চারটি ছাগল কেনা যেত।

সুলতানি যুগে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী, কারিগর, পেশাদার মানুষ, শ্রমিক ও ভৃত্যদের বেতনক্রম কীরকম ছিল নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। এসম্পর্কে যেসমস্ত তথ্য পাওয়া যায় তা যথেষ্ট নয়। তবে এসমস্ত তথ্য থেকে এযুগের মানুষের বেতন কাঠামোর একটি রূপরেখা দেওয়া যায়। জালালুদ্দিন তাঁর এক বন্ধুকে ভকিল-এ-দার নিযুক্ত করেন, তাঁর বেতন ধার্য হয়েছিল এক লক্ষ জিতল। সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে তাঁর নায়েব ইরাকের মতো এক বৃহৎ প্রদেশের রাজস্ব ভোগ করত। উজিরের বেতন একইরকম ছিল। চারজন মন্ত্রীর প্রত্যেকে বছরে বিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা পেতেন। মহাকরণের কর্মচারীদের তিনশো জনের প্রত্যেকের ন্যূনতম বেতন ছিল বছরে দশ হাজার টাকা। কেউ কেউ আবার বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত রোজগার করত। সদর-এ-জাহান ও শেখ-উল-ইসলাম বছরে পেতেন ষাট হাজার টাকা। এমনকি মুহতাসিব বা শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী একটি গ্রামের সব রাজস্ব ভোগ করত। ফিরুজ তুঘলকের উজির খান-এ-জাহান যে ইক্‌তা ভোগ করতেন তার বার্ষিক আয় ছিল দেড় কোটি টাকা, এর ওপর তাঁর পরিবারের পোষ্যদের জন্য ভাতা পেতেন।

সামরিক বাহিনীর লোকদের বেতনক্রম কেমন ছিল নির্দিষ্ট করে কিছু বলা যায় না। সুলতান বলবন তাঁর কিছু বয়স্ক সামরিক অফিসারদের বরখাস্ত করে তাদের মাসিক

৪০-৫০ টাকা পেনসন দানের ব্যবস্থা করেন। সুলতান আলাউদ্দিন সৈন্যদের বার্ষিক বেতন দিতেন ২৩৪ টাকা বা মাসে সাড়ে উনিশ টাকা। দুটো ঘোড়া থাকলে অতিরিক্ত ৭৮ টাকা ভাতা মঞ্জুর করা হতো। আলাউদ্দিন তাঁর সৈন্যদের নগদে বেতন দিতেন, এই বেতন বছরে একবার বা কয়েকটি কিস্তিতে দেওয়া হতো। গ্রামের প্রধান বা মুকাদ্দম ছিল রাজস্ব আদায়কারী। আধা-সরকারি এই পদের জন্য সে আদায়ীকৃত রাজস্বের ওপর কমিশন ও অতিরিক্ত কিছু সুযোগ-সুবিধা পেত। মাহরু তাঁর স্মৃতিচারণায় উল্লেখ করতে ভোলেননি যে আলাউদ্দিনের শাসনকালে একজন কারিগর দৈনিক দুই থেকে তিন জিতল আয় করত। একজন তাঁতি একখানি চাদর বুনে দিয়ে দুই জিতল মজুরি নিত, একজন দরজি পোশাক বানিয়ে দিয়ে নিত চার জিতল। আলাউদ্দিনের আমলে একজন গৃহভৃত্যের বার্ষিক বেতন ছিল দশ থেকে বারো টাকা—দৈনিক দুই জিতল। গৃহভৃত্য বা ক্রীতদাসদের নির্দিষ্ট বেতনক্রম ছিল না, শুধু সুলতানি ক্রীতদাসদের স্বীকৃত মর্যাদা ও বেতনক্রম ছিল। সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক ক্রীতদাসদের জন্য বেতন, চাল, গম, মাংস, পোশাক ইত্যাদি বরাদ্দ করেন। ফিরুজ তুঘলক ক্রীতদাসদের হিতসাধনে আরও বেশি উদ্যোগী ছিলেন, তাঁর আমলে রাজকোষ থেকে ক্রীতদাসদের ১০-১০০ টাকা পর্যন্ত দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল।

চিকিৎসাবিদ্যা ছিল সম্মানজনক পেশাগুলির অন্যতম। চিকিৎসকরা বড় বড় শহর ও রাজধানী শহরে আপন পেশায় নিযুক্ত থাকতেন। যে উদ্যোগী চিকিৎসক নতুন কিছু আবিষ্কার করতেন বা চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শিতা দেখাতেন তিনি বিশেষভাবে পুরস্কৃত হতেন। অর্থ ও খ্যাতি তিনি দুই-ই লাভ করতেন। সাধারণ শ্রমিকের মজুরি সম্পর্কে বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না। দিল্লি ও ফিরুজাবাদের মধ্যে যারা যাত্রী পরিবহনের কাজে নিযুক্ত ছিল তাদের আয়ের একটি মোটামুটি হিসেব পাওয়া যায়। গাড়ির ভাড়া পড়ত চার জিতল, ঘোড়ার বারো জিতল আর পালকির পঁচিশ জিতল।

সুলতানি যুগে জীবনযাত্রার ব্যয় কেমন ছিল নির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণসহ হিসেব করে বলা যাবে না। জীবনযাত্রার গড় ব্যয় হিসেব করার অসুবিধা অনেক। বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানে ছিল বিস্তর ফারাক। *মাসালিক-অল-অবসর*-এর গ্রন্থকার তাঁর শোনা গল্পের ওপর নির্ভর করে লিখেছেন যে একজন ব্যক্তি তার তিন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে গোরুর মাংসের রোস্ট, রুটি ও মাখন খেয়েছিল, দাম পড়েছিল মাত্র এক জিতল। এই তথ্যের ওপর নির্ভর করে কে. এম. আশরাফ হিসেব করেছেন যে একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির একমাসে সবরকম ব্যয় নির্বাহ করতে এক টাকার বেশি ব্যয় হতো না। তবে এটি নির্ভুল হিসেব নয়, সাধারণভাবে ধারণা দেওয়ার মতো একটি হিসেব।

সুলতানি যুগে সুলতান ও অভিজাতরা বিলাস-ব্যসনের মধ্যে ছিলেন, তাঁদের স্বাচ্ছন্দ্যের কোনো অভাব হতো না। তাঁরা পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান ও খাওয়া-দাওয়ার জন্য অঢেল অর্থ ব্যয় করতেন। সুলতান ফিরুজ তুঘলকের আমলে সরকারি

কারখানাগুলি বাছাই ও দুষ্প্রাপ্য জিনিসে বোঝাই থাকত। কারখানার তত্ত্বাবধায়কদের ওপর নির্দেশ ছিল দুষ্প্রাপ্য ও চমকপ্রদ জিনিস দেখলেই তা রাজভাণ্ডারের জন্য সংগ্রহ করতে হবে। কে. এম. আশরাফ লিখেছেন যে ফিরুজ তুঘলকের একজোড়া জুতোর জন্য সত্তর হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছিল। রাজপ্রাসাদ, হারেম, ক্রীতদাস-দাসী, দেহরক্ষী, রত্নাভরণ ইত্যাদির জন্য সুলতানরা বহু অর্থ ব্যয় করতেন। সুলতানরা বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। আলাউদ্দিন খল্‌জি সিংহাসন আরোহণের সময় সোনা-রুপো ছড়িয়েছিলেন। বলবন রাজদরবারের জাঁকজমক পছন্দ করতেন, জনগণকে সম্পদ ও ঐশ্বর্যবলে বশীভূত করা ছিল এঁর উদ্দেশ্য। আমীর-ওম্‌রাহ্‌রা সুলতানদের মতো ব্যয়বহুল জীবনযাপন করতেন। সুলতান ও আমীরদের জীবনযাত্রার ধরনে বড় রকমের কোনো পার্থক্য ছিল না, তাঁরাও প্রাসাদোপম অট্টালিকায় বাস করতেন, অসংখ্য দাসদাসী থাকত। পোশাকআশাক ও জীবনযাত্রায় তাঁরা রাজকীয় আদব-কায়দা বজায় রাখতেন। এঁদের জন্য সুলতানরা ইক্‌তা দিতেন, ভাতারও ব্যবস্থা ছিল। সাধারণ অভিজাতদের জন্য রাষ্ট্র আয়ের ব্যবস্থা করে দিত। অর্থের অভাব ঘটলে এঁরা অক্লেশে ধনী বণিক ও মহাজনদের কাছ থেকে ধার নিতেন। সুলতানি যুগে রাষ্ট্র বণিক ও ব্যবসায়ীদের ধন ও সম্পত্তি রক্ষা করত। এঁদের ঐশ্বর্য নিয়ে সুলতানদের কোনো উদ্বেগ ছিল না। সুলতানি যুগে বণিক শ্রেণী শিক্ষিত ও সমৃদ্ধ ছিল, বহু নিষ্কর জমি এঁরা ভোগ করতেন, সুলতান খুশি হয়ে এঁদের নিষ্কর জমি উপহার দিতেন।

সুলতানি যুগে, বিশেষ করে আলাউদ্দিন, ফিরুজ তুঘলক ও লোদি সুলতানদের আমলে ভারতবর্ষে খাদ্যশস্য ও ভোগ্যপণ্যের দাম খুব সস্তা ছিল। আলাউদ্দিন বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করেন। ফিরুজ তুঘলকের সময় এসব কিছু ছিল না, তিনি সব নিয়ন্ত্রণ তুলে দেন। লোদিদের আমলে মুদ্রা খুব দুষ্প্রাপ্য ছিল, সরকার উৎপন্ন শস্যের একাংশে রাজস্ব নিত। সাধারণভাবে বলা যায় সুলতানি যুগে জিনিসপত্র সস্তা ছিল, মূল্যস্তর ছিল নিম্নমুখী। এ তথ্যের উল্লেখ করে বারানি লিখেছেন যে পণ্য সস্তা হলেও সাধারণ মানুষ ও মজুর শ্রেণী খুব উপকৃত হয়নি কারণ মজুরির হারও ছিল খুব কম। সমকালীন একটি চলিত প্রবাদ উদ্ধৃত করে তিনি পণ্যমূল্য ও মজুরির সম্পর্ক বুঝিয়েছেন। 'এক পয়সায় (তামার দাঙ্‌) একটি উট পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু ঐ পয়সাটি আছে কার?' মজুরের যদি একটি পয়সাও না থাকে তাহলে এক পয়সায় উট বিক্রি হলে তার কী আসে যায়। আসল কথা হলো শ্রমিকের আয় ও ক্রয় ক্ষমতা। এই আয় ছিল অত্যন্ত সীমিত, জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহ করে এক পয়সায় উট কেনার মতো সঞ্চয় তার থাকত না। চিত্রটি অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে যায়। উঁচুতলার স্বাচ্ছন্দ্য, বিলাসব্যসন, জাঁকজমক থাকলেও নীচের তলায় ছিল অন্ধকার, সঞ্চয়হীনতা ও অনিশ্চয়তা। রাষ্ট্র কৃষকের উদ্বৃত্ত এমনভাবে আত্মসাৎ করত যে শুধু বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম সম্বলটুকু

তার হাতে থাকত। শুধু শাসকগোষ্ঠী নয়, মধ্যবর্তীস্তরের রাজস্ব আদায়কারী, গাঁয়ের প্রধান ও অন্যান্য সহযোগী গোষ্ঠীও কৃষকের উদ্বৃত্তে ভাগ বসিয়ে ফুলেফেঁপে উঠত। কে. এম. আশরাফ লিখেছেন যে কৃষক যদি দুবেলা দুমুঠো খেতে পেত তাহলে সে নিজেকে পরম ভাগ্যবান বলে মনে করত। বছরের অধিকাংশ সময় কৃষক খেতে পেত না, অর্ধাহারে, অনাহারে তার দিন কাটত। কৃষক প্রায় নগ্ন অবস্থায় থাকত, বস্ত্র কেনার মতো অর্থ তার থাকত না। বাড়িতে কৃষকের আসবাব বলতে ছিল একখানি তক্তপোষ এবং সম্পত্তি হলো কয়েকখানি বাসন। গৃহভৃত্য, কামার, কুমোর, ছুতোর, ধোপা, ধাঙড় ইত্যাদির আর্থিক অবস্থা কৃষকের চেয়ে ভালো ছিল না। তাদের অবজ্ঞাত নিঃসঙ্গ জীবন একদিক দিয়ে নিরাপদ ছিল, বাইরের কারোর অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা ছিল কম।

আলাউদ্দিন খলজির বাজার নিয়ন্ত্রণ

আলাউদ্দিন খল্জির (১২৯৬-১৩১৬) শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর অর্থনৈতিক সংস্কারসমূহ। চতুর্দশ শতকের গোড়ার দিকে তাঁর বাজার নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাসমূহ তাঁকে 'একজন দুঃসাহসী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপক' হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। সুলতান ছিলেন একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী সাম্রাজ্যবাদী শাসক। তিনি বলবনের অনুসৃত 'সংহতি নীতি' থেকে সরে গিয়ে সম্প্রসারণের পথ ধরেন, একে একে গুজরাট, রণথম্ভোর, চিতোর ও মালব তিনি জয় করেন। উত্তর ভারতে এক বিস্তৃত সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। চতুর্দশ শতকের প্রথম দশকে তিনি দক্ষিণ ভারতে ক্রমাগত দুঃসাহসী সামরিক অভিযান চালিয়ে যান। আলাউদ্দিনের শাসনকালে মোঙ্গলরা বারবার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে হানা দিয়েছিল। মোঙ্গল আক্রমণ থেকে দিল্লি সুলতানিকে রক্ষার জন্য আলাউদ্দিন নতুন সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। দিল্লি থেকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত দুর্গগুলি সংস্কার করে সৈন্য সমাবেশ করা হয়। এসমস্ত সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে দিল্লি সুলতানি অনেকখানি নিরাপদ হয়, কিন্তু সৈন্যসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল চার লক্ষ পঁচাত্তর হাজার বা পাঁচ লক্ষ। এই বিশাল সৈন্যবাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্য রাষ্ট্রীয় বাজেটের ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়েছিল। রাষ্ট্রীয় আয় না বাড়িয়ে সৈন্যবাহিনীকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য আলাউদ্দিনকে বাজার নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

জিয়াউদ্দিন বারানির *তারিখ-ই-ফিরুজশাহী* গ্রন্থ থেকে আলাউদ্দিনের বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে বারানি আলাউদ্দিনের বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি লিখেছেন যে আলাউদ্দিন মোঙ্গল আক্রমণের বিরুদ্ধে শক্তিশালী দক্ষ সৈন্যদল গঠন করবার জন্য বাজার নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেছিলেন। বারানির মতে, আলাউদ্দিনের বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছিল আসলে

সামরিক ব্যবস্থার অঙ্গ। আবার বারানি তাঁর অপর গ্রন্থ *ফতোয়া-ই-জাহান্দারি*-তে বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে প্রজামঙ্গলকর কাজ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন যে সবযুগে জনগণের মঙ্গলের জন্য রাজাদের বাজার নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। জিনিসপত্রের দাম স্থিতিশীল না হলে সৈন্যবাহিনীতে যেমন শান্তি থাকে না, জনগণও সুখ ও শান্তিতে জীবন কাটাতে পারে না। বারানি তাঁর দুখানি গ্রন্থে আলাউদ্দিনের বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুটি উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন—অল্প ব্যয়ে সৈন্যবাহিনী পোষণ এবং জনগণকে সুখী ও সন্তুষ্ট রাখা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। আলাউদ্দিনের সমসাময়িক লেখক হামিদ কালান্দার সুলতানের সঙ্গে কাজী হামিদউদ্দিনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে যেসব আলোচনা হয়েছিল তার বিবরণ রেখে গেছেন। এতে আলাউদ্দিনের প্রজামঙ্গলকর চিন্তার আভাস আছে। আলাউদ্দিন শাসিত জনগণকে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য দিতে চেয়েছিলেন। এগুলি ছাড়াও আলাউদ্দিনের সমকালীন লেখক ও কবি আমীর খসরুর *খাজাইনুল ফুতু*-তে তাঁর অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার উল্লেখ আছে। আমীর খসরু জানিয়েছেন যে শুধু সামরিক প্রয়োজনের জন্য নয়, জনগণের মঙ্গলের কথা ভেবে সুলতান তাঁর অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থার প্রচলন করেন।

আলাউদ্দিনের বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো এই ব্যবস্থার ভিত্তি বা বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার নীতি। বারানি এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন যে আলাউদ্দিন প্রত্যেক পণ্যের মূল্য নির্ধারণের আগে উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ করেন। বারানির *ফতোয়া-ই-জাহান্দারি*-তে মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতির বিস্তৃত আলোচনা আছে। পণ্ডিতদের ধারণা সুলতানের মূল্য নির্ধারণ নীতি ছিল 'মার্কসীয় শ্রমভিত্তিক মূল্যনীতির নিকটবর্তী'। আলাউদ্দিন প্রথমে খাদ্যশস্যের মূল্য নির্ধারণ করেন। ভোগ্যপণ্যের মূল্য নির্ধারণকালে তিনি কুশলী ও অকুশলী কারিগর ও বণিকদের লগ্নিকৃত পুঁজির জন্য লভ্যাংশের ব্যবস্থা করেন। আলাউদ্দিনের সময়ে পুঁজিপতি বণিকরা ছিল লোভী ও মুনাফাখোর। তিনি তাদের অতি মুনাফালাভের প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করেন। আলাউদ্দিন রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ করে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের পথ ধরেননি। তিনি জানতেন যে-কোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বল প্রয়োগে গড়ে তোলা যায় না। অর্থনীতির সাধারণ নিয়ম ভঙ্গ করা হলে কোনো ব্যবস্থা স্থায়ী হয় না। যেহেতু তাঁর অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তাঁর মৃত্যুর পরেও টিকেছিল একথা বললে অত্যুক্তি হয় না যে সুলতান যে-ব্যবস্থা গঠন করেন তা ছিল স্বাভাবিক। স্বাভাবিক বাজার গঠন করা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। সেই যুগে ভারতে দুটি প্রভাবশালী হিন্দু বণিকগোষ্ঠী ছিল, নায়করা (Nayaks) ছিল শস্য ব্যবসায়ী, আর মুলতানিরা বস্ত্র ব্যবসায়ী। আলাউদ্দিন বিস্তৃত রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করে এদের একচেটিয়া ব্যবসাকে রাষ্ট্রের অধীনে স্থাপন করেন। সুলতানের ব্যবস্থার ফলে ব্যক্তিগত একচেটিয়া ব্যবসা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত একচেটিয়া ব্যবসার রূপ নিয়েছিল।

আলাউদ্দিন প্রতিষ্ঠিত চারটি বাজারের প্রথমটি হলো মাণ্ডি বা শস্য বাজার। এই বাজার সম্পর্কে তিনি বিস্তৃত সরকারি নির্দেশ জারি করেন। সুলতান সমস্ত শস্যের উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ করে বাজার দর নির্দিষ্ট করে দেন। বারানি ও আমীর খসরু উভয়ে জানিয়েছেন যে সুলতান শস্যমূল্য নির্ধারণ করে আদেশ জারি করার পর তা আর কখনো বাড়তে দেননি। সরকার নির্ধারিত প্রতিমণ শস্যের দাম ছিল নিম্নরূপ ঃ গম সাড়ে সাত জিতল, বার্লি ও যব চার জিতল, ধান ও ডাল পাঁচ জিতল। এইসময়ে দিল্লির একজন নাগরিক একটি রুপোর টাকা ব্যয় করে ৮৮ সের গম, ৯৮ সের চাল বা ডাল কিনতে পারত। শস্য বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য আলাউদ্দিন মালিক কাবুল উলুগখানিকে 'শাহানা' বা বাজার নিয়ন্ত্রক নিযুক্ত করেন, শাহানার অধীনে ছিল বারিদরা (গুপ্তচর)। দিল্লির বিভিন্ন মহল্লায় শস্যভাণ্ডার স্থাপন করা হয়েছিল। দোয়াব অঞ্চলের 'খালিসা' জমি থেকে সুলতান উৎপন্ন শস্যে রাজস্ব সংগ্রহ করেন। মজুত শস্যভাণ্ডার গড়ে তোলা ছাড়াও সুলতান শস্য ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যবস্থা নেন। এদের নিয়ে একটি পৃথক বণিকগোষ্ঠী গঠন করা হয়, স্ত্রী-পুত্র ও পণ্য নিয়ে এরা দিল্লিতে থাকত। সাধারণ সময়ে এরা এত শস্য দিল্লির বাজারে নিয়ে আসত যে রাজকীয় ভাণ্ডারে হাত দিতে হতো না। শস্য বেচাকেনার বাজারে তিনি কঠোরভাবে অতি মুনাফালাভের প্রবণতা বন্ধ করে দেন। শস্য ওঠানোর সময় তিনি কড়াকড়ি করে রাজস্ব আদায় করে নিতেন, এর ফলে বাজারে শস্যের দাম কম থাকত। শাহানা-ই-মাণ্ডি, বারিদ ও অন্যান্য গুপ্তচরদের মাধ্যমে সুলতান শস্য বাজারের ওপরে নিয়ন্ত্রণ রাখতেন। তাঁর শাসনকালে দিল্লিতে কোনো দুর্ভিক্ষ হয়নি, খাদ্যশস্যের দাম বাড়েনি। দুর্ভিক্ষের সময় আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসেবে সুলতান বিস্তৃত খাদ্য রেশনিং ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। প্রত্যেক মহল্লার দোকানে নাগরিকদের প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল। বারানির মতে, শস্য বাজারে নির্দিষ্ট স্থায়ী মূল্যস্তর ছিল 'সে যুগের বিস্ময়'।

আলাউদ্দিন প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় বাজারটি ছিল *সেরাই আদল*, বিশেষ অনুদানপ্রাপ্ত শিল্পপণ্যের বাজার। দিল্লির বদায়ুন তোরণের কাছে সুলতান এই বিশেষ বাজারটি স্থাপন করেন। এই বাজারে বিদেশ থেকে (সাম্রাজ্যের বাইরে থেকে) পণ্য এনে বিক্রি করা হতো। এই বাজারে বিক্রি হতো বস্ত্র, চিনি, ওষুধপত্র, শুকনো ফল, ঘি, জ্বালানি তেল ও অন্যান্য পণ্য। বারানি এই বাজারের বিক্রয়যোগ্য সমস্ত পণ্যের দাম উল্লেখ করেছেন। উচ্চমূল্যের সূক্ষ্ম রেশমবস্ত্র এই বাজারে পাওয়া যেত। সাধারণত এক টাকায় চল্লিশ গজ মোটাকাপড় বা বিশ গজ মিহিকাপড় কেনা যেত। একখানি উত্তম রেশমী বস্ত্রের দাম পড়ত ষোলো টাকা, এক সের চিনির দাম ছিল ১.৫ জিতল, মিছরি ২.৫ জিতল। এক জিতল-এ দেড় সের ঘি পাওয়া যেত। জ্বালানি তেল বা রেড়ির তেল এক জিতল-এ পাওয়া যেত তিন সের, পাঁচ সের লবণের দাম ছিল এক জিতল। এ বাজারে যারা পণ্য বিক্রির জন্য আনত তাদের নাম বাণিজ্য মন্ত্রণালয় দেওয়ান-ই-

রিয়াসতে নথিভুক্ত করতে হতো। এরা ছিল নিয়ন্ত্রিত বণিক—'সওদাগরান-ই-মিজানি'। এই বণিকদের প্রতিবছর নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য সেরাই আদলে আনতে হতো এবং সরকার নির্ধারিত দামে তা বিক্রি করতে হতো। সরকারি নিয়ন্ত্রণের জন্য সেরাই আদল সবসময় পণ্যসম্ভারে পূর্ণ থাকত। এই বাজারে মুলতানি বণিকরা সাম্রাজ্যের বাইরে থেকে বহুমূল্য পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে আসত, দিল্লির অভিজাতরা নির্দিষ্ট মূল্যে তা কিনত। সুলতান এজন্য মুলতানি বণিকদের রাজকোষ থেকে কুড়ি লক্ষ টাকা ভরতুকি দেন, তিনি তাদের সেরাই আদল নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেন। এই নিয়ন্ত্রিত বাজার থেকে পণ্য সস্তায় কিনে যাতে কেউ মুনাফা করতে না পারে সেজন্য সুলতান পরওয়ানা অফিসার (পারমিট অফিসার) নিয়োগ করেন।

আলাউদ্দিন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও নিয়ন্ত্রিত তৃতীয় বাজারটি হলো ঘোড়া, ক্রীতদাস ও গবাদিপশুর বাজার। এ-বাজারের ক্ষেত্রেও সুলতান মূল্য নিয়ন্ত্রণ, বণিক ও দালালদের নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি ব্যবস্থা চালু রাখেন। সেযুগে সৈন্যবাহিনীর একটি বড় অংশ ছিল অশ্বারোহী, তুর্কিদের সৈন্যবাহিনীতে অশ্বারোহী বাহিনীকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতো। রাষ্ট্র সামরিক প্রয়োজনে প্রচুর ঘোড়া কিনত। শুধু রাষ্ট্র নয়, সাধারণ নাগরিকদেরও নানাকাজে প্রচুর ঘোড়ার দরকার হতো। ঘোড়ার বাজারে ছিল প্রচুর দালাল ও মুনাফা শিকারী ব্যবসাদার। আলাউদ্দিন কঠোরভাবে এই দালাল ও ব্যবসাদারদের নিয়ন্ত্রণ করেন। গুণগত মান অনুযায়ী ঘোড়ার দাম বেঁধে দেওয়া হয়। প্রথম শ্রেণীর ঘোড়ার দাম ধার্য করা হয় ১০০-১২০ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীর ৮০-৯০ টাকা এবং তৃতীয় শ্রেণীর ৬০-৭০ টাকা। সামরিক বাহিনীর কাজে লাগে না এমন নিকৃষ্ট শ্রেণীর টাট্টু ঘোড়ার দাম ছিল সবচেয়ে কম, ২০-২৫ টাকা। সুলতানের এইসব বিধিব্যবস্থার ফলে বাজারে মূল্যস্তর স্থিতিশীল হয়, বণিক ও দালালদের মুনাফা শিকার বন্ধ হয়ে যায়। সুলতান ক্রীতদাস ও গবাদিপশুর ক্ষেত্রেও মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি অনুসরণ করেন। একজন সাধারণ ক্রীতদাসের রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত দাম ছিল পাঁচ থেকে বারো টাকা। একজন তরুণ ক্রীতদাসের দাম পড়ত বিশ থেকে ত্রিশ টাকা। একজন অকুশলী সাধারণ ক্রীতদাসের দাম পড়ত সাত থেকে আট টাকা। একজন ক্রীতদাসীর দাম ছিল পাঁচ থেকে বারো টাকা, উপপত্নী পাওয়া যেত বিশ থেকে চল্লিশ টাকায়। ভারবাহী বলদ বা মোষ বিক্রি হতো চার থেকে পাঁচ টাকায়। সাধারণ বলদের দাম ছিল তিন টাকা, দুগ্ধবতী গাভী তিন থেকে চার টাকা, দুধেলা মোষ দশ থেকে বারো টাকা। একটি পাঁঠা বা মেষের দাম ছিল দশ থেকে বারো জিতল। মাংসের জন্য বিক্রয়যোগ্য গরুর দাম ছিল দেড় থেকে দু টাকা, মোষের দাম পাঁচ থেকে ছ টাকা।

আলাউদ্দিন তাঁর বাণিজ্য মন্ত্রণালয় দেওয়ান-ই-রিয়াসতের অধীনে চতুর্থ সাধারণ বাজার গঠন করেন। মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীদের সহায়তায় এই বাজারে বিক্রয়যোগ্য সমস্ত পণ্যের দাম তিনি নির্ধারণ করে দেন। সমগ্র রাজধানী শহর জুড়ে ছিল এই

বাজার। সাধারণ বাজারে মানুষের প্রয়োজনীয় সব ভোগ্যপণ্য পাওয়া যেত, মাছ, মাংস, সবজি, রুটি, তৈজসপত্র থেকে টুপি, চিরুনি, মোজা, সূঁচ সব এখানে বিক্রি হতো। নির্ধারিত মূল্যে এসব পাওয়া যেত। আলাউদ্দিন ইয়াকুব নাজিরকে তাঁর বাণিজ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। নাজির খুব দক্ষ ও সৎ কর্মচারী ছিলেন, তাঁকে এই বাজার পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রত্যেক আঞ্চলিক বাজারের জন্য তিনি একজন করে শাহানা (পরিদর্শক) নিযুক্ত করেন। এদের কাজ ছিল বাজারের নির্ধারিত মূল্য, ওজন ও মাপ সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া এবং ভেজাল বন্ধ করা। এই বিভাগের তদারকির জন্য সাধারণ বাজারের দোকানদাররা নির্দিষ্ট মূল্যে, সঠিক ওজনে ও মাপে খাঁটি জিনিস বিক্রি করতে বাধ্য হতো।

আলাউদ্দিনের বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছিল 'সে যুগের বিস্ময়'। তিনি যে শুধু জিনিসপত্রের দাম কমিয়েছিলেন তা নয়, তিনি একটি নির্দিষ্ট স্তরে জিনিসপত্রের দাম বেঁধে রাখতে সক্ষম হন। তাঁর বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অঙ্গ ছিল রেশনিং। তাঁর শাসনকালে দেশে দুর্ভিক্ষ হয়নি, খরা ও অজন্মার বছরে যখন সাধারণ মানুষ মনে করত দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী সুলতান তা হতে দেননি। সুলতানের বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছিল। চারটি বাজারের ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ তিনি এমনভাবে কায়েম করেন যে সব প্রজা সুখী ও সন্তুষ্ট ছিল। দেওয়ান-ই-রিয়াসত, শাহানা, বারিদ প্রভৃতি কর্মচারীরা নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করত। কোনো কর্মচারী কাজে অবহেলা করলে সুলতান গুপ্তচর মারফত তা জেনে যেতেন, অপরাধীকে শাস্তি দিতেন। বারানি মনে করেন যে সুলতান 'ত্রাস' সৃষ্টি করে তাঁর বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। আধুনিক ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ এই মত প্রকাশ করেছেন যে সুলতানের মৃত্যুর পরও তাঁর ব্যবস্থা টিকেছিল। 'ত্রাস' যদি তাঁর সাফল্যের একমাত্র কারণ হয়, তাহলে তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ব্যবস্থা শেষ হয়ে যেত। আলাউদ্দিন সফল হয়েছিলেন কারণ অর্থনীতির মূলনীতিকে তিনি নস্যাৎ করেননি। সব মানুষকে তিনি স্বাধীনভাবে অর্থনৈতিক কাজকর্মে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেন। সকলে জানত তাদের আয় কতখানি, সংগৃহীত অর্থে তারা কী ধরনের জীবনযাপন করতে পারবে। সুলতানের বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জনগণকে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দিয়েছিল।

সুলতানের বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার আয়তন নিয়ে একটি বিতর্ক আছে। প্রশ্ন উঠেছে এই ব্যবস্থা শুধু রাজধানী দিল্লির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল কি না। মোরল্যান্ড মনে করেন যে সুলতানের বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শুধু রাজধানী দিল্লির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বারানির *ফতোয়া-ই-জাহান্দারি*-তে বলা হয়েছে যে সুলতানের বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দিল্লির বাইরে প্রদেশগুলিতে সম্প্রসারিত হয়েছিল। *কেম্ব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি*-তে বারানির মতকে সমর্থন করা হয়েছে। সুলতানের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা যে-অঞ্চল জুড়ে ছিল সেখানে বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও চালু হয়েছিল। উত্তর-পশ্চিমে লাহোর থেকে

দক্ষিণে ছাইন (রাজস্থান) (Chhain) এবং পূর্বে কতেহার (রোহিলখণ্ড) পর্যন্ত এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। মুলতানি বণিকরা দিল্লির বাজারের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিল যে তারা উত্তর ভারতের পণ্যসামগ্রী নিজেদের অঞ্চলে রপ্তানি করত। এই ব্যবস্থা শুধু দিল্লির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। আবুল কাশেম ফিরিস্তা জানিয়েছেন যে সুলতানের বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তাঁর সাম্রাজ্যের বিস্তৃত অঞ্চলে প্রবর্তিত হয়। যদি ধরে নেওয়া হয় সুলতানের বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সৈন্যবাহিনীর সন্তোষ বিধান বা অল্প বেতনে তাদের সুখী রাখা, তাহলে বলা যায় যেহেতু তাদের পরিবার সারা দেশে ছড়িয়ে ছিল সারাদেশের জীবনযাত্রার ব্যয় না কমিয়ে সুলতান তাদের সন্তুষ্ট রাখতে পারতেন না। দিল্লিতে ঘোড়ার দাম নির্দিষ্ট করে দিয়ে বণিকদের তিনি প্রদেশ থেকে সস্তায় ঘোড়া কিনতে বাধ্য করতে পারতেন না। প্রদেশেও ঘোড়ার দাম তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়েছিল।

ফিরিস্তা সুলতানের বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁর মতে, এই ব্যবস্থা ছিল অনন্য, তাঁর আগের বা পরের কোনো শাসক এই কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন না। জনগণ সুখী ছিল এটাই বড় কথা। সুলতানের শাসনকালে রাস্তায় বস্ত্রহীন ভিখারী দেখা যেত না, দেশে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য এসেছিল। অধ্যাপক পি. শরণ ও কে. এস. লাল সুলতানের বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করেছেন। এঁদের মতে, আলাউদ্দিনের বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও রেশনিং শুধু দিল্লিতে চালু হয়েছিল। তাঁর ব্যবস্থা দেশের শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষির ক্ষতি করেছিল। দোয়াবের কৃষকদের ওপর তিনি পঞ্চাশ শতাংশ হারে রাজস্ব ধার্য করেন, উপরন্তু তাদের উদ্বৃত্ত শস্য সরকার নির্ধারিত দামে বিক্রি করতে হতো। দোয়াব অঞ্চলের কৃষি ও কৃষকের ক্ষতি করে সুলতান দিল্লিতে অপর্যাপ্ত শস্য সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। বণিকদের ওপর এত বিধিনিষেধ চাপানো হয়েছিল এবং তাদের মুনাফার পরিমাণ এত কম ছিল যে তারা সব উৎসাহ হারিয়ে ফেলে (loss of incentive)। দিল্লির নথিবদ্ধ বণিকরা তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের জামিন হিসেবে রাখতে বাধ্য হতো। সুলতানের ব্যবস্থার ফলে শুধু দিল্লির অধিবাসী ও সৈনিকরা লাভবান হয়, সারাদেশের ক্ষতি হয়। সৈন্যবাহিনীকে সন্তুষ্ট রাখার পরিকল্পনা সফল হয়েছিল, কিন্তু অর্থনীতির মূলসূত্রগুলির বিরোধী হওয়ায় সুলতানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পতন ঘটে। এসব বিরোধী সমালোচনা সত্ত্বেও বলা যায় যে আলাউদ্দিন শুধু সৈন্যবাহিনীর জন্য নয়, তাঁর শাসনাধীন জনগণের মঙ্গলের জন্য তাঁর বিস্তৃত বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গঠন করেন। নির্দিষ্ট মূল্যমান বজায় থাকলে সাধারণ মানুষ, কৃষক, শ্রমিক সকলে লাভবান হয়। সুলতান যতদিন জীবিত ছিলেন তাঁর বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জনগণকে অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা দিয়েছিল।

অষ্টম অধ্যায়

সুলতানি যুগে দাসব্যবস্থা, অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য

দাসব্যবস্থা

সুলতানি শাসন শুরু হবার আগে থেকে ভারতে দাসব্যবস্থা ছিল। প্রাক্-সুলতানি যুগের দাসব্যবস্থা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া গেছে। সমগ্র মুসলিম জগতে ক্রীতদাস রাখা ছিল একটি যুগ-প্রাচীন প্রথা। প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত ব্যক্তি বেশ কিছু ক্রীতদাস রাখতেন, ক্রীতদাস না থাকলে সম্মানিত ব্যক্তির সামাজিক সম্মান কমে যেত। *কেম্ব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি*-তে মন্তব্য করা হয়েছে যে জুলিয়াস সিজারের ইংল্যান্ড আক্রমণের মতো গজনি ও ঘুরির শাসকদের ভারত আক্রমণের পেছনে একটি বড় কারণ হলো ক্রীতদাস সংগ্রহ। দিল্লিতে ঘুরি শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে দাসপ্রথা আরও সুগঠিত রূপ নিয়েছিল, এর অর্থনৈতিক তাৎপর্য বৃদ্ধি পেয়েছিল।

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে একটি সামরিক অভিযানের সাফল্য ও ব্যর্থতা বিচার করা হতো শুধু কত সোনা-রুপো পাওয়া গেল তা দিয়ে নয়, সেই সঙ্গে কত দাস-দাসী, হাতি, ঘোড়া, গবাদি পশু মিলল তারও হিসেব নেওয়া হতো। ১১৯৫ খ্রিস্টাব্দে কুতুবুদ্দিন আইবক গুজরাটে একটি অভিযান পরিচালনা করেন, ঐ অভিযানে তিনি বিশ হাজার ক্রীতদাস (বুরদা) সংগ্রহ করেন। সাত বছর পর কালিঞ্জর আক্রমণ করে তিনি লাভ করেন পঞ্চাশ হাজার ক্রীতদাস। দিল্লি সুলতানি স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পরেও ক্রীতদাস সংগ্রহ সামরিক অভিযানের অন্যতম লক্ষ্য থেকে যায়। বিদেশী অভিজাতদের জীবনযাপনের উপকরণ সংগ্রহ, সেবা এমনকি শাসনের জন্য ক্রীতদাসের প্রয়োজন হতো। ১২৫৩ খ্রিস্টাব্দে বলবন রণথম্ভোর আক্রমণ করে অসংখ্য ঘোড়া ও ক্রীতদাস লাভ করেন। দাক্ষিণাত্যে অভিযান পাঠানোর প্রাক্কালে আলাউদ্দিন তাঁর প্রিয় সেনাপতি মালিক কাফুরকে কয়েকটি নির্দেশ দিয়েছিলেন। এর মধ্যে একটি নির্দেশ ছিল ঐ অঞ্চল থেকে ঘোড়া ও ক্রীতদাস সংগ্রহ করতে হবে। দিল্লির সুলতানরা সুলতানি রাজ্য সম্প্রসারণকালে বা বিদ্রোহ দমনের সময় ক্রীতদাস সংগ্রহ করতেন। এটি ছিল দিল্লি সুলতানির এক স্থায়ী বৈশিষ্ট্য।

যেসব অঞ্চল সুলতানি শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করত বা রাজস্ব দিতে চাইত না সেসব অঞ্চল থেকে ক্রীতদাস সংগ্রহ করা হতো। সুলতান বলবন দোয়াব অঞ্চলে দস্যুবৃত্তি বন্ধ করার জন্য সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। ঐসময় তিনি এত ক্রীতদাস ও গবাদি পশু সংগ্রহ করেছিলেন যে রাজধানীর বাজারে এদের দাম নেমে

গিয়েছিল। নিজামুদ্দিন একজন বৃদ্ধা ক্রীতদাসীর কথা দুবার উল্লেখ করেছেন যাকে কতেহারের (Kateher) বিদ্রোহী অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। নিজামুদ্দিনের শিষ্য নাসিরুদ্দিন পাঞ্জাবের একটি গ্রামের কথা জানিয়েছেন যেখানে আক্রমণ চালিয়ে স্থানীয় গভর্নর (মুক্‌তি) সমস্ত লোককে ক্রীতদাস বানিয়ে ফেলেন। ইবন বতুতা জানিয়েছেন যে সামরিক অভিযান চালিয়ে দাসদাসী সংগ্রহ করার রেওয়াজ ছিল। এদের মধ্যে থাকত এমন বহুসংখ্যক দাসদাসী যারা ছিল অপরিচ্ছন্ন এবং রুচিও নিম্নমানের। বাজারে এদের বিনিময়ে বেশি দাম পাওয়া যেত না, তবুও এদের ছেড়ে দেওয়া হতো না।

এভাবে যেসব ক্রীতদাসদাসী সংগ্রহ করা হতো তাদের সংখ্যা হতো বিশাল। এর ওপর তুর্কিস্তান, চীন ও আফ্রিকা থেকে ভারতে ক্রীতদাস আমদানি করা হতো। আফ্রিকার হাবসী ক্রীতদাসদের ভারতে বিশেষ কদর ছিল, এরা হতো অস্ত্রচালনায় নিপুণ, অন্যান্য কাজেও দক্ষ। আলাউদ্দিন খল্‌জির পঞ্চাশ হাজার ক্রীতদাস ছিল, ফিরুজ তুঘলকের ক্রীতদাসের সংখ্যা হলো এক লক্ষ আশি হাজার। সুলতানি অভিজাতদের সকলের ক্রীতদাস ছিল, ফিরুজ তুঘলকের মন্ত্রী খান-জাহান মকবুলের দুহাজার উপপত্নী ছিল। শুধু ধনী অভিজাতরা ক্রীতদাস রাখত না, নির্ধন অনেক উচ্চবংশীয় পরিবার ক্রীতদাস রাখত। দিল্লির নূর তুর্ক নামক এক দরবেশের একজন ক্রীতদাস ছিল। এই ক্রীতদাসটি ছিল পেশায় ধুনুরি, তার আয় থেকে দরবেশের জীবিকানির্বাহ হতো। নিজামুদ্দিন বদায়ুনে তাঁর মায়ের সঙ্গে কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করতেন, তাঁরও একজন ক্রীতদাসী ছিল।

মুসলিম আইনে ক্রীতদাস হলো প্রভুর সম্পত্তি এবং বিক্রয়যোগ্য। সুলতানি যুগে দিল্লিতে এবং প্রাদেশিক শহরগুলিতে ক্রীতদাসের বাজার গড়ে উঠেছিল। বারানি আলাউদ্দিনের বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার যে বিস্তৃত বিবরণ রেখে গেছেন তাতে দিল্লির ক্রীতদাস বাজারের উল্লেখ আছে। বারানির বর্ণনায় ক্রীতদাসদাসীদের বাজার দামেরও উল্লেখ আছে। তাঁর সময়ে একজন গৃহপরিচারিকার দাম পড়ত পাঁচ থেকে বারো টাকা, একজন উপপত্নী বিশ থেকে চল্লিশ টাকা, অকুশলী বালক দাস সাত থেকে আট টাকা, কুশলী দক্ষ দাস দশ থেকে পনেরো টাকা। চতুর্দশ শতকের গোড়ার দিকে দেবগিরিতে পাঁচ টাকায় ক্রীতদাস বিক্রির নজির আছে। এর পাশাপাশি দিল্লির বাজারে অন্য পণ্য মূল্যের হিসেব নিলে আশ্চর্য হতে হয়। ঐ সময় দিল্লির বাজারে একটি নিকৃষ্ট টাট্টু ঘোড়ার দাম ছিল দশ থেকে পঁচিশ টাকা, একটি দুধেলা মোষের দাম পড়ত দশ থেকে বারো টাকা। এসমস্ত পশুর চেয়ে মানুষের দাম কম ছিল। মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে ক্রীতদাসের দাম আরও কমেছিল। দিল্লিতে আট টাকায় একজন ক্রীতদাসী এবং পনেরো টাকায় একজন গৃহপরিচারিকা বা উপপত্নী পাওয়া যেত। রাজধানীর

বাইরে দাসদাসীর দাম আরও কম ছিল। চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ক্রীতদাস-দাসীর দাম বাড়তে শুরু করেছিল কারণ বারানি ক্রীতদাসের দাম বৃদ্ধি নিয়ে আক্ষেপ করেছেন। সাধারণভাবে সমস্ত পণ্যের দাম বাড়ছিল, সেইসঙ্গে ক্রীতদাসের দাম বেড়েছিল। ক্রীতদাসের দাম বৃদ্ধির আর একটি সম্ভাব্য কারণ হলো বাজারে ক্রীতদাসের জোগান কমেছিল। ফিরুজ তুঘলকের আমলে দিল্লি সুলতানি তার সামরিক দক্ষতা হারিয়ে ফেলেছিল, আগের মতো সামরিক অভিযান ছিল না। তবুও ভারতের বাজারে প্রচুর ক্রীতদাস পাওয়া যেত, দাম যাই হোক না কেন। ভারতীয় ক্রীতদাসের একাংশ মুসলিম দুনিয়ায় রপ্তানি হয়ে যেত। ঐতিহাসিক মিনহাজ সিরাজ যখন জানলেন যে তাঁর ভগ্নী জীবিত, সুলতান তাঁর জন্য চল্লিশ জন ক্রীতদাস ও একশ গাধার পিঠে চাপিয়ে উপহার সামগ্রী পাঠিয়েছিলেন। নিজামুদ্দিন একজন দরবেশ বণিকের কাহিনী শুনিয়েছেন, এই দরবেশের ব্যবসা ছিল ক্রীতদাসদাসীর। তিনি দিল্লি থেকে গজনিতে দাস নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা করতেন। ফিরুজ তুঘলক ভারত থেকে ক্রীতদাস রপ্তানি বন্ধ করে দেন। সম্ভবত ক্রীতদাসদের সংগঠিত করে তাদের সামাজিক উন্নতির কথা তিনি ভেবেছিলেন। অন্য একটি মত হলো তিনি নিজে অনুচরবাহিনী গড়ার জন্য রপ্তানি বন্ধ করে দেন। তৈমুরের ভারত আক্রমণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ক্রীতদাসদাসী সংগ্রহ। তাঁর সৈন্যরা দিল্লিতে ঢোকার আগেই একলক্ষ হিন্দু দাস সংগ্রহ করেছিল, তাঁর সঙ্গী একজন ধর্মপ্রাণ দরবেশও পনেরো জন ক্রীতদাস সংগ্রহ করেন। তৈমুর দিল্লিতে প্রবেশের আগে এদের সকলকে হত্যা করেন, তাঁর ভয় হয়েছিল সুযোগ পেলে এরা সকলে মিলে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে। দিল্লি অধিকার করে তৈমুরের সৈন্যবাহিনী দিল্লির অধিবাসীদের বন্দী করে ক্রীতদাসে পরিণত করেছিল। তৈমুরের সঙ্গীদের মধ্যে এদের ভাগ করে দেওয়া হয়, এদের মধ্যে ছিল কয়েক হাজার পেশাদার মানুষ ও দক্ষ কারিগর।

ক্রীতদাসদের মধ্যে ছিল প্রধানত দুটি শ্রেণী। প্রথম শ্রেণীতে ছিল সুলতানের খাস বান্দারা (বন্দগান-ই-খাস), এরা বিভিন্ন দেশ থেকে আসত এবং একই সুলতানের অধীনে কর্মসূত্রে বাঁধা পড়ত। স্বার্থ বা রক্তের ভিত্তিতে এদের মধ্যে গোষ্ঠী গড়ে উঠত না। সুলতানরা অনেকসময় অভিজাত বা আমলাদের চেয়ে এদের ওপর বেশি নির্ভর করতেন। এদের বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের ওপর সুলতানকে অনেকখানি নির্ভর করতে হতো। সুলতান ছিলেন এদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তিনি ইচ্ছা করলে এদের হত্যা করতে পারতেন, আবার অন্যের কাছে হস্তান্তর করার অধিকারও তাঁর ছিল। বাস্তবক্ষেত্রে সুলতান ও ক্রীতদাসের মধ্যে সম্পর্ক অপ্রীতিকর ছিল না। ক্রীতদাসরা এমন কিছু করত না যাতে সুলতান তাদের ওপর বিরক্ত হন এবং চরম ব্যবস্থা নেন। অনেকক্ষেত্রে সুলতানরা ক্রীতদাসদের পুত্রস্নেহে পালন করতেন, আবার ক্রীতদাসরাও একান্ত

বিশ্বাসভাজন অনুচর রূপে গড়ে উঠত। বিশ্বস্ত ক্রীতদাসরা সুলতানদের শাসনব্যবস্থায় সক্রিয় ভূমিকা নিত। জীবনের পাঠশালায় এরা প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ পেত। প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার কঠোর মানসিকতা এদের তৈরি হয়ে যেত। সুলতানের যোগ্য উত্তরাধিকারী না থাকলে এরাই সিংহাসন দখল করত। এদের হাতে সুলতানি শাসন স্থায়িত্ব লাভ করেছিল, তিনজন ক্রীতদাস কুতুবুদ্দিন আইবক, ইলতুৎমিস ও বলবনের জীবন হলো এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সুলতানদের প্রচুর ক্রীতদাস থাকত। সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের এত বিপুল সংখ্যক ক্রীতদাস ছিল যে তিনি প্রতি সপ্তাহে এদের কয়েকজনকে মুক্তি দিতেন এবং বিবাহ দিয়ে সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠিত করতেন। সুলতানের মধ্যে ফিরুজ তুঘলক ক্রীতদাস দরদী ও তাদের পরম হিতৈষী রূপে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি তাঁর আমীর-ওমরাহ্‌দের কাছ থেকে রাজস্বের বিনিময়ে ক্রীতদাস নিতেন। এদের দেখাশোনার জন্য তিনি একটি পৃথক রাষ্ট্রীয় বিভাগ গঠন করেন। সুলতান ক্রীতদাসদের অনেককে নির্দিষ্ট বেতন দিয়ে শহরে স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেন। অন্যদের বিভিন্ন ব্যবহারিক বিদ্যা, পেশাগত ও ধর্মীয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়। তাঁর শাসনকালে বারো হাজার ক্রীতদাস কারিগরি ও রাজমিস্ত্রীর শিক্ষা পেয়েছিল, সাতচল্লিশ হাজার ক্রীতদাস অনুচর হিসেবে দরবারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। সুলতানের খাস দাসদের সমাজে প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। যেহেতু তারা ছিল সুলতানের কাছের মানুষ আমীর-ওম্‌রাহ্‌রা তাদের কৃপালাভের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ত। সুলতানা রাজিয়ার রাজত্বকালে ক্রীতদাসরা নিজেদের রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। ইলতুৎমিসের 'চল্লিশা' সুলতান বলবনকে রীতিমতো ভাবিয়ে তুলেছিল। সুলতান ফিরুজ তুঘলকের রাজত্বকালে এদের প্রভাব-প্রতিপত্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। পঞ্চদশ শতকের শেষে বাংলার হাবসী ক্রীতদাসরা ইলিয়াসশাহী বংশের পতন ঘটিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছিল। সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্‌ এদের দমন করেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্রীতদাসরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ, এরা সাধারণত গৃহস্থালির পরিচারক ও পরিচারিকার কাজ করত (বুরদা ও কানিজক)। এরা অভিজাতদের সশস্ত্র অনুচরের কাজেও নিযুক্ত হতো, অনেক ক্রীতদাস শ্রমিক হিসেবে উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত হতো। সুলতানি যুগে সুলতান, অভিজাত, উচ্চবংশীয়, মধ্যবিত্ত সকলের ক্রীতদাস ছিল। তুর্কিস্তান ও ভারতীয় ক্রীতদাসদের প্রাচ্যের দেশগুলিতে বেশ সুনাম ছিল। ভারতীয় দাসদের মধ্যে বলিষ্ঠ গঠন ও কষ্টসহিষ্ণুতার জন্য আসামের দাসদের সুনাম ও চাহিদা ছিল। হারেমের জন্য এক বিশেষ ধরনের ক্রীতদাস নিয়োগ করা হতো, এদের বলা হতো 'খোজা'। শিশুকালে এদের নপুংশক করে দিয়ে হারেম পাহারার কাজে লাগানো হতো। ত্রয়োদশ শতকের বাংলাদেশে খোজা বেচাকেনার বাজার ছিল। সুদূর মালয়

দ্বীপপুঞ্জ থেকেও এদের আমদানি করা হতো। ক্রীতদাসীরা হয় ঘরকন্নার শ্রমসাধ্য কাজ করত, নয় সঙ্গদান বা চিত্তবিনোদনের কাজে নিযুক্ত থাকত। বলাবাহুল্য, দ্বিতীয় দলের কদর ছিল বেশি এবং অভিজাত গৃহে এরাই কর্তৃত্ব করত। অভিজাতরা লড়াই ও চিত্তবিনোদন নিয়ে এত ব্যস্ত থাকত যে ঘর সামলাত এই ক্রীতদাসীরা। ক্রীতদাসী কেনার সময় ক্রেতার সামনে কয়েকটি স্পষ্ট লক্ষ্য থাকত। একজন মুঘল ওম্‌রাহ্‌ একবার কৌতুক করে এ-প্রসঙ্গে কয়েকটি মন্তব্য করেন। এ থেকে ক্রেতার মনোভাব ও লক্ষ্য স্পষ্ট ধরা পড়ে ঃ 'ঘরের কাজের জন্য খোরাসানের মেয়ে কেনো, দক্ষ শিশু পরিচর্যাকারিণী হিসেবে হিন্দু রমণী, হাস্যে, লাস্যে, রহস্যে মাতিয়ে রাখার জন্য পারস্যবাসিনীর সঙ্গ চাই। আর অক্ষু নদীর ওপারের মেয়ে ঘরে আনো যাকে বেত্রাঘাত করে অন্য তিনজনকে সাবধান করে দিতে পারো।' সুলতানি যুগে সাংসারিক কাজে দাসদাসী নিয়োগ করা শুধুমাত্র মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। হিন্দু শাসক ও অভিজাতরা সামরিক ও গার্হস্থ্য কাজে দাসদাসী নিয়োগ করতেন। দাক্ষিণাত্যের বারবনিতারা সেবা ও পরিচর্যার জন্য ক্রীতদাস রাখতে শুরু করেছিল, রাজপুতনার বিস্তৃত অঞ্চলে ক্রীতদাসদাসী রাখার প্রথা গড়ে উঠেছিল।

সুলতানি যুগে ক্রীতদাসদের অবস্থা সম্পর্কে তথ্যের অভাব আছে। সুলতানি যুগে ক্রীতদাস ছিল মালিকের সম্পত্তি, ক্রীতদাস পালিয়ে গেলে মালিকের সম্পত্তির ক্ষতি হতো। ক্রীতদাসের পক্ষে এ ঘটনা অপরাধ ও পাপ বলে গণ্য হতো। কোনো ক্রীতদাস পালিয়ে গেলে তার প্রত্যাবর্তনের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনাও জানানো হতো। তবে কোনো মালিক ক্রীতদাসকে মুক্তি দিলে তা ধর্মীয় পুণ্য কাজ বলে স্বীকৃতি পেত। মুক্তি পেয়ে ক্রীতদাস যদি ইসলাম ধর্ম ত্যাগও করত তাহলেও মুক্তিদাতা সেকাজকে পুণ্য কাজ বলে ধরে নিতেন। ইসলাম তত্ত্বগতভাবে ক্রীতদাস ও স্বাধীন মানুষের মধ্যে পার্থক্য করে না, ইসলামে সব মানুষ সমান, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সবসময় এ আদর্শের প্রতিফলন ঘটত না। তবে একথা বোধহয় স্বীকার করে নেওয়া যায় যে একজন নিম্নবর্গের হিন্দু ক্রীতদাসত্ব থেকে অনেক সময় লাভবান হতো। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে সে অনেক সামাজিক অবিচার থেকে মুক্তি পেত। কোনো উচ্চশ্রেণীর হিন্দু ক্রীতদাসত্বের সময় ধর্মান্তরিত হলে সে আর সমাজে ফিরে যেতে পারত না। ক্রীতদাসদের স্বাধীন সত্তা আইনে স্বীকৃতি পেত না, এদের বেচাকেনা ছিল আইনানুমোদিত। এদের স্বাধীনভাবে চলাফেরা, জীবনযাপন, বিবাহ করে সংসার করা সবই ছিল প্রভুর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল।

ক্রীতদাসদের জীবনযাত্রার মান সে যুগের অগণিত সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানের চেয়ে নিম্নতর ছিল না। সুলতানরা ক্রীতদাসদের মুক্তি দিয়ে সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দিতেন। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা বা অশান্তি তাদের সামনে

অপ্রত্যাশিত সুযোগ এনে দিত। রাজিয়ার ক্রীতদাস আলতুনিয়ার ইতিহাস এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। এরকম পরিস্থিতিতে প্রতিভাবান ক্রীতদাস সমাজের এমনস্তরে উঠে যেত যা অভিজাতদের ঈর্ষার কারণ হতো। ক্রীতদাস প্রথার ফলে কোনো সমাজ শেষপর্যন্ত লাভবান হয় না। পশ্চিমী পণ্ডিতদের অনেকে এসম্পর্কে সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। নেবুর লিখেছেন যে ক্ষমতাশালী অভিজাত শ্রেণী এদের ওপর আধিপত্য চালাতে গিয়ে নিজেদের সর্বনাশ করে থাকে। গণতান্ত্রিক ধারণা, মানবতাবোধ, মানবিক অনুভূতি সব নষ্ট হয়ে যায়, সমাজে প্রগতির ধারা স্তব্ধ হয়ে যায়। সমাজে দুটি শ্রেণী তৈরি হয়—সুবিধাভোগী, ক্ষমতাশালী, নির্মম, আক্রমণাত্মক অভিজাত এবং শোষিত, বঞ্চিত, কিন্তু নির্মম, নিষ্ঠুর, প্রতিহিংসাপরায়ণ দাস। প্রাচীন স্পার্টায় ক্রীতদাসরা সুযোগ পেলেই বিদ্রোহ করে রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা ওলটপালট করে দিত। শিক্ষা ও স্বাভাবিক পারিবারিক জীবনের অভাব তাদের মানবিক বোধ, আত্মবিশ্বাস, মনোবল সব নষ্ট করে দিত। দাসপ্রথার জন্য সমাজে নানাধরনের অসুস্থতা দেখা দেয়, সমাজ গতিহীন, আবদ্ধ ও স্থবির হয়ে পড়ে। সুলতানি যুগে দাসপ্রথা হয়তো এতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, তবে এর কুফল চোখে পড়ার মতো ছিল।

চতুর্দশ শতকের পর থেকে ভারতের দাসব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটতে থাকে। বাবর তাঁর 'আত্মজীবনীতে' ভারতের গোষ্ঠীবদ্ধ, বংশানুক্রমিক শ্রমিক ও কারিগরদের কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু দাসদের কথা বলেননি। মুঘল যুগে যেসব বিদেশী ভারত সম্পর্কে লিখেছেন তাঁরা ক্রীতদাসদের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে চতুর্দশ শতকের দিল্লিতে যে বিশাল ক্রীতদাস বাজারের উল্লেখ আছে এঁদের বর্ণনায় তেমন ক্রীতদাস বাজারের কথা নেই। এঁরা দাসশ্রমিক বা কারিগরের কথা বলেননি। সম্ভবত এই পরিবর্তনের কারণ হলো যে অর্থনীতিতে দাসদের আর তেমন প্রয়োজন ছিল না। প্রথম দিককার সুলতান ও অভিজাতরা নিজেদের জীবনযাত্রার প্রয়োজনে এদের রেখেছিলেন। পরবর্তীকালে স্বাধীন শ্রমিকরা এঁদের প্রয়োজনীয় জীবনযাত্রার উপকরণ জোগান দিতে সক্ষম হয়। মুসলমানদের সঙ্গে নতুন শিল্প ও প্রযুক্তি ভারতে এসেছিল। এগুলি হলো তুলো ধোনা, চরকায় সুতো কাটা ও কাগজ তৈরি। ভারতের স্বাধীন শ্রমিক এসব কাজে দক্ষ হলে আর দাসশ্রমিকের প্রয়োজন ছিল না। ভারতের মুসলমানরা শাসকশ্রেণীর ভাষা ও সংস্কৃতি আয়ত্ত করলে দাসশ্রমিকের চাহিদা আরও কমে যায়। দাস শ্রমিক দিয়ে উৎপাদনের কাজ চালানোয় অসুবিধা ছিল, দাসশ্রমিকরা উৎপাদনে উৎসাহ পেত না বলে উৎপাদিত পণ্যের মান হতো নিকৃষ্ট। আবার স্বাধীন দক্ষ কারিগরের মতো জীবিকার নিরাপত্তা থাকত না বলে উৎপাদন ব্যাহত হতো। উনিশ শতকের ষাটের দশকে রাশিয়ার জমিদাররা দেখেছিল যে ভূমিদাস দিয়ে জমি চাষ করালে উৎপাদন

ব্যয় বেশি হয়, লাভের পরিমাণ কম থাকে। স্বাধীন শ্রমিক দিয়ে চাষ করালে লাভ বেশি হয়। সম্ভবত একই অর্থনৈতিক কারণে সুলতানি যুগের উৎপাদন ব্যবস্থায় আর ক্রীতদাসদের প্রয়োজন ছিল না। এই সামাজিক গোষ্ঠী ক্রমশ সঙ্কুচিত হতে থাকে, তবে মুঘল যুগের শেষ অবধি এদের অস্তিত্ব ছিল।

অন্তর্বাণিজ্য

সুলতানি যুগে মুদ্রানির্ভর অর্থনীতির সম্প্রসারণ ঘটেছিল, সুলতানরা নতুন নতুন অঞ্চল জয় করে মুদ্রাভিত্তিক অর্থনৈতিক কাজকর্ম চালু করেন। কৃষকদের নগদ অর্থে সরকারি রাজস্ব দিতে হতো, এজন্য কৃষিজ পণ্যের বাজার গড়ে ওঠে। দিল্লির মতো বৃহৎ শহরের প্রয়োজন মেটানোর জন্য বাণিজ্য ও বিনিময়ের প্রয়োজন হতো। ইবন বতুতা জানিয়েছেন যে আয়তন ও লোকসংখ্যায় দিল্লি ছিল ইসলামী প্রাচ্যের সবচেয়ে বড় শহর। দৌলতাবাদও ছিল প্রায় দিল্লির সমান শহর। এদুটি প্রধান শহর ছাড়া লাহোর, মুলতান, আনহিলবারা, ক্যাম্বে, কারা ও লক্ষ্মণাবতী ছিল সুলতানি যুগের অন্যান্য প্রধান শহর। সুলতানি যুগে এক সমৃদ্ধ নগর অর্থনীতির আবির্ভাব ঘটেছিল, এরকম অর্থনীতির প্রয়োজনে বিস্তৃত বাণিজ্য গড়ে উঠেছিল।

গ্রাম থেকে শহরগুলিতে আসত প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য ও কাঁচামাল। সুলতানি যুগে কৃষকদের ওপর করের চাপ ছিল বেশি, কৃষকরা সরকারি প্রাপ্য মেটানোর জন্য ফসল ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কৃষিক্ষেত থেকেই তা বিক্রি করতে বাধ্য হতো। বারানি জানিয়েছেন যে 'কারাভানি' (Karavanis) বণিকরা শস্য কিনে বলদের পিঠে চাপিয়ে বিক্রির জন্য দিল্লিতে নিয়ে আসত। সমকালীন আর একজন লেখক এদের নায়ক (Nayak) বণিক বলে উল্লেখ করেছেন। দশ থেকে বিশ হাজার বলদের পিঠে চাপিয়ে এরা গ্রাম থেকে শহরে শস্য নিয়ে আসত। ইবন বতুতা লিখেছেন যে তিন হাজার বলদের পিঠে চাপিয়ে আমরোহা থেকে দিল্লিতে তিরিশ হাজার মণ শস্য আনা হতো। ইবন বতুতা আরও জানিয়েছেন যে ভারী ও আয়তনে বিশাল পণ্য পরিবহনের জন্য বলদ ব্যবহার করা হতো। আলাউদ্দিনের সময়ে দিল্লিতে শস্যের বাজার ছিল নিয়মিত ও স্বাভাবিক। সুলতান একইসঙ্গে কঠোরতা ও আর্থিক উৎসাহদানের নীতি অনুসরণ করে সফল হন। বারানি জানাচ্ছেন যে সুলতান আলাউদ্দিন কারাভানিদের সম্পত্তি ও পরিবার জামিন হিসেবে রাখতেন, ভয় দেখাতেন তাদের দলপতিকে। আবার 'নায়কদের' তিনি অগ্রিম অর্থ, বহুমূল্য পোশাক ইত্যাদি দিয়ে উৎসাহিত করে নিয়মিতভাবে দিল্লিতে শস্য আনতে বাধ্য করতেন। এসব শস্যব্যবসায়ীদের হাতে নগদ অর্থের ভাণ্ডার ছিল। শহরগুলি গ্রামে বিশেষ কিছু পাঠাত না। তাদের হাতে ছিল নগদ অর্থ; সুলতান, অভিজাত ও বণিকরা শহরগুলিতে বাস করত।

সুলতানরা বাণিজ্যের উন্নতির সহায়ক পরিমণ্ডল গঠনের জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা নেন। তারা অনেকগুলি বড় সড়ক নির্মাণ করে দেন, এগুলি সুরক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল। পথিক ও বণিকদের বিশ্রামের জন্য মাঝে মাঝে পান্থশালা (মঞ্জিল) স্থাপন করা হয়। বাংলায় গিয়াসউদ্দিন খল্‌জি বাঁধ দিয়ে নদীর গ্রাস থেকে রাস্তা রক্ষা করেন। যাতায়াতের মাধ্যম ছিল ঘোড়া, পালকি ও বলদে টানা গাড়ি। বারিদদের মাধ্যমে একস্থান থেকে অন্যস্থানে সংবাদ পাঠানো যেত, রানার ঘোড়ায় চেপে দ্রুত সংবাদ পৌঁছে দিত। বেসরকারি পর্যায়ে সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। ভারী ও বৃহদায়তন পণ্যের বাজার ছিল সংকীর্ণ, অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে সারা দেশ ছিল বাজার।

স্থলপথে পার্শ্ববর্তী দেশগুলির সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য চলেছিল। উত্তর-পশ্চিমে মুলতান ছিল স্থল বাণিজ্যের একটি বড় অন্তর্বর্তী ঘাঁটি। এখান থেকে ক্রীতদাস পাঠানো হতো মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতে আর সংগ্রহ করা হতো উন্নতমানের ঘোড়া। পারস্য ও আফগানিস্তান হয়ে রেশম আমদানি করা হতো ভারতে, আবার এপথ দিয়ে ভারতের নীল ইরানে রপ্তানি করা হতো। মুলতান নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পণ্য সংগ্রহ করত। দিল্লি ও লাহোরের ক্যান্ডি চিনি ও সিরসার ঘি যেত মুলতানে। উত্তর-পশ্চিমের সমস্ত পণ্য মুলতান হয়ে দিল্লির বাজারে যেত আবার দিল্লির বাজার থেকে পণ্য এখানে এসে রপ্তানির জন্য জমা হতো। সুলতানি যুগে দিল্লি ছিল ঘোড়া ও ক্রীতদাসের সবচেয়ে বড় বাজার। খোরাসানি বণিকরা ঘোড়া নিয়ে মুলতান নয়, সরাসরি দিল্লিতে এসে বাণিজ্য করতে চাইত। রাজধানী দিল্লির খাদ্যশস্যের যোগান আসত আমরোহা থেকে, পানীয় আলিগড় ও মীরাট থেকে, আর পান আসত সুদূর মালবের ধর থেকে। রাজধানীর বস্ত্রের চাহিদা ছিল বিচিত্র। অযোধ্যা অঞ্চল থেকে আসত সাধারণ কাপড়, দেবগিরি থেকে মস্‌লিন, ছাপা কাপড়ের জোগান দিত বাংলা আর সুদূর ইরানের তাব্রিজ থেকে আসত পশমী কাপড় (ব্রকেড)। ঘোড়ার ব্যবসা ছিল সারা দেশ জুড়ে, বখতিয়ার খল্‌জিকে নদীয়ার মানুষ অশ্ব ব্যবসায়ী বলে ভুল করেছিল। বিজয়নগরের রাজারা বছরে বারো-তেরো হাজার বিদেশী ঘোড়া কিনতেন। বাংলা হিমালয় অঞ্চল থেকে ঘোড়া সংগ্রহ করত। বাংলা ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারে সরবরাহ করত মস্‌লিন ও রেশমী কাপড়।

দক্ষিণ ভারতে বিজয়নগর ও পশ্চিম ভারতে গুজরাট ছিল বাণিজ্যের বড় ঘাঁটি। বিজয়নগর রাজ্যে বিদেশী বণিকরা বাস করত। তারা নিয়ে আসত ঘোড়া, মদ, সুগন্ধি দ্রব্য ও মূল্যবান পাথর, নিয়ে যেত বস্ত্র, শৌখিন দ্রব্য, রত্নালঙ্কার ও মশলা। বিজয়নগর রাজ্যের মধ্যে অন্তত আশিটি বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল, এগুলি ছিল একসঙ্গে প্রশাসনিক, ধর্মীয় ও বাণিজ্যকেন্দ্র। পশ্চিম গোদাবরী জেলায় কোমতি বণিকরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত

করেছিল, বাণিজ্য ও মহাজনী কারবারে এরা ছিল সকলের সেরা।[১] বস্ত্র ও রেশমজাত পণ্যের জন্য গুজরাট ছিল সেরা বাণিজ্যকেন্দ্র। উপকূলবর্তী এই অঞ্চল শুধু অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে নয়, সমুদ্র বাণিজ্যেও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। বহুধরনের বিচিত্র বণিকগোষ্ঠী যুক্ত ছিল ভারতের এই অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সঙ্গে। মধ্যপ্রাচ্য থেকে বণিকরা লাভের আশায় দিল্লিতে বাণিজ্য করতে আসত। বিহারের এক সুফি বণিক দিল্লি ও গজনির মধ্যে ক্রীতদাসের ব্যবসা করতেন। মুলতানের হামিদউদ্দিন ছিলেন একজন ধনবান প্রভাবশালী বণিক। আলাউদ্দিন এই বণিকশ্রেষ্ঠকে (মালিক-উৎ-তুজ্জর) প্রধান কাজীর পদ দেন। মুলতানিরা ছিল সুলতানি যুগের সবচেয়ে বড় বণিক সম্প্রদায়। এঁদের বেশিরভাগ ছিল হিন্দু শাহ্, অল্প কয়েকজন মুসলমান। এরা একই সঙ্গে বাণিজ্য ও ব্যাঙ্কিং-এর (সুদ ও সওদা) কাজ করত। আলাউদ্দিন দিল্লির বাজারে শৌখিন দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য মুলতানি বণিকদের বিশ লক্ষ টাকা অগ্রিম দেন। শর্ত ছিল এরা উৎকৃষ্ট পণ্য ন্যায্য দামে দিল্লির বাজারে সরবরাহ করবে। সুলতানি যুগে মুলতানিরা শুধু বাণিজ্য করে ধনী হয়নি, তারা অভিজাত ও আমীরদের প্রয়োজনে অর্থ সরবরাহ করত। বলবনের আমলের মুলতানি বণিকদের পরিচয় দিতে গিয়ে বারানি মন্তব্য করেছেন যে এঁরা মালিক ও আমীরদের সম্পদ নিয়ে ধনী হয়েছিল। আমীররা এদের কাছ থেকে ধার নিতেন, ইক্‌তার রাজস্বের ওপর এরা বরাত পেতেন। অষ্টাদশ শতকে বাংলার জগৎ শেঠ পরিবার অভিজাতদের এভাবে ঋণ দিয়ে অর্থ সঞ্চয় করেছিল। বাংলার নবাব, অভিজাত ও রাজনীতির ওপর এদের প্রভাব স্থাপিত হয়। সুলতানি অভিজাতদের ওপর মুলতানি বণিকদের এধরনের প্রভাব ছিল কিনা জানা যায় না।

ইবন বতুতা দৌলতাবাদের হিন্দু শাহ্ বণিকদের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন যে দৌলতাবাদের এসব বণিকদের কাজকর্ম মিশরের 'করিম' বণিকদের অনুরূপ ছিল। মিশরের এই বণিক সম্প্রদায় সংঘবদ্ধভাবে লোহিত সাগর ও ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বাণিজ্য করত। শাহ্ বণিকদের বাণিজ্যের ধরনটা ছিল অনেকটা ওদের মতো। ভারতীয় বণিকদের জাতিগত ঐক্য এরকম সংগঠিত বাণিজ্যের সহায়ক হয়েছিল। সুলতানি যুগে ভারতের অন্তর্বাণিজ্যে দালাল শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। সাধারণ মানুষ মনে করত দালালদের জন্য বাজারে জিনিসপত্রের দাম অস্বাভাবিক বেড়ে গেছে। আলাউদ্দিন দালালদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেন, বারানি তাঁর কাজকে সমর্থন করেছিলেন। তবে ভারতের বাজার ক্রমশ সম্প্রসারিত হয়ে চলেছিল। এই বিশাল বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে দালালদের অবস্থানকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হয়নি। কে. এম. আশরাফ জানিয়েছেন যে বণিকরা অর্থ উপার্জনের জন্য

১. বার্টন স্টেইন, *কেম্ব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২০।

যে-কোনো অসাধু উপায় অবলম্বন করতে দ্বিধা করত না, এরা ক্রেতাকে ওজন ও মাপে ঠকাত, পণ্যে ভেজাল দিত। আলাউদ্দিনের মতো কঠোর প্রকৃতির শাসক এদের দমন করে রেখেছিলেন, ফিরুজ তুঘলকের মতো দুর্বল শাসকের আমলে এরা আবার স্বমূর্তি ধারণ করেছিল। তবে উপকূলবর্তী শহরগুলিতে বণিকদের নৈতিক পরিবেশ অনেক সুস্থ, স্বাভাবিক ও দুর্নীতিমুক্ত ছিল। এসব বণিকরা সচরাচর বিদেশীদের সঙ্গে বাণিজ্য করত, সব বিদেশী পর্যটক ভারতীয় বণিকদের সততা ও সত্যনিষ্ঠার প্রশংসা করেছেন। এঁদের বিবরণ থেকে জানা যায় ভারতীয় বণিকরা অতিরিক্ত লাভের আশায় কখনো প্রতারণার আশ্রয় নিত না, ওজন ও মাপের ব্যাপারে একচুল এদিক-ওদিক করত না।

সুলতানি যুগে অন্তর্বাণিজ্যের মোট পরিমাণ কত ছিল সঠিক বলা যায় না। যা সঠিক বলা যায় তা হলো সারা দেশ জুড়ে, বিশেষ করে শহরগুলিতে, বাণিজ্যিক তৎপরতা ছিল, সরকার হস্তক্ষেপ না করলে বাণিজ্য অব্যাহত গতিতে চলত। বহু বণিক বাণিজ্য করে বেশ ধনী হয়েছিল। দেশে দস্যু-তস্করের উৎপাত ছিল, অনেকসময় বণিকের পণ্য লুণ্ঠিত হতো। তবে বাণিজ্যে লাভের হার এত বেশি ছিল যে লোকসান পুষিয়ে লাভ হতো। মহাজন ও সাহুরা বাণিজ্যের সঙ্গে সুদের কারবার যুক্ত করেছিল। এরা টাকা গচ্ছিত রাখত আবার ১০-২০ শতাংশ সুদে টাকা ধার দিত, হুন্ডির কারবারও চলত। গুজরাটের বানিয়া, দক্ষিণের চেট্টি, মুলতানের বস্ত্র ব্যবসায়ীরা এবং উত্তরের শস্য ব্যবসায়ী নায়করা (Nayaks) ছিল এযুগের সবচেয়ে বড় বণিকগোষ্ঠী। এরা বাণিজ্য করে বহু অর্থের মালিক হয়েছিল।

বহির্বাণিজ্য

সুলতানি যুগে বৈদেশিক বাণিজ্যের বেশিরভাগ পরিচালিত হতো জলপথে। স্থলপথে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে ভারতের ক্রীতদাস ও ঘোড়ার ব্যবসা ছিল। জলপথে ভারতের কৃষিজ ও শিল্পপণ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাঠানো হতো। পশ্চিম উপকূলে গুজরাট, দক্ষিণে বিজয়নগর রাজ্য এবং পূর্বে বাংলায় উৎকৃষ্ট শিল্প-পণ্য উৎপন্ন হতো। ভারতের কৃষিজ ও শিল্পপণ্য—বস্ত্র, রেশম, মশলা, চাল, গম, শৌখিনদ্রব্য, গন্ধদ্রব্য, মূল্যবান স্বর্ণালঙ্কার, লোহা ও ইস্পাত, দামি মণিমুক্তো ও পাথর পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলি, ইউরোপ ও আফ্রিকায় রপ্তানি হতো। ইউরোপ ও আফ্রিকা থেকে ভারতে আমদানি করা হতো বিলাসদ্রব্য (যেমন, মখমল, নকশাদার পর্দা, রেশমী ও কিংখাবের কাপড়), ওষুধপত্র, অস্ত্রশস্ত্র, মদ, কাচ, সোনা-রুপো ও আফ্রিকার ক্রীতদাস। ভারতে গুজরাতি ও মুলতানি হিন্দু বণিকরা বেশ সম্পন্ন ছিল, কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্যে এদের বিশেষ ভূমিকা ছিল না। বৈদেশিক বাণিজ্যে বিশিষ্ট

স্থান নিয়েছিল বিদেশীরা, এদের বেশিরভাগ ছিল ইরান, মিশর ও আরবের মুসলমান। অল্প কিছু বণিক ছিল খ্রিস্টান, ইহুদি ও পারসিক (জরথুস্ট্র সম্প্রদায়ের লোক)। এঁরা পশ্চিম উপকূলের ক্যাম্বে, এলি, কুইলন, কালিকট, কোচিন এবং পূর্ব উপকূলের মসুলিপত্তম, নেগাপত্তম, সপ্তগ্রাম ও সোনার গাঁয়ে বসতি স্থাপন করে বাণিজ্য করত।

সুলতানি যুগে বৈদেশিক বাণিজ্যের ছিল দুটি ভাগ—পূর্ব ও পশ্চিম। পূর্বদিকে বঙ্গোপসাগর হয়ে ভারতের বাণিজ্য তরী ব্রহ্মদেশ, সুমাত্রা, মালক্কা, জাভা ও চীনে বাণিজ্য করতে যেত। আর পশ্চিম দিকে পারস্য উপসাগর হয়ে হরমুজ, বসরা ও নিকটবর্তী আল-ওবুল্লাতে বাণিজ্য করতে যেত ভারতীয় বণিকরা। হরমুজে ভারতীয় বণিকদের উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। আবার লোহিত সাগর হয়ে ভারতীয় বাণিজ্যতরী কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছে যেত। কায়রো ছিল সেযুগে মুসলিম জগতের সবচেয়ে জনবহুল ও সমৃদ্ধিশালী নগরী, এখান থেকে সিরিয়া, ইরাক, রাশিয়া ও ইরানে ভারতীয় পণ্য পৌঁছে যেত। শুধু তাই নয়, কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়া থেকে ভারতের বস্ত্র ও শৌখিন দ্রব্য ইউরোপ, বিশেষ করে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ও আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের দেশগুলিতে গিয়ে হাজির হতো।

সুলতানি যুগে বৈদেশিক বাণিজ্যের ঝুঁকি ছিল খুব বেশি। জলদস্যুরা দলবদ্ধভাবে আরব সাগর ও ভারত মহাসাগরে বাণিজ্য জাহাজ লুঠ করত। এজন্য এযুগের বণিকদের আত্মরক্ষার জন্য সৈন্যসামন্ত রাখতে হতো, প্রত্যেক পণ্যবাহী জাহাজে সশস্ত্র রক্ষীরা থাকত। একাজে খুব দক্ষ ছিল আফ্রিকার হাবসীরা। বাণিজ্যে ঝুঁকি ছিল খুব বেশি, তবে লাভের অনুপাত বেশি ছিল বলে বণিকরা দূরপাল্লার বাণিজ্যে আগ্রহী হতো। এযুগে ভারত বাণিজ্যে অংশগ্রহণকারী মুসলমান বণিকরা ছিল খুব ধনী। পঞ্চদশ শতকের শেষদিককার করমণ্ডলের মুসলমান বণিকদের সম্পর্কে নিকোলো কন্টি লিখছেন ঃ "এসব বণিকরা খুব ধনী, এদের মধ্যে অনেকের চল্লিশখানা জাহাজ আছে। প্রত্যেকটি জাহাজের দাম পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা।' বার্থেমো লিখেছেন যে 'প্যাগানরা (হিন্দুরা) জলপথ পছন্দ করে না। মুররা (মুসলমানরা) বাণিজ্য পণ্য বহন করে।"[২] হিন্দু বণিক ও মহাজনদের হাতে প্রচুর মূলধন ছিল, এই মূলধন নিয়ে তারা বৈদেশিক বাণিজ্যের পণ্য বেচাকেনার ব্যাপারে দালালের ভূমিকা পালন করত। ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে কান্নানোরের মামাল্লি ছিলেন খুব বড় বণিক, মালদ্বীপের সুলতানের ওপর তাঁর প্রভাব ছিল। তিনি পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ইবন বতুতা জানিয়েছেন যে ইবন-অল-কাবলামি (Ibn al Kawlami) ছিলেন এযুগের আর একজন অতি ধনী বণিক। মহম্মদ বিন তুঘলক তাঁকে মুলতানের

২. *কেম্ব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৬।

গভর্নর নিযুক্ত করেন। তিনি মালাবার, সিংহল ও অন্যান্য দেশে জাহাজ ভর্তি পণ্য পাঠাতেন, বাণিজ্য করে অতি ধনী হন।

ক্যাম্বের বণিকদের বেশিরভাগ ছিল বিদেশী, কৃষ্ণসাগর ও কাস্পিয়ান সাগর তীরবর্তী অঞ্চল থেকে বণিকরা ক্যাম্বেতে এসে ব্যবসা করত। ক্যাম্বের বণিকদের সকলে বিদেশী ছিল না, স্থানীয় ইসমাইল সম্প্রদায়ের খাজা বোহরারা এই বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এরা কুইলন ও সিংহলে বাণিজ্য করত। সুলতান জালালুদ্দিন ছিলেন হোনাভুরের শাসক (ক্যাম্বে ও কালিকটের মাঝখানে)। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন একজন জাহাজ মালিক ও ব্যবসায়ী। ক্যাম্বের হিন্দু শাসকের বাণিজ্য জাহাজ ছিল, সেযুগের সুলতান ও রাজারা বহির্বাণিজ্যে অংশ নিতেন। কালিকটের আরব বণিক মিথকল, ক্যাম্বের জাহাজ মালিক ইলিয়াস ও বোহরা ইব্রাহিম এযুগের বাণিজ্যের ইতিহাসে আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম। মার্কোপোলো গুজরাটের বানিয়া সম্প্রদায় এবং করমণ্ডলের চেট্টিদের কথা উল্লেখ করেছেন। এরা পশ্চিম এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য করত। কে. এম. আশরাফ লিখেছেন যে সুলতানি যুগে যেসব বণিক ভারতে বাণিজ্য করতে আসত মানসিকতায় তারা ছিল মুনাফা শিকারি। এদেশের জনগণের সঙ্গে হৃদয়হীন, সহানুভূতিহীন ব্যবহারে তারা অভ্যস্ত ছিল।[৩] এইসব বিদেশী বণিক লাভের আশায় ভারতে আসত, এদেশের প্রতি তাদের কোনো মমতা বা আনুগত্য থাকত না। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ইসলাম ধর্মের প্রসারে আগ্রহ দেখিয়েছিল। আশরাফ জানিয়েছেন যে সুলতানি যুগে স্থলপথে ভারতের বহির্বাণিজ্য প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই বাণিজ্যের প্রধান পণ্য ছিল ঘোড়া, আমদানি করা হতো পশম, অস্ত্রশস্ত্র, উটপাখি ইত্যাদি। মোঙ্গল আক্রমণের জন্য এই বাণিজ্য নষ্ট হয়েছিল, যখন মোঙ্গল আক্রমণ থাকত না বাণিজ্য চালু হয়ে যেত। তুর্কিস্তানের অজকের অধিবাসীরা ভারতে রপ্তানি করার উদ্দেশ্যে ঘোড়া বিশেষভাবে লালন-পালন করত। এরা এমন একটি বিশাল সংগঠন গড়ে তুলেছিল যার কাজ ছিল ঘোড়াগুলিকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেওয়া এবং পথে ঘোড়াগুলির যথোচিত যত্ন নেওয়া। ভারত সীমান্তে পদার্পণ করার পর প্রতিটি ঘোড়ার জন্য শুল্ক দিতে হতো, সাধারণত বিক্রয়মূল্যের এক-চতুর্থাংশ শুল্ক হিসেবে আদায় করা হতো।

সুলতানি যুগে বিজয়নগর রাজ্য ছিল বহির্বাণিজ্যের একটি বড় ঘাঁটি। বিদেশী পর্যটক বারবোসা, পেজ, নিকিতিন, আবদুর রজ্জাক সকলে বিজয়নগর রাজ্যের সমৃদ্ধ বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। বিদেশী বণিকরা এখানে স্বচ্ছন্দে ও স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করত, বহু বিদেশী বণিক এখানে বসবাস করত। দেশে ছোট-বড় তিনশো বন্দর ছিল। বিজয়নগরের শ্রেষ্ঠ রাজা কৃষ্ণদেব রায় তাঁর *আমুক্তমাল্যদা*-য় লিখেছেন ঃ 'রাজা

৩. কে. এম. আশরাফ, *হিন্দুস্তানের জনজীবন ও জীবনচর্যা*, পৃ. ১৬৪।

তাঁর বন্দর ও পোতাশ্রয়ের যত্ন নেবেন। বাণিজ্যের উন্নতি ঘটাবেন যাতে হাতি, ঘোড়া, দামি মণিমুক্তো, চন্দনকাঠ এবং অন্যান্য পণ্য আমদানি করা সম্ভব হয়।' রাজা বিদেশী বণিকদের সযত্নে রক্ষা করার কথাও বলেছেন।

চতুর্দশ শতকে চীনের সম্রাট মহম্মদ বিন তুঘলককে কিছু উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন। এগুলির মধ্যে ছিল পাঁচশো ক্রীতদাসদাসী, পাঁচশো রেশমী বুটিদার কাপড়, পাঁচ মণ মুখোশ এবং পাঁচখানি রত্নখচিত বস্ত্র। সুলতান ভারত থেকে পাঠিয়েছিলেন দুশো ক্রীতদাসদাসী, একশো ঘোড়া, পাঁচশো সূক্ষ্মবস্ত্র ও পাঁচশো রেশমী কাপড়। এর সঙ্গে ছিল সোনা-রুপোর বাসনপত্র, পোশাক, তরবারি ইত্যাদি। আলাউদ্দিন খল্‌জি পারস্যের উজিরকে যে উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন তার মধ্যে ছিল সূক্ষ্মবস্ত্র, দামি পাথর, সুগন্ধি দ্রব্য, কিছু পশু ও পাখি। কায়রোর জেনিজার ইহুদি বণিকদের ভারত বাণিজ্যের বর্ণনা থেকে জানা যায় ঐ অঞ্চল থেকে ভারতে আমদানি করা হতো বস্ত্র, পোশাক, রুপো, পেতল ও কাঁচের পাত্র, গৃহস্থালির দ্রব্য ও কাগজ। সুলতানি যুগে চীনের সঙ্গে ভারতীয় বণিকদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। চীনের জাঙ্কগুলি (Junk) ভারত মহাসাগরে ঐদেশের পণ্য বহন করে নিয়ে আসত। চীন ভারতে পাঠাত মশলা, ওষুধ, চীনামাটির বাসনপত্র, চীনের রেশম ও রেশমী কাপড়। ভারত থেকে চীন আমদানি করত মশলা, কাপড়, গাছগাছালির মূল ও অন্যান্য দ্রব্য। ত্রয়োদশ শতকের চীনদেশীয় ভূগোলবিদ্ চাওজুকুয়ার রচনায় এই বাণিজ্যের উল্লেখ আছে। চীনে গোলমরিচের খুব চাহিদা ছিল। মাহুয়ান ও চাওজুকুয়া উভয়ে জানিয়েছেন যে প্রধানত মালাবার অঞ্চল থেকে গোলমরিচ সংগ্রহ করা হতো। চীনের মশলা পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতে পুনঃরপ্তানি হয়ে যেত, এখান থেকে এ-পণ্য ইউরোপেও পাঠানো হতো। দক্ষিণ ভারতের বন্দরগুলিতে চীনের পণ্য ভারতীয় বণিকরা কিনে নিয়ে তা পশ্চিম এশিয়ায় পাঠিয়ে দিত। ভারতীয় বণিকরা মালাক্কা, সুমাত্রা ও জাভার সঙ্গে নিয়মিত বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে বাংলার বিচিত্র বস্ত্রসম্ভার ইন্দোনেশিয়ার বাজারে বিক্রি হত। ওখান থেকে আমদানি করা হতো মশলা ও কাঁচামাল। বারবোসা ও পাইরেস (Pires) এই বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। গুজরাটের ধনী মুসলমান বণিকরা এই বাণিজ্যে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এ অঞ্চলে ইসলামী সভ্যতার বিস্তারে তাদের অবদান নগণ্য নয়।

গোটিন (Goitein) দ্বাদশ শতকের কায়রোর ইহুদি বণিকদের সূত্র উদ্ধৃত করে জানিয়েছেন যে ভারত থেকে মশলা, সুগন্ধি দ্রব্য, রঙ ও ওষুধ পশ্চিম এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় রপ্তানি করা হতো। এসবের সঙ্গে থাকত ভারতের লোহা ও ইস্পাত, পিতল ও ব্রোঞ্জের পাত্র। পশ্চিম এশিয়ার আরব দেশগুলি ভারত থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করত। বাংলা, করমণ্ডল ও গুজরাট থেকে এসব অঞ্চলে পাঠানো হতো

প্রচুর পরিমাণে বস্ত্র। ইবন বতুতার সাক্ষ্য থেকে একথা নিশ্চিতভাবে জানা যায়। হিন্দুস্তানে ঘোড়ার চাহিদা ছিল অফুরন্ত। সামরিক প্রয়োজনে প্রচুর ঘোড়ার দরকার হতো, তাছাড়া পরিবহন ও যাতায়াতের মাধ্যম হিসেবে ঘোড়ার কদর ছিল। হিন্দুস্তানে ভালোজাতের বাছাই ঘোড়ার চাহিদা খুব বেশি থাকার জন্য ঘোড়ার বাজার খুব তেজি ছিল। শুধু বিজয়নগরের রাজারা বছরে বারো-তেরো হাজার ঘোড়া আমদানি করতেন। রাজপুতনা ও দাক্ষিণাত্যের হিন্দু রাজারা ঘোড়ার কদর বুঝেছিলেন। ভারতের এই বিপুল ঘোড়ার চাহিদা মেটাত পারস্য, ইরাক, সিরিয়া ও ইয়েমেন। ইরাক ও আলেকজান্দ্রিয়া থেকে কিছু রেশমী ও কিংখাবের কাপড় আমদানি করা হতো।

হিন্দুস্তান থেকে সুলতানি যুগে যেসব পণ্য রপ্তানি করা হতো তার মধ্যে খাদ্য ও সুতিবস্ত্র ছিল প্রধান। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, মালয় দ্বীপ এবং আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে ভারতীয় পণ্যের বিস্তৃত বাজার ছিল। বাংলা ও গুজরাট ছিল বৈদেশিক বাণিজ্যের দুই বড় ঘাঁটি। গুজরাটের প্রধান রপ্তানি পণ্য ছিল বহুমূল্য পাথর, নীল, তুলো, পশুর চামড়া ও অন্যান্য বহু দ্রব্য। অপেক্ষাকৃত গৌণ রপ্তানি পণ্যের মধ্যে ছিল সুগন্ধি কাঠ, সুবাসিত তেল, দস্তা ও আফিম। কৃষিজাত রপ্তানি পণ্যের মধ্যে ছিল গম, জোয়ার, চাল, ডাল, তৈলবীজ, গন্ধদ্রব্য এবং এজাতীয় আরও কিছু পণ্য। বার্থেমোর মতে, বাংলাদেশে তুলো, আদা, চিনি, শস্য ও সবরকম মাংস প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। বার্থেমোর ধারণায় বাংলা ছিল পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ধনী দেশ। বারবোসা জানিয়েছেন বাংলার প্রধান রপ্তানি পণ্য ছিল চিনি। ইউরোপ থেকে নানা পণ্য ভারতে আমদানি করা হতো। ইউরোপ থেকে ভারতে আমদানি করা হতো বন্দুক, বারুদ, অস্ত্রশস্ত্র, সোনা, রুপো, তামা, তুঁতে প্রভৃতি পণ্য।

সুলতানি যুগে ভারতের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ সঠিকভাবে নির্ধারণ করার উপায় নেই। আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। তবে আধুনিককালের সঙ্গে তুলনায় এই বাণিজ্যের পরিমাণ যে কম ছিল তাতে সন্দেহ নেই। গুজরাটের ক্যাম্বে এবং বাংলার 'বাঙ্গালা' বন্দর দিয়ে বহির্বাণিজ্যের বেশিরভাগ পরিচালিত হতো। বার্থেমোর মতে, ভারত এই দুই বন্দর দিয়ে পারস্য, তাতার, তুরস্ক, সিরিয়া, আফ্রিকা, আরব, ইথিওপিয়া ও অসংখ্য দ্বীপে রেশমী ও সুতিবস্ত্র সরবরাহ করত। বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিবছর ক্যাম্বেতে তিনশো জাহাজ এবং বাংলায় পঞ্চাশটি জাহাজ আসত। এসব জাহাজের মালবহন ক্ষমতা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না, তবে আন্দাজ করা যায় এগুলির গড়ে ৫০০-১০০০ টন মালবহনের ক্ষমতা ছিল। পারস্য উপসাগর, লোহিত সাগর ও ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী দেশগুলিতে ভারতীয় পণ্যের বাজার বেশ তেজি ছিল। ভারতীয় বাজারের বিপুল সম্ভাবনা ও এদেশের অমিত সম্পদ পর্তুগালের রাজাকে ভারত জয়ে প্রলুব্ধ করেছিল।

নবম অধ্যায়	ধর্ম ও সংস্কৃতি

সুফি মতবাদ, তত্ত্ব, সিলসিলা ও আচার-আচরণ

ইসলামের আবির্ভাবের পর বিজিত অঞ্চলের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেছিল। ইসলামের ওপর ইরানীয়, গ্রিকো-বাইজান্টাইন ও ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব পড়েছিল। আরবদের গ্রহণ ক্ষমতা ছিল খুব বেশি। আল-কিন্দি ভারতের ধর্মগুলির ওপর গ্রন্থ রচনা করেন। আল-নাদিম, আল-আশারি ও শাহ্‌রাস্তানি ভারতের ধর্ম ও দর্শন নিয়ে আলোচনা করেন, আলবেরুনি পতঞ্জলির *যোগসূত্র*-র আরবি অনুবাদ করেন। ইসলামের মৌল দর্শন হলো কোরান এবং পয়গম্বরের বাণী (হাদিস)। দশম শতকে ইসলামের নতুন পর্ব শুরু হয়েছিল, আব্বাসীয় খলিফাতন্ত্রের পতনের পর তুর্কিদের উত্থান ঘটে, চিন্তা ও ভাবনার ক্ষেত্রে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। ইসলামী শাস্ত্রচিন্তায় যুক্তিবাদী মুতাজিলাদের প্রাধান্যের অবসান ঘটে। গোঁড়া রক্ষণশীলরা কোরান ও হাদিসকে কেন্দ্র করে নতুন মতবাদ গঠন করেন এবং তৃতীয় ধারা রহস্যবাদী সুফি মতবাদ ও সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। আব্বাসীয় খলিফারা মুতাজিলাদের সমর্থক ছিলেন, ধর্মের ক্ষেত্রে যুক্তিবাদের প্রসারে তাঁরা সহায়তা দেন। মুতাজিলারা ঈশ্বর, সৃষ্টি, মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক, আত্মা ইত্যাদি বিষয়গুলি যুক্তিগ্রাহ্য করার প্রয়াস চালিয়েছিলেন। মুতাজিলারা মনে করেন যে ভালোমন্দ সব কাজের জন্য দায়ী হলো মানুষ। কোরান সৃষ্টি করা হয়েছে, পবিত্র গ্রন্থ ঈশ্বরের বাণী, শাশ্বত ও অমোঘ এই ধারণা তাঁরা গ্রহণ করেননি।

ইসলামের গোঁড়া রক্ষণশীলরা মুতাজিলাদের বিরোধিতা করেন। তাঁরা অভিযোগ করেন যে এই যুক্তিবাদীরা ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সন্দেহ, অবিশ্বাস ও নিরীশ্বরবাদ প্রচার করেছেন। মুতাজিলা দর্শনে স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে এক করে দেখা হয়। রক্ষণশীলদের মতে, এই ধারণা ধর্মদ্রোহের সামিল, স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য মুছে দিয়েছে। মুতাজিলাদের বিরোধিতা ছিল, অত্যাচার চলেছিল তাদের ওপর, শেষপর্যন্ত এরা ধ্বংস হয়ে যায়। রক্ষণশীলরা জয়ী হয়, ইসলামের মধ্যে চারটি সম্প্রদায় তৈরি হয়ে যায়। এই চারটি ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে তুর্কিরা উদার হানাফি মতবাদকে গ্রহণ করেছিল, এই মতবাদ তুর্কিদের সঙ্গে ভারতে এসেছিল। মুতাজিলাদের পতনের পর সুফি রহস্যবাদীরা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ইসলামের জন্মলগ্ন থেকে সুফিরা ছিল। ইসলামের মধ্যে বেশ কিছু ভক্তিবান, আসক্তিশূন্য, নীতিপরায়ণ মানুষ ছিলেন, এঁরা পার্থিব সম্পদের

প্রতি মোহ ও নৈতিক অবক্ষয়ের বিরোধিতা করেছিলেন। সুফি সম্প্রদায়ের প্রথম যুগের দরবেশ হাসান বসরি ও তাঁর মহিলা শিষ্যা রাবিয়া প্রার্থনা, উপবাস ও নিঃশর্ত ভক্তির কথা বলেছিলেন। রাবিয়া সন্ন্যাসিনীর জীবনযাপন করতেন, দূরদূরান্তে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। সুফিরা ছিন্ন পশমের পোশাক পরতেন (সুফ), তাঁরা মনে করতেন এটা হলো পয়গম্বর, খ্রিস্টান সন্ত ও সাধুদের ঐতিহ্য। মিশরের জুন্নু মিশরি নবম শতকে আরব ও সিরিয়া ভ্রমণ করে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের কথা বলেছিলেন, মিলন হবে সাধনার মাধ্যমে। তাঁর বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ উঠেছিল। সুফি তত্ত্বের মূলকথা হলো ভগবানের সঙ্গে ভক্তের মিলন, রক্ষণশীল উলেমারা এই তত্ত্বের বিরোধিতা করেন। বায়াজিদ বায়াত ঘোষণা করেন যে 'আমার গৌরব মহান, কাবা আমার চারপাশে ঘুরছে' (How great is my majesty. I saw the Kaba walking around me.)। তাঁর শিষ্য বাগদাদের মনসুর বিন হাল্লাজ সিন্ধুদেশে এসেছিলেন, হিন্দু বেদান্তবাদীদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ তাঁকে বন্দী ও হত্যা করা হয়।

মনসুর সুফি তত্ত্বের মূলনীতির প্রতিষ্ঠা করেন। সব ধর্মের অতীন্দ্রিয় অনুভূতির পরিণতি হলো এক ধরনের। মনসুর ঘোষণা করেন যে 'আমিই সত্য/ঈশ্বর'। অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হওয়া হলো সুফি ধর্মমতের মূল লক্ষ্য[১] (unification with God was the highest stage of enlightenment.)। মনসুর তাঁর ধর্মাদর্শের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন, সুফি মতবাদে এই ঐতিহ্য তৈরি হয়ে যায়। সুফিরা হলেন অন্তরে শুদ্ধ, আন্তরিক এবং পার্থিব বস্তুতে আসক্তিহীন। প্রেম, আনুগত্য ও সাধনার ওপর ভিত্তি করে সুফিদের শান্ত, সহজ, সরল ধর্মীয় মতবাদ গড়ে উঠেছিল। এই আন্দোলন ভগবৎ প্রেমের প্রবল আবেগে আপ্লুত একটি মতবাদে পরিণতি লাভ করে। সামাজিক আচার-আচরণ, ধর্মশাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ, সাধারণ পার্থিব জীবন সবই তাদের কাছে তুচ্ছ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দশম শতকের মধ্যে সুফি মতবাদ ইসলামী জগতে ছড়িয়ে পড়েছিল। দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে সুফি সম্প্রদায়ের দর্শন, বিশ্বাস, আচার-আচরণ, বিভিন্ন সম্প্রদায় (সিলসিলা) সুফিদের আশ্রয়স্থল 'খান্‌কা' ইত্যাদি গড়ে উঠেছিল। সুফিদের আচার-আচরণ ও মঠজীবনের ওপর বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান মঠজীবনবাদের প্রভাব পড়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। পেশোয়ারের নাথপন্থী যোগীদের কাছ থেকে সুফিরা হঠযোগ শিক্ষা করেছিল, হঠযোগের ওপর সংস্কৃতে লেখা গ্রন্থ অমৃতকুণ্ড আরবি ও ফারসিতে অনূদিত হয়।

পারস্যের কবিরা সুফিদের মূলমন্ত্র ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন ও প্রেমের কথা দেশ ও বিদেশে ছড়িয়ে দেন। সানাই, আত্তার, ইরাকি ও রুমির কবিতায় সুফিদের প্রভাব

১. হিন্দুদের 'সোহম' ধারণার সঙ্গে তুলনীয়।

আছে। এঁরা অতীন্দ্রিয় সুখানুভূতি ও প্রেমের কথা বলেছেন। সুফি কবি সিনাই (Sinai) লিখেছেন যে বিশ্বাস ও অবিশ্বাস তাঁর দিকে চলেছে, তিনি অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরিক নেই। সুফিদের মধ্যে একাংশ সমবেত সঙ্গীত (সম) চর্চায় বিশ্বাসী ছিলেন। সঙ্গীত যে বিপুল আবেগ সৃষ্টি করে তাতে ঈশ্বরের অনুভূতি জাগে। রক্ষণশীল উলেমারা এই তত্ত্ব বাতিল করেন। দার্শনিক আলগজ্জালি (মৃত্যু, ১১১২) রক্ষণশীল ও সুফিদের মধ্যে সেতুবন্ধনের প্রয়াস চালিয়েছিলেন, এক্ষেত্রে তিনি অনেকখানি সফল হয়েছিলেন। তিনি যুক্তিবাদীদের আক্রমণ করে লিখেছিলেন যে যুক্তি দিয়ে ঈশ্বরকে জানা যায় না, ঈশ্বর ইচ্ছামতো নিজেকে জানান (revelation)। দ্বাদশ শতকে সুফিদের বারোটি সম্প্রদায় বা সিলসিলার কথা জানা যায়। তবে সবসময় এই সংখ্যক সম্প্রদায় পাওয়া যেত না, কখনো কমে যেত, কখনো বেড়ে যেত। সুফি আন্দোলনের প্রথম যুগে এই সিলসিলাগুলি এই আন্দোলনকে দিয়েছিল স্থিতিশীলতা, রক্ষণশীলদের আক্রমণ প্রতিরোধের শক্তি এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিস্তারের সুযোগ। সুফি সম্প্রদায়ের প্রধান 'খান্‌কায়' শিষ্যদের নিয়ে বাস করতেন। সুফি মতবাদে পীর ও মুরিদের সম্পর্কের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক পীর তাঁর ধর্মীয় ও অন্যান্য কাজকর্ম পরিচালনার জন্য তাঁর উত্তরাধিকারী 'খলিফা' মনোনীত করতেন। খলিফা আবার ধর্মীয় আদর্শ প্রচারের জন্য ওয়ালি নিযুক্ত করতেন, তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট অঞ্চল ছিল। সুফিদের প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায় 'বা-শরা' অর্থাৎ যারা ইসলামী শরিয়ত মানে এবং 'বে-শরা' অর্থাৎ যারা শরিয়ত মানে না। ভারতে এই দুই ধরনের সুফি সম্প্রদায় ছিল। ভ্রাম্যমাণ কালান্দর সুফিরা ধর্মশাস্ত্র মানত না। কালান্দররা কোনো সম্প্রদায় (সিলসিলা) স্থাপন করেনি, কিন্তু তাদের অনেকে হিন্দু ও মুসলমান জনগণের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল।

সুলতানি যুগে ভারতে দুটি সুফি 'সিলসিলা' প্রাধান্য অর্জন করেছিল, এই দুটি সম্প্রদায় হলো চিশ্‌তি ও সুরাবর্দি। সুফিবাদ একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিল, আত্মার অমলিন শুদ্ধতা নিয়ে পবিত্র জীবনযাপন করা ছিল এদের লক্ষ্য। সর্বস্ব ত্যাগ করে প্রেমের পথে তাঁরা ঈশ্বর লাভ করতে চেয়েছিলেন। উলেমাতন্ত্র, জাতিভেদ প্রথা, হজ, রোজা, নামাজের ওপর তাঁরা গুরুত্ব দেয়নি। ধর্মের বহিরাবরণে তাঁদের বিশ্বাস ছিল না, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান তাঁরা মানতেন না। সুফিরা শুদ্ধ, নির্মল, সহজ জীবনযাপনে বিশ্বাসী ছিলেন, ভোগৈশ্বর্যের প্রতি তাঁদের কোনো মোহ ছিল না। জাতিভেদ ও বর্ণ শাসিত ভারতীয় সমাজে সুফি দরবেশরা সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায়ের আদর্শ নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। এদেশের দুঃস্থ, লাঞ্ছিত, শোষিত মানুষ এদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। সাধারণের চোখে সুফিরা ছিলেন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। সুফিদের কতকগুলি পালনীয় আচার ছিল, তাঁরা কৃতকার্যের জন্য 'তওবা' (অনুশোচনা) করতেন, অনিচ্ছাকৃত

দান তাঁরা গ্রহণ করতেন না (বরা) এবং সব মানুষের প্রতি ছিল তাঁদের করুণা (জুহুদ)। তাঁদের সাধনার অঙ্গ ছিল দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবন (ফকর)। সকল মানুষের প্রতি তাঁরা সহনশীল ছিলেন। সুফিরা মুক্তির জন্য কতকগুলি ব্রত পালন করতেন, তাঁরা অনুগামীদের দায়িত্ব নিতেন, সর্বদা সন্তুষ্ট থাকতেন। ঈশ্বরের কাছে তাঁরা নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করতেন। তাঁদের সেবামূলক কাজকর্ম ছিল, এঁরা দুঃস্থদের জন্য লঙ্গরখানা খুলতেন, চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিতেন।

ভারতে দুটি প্রধান সুফি সম্প্রদায়ের প্রভাব ছিল। দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, পাঞ্জাব, বিহার, ওড়িশা ও দক্ষিণ ভারতে ছিল চিশ্‌তিদের প্রভাব। সুরাবর্দি সম্প্রদায়ের প্রভাব ছিল পাঞ্জাব, মুলতান ও সিন্ধুপ্রদেশে। কাশ্মীরে কুব্রাবিয়া (Kubrawiya) নামে একটি পৃথক সুফি সম্প্রদায় ছিল, ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে নকশাবন্দি নামক আর একটি সুফি সম্প্রদায়ের কথা জানা যায়। বাবরের গুরু ছিলেন এই সম্প্রদায়ের দরবেশ। সুফিদের সম্প্রদায়গুলি পরস্পরের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিল। সুরাবর্দি সম্প্রদায়ের সুফিরা দিল্লিতে এলে চিশ্‌তি সুফিরা তাঁদের অভ্যর্থনা জানাতেন, আবার চিশ্‌তিরা মুলতানে গেলে অভ্যর্থিত হতেন। সুফি দরবেশদের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চল ভাগ করা থাকত। ভারতে চিশ্‌তি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হলেন মৈনুদ্দিন চিশ্‌তি। তিনি ছিলেন আফগানিস্তানের চিশ্‌তের লোক, কিন্তু ভারতীয় হয়ে যান। মৈনুদ্দিনের জীবন সম্পর্কে অনেক জনশ্রুতি পাওয়া যায়, পরবর্তীকালের লেখকেরা তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন। মহম্মদ ঘুরির বিজয়ের পর তিনি ভারতে আসেন এবং আজমীরে তাঁর 'খান্‌কা' স্থাপন করেন। এখানে তুর্কি গাজি ও ধর্মান্তরিত মুসলমানদের মধ্যে তিনি তাঁর ধর্মীয় আদর্শ প্রচার করেন। তিনি একটি নির্জন ছোট শহরে তাঁর কর্মকেন্দ্র গড়ে তোলেন, রাজধানী শহরের কোলাহল ও ব্যস্ততা তাঁর পছন্দ ছিল না। তাঁর শিষ্য হামিদউদ্দিন রাজস্থানের নাগরে তাঁর কেন্দ্র স্থাপন করেন। মৈনুদ্দিন বিবাহিত ছিলেন, সরল, ধার্মিক সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করতেন। মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনযাপনের জন্য তিনি উপদেশ দিতেন, ধর্মান্তরকরণে তাঁর আগ্রহ ছিল না কারণ তিনি মনে করতেন যে ধর্মবিশ্বাস হলো মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। ১২৩৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর খ্যাতি বিস্তার লাভ করে। মহম্মদ বিন তুঘলক তাঁর সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছিলেন। পঞ্চদশ শতকে মালবের মাহমুদ খল্‌জি একটি সৌধ ও মসজিদ এখানে নির্মাণ করে দেন। আকবর তাঁর পরম ভক্ত ছিলেন, ধর্মমত নির্বিশেষে সকল মানুষের ওপর খাজার প্রভাবের রাজনৈতিক গুরুত্ব আকবর উপলব্ধি করেন।

দিল্লিতে চিশ্‌তি প্রভাবের প্রতিষ্ঠাতা হলেন কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি। মধ্যপ্রাচ্যের এই সুফি সাধক দিল্লিতে এলে সুলতান ইলতুৎমিস তাঁকে স্বাগত জানান। দিল্লি এই সময় ছিল ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির পীঠস্থান (কুবাত-উল-ইসলাম)। পশ্চিম

ও মধ্য এশিয়ার ওপর মোঙ্গল অভিযান শুরু হলে বুদ্ধিজীবী, ধর্মজ্ঞ, লেখক ও দরবেশরা দিল্লিতে এসে আশ্রয় নেন। কাকি দিল্লিতে উলেমাদের বিরোধিতা এবং সুরাবর্দিদের প্রতিরোধ অগ্রাহ্য করেন। তাঁর বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহের অভিযোগ তোলা হয়েছিল কারণ তিনি সঙ্গীতের চর্চা বজায় রেখেছিলেন। ইলতুৎমিস উলেমাদের বিরুদ্ধে সুফিদের সমর্থন করেন। তিনি এত জনপ্রিয় হন যে তিনি দিল্লি ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলে বহু মানুষ তাঁর সঙ্গ নিয়েছিল। তিনি দিল্লিতে রয়ে যান এবং সুরাবর্দি সম্প্রদায়ের প্রচার তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। এই রক্ষণশীল সম্প্রদায় জনপ্রিয় ছিল না।

বখতিয়ার কাকির সবচেয়ে বিখ্যাত শিষ্য হলেন বাবা ফরিদউদ্দিন গঞ্জ-ই-সখর। তিনি প্রথমে ছিলেন হান্সিতে, পরে শতদ্রুর তীরে অযোধানে বাস করতেন। বাবা ফরিদ দারিদ্র্য, আসক্তিহীনতা, ইন্দ্রিয় দমন, কৃচ্ছ্রসাধনা এবং সেবামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের ওপর জোর দেন। সম্ভবত তাঁর কিছু উক্তি *গ্রন্থসাহেব*-এ স্থান পেয়েছিল। বাবা ফরিদের শ্রেষ্ঠ শিষ্য হলেন নিজামুদ্দিন আউলিয়া, তাঁর সময়ে দিল্লিতে চিশ্‌তি সম্প্রদায় প্রাধান্য লাভ করেছিল। বলবন থেকে তুঘলকদের শাসনকাল পর্যন্ত অস্থির রাজনৈতিক যুগে তিনি দিল্লিতে ছিলেন। তিনি অভিজাত ও শাসকগোষ্ঠী থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন। বরদু খসরু তাঁকে অর্থ দিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তা জনগণকে বিলিয়ে দেন। সুলতান গিয়াসউদ্দিনকে তিনি বলেছিলেন যে মুসলমানদের টাকা তিনি তাদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছেন। সুলতান তাঁকে শাস্তি দেবার কথা ভেবেছিলেন কিন্তু দিল্লিতে পৌঁছানোর আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। গল্প সত্যি বা মিথ্যে হোক, এই ঘটনার পর নিজামুদ্দিনের জনপ্রিয়তা আরও বেড়ে গিয়েছিল। নাসিরুদ্দিন চিরাগ হলেন সুলতানি যুগের আর একজন শ্রেষ্ঠ সুফি, তাঁর সহায়তা নিয়ে ফিরুজ সিংহাসন অধিকার করেন। মহম্মদ বিন তুঘলকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। ফিরুজ তাঁকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন, অনেকবার তাঁর 'খান্‌কায়' গিয়ে দেখা করেন। কিন্তু সুফি সাধক রাজনীতি থেকে দূরে থাকতেন। নাসিরুদ্দিন কাউকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেননি, এর ফল হলো তাঁর মৃত্যুর পর এই সম্প্রদায়ের সুফিরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল, চিশ্‌তি মতবাদের বিস্তার ঘটেছিল।

চিশ্‌তি সুফিরা সরল জীবনযাপন, দারিদ্র্যবরণ, দীনতা এবং অবিচল ভগবৎ প্রেমের ওপর জোর দিয়েছিলেন। তাঁরা পাকা বাড়িতে বাস করতেন না, ভালো পোশাক পরতেন না, সুফিদের অনেকসময় আহার জুটত না। এঁরা মনে করেন ইন্দ্রিয় জয় না করলে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় না। ইন্দ্রিয় দমনের জন্য তাঁরা উপবাস, যোগ, প্রায়শ্চিত্ত, কৃচ্ছ্রসাধনা ইত্যাদির আশ্রয় নেন। তাঁরা সরকারি চাকরি, সম্পদ ও অসতী নারীসঙ্গ পরিহার করতে বলেন, তবে তাঁরা সমাজ ত্যাগ করার কথা বলেননি। মৈনুদ্দিন চিশ্‌তি মনে করতেন যে দুঃখীর দুঃখ দূর করলে, অসহায়কে সাহায্য দিলে

ও অভুক্তকে আহার দিলে ঈশ্বর সাধনা হয়। নিজামুদ্দিন বলতেন যে প্রার্থনার চেয়ে এইসব সেবামূলক কাজ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নিজামুদ্দিন ছাড়া আর সব খ্যাতনামা সুফিরা বিবাহিত ছিলেন, তাঁদের পরিবার ছিল, এতে তাঁদের আধ্যাত্মিক সাধনার কোনো ক্ষতি হয়নি। চিশ্‌তিরা জনগণকে চার ভাগে ভাগ করতেন—সুফি প্রচারক, শিষ্য, শাসক ও বুদ্ধিজীবী এবং সাধারণ মানুষ। শিষ্যদের বলা হতো পেশাদারি করে জীবিকা অর্জন করতে, কৃষি ও বাণিজ্য পেশা হিসেবে স্বীকৃত ছিল, তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ সঞ্চয় করা যাবে না। সৎভাবে ব্যবসা করার জন্য বলা হতো। পরিবারের দায়িত্ব নিতে হবে, তবে আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষতি করা যাবে না। ক্রোধ জয় করা, হিংসা না করা, সহনশীলতা, প্রেম, করুণা প্রভৃতি উন্নত নীতির কথা সুফিরা প্রচার করতেন।

সুফিরা সব মানুষকে সমান বলে গণ্য করতেন, অর্থ, ধর্ম, সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদিকে তাঁরা গুরুত্ব দিতেন না। ইসলাম সাম্যের নীতি থেকে সরে এসেছিল, তুর্কি শাসকরা সাধারণ মানুষকে তাচ্ছিল্য করত। সাম্য প্রচার করে সুফিরা শুধু জনপ্রিয় হননি, সামাজিক উত্তেজনা প্রশমিত করেন। নিজামুদ্দিনের জামাতখানার দুয়ার সকল মানুষের জন্য উন্মুক্ত ছিল, এখানে তারা পেত সহানুভূতি, সদুপদেশ ও সাহায্য। শুধু মুসলমানরা নয়, হিন্দুরাও তাদের সাহায্য ও সহানুভূতি পেত। নিজামুদ্দিনের শিষ্য হামিদউদ্দিন হিন্দুদের মনোভাবের কথা ভেবে নিরামিষাশী হয়ে যান, শিষ্যদের তিনি মাংস ত্যাগ করতে বলেন। চিশ্‌তি সুফিরা হিন্দু সাধু ও যোগীদের সঙ্গে মিশতেন, এদের সঙ্গে যোগসহ বহু বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। চিশ্‌তিরা বলপ্রয়োগে ধর্মান্তরকরণে বিশ্বাসী ছিলেন না, হিন্দুদের পূজার্চনা সম্পর্কে তাঁদের শ্রদ্ধা ছিল। একবার নিজামুদ্দিন তাঁর বন্ধু আমীর খসরুকে বলেছিলেন, 'প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিজস্ব পথ আছে, বিশ্বাস আছে। নিজেদের মতো করে তারা ভজনা করে' (Every community has its own path and faith, and its own way of worship.)। এই উদার মনোভাবের জন্য গাঙ্গেয় উপত্যকার অমুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে চিশ্‌তি সুফিরা সফল হন। সুফি সম্প্রদায়গুলির সকলে ধর্ম সম্পর্কে এমন উদার ছিল না। কাশ্মীরের কুব্রাবিয়া সুফিরা হিন্দু মন্দির ভাঙা ও অপবিত্র করার ব্যাপারে উৎসাহী ছিল।

চিশ্‌তিদের সঙ্গে সুরাবর্দিদের মৌলিক পার্থক্য ছিল। ভারতে সুরাবর্দি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বাহাউদ্দিন জাকারিয়া অনশন, আত্মনিগ্রহ ইত্যাদিতে বিশ্বাস করতেন না। খাদ্য ও পোশাকের ক্ষেত্রে তিনি সাধারণভাবে চলার পক্ষপাতী ছিলেন, দারিদ্র্যকে তাঁরা আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করেননি। চিশ্‌তিরা নিষ্কর ভূমি, অর্থ ইত্যাদি দান হিসেবে নিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। সুরাবর্দিরা সরকারি অনুদান নিতেন, বাহাউদ্দিন জাকারিয়া নিজে ধনী ছিলেন। তিনি বলেন যে অর্থ আছে বলে তিনি দরিদ্রদের সেবা করতে পারেন। তিনি ধর্মের বিধানসমূহ (রোজা, নামাজ,

হজ) মানার পক্ষপাতী ছিলেন। বিদ্যার সঙ্গে তিনি অতীন্দ্রিয়বাদের মিলন ঘটাতে চেয়েছিলেন। তিনি সঙ্গীত বাতিল করেননি, গুরুত্ব কমিয়ে দিয়েছিলেন। এসব সত্ত্বেও গোঁড়া উলেমারা তাঁকে পছন্দ করত না। জাকারিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যরা পাঞ্জাব ও সিন্ধু অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করে। গুজরাট, বাংলা ও কাশ্মীরে সুরাবর্দি সম্প্রদায়ের প্রভাব বিস্তার লাভ করে। সুরাবর্দিরা চিশ্‌তিদের গৃহীত হিন্দু আচরণের বিরোধিতা করেন (মস্তক মুণ্ডন, জলদান, নত হয়ে কুর্নিশ ইত্যাদি), ধর্মান্তরকরণে তাঁরা খুব আগ্রহী ছিলেন। বাংলার সুরাবর্দি সুফি শেখ জামালুদ্দিন বলপ্রয়োগে ধর্মান্তর করেন, মন্দির ভেঙে খান্‌কা বানিয়েছিলেন।

রাষ্ট্র সম্পর্কে এদের দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য ছিল। চিশ্‌তিরা শাসক ও শাসন থেকে দূরে ছিলেন, তাঁরা মনে করতেন রাজা ও রাজদরবার আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে ক্ষতিকারক। এজন্য ইমাম গজ্জালি রাজনীতি থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেন। উলেমা ও সুফিদের একাংশ সুলতানির সমর্থক ছিল। তারা বলত যে শাসককে যে মেনে চলে সে ঈশ্বরকে মেনে চলে (Whoever obeys the Sultan, obeys God.)। সুরাবর্দিরা সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলেছিল। ভারতের বাইরে এই সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা শিহাবুদ্দিন সুরাবর্দি খলিফার সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছিলেন, ভারতে এই সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা বাহাউদ্দিন এই ঐতিহ্য বজায় রাখেন। তিনি বলতেন যে সুলতানের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে দরিদ্রদের সেবা করা যায়। সুলতান ও অভিজাতদের আধ্যাত্মিক পরামর্শের প্রয়োজন আছে। সুরাবর্দিরা সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করতেন, বাহাউদ্দিন ইলতুৎমিসকে সিন্ধু জয়ের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সুলতানরা সুফিদের সাহায্য নিয়েছিলেন একথা বলা যায় না, উলেমা ও সুফিরা সুলতানের পক্ষ নেন। চিশ্‌তিরা মনে করেন যে শাসক সর্বদা দয়ালু ও প্রজাহিতৈষী হবেন, তাঁরা রাষ্ট্রের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন না। জনগণের প্রতিনিধিত্ব তাঁরা করেননি, শাসকশ্রেণীর বিরোধিতা করা তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না। ভারতে বেশিরভাগ সুফি ছিল যাজক সম্প্রদায়ের লোক। তাঁরা সরকারি অনুদানের আকাঙ্ক্ষা করতেন না, অযাচিত দান গ্রহণ করতেন (ফুতু)। অভিজাত ও বণিকরা তাঁদের সাহায্য করতেন, বেশিরভাগ খান্‌কা ছিল বাণিজ্যপথের ওপর অবস্থিত। সুলতানরা সুফিদের বিরোধিতা করতেন না। তাঁরা মনে করেন যে সুফিদের আশীর্বাদ ও জনজীবনে এদের প্রভাব তাঁদের শাসনকে বৈধতা দেবে। সুফিরা সামাজিক ন্যায়ের প্রচার করতেন, সামাজিক উত্তেজনা ও বিক্ষোভ কমাতে সাহায্য করতেন। সুফিদের মধ্যে সকলে সরকারি চাকরি প্রত্যাখ্যান করতেন না। শিষ্যদের অনেকে রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, নাসিরুদ্দিন চিরাগ সরকারি চাকরিকে আধ্যাত্মিক সাধনার প্রতিবন্ধক বলে মনে করেননি। চিশ্‌তিরা চাকরি নয়, শিল্প ও কৃষিকে আসল কাজ বলে গণ্য করতেন।

চিশ্‌তিরা রাষ্ট্র ও শাসকগোষ্ঠী থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলেছিলেন। রাষ্ট্র জনকল্যাণমূলক হয়ে উঠুক এটি ছিল তাঁদের কামনা। রাষ্ট্র ও সুফিদের মধ্যে বড় ধরনের সংঘাত ছিল না, শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থা তাঁদের কাম্য ছিল। তাদের শান্তি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার আবেদন রাষ্ট্র ও মুসলিম সমাজের সংহতি সাধনে সহায়ক হয়েছিল। চিশ্‌তিরা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন সব ধর্মের প্রতি সহনশীল, তাঁদের খান্‌কার দুয়ার সব ধর্মের মানুষের জন্য উন্মুক্ত ছিল। তাঁরা জৈন সাধু ও হিন্দু যোগীদের সঙ্গে মিশতেন, হিন্দাভি ভাষায় কথা বলতেন। তাদের খান্‌কায় গানবাজনা হতো। তুর্কিদের কঠোর প্রকৃতির শাসন এবং রক্ষণশীল উলেমাদের ইসলাম ব্যাখ্যা এদের প্রভাবে খানিকটা সহনশীল হয়ে উঠেছিল। দু-একজন আধুনিক ঐতিহাসিক বলেছেন যে সুফিরা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটিয়েছিল। এই অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। সমাজ বিপ্লবের জন্য কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়, তা ঘটানো ছিল সুফিদের ক্ষমতা বহির্ভূত। সুফিরা উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল মতবাদের মিশ্রণ ঘটিয়ে এক উদারনৈতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিলেন। সুফি আদর্শবাদের দুর্বলতা হলো সুফি পীরদের ঘিরে ব্যক্তিপূজা ও মূর্তিপূজার (সমাধিকে কেন্দ্র করে) চলন হয়েছিল। খান্‌কাকে কেন্দ্র করে পীর ও মুরিদদের মধ্যে যে সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল তাতে স্তাবকতা ব্যক্তিত্বের অবমূল্যায়ন ঘটিয়েছিল। সুফিরা দর্শন ও যুক্তিবাদের বিরোধী ছিলেন, বেশি পড়াশোনা তাঁরা পছন্দ করতেন না, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের প্রতি তাঁদের অশ্রদ্ধা ছিল। তাঁরা অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী ছিলেন এবং জনগণের মধ্যে তা প্রচারিত হয়। জনগণের বিজ্ঞানমনস্কতা এতে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

সুলতানি যুগের সুফি আন্দোলন নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। সুফিরা এদেশের অবহেলিত লাঞ্ছিত মানুষদের উপদেশ ও আশ্রয় দিতেন। সুফিরা ন্যায়, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও মানবতাবাদের উচ্চ আদর্শ তুলে ধরেছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে তারা মিলনের দূত হিসেবে কাজ করেছিলেন। হিন্দুদের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য লাভের জন্য সুফি দরবেশরা হিন্দুদের অনেক আচার-আচরণ গ্রহণ করেছিলেন। সুফি আন্দোলন ভারতে এক সহনশীল উদার ও মানবতাবাদী পরিবেশ তৈরি করেছিল। সুফি সন্তরা রাজশক্তি ও শাসকগোষ্ঠী থেকে সাধারণত দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন। রাজশক্তির সহায়তা পাননি বলে তাঁরা জনসাধারণকে তেমনভাবে প্রভাবিত করতে পারেননি। সমাজের বহমান ধারার সঙ্গে সুফিদের অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল। মুসলমান ধর্মের গোঁড়ামি এঁরা পছন্দ করেননি, বিধর্মীদের দূরে সরিয়ে দেননি। রক্ষণশীলদের বাধা দেবার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। অভিজাতদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রা তাঁরা পছন্দ করতেন না, কিন্তু তাদের

সমালোচনা করার সাহস তাঁদের ছিল না। সুফিরা ইসলামের অতীন্দ্রিয়বাদী মরমী ব্যাখ্যা দেন, কোরানের বাণী ও পয়গম্বর মহম্মদের উপদেশাবলীকে তাঁরা নতুন ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত করেন। গোঁড়া রক্ষণশীলরা তাদের সব প্রয়াস ব্যর্থ করে দিয়েছিল। গোঁড়া রক্ষণশীলদের কাছে সুফিরা ছিল ধর্মত্যাগী, বিধর্মী বা ধর্মদ্রোহী। কে. এম. আশরাফ লিখেছেন যে ইসলামের জন্মলগ্ন থেকে যে অস্থিরগতি ও প্রচণ্ড আবেগ তৈরি হয়েছিল তারই এক প্রকাশ হলো সুফিবাদ। এই দর্শন হলো অতীন্দ্রিয়বাদী, মরমী, রহস্যবাদী ও ভাববাদী, ভাবসাধনা হলো সুফিবাদের মূলকথা। সুফিবাদের ওপর জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দু দর্শনের প্রভাব পড়েছিল। ঈশ্বর সাধনা, মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও অহিংসা হলো এর মৌল উপাদান। সুফিবাদ কোরান ও হাদিস থেকে অনেকক্ষেত্রে সরে গিয়েছিল। বাস্তব পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের খাতিরে নতুন ধর্মমত ও আদর্শ গড়ে উঠেছিল। ভারতীয় যোগ ও সন্ন্যাস একে প্রভাবিত করেছিল। ইসলামের প্রসারে এই সম্প্রদায়ের অবদান কম নয়। দুই সম্প্রদায়, দুই ধর্ম ও দুই সংস্কৃতির মিলনে এদের বিশিষ্ট অবদান ছিল।

ভক্তি আন্দোলন ঃ কবীর, নানক, নাথপন্থী ও সন্ত ঐতিহ্য

সুফি মতবাদ ভারতে প্রবেশের আগেই এদেশে ভক্তিধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে এই আন্দোলন সমাজ ও ধর্মের ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছিল। দ্বৈতবাদী দর্শন থেকে বৈষ্ণব ভক্তিবাদের উদ্ভব হয়। রামানুজ, নিম্বার্ক, মাধবাচার্য ও বল্লভাচার্য এই চারজন ভক্তিধর্মের দার্শনিক ভিত্তি গঠন করে দেন। পালরাজারা ধর্মমতে মহাযানী হলেও হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁদের অনুরাগ ছিল। সেন বংশীয়দের মধ্যে বিজয়সেন ও লক্ষ্মণসেন বিশেষভাবে বৈষ্ণবধর্মের প্রতি অনুকূল ছিলেন। লক্ষ্মণসেনের সভাতে জয়দেব *গীতগোবিন্দ* রচনা করেন, মৈথিলী কবি বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক পদ রচনা করেন। সুলতানি যুগে ভক্তিধর্মের বিস্তার ঘটেছিল, এজন্য অনেকে মনে করেন যে এর পশ্চাতে ইসলামের প্রভাব ছিল। একাদশ শতকের গোড়ার দিকে আলবেরুনি হিন্দুসমাজের নানা কুসংস্কার ও অসাম্যের কথা উল্লেখ করেন। সমাজে জাতিভেদ প্রথা ও অস্পৃশ্যতা ছিল, শিশুবিবাহ, বহুবিবাহ ও সতীপ্রথা ছিল। ইসলামের আগমনের পর হিন্দুদের মধ্যে রক্ষণশীলতা বেড়েছিল। সুলতানি যুগে ভারতে চারটি প্রধান ধর্মমত হলো বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু ও ইসলাম। হিন্দুধর্মের মধ্যে শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত প্রভৃতি সম্প্রদায় তৈরি হয়েছিল। বৈদিক, বৈষ্ণব, শাক্ত ও শৈবরা নিজ নিজ মত ও পথ অনুযায়ী চলত, বৌদ্ধ ও জৈনরা অহিংসা ও সরল জীবনযাপনের কথা বলত। ইসলাম একেশ্বরবাদ, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ নিয়ে হাজির হয়েছিল। সুফিরা উদার, সহিষ্ণু একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা করেছিল।

ভক্তি আন্দোলনের উৎপত্তি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। ম্যাক্স ওয়েবার ও গ্রিয়ারসন মনে করেন যে খ্রিস্টানধর্ম থেকে একেশ্বরবাদ ও ভক্তির ধারণা এসেছিল। অন্যমতে, ইসলাম ধর্ম থেকে ভক্তি আন্দোলনের উৎপত্তি হয়েছিল। ইসলামের একেশ্বরবাদ, সামাজিক সাম্য ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের ওপর ভিত্তি করে ভক্তি আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। ভারতীয় পণ্ডিতরা মনে করেন যে ভারতের বেদ ও উপনিষদের মধ্যে ভক্তি আন্দোলনের উৎস আছে। শংকরাচার্যের শিষ্য রামানুজ অদ্বৈতবাদী ছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে রামানন্দ, কবীর ও চৈতন্যদেব ভক্তি আন্দোলন গড়ে তোলেন। ভক্তি আন্দোলনের পটভূমিকার মধ্যে এর উৎপত্তির কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। ইসলামের আগমনের পর এদেশের বহু নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। ভক্তি আন্দোলনের নেতারা হিন্দুসমাজকে রক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে ভক্তি আন্দোলন গড়ে তোলেন। এটি শুধু ধর্মীয় বিপ্লব নয়, সমাজ বিপ্লবও। হিন্দুধর্ম ও সমাজের মধ্যে বহু কুসংস্কার প্রবেশ করেছিল। মূর্তিপূজা, পুরোহিততন্ত্র, আচার-অনুষ্ঠান, জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতা সমাজজীবনকে পঙ্গু করে ফেলেছিল। হিন্দুদের রাজনৈতিক অধঃপতন তাদের জীবনে হতাশা ও অবসাদ এনেছিল। ভক্তির মাধ্যমে হিন্দুরা এই অধঃপতিত অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল।

ভক্তিধর্মের মূলকথা হলো ভক্তির মাধ্যমে মানুষের মুক্তি। জ্ঞান বা কর্মের প্রয়োজন নেই শুধু ভক্তির মাধ্যমে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে মিলন হতে পারে, 'প্রপত্তি' বা ঈশ্বরের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমপর্ণের মাধ্যমে মুক্তি হতে পারে। অথবা দাসভাব অনুসরণ করে ঈশ্বর লাভ হতে পারে। ভাগবত পুরাণে এই ভক্তিধর্মের কথা আছে। দক্ষিণ ভারতের নয়নার ও আলবার সাধুরা ভক্তিধর্ম প্রচার করেন। এরা বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের বিরুদ্ধে ভক্তি ধর্ম প্রচার করেছিল। নবম শতকে শংকরাচার্য অদ্বৈতবাদ প্রচার করেন, শংকরাচার্যের শিষ্য রামানুজ একাদশ শতকে ভক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। তিনি সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন। রামানুজ প্রচার করেন যে জ্ঞানের চেয়ে ঈশ্বর ভক্তি হলো মুক্তিলাভের উন্নততর পথ। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলে ভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বর লাভ করতে পারে। রামানুজ বেদের সঙ্গে ভক্তি আন্দোলনের সম্পর্ক স্থাপন করেন।

ভক্তি আন্দোলনের প্রচারকরা মনে করেন যে তদানীন্তন পরিস্থিতিতে ভক্তি হলো মুক্তির একমাত্র পথ। ঈশ্বর ও ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নতুন অর্থ লাভ করেছিল। কর্ণাটক অঞ্চলে বাসব বীরশৈব (লিঙ্গায়েত) ধর্ম প্রচার করেন, এর মূলকথা ছিল ঈশ্বরের (শিব) প্রতি অবিচল ভক্তি। এই ভক্তিধর্মে গুরু প্রাধান্য পান, উপবাস, তীর্থভ্রমণ ইত্যাদি ধর্মীয় আচার গুরুত্ব হারিয়েছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্ম, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের তাঁরা বিরোধিতা করেন। তাঁরা জাতিভেদ প্রথার নিন্দা করেন, সব মানুষের সমতায় তাঁরা বিশ্বাস করতেন। দক্ষিণে নিম্বার্ক ও মাধবাচার্য ভক্তি আন্দোলন সাধারণ মানুষের

মধ্যে প্রচার করেন। উত্তর ভারতে রামানুজ শিষ্য রামানন্দ রামভক্তি প্রচার করেন। রামানন্দ যে আন্দোলন গড়ে তোলেন তার মূলকথা ছিল ঈশ্বর ভক্তি, জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা এবং নারী-পুরুষের সমান অধিকার। তিনি উচ্চ-নীচ, ব্রাহ্মণ-শূদ্রের মধ্যে পার্থক্য করতেন না, তাঁর আন্দোলনের ফলে সমাজে নিম্নবর্গের মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

রামানন্দের সবচেয়ে বড় শিষ্য হলেন কবীর। জোলা পরিবারের সন্তান কবীর জাতি, ধর্ম, পুরোহিততন্ত্র ও শাস্ত্র মানতেন না। তিনি হিন্দু সাধু ও সুফিদের সংস্পর্শে এসেছিলেন, নাথপন্থীদের সাধনার দ্বারা তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হন। তিনি একেশ্বরবাদ প্রচার করেন, তাঁর কাছে রাম, হরি, আল্লাহ্ সবই এক। তিনি মূর্তিপূজা, তীর্থস্নান এবং উপাসনায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি প্রচার করেন যে রামভক্তি হলো মুক্তির পথ। গৃহী জীবন ত্যাগ করে তিনি সন্ন্যাস জীবনযাপনের কথা ভাবেননি। নাথপন্থীদের কাছে যোগ শিক্ষা করেন, পুঁথির জ্ঞানকে তিনি ঈশ্বরলাভের উপায় বলে মনে করেননি। হিন্দু ও ইসলামের ধর্মীয় নেতাদের তিনি আক্রমণ করেন। এরা ঈশ্বর বা ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যের খোঁজ রাখে না, মানুষের দুর্বলতাকে এরা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে। ঈশ্বরের ঐক্যের ধারণা থেকে তিনি মানুষের সমতায় বিশ্বাস স্থাপন করেন। বহুস্তরে বিভক্ত সমাজকে তিনি আক্রমণ করেন। বংশগরিমা, ঐশ্বর্যের দাম্ভিকতা ও জাতিগরিমাকে তিনি আক্রমণ করেন, রাষ্ট্র হলো এই অসাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজের রক্ষক। এজন্য তিনি তাঁর অনুগামীদের রাষ্ট্র ও রাজসভা থেকে দূরে থাকতে বলেন। একেশ্বরবাদে গভীর বিশ্বাস থেকে তিনি সব ধর্মের কার্যকারিতা স্বীকার করে নেন (all religions were different roads to the same goal)। এজন্য তিনি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভেদকে কৃত্রিম বলে গণ্য করেন। কবীর সমাজসংস্কারক ছিলেন না, তবে তিনি বলেছেন যে মানুষের আচার-আচরণ থেকে সমাজ গড়ে ওঠে (human conduct would shape society)। কবীর হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকে প্রভাবিত করেন। কিন্তু এই দুই ধর্মের কোনো পরিবর্তন তিনি ঘটাতে পারেননি। জাতিভেদ প্রথায় ভাঙন ধরেনি, কবীরপন্থীরা একটি ক্ষুদ্র ধর্ম-সম্প্রদায় হিসেবে বহুকাল টিকে ছিল। কবীর হলেন একটি বিশেষ যুগের প্রতিনিধি, তিনি হলেন সাম্যের প্রতীক, হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের আদর্শ এবং জাতিভেদ প্রথার কঠোর সমালোচক।

মহারাষ্ট্রে জ্ঞানেশ্বর ও তাঁর শিষ্য নামদেব ভক্তিধর্ম প্রচার করেন। রাণাডে জানিয়েছেন যে পান্ধারপুর আন্দোলন মহারাষ্ট্রের সামাজিক জীবনে উন্নতি ঘটিয়েছিল। নারী জাতির উন্নতি হয়, সমাজজীবনের অনেক কলুষতা দূর হয়। শিখধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানক ১৪৬৯ খ্রিস্টাব্দে লাহোরের কাছে তালবন্দি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ক্ষত্রী পরিবারের সন্তান নানক ছিলেন অতীন্দ্রিয়বাদী, চিন্তাশীল এবং সাধু ও সন্তদের কাছ

থেকে উপদেশ নিতে ভালোবাসতেন। তিনি ঈশ্বরের নির্দেশ পেয়ে গৃহত্যাগ করেন, প্রিয় শিষ্য মর্দনকে সঙ্গে নিয়ে দেশ ও বিদেশে যান, সিংহল, মক্কা ও মদিনায় তিনি গিয়েছিলেন। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর আগে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর বহু শিষ্য হয়েছিল। কবীরের মতো নানক একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষ ঈশ্বর সাধনার মাধ্যমে মুক্তি পেতে পারে। তবে ঈশ্বর পেতে হলে চারিত্রিক শুদ্ধির প্রয়োজন, গুরু শিষ্যকে পথ দেখাবেন। তিনি কবীরের মতো মূর্তিপূজা, তীর্থভ্রমণ ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে স্বীকার করেননি। তিনি মনে করেন যে গৃহীধর্মের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সাধনার কোনো বিরোধ নেই।

নানক নতুন ধর্মমত স্থাপন করতে চাননি, হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে সেতুবন্ধনের প্রয়াস চালিয়েছিলেন। শান্তি, শুভেচ্ছা, মিলন হলো তাঁর ধর্মীয় আদর্শ। তিনি কবীরের মতো মানুষের সমতায় বিশ্বাসী ছিলেন, জাতিভেদ প্রথার তীব্র নিন্দা করেন। শাসকদের তিনি মনে করেন অধার্মিক অপশাসক। তিনি যে রাষ্ট্রের কল্পনা করেছিলেন তার শীর্ষে থাকবেন একজন দার্শনিক রাজা, নৈতিকতা, ন্যায়বিচার ও সাম্য হবে তাঁর রাষ্ট্রনীতি। ভক্তিবাদ ভারতের ঐতিহ্য-নির্ভর সমাজে অবশ্যই আলোড়ন তুলেছিল। প্রথাগত ধর্ম ও আদর্শের সঙ্গে নতুন ধর্মমত ও আদর্শের সংঘাত বেধেছিল। এই সংঘাতের মধ্যে দিয়ে বৌদ্ধিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, এই বৌদ্ধিক আন্দোলনে কবীর ও নানকদের অবদান কম ছিল না। উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারী, পশ্চিমে পাঞ্জাব থেকে পূর্বে আসাম পর্যন্ত এই আন্দোলন বিস্তৃত ছিল। সমাজ ও ধর্মের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়েছিল। ভক্তি আন্দোলন একেশ্বরবাদ প্রচার করেছিল। শুধু ভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বর ও ভক্তের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে। পুরোহিততন্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, যাগযজ্ঞ ও ধর্মীয় অনুশাসন থেকে মানুষ অনেকখানি মুক্ত হয়েছিল। এই আন্দোলনের ফলে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, অস্পৃশ্যতা, বহুবিবাহ ইত্যাদির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠেছিল। নারীজাতির অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়, তবে ভক্তি আন্দোলনের সব উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়নি। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ব্যবধান খানিকটা কমেছিল, কিন্তু স্থায়ী উন্নতি হয়নি। তবে দুই ধর্ম পরস্পরকে বুঝেছিল, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমন্বয় ঘটেছিল। দুই সভ্যতার মিলনে নতুন সভ্যতার সৃষ্টি হয়। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সহনশীলতা বেড়েছিল। ভক্তি আন্দোলনের নেতারা স্থানীয় ভাষায় তাঁদের মত প্রচার করতেন, এতে অবশ্যই স্থানীয় ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি হয়। ভক্তি আন্দোলনের নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বলা যায় এই ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলন হিন্দুসমাজকে শক্তিশালী করেছিল। ধর্মীয় রক্ষণশীলতা দূর হবার ফলে অর্থনৈতিক কাজকর্ম বেড়েছিল। ভক্তি আন্দোলন ছিল মানবতাবাদী, রামানন্দ, চৈতন্য, কবীর, নানক সকলে নারীজাতি ও অস্পৃশ্যদের মানবিক অধিকারের স্বীকৃতি দেন।

নাথপন্থী আন্দোলন ও সন্ত ঐতিহ্য

দশম শতক থেকে সারা ভারতবর্ষে নাথপন্থী সম্প্রদায় ছিল। দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে সমগ্র উত্তর ভারত, পশ্চিম ভারত, দাক্ষিণাত্য এবং পূর্বভারতে নাথপন্থী সম্প্রদায়ের প্রভাব ছিল। এদের প্রধান কেন্দ্র ছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পেশোয়ারে, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও বাংলাদেশে এদের প্রভাব লক্ষ করা যায়। এরা ছিল ধর্মে শৈব, সাধারণত যোগী বা যুগী নামে এরা পরিচিত হতো। এদের ধর্মকর্ম, আচার-আচরণকে কেন্দ্র করে লোকগীতি, আখ্যানকাব্য, ছড়া ও পাঁচালি রচিত হয়েছে। নাথ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ভাষায় রচিত সাহিত্য আছে। ভারতের কোনো কোনো দার্শনিক গোষ্ঠী জড়দেহকে মুক্তির বাধা না বলে উপায় হিসেবে দেখেছেন। নানাধরনের যৌগিক ও তন্ত্রসাধনার মাধ্যমে দেহকে পরিশুদ্ধ করে মোক্ষ বা মুক্তি লাভের কথা বলেছেন। হঠযোগের সাহায্যে জড়দেহকে দিব্যদেহে পরিণত করা যায় বলে এঁরা মনে করেন। এই যোগী সম্প্রদায়ের সাধনা পতঞ্জলির যোগ দর্শনকে গ্রহণ করেছিল। এঁরা মনে করেন যে কায়াসাধনার মাধ্যমে জড়দেহকে অজর, অমর ও প্রাজ্ঞ করা যায়। যোগের দ্বারা প্রাণায়ামাদির সাহায্যে এঁরা নিশ্বাস-প্রশ্বাসকে ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রিত করতেন। পূরক-কুম্ভক-রেচক শীর্ষক বায়ু বশীভূত করে এঁরা মোক্ষলাভের প্রথম সোপান অতিক্রম করতেন। তন্ত্রের 'কুলকুণ্ডলিনী' তত্ত্ব অনুসরণ করে তাঁরা দিব্যানুভূতি লাভ করতেন। পঞ্চভৌতিক জড়দেহ অপার্থিব দিব্যদেহে পরিণত হতো। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা এরকম ধারণা পোষণ করতেন।

নাথপন্থীরা ছিল মূলত আত্মবাদী, ঈশ্বরবাদী ততটা নয়। সাধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মোক্ষ লাভ করা ছিল এদের লক্ষ্য। শিব হলেন এঁদের আদি গুরু, তিনি আদিনাথ, তাঁর শিষ্য মীননাথ, মীননাথের শিষ্য হলেন গোরক্ষনাথ। এই গোরক্ষনাথের জীবনকাহিনী নিয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অনেক জনশ্রুতি গড়ে উঠেছে, কাব্য ও গল্প লেখা হয়েছে। ইনি নিজের গুরু মীননাথকে বুদ্ধিভ্রষ্টতা থেকে উদ্ধার করে স্মরণীয় হয়ে আছেন। শিব আদিনাথ হলেও চরিত্রগৌরবে গোরক্ষনাথ অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেছেন। মানুষ গোরক্ষনাথ দেবতাকে ছাড়িয়ে গেছেন। ঠিক এই কারণে নাথপন্থীরা কোনো কোনো প্রদেশে গোরক্ষপন্থী বলে পরিচিত। নাথধর্মে নজন গুরুর কথা জানা যায়, বৌদ্ধ তান্ত্রিকেরা এই নাথগুরুদের পূজা করত। চর্যাপদে নাথগুরু ও নাথধর্মের কথা আছে। নজন নাথ গুরু হলেন পূর্বে গোরক্ষনাথ, উত্তরাপথে জলন্ধর, দক্ষিণে নাগার্জুন, পশ্চিমে দত্তাত্রেয়, দক্ষিণ-পশ্চিমে দেবদত্ত, উত্তর-পশ্চিমে জড়ভরত, কুরুক্ষেত্র ও মধ্যদেশে আদিনাথ এবং দক্ষিণ-পূর্বে সমুদ্রোপকূলে মৎস্যেন্দ্রনাথ (মীননাথ)। মারাঠি কাহিনীতে আছে আদিনাথ শিবের কাছে শিবঘরণী পার্বতী, মীননাথ ও জলন্ধরিপাদ মহাজ্ঞান লাভ করেন। বাংলাদেশে মীননাথের দুজন শিষ্য হলেন গোরক্ষনাথ ও

চৌরঙ্গিনাথ। জলন্ধরের দুই শিষ্য কানুপা ও ময়নামতী, গোরক্ষনাথের দুই শিষ্য হলেন গৈনীনাথ ও চর্পটিনাথ। মীননাথ, গোরক্ষনাথ, জলন্ধরিপাদ, রানী ময়নামতী ও তাঁর পুত্র গোপীচন্দ্র (গোবিন্দচন্দ্র)-কে নিয়ে কাব্য, কাহিনী ছড়া ইত্যাদি লেখা হয়েছে।

বাংলাদেশে নাথ সাহিত্য পাওয়া যায় গোরক্ষনাথের কাহিনী ও ময়নামতী-গোপীচন্দ্রের কাহিনীর মধ্যে। ভারতের সর্বত্র নাথ সাহিত্য প্রধানত এই দুই ভাগে বিভক্ত। নাথধর্ম, দর্শন ও তত্ত্ব সম্পর্কে কিছু গান, ছড়া, পাঁচালি ইত্যাদি পাওয়া যায়। গোরক্ষনাথ ছিলেন সম্ভবত একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি, দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। গোরক্ষনাথকে ঘিরে নানা প্রদেশে নানা গল্প ও জনশ্রুতি তৈরি হয়েছে। গোরক্ষনাথ তাঁর পথভ্রষ্ট গুরুকে উদ্ধার করে সাধনমার্গে ফিরিয়ে আনেন। বাংলাদেশে ময়নামতী ও তার পুত্র গোপীচন্দ্রের কাহিনীতেও সাধনমার্গে ফিরে আসার কথা আছে। অল্পশিক্ষিত সাধারণ মানুষ এসব কাহিনী নিয়ে গল্প, কবিতা কাব্য রচনা করেন। এসব গান করা হতো। মুসলমান শেখ ফয়জুল্লাহ্ এই কাহিনী রচনা করেন অথবা সংকলন করে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। নাথপন্থীরা মূলত ছিল নিরীশ্বরবাদী, এঁরা মনে করেন যে নিজের আত্মার মুক্তি নিজের সাধনার দ্বারা সম্ভব। দেবদেবীর প্রতি এঁদের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না, এজন্য মুসলমান সাধকেরা এই দলে যোগ দিতে কোনো মানসিক বাধা পাননি। ময়নামতী ও গোপীচন্দ্রের কাহিনী বাংলা থেকে রাজপুতনা, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, বিহার ও পাঞ্জাবে গিয়েছিল। ত্রিপুরার মেহারকুলের রাজার স্ত্রী হলেন ময়নামতী, পুত্র গোপীচন্দ্র। গোপীচন্দ্র কীভাবে নাথ সাধনমার্গে ফিরে এলেন তা হলো এই কাহিনীর মূল বিষয়বস্তু। গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণ হলো গোপীচন্দ্রের পাঁচালির কথা। মুসলমান কবিরাও গোবিন্দচন্দ্রের গীত গেয়েছেন। সুকুর মাহমুদ নামক একজন মুসলমান কবির নাম পাওয়া যায়।

নাথ ধর্ম ও দর্শন সংক্রান্ত কয়েকখানি আখ্যানকাব্য, পাঁচালি ও ছড়া পাওয়া গেছে। সারা ভারতে এগুলি ছড়িয়ে আছে, এইসব গ্রন্থে সাধন-ভজনের কথা আছে। ড. পঞ্চানন মণ্ডল তাঁর সম্পাদিত *গোরক্ষ বিজয়*-এর পরিশিষ্টে এরকম তত্ত্ব সংক্রান্ত কয়েকটি ছড়া মুদ্রিত করেছেন। চারখানি পুঁথি পাওয়া গেছে—*যোগীর গান*, *যুগীকাচ*, *গোর্খসংহিতা* ও *যোগ চিন্তামণি*—যেগুলি নাথ ধর্ম ও দর্শনের পরিচয় বহন করে। এসব পুঁথিতে দেহকে অমর করার কৌশল, হঠযোগ, তন্ত্র ইত্যাদির কথা আছে। যোগরহস্য ব্যাখ্যায় রাধাকৃষ্ণের রূপকও গ্রহণ করা হয়েছে। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক মুসলমান ছিলেন, হিন্দুর যোগদর্শন গ্রহণ করলেও তাঁরা ইসলামী সাধনার তত্ত্বের কথা বলেছেন। শৈব নাথধর্ম একহাজার বছর ধরে সারা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, আজও আছে। এরা সন্ত ঐতিহ্য তৈরি করেছে, নিজেদের সাধন-ভজন নিয়ে

এরা সন্তুষ্ট থাকে। এদের প্রচারমূলক সাহিত্য আছে, ভারতের সন্ত ঐতিহ্য এরা বহন করে চলেছে।

ভারতের জৈনসাধু, বৌদ্ধ তন্ত্রযানী, নাথপন্থী যোগী, সুফি দরবেশ, শৈব ও বৈষ্ণব ভক্তরা সারাদেশ জুড়ে সন্ত ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করেছে। এরা আপনমনে ঈশ্বরের সাধনা করেছে, সব সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি রয়েছে এদের অপার করুণা। জনজীবনের ওপর এরা এমন প্রভাব বিস্তার করেছে, জনসেবার আদর্শ গড়ে তুলেছে যে সর্বশ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের মানুষ লাভবান হয়েছে। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে হানাহানি কমেছে। এদের প্রচারিত সমতা ও মৈত্রীর আদর্শ সামাজিক সহনশীলতা সৃষ্টি করেছে। জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতা, পুরোহিততন্ত্র ও রক্ষণশীলতা দুর্বল হয়েছে। সন্ত ঐতিহ্য ভারতের বৌদ্ধিক আন্দোলন ও মননশীলতাকে প্রভাবিত করেছে, ভারতের শাসকগোষ্ঠী যোগী, সন্ত-সুফিদের অগ্রাহ্য করতে পারেননি। ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এদের অবদান অস্বীকার করা যায় না।

নাথপন্থী ঐতিহ্য, সাহিত্য ও দর্শন

ভারতবর্ষের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ছিল কানফাটা হঠযোগে অভ্যস্ত গুপ্ত রহস্যবাদী যোগীরা যারা নাথ নামে পরিচিত। এদের নজন গুরুর সকলের নাম শেষ হয়েছে নাথ শব্দ দিয়ে। আদিনাথ, মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা, কানুপা, চৌরঙ্গিনাথ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব সকলের নামের শেষে নাথ শব্দ যুক্ত করে নাথ সম্প্রদায়ের সাহিত্য রচিত হয়েছে। আদি ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এই সম্প্রদায়ের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। অধ্যাপক সুকুমার সেনের মতে, উত্তর ও উত্তর-পূর্ব বাংলাদেশ হলো এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তিস্থল। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও রাজস্থানে এই সম্প্রদায়ের যে লোককাহিনী গড়ে উঠেছে তাতে দেখা যায় প্রধান চরিত্রগুলির উৎপত্তিস্থল হলো বাংলা। বিভিন্ন প্রদেশের গোরক্ষপন্থী ঐতিহ্যের রহস্যবাদী পদ ও শিক্ষামূলক রচনার ওপর বাংলার প্রভাব লক্ষ করা যায়। বাংলার বাউলদের মধ্যে নাথপন্থী মতবাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে (The Baul cult of Bengal is indeed a transformed form of the Natha cult.)। বাংলার বৈষ্ণব আন্দোলনের মধ্যেও নাথ ধর্মের প্রভাব লক্ষ করা যায়। বাংলার বাউলরা নাথপন্থীদের যোগ ও রহস্যবাদী পদের অনুকরণ করেছে।

নাথপন্থীরা ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিল বলা যায় না। প্রত্যেক নাথযোগী হলেন নিজের দেহের রাজ্যে নিজেই ঈশ্বর। বাংলার নাথপন্থীরা যুগি নামে উত্তরবঙ্গ ও বাংলার অন্যান্য স্থানে টিকে আছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নাথপন্থীদের মধ্যে বিভিন্ন শাখার সৃষ্টি হয়েছে। আশ্রম তৈরি করে নাথ মহান্তরা শিষ্যদের নিয়ে সাধনা করেন। এভাবে

এই সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকগুলি পন্থ তৈরি হয়েছে। এদের অনেকে জোলাদের মতো বয়ন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। অনেকে তাবিজ, কবচ, জাদুবিদ্যার মাধ্যমে জীবিকার্জন করতে থাকে। গৃহিযোগীরা নাথপন্থার নির্দেশ অনুযায়ী মৃতদেহগুলিকে কবরস্থ করত। বাংলার বাউল বৈষ্ণবরা এই পন্থা অনুসরণ করেন। মৃতদেহ কবরদান ব্যবস্থা, নিম্নকাজ, নিরীশ্বরবাদিতা এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরোধিতা তাদের প্রথাগত হিন্দুধর্মের বহির্ভূত করে রেখেছিল। এদের অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। বর্তমানে নাথপন্থীদের বেশিরভাগ হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলেছে।

সাধারণভাবে বলা হয় যে নাথপন্থীরা হলো শৈব, রুদ্রাক্ষ মালার ব্যবহার, যোগীর কপালে ত্রিপুন্ড্রা (বিভূতির তিন দাগ) ইত্যাদি দেখে পণ্ডিতরা এরকম অনুমান করেন। সন্দেহ নেই এই মতবাদের ওপর শৈব ধর্মের প্রভাব ছিল। মনসা মতবাদের সঙ্গে এই মতবাদের যোগ ছিল, গোরক্ষনাথ নিজেকে ভৈরব (শিব) বলেছেন। এরা ত্রিশূল ব্যবহার করেন, চৈত্র মাসে শিবের উৎসব করেন এবং শিবরাত্রি পালন করেন। অবাঙালিদের মধ্যে শৈব প্রভাব কম, সম্ভবত গোরক্ষনাথের গুরু মীননাথ থেকে এই ধর্মমতের মধ্যে শৈব প্রভাব বিস্তার লাভ করেছে। পশ্চিম ভারতের বৈষ্ণব প্রভাব, পূর্ব ভারতের বৌদ্ধ প্রভাব, জৈন ও ইসলাম ধর্মের প্রভাব নিয়ে জটিল নাথপন্থী মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। এরমধ্যে শাক্ত প্রভাব রয়েছে, এদের তীর্থস্থানগুলি হলো শাক্ততীর্থ। তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই ধর্মমত কখনো আন্তরিকভাবে ঈশ্বরবাদী ছিল না (The cult had never been seriously theistic.)। সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার আবির্ভাব, ইনি নিরঞ্জন, শূন্য, অনাদি, আদিনাথ। নাথপন্থীদের সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে ঋকবৈদিক ও মনুসংহিতার সৃষ্টিতত্ত্বের অদ্ভুত মিল রয়েছে। সৃষ্টির আগে ছিল বিশাল অন্ধকার ও শূন্যতা (all encompassing darkness and void)। শূন্যের মধ্যে বুদ্‌বুদের সৃষ্টি, অণ্ডের মধ্য থেকে ঈশ্বরের আবির্ভাব (Primal God)। ইনি হলেন আদিনাথ, আদিনাথ থেকে আর সব গুরুদের সৃষ্টি হয়েছে।

নজন নাথ গুরুকে বৌদ্ধ তন্ত্রযানীরা নিজেদের গুরু বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। গুপ্ত সাধন ও যোগাভ্যাসের ক্ষেত্রে বজ্রযানী ও নাথপন্থীদের মধ্যে মিল রয়েছে। মুনিদত্ত চর্যাগীতি কোষের ভাষ্যে মীননাথের কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করেছেন। এই পদগুলির অর্থ হলো সাধন-ভজনের ক্ষেত্রে গুরু পথ দেখাবেন (The Guru directs the path to the supreme goal.)। মীননাথ ও গোরক্ষনাথ সম্ভবত ধীবর ও কৈবর্ত সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। নেপাল ও তিব্বতে মীননাথ হলেন বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর। পুরীর জগন্নাথের মতো নেপালে মীননাথের রথ উৎসব হয়। বাংলার মুসলমানদের একাংশের কাছে মৎস্যেন্দ্রনাথ পীর হয়ে যান। গোরক্ষবিজয়ে গোরক্ষনাথকে বলা হয়েছে মোচানদালি (মোচারা), তিনি গাভীদের রক্ষা কর্তা।

জালান্ধরিনাথ (হাড়িপা) সংস্কৃতে লেখেন এই ধর্মমতের ওপর কয়েকখানি গ্রন্থ। এগুলি হলো বজ্রযোগিনী সাধনা, শুদ্ধিবজ্র প্রদীপ, শ্রীচক্রসম্বরগর্ভতত্ত্ববিধি ও হুংকার-চিত্তবিন্দু-ভাবনাক্রম। সম্ভবত এগুলি জালান্ধরিনাথ একা লেখেননি, অনেক দিন ধরে অনেক সিদ্ধাচার্য এগুলি লিখেছিলেন। এই নাথপন্থী যোগীদের অনেকে তান্ত্রিক যোগী ছিলেন, জালান্ধরির প্রধান শিষ্য কানুপা একজন কাপালিক ছিলেন। কৃষ্ণপাদ এই ধর্মমতের ওপর কিছু পদ এবং যোগের ওপর কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন। এদের লেখায় নাথপন্থা ও তান্ত্রিক সাধনার সমন্বয় ঘটেছে। আচার্য চৌরঙ্গি লেখেন *বায়ুতত্ত্বোপদেশ*, সম্ভবত তিনি একজন নাথ সিদ্ধ ছিলেন। কানেরিনাথ নামে আরো একজন নাথ সিদ্ধাচার্যের নাম পাওয়া যায়, ইনি তান্ত্রিক যোগসাধনার ওপর গ্রন্থ রচনা করেন, তিব্বতী অনুবাদে এই গ্রন্থ পাওয়া যায়।

গোরক্ষনাথ নিজে কোনো গ্রন্থ বা ভাষ্য রচনা করেছিলেন বলে জানা যায় না। গোরক্ষসংহিতা নামে যা পাওয়া যায় তা হলো অনেক পরবর্তীকালের রচনা। গোরক্ষনাথ সম্ভবত একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন, তাঁকে ঘিরে অনেক লোকশ্রুতি, লোককাহিনী, গাথা, প্রবাদ গড়ে উঠেছে। গোরক্ষনাথের প্রচারিত উপদেশাবলী নাথপন্থীদের ধর্মমতের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উপাদান। গোরক্ষনাথ ছিলেন আদি সিদ্ধ, যোগী, ব্রহ্মচারী, উত্তর ভারতে তাঁকে ঘিরে গোরক্ষপন্থা স্থাপিত হয়। তাঁর ধর্মমতের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মমত, যোগী সম্প্রদায় ও তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের মিলন ঘটেছিল। এসব সম্প্রদায় মহিলাদের বাদ দেয়নি। এসবের সমন্বিত রূপ হলো বাংলার নাথ সম্প্রদায়। বাংলার বাইরে গোরক্ষপন্থা ব্রহ্মচর্যা ও যোগের ওপর বেশি জোর দিয়েছে, তবে অনেক স্থানে ব্রহ্মচর্য ও কৌমার্য নীতি থেকে সন্তরা সরে এসেছেন। মীননাথ, জালান্ধরি ও কানহা একটি গুপ্ত সাধন-ভজন সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন যাঁরা তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগিনীদের স্থান দেন। গোরক্ষনাথ তাঁর গুরু মীননাথের চৈতন্যোদয় (মীনচৈতন্য) ঘটিয়ে সাধনমার্গে ফিরিয়ে আনেন। এই কাহিনীর অন্য নাম হলো গোরক্ষ বিজয় যার মধ্যে আছে সংসারমুখী জীবনের সঙ্গে সাধন মার্গের সংঘাত। এই গ্রন্থে গোরক্ষনাথ জয়ী হয়েছেন, গুরুকে যোগ সাধনার পথে ফিরিয়ে এনেছেন।

গোপীচন্দ্রের আখ্যানে ময়নামতী ও জালান্ধরির মধ্যে সম্পর্কের ওপর ইঙ্গিত আছে। গোপীচন্দ্র মায়ের নৈতিক অধঃপতন দেখে যোগসাধনার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন। শেষপর্যন্ত গুরুর কৃপায় গোপীচন্দ্রের মোহভঙ্গ হলো। সরাহ গোপীচন্দ্রের মানসলোকের পরিবর্তন ব্যাখ্যা করেছেন। নাথপন্থার মূল দর্শন হলো সহজ পথে যোগের মাধ্যমে এমন অবস্থায় পৌঁছে যাওয়া যেখানে জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। এই দর্শনে বলা হয়েছে সৃষ্টি ও লয় হলো মানুষের আসক্তি ও কামনার ফল। মানুষের বন্ধন ও মুক্তি তার নিজের হাতে (existence and extinction are the results of

man's desire and cogitation.)। আসল যোগী চিন্তাভাবনাকে অতিক্রম করে যান, তার কাজ নেই, নির্বাণে তার প্রয়োজন নেই, জীবন ও মৃত্যুতে কোনো ভেদাভেদ নেই (There is no distinction between living and the dead.)। নাথপন্থী যোগী সরাহ্ (Saraha) এরকমের পদ রচনা করেছেন। কানহা বলেছেন যে যোগী যোগ সাধনায় সব কিছুর ঊর্ধ্বে উঠে যায়, তার কাছে তখন সব শূন্য বলে মনে হয়। যোগী 'সহজ' লাভের জন্য তিনটি কাজ করবেন—বিন্দুধারণ, পবন নিশ্চাঞ্চল্য ও চিত্ত নিরোধ। তিনি বীর্য ক্ষয় রোধ করবেন এবং মনকে শান্ত করে রাখবেন, এভাবে তিনি তাঁর কাঙ্ক্ষিত 'সহজ' লাভ করবেন।

ভারতের মধ্যযুগের সাহিত্যে দেখা যায় যোগীরা নাচছেন, গান করছেন, গল্প বলছেন। এসব করে তাঁরা অর্থোপার্জন করছেন, জীবিকানির্বাহ করছেন। প্রেমিক-প্রেমিকার দূত হিসেবে তাঁরা কাজ করতেন। এই যোগী ও যোগিনীরা গোপীচন্দ্রের কাহিনীকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে গান ও নাচের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছেন। ভারতের রক্ষণশীল সমাজ এদের ভালো চোখে দেখত না, এদের জীবনযাত্রা, গুপ্ত সাধন-ভজন সম্পর্কে অবজ্ঞার মনোভাব ছিল। যোগীরা তাদের তন্ত্রমন্ত্র, বশীকরণ দিয়ে সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করত। সেকশুভোদয়ে একটি কাহিনী আছে। রাজা লক্ষ্মণসেন একজন যোগীকে অমৃতান্ন খেতে দেন, তিনি তা গ্রহণ করেননি। মোটা চালের ভাত ও শাক সিদ্ধ পেয়ে যোগী মহানন্দে তা গ্রহণ করেন। এই ঘটনাটি যোগীদের জীবনযাত্রার ধরন সম্পর্কে অনেকটা ইঙ্গিত দেয়। এরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশত এবং সাধারণ খাদ্য গ্রহণ করত। নাথ যোগীরা রহস্যবাদী পদ রচনা করে তাদের 'ভাবের' কথা বলতেন। সাধারণ ভাষায় তাঁরা কথা বলতেন না। এই প্রহেলিকাময় ভাবের কথা নতুন নয়, সারা উত্তর ভারতে এই ধারার চলন ছিল। নাথপন্থীদের রহস্যবাদী, অতীন্দ্রিয় চিন্তাভাবনার বেশিরভাগের উৎস হলো বাংলা। হিন্দী ও রাজস্থানী ভাষায় যেসব পদ ও ভাষ্য পাওয়া যায় তার ওপর বাংলার প্রভাব আছে।

স্থাপত্য

সুলতানি যুগে ভারতে ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যশৈলী গড়ে উঠেছিল। বিজেতা ও বিজিত সংস্কৃতির মধ্যে আদান-প্রদান শুরু হয়েছিল, তুর্কিরা মধ্য এশিয়া ও ইরানের স্থাপত্য রীতি ভারতে এনেছিল। মিশর, উত্তর আফ্রিকা, আফগানিস্তান ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের বাইজান্টাইন সভ্যতার প্রভাব পড়েছিল ইসলামী স্থাপত্যের ওপর। ভারতে হিন্দু মিস্ত্রি ও কারিগররা তাদের অট্টালিকা, প্রাসাদ, মসজিদ ইত্যাদি নির্মাণ কাজের সঙ্গে যুক্ত হতো। স্বাভাবিকভাবে হিন্দু স্থাপত্যের প্রভাব পড়েছিল এসবের ওপর। অনেক হিন্দু মন্দির ভেঙে শাসকরা তাঁদের প্রাসাদ ও মসজিদ বানিয়েছিলেন, হিন্দু

স্থাপত্যের ছাপ পড়েছিল ঐসব সৌধের ওপর। কুতুবুদ্দিন দিল্লিতে যে কুবাতুল ইসলাম মসজিদ বানিয়েছিলেন তার উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছিল সাতাশটি মন্দির ভেঙে। হিন্দু ও মুসলিম স্থাপত্য অলংকরণ পছন্দ করত, দেবদেবীর মূর্তির পরিবর্তে ইসলামী স্থাপত্যে জ্যামিতিক নকশা, ফুল ও কোরানের বাণী স্থান পেয়েছিল।

কুতুবুদ্দিন আইবক দিল্লিতে কুবাতুল ইসলাম মসজিদ এবং আজমীরে 'আড়াই-দিনকা-ঝোপড়া' মসজিদ নির্মাণ করেন। এদুটি হলো ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের প্রথম নিদর্শন। এই দুই স্থাপত্যে হিন্দু স্থাপত্য রীতির সঙ্গে ইসলামী রীতির মিশ্রণ ঘটেছিল। হিন্দু স্থাপত্যের দুই বৈশিষ্ট্য শক্তি ও সৌন্দর্য এই স্থাপত্যের মধ্যে পাওয়া যায়। মুসলমান শাসকরা ভারতে নিয়ে এসেছিলেন আর্চ, ডোম, মিনার ও চুনের ব্যবহার, এগুলি নতুন স্থাপত্যে ব্যবহার করা হয়। ডোম ও আর্চ মুসলিমরা বাইজান্টাইন সভ্যতা থেকে লাভ করেছিল, ভারতীয় স্থাপত্যে এগুলির ব্যবহার শুরু হলে বৃহৎ অট্টালিকা বানানোর সুবিধে হয়। এসব স্থাপত্যে আলোর অভাব হতো না। কুবাতুল ইসলাম মসজিদের পাশে কুতুবমিনার নির্মিত হয়। কুতুবুদ্দিন আইবক এই মিনার নির্মাণের কাজ শুরু করেন। ২৩৮ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট এই মিনার নানাদিক দিয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, এর গঠনশৈলী হলো অসাধারণ। ফার্গুসন জানাচ্ছেন যে এটি হলো পৃথিবীর সেরা মিনার (the most perfect example of a tower known to exist anywhere in the world.)। কুতুবমিনারের স্থাপত্যরীতি পুরোপুরি ইসলামী, মুয়াজ্জিনের আজান দেবার জন্য এটি নির্মিত হয়। সম্ভবত সন্ত কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকির নামানুযায়ী এর নাম রাখা হয়। ইলতুৎমিস তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র নাসিরুদ্দিন মাহমুদের সমাধির ওপর সুলতান ঘরি নামে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করে দেন। ইলতুৎমিসের অন্যান্য নির্মাণ কাজের মধ্যে ছিল তাঁর নিজের সমাধি, বদায়ুনে হাউজ-ই-শামসি, শামসি ইদগা ও জামি মসজিদ। যোধপুরের কাছে নাগরে তিনি নির্মাণ করেন অতারকিন-কা-দরওয়াজা। কুবাতুল-ইসলাম মসজিদ ও আড়াই-দিনকা-ঝোপড়ার তিনি সংস্কার করেন।

বলবনের সময় নির্মাণ কাজের সংখ্যা কম। তিনি নিজের সমাধি ও লাল প্রাসাদ নির্মাণ করেন। ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্য রীতির অগ্রগতি ঘটেছিল বিশেষ করে নতুন ধরনের আর্চ নির্মাণের ক্ষেত্রে। আলাউদ্দিন খল্‌জি ছিলেন ধনশালী, তাঁর সময়কালে স্থাপত্য নির্মাণের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটেছিল। ইসলামী রীতি অনুসরণ করে তিনি দুর্গ, প্রাসাদ ও মসজিদ নির্মাণ করেন। কুতুবমিনারের আলাই দরওয়াজা হলো তাঁর এক বিশিষ্ট অবদান। মার্শাল জানিয়েছেন যে এটি হলো মুসলিম স্থাপত্যের একটি রত্ন (Alai Darwaza is one of the most treasured gems of Islamic architecture.)। তিনি সিরি শহর এবং নিজামুদ্দিনের সমাধির কাছে জামাত খানা

মসজিদ ইত্যাদি নির্মাণ করেন। সিরি প্রাসাদের কাছে তিনি হাউস-ই-আলাই নামে একটি বিশাল জলাশয় নির্মাণ করেন। জামাত খানা মসজিদে পুরোপুরি ইসলামী স্থাপত্যরীতি অনুসরণ করা হয়েছে (the earliest example of a mosque in India built wholly in conformity with Islamic ideas.)।

তুঘলকদের স্থাপত্য রীতি খুব সাধারণ, অলংকরণ বর্জিত এবং ইসলামী রীতি অনুসারী। কুতুবমিনারের পাশে গিয়াসউদ্দিন তুঘলক তুঘলকাবাদ শহর নির্মাণ করেন। গিয়াসউদ্দিনের নিজের সমাধি হলো নতুন স্থাপত্য রীতির নিদর্শন। ইবন বতুতা লিখেছেন যে সোনালি রঙের ইট দিয়ে এই তুঘলকাবাদ শহর নির্মিত হয়। সূর্য উঠলে এর দিকে তাকানো যেত না (it was constructed of golden bricks which, when the sun rose, shone so dazzlingly that no one could gaze at it steadily.)। মহম্মদ বিন তুঘলক দিল্লিতে জাহানপানা নামে নতুন শহর বানিয়েছিলেন। আদিলাবাদের দুর্গ এবং দৌলতাবাদের দুর্গ ও প্রাসাদগুলি তিনি নির্মাণ করেন। ফিরুজ তুঘলক হলেন সুলতানদের মধ্যে সবচেয়ে বড় নির্মাতা। তিনি শহর, দুর্গ, প্রাসাদ, মসজিদ, স্মৃতিসৌধ ও অন্যান্য অট্টালিকা নির্মাণ করেন। ফিরুজাবাদ নামে দিল্লিতে তিনি শহর নির্মাণ করেন, এই শহরের মধ্যে কোটলা ফিরুজশাহ ছিল তাঁর প্রাসাদ। তিনি কয়েকটি কলেজ ও নিজের সমাধি নির্মাণ করেন। তাঁর আমলে কালান মসজিদ, খিরকি মসজিদ ইত্যাদি নির্মিত হয়। তাঁর সময়ে স্মৃতিসৌধ নির্মাণের যে শৈলী গড়ে ওঠে তা দুশো বছর স্থায়ী হয়েছিল। 'বাত্তের' ও 'চাজ্জা' শৈলী অনুসরণ করা হয়, সম্ভবত এই স্থাপত্যরীতি ভারতে তৈরি হয়েছিল। নাসিরুদ্দিন মাহমুদ তুঘলক কবীরউদ্দিন আউলিয়ার সমাধির ওপর একটি সৌধ নির্মাণ করে দেন।

সৈয়দ সুলতানরা খিজিরাবাদ ও মুবারকাবাদ নামে দুটি শহর নির্মাণ করেন। এযুগে কয়েকটি সমাধিসৌধ নির্মিত হয়। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো মুবারক শাহ্ সৈয়দ, মুহম্মদ শাহ্ সৈয়দ ও সিকান্দর লোদির স্মৃতিসৌধ। সিকান্দর লোদির প্রধানমন্ত্রী মথকি মসজিদ নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। মার্শাল লিখেছেন যে লোদি স্থাপত্যের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তার নিদর্শন আছে এই মসজিদে (the mosque epitomises in itself all that is best in the architecture of the Lodis.)। ইসলামী স্থাপত্যরীতির সুষমামণ্ডিত সৃষ্টির এটি হলো একটি নিদর্শন। সুলতানি আমলে যেসব স্থাপত্য নির্ম্রিত হয় তার বেশিরভাগ ধ্বংস হয়ে গেছে। যেগুলি টিকে আছে আলাই দরওয়াজা ও কুতুবমিনার হলো তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শেরশাহ্ দুটি মসজিদ নির্মাণ করেন—জামালি ও কিলা-ই-কুহনা, সাসারামে তাঁর সমাধি হলো মুসলিম স্থাপত্যের এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তিনি মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে যে নতুন রীতির প্রবর্তন করেন তা মুঘল আমলে অনুসৃত হয়।

দিল্লির স্থাপত্যরীতি ও শৈলীর প্রভাব পড়েছিল প্রদেশগুলির ওপর। কেন্দ্রীয় রীতির সঙ্গে মিলিয়ে স্থানীয় আঙ্গিক ব্যবহার করে এই স্থাপত্যগুলি গড়ে তোলা হয়। এজন্য এদের স্বাতন্ত্র্য ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। বাংলা, জৌনপুর, মালব, গুজরাট, দাক্ষিণাত্য, রাজপুতনা ও বিজয়নরে সুলতানি যুগে প্রাদেশিক স্বতন্ত্র শিল্পরীতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রাদেশির স্থাপত্য শৈলীর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল বাংলার স্থাপত্য রীতি। সুলতানি যুগে বাংলা সমৃদ্ধিশালী, ইলিয়াস বংশীয় শাসক সিকান্দর শাহ নির্মাণ করেন বিখ্যাত আদিনা মসজিদ, হুসেন শাহ নির্মাণ করেন ছোট সোনা মসজিদ এবং নসরত শাহ·বড় সোনা মসজিদ। আরো অনেক সৌধ ও মসজিদ এযুগের বাংলায় নির্মিত হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জালালুদ্দিনের একলাখি সমাধি ও কদম রসুল। বাংলায় পাথর পাওয়া যেত না, এজন্য এখানকার কারিগররা ইট ব্যবহার করেছেন, মশলা হিসেবে ব্যবহার করেছেন চুন ও সুরকি। এজন্য দিল্লি স্থাপত্যের মত এগুলি তেমন আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেনি (Islamic arclitecture of Bengal is not a style of building of a very impressive kind)।[২] জৌনপুরকে কেন্দ্র করে স্বাধীন সুলতানি গড়ে উঠলে সেখানেও নিজস্ব স্থাপত্য রীতির আবির্ভাব হয়। ইব্রাহিম সাহ শর্কি অতল মসজিদ নির্মাণ করেন যা হল জৌনপুর রীতির বড় উদাহরণ। হুসেন শাহ শর্কি নির্মাণ করেন বৃহৎ আয়তনের জামি মসজিদ।

মালবের সুলতানরা দিল্লির রীতিকে প্রধানত অনুসরণ করলেও তাদের নিজস্ব শৈলী তৈরি হয়েছিল। মাণ্ডুতে তাদের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য কীতিগুলি নির্মিত হয়। এর সমকালীন নাম ছিল আনন্দনগরী (city of joy)। মাণ্ডুর জামি মসজিদের আয়তন বিশাল, এর নির্মাতা হলেন সুলতান মাহমুদ খলজি। মালবের সুলতানরা মাদ্রাসা, প্রাসাদ ও দুর্গ বানিয়েছিলেন তাদের নিজস্ব রীতিতে। মাণ্ডুতে তৈরি হয়েছিল বাজবাহাদুর ও রূপমতীর মহল। গুজরাট হিন্দু ও মুসলিম রীতির অপূর্ব মিশ্রণ লক্ষ করা যায়। ক্যাম্বে তৈরি হয় জামি মসজিদ, ঢোলকাতে এর অনুকরণে আরো একটি মসজিদ বানানো হয়। আধুনিক আমেদাবাদের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম আহম্মদ শাহ অনেক স্থাপত্যকীর্তি দিয়ে রাজধানীকে সাজিয়েছিলেন। ফিরিস্তার মতে, আমেদাবাদ হল হিন্দুস্তান তথা বিশ্বের সেরা শহর (the handsomest city in Hindustan and perhaps in the whole World)। এর অন্য স্থাপত্য কীর্তির মধ্যে রয়েছে তিন দরওয়াজা। দাক্ষিণাত্যে বাহমনি সুলতানরা গুলবর্গা ও বিদরে এবং বিজয়নগরের রাজারা বিজয়নগরের অট্টালিকা, প্রাসাদ, দুর্গ ও মসজিদ বানিয়ে শহরগুলিকে সুসজ্জিত করেন।

২. আর. সি. মজুমদার, *দিল্লি সুলতানাত*, পৃ. ৬৯৭।

এযুগে রাজপুতনা একটি স্থাপত্য কীর্তি স্তম্ভ অনুসরণ করে চলেছিল। চিতোর দুর্গে রানা কুম্ভের কীর্তি স্তম্ভ রাজপুত রীতির এক উজ্জ্বল নিদর্শন। রানা কুম্ভ স্থাপত্যের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি কীর্তি স্তম্ভ ছাড়াও যোধপুরে নির্মাণ করেন চৌমুখ মন্দির যা অতীব সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন। বিদেশীরা বিজয়নগর রাজ্যের যে বর্ণনা রেখে গেছেন তাতে দেখা যায় রাজারা স্থাপত্য ও শিল্পের অনুরাগী ছিলেন। পর্তুগিজ ডমিংগো পেজ বলেছেন যে 'শহরটি অত্যন্ত সুন্দর এবং রোমের মত বিশাল (as large as Rome and very beautiful to look at)। রাজার প্রাসাদটি ছিল অনেকখানি জায়গা জুড়ে। তাদের অন্য স্থাপত্য নিদর্শন হল বিশাল বিট্টলস্বামী মন্দির। বাহমনি সুলতানরা নির্মাণকার্যে পিছিয়ে ছিলেন না, বিদেশী উপাদান নিয়ে তারা অনেক অট্টালিকা, মসজিদ ও মাদ্রাসা বানিয়েছিলেন। বাহমনি রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী মাহমুদ গাওয়ান নির্মাণ কাজকে এগিয়ে নিয়ে যান এবং উন্নতমানের সৌধ নির্মাণ করেন। নিঃসন্দেহে বলা যায় কেন্দ্রীয় স্থাপত্য শৈলী ও আঙ্গিকের পাশাপাশি সারা দেশজুড়ে স্থানীয় রীতির সংমিশ্রণে প্রাদেশিক স্থাপত্য রীতি গড়ে উঠেছিল। এদের গঠন, ভাব, কল্পনা এবং শৈলী ও আঙ্গিকে নিজস্বত্ব ছিল। সুলতানি যুগে স্থাপত্য রীতির পাশাপাশি চিত্ররীতিরও বিকাশ ঘটেছিল। চিত্রের ধরন পাল্টেছে, দেবদেবীর মূর্তি ছিল দেবমন্দিরে, মুসলিম মসজিদে পাখি, ফুল, নৈসর্গ দৃশ্য এবং কোরানের বাণী নিয়ে চিত্রকলা তৈরি হয়েছিল। জৈন, বৌদ্ধমন্দির ও গ্রন্থে চিত্রকলার চর্চা ছিল। সুলতানি যুগে চিত্রকলার চর্চা একেবারে বন্ধ হয়েছিল এই অভিমত ঠিক নয়।

দশম অধ্যায়

পূর্ব ভারতে বৈষ্ণব আন্দোলন, ওড়িশায় জগন্নাথ মতবাদ, মহারাষ্ট্রে বারাকরী আন্দোলন ও বিঠোবা মতবাদ

পূর্ব ভারতে বৈষ্ণব আন্দোলন ঃ চৈতন্যদেব

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগে থেকে বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্ম ছিল। বাংলাদেশে বৈষ্ণব আন্দোলনের মধ্যে দুটি ধারার মিলন ঘটেছিল, একটি হলো বৈষ্ণবীয় ধারা, অন্যটি হলো বৌদ্ধ ও হিন্দু ঐতিহ্য (on the one hand there is the influence of the Vaishnava tradition and on the other the non-Vaishnava influences from Buddhist and Hindu sources.)। পালযুগ থেকে এই মিথস্ক্রিয়া শুরু হয়েছিল। বৈষ্ণবরা ভাগবত পুরাণে বর্ণিত কৃষ্ণলীলাকে তাদের ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিল, অন্যদিকে বৌদ্ধ বজ্রযানী মতবাদ ও সহজিয়া সম্প্রদায় বৈষ্ণব মতবাদের দিকে ঝুঁকেছিল। জয়দেবের *গীতগোবিন্দ* বৈষ্ণবদের অনুপ্রাণিত করেছিল, বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* ও বিদ্যাপতির পদাবলী রাধাকৃষ্ণের কাহিনীকে জনপ্রিয়তা দিয়েছিল। দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণব আন্দোলনের ঐতিহ্য ছিল, এই আন্দোলন ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদ ও জাতিভেদ বিরোধী, পূর্ব ভারতেও এই আদর্শ প্রচারিত হয়। উচ্চবর্ণের বর্ণাশ্রম ধর্মের বিরুদ্ধে বৈষ্ণব আন্দোলন হলো একটি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ।

পূর্ব ভারতে বৈষ্ণব আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ও প্রচারক হলেন চৈতন্যদেব। ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে[১] বাংলার নদীয়াতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর পিতা জগন্নাথ মিশ্র ছিলেন একজন বৈদিক ব্রাহ্মণ। নদীয়া তখন ছিল বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, শান্তিপুর ও বর্ধমান ছিল বৈষ্ণবদের বড় কেন্দ্র। ১৫০৮ খ্রিস্টাব্দে চৈতন্যদেব গয়াধামে গিয়ে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ভক্ত ঈশ্বরপুরীর কাছে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা নেন, কাটোয়ার কেশব ভারতীর কাছে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের ওপর বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের ভার দিয়ে তিনি পুরীধামে যান। সেখানে প্রসিদ্ধ অদ্বৈতবাদী বাসুদেব সার্বভৌম তাঁর ভক্তি ধর্ম গ্রহণ করেন, ওড়িশার রাজা প্রতাপরুদ্রদেব তাঁকে অতিশয় শ্রদ্ধা করতেন। এই সময় দক্ষিণ ভারত ছিল ভক্তিধর্মের প্রধান কেন্দ্র, পুরী থেকে তিনি দক্ষিণ ভারত পরিক্রমায় যান। সেখানে পরম পণ্ডিত ভক্ত রামানন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। দক্ষিণ ভারত পরিক্রমার পর তিনি পশ্চিম ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে ভক্তি ধর্ম প্রচার করতে গিয়েছিলেন। পুরীতে ফিরে তিনি বৃন্দাবন

১. কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে ১৪৮৫ খ্রিস্টাব্দে চৈতন্যদেবের জন্ম হয়।

পরিক্রমায় বেরিয়েছিলেন, নদীয়ায় গিয়ে তিনি শেষবারের মতো মায়ের সঙ্গে দেখা করেন। এরপর তিনি আর কখনও বাংলায় আসেননি, তাঁর শিষ্যরা বাংলায় তার নির্দেশিত পথে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন।

১৫১৫ খ্রিস্টাব্দে চৈতন্যদেব পুরীধামে ফিরে আসেন, ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি পুরীতে ছিলেন। এই আঠারো বছর তিনি দিব্যভাবে বিভোর হয়ে থাকতেন। ভক্তের দল তাঁকে প্রেমভক্তির গান শুনিয়ে ও কাব্য পাঠ করে তাঁর কৃষ্ণবিরহের কষ্ট দূর করার চেষ্টা করতেন। বৃন্দাবন দাস *চৈতন্যভাগবতে* এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ *চৈতন্যচরিতামৃতে* তাঁর জীবন ও কর্মের ব্যাখ্যা করেছেন। জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। চৈতন্যদেব প্রচার করেন যে শুধু কৃষ্ণনাম নিয়ে জীব মুক্তি পেতে পারে, অন্যকোনো আচার-অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। জ্ঞান ও কর্ম নয়, ভক্তিকে তিনি মুক্তির পথ বলে নির্দেশ করেন (He was unique in medieval *bhakti* history in that he was the initiator of a very broad movement which emcompassed an organized sect, a strong theological school, and a broad-based papular cult.)। তিনি পুরোহিততন্ত্র, মূর্তিপূজা ও জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা করেন। পাপী-তাপী, অস্পৃশ্য, দীন-হীন মানুষকে তিনি আশ্রয় দেন। গৌতম বুদ্ধের মতো তিনি ছিলেন করুণার প্রতিমূর্তি। সুদর্শন ও অসামান্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই মানুষ ভক্তি প্রচারে নামলে বাংলার মানুষ তাঁকে অবতার বলে গ্রহণ করেছিল। রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখছেন ঃ 'জয়দেব বর্ণিত যে অবতারবাদ ক্রমে ভারতের সর্বত্র প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, তাহা ভারতে বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি প্রধান দান বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। জয়দেব বর্ণিত রাধাকৃষ্ণ লীলাও সম্ভবত বাংলাতেই প্রথম প্রচলিত হয় এবং পরে সমগ্র ভারতে প্রসিদ্ধিলাভ করে।'

চৈতন্যদেব ও তাঁর পরিকরগণ পৌরাণিক বৈষ্ণব ধর্মের কথা বলেননি, তাঁরা ভক্তির মতাদর্শের সঙ্গে ভাগবত পুরাণে বর্ণিত কৃষ্ণলীলার মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। চৈতন্যদেবের নেতৃত্বে নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে প্রভাবশালী বৈষ্ণবগোষ্ঠী গড়ে তোলা হয়। এই গোষ্ঠীর মধ্যে জাতবিচার ছিল না। সম্ভবত চৈতন্যদেব মহান্ত ও কীর্তন গায়কদের সংগঠিত করেন। 'নিরবধি করে প্রভু নাম সংকীর্তন' তিনি ঘরে ঘরে কৃষ্ণনাম প্রচারের ব্যবস্থা করেন। আগে পাষণ্ডীদের ভয়ে বদ্ধ গৃহে কীর্তন চলত। চৈতন্যদেব বিশাল শোভাযাত্রা সহ নগর কীর্তন পরিচালনা করেন, তাতেও জাত বিচারের কোনো প্রশ্ন ছিল না। উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ চৈতন্যদেব স্বর্ণকার, মালাকার, শঙ্খকার, গোয়ালা প্রভৃতি শূদ্র ও পেশাদার মানুষদের সঙ্গেও ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করেন। চৈতন্যদেব ও তাঁর অনুচররা প্রচলিত লোকধর্মের বিরোধিতা করেননি। বৃন্দাবন

দাস জানাচ্ছেন যে ধর্মরাজ, যম, শংকর, গণেশ, ইন্দ্র ও ব্রহ্মদৈত্য সংকীর্তন শুনে তিনি প্রীত হন। নবদ্বীপের দুই কুক্রিয়াসক্ত প্রভাবশালী ব্রাহ্মণ জগাই ও মাধাইকে উদ্ধার করে তিনি ভক্তিমার্গের পথ দেখিয়েছিলেন। বিশাল শোভাযাত্রা ও নগর সংকীর্তনের ব্যবস্থা করে তিনি কীর্তন বিরোধী নবদ্বীপের কাজীকে দমন করেন। চৈতন্যদেবের প্রচারের মাধ্যম ছিল বাংলা ভাষা। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে চণ্ডাল ও মুসলমানরা ছিল। তিনি ঘোষণা করেন হরিভক্ত চণ্ডাল হরিভক্তিহীন ব্রাহ্মণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ (চণ্ডাল চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ বলে, বিপ্র বিপ্র নহে যদি অসৎ পথে চলে)। তিনি নারীজাতিকে তাঁর আন্দোলনে অন্তর্ভুক্ত করেন, কৃষ্ণনাম সংকীর্তনে তাদের কোনো বাধা ছিল না। অধ্যাপক হিতেশরঞ্জন সান্যাল জানিয়েছেন যে 'শ্রীচৈতন্যদেবের নেতৃত্বে বঙ্গদেশে যে ভক্তি আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল তাতে সমাজের নিষ্পেষিত অংশের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটানোর প্রয়াস স্বীকৃতি পেয়েছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণববাদ সমাজের নিম্নস্তরে যেসব মানুষ ছিল বিশেষ করে যারা সামাজিক উন্নতি ও সচলতার প্রত্যাশা করত, তাদের কাছে জনপ্রিয় হয়েছিল।'

স্যার যদুনাথ লিখেছেন যে এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে চৈতন্যদেব পূর্বভারতে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করে অধঃপতিত হিন্দুসমাজকে রক্ষা করেন। তাঁর প্রভাবে নিম্নবর্ণের নির্যাতিত, অবহেলিত, লাঞ্ছিত মানুষ মানসিক আশ্রয় পেয়েছিল। তিনি পূর্ব ভারতে এক সমাজ বিপ্লব ঘটিয়ে দেন, আচণ্ডাল সকলে তাঁর ভক্তিধর্মে স্থান পেয়েছিল। শাস্ত্রপাঠ, যাগযজ্ঞ ও পুরোহিততন্ত্র জীবের মুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় নয়, শুধু কৃষ্ণনাম জীবকে মুক্তি দিতে পারে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তিনি সকলকে কৃষ্ণপ্রেমে অনুপ্রাণিত করেন। পূর্ব ভারতে বৈষ্ণব আন্দোলনের মূল সুরটি ছিল মানবতাবাদী। সব মানুষের ঐক্য ও সমতা প্রচার করা হয়, প্রেম, করুণা, আনন্দ ও সৌন্দর্যের ওপর জোর দেওয়া হয়। চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পর বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী—সনাতন, রূপ, জীব, গোপালভট্ট, রঘুনাথ দাস ও রঘুনাথ ভট্ট—গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক ভিত্তি নির্মাণ করে দেন। এরা চৈতন্যদেবের রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন, এরা বৈষ্ণবধর্মকে গৌরব ও মর্যাদা দেন। বাংলায় বৈষ্ণব আন্দোলনের ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে বিশাল সাহিত্য গড়ে উঠেছিল। বর্ণাশ্রম ধর্মের কঠোরতা হ্রাস পেয়েছিল, পারিবারিক জীবনে পবিত্রতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়, মহিলাদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তাদের সামাজিক অবস্থানের উন্নতি ঘটে। মানবতাবাদ ও সহিষ্ণুতার প্রসার ঘটে, আচার-অনুষ্ঠান, তীর্থ ভ্রমণ, উপবাস ইত্যাদি অনেকখানি গুরুত্ব হারিয়েছিল। জ্ঞানমার্গ নয়, ভক্তি ও প্রেম প্রাধান্য লাভ করেছিল। ঈশ্বরের বহুত্ববাদী ধারণা ধাক্কা খেয়েছিল। সন্দেহ নেই জাতি চিন্তা ও কর্মে উন্নততর স্তরে পৌঁছেছিল। জর্ডেনস জানাচ্ছেন যে চৈতন্যের ভক্তি আন্দোলন সমগ্র বাঙালি জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

বাঙালি তার নিজ সত্তায় স্থিত হয়, কবি ও সংস্কারকরা এথেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছিল। কেশবচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এই ভাবধারা থেকে মুক্ত ছিলেন না (The Chaitanya movement had a great inpact on Bengali life as a whole. It gave it a special identity which persisted even through periods of stagnancy, and provided time and again new inspiration to its religious reformers and poets. Keshab Chandra Sen, Bankim Chandra Chatterjee and Rabindranath Tagore can not be properly understood without reference to that tradition.)।[২]

গুজরাটে নরসিংহ মেহতা, রাজস্থানে মীরা ও পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে সুরদাস ভক্তিধর্ম ও কৃষ্ণপ্রেম প্রচার করেন। এইসময় পূর্ব ভারতের আর একজন শ্রেষ্ঠ ভক্তি প্রচারক হলেন শংকরদেব। আসামের নওগাঁ জেলার ভুঁইয়া পরিবারের সন্তান শংকরদেব কৃষ্ণভক্তি প্রচার করেন। তিনি শুধু ভক্ত সাধক ছিলেন না, কাব্য ও নাটক রচনায় তিনি সমান দক্ষ ছিলেন। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে অসমিয়া-ব্রজবুলি মিশ্রিত ভাষায় তিনি যে পৌরাণিক নাটকগুলি রচনা করেন সেগুলি মঞ্চে অভিনীত হতো। নাটকের মাধ্যমেও তিনি তাঁর ভক্তিধর্ম প্রচার করেন। তাঁর প্রচারিত ভক্তিধর্ম 'একশরণ' ধর্ম নামে পরিচিতি লাভ করে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় তার এই বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদী ধর্ম এবং নিষ্কাম ভক্তির আদর্শ জনপ্রিয় হয়েছিল। নানকের মতো তিনিও জাতিভেদ প্রথা ও ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে নীরবতা পালন করেন।

পূর্ব ভারতে ভক্তি আন্দোলনের মূল সুরটি ছিল মানবতাবাদী, সব মানুষের সমতা ও ঐক্য প্রচার করা হয়। প্রেম, করুণা, আনন্দ ও সৌন্দর্যের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা অসাম্প্রদায়িক ছিলেন, জাতিভেদ ব্যবস্থাকে আক্রমণ করেছিলেন। এঁদের প্রচারের ফলে জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদ হয়নি তবে লাঞ্ছিত, নিপীড়িত নিম্নবর্ণের মানুষ সামাজিক স্বীকৃতি পেয়েছিল। চৈতন্য, শংকরদেব, মীরা, সুরদাস, তুলসীদাস এঁদের স্বীকৃতি দেন, ভক্তদের মুক্তির আশ্বাস দেন। ভক্ত কবি লিখছেন ঃ 'আমার জাত নিচু, আমার পেশা ও কাজ নিচু, এই পতিত অবস্থা থেকে চামার রবিদাসকে ঈশ্বর উচ্চস্থানে বসিয়েছেন।'[৩] পূর্ব ভারতের সুফি সন্তরাও ঠিক এই মানবতাবাদী আদর্শ প্রচার করেন। পঞ্চদশ শতকে বিখ্যাত আরব দার্শনিক ইবন-ই-আরাবির একেশ্বরবাদের

২. জে. টি. এফ. জর্ডেনস, *মিডাইভ্যাল হিন্দু ডিভোসানালিজম,* ব্যাসাম সম্পাদিত, *এ কালচারাল হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া,* পৃ. ২৭৪।

৩. 'My caste is low, my deeds are low, and lowly is my profession, from this low position, God has raised me high, says Rabidas the Chamar.' সতীশচন্দ্র, *মিডাইভ্যাল ইন্ডিয়া,* ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৬।

ধারণা ভারতে পৌঁছেছিল। তিনি প্রচার করেন যে সব প্রাণী এক, সব কিছুতেই ঈশ্বরের প্রকাশ ঘটে। রক্ষণশীল উলেমারা তাঁর এই তত্ত্বের তীব্র বিরোধিতা করেন, তাঁর অনুগামীদের ওপর উৎপীড়ন হয়েছিল। তিনি আরও প্রচার করেন যে সব ধর্ম হল প্রায় এক রকমের (different religions were identical)। আরাবির মানবতাবাদী ঐক্যের ধারণা *তৌহিক* নামে পরিচিত (doctrine of unity of Being)। আরাবির এই ঐক্যের তত্ত্ব ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের সুফিদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছিল। হিন্দু যোগী ও সন্তদের সঙ্গে সুফিদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ভারতীয় সুফিরা সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষা শেখেন, দাউদ মুল্লা ও মালিক মুহম্মদ জায়সি হিন্দিতে গ্রন্থ লেখেন। বৈষ্ণবদের গান ও পদ সুফিদের প্রভাবিত করেছিল। সুফি আবদুল ওয়াহিদ বিলগ্রামী *হাকাইক-ই-হিন্দি* গ্রন্থে মরমীয়া ভাষায় কৃষ্ণতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ভক্তি প্রচারক ও সুফি সন্তরা এমন একটি সমন্বয়ী পরিবেশ গড়ে তোলেন যেখানে বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ পরস্পরকে বোঝার চেষ্টা করত। সমন্বয়বাদী সংস্কৃতির সূচনা হয়েছিল।

শংকরদেব ও আসামের বৈষ্ণব আন্দোলন

দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে আসামে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম, সহজিয়া ও নাথধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাংলা থেকে এইসব ধর্মাবলম্বীরা আসামে প্রবেশ করেছিল। আসাম তান্ত্রিক ধর্মের একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়, এই ধর্মের সঙ্গে যুক্ত সব অনাচার এখানে লক্ষ করা যায়। কামাখ্যা ছিল তান্ত্রিক ধর্মের একটি বড় কেন্দ্র। আসামে বৈষ্ণব ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রচারক হলেন শংকরদেব। তাঁর পিতার নাম কুসুমবর, মাতার নাম সত্যসন্ধা, তাঁর জন্ম তারিখ নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি মারা যান। অল্প বয়সে শংকরদেব তাঁর পিতামাতাকে হারিয়ে পিতামহ ও পিতামহীর কাছে পালিত হন। অল্প বয়সে তিনি কবিতা ও গান রচনা করেন, ছবি আঁকতে শেখেন। অল্প বয়সে তিনি নওগাঁ জেলায় চলে আসেন, বিবাহ করেন, পত্নী বিয়োগের পর তিনি তীর্থ দর্শনে বেরিয়ে পড়েন। গয়া, কাশী, পুরী, বৃন্দাবন, মথুরা, কুরুক্ষেত্র, বদরিকাশ্রম, বরাহক্ষেত্র, পুষ্কর, দ্বারকা ও রামেশ্বরমে তিনি গিয়েছিলেন। তিনি দেখেছিলেন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বৈষ্ণবধর্ম মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছে কীর্তনের মাধ্যমে। বৃন্দাবনে তিনি শুনেছিলেন জয়দেব ও বিদ্যাপতির পদাবলী। উত্তর ভারতে তিনি বৈষ্ণবদের রামায়ত শাখার সঙ্গে পরিচিত হন, পুরীতে বৈষ্ণব গুরু চৈতন্যদেবের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল।

আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধে শংকরদেব দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহণ করেন, কিন্তু হৃদয়ে অশান্তি রয়ে যায়। এই সময় জগদীশ মিশ্র নামে এক পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁর কাছে ভগবৎ পুরাণ ব্যাখ্যা করেন। শংকরদেব এই ঘটনাটিকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ

বলে গ্রহণ করেন। তাঁর পারিবারিক শাক্ত ঐতিহ্য থেকে সরে এসে তিনি ভাগবতের কৃষ্ণলীলা কামরূপি ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। তাঁর এই পদগুলি গান করা হতো। তাঁর রচিত কীর্তনের মধুর ভাব ও ভাষা জনগণকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। পূর্ব ভারতে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা ছিল। তিনি আসামের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে গিয়ে বসতি গড়ে তোলেন, শেষপর্যন্ত মাজুলিতে তিনি আশ্রয় নেন। আসামে সাধারণ মানুষের ধর্ম ছিল হিন্দুধর্ম, এর ওপর তান্ত্রিক বৌদ্ধ মতবাদের প্রভাব পড়েছিল। শংকরদেব কাঠের কৃষ্ণমূর্তি গড়িয়ে তাঁর প্রার্থনা ঘরে স্থাপন করেন, তাঁর ধর্মমতে প্রবেশের নাম দেন শরণ। বৌদ্ধধর্মের অনুকরণে তাঁর তিন শরণ হলো নামশরণ, গুরুশরণ ও ভক্তশরণ। তাঁর প্রচারিত ধর্মের নাম হয় একশরণ ধর্ম, যেখানে কীর্তন হতো, প্রার্থনা হতো সেই স্থানের নাম হয় নামঘর।

শংকরদেবের প্রচারিত ধর্মমত জনপ্রিয় হয়েছিল। গয়াপানি, শতানন্দ ও মাধবদেব তাঁর ধর্ম প্রচার করেন। রাজদরবারের সঙ্গে তাঁর পরিবারের বিরোধ হলে তিনি বরপোতাতে এসে আশ্রম স্থাপন করেন। ভাগবতের অনুবাদ, গান লেখা, নাটক রচনা ও ছোট মহাকাব্য রচনা করে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। আসামের জনগণ তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট হন। অতিসহজ ও সরলভাবে তিনি গূঢ় দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারতেন। মুসলমান, গারো, ভুটিয়া, মিকির সকলে তাঁর নামঘরে স্থান পেত। নিম্নবর্গের অনেক মানুষ তাঁর নামঘরে পৌরোহিত্য করতেন। শংকরদেব তাঁর নামঘর থেকে মূর্তি সরিয়ে দিয়ে কোনো ধর্মগ্রন্থ স্থাপন করে প্রার্থনার রীতি চালু করেন। শংকরদেব ঐতিহ্য বিরোধী এই ব্যবস্থা করে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থার বিরোধিতা করেন। ব্রাহ্মণরা কুচবিহারের রাজা নরনারায়ণের কাছে শংকরদেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। রাজা শংকরদেবের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে কুচবিহারে আশ্রম খোলার অনুরোধ করেন, রাজদরবারে তিনি সম্মান লাভ করেন। তিনি দ্বিতীয়বার তীর্থদর্শন সেরে এসে রাম-সীতার বিবাহ নিয়ে নাটক লেখেন। অল্পকাল পরে তিনি মারা যান।

তাঁর ধর্মমত ব্যাখ্যার জন্য শংকরদেব ব্রহ্মসূত্র বা ঐ ধরনের গ্রন্থের ওপর ভাষ্য রচনা করেননি। গান, সনেট, নাটক এবং ভাগবতের অনুবাদে তাঁর চিন্তাভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি কামরূপি ভাষায় মার্কণ্ডেয় পুরাণের রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী এবং ভাগবত পুরাণের পাঁচটি অধ্যায়ের অনুবাদ করেন। *ভক্তিপ্রদীপ* নামে গ্রন্থ লিখে তিনি ভক্তিধর্ম ব্যাখ্যা করেন। বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে ভক্তিধর্ম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে তিনি সংস্কৃতে *ভক্তি রত্নাকর* নামে গ্রন্থ লেখেন। মাধব সম্প্রদায়ের বিষ্ণুপুরীর ভক্তিরত্নাবলী গ্রন্থ দ্বারা তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হন। তাঁর শিষ্য মাধবদেব

এই গ্রন্থখানি কামরূপি ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি ভাগবত অনুসরণ করে এমন অনবদ্য কীর্তন রচনা করেন যা জনগণের কাছে আদৃত হয়। শংকরদেব ছখানি একাংক নাটক লিখেছিলেন (আনকিয়া নাট), এর মধ্যে পাঁচখানি কৃষ্ণের জীবনকাহিনী নিয়ে লেখা। তাঁর অনেকগুলি গানের মধ্যে উচ্চস্তরের দর্শন আছে, এগুলি কৃষ্ণ ও রামকে নিয়ে লেখা। কামরূপি ভাষায় এগুলির নাম হলো বরগীত (মহান সঙ্গীত)। গুরুর নির্দেশে মাধবদেব নামঘোষা নামে ভক্তিধর্মের ওপর গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থখানি ভক্তিধর্মের সার নিয়ে লেখা হয়, এই গ্রন্থে একহাজার গান আছে, এজন্য এর নাম হলো *হাজারি ঘোষা*।

শংকরদেবের ভক্তিদর্শনের ভিত্তি হলো ভাগবত ও ভগবত গীতা। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে মিলন হলো ভক্তিধর্মের মূলকথা। কর্ম বা জ্ঞান নয়, শুধু ভক্তি দিয়ে ঈশ্বর লাভ হয়। শংকরের অদ্বৈত বেদান্ত বা সাংখ্যের অজ্ঞেয়বাদ এই ধর্মে স্থান পায়নি। শংকরদেব তাঁর ভক্তি রত্নাকরে বলেছেন যে, জীব ও জগৎ ব্রহ্ম থেকে স্বতন্ত্র নয় (Jiva and Jagat are by no means different from Brahman.)। অজ্ঞানতা থেকে এই স্বাতন্ত্র্যের ধারণা তৈরি হয়। ঈশ্বর সব কিছুতে, তার সৃষ্টির প্রতিটি ক্ষেত্রে বিরাজমান, নাম ও রূপেই যা পার্থক্য, আসলে কোনো পার্থক্য নেই। বরগীতে শংকরদেব তাঁর তত্ত্বকে আরো বিশদ করে ব্যাখ্যা করেছেন। মায়ার জন্য মানুষ বুঝতে পারে না স্থাবর, অস্থাবর, সচল, অচল সব কিছুতে ঈশ্বর আছেন। তিনি বলেছেন, 'হে ঈশ্বর আমরা তোমারই অংশ' (We are, Oh Lord, thy parts)। গীতার দর্শনের সঙ্গে তার চিন্তার মিল আছে। সনাতন ব্রহ্মের নাম নিয়ে শংকরদেব তাঁর কীর্তন শুরু করতেন। তিনি রূপ পরিগ্রহ করে অবতার হন, তিনি বাসুদেব, পরমেশ্বর, তিনি আত্মা ও বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা।

সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষতত্ত্ব উত্থাপন করলেও শংকরদেব পরমেশ্বরকে প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রকৃতি পরমেশ্বরে লয় প্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি ক্ষর ও অক্ষর ধারণার কথা বলেছেন, ক্ষর হলো জীবাত্মা, অক্ষর পরমাত্মা। পরমাত্মা সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা। মাধবদেব নামঘোষাতে এই তত্ত্ব আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। হরি হলেন পুরুষোত্তম, তিনি ক্ষর ও অক্ষরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এই পুরুষোত্তম হলেন বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ, কলিযুগে নামকীর্তন হলো কৃষ্ণ আরাধনার শ্রেষ্ঠ উপায়। গীতার যিনি পুরুষোত্তম, ভাগবতে তিনি মহাপুরুষ। শংকরদেবের প্রচারিত ধর্মের অন্য নাম হলো মহাপুরুষিয়া ধর্ম, অন্য নাম নামধর্ম। ভক্তিধর্মের মন্ত্র হলো 'হরে কৃষ্ণ, হরে রাম'। শংকরদেব ও মাধবদেবের শিষ্যরা তাঁদের মহাপুরুষ বলে মনে করতেন। ঈশ্বর হলেন অব্যক্ত ও মূর্তিশূন্য, নামের মাধ্যমে চিত্তশুদ্ধি হয়, তার কাছে পৌঁছানো যায়। গীতায় ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন, 'আমাকে স্মরণ কর', শংকরদেব বলেছেন 'এক শরণের' কথা।

এজন্য তাঁর ধর্মমতের অন্য নাম 'এক শরণিয়া ধর্ম'। বৈষ্ণব মতবাদে বলা হয়েছে ভক্ত ভগবানের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করবেন। এই সম্পর্ক পাঁচ রকমের হতে পারে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। শংকরদেব দাস্য ভাবের ওপর জোর দেন। মাধবদেব বলেছেন যে ভক্ত তার মুক্তির কথাও ভাববেন না। শংকরদেব চৈতন্যদেব প্রচারিত মধুর ভাবের (রাধা ভাব) ওপর জোর দেননি।

শংকরদেবের মৃত্যুর পর তাঁর এক শরণ ধর্মমতের বিস্তার ঘটেছিল। তাঁর ব্রাহ্মণ শিষ্য দামোদরদেব একটি পৃথক সম্প্রদায় গঠন করেন। তিনি বিষ্ণুমূর্তি স্থাপন করে পূজার্চনার ব্যবস্থা করেন, গুরুর নির্দেশিত আচার-আচরণ থেকে সরে যান। মাধবদেব কীর্তনঘর স্থাপন করে তাঁর গুরুর নির্দেশ অনুযায়ী চলতে থাকেন। বংশীগোপালদেব নামে শংকরদেবের আর একজন শিষ্য উচ্চ আসামে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। কলাবাড়ি ও কুরুয়াবহিতে তিনি আশ্রম গড়ে তোলেন, অন্যান্য বৈষ্ণব প্রচারকগণ উচ্চ আসামে গিয়ে বৈষ্ণব মতবাদ প্রসারিত করেন। সাধারণ মানুষ শুধু নয়, আসামের অহোম রাজা জয়ধ্বজ সিংহ বৈষ্ণব মতবাদে দীক্ষা নেন। বৈষ্ণব গুরুরা সত্র স্থাপন করে তাঁদের ধর্মমত প্রচার করতেন, রাজা এঁদের অনুদান দেন।

শংকরদেবের প্রচারিত ধর্ম আন্দোলন ঐক্যবদ্ধ ছিল না। অনেকগুলি সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল, বিভেদের কারণ হলো বিভিন্ন গোষ্ঠীর আচার-আচরণ। মূলনীতির ক্ষেত্রে তেমন পার্থক্য ছিল না, শংকরদেবের শাখা পুরুষ সংহতি নামে পরিচিত হয়। দামোদরদেবের শাখা ব্রহ্ম সংহতি নামে খ্যাত হয় (বামুনিয়া শাখা)। মাধবদেবের শিষ্য গোপালদেব কাল সংহতি নামে আরও একটি শাখা স্থাপন করেন। বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ প্রবেশ করেছিল। অনিরুদ্ধদেব নিম্নবর্গের মানুষদের নিয়ে মায়ামোরা শাখা গঠন করেন। শংকরদেবের পৌত্র পুরুষোত্তম ঠাকুরের সম্প্রদায় ঠাকুরিয়া নামে পরিচিত ছিল। বৌদ্ধ তান্ত্রিক আচার-আচরণ, মায়াবিদ্যা ইত্যাদি বৈষ্ণব মতবাদের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। এধরনের আরও ছটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়েছিল, এরা সকলে শংকরদেবের দর্শনের প্রতি অনুগত ছিল। শংকরদেবের কীর্তন এবং মাধবদেবের 'নামঘোষা' ছিল তাদের ধর্মমতের প্রধান ভিত্তি। যেখানে কীর্তন হতো তার নাম হলো নামঘর (কীর্তন ঘর), ভক্তরা নামঘরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কুটির নির্মাণ করে বসবাস করত।

শংকরদেব বিবাহিত ছিলেন, তবে তাঁর প্রধান শিষ্য মাধবদেব বিবাহ করেননি। বংশীগোপালদেবও অকৃতদার ছিলেন। অনেক আশ্রমের (সত্র) গুরু কৌমার্য ব্রত পালন করতেন। সত্রের মধ্যে উদাসীন ভক্তরা অবিবাহিত থাকতেন, পরিশ্রম করে অনেকে জীবিকা অর্জন করতেন। কোনো কোনো সত্রে (আশ্রমে) ভক্তদের দায়িত্ব আশ্রম নিত। শংকরদেব মহিলাদের তাঁর ধর্মমতে দীক্ষা দিতেন না, তবে নাম গান

শোনায় কোনো বাধা ছিল না। শংকরদেবের পৌত্রবধূ কনকলতা তার স্বামীর সত্র পরিচালনা করেন। গোপালদেবের কন্যা পদ্মপ্রিয়া কয়েকখানি উচ্চস্তরের পদ লিখে খ্যাতি লাভ করেন।

ওড়িশায় জগন্নাথ মতবাদ

বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুন হলেন শূন্যবাদের প্রবর্তক। শূন্য হলো সৃষ্টির কারণ, তিনি আদি পুরুষ। ওড়িশার বৈষ্ণবরা বিশ্বাস করত যে জগন্নাথ হলেন আদি পুরুষ, তিনি অলেখ, নিরঞ্জন, নির্গুণ ও নিরাকার। বৈষ্ণবেরা জগন্নাথকে দেখলেন নির্গুণ পুরুষ হিসেবে, কোনো বিশেষণে তিনি বিশেষিত হন না। ওড়িশার ওপর মহাযানী বৌদ্ধমত ও তন্ত্রের প্রভাব পড়েছিল। পঞ্চসখা সম্প্রদায়ের কেন্দ্রবিন্দু হলেন প্রভু জগন্নাথ, এঁদের রচিত শূন্য সম্পর্কিত ভজন ওড়িশার ভক্ত সমাজে বিশেষভাবে আদৃত হয়। এঁরা মনে করেন যে জগন্নাথ হলেন বুদ্ধ, শূন্য পুরুষ ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির পরিপূর্ণ প্রকাশ। জগন্নাথ তত্ত্বের ওপর গোরক্ষনাথের সাধন পদ্ধতির প্রভাব পড়েছিল। বৌদ্ধধর্মের শূন্যবাদ, তন্ত্রের ক্রিয়াবাদ এবং যোগের কায়াসাধন সমন্বয়ী জগন্নাথ তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেছে। জগন্নাথ তত্ত্বের মধ্যে রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বও আছে, জগন্নাথ তত্ত্বের মধ্যে রামতত্ত্বকেও পাওয়া যায়। জগন্নাথের চার রূপ হলো জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শন, নীলাচল হলো প্রভুর গোলোক। ওড়িশার বৈষ্ণবেরা সর্বদা জগন্নাথদেবের মহিমা কীর্তন করেছেন। জগন্নাথ আদিতে ছিলেন শবরদের দেবতা, পরে তিনি জৈন, বৌদ্ধ, শৈব ও বৈষ্ণবদের উপাস্য দেবতা হন।

ওড়িশার মহাকবি সারলা দাস জগন্নাথকে বলেছেন বুদ্ধ ও কৃষ্ণ, মানব মুক্তির জন্য জগন্নাথের এই অভিনব রূপ। ধর্মপূজা বিধানে বলা হয়েছে যে 'নবম অবতারে হরি জগন্নাথ রূপে আবির্ভূত হন'। জগন্নাথ দাস তাকে বুদ্ধের সঙ্গে অভিন্ন বলে গণ্য করেন। অচ্যুতানন্দ দাস বলেছেন যে, জগন্নাথ বুদ্ধ ব্যতীত আর কেউ নন। ড. রাধাকৃষ্ণন মনে করেন যে পুরীর বৌদ্ধ মন্দির বৈষ্ণব মন্দিরে রূপান্তরিত হয়েছে (The transition of Buddhism into Vaishnavism may be seen in Puri, Orissa where a temple originally dedicated to Gautama Buddha is now a dwelling of Krishna in the form of Jagannath.)। পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখেছেন যে জগন্নাথ ও তাঁর অনুষ্ঠানের মধ্যে বৌদ্ধ আচার-আচরণ স্থান পেয়েছে। অনেকে মনে করেন যে সন্ধ্যাবেলায় দ্বীপ জ্বালানো, একসঙ্গে প্রসাদ খাওয়া এবং রথযাত্রায় জাতিবৈষম্যহীনতা প্রভৃতি অনুষ্ঠান বৌদ্ধধর্ম থেকে এসেছে। শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব আচার-আচরণ মিশে গিয়ে জগন্নাথ এক সমন্বয়ী দেবতা হয়েছেন। তিনি সব ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রভু। জৈনরা বলেন যে পুরীর মন্দিরের তিন মূর্তি হলো জৈন

ত্রিরত্ন—সম্যকজ্ঞান, সম্যকচরিত্র ও সম্যকদৃষ্টি। এঁরা মনে করেন যে জগন্নাথ জৈনদের আদি তীর্থঙ্কর ঋষভনাথ ছাড়া আর কেউ নন। জগন্নাথদেবের রথযাত্রা, স্নানযাত্রা, নবকলেবর ধারণ ইত্যাদি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুসরণ করা হয়। বিহারে জগন্নাথ মন্দির আছে, বাংলায় রথযাত্রা হলো এক বড় উৎসব।

পুরী হলো জগন্নাথদেবের ক্ষেত্র। পুরী ওড়িশার রাজধানী ছিল না, কিন্তু রাজশক্তি এই দেবশক্তিকে মেনে চলে। গঙ্গবংশীয় রাজা অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গ একাদশ শতকে বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণের কাজ শুরু করেন, তাঁর উত্তরাধিকারীদের আমলে এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়। এঁরা সমগ্র ওড়িশা রাজ্য জগন্নাথদেবকে উৎসর্গ করে তাঁর সামন্ত হিসেবে দেশ শাসন করতেন। মাদলাপঞ্জীতে বলা হয়েছে যে রাজা যযাতি কেশরী জগন্নাথের মন্দির নির্মাণ করেন। ওড়িশার শেষ স্বাধীন নরপতি মুকুন্দদেব বাংলার সুলতান সুলেমান কররানীর হাতে পরাস্ত হন, তাঁর সেনাপতি কালাপাহাড় জগন্নাথ মন্দির লুণ্ঠন করেন। ওড়িশার সংস্কৃতির ধারা জগন্নাথ ও জগন্নাথ ধর্মকে অনুসরণ করে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। জগন্নাথ হলেন সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের প্রতীক। বিষ্ণু, অগ্নি, নারদ ও স্কন্দপুরাণে জগন্নাথের উল্লেখ আছে। জগন্নাথ শুধু পূর্ব ভারতের দেবতা নন, উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতেও তাঁর মহিমা ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতিবছর হাজার হাজার ভক্ত প্রভু জগন্নাথকে দর্শন করার জন্য পুরীধামে যান। উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন তিনি সকলের সখা, সকলের আশ্রয়দাতা। তাঁর সম্পর্কে বহু কাহিনী, প্রবাদ ও জনশ্রুতি তৈরি হয়েছে, তিনি দীনবন্ধু, নীচ ও পাপীর উদ্ধারকর্তা, তিনি হলেন ভক্তের ভগবান। ওড়িশার অধিবাসীরা দাবি করেন যে বৈষ্ণব কবি জয়দেব হলেন ওড়িশার লোক। জগন্নাথদেবের নির্দেশে তিনি *গীতগোবিন্দ* রচনা করেন।

জগন্নাথের এক নাম হলো পতিতপাবন, তিনি দীনদয়াল, যে কেউ তার শরণ নিতে পারে। তিনি ভক্তাধীন, তাঁকে পাবার বা জয় করার শ্রেষ্ঠ উপায় হলো ভক্তি। জগন্নাথদেব চিরকালই ভক্তদের প্রতি অনুকম্পাপরায়ণ, ভক্তদের প্রতি তাঁর করুণা সর্বজনবিদিত। জনশ্রুতি, গাথায় ও গানে জগন্নাথদেবের মহিমা কীর্তন করা হয়। শুধু ওড়িয়া ভাষাতে নয়, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ভাষায় জগন্নাথদেবের মহিমা কীর্তিত হয়েছে। ভারতের পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ জগন্নাথ মতবাদে মিশে গেছে। জগন্নাথকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে কালজয়ী লোকসংস্কৃতির ধারা, নানা পালাপার্বণ, সৃষ্টি হয়েছে চিত্রকলা ও ভাস্কর্য। জগন্নাথকে ঘিরে এক বিশেষ ধরনের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছিল। মধ্যযুগে পথঘাট, যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো ছিল না। দূরদূরান্ত থেকে তীর্থযাত্রীরা জগন্নাথধামে জগন্নাথ দর্শনে আসত, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পের ক্ষেত্রে ভাব বিনিময় হতো। জগন্নাথ শুধু ওড়িশার মানুষদের প্রভাবিত করেননি, পূর্ব ভারতে তাঁর অপরিসীম প্রভাব লক্ষ করা যায়। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

লিখেছেন : 'একদা ওড়িশা ও বাংলা একই শাখার দুটি ফুলের মতো বিকশিত হয়েছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের শেষার্ধ পুরীধামে অতিবাহিত হয়েছে। ওড়িশার ধনী অভিজাত, রাজা ও দীন-দরিদ্র সকলেই তাঁকে দেবতার মতো ভক্তি করতেন। ওড়িশা ও বাংলার ভ্রাতৃত্ব বন্ধন তাঁর দ্বারাই দৃঢ়ত্ব লাভ করেছিল। জগন্নাথের পুণ্যভূমি নীলাচল বাঙালীর শ্রেষ্ঠ তীর্থ। সুতরাং বাংলার সঙ্গে ওড়িশার সম্পর্ক অনেক প্রাচীন। অনেক বাঙালী তীর্থদর্শনে গিয়ে ওড়িশায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন, কেউবা কর্মব্যপদেশে বাস্তু বেঁধেছেন। অনেক বাঙালী ওড়িশায় বসবাস করে ওড়িয়া ভাষাকে মাতৃভাষা রূপে গ্রহণ করেছেন, কেউ কেউ ওড়িয়া ভাষায় কাব্য রচনা করে ওড়িয়া সাহিত্যকে ঐশ্বর্যশালী করেছেন।'

বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ওপর জগন্নাথ মতবাদের প্রভাব পড়েছে। ওড়িশার যাজপুর হলো ধর্মঠাকুরের প্রাচীনতম তীর্থস্থানগুলির মধ্যে অন্যতম। অনেকে জগন্নাথদেব ও ধর্মঠাকুরকে অভিন্ন বলে মনে করেন। শূন্যপুরাণের আদি কবি রামাই পণ্ডিত লিখছেন : 'নবম মূর্তিতে হরি জগন্নাথ নাম ধরি জলধরতীরে কৈলা বাস।' ভারতচন্দ্র *অন্নদামঙ্গল*-এ জগন্নাথদেবের কথা উল্লেখ করেছেন। বাঙালী কবি গদাধর দাস *জগন্নাথমঙ্গল* কাব্য রচনা করেন। জগন্নাথ শুধু ব্রাহ্মণের দেবতা নন, আচণ্ডাল সকলের তাতে সমান অধিকার। তিনি বিষ্ণুর অবতার, পতিতের পাবন, পরম অহিংসক, তাঁর দুয়ারে সর্বলোক, সর্বদেশ একাকার হয়ে গেছে। জাতিভেদে জর্জরিত ভারতবর্ষে জগন্নাথ মতবাদ হলো মূর্ত প্রতিবাদ। এখানে নানকী, কবীরী, নাথপন্থী, বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব সকলে এসে মিলিত হয়েছে। ভিন্ন মতাবলম্বী সম্প্রদায়ের দেবতারাও জগন্নাথ মন্দির প্রাঙ্গণে স্থানলাভ করেন। সুদূর আসামেও জগন্নাথ মতবাদের প্রভাব পড়েছে। আসামের কাছাড়, গৌহাটি প্রভৃতি স্থানে রথযাত্রা পালন করা হয়, রেঙ্গুনে একটি জগন্নাথ মন্দির আছে। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার কাছে ধামরাইতে একটি জগন্নাথ মন্দির ছিল। জগন্নাথ তত্ত্বকে আশ্রয় করে সাধারণ মানুষ শান্তি ও আশ্রয় খুঁজেছিল। হাজার বছর ধরে এই মতবাদ হিন্দুদের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পকে সমৃদ্ধ করেছে। পূর্ব ভারতে সংস্কৃতি বিনিময়ের মাধ্যম হয়েছে জগন্নাথ মতবাদ।

মহারাষ্ট্রে বারাকরী আন্দোলন ও বিঠোবা মতবাদ

মধ্যযুগের মহারাষ্ট্রে তিনটি ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা লক্ষ করা যায়। এই তিনটি সম্প্রদায় হলো নাথ সম্প্রদায়, বারাকরী সম্প্রদায় ও মহানুভব সম্প্রদায়। নাথ সম্প্রদায়ের আদি গুরু হলেন আদিনাথ শংকর; এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ (মীননাথ)। খ্রিস্টীয় দশম শতকে এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হয়। গোরক্ষনাথ হলেন

এই সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় গুরু ও প্রচারক। সারা ভারতের সর্বত্র গোরক্ষনাথের প্রভাব পড়েছিল। এঁরা যোগ ও সাধনার পথে মুক্তির কথা বলেছিলেন। মারাঠি ভাষায় কয়েকটি কবিতা আছে যার রচয়িতা হলেন গোরক্ষনাথ। *গোরক্ষ-অমরনাথ সংবাদ*-এ মারাঠি গদ্য সাহিত্যের নমুনা পাওয়া যায়, এতে নাথ সম্প্রদায়ের দর্শন ও তত্ত্বকথা আছে। মহারাষ্ট্রে গোরক্ষনাথের শিষ্য গহিনীনাথ হলেন নাথধর্মের একজন শ্রেষ্ঠ প্রচারক। মহানুভব ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হলেন গুজরাতি চক্রধর (১২৬৩)। চক্রধর ও তাঁর প্রধান শিষ্য নাগদেবাচার্য এই ধর্মমত প্রচার করেন। এই সম্প্রদায় জাতিভেদ প্রথা বিরোধী ছিলেন, তাঁরা মূর্তি পূজায় বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু কৃষ্ণভক্তি প্রচার করেন, সন্ন্যাস গ্রহণ সব সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে উন্মুক্ত করেন।

মহারাষ্ট্রে বারাকরী ধর্মমতের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হলেন জ্ঞানেশ্বর (জ্ঞানদেব), তিনি *জ্ঞানেশ্বরী* নামে গীতার টীকা লেখেন। মারাঠি সাহিত্যে শুধু নয়, ধর্ম ব্যাখ্যায় এটি হলো এক অসাধারণ অবদান। জ্ঞানদেব (১২৭১-৯৬) হলেন মহারাষ্ট্রের ধর্মীয় আন্দোলনের কেন্দ্রস্থিত চরিত্র। পান্ধারপুরের বিঠোবার (বিষ্ণু) মন্দিরকে ঘিরে এই আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। সমগ্র মহারাষ্ট্র থেকে ভক্তরা বিঠোবার মন্দিরে পুজো দিতে যেত। জ্ঞানদেব ছিলেন একজন প্রতিভাবান সাধক। তিনি *অমৃতানুভব* নামে গ্রন্থ ও অভঙ্গ ছন্দে বহু মারাঠি কবিতা লিখে জনগণের মধ্যে ভক্তি আন্দোলন গড়ে তোলেন। বারাকরী সম্প্রদায় মনে করত বিঠোবার প্রতি ভক্তি হলো মুক্তির সোপান। নিবৃত্তিনাথ ছিলেন জ্ঞানেশ্বরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তিনি নাথধর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সম্ভবত নিবৃত্তিনাথ তাঁকে ভক্তিধর্মের দিকে আকৃষ্ট করেন, যোগসাধনায় দীক্ষা দেন। জ্ঞানেশ্বর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সোপানদেব ও ভগ্নী মুক্তাবাঈকে ভক্তি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেন। এঁরা সকলে বেদান্ত দর্শনের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, সৎ জীবনের আদর্শ স্থাপন করেন।

জ্ঞানদেবের পর মহারাষ্ট্রে বারাকরী আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ প্রচারক হলেন নামদেব (১২৭০-১৩৫০)। জ্ঞানদেব মারাঠি ভাষায় তাঁর ধর্মীয় উপদেশ প্রচার করেন। কীর্তনের মাধ্যমে ভক্ত ভগবানের চরণে ভক্তি নিবেদন করত। বারাকরী ধর্মমতের মূলতত্ত্ব হলো ভক্তির মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়া। পথ হলো নয়টি—নামকীর্তন (রাম-কৃষ্ণ-হরি-বিট্টল), পান্ধারপুরে গিয়ে বিঠোবার মন্দিরে পূজাদান, আলান্দিতে জ্ঞানদেবের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানানো, উপবাস, ব্রাহ্মণ ও অতিথিকে আপ্যায়ন, সাধুদের সেবা, মদ ও মাংস গ্রহণ না করা, হরিকীর্তন শ্রবণ এবং ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা। পান্ধারপুরে তীর্থ ভ্রমণে যেত এজন্য এই সম্প্রদায়ের নাম হয় বারাকরী সম্প্রদায়। বলা হয়েছে যে নবম শতক থেকে মহারাষ্ট্রে বারাকরী সম্প্রদায় ছিল, এই ধর্মমতের অনুগামীরা জাতিভেদ মানত না, অস্পৃশ্যতাকে আমল দেয়নি।

মহারাষ্ট্রে ভাগবত ধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রচারক হলেন নামদেব। ভাগবত ধর্মের অন্যান্য সন্ত ও প্রচারকদের অনেকে ছিলেন নিম্নবর্ণের মানুষ। নামদেব নিজে ছিলেন একজন দর্জি, গোরা ছিলেন কুম্ভকার, সেনা ছিলেন নাপিত, সংবত ছিলেন মালী, চোখা ছিলেন অন্ত্যজ, নরহরি ছিলেন স্বর্ণকার, যোগা তেলি। এঁরা ছিলেন সরল, নিরহঙ্কারী, সন্তের পবিত্র জীবনযাপন করতেন। এঁরা উচ্চ ও নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যেকার ব্যবধান ঘুচিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বেদান্ত দর্শনকে জনপ্রিয় করে তোলেন। বারাকরী সম্প্রদায়ের সন্তরা সামাজিক বৈষম্য থেকে মানুষকে মুক্ত করেন, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সেতুবন্ধন করেন। নামদেব ছিলেন একজন ভক্ত ও প্রচারক। তিনি কবিতা রচনা করে তার মাধ্যমে ধর্মীয় উপদেশ দিতেন। জনাবাঈসহ তাঁর বারোজন সঙ্গী ছিল, এঁরা সকলে মারাঠি ভাষায় কবিতা রচনা করতে পারতেন। এঁরা প্রচার করেন যে রাম ও কৃষ্ণের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, উচ্চ ও নীচ বর্ণের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। এঁরা অন্ত্যজ ও নিম্নবর্ণের মানুষের কাছে ভক্তিধর্ম প্রচার করেন। এরা সামাজিক কুপ্রথা, শিশুবিবাহ, বহুবিবাহ, সতীদাহ প্রথা ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। এঁরা বিঠোবাকে (বিষ্ণু) ইষ্টদেবতা হিসেবে গ্রহণ করেন। অভঙ্গ ছন্দে এঁরা কবিতা লিখতেন। তাঁদের ভক্তি, পবিত্র জীবন, সুমধুর কীর্তন, ধর্মীয় উপদেশ, কথকতা ইত্যাদি মহারাষ্ট্রের সামাজিক জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। বারাকরী সম্প্রদায় সন্ন্যাস গ্রহণের ওপর জোর দেয়নি, গৃহী জীবনযাপন করে ঈশ্বর সাধনার কথা বলেছিল। এই আন্দোলন মহারাষ্ট্রে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। উপাসনার জন্য মন্দির মসজিদের প্রয়োজন নেই, মানুষের হৃদয় হলো মন্দির ও মসজিদ। পরবর্তীকালে ভক্ত সাধকেরা অনেকে এধরনের কথা বলেছেন।

নামদেবের উত্তরসূরিরা হলেন একনাথ (১৫৩৩-৯১), তুকারাম (১৫৯৮-১৬৫০) ও রামদাস (১৬০৮-৮৯)। একনাথ জ্ঞানেশ্বরের গীতার প্রচার করেছিলেন, মারাঠি জনগণের মধ্যে রামায়ণ কথা প্রচার করেন। একনাথ গৃহী জীবনযাপন করেন, গ্রন্থরচনা ও ভক্তিধর্ম পালন করে তিনি জীবন অতিবাহিত করেন। ভক্তিধর্মের সাধক হিসেবে তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি লাভ করেন। তিনি ছিলেন একজন অতীন্দ্রিয়বাদী। তাঁর ভক্তিসঙ্গীত ও কীর্তন হলো মারাঠি সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। তুকারাম শুধু মহারাষ্ট্রের নয়, সমগ্র ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ ভক্তকবি। মহারাষ্ট্রের এক গ্রামে এক শস্য ব্যবসায়ী পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। পারিবারিক দুর্ঘটনা তাঁকে বৈরাগ্য ও ভক্তির পথে নিয়ে যায়। ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষে তাঁর পরিবারের অনেকে মারা যান। ভক্তিকে তিনি তাঁর জীবনের পাথেয়রূপে গ্রহণ করেন। তাঁর ভক্তিমূলক কবিতা ও গান বারাকরী তীর্থযাত্রীরা মুখে মুখে গাইত, এগুলি খুব জনপ্রিয় ছিল। দুঃখময় জীবনে তিনি ভক্তিকে আশ্রয় করেন, ভক্তির মধ্যে আশার আলো দেখতে পেতেন। প্রেমের সাধনায় ঈশ্বর

লাভ হয় বলে তিনি বিশ্বাস করতেন, তাঁর কাব্যে ও গানে অতীন্দ্রিয়বাদের প্রকাশ ঘটেছে। ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান, তিনি সর্বশক্তিমান, দুঃখে ও হতাশায় তিনি হলেন মানুষের একমাত্র সান্ত্বনা, আশ্রয়। সাধারণের বোধ্য ভাষায় তুকারাম তাঁর গান ও কবিতাগুলি লেখেন। সাধারণ মানুষের জীবন থেকে উদাহরণ দিয়ে তিনি ঈশ্বর উপলব্ধির কথা বলতেন, আত্মোপলব্ধির উপদেশ দিতেন। হিন্দুধর্মের আচার-অনুষ্ঠান, যাগযজ্ঞ থেকে সরে গিয়ে তিনি প্রেম ও ভক্তির আদর্শ প্রচার করেন, সাধারণ মানুষ অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

রামদাস গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি কৃষ্ণা নদীর তীরে আশ্রম স্থাপন করে রামভক্তি প্রচার করেন। রামদাসের উপদেশগুলি তাঁর *দশবোধ* গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থার চিত্র পাওয়া যায়। আধ্যাত্মিক বিষয় তাঁর আলোচনায় স্থান পেয়েছে। এই সাধকের শ্রেষ্ঠ অবদান হলো মারাঠা নবজাগরণের স্রষ্টা শিবাজী। ভক্তিমার্গের লোক হলেও রামদাস কর্মত্যাগ করেননি, শিষ্যদের কর্মত্যাগ করতে বলেননি। তাঁর পূর্বসূরি সাধকদের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা ছিল না, কিন্তু রামদাস নিজেকে সমাজ ও রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে নেননি। বারাকরী সম্প্রদায় ও তাঁর সন্তরা মহারাষ্ট্রে সামাজিক ও নৈতিক পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছিলেন। এম. জি. রানাডে পান্ধারপুর আন্দোলনের অবদানের কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন যে, এই আন্দোলনের ফলে সামাজিক উন্নতি হয়েছিল, নারীজাতি মর্যাদা লাভ করেছিল। জাতিভেদ প্রথা ও অস্পৃশ্যতার মতো ব্যাধি আগের মতো আর প্রাধান্য পেত না। সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে তাঁরা যে সফল হন তাতে আর সন্দেহ থাকে না। ভক্তিবাদের এই ঐতিহ্য থেকে মহারাষ্ট্রে জাতি-রাষ্ট্র স্থাপনের ইচ্ছা জেগেছিল, সংস্কারের ঐতিহ্য তৈরি হয়েছিল। সাম্প্রতিককালে পি. ভি. রানাডে একটি প্রবন্ধে বারাকরী আন্দোলনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, সন্ত কবি ও ভক্তিবাদের উদ্ভবকে তুর্কি-আফগান শাসনের বিরুদ্ধে সর্বজনীন মারাঠা প্রতিক্রিয়া বলা যায় না। ভক্তি আন্দোলন ইসলামের চেয়ে হিন্দু গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বেশি সোচ্চার ছিল। বিঠোবা ও পান্ধারপুর আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে নতুন একটি আধ্যাত্মিক ও সামাজিক বিন্যাস ঘটানো। জাতি, ধর্ম ও ভাষাগত ঐক্যের ভিত্তিতে বারাকরী আন্দোলন মারাঠা শক্তির উত্থানের সহায়ক পটভূমি তৈরি করে দিয়েছিল।

বারাকরী ঐতিহ্য, সাহিত্য ও দর্শন

মহারাষ্ট্রে অতীন্দ্রিয়বাদী সন্তধারার প্রতিষ্ঠাতা হলেন নিবৃত্তিনাথ ও জ্ঞানদেব। নাথপন্থীদের আদর্শ থেকে সন্ত মতবাদের উদ্ভব হয়, নিবৃত্তিনাথ নাথপন্থার সঙ্গে যুক্তে ছিলেন।

নামদেব, একনাথ, তুকারাম ও রামদাস সন্ত আদর্শকে প্রসারিত করেন। রামদাস ও তাঁর অনুগামীরা একটি পৃথক সম্প্রদায় গঠন করেন। এঁরা আধ্যাত্মিক সাধনার সঙ্গে রাজনীতিকে যুক্ত করেছিলেন, এঁরা ছিলেন কিছুটা উগ্র ও সংগ্রামশীল। এজন্য এই শাখা ধারাকারি নামে পরিচিত হয়। পান্ধারপুরের বিট্টল মন্দিরকে ঘিরে যে সন্তবাদী শাখা জ্ঞানদেব, নামদেব, তুকারাম ও একনাথ গড়ে তোলেন তার নাম হয় বারাকরী। এঁরা ছিলেন শান্ত, নম্র ও ভদ্র, মানুষের সমতায় বিশ্বাসী, প্রথাগত ধর্ম ও সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে এঁরা প্রচার চালিয়েছিলেন। পুরোহিত তন্ত্র, অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ প্রথার এঁরা বিরোধিতা করেন। এঁরা অনেকটা আবেগতাড়িত হয়ে ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন যার সঙ্গে বাস্তবের তেমন মিল ছিল না। অপরদিকে ধারাকারিরা ছিলেন বাস্তববাদী, যুক্তিবাদী এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাঁদের ধর্মমত গঠন করেন। এঁদের মধ্যে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির মিল ছিল। ঈশ্বর লাভ মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে এঁরা মনে করতেন (realization of God as the highest end of human life being common to both.)।

সৃষ্টি রহস্যকে কেন্দ্র করে মধ্যযুগের ভারতে অনেকগুলি অতীন্দ্রিয়বাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। এই দর্শনের উৎস হলো শংকর ও রামানুজের দর্শন। এই দর্শনের মূলকথা হলো ব্রহ্ম একমাত্র সত্য, আর সব মায়া। বিঠোবা মতবাদের উৎস হলো কর্ণাটক। জ্ঞানদেব, নামদেব, তুকারাম ও একনাথ মহারাষ্ট্রে একে জনপ্রিয় করে তোলেন। কর্ণাটকে এই মতবাদ প্রচার করেন পুরন্দর, কনক, বিজয় বিট্টল ও জগন্নাথ অন্ধ্র ও তামিল অঞ্চলের বহু সন্ত এই বিঠোবা মতবাদের অনুরাগী ছিলেন। এইদিক থেকে বিচার করে বলা যায় যে বিঠোবা মতবাদ সারা দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে চালু ছিল জ্ঞানদেব এই মতবাদের সবচেয়ে বড় প্রবক্তা ছিলেন। জনাবাঈ, গোরা, সম্বত, চোখামেলা সকলে ছিলেন বিট্টল ভক্ত। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর হলেন সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার কর্তা এরা একই ঈশ্বরের ভিন্ন রূপ মাত্র। বিট্টল হলেন বিষ্ণু, তিনি হলেন বারাকরী সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবতা। রামদাস রামকে ঘিরে স্বতন্ত্র ধারাকারি সম্প্রদায় গড়ে তোলেন।

বারাকরী সম্প্রদায়ের দর্শনের মৌল ধারণা হলো ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং সকলের পক্ষে ঈশ্বর প্রাপ্তির সম্ভাবনা (the reality of the other world and the possibility of spiritual experience for all.)। রামদাস বলেছেন প্রত্যেক সন্ত ইহজীবনে ঈশ্বর উপলব্ধি করতে পারেন, নিম্নতম, অধঃপতিত, পাপী মানুষও সন্ত হতে পারেন। বারাকরী সন্তরা এই বাণী প্রচার করেছেন। ইন্দ্রিয় সুখের মতো অতীন্দ্রিয় সুখ লাভ সম্ভব (spiritual experience is as objective as sensuous experience) মানুষ যেমন পৃথিবীকে দেখতে পায় তেমনি ঈশ্বর দর্শনও সম্ভব। মানুষ যখন সাধনার মাধ্যমে ঈশ্বরের অনুভূতি অর্জন করে তখন মন্ময়, তন্ময় ধারণা থাকে না, সব এক

হয়ে যায় (mystic experience is unitive, and transcends the subject-object relation.)। ঈশ্বর লাভ ঈশ্বরের ইচ্ছা ও গুরুর কৃপার ওপর নির্ভর করে। ঈশ্বর লাভের জন্য মানুষকে অনুভব করতে হয় যে সে তারই অংশ (Realization of the identity of individual soul with the supreme soul.)। ঈশ্বর লাভ করলেও মানুষ কিন্তু ঈশ্বরত্ব লাভ করে না, পার্থক্য রয়ে যায়। জ্ঞানদেব এধরনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

সাধনা ছাড়া ঈশ্বর লাভ হয় না, এজন্য সাধুকে পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। এই পবিত্রতা অর্জনের পথ হলো নিঃস্বার্থভাবে, আন্তরিকভাবে ঈশ্বরকে ভালোবাসা (whole-hearted and disinterested love for God.)। যাঁরা ঈশ্বরের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেন ঈশ্বর তাঁকে দয়া করেন, ঈশ্বর তাঁকে দর্শন দেন। ঈশ্বর লাভের পর সন্তের কাজ শেষ হয়ে যায় না, তাকে সমাজের উন্নতির জন্য প্রয়াস চালাতে হয়, সমাজের আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটাতে হয়। তবে সকলের মধ্যে একই মানসিক অবস্থা সৃষ্টি করা যায় না। সামাজিক অবস্থা ও পরিবেশ অনুযায়ী সন্তদের কাজকর্মে পার্থক্য দেখা যায়। এজন্য আর. ডি. রানাডে সন্তদের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। জ্ঞানদেব বারাকরী ধর্মমতের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। স্রষ্টা ও সৃষ্টি এক নয়, সৃষ্টি দৃশ্যমান, স্রষ্টা অদৃশ্য, অনির্বচনীয়, আকৃতিহীন। তাঁর 'স্ফূর্তিবাদে' জ্ঞানদেব বলেছেন যে ঈশ্বর নিজের মহিমা প্রকাশ করেন সৃষ্টির মধ্য দিয়ে, সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই (There is no difference between the Absolute and the world.)। জ্ঞানদেব ঈশ্বরের কোনো আকৃতি স্বীকার করেননি, রামদাস ঈশ্বরের চার রূপের কথা বলেছেন—মূর্তি, অবতার, আত্মা ও ঈশ্বর। জ্ঞানদেব বলেছেন যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সর্বত্র, তিনি অরূপ (He is immeasurable, indeterminate, immaculate, and indescribable.)। তুকারাম বলছেন যে, তিনি আর কেউ নন, 'তিনি আমাদের আত্মা (He is our very self.)।

জ্ঞানদেব ও রামদাস জ্ঞানতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। সত্যিকারের জ্ঞান হলো ঈশ্বর জ্ঞান, সাধনার পথে ঈশ্বর লাভ হয়, জ্ঞানচর্চা করে ঈশ্বর লাভ হয় না। আসল জ্ঞান হলো বহুর মধ্যে এককে দেখা। তবে নৈতিকতা, শুচিতা, নম্রতা, অহিংসা, পবিত্রতা এবং ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির মতো সদগুণ আয়ত্ত করতে হবে। গুরু পথ দেখাবেন। প্রবঞ্চনা, দাম্ভিকতা, ঈর্ষা, আত্মম্ভরিতা, অজ্ঞানতা মানুষকে পাপের পথে নিয়ে যায়। সত্ত্বগুণ মানুষকে ঈশ্বরের পথে চালিত করে, রজ গুণে মানুষ পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে আর তমগুণে মানুষ পাপের পথে এগিয়ে যায়। অজ্ঞানতা তাকে আচ্ছন্ন করে। ঈশ্বর একমাত্র সত্য, ঈশ্বর উপলব্ধির চেয়ে শ্রেয়তর কিছু নেই। পার্থিব জীবনে ঈশ্বর সাধনার পথে যেসব বাধা আসে তা সব দূর করে এগিয়ে যেতে হবে। পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জীবনের সম্পর্ক নিয়েও বারাকরী সম্প্রদায়ের

সন্তরা আলোচনা করেছেন। তুকারাম বলেছেন যে একই সঙ্গে পার্থিব সুখ ও আধ্যাত্মিক শান্তি লাভ করা যায় না। একনাথ ও রামদাস পার্থিব জীবন ও আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের প্রয়াস চালিয়েছেন। একনাথের নিজের জীবনে এই সমন্বয় ঘটেছে। তবে সন্তরা বলেছেন যে গৃহী মানুষ সংসারের প্রতি আসক্ত হবেন না, গৃহী সাধু নির্মোহ আসক্তি শূন্য হয়ে জীবনে চলবেন।

আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতির জন্য মানুষকে উদ্যোগী হতে হবে। তিনি কখনো নিরাশ হবেন না, অবিচলভাবে ঈশ্বর সাধনা করে যেতে হবে। কৃচ্ছ্রসাধনের প্রয়োজন নেই, ঈশ্বরলাভের জন্য অরণ্যবাসের প্রয়োজন হয় না। যা প্রয়োজন তা হলো পবিত্র হৃদয়, আনন্দিত মন। সন্ত ইন্দ্রিয় সুখ থেকে দূরে থাকবেন, মনকে নিয়ন্ত্রণ করে চলবেন, আহার-নিদ্রা ও আচার-আচরণে তিনি সংযত থাকবেন। তুকারাম বলেছেন যে যে-কোনো নির্জনস্থান সাধনার পক্ষে উপযুক্ত। অপরদিকে জ্ঞানদেব আদর্শ সাধন স্থানের বর্ণনা দিয়েছেন। স্থানটি হবে নির্জন, ছায়াশীতল ও সুন্দর, মানুষের বাসনা-তাড়িত মন সহজে শান্তি পাবে। সাধনার মাধ্যমে মানুষ সব পেতে পারে। আত্মনিয়ন্ত্রণ ও যোগাভ্যাসের প্রয়োজন আছে, সাধনা মানুষকে কামনা ও অর্থলোভ থেকে মুক্তি দেবে। সব দাম্ভিকতা ও অহংবোধকে জয় করে ঈশ্বর লাভ করতে হয়, কারো প্রতি কোনো বিদ্বেষ বা ঘৃণা থাকবে না। সাধক তার লোভ, ভয়, ক্রোধ ইত্যাদি ঈশ্বরকে সমর্পণ করে সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন করবেন। সব অবস্থায় সন্তুষ্ট থেকে, সাধু সঙ্গ করে ঈশ্বরের দাসানুদাস হবেন। অনুতাপের মাধ্যমে সব পাপ দগ্ধ করে সন্ত শান্তি লাভ করেন। গুরু তাকে সাধনমার্গে পরিচালনা করবেন। জ্ঞানদেব বলেছেন যে পরমভক্তি হলো ঈশ্বর লাভের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পথ, অন্যপথগুলি হলো জ্ঞান, কর্ম, সাধনা ও অবিচল আনুগত্য। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মকে মিলিয়ে বারাকরী সম্প্রদায় ভক্তিধর্ম গঠন করেন। এই ভক্তিধর্মে জাতি, ধর্ম, বর্ণ কিছুই নেই, জনাবাঈ বলেছেন, ভক্তিমার্গের সাধক সবকিছুতে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেন।

বারাকরী সম্প্রদায়ের সন্তরা ন'রকম ভক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। এই ন'রকম ভক্তি হলো শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পদসেবন, অর্চনা, বন্দনা, দাস্যভক্তি, সখ্য ও আত্ম নিবেদন। একনাথ এই ন'রকম ভক্তির উদাহরণ দিয়েছেন। তুকারাম কীর্তনের ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে কীর্তনের মধ্য দিয়ে ভক্ত, ভগবান ও তার নামের মিশ্রণ ঘটে যায়। কীর্তনের আনন্দ হলো অশেষ এবং সজীব। মুক্তাবাঈ লিখেছেন যে, দাস্যভক্তির মধ্য দিয়ে সাধক নিজেই ঈশ্বরত্ব লাভ করেন। একনাথ ও রামদাস অর্চনা ও বন্দনার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। দাস্যভক্তি দিয়ে সাধক ঈশ্বর ছাড়া আর সব ত্যাগ করবেন। আত্ম নিবেদন হলো শ্রেষ্ঠতম ভক্তির নিদর্শন (It consists in the realization of the unity and identity of one's self with God.)। ভক্ত

ও ভগবান এক হয়ে যান, ঈশ্বরের নাম কীর্তন হলো সব সাধনার মূল কথা। ঈশ্বরের নাম নিয়ে অপরিসীম দুঃখের মধ্যেও সাধক আনন্দ পান। ঈশ্বর তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান, পরীক্ষা করেন, হতাশা আসে, সাধক নির্বিকারচিত্তে ঈশ্বরের সাধনা করলে সিদ্ধি লাভ করেন। নামদেব, তুকারাম, রামদাস সকলে এই অন্ধকারময় পর্বের মধ্য দিয়ে এগিয়েছিলেন (dark night of the soul)।

রামদাস বলছেন, সিদ্ধিলাভ করলে সাধকের কাজ শেষ হয়ে যায় না। তিনি বিজ্ঞতম, বাস্তববাদী মানুষ, তিনি সর্বকাজের যোগ্য এবং দুঃখী, হতাশাগ্রস্ত মানুষকে তিনি পথ দেখাবেন (He is all-sided, always works, and leads people to the service of God.)। তিনি বিনয়ী, নম্র, সহজ, সরল, আবার সকলের উপরে তার অবস্থান (He is smaller than the smallest and greater than the greatest.)। সাধু সকলকে ঈশ্বরের কথা বলবেন, নিরীশ্বরবাদীদের বিরোধিতা করবেন, ঈশ্বরের নামের অমৃত তিনি জনগণের মধ্যে বিতরণ করবেন।

একাদশ অধ্যায়	সাহিত্য ও শিল্প

ফার্সি সাহিত্য

আরবরা আরবি ভাষায় সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শন গ্রন্থ রচনা করেছেন। তুর্কিদের সঙ্গে পারস্যের ঘনিষ্ঠ পরিচয় গড়ে উঠেছিল, ফার্সি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তারা আকৃষ্ট হয়েছিল, ফার্সি ভাষা ও সাহিত্য তারা ভারতে এনেছিল। তুর্কি শাসকদের আমলে ফার্সি ছিল প্রশাসন ও সাহিত্যের ভাষা। আরবি ভাষার চর্চা ভারতে সীমাবদ্ধ ছিল মুষ্টিমেয় উলেমা ও পণ্ডিতদের মধ্যে, এটি ছিল ধর্ম ও দর্শনের ভাষা। ফার্সি ভাষায় ভারতের *আইনসংহিতা* রচিত হয়েছিল। ফিরুজশাহ তুঘলকের রাজত্বকালে *ফিক-ই-ফিরুজশাহী* নামে আইনের সংকলন রচিত হয়। তুর্কি শাসকরা ফার্সি ভাষার পৃষ্ঠপোষণ করেন। দশম শতক থেকে পারস্য ও মধ্য এশিয়ায় ফার্সি ভাষা ও সংস্কৃতির নবজাগরণ ঘটেছিল। পারস্যের বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিকরা দশম থেকে চতুর্দশ শতকের মধ্যে তাঁদের সাহিত্য সৃষ্টি করেন। এদের মধ্যে বিখ্যাত নামগুলি হলো ফিরদৌসি, সাদি, সিনাই, ইরাকি, জামি ও হাফিজ। গজনি ও ঘুরির শাসকরা ফার্সি সাহিত্যের সমাদর করেন, তাঁদের রাজসভায় বিখ্যাত ফার্সি কবি ও সাহিত্যিকরা স্থান লাভ করেন। গজনির মাহমুদের সঙ্গে আলবেরুনি ভারতে এসেছিলেন। মৈজুদ্দিনের রাজসভায় ছিলেন কবি ও সাহিত্যিক তাজুদ্দিন হাসান, রুকনুদ্দিন হামজা, শিহাব, নাজুকি ও কাজী হামিদ। লাহোর ছিল ফার্সি ভাষা ও সাহিত্যচর্চার এক প্রধান কেন্দ্র। ফার্সি কবি মাসুদ সাদ সলমন লাহোরের প্রতি ভালোবাসা জানিয়ে কবিতা লেখেন।

সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবক (১২০৬-১২১০) কবিদের প্রতি এত উদার ছিলেন যে তাঁকে 'লাখ বক্স' উপাধি দেওয়া হয়। ইলতুৎমিস পণ্ডিত, কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। কবি নাসিরি, আবু বকর, তাজুদ্দিন দাবির, নুরুদ্দিন মহম্মদ আওয়াফি তাঁর রাজসভা অলংকৃত করেন। নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহের দরবারে (১২৪৬-৬৫) ছিলেন ফকরুদ্দিন নুনাকি এবং ঐতিহাসিক মিনহাজ সিরাজ। তিনি ১২৬০ খ্রিস্টাব্দে তুর্কি শাসনের ইতিহাস লিখেছেন *তবাকৎ-ই-নাসিরী* গ্রন্থে। বলবনের রাজত্বকাল থেকে তুঘলক রাজত্বের শেষ অবধি ফার্সি সাহিত্যের উন্নতি ঘটেছিল। এই পর্বে বিখ্যাত ফার্সি কবি, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক আমীর খসরু সাহিত্য সৃষ্টি করেন। উত্তরপ্রদেশের পাতিয়ালিতে ১২৫৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়।

তিনি বহু কবিতা, রোমাঞ্চ কাব্য ও আলাউদ্দিনের ইতিহাস *খাজাইনুল ফুতুহ* লিখেছেন। তিনি সুফি দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং শেখ নিজামুদ্দিন আউলিয়ার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। খসরু নিজেকে ভারতীয় বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করতেন। তিনি লিখেছেন যে ভারতকে তিনি প্রশংসা করেন কারণ ভারত তাঁর জন্মভূমি ও তাঁর দেশ, দেশকে ভালোবাসা মানুষের কর্তব্য। আর হিন্দুস্তান হলো স্বর্গের মতো। খোরাসানের চেয়ে এর জলবায়ু ভালো, সারা বছর ধরে এখানে সবুজের মেলা চলে, প্রচুর ফুল ফোটে। এখানকার ব্রাহ্মণরা হলেন অ্যারিস্টটলের মতো পণ্ডিত, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু পণ্ডিতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। খসরুর ভারতপ্রীতি প্রমাণ করে যে তুর্কি অভিজাত শ্রেণী ভারতকে আর বিদেশ বলে গণ্য করত না। তুর্কিস্তান ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক মিলনের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল। আমীর খসরুকে বলা হতো 'হিন্দুস্তানের তোতাপাখি'। খাজা নাজমুদ্দিন হাসান ছিলেন আলাউদ্দিনের একজন সভাকবি। তাঁর আকর্ষণীয় মনোমুগ্ধকর গজলের জন্য তাঁকে 'হিন্দুস্তানের সাদি' বলা হতো। তিনি দরবেশ নিজামুদ্দিন আউলিয়ার বাণীগুলি লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানি তাঁর কবিত্বের প্রশংসা করেছেন। আলাউদ্দিনের রাজসভার অন্যান্য কবি ও সাহিত্যিকরা হলেন সদরুদ্দিন আলি, ফকরুদ্দিন কাবাস, হামিদউদ্দিন রাজা, মওলানা আরিফ, হাকিম ও শিহাবুদ্দিন। এঁরা সকলে ফার্সি কবিতা *দিবান* রচনা করেছেন। খসরুর সময় থেকে ভারতীয় ফার্সিতে নতুন শৈলী গড়ে উঠেছিল, একে বলা হয় 'সবক-ই-হিন্দি' (Sabaq-i-hindi) বা ভারতের শৈলী। খসরু ভারতের ভাষাগুলির প্রশংসা করেছেন, হিন্দিতে কিছু কবিতা লিখেছেন। তিনি হিন্দিকে বলেছেন 'হিন্দাবি'। তিনি সঙ্গীতের সমঝদার ছিলেন, নিজামুদ্দিনের সঙ্গীত সমাবেশে তিনি যোগ দিতেন।

ফার্সিতে গদ্য ও পদ্য ছাড়াও ইতিহাস লেখা হয়েছে। মিনহাজ, বারানি, আফিফ ও ইসামী সুলতানি যুগে ইতিহাস লিখেছেন, ইতিহাস সাহিত্য এঁদের অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে। মধ্যযুগের তথ্যনির্ভর ইতিহাস লেখা সম্ভব হয়েছে। ফার্সি সাহিত্যের তৃতীয় ধারা ধর্ম ও দর্শনবিষয়ক গ্রন্থ লেখা হয়েছে। সুফি দরবেশরা ফার্সি ভাষায় সাহিত্য রচনা করে তাঁদের আদর্শ প্রচার করেছেন। ফার্সি ভাষার মাধ্যমে মধ্য এশিয়া ও পারস্যের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। তুর্কি অভিজাতদের ভাষা হয়েছে ফার্সি, এদেশের হিন্দুরা এই ভাষা আয়ত্ত করেছে, শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে এই ভাষা সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ফার্সি লেখকেরা সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করে সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। মহম্মদ বিন তুঘলকের শাসনকালে জিয়া নাখসাবি *তুতিনামায়* ফার্সিতে সংস্কৃত লোককাহিনীর অনুবাদ

করেন। ফিরুজের সময়ে ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র ও সঙ্গীতের ওপর গ্রন্থ ফার্সিতে অনূদিত হয়। কাশ্মীরের শাসক জয়নাল আবেদিন *রাজতরঙ্গিণী* ও মহাভারতের ফার্সি অনুবাদের ব্যবস্থা করেন।

মহম্মদ বিন তুঘলক নিজে ছিলেন ফার্সি সাহিত্যে সুপণ্ডিত। তিনি কবি, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকদের উৎসাহ দেন, ইবন বতুতা ও বারানি তাঁর রাজসভায় ছিলেন। তাশখন্দের বদরুদ্দিন মহম্মদ মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজসভায় এসেছিলেন। তিনি বেশ কিছু দিবান, কাসিদা, গজল ও রুবাইয়া রচনা করে সুলতানকে উৎসর্গ করেন। ইসামী ফিরদৌসির *শাহনামার* মডেলে তাঁর *ফুতুহ-উস-সালাতিন* রচনা করেন, এটি হলো মুসলিম শাসনের ইতিহাস। ফিরুজ শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তারে উৎসাহ দেন। তাঁর আত্মজীবনী *ফুতুহাত-ই-ফিরুজশাহী*-তে তাঁর রাষ্ট্রনীতির কথা বলেছেন। তাঁর রাজসভার কবি ইজউদ্দিন খালিদ খানি সংস্কৃত আকর থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ফার্সিতে লেখেন প্রাকৃতিক দর্শনের ওপর গ্রন্থ *দালায়িল-ই-ফিরুজশাহী*। শাম্‌স-ই-সিরাজ আফিফ লিখেছেন *তারিখ-ই-ফিরুজশাহী*, বারানির গ্রন্থের পরবর্তী অংশ হলো এই ইতিহাস। মহম্মদ বিহামদ খানি লেখেন *তারিখ-ই-মুহাম্মদী* নামে সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থ। সৈয়দ বংশের রাজত্বকালে সরহিন্দের ইয়াহিয়া বিন আহম্মদ লিখেছিলেন *তারিখ-ই-মুবারকশাহী*। এখানি হলো সৈয়দ বংশীয় শাসক দ্বিতীয় মৈজুদ্দিন মুবারক শাহের ইতিহাস।

বাহমনি রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী খাজা মাহমুদ গাওয়ান ছিলেন একজন সাহিত্যিক ও কবি। বাহমনি রাজারাও শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। মুল্লা আবদুল করিম *মাসির-ই-মাহমুদশাহী* নামে গুজরাটের ইতিহাস লেখেন। মাহমুদ আয়াজ বিজাপুর সুলতান ইউসুফ আদিল শাহের ইতিহাস লিখেছিলেন, এই ইতিহাসের নাম হলো *মিফতাহ্-উস-সুরুর-ই-আদিলশাহী*। লোদি যুগের শ্রেষ্ঠ ফার্সি কবি হলেন দিল্লির শেখ জামালুদ্দিন। ফার্সি কবি জামিরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের কথা জানা যায়। লোদিদের পতন ও মুঘলদের প্রতিষ্ঠা তিনি দেখেছিলেন। ইবন বতুতা তাঁর *রেহালা*-য় (Rehlah) সুফিদের কথা উল্লেখ করেছেন। সুফিরা সকলে ছিলেন শিক্ষিত এবং অনেকে প্রচারমূলক সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। কালান্দার, মুহম্মদ ইমাম, হাসান আলাই সান্‌জারি সকলে প্রচারের উদ্দেশ্যে গ্রন্থ রচনা করেছেন। সন্দেহ নেই সুলতানি যুগে ফার্সি সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে, ভারতীয় সাহিত্যের সঙ্গে ফার্সির যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। ভারতের ভাষা, সাহিত্য ও দর্শনের ওপর ফার্সি সাহিত্যের গভীর প্রভাব পড়েছে। ফার্সি ভাষায় ইতিহাস রচিত হয়েছে, ফার্সি ভাষায় দলিল-দস্তাবেজ সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

সংস্কৃত

তুর্ক-আফগান যুগে সংস্কৃত ভাষা ছিল উচ্চতর দর্শন ও সাহিত্যের বাহন। এই যুগে সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বহু গ্রন্থ সংস্কৃতে লেখা হয়। পূর্ববর্তী যুগের সঙ্গে তুলনায় এই যুগে রচনার পরিমাণ অনেক বেশি। শংকরের অদ্বৈত দর্শনকে অনুসরণ করে রামানুজ, মাধব, বল্লভ ও অন্যান্যরা সংস্কৃতে উচ্চস্তরের দর্শন গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁদের ধ্যানধারণা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এ থেকে অনুমান করা যায় যে দেশের সর্বত্র বিদ্বজ্জনের কাছে সংস্কৃত ছিল চিন্তাভাবনা প্রকাশের মাধ্যম। দেশের সর্বত্র, সুলতানি রাজ্যের মধ্যে, সংস্কৃত চর্চার জন্য শিক্ষায়তন ছিল। শাসকরা এসব প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতেন না, এসব সংস্কৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবাধে বিকাশলাভ করেছিল। ভারতে কাগজের চলন হলে পুরনো পুঁথিগুলির নকল প্রকাশ করা সহজ হয়, পুঁথিগুলির প্রচার বৃদ্ধি পায়, সহজলভ্য হয়। রামায়ণ ও মহাভারতের অনেকগুলি পুঁথি এযুগে রচিত হয়েছে।

সংস্কৃতে কাব্য, নাটক, কাহিনী, চিকিৎসা বিদ্যা, জ্যোতিষ, সঙ্গীতশাস্ত্র ইত্যাদির ওপর অজস্র গ্রন্থ রচিত হয়েছে। দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যে ধর্মশাস্ত্রের অনেকগুলি ভাষ্য ও টীকা রচনা করা হয়। দ্বাদশ শতকে বিজ্ঞানেশ্বর মিতাক্ষরা আইনের সংকলন প্রকাশ করেন, হিন্দু আইনের অন্য শাখা হলো দায়ভাগ। চতুর্দশ শতকে বিহারের চন্দেশ্বর ধর্মশাস্ত্রের ভাষ্য রচনা করেন। দক্ষিণ ভারত, বাংলা, মিথিলা ও পশ্চিম ভারতের হিন্দু রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু সংস্কৃত গ্রন্থ লেখা হয়। সংস্কৃতের প্রসারে জৈন গুরু ও প্রচারকদের অবদান ছিল। হেমচন্দ্র সুরি সংস্কৃত ভাষায় অনেকগুলি গ্রন্থ লেখেন। এযুগের সংস্কৃত রচনার একটি দুর্বলতা হলো এগুলিতে মুসলমানদের কথা নেই। ইসলামী ধর্ম ও দর্শনের গ্রন্থগুলি সংস্কৃতে অনুবাদ করার চেষ্টা ছিল না। ফার্সি ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে সংস্কৃতের যোগাযোগ স্থাপিত হয়নি। একমাত্র ব্যতিক্রম হলো বিখ্যাত ফার্সি কবি জামির 'ইউসুফ জুলেখার' প্রণয় কাব্য সংস্কৃতে অনুবাদ করা হয়। আলবেরুনি ভারতীয়দের দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতার যে উল্লেখ করেছেন এটি হলো তার প্রমাণ। সংস্কৃত লেখকদের লেখায় বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটেনি। রোমান্টিক অতীতচারিতায় তারা মুখ লুকিয়েছেন, এজন্য তাঁদের লেখায় সতেজ, বলিষ্ঠ দৃষ্টি এবং মৌলিকতার অভাব ঘটেছিল।

প্রাদেশিক সাহিত্য

সুলতানি যুগে প্রাদেশিক ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। হিন্দি, বাংলা ও মারাঠি সাহিত্যের উৎপত্তি হয়েছে অষ্টম শতক বা তার কাছাকাছি সময়ে। তামিল সাহিত্য ছিল এদের

চেয়ে পুরনো। বৌদ্ধ, জৈন ও নাথপন্থী সিদ্ধরা অপভ্রংশ ও স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করে তাঁদের সাহিত্য রচনা করেছেন। চতুর্দশ শতকের গোড়ার দিকে আমীর খসরু ভারতের আঞ্চলিক ভাষাগুলির কথা উল্লেখ করেছেন। প্রদেশগুলির নিজস্ব স্বতন্ত্র ভাষা ছিল— সিন্ধি, লাহোরি, কাশ্মীরী, কুবারি (ডোগরি), ধুর সমুন্দারি (কানাড়া), তিলাঙ্গি (তেলেগু), গুজর (গুজরাতি), মাবারি (তামিল), গৌড়ি (উত্তরবঙ্গ), বাংলা, অযোধ্যা, দিল্লি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছিল হিন্দাবি ভাষা। জীবনের সব কাজের জন্য 'এইসব ভাষার ব্যবহার হতো বলে তিনি জানিয়েছেন। আমীর খসরু অসমিয়া, ওড়িয়া ও মালয়ালম ভাষার উল্লেখ করেননি। সুলতানি যুগে এসব ভাষার স্বাধীন অস্তিত্বের কথা জানা যায়। আমীর খসরুর লেখা থেকে ভারতের আধুনিক ভাষাগুলির আবির্ভাবের কথা নিশ্চিতভাবে জানা যায়। মধ্যযুগে এই ভাষাগুলি পরিণত হয়েছিল, সাহিত্যের মাধ্যম হিসেবে এগুলির ব্যবহার শুরু হয়েছিল।

মধ্যযুগে প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের উৎপত্তির নানা কারণ আছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রাধান্য হারিয়েছিল, সেজন্য সংস্কৃত ভাষা তার গৌরবের আসন হারিয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের ভক্তি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত প্রচারকরা স্থানীয় ভাষায় তাঁদের ধর্মমত প্রচার করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে ওড়িশায় বৈষ্ণবরা ওড়িয়া ভাষায়, আসামে শংকরদেব অসমিয়া ভাষায় এবং মহারাষ্ট্রে জ্ঞানদেব ও নামদেব মারাঠি ভাষায় তাঁদের ধর্মীয় আদর্শ প্রচার করেন। তাঁরা শুধু ধর্মমত প্রচার করেননি, দার্শনিক প্রবন্ধ লিখেছেন, গান ও সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। তুর্কি আগমনের আগে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রশাসনে সংস্কৃতের সঙ্গে স্থানীয় ভাষা তামিল, কানাড়া, মারাঠি ইত্যাদি ব্যবহার করা হতো। তুর্কি শাসকরা এই রীতি বজায় রাখেন, সংস্কৃতের স্থান নিয়েছিল ফার্সি ভাষা। সুলতানি যুগে হিন্দি জানা হিসেবরক্ষক নিযুক্ত করা হয়। সুলতানি রাজ্যে ভাঙন দেখা দিলে আঞ্চলিক রাজ্য গড়ে ওঠে, এরা ফার্সির সঙ্গে স্থানীয় ভাষাকে প্রশাসনিক কাজে ব্যবহার করত। বিজয়নগরের রাজারা তেলেগু ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণ করেন। বাহমনি ও পরে বিজাপুর রাজ্যে মারাঠি ভাষা প্রশাসনিক কাজে ব্যবহার করা হতো। এই ভাষাগুলি উন্নত হলে প্রাদেশিক ভাষায় সাহিত্য রচনা করা সম্ভব হয়। স্থানীয় শাসকরা এইসব ভাষায় সাহিত্য রচনায় উৎসাহ্ দেন। বাংলার শাসক নসরত শাহ্ রামায়ণ ও মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করান। মালাধর বসু ভাগবতের বাংলা অনুবাদ করেন। হুসেনশাহী বংশের শাসকরা বাংলা সাহিত্যের উন্নতিতে যথেষ্ট অবদান রেখেছিলেন। সুফি সাধকরা তাঁদের সঙ্গীত সম্মিলনীতে হিন্দি কবিতা পাঠ করতেন। সুফি দরবেশ মুল্লা দাউদ *চন্দায়ন* এবং মালিক মুহম্মদ জায়সি হিন্দিতে *পদ্মাবতী* কাব্য রচনা করেন। জনগণের বোধগম্য ভাষায় তাঁদের উপদেশমূলক গ্রন্থগুলি রচনা করেন।

এই পর্বে যেসব প্রাদেশিক ভাষার উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তাদের একটি বৈশিষ্ট্য হলো কবিতা বেশি, গদ্য খুবই কম (fundamentally the literature of poetry, and prose was very rarely cultivated)। কবিতাগুলিতে বারমাস্যা ও চৌতিশা পাওয়া যায়। অপভ্রংশ থেকে হিন্দির উৎপত্তি হয়েছিল। আমীর খসরু হলেন প্রথম দিককার হিন্দি লেখকদের মধ্যে অন্যতম, কবীর হলেন হিন্দি সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ লেখক। *বীজক* ও *বাণীতে* কবীরের দোঁহাগুলি পাওয়া যায়, শিখদের আদিগ্রন্থে কবীরের দোঁহা স্থান পেয়েছে। কবীর ভোজপুরি ভাষায় কিছু দোঁহা রচনা করেন। বল্লভাচার্য ও তাঁর শিষ্যরা ব্রজ ভাষায় তাঁদের রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গান ও কাব্য রচনা করেন, সুরদাস এই ভাষাতে লিখেছিলেন। মীরাবাঈ রাজস্থানী ভাষায় তাঁর গান লেখেন। গুরু নানকের জীবনী *জনমসখি*-তে গুরুমুখি ভাষার উৎপত্তি লক্ষ করা যায়। সিন্ধি সাহিত্যে লেখা হয়েছে অনেকগুলি গাথা। গুজরাতি ভাষায় প্রচুর লেখা হয়েছে, তবে এই ভাষা বিশুদ্ধ গুজরাতি নয়, অপভ্রংশের মিশ্রণ আছে। জৈন লেখকরা গুজরাতি ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ঘটিয়েছেন, হেমচন্দ্র হলেন এই ভাষার একজন শ্রেষ্ঠ লেখক। গুজরাট, মাড়োয়ার ও মালবের লোককথা নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। গীতগোবিন্দের সমপর্যায়ের গুজরাতি কাব্য *বসন্তবিলাস* লেখা হয়েছে। পদ্যে লেখা হয় *রণমল্ল ছন্দ*, *ঊষাহরণ*, *সীতাহরণ*, *প্রবোধ চিন্তামণি* ও গদ্যে *পৃথ্বীচন্দ্র চরিত্র*।

নরসিংহ মেহতা (১৪১৫-৮১) ছিলেন গুজরাতি সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ লেখক। তিনি ছিলেন একজন ভক্ত-সাধক, জাতিপ্রথার বিরোধী। বেদান্তে বিশ্বাসী নরসিংহ ভক্তিধর্ম প্রচার করেন। পঞ্চদশ শতকে ভালনা গুজরাতি ভাষায় রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কাব্য রচনা করেন। জ্ঞানদেব ও নামদেব, একনাথ ও তুকারাম মারাঠি সাহিত্যের উন্নতি ঘটিয়েছিলেন। এরা বারাকরী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পান্ধারপুরের বিঠোবা মন্দির ঘিরে এই ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। বাংলা, অসমিয়া, ওড়িয়া, মৈথিলী, মাগধি ও ভোজপুরি হলো পূর্ব ভারতের ভাষা। এর মধ্যে বাংলার অবদান হলো সবচেয়ে বেশি, বেশি লোক এই ভাষায় কথা বলত, বেশি সাহিত্যও সৃষ্টি হয়েছিল। *মনসামঙ্গল*, *চণ্ডীমঙ্গল* ও *ধর্মমঙ্গলে* লোককথাকে সাহিত্যিক রূপ দেওয়া হয়েছে। কৃত্তিবাস ওঝা বাংলায় রামায়ণ লিখেছেন (১৪১৮)। গুণরাজ খান মালাধর বসু লেখেন *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* কাব্য (১৪৭৩), বিজয় গুপ্ত ও বিপ্রদাস পিপলাই মনসামঙ্গল রচনা করেন। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকবি হলেন চণ্ডীদাস। পঞ্চদশ শতকের বাংলায় সংস্কৃতি ও সাহিত্যক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ করা যায়। হুসেন শাহ্ ও তাঁর পুত্র নসরত খান বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। হুসেন শাহের চট্টগ্রামের প্রাদেশিক গভর্নর পরাগল খান ও ছুটি খান কবীন্দ্র ও শ্রীকর নন্দীকে

দিয়ে মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করিয়েছিলেন। পঞ্চদশ শতক থেকে বাঙালি রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত শুনতে ভালোবাসত, সাহিত্যরস পান করে বাঙালি মানস উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। বৈষ্ণব কবিরা রাধাকৃষ্ণের লীলা নিয়ে পদ লিখে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন, চৈতন্যের জীবনী সাহিত্য হলো বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ।

উমাপতি ধর হলেন মৈথিলী ভাষার প্রথম কবি। জ্যোতিরিশ্বর ঠাকুরের বর্ণরত্নাকর হলো মৈথিলী ভাষার প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা। বিদ্যাপতি ঠাকুর হলেন মৈথিলী ভাষার শ্রেষ্ঠ গীতিকবি, তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা হলো রাধাকৃষ্ণ প্রেম নিয়ে লেখা গীতিকবিতাগুলি। বাঙালি হৃদয় জয় করে নিয়েছে এই কবিতাগুলি, বাঙালি কবিরা এগুলির অনুকরণ করেছেন (These Radha-Krishna poems of Vidyapati took by storm the heart of Bengal.)। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মানুষ অসমিয়া ভাষায় কথা বলে, অসমিয়া ভাষা অনেকটা বাংলার মতো। চর্যাপদগুলি পুরনো অসমিয়া ভাষায় লেখা হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। কামতাপুর রাজ্যের রাজার সভাকবি হেম সরস্বতী হলেন অসমিয়া ভাষার প্রথম দিককার লেখক, তিনি লেখেন *প্রহ্লাদচরিত্র*। হরিহর বিপ্র ও কবিরত্ন সরস্বতী মহাভারতের অসমিয়া অনুবাদ করেন। কবিরাজ মাধব বাঙালি হলেও অসমিয়া ভাষার একজন শ্রেষ্ঠ কবি। অন্যান্য কবিরা হলেন দুর্গাবর, পীতাম্বর ও মানকর। অসমিয়া সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ধর্ম আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হলেন শংকরদেব। শংকরদেবের আগে আসামে শক্তিধর্মের প্রাধান্য ছিল, শংকরদেব 'একশরণ ধর্ম' প্রবর্তন করেন। এই ধর্মমত হলো ভক্তিবাদ (Religion of seeking refuge in one)। অসমিয়া ভাষায় তিনি ও তাঁর শিষ্যরা ভক্তিধর্ম প্রচার করেন, প্রত্যেক অসমিয়ার ঘরে (নামঘর) তাঁর গান গাওয়া হতো। তিনি নাটক লিখে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। অসমিয়া ভাষায় তিনি 'বরগীত' রচনা করেন, এগুলি হলো ভক্তিমূলক কবিতা, এগুলি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। শংকরদেবের শিষ্য মাধবদাসও গুরুর মতো সাহিত্য সৃষ্টি করে অসমিয়া সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। আসামের ঐতিহাসিক সাহিত্য বুরঞ্জি লেখা হয়।

পূর্ব ভারতের আর একটি প্রধান ভাষা হলো ওড়িয়া। ওড়িয়া লেখ পাওয়া গেছে। ওড়িয়া পণ্ডিতরা চর্যাপদকে ওড়িয়া ভাষায় লেখা বলে দাবি করেছেন। দ্বাদশ শতক থেকে ওড়িয়া ভাষায় প্রভু জগন্নাথের ইতিহাস লেখা শুরু হয়েছে, এর নাম হলো *মাদলাপঞ্জি*। চতুর্দশ শতকে বৎসদাস *কলস-চৌতিশা* লিখেছেন পদ্যে। নারায়ণদাস অবধূত 'রুদ্র-শুদ্ধ-নিধি' নামে যোগ-বেদান্ত-তন্ত্র নিয়ে দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। সারলা দাস হলেন ওড়িশার একজন শ্রেষ্ঠ কবি, তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। এঁদের মধ্যে আছে চণ্ডীপুরাণ, বিলঙ্কা রামায়ণ ও মহাভারত। ওড়িশার বৈষ্ণব কবিরা

কৃষ্ণকাহিনী নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। মার্কণ্ড দাস, অর্জুনদাস ও জগন্নাথ দাস হলেন বৈষ্ণব কবি, বলরাম দাস ওড়িয়া ভাষায় রামায়ণের অনুবাদ করেন।

প্রাদেশিক স্থাপত্য ও শিল্প

সুলতানি যুগে প্রদেশগুলিতে নিজস্ব স্থাপত্যরীতি গড়ে উঠেছিল। দিল্লির স্থাপত্য রীতির প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। প্রাদেশিক শাসকদের সম্পদ ছিল সীমিত। স্থানীয় শিল্পরীতির প্রভাব পড়েছিল স্থানীয় স্থাপত্যের ওপর। সব প্রদেশে দিল্লির মতো উন্নত গুণগত মানের শিল্পী ও কারিগর পাওয়া যেত না, নির্মাণের উপাদানও সহজলভ্য ছিল না। বাংলায় নির্মাণ কাজের জন্য ভালো পাথর সংগ্রহ করা সহজ হতো না। রাজস্থান ও দক্ষিণে হিন্দু রাজারা প্রাচীন হিন্দু নির্মাণ শৈলী অনুসরণ করেছিলেন। বাংলার মুসলমান শাসকরা নতুন স্থাপত্যরীতি প্রবর্তন করেন। মিনহাজ লিখেছেন যে ইখতিয়ারউদ্দিন লক্ষ্মণাবতীতে মসজিদ, কলেজ, বিশ্রামাগার ও অন্যান্য অট্টালিকা নির্মাণ করেন। বাংলার সুলতানরা সকলে কম-বেশি মসজিদ, মাদ্রাসা ও স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন। ইলিয়াসশাহী শাসক সিকান্দর শাহ্ বিখ্যাত আদিনা মসজিদ নির্মাণ করেন। মার্শাল লিখেছেন যে পূর্ব ভারতে এটি ছিল সবচেয়ে বড় মসজিদ (the most ambitious structure of its kind evér essayed in Eastern India.)। গৌড়ের গুণমন্ত ও দবসবারি হলো এধরনের আরও দুটি মসজিদ। হজরত পাণ্ডুয়ার 'একলাখি' সমাধিসৌধ হলো বাংলার এক বিশেষ স্থাপত্যকীর্তি। গৌড়ের বড় সোনা মসজিদ ও ছোট সোনা মসজিদ বাংলার শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ফার্গুসন মনে করেন যে বড় সোনা মসজিদ হলো স্থাপত্যের এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন (the finest memorial left at Gaur)।

ধর্মনিরপেক্ষ কয়েকটি স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। গৌড়ের বাইশ গজি দেউল হলো এর একটি নিদর্শন, অন্য দুটি নিদর্শন হলো দাখিল দরওয়াজা ও ফিরুজ মিনার। বাংলার ইসলামী স্থাপত্যরীতি খুব উচ্চমানের ছিল বলা যায় না (The Islamic architecture of Bengal is not a style of building of a very impressive kind.)। বাংলায় ভালো পাথর পাওয়া যায় না, এজন্য নির্মাণের কাজে ইট ব্যবহার করা হতো। এজন্য বাংলার স্থাপত্যশৈলীকে ইটশৈলী (brick style) বলা হয়েছে। বাংলার স্থাপত্যরীতিতে সামঞ্জস্য ও ঐক্যের অভাবের কথা বলেছেন অনেকে (loss of balance and organic unity)। ফিরুজশাহ্ তুঘলক জৌনপুর শহর নির্মাণ করেন, জৌনপুরে স্বাধীন সুলতানি স্থাপিত হয়েছিল। এখানকার শর্কি শাসকরা ছিলেন শিল্প ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক, তাঁরা স্মৃতিসৌধ, প্রাসাদ, দুর্গ, মসজিদ ও সমাধিসৌধ নির্মাণ করেন। অটল মসজিদ হলো একটি বিখ্যাত স্থাপত্য নিদর্শন।

ইব্রাহিম শাহ্ শর্কি নির্মিত জামি মসজিদ হলো জৌনপুর স্থাপত্যের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। মার্শাল মালব সুলতানদের স্থাপত্যকীর্তির প্রশংসা করেছেন। এগুলি মালবের রাজধানী মাণ্ডুতে অবস্থিত। দিল্লির স্থাপত্যরীতিকে এখানে স্থানীয় রীতির সঙ্গে মিশিয়ে অপূর্ব স্থাপত্য নির্মাণ করা হয়েছে। মাণ্ডুর দুর্গ ও মসজিদগুলি হলো তার স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সুলতান হুসেন শাহ্ অনেক নির্মাণ কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দিল্লির মতো মাণ্ডুতে জামি মসজিদ আছে। জামি মসজিদের কাছে আছে আসরাফি মহল, বাজবাহাদুর ও রূপমতীর নামে প্রাসাদ আছে।

প্রাদেশিক স্থাপত্যরীতির এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হলো গুজরাটের স্থাপত্য। এখানে হিন্দু ও মুসলমান ঐতিহ্যের সর্বাধিক মিশ্রণ হয়েছে, মুসলমান ও হিন্দু রীতি অলংকরণ পছন্দ করেছিল। এখানকার মুসলমান শাসকরা স্থানীয় উপকরণ ও কারিগরদের দিয়ে স্থাপত্য নির্মাণ করেন। ব্রোচ ও ক্যাম্বের জামি মসজিদে এই রীতির নিদর্শন আছে। আহম্মদ শাহ্ হলেন গুজরাটের সবচেয়ে বড় নির্মাতা, তিনি আমেদাবাদ নামক নতুন রাজধানীর প্রতিষ্ঠাতা। রাজধানীতে তিনি অনেক সুদৃশ্য অট্টালিকা নির্মাণ করেন। ফিরিস্তা লিখেছেন যে আমেদাবাদ হলো হিন্দুস্তানের সবচেয়ে সুন্দর শহর, সম্ভবত সারা পৃথিবীর (The handsomest city in Hindustan and perhaps in the whole world.)। আহম্মদ শাহের জামি মসজিদকে ফার্গুসন প্রাচ্যের অন্যতম সুদৃশ্য মসজিদ বলে উল্লেখ করেছেন (one of the most beautiful mosques in the East)। অন্য স্থাপত্য নিদর্শন হলো 'তিন দরওয়াজা'। মুহম্মদ শাহ্ শেখআহম্মদ ক্ষত্রীর সমাধিস্তম্ভ ও মসজিদ নির্মাণ করেন। গুজরাটের আর একজন শ্রেষ্ঠ নির্মাতা হলেন মাহমুদ বেগারহা (১৪৫৮-১৫১১), তিনি চাম্পানের নামে নতুন রাজধানী নির্মাণ করেন। সমাধি ও মসজিদের মিলিত মিশ্র রূপ হলো রওজা। নতুন কূপ নির্মাণ পদ্ধতি ওয়াভ (Wav) চালু হয়েছিল।

রাজপুতনার হিন্দু রাজারা নিজস্ব শৈলী অনুযায়ী দুর্গ, প্রাসাদ ও মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। পঞ্চদশ শতকের রাজপুত স্থাপত্যের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হলো চিতোর দুর্গের কীর্তিস্তম্ভ, রাণা কুম্ভ এটি নির্মাণ করেন (১৪৪০)। কুম্ভ শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, রানপুরে (যোধপুর) তিনি চৌমুখ মন্দির নির্মাণ করেন। গোয়ালিয়রে মানসিংহ প্রাসাদ নির্মাণ করেন, এটি রাজপুত স্থাপত্যরীতির এক উজ্জ্বল নিদর্শন। বিজয়নগরের রাজারা হিন্দু শৈলীর অনুসরণে রাজধানী ও বিট্টলস্বামী মন্দির নির্মাণ করেন। পেজ লিখেছেন যে বিজয়নগর শহর ছিল রোমের মতো বৃহৎ এবং অতিশয় সুন্দর (as large as Rome and very beautiful to look at)। বাহমনি রাজারা প্রাসাদ, দুর্গ, মাদ্রাসা, মসজিদ ও স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন। বিজয়নগর শৈলীর দুটি

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো রাজসভার প্রবেশ দুয়ার গোপুরম এবং মন্দিরের প্রবেশ মুখে বিশাল মণ্ডপ।

সুলতানি যুগের চিত্রকলায় দুটি ধারা লক্ষ করা যায়। একটি হলো পুরনো ঐতিহ্যনির্ভর ধারা, অপরটি নতুন আঙ্গিকে সমৃদ্ধ নতুন ধারা। তুর্কিরা পারস্যের শিল্প ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত ছিল, তাদের মাধ্যমে পারস্যের চিত্রশিল্পরীতি ভারতে প্রবেশ করেছিল। পারস্য রীতির সঙ্গে স্থানীয় রীতি মিশে গিয়ে নতুন চিত্রশিল্পরীতি গড়ে উঠেছিল। মুসলমান সংস্কৃতি মূর্তি আঁকার বিরোধী ছিল, কিন্তু সুন্দরভাবে ফুল ও কোরানের বাণী অঙ্কনে কোনো বাধা ছিল না। চিত্রশিল্পের প্রতি অনেক মুসলমান শিল্পীর অনুরাগ ছিল। ভারতে কাগজের ব্যবহার শুরু হলে গ্রন্থের ওপর চিত্র অঙ্কনের কাজ শুরু হয়েছিল। মাণ্ডুর সুলতান নাসির শাহ্ খল্জি চিত্রশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাঁর চিত্ররীতিতে হেরাতের অনুকরণে রঙ ব্যবহার করা হয়েছে, সমকালীন ভারতীয় চিত্রকলায় সিরাজের চিত্রাঙ্কন রীতির প্রভাব পড়েছে। ভারতের চিত্রকররা পারস্য রীতি আয়ত্ত করলেও দেশীয় রীতিকে বিসর্জন দেননি। গুজরাটে জৈনরা পুঁথিতে চিত্রাঙ্কন শুরু করেন। শুধু গুজরাট নয়, রাজস্থান, দিল্লি ও পূর্ব ভারতে পুঁথি অঙ্কনের রীতি গড়ে উঠেছিল। জৈনদের চিত্ররীতিতে ছবিগুলি খুব স্পষ্ট, মানুষের মুখ ও অবয়ব প্রাধান্য পেয়েছে, রঙের খুব বৈচিত্র্য ছিল না, দু-একটি রঙ ব্যবহার করা হয়েছে।

সুলতানি যুগে নতুন আঙ্গিকের চিত্র আছে মাণ্ডুর কল্পসূত্রের পুঁথি, জৌনপুর পুঁথি এবং কালকার্য কথায়। এই সব চিত্রে নতুন রীতির আবির্ভাব সূচিত হয়েছে। মহাভারতের আরণ্যক পর্বের পুঁথি, মহাপুরাণের পুঁথি ও বিলহনের চৌরপঞ্চশিকার পুঁথিতে এই চিত্ররীতির পরিচয় আছে। পারসিক রীতিতে মুল্লা দাউদ চন্দায়নে নতুন রীতির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। নতুন শিল্পরীতিতে মধ্য এশিয়া, ইরান, চীন ও মঙ্গোলিয়ার প্রভাব পড়েছিল, ভারতের শিল্পরীতি অবশ্যই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

সুলতানি যুগে ঐক্য ও সমন্বয়ের প্রয়াস শুধু ধর্মবিশ্বাস ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে ছিল না, চিত্রকলা ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তা লক্ষ করা যায়। তুর্কিরা আরবদের সঙ্গীত ঐতিহ্য লাভ করেছিল, ইরান ও মধ্য এশিয়ার ঐতিহ্য এই ধারাকে পুষ্ট করেছিল। তুর্কিরা নতুন বাদ্যযন্ত্র রবাব ও সারেঙ্গি সঙ্গে এনেছিল, সঙ্গীতের নতুন পদ্ধতি ও বিধি-বিধানও তাদের সঙ্গে ভারতে প্রবেশ করেছিল। বাগদাদের খলিফার রাজসভায় ভারতীয় সঙ্গীতকাররা ছিলেন। সুলতানি যুগে ইসলামী ও ভারতীয় সঙ্গীতের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হয়। আমীর খসরু ছিলেন সঙ্গীতে একজন বিশেষজ্ঞ, তিনি অনেকগুলি বিদেশী রাগ ইমন, গোরা ও সনম ভারতে প্রবর্তন করেন। বলা হয় যে তিনি হলেন কাওয়ালির স্রষ্টা, আরো বলা হয়েছে যে তিনি হলেন সেতারের

প্রবর্তক। তবে এসম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না, তবলা মুসলিম সংস্কৃতি প্রবর্তন করেছিল।

ফিরুজ তুঘলকের আমলে সঙ্গীতের সমন্বয় আরও এগিয়েছিল। তাঁর শাসনকালে সঙ্গীতের একটি আকর গ্রন্থ রাগদর্পণ ফার্সি ভাষায় অনূদিত হয়। সুফিরা সঙ্গীতের আয়োজন করতেন, নৃত্যেও তাঁদের আপত্তি ছিল না। সুফিদের খান্‌কা থেকে সঙ্গীত অভিজাতদের প্রাসাদে পৌঁছেছিল। জৌনপুরের সুলতান হুসেন শর্কি সঙ্গীতের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সুফি দরবেশ পীর বোধান হলেন এযুগের একজন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী, গোয়ালিয়রের রাজ পরিবার সঙ্গীত চর্চাকে উৎসাহ দেন। গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহ খুব সঙ্গীত ভালোবাসতেন, তাঁর আদেশে *মানকৌতূহল* নামে সঙ্গীতের ওপর একখানি গ্রন্থ রচিত হয়। এই গ্রন্থে মুসলমানদের সব সঙ্গীত পদ্ধতি স্থান পেয়েছিল। উত্তর ভারতের সঙ্গীতের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের মিল খুব বেশি নেই। অনেকে মনে করেন যে উত্তর ভারতে মুসলিম তান, রাগ প্রধান সঙ্গীত পদ্ধতির প্রবর্তন হলে উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণের পার্থক্য গড়ে ওঠে। কাশ্মীরের সুলতানরা সঙ্গীতের নতুন রীতির প্রবর্তন করেন, পারস্য রীতির প্রভাব পড়েছিল কাশ্মীরী রীতির ওপর। জৌনপুর জয় করে সিকান্দর লোদি সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। আফগান শাসকরা সঙ্গীতের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, শেরশাহের একজন বংশধর আদালি সঙ্গীতের একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। মুঘল যুগে ভারতীয় সঙ্গীতের আরো উন্নতি ঘটেছিল, স্বাতন্ত্র্য তৈরি হয়েছিল।

দ্বাদশ অধ্যায়	আঞ্চলিক ইতিহাস

আঞ্চলিক ইতিহাসের উপাদান

আধুনিক কালে ইতিহাসের ধ্যানধারণা পাল্টে গেছে। ইতিহাস আজ আর শুধু সুলতান, রাজা, দরবার ও শাসকগোষ্ঠীর কাহিনী নয়। ঐতিহাসিক মানুষের সামগ্রিক জীবন-যাত্রার উপকরণ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি, শিল্প-বাণিজ্য, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ইতিহাস লেখা হচ্ছে। ইতিহাসের বিষয়বস্তুর যেমন বিস্তার ঘটেছে, উপকরণ সংগ্রহের ক্ষেত্রও পাল্টে গেছে, প্রসারিত হয়েছে। আদি মধ্যযুগের ইতিহাসের জন্য আর শুধু লিখিত উপাদানের ওপর নির্ভর করা হয় না। হাজার হাজার উপাদান সাহিত্য, কাব্য, জনশ্রুতি, লোককথা, ভাট ও চারণ কবিদের রচনা ও পল্লী কবিদের গানে ছড়িয়ে আছে। ইতিহাসের উপাদানের মধ্যে বৈচিত্র্য এসেছে, বিচিত্র উৎস থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে ইতিহাস রচনা করা হচ্ছে। ইতিহাস অনেকবেশি বর্ণময়, বৈচিত্র্যময় ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ভারত হলো একটি বিশাল বৈচিত্র্যময় দেশ, এর আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য রয়েছে, আদি মধ্যযুগ থেকে এই স্বাতন্ত্র্য গড়ে উঠেছে। স্থানীয় শাসকরা এই স্থানীয় স্বাতন্ত্র্যকে উৎসাহ দিয়েছেন। আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য নিয়ে ভারতের জাতীয় ইতিহাস গড়ে উঠেছে। স্বাতন্ত্র্যকে ধ্বংস করে নয়, স্বাতন্ত্র্যকে গ্রহণ করে সমন্বয়সাধন করা হলো ভারত সংস্কৃতি ও ইতিহাসের মূল সুর। ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক কারণে ভারতের সমন্বয়বাদী ইতিহাসের ধারা গড়ে উঠেছে।

সংস্কৃত, হিন্দি, রাজস্থানী, মারাঠি, গুরুমুখি, ওড়িয়া ও অসমিয়া ভাষায় ইতিহাসের উপকরণ ছড়িয়ে আছে। আদি মধ্যযুগের বেশিরভাগ তথ্য পাওয়া যায় সংস্কৃত আকর থেকে। ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্য এই ভাষায় বিধৃত হয়ে আছে। ইতিহাস, পুরাণ, মহাকাব্য, বংশাবলী সব সংস্কৃত ভাষায় লেখা হয়েছে। জার্মান পণ্ডিত জি. বুলার (Buhler) অনেকগুলি পুঁথি সংগ্রহ করে গুজরাটের আঞ্চলিক ইতিহাসের ভিত্তি স্থাপন করেন। ভাওদাজী ও ভগবানলাল ইন্দ্রাজী আরো অনেক পুঁথি সংগ্রহ করে গুজরাটের ইতিহাসের ভিত্তিকে শক্তিশালী করে গঠন করেছেন। গুজরাটের জৈন গুরুরা সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় অনেক প্রবন্ধ ও ইতিহাস লিখেছেন। মেরুতুঙ্গের প্রবন্ধচিন্তামণি এবং রাজশেখরের প্রবন্ধকোষ হলো এধরনের গ্রন্থ। জিনমনদন উপাধ্যায় লেখেন চালুক্য রাজা কুমার পালের জীবনী 'কুমারপাল চরিত'। হেমচন্দ্রের কাব্যে ইতিহাসের উপাদান ছড়িয়ে আছে। দ্বাদশ শতকে জয়সিংহ সুরি লেখেন হামির মদমর্দন,

ন্যায়চন্দ্র সুরি হামির মহাকাব্য। হামির মহাকাব্যে আলাউদ্দিনের রণথম্ভোর জয়ের কাহিনী আছে।

আধুনিককালে রাজস্থানের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করেছেন কবিরাজ শ্যামল দাস। মেবারের রানার সভাকবি *বীরবিনোদ* নামে যে ইতিহাস লিখেছেন তাতে বহু ঐতিহাসিক উপাদান স্থান পেয়েছে। রাজস্থানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ইতিহাসের বহু নতুন উপকরণ তিনি সংগ্রহ করেছেন। গৌরীশংকর হীরাচাঁদ ওঝা ও হরিবিলাস সারদা রাজস্থানের ইতিহাসের অনেক উপাদান সংগ্রহ করেছেন। ওঝার *মধ্যকালীন ভারতীয় সংস্কৃতি* ও *ভারতীয় প্রাচীনলিপিমালা* মধ্যযুগের ইতিহাসের ওপর আলোকপাত করেছে। এই ধারার সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন হরিবিলাস সারদা। আজমীরের ইতিহাস, রাণা কুম্ভ ও সংগ্রাম সিংহের জীবনীতে তিনি নতুন উপকরণের সন্ধান দিয়েছেন। রঘুবীর সিংহ, দশরথ শর্মা ও নাহাতা ভ্রাতৃদ্বয় নতুন উপকরণের কথা জানিয়েছেন। সি. ভি. বৈদ্য ও এইচ. সি. রায় উত্তর ভারতের রাজবংশগুলির ইতিহাসে নতুন উপাদানের সন্ধান দিয়েছেন। জেমস টড দেখিয়েছেন যে রাজস্থানে ঐতিহাসিক উপাদানের অভাব নেই। হিন্দুদের ইতিহাসবোধ ছিল স্বতন্ত্র ধরনের। রাজস্থানের খত (Khyat) সাহিত্য, রসো কাব্য, সরকারি পরোয়ানা, রুক্কা ও সনদে ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যায়।

জৈনগুরু ভানুচন্দ্রের জীবনী লেখেন সিদ্ধিচন্দ্র উপাধ্যায়। তিনি ছিলেন আবুল ফজলের সমসাময়িক, তার সঙ্গে উপাধ্যায়ের পরিচয় ছিল। উপাধ্যায় এই গ্রন্থে আকবর ও আবুল ফজলের গুণাবলীর প্রশংসা করেছেন। তরুণ সম্রাট সব শিল্পকর্ম, সর্বজ্ঞান যেমন আয়ত্ত করেছেন তেমনি তিনি হলেন সাহসী ও শক্তিশালী। আবুল ফজল সম্পর্কে লেখা হয়েছে যে তিনি হলেন বিজ্ঞতম ব্যক্তি, সব শাস্ত্রের সঙ্গে তার পরিচয় আছে, সব সাহিত্য তিনি পাঠ করেছেন (He (Abul Fazal) had gone through the ocean of the whole literature and he was the best among all men of learning. There is nothing in literature which was not seen or heard by him.)। আকবরের সমসাময়িক উত্তরপ্রদেশের বারাণসী দাস নামক একজন বণিক তার আত্মজীবনী 'অর্ধ কথনক' (১৬৪১) লিখেছিলেন। ঐতিহাসিকরা এই গ্রন্থখানিকে অসাধারণ বলেছেন কারণ লেখক নির্মোহ, স্বচ্ছ মুক্ত দৃষ্টি নিয়ে নিজের জীবন ও পারিপার্শ্বিককে দেখেছেন (Banarasi Das stands outside himself, as it were, and views the incidents of his life, no less his actions, with the perfect detachment of an observer and mirrors them with such conspicuous honesty and frankness that we are left simply amazed.)।

তিনি সমকালের শিল্প-বাণিজ্য, রাস্তাঘাট ও পরিবহনের কথাও উল্লেখ করেছেন। রাজধানী আগ্রায় তিনি জিনিসপত্রের দাম অত্যন্ত সস্তা ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। আকবর তার সভাকবি গোবিন্দ ভট্টকে আকবরের যুগের কালিদাস আখ্যা দিয়েছিলেন। মোগল শাসকরা সংস্কৃত ভাষাকে অবহেলা করেননি। সপ্তদশ শতকে জগন্নাথ পণ্ডিতরাজ শাহজাহানের আনুকূল্য লাভ করেন।

মধ্যযুগের ইউরোপের চারণ কবিদের মতো আদি মধ্যযুগের ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ভাট, চারণ, পল্লীকবি, পাঁচালিকার, জারি ও সারি গানের গীতিকাররা ছিলেন। ভারতের মহাকাব্য দুটিতে বীরগাথার চলন ছিল বলে জানা যায়। সূত ভাট ও চারণরা মুখে মুখে গান করে তাদের পৃষ্ঠপোষকের কীর্তি প্রচার করত। রাজস্থানের ডিঙ্গল সাহিত্যে ব্রাহ্মণ, চারণ, জৈন সাধু (যতি) মুসলমান ফকির ও ক্ষত্রিয় পূজারীদের কথা আছে। এর মধ্যে চারণরা ছিল রাজস্থানের জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রাজস্থানের সব রাজপরিবারের চারণ ছিল। শিশোদিয়াদের (মেবার) চারণ ছিল গোদারা, মাড়োয়ারের রোহড়িয়া এবং চৌহানদের বারহঠ দুসরাবত। চারণদের ধর্ম ছিল পাঁচ মিশালী, পোশাকি ধর্ম ছিল পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, জনপ্রিয় ধর্ম ছিল তান্ত্রিক শক্তি উপাসনা। এদের সামাজিক অবস্থান ছিল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যবর্তী স্থানে। চারণ গুণ ও স্বভাবে ছিল ব্রাহ্মণ, কর্মে ক্ষত্রিয়, আচার-ব্যবহারে, অশনে-বসনে সর্বসংস্কার মুক্ত রাজপুত।[১] চারণের গুরু ও পুরোহিত ছিল ব্রাহ্মণ। চারণ শাকাহারী না হলেও ছিল অহিংসবাদী। চারণ যজমানের জন্য যুদ্ধ করত, যজমানকে অন্যায় রক্তপাত থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিত।

মধ্যযুগের চারণ জাতির আচরিত ধর্ম হলো *তুষ্টি, পুষ্টি, ধৃতি, দীপ্তি এবং 'সূর্য-চন্দ্র নিববর্ধনকারী'*। চারণ অল্পে সন্তুষ্ট থাকত, স্তুতি দ্বারা ক্ষত্রিয়ের তুষ্টি, পুষ্টি ও দীপ্তি বর্ধন করত। চারণ 'ধৃতি' দিয়ে রাজপুত সমাজের ধারক হয়েছিল। চারণের গাথায় আদি মধ্যযুগের অনেক রাজবংশের কীর্তি ভাস্বর হয়ে আছে। চারণ কখনো নাচ-গান করত না, ডোম ও ডোমনীরা একাজ করত। রাজপুত সমাজের ভব্য পরিবেশে চারণ অভিজাতদের সামনে রৌদ্র ও বীররস পরিবেশন করত। চারণ জীবিকার জন্য শুধু ক্ষত্রিয়ের কাছ থেকে দান গ্রহণ করত, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রদের দান চারণরা গ্রহণ করত না। চারণরা কাব্যরচনাও করত। চারণরা রাজপুতদের সখা, উপদেষ্টা ও গুরু ছিল। মাড়োয়ারের রাজা উদয়সিংহ নিষ্কর ভূমি অধিগ্রহণ করলে চারণ লাখার নেতৃত্বে চারণরা প্রতিবাদে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিল। অপমানিত হলে চারণ অবলীলায় জাপানের সামুরাইদের মতো আত্মহত্যা করত।

১. কালিকারঞ্জন কানুনগো, *রাজস্থান কাহিনী*, পৃ. ১৩৭

পূর্ব ভারতে অনেক পল্লীকবি ছিলেন যারা গান গেয়ে মানুষের মনোরঞ্জন করত। সুকুমার সেন জানিয়েছেন যে বাংলা, বিহার, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু, মহারাষ্ট্র, মধ্যভারত ও ওড়িশায় যোগীরা (গোরখনাথের অনুগামী) গোবিন্দচন্দ্রের গান গেয়ে ভিক্ষা করে জীবন কাটাত। দীনেশচন্দ্র সেনও গোপীচন্দ্র ও ময়নামতীর গানের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে এই গান করুণ রসের উদ্রেক করত। পূর্বভারতে লব-কুশ নামে এক ধরনের চারণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এরা গান ও নাচ করে সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জন করত। বাংলার কবিগান, পালাগান, জারি ও সারিতে সাধারণ মানুষের দুঃখ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে। সংস্কৃতির ইতিহাসে এদের মূল্য কম নয়। বাংলার গ্রামাঞ্চলে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী নিয়ে কথকতা হতো। এগুলি নিঃসন্দেহে লোকশিক্ষার মাধ্যম ছিল। নিরক্ষররা এগুলি শুনে সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠত, নৈতিকবোধ গড়ে উঠত। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন নামে এদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিকভাষায় রচিত সাহিত্যে ইতিহাসের উপকরণ ছড়িয়ে আছে। ওড়িশায় মাদলা পঞ্জিকা, আসামে বুরাঞ্জি সাহিত্য ও মহারাষ্ট্রে বখর সাহিত্য হলো এধরনের ঐতিহাসিক সাহিত্য। পাঞ্জাবে গুরুমুখি ভাষায় আদি গুরুগ্রন্থসাহেব লেখা হয়। মেহারবান রচিত গুরুনানকের জীবনী জনমসখীতে ঐতিহাসিক তথ্য আছে। নাথের বরণ (Varan) গ্রন্থে পাওয়া যায় গুরু হরগোবিন্দের যুদ্ধগুলির পরিচয়। শিখদের সাহিত্যে এধরনের অজস্র আধা-ইতিহাস পাওয়া যায়। আধুনিক ঐতিহাসিকরা এসব উপাদান থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ইতিহাস লিখেছেন। ভারতের সুফি দরবেশরা সমৃদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি করে রেখে গেছেন। এগুলি আদিমধ্য ও মধ্যযুগের ইতিহাস রচনায় সহায়ক হয়। সুফিকবি কৃতবন লিখেছেন মৃগাবতী, মক্রবান লিখেছেন মধুমালতী কাব্য। এগুলি হিন্দিতে লেখা, জায়সি এই ধারার অগ্রগতি ঘটিয়ে ছিলেন। সুফিরা ফারসি সাহিত্যে বিশিষ্ট অবদান রেখেছেন। সুফি সন্তদের জীবনী ও চিঠিপত্র সংরক্ষিত হয়েছে। সুফি দরবেশ মৈনুদ্দিন চিশ্‌তি, বখতিয়ার কাকী ও অন্যান্যদের বাণী সংকলিত হয়েছে। নিজামুদ্দিনের শিষ্য কবি-ঐতিহাসিক আমীর খসরু তার বাণীকে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। শরফউদ্দিন মানেরি ছিলেন একজন দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবী, তিনি লিখেছেন ইসলামের রহস্যবাদ নিয়ে গ্রন্থ মকতুবদ-ই-সাদি। শরফউদ্দিন কালান্দর ও হামিদউদ্দিন কালান্দার দরবেশদের বাণীগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন। শেখ শরফউদ্দিন আহম্মদ বিন ইয়াহিয়া ইরসাদ-উস-মালিকিন নামে সুফি ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন।

দক্ষিণ ভারত ছিল ভক্তি আন্দলনের একটি বড় ঘাঁটি। দক্ষিণের শৈব নয়নার ও বৈষ্ণব আলবার সাধুরা ভক্তি ধর্ম প্রচার করেন। ভক্তি হল মুক্তির একমাত্র পথ। নয়নার

ও আলবার সাধুরা গান লিখে গাইতেন, এই গানগুলি দক্ষিণ ভারতে খুব জনপ্রিয় ছিল। *তেবারাম ও তিরুবাচকম* হলো শৈব নয়নার সন্তদের রচিত গীত-সঙ্কলন। বৈষ্ণব আলবার সাধুরা লেখেন *নালায়িরা* প্রবন্ধম। ৬০০-৮৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এসব অনবদ্য সঙ্গীত রচিত হয়, দক্ষিণের জীবন ও সংস্কৃতির ওপর এদের অসামান্য প্রভাব লক্ষ করা যায়। তিরুমালাকাই তিরুইসাইপ্পা *শিবস্তোত্র* রচনা করেন, এগুলিও সমান জনপ্রিয় ছিল। বৈষ্ণব আচার্য নাথপুরী (রঙ্গনাথাচার্য) বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ব্যাখ্যা করেন। *ভাগবত পুরাণ*, *ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ* এবং লক্ষ্মণসেনের সভাকবি জয়দেবের *গীতগোবিন্দে* কৃষ্ণলীলা প্রাধান্য পেয়েছে। রামানুজ অনেকগুলি বৈষ্ণবদর্শন বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। মহারাষ্ট্রে জ্ঞানদেব, নামদেব, একনাথ, তুকারাম ও রামদাস বৈষ্ণব ধর্মের ওপর গ্রন্থ রচনা করেন। চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে বাংলা ভাষায় জীবনী সাহিত্য গড়ে উঠেছিল। বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যের জীবনী লিখেছেন। রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামী বৈষ্ণবধর্মের ওপর গ্রন্থ রচনা করেছেন। রূপ গোস্বামী লিখেছেন ভক্তি রসামৃত সিন্ধু ও উজ্জ্বল নীলমণি। শুধু বাংলায় নয়, ওড়িশা ও আসামে বৈষ্ণব সাহিত্য রচিত হয়েছে। কবি কর্ণপুর লেখেন সংস্কৃত ভাষায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। শংকরদেব ও তার শিষ্য মাধবদেব একশরণ ধর্মের প্রচারের জন্য বরগীত (বড়গান) ও নাটক রচনা করেন।

মধ্যযুগে বহু বিদেশী ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন। এদের মধ্যে বিখ্যাত নামগুলি হলো আলবেরুনি, মার্কোপোলো, ইবন বতুতা, মাহুয়ান, আবদুর রজ্জাক, ডমিংগো পেজ, নুনিজ, বারবোসা ও নিকিতিন। একাদশ শতকের গোড়ার দিকে আলবেরুনি ভারতে এসে *তহ্‌কিক-ই-হিন্দ* গ্রন্থে হিন্দুদের সমাজ, দর্শন, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে বহু তথ্য রেখে গেছেন। আলবেরুনি হিন্দুদের সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্রটিও তুলে ধরেছেন। মার্কোপোলো হলেন ভেনিসের লোক, তিনি দক্ষিণ ভারতে এসেছিলেন। এই অঞ্চলে তিনি যা দেখেছিলেন তার ভ্রমণবৃত্তান্তে তা স্থান পেয়েছে। ইবন বতুতা লিখেছেন রেহালা নামক ভ্রমণ বৃত্তান্ত। তিনি ভারতে চৌদ্দ বছর কাটিয়ে এদেশের রাজনীতি, সমাজ ও অর্থনীতি সম্পর্কে প্রচুর তথ্য রেখে গেছেন। ইবন বতুতা বাংলায় এসেছিলেন।[২] আবদুর রজ্জাক হলেন পারস্যের দূত, তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে বিজয়নগর রাজ্যের অনেক কথা আছে। বাহমনি রাজ্য ভ্রমণ করেন রুশ পর্যটক নিকিতিন। নিকিতিন বিজয়নগর রাজ্যের কথাও বলেছেন। নুনিজ ও বারবোসা বিজয়নগর পরিভ্রমণ করেন, চীনাদূত মাহুয়ান এসেছিলেন বাংলায়। এদের রেখে যাওয়া ভ্রমণ বৃত্তান্তগুলি হলো ভারত ও আঞ্চলিক ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য উপাদান।

২. এই গ্রন্থের ইবন বতুতা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

রাজস্থান

রাজস্থানের ইতিহাসে আলাউদ্দিন খল্‌জির রাজত্বকাল হলো (১২৯৬-১৩১৬) একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সুলতান রাজস্থানের সমগ্র অঞ্চল জয় করে তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেন। ঐ সময় থেকে রাজপুতনার পুরনো যুগের শেষ হয়, শুরু হয় নতুন যুগ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার। এই পর্বে মেবার ও মাড়োয়ার রাজ্য এবং তাদের অধীনস্থ সামন্তরাজ্যগুলির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তুঘলকদের সময়ে দিল্লি সুলতানির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মেবারে শিশোদীয় এবং মাড়োয়ারে রাঠোররা স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিল। রাও চুনড়া সম্বর, নাগর ও আজমীর দখল করে মাড়োয়ার রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। মেবার, ভাট্টি ও মুলতানের প্রতিকূলতার জন্য মাড়োয়ার রাজ্যের তেমন উন্নতি হয়নি। রাও যোধা (১৪৩৮-৮৯) মাড়োয়ার রাজ্যের রাজধানী যোধপুর স্থাপন করেন। মেবার রাজ্যের উত্থানের ইতিহাস রহস্যাবৃত হয়ে আছে। বলা হয় রাজা হাম্মির হলেন মেবার রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। আরাবল্লী পর্বতের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে তিনি মুসলমান শক্তি ও মাড়োয়ারের বিরুদ্ধে লড়াই করে চিতোর উদ্ধার করেন। তাঁর পুত্র ক্ষেত্র সিংহ বুন্দির বিরুদ্ধে লড়াই করে তার বশ্যতা আদায় করেন। ক্ষেত্র সিংহ মাড়োয়ার ও মালবের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন। মুহানত নেনসির (Muhanote Nensi) 'খত' থেকে এসব তথ্য পাওয়া যায়। ক্ষেত্র সিংহের পুত্র লক্ষ সিংহ (লাখা) মেবারের রাণা হন। তাঁর সময়ে তাঁর রাজ্যে দস্তা ও রুপোর খনি পাওয়া যায়, এতে মেবারের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়েছিল। মালব ও মাড়োয়ারের সঙ্গে দ্বন্দ্ব চলেছিল।

রাণা কুম্ভ হলেন মেবার রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা (১৪৩৩-৬৮)। তাঁর শাসনকালে মেবার তার শক্তি বৃদ্ধি করেছিল। সম্বর, নাগর, আজমীর ও রণথম্ভোর তিনি জয় করেন, সীমান্ত রাজ্য বুন্দি, কোটা ও দুঙ্গারপুরের ওপর তিনি আধিপত্য স্থাপন করেন। কোটা ও দুঙ্গারপুর নিয়ে তিনি পার্শ্ববর্তী মালব ও গুজরাটের সুলতানদের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। নাগরের মুসলিম শাসক কুম্ভের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে গুজরাটের সুলতানের সাহায্য প্রার্থনা করেন। রাণা কুম্ভ মালবের সুলতানের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে আশ্রয় দেন। প্রত্যুত্তরে মালবের সুলতান মাহমুদ খল্‌জি রাণার রাজনৈতিক শত্রুদের আশ্রয় দেন। গুজরাট ও মালবের সঙ্গে দ্বন্দ্বে কুম্ভের জীবনের অনেকখানি সময় কেটে যায়। চতুর্দিক থেকে আক্রান্ত হয়েও তিনি মেবারে তাঁর অধিকার বজায় রাখতে সক্ষম হন। গুজরাটের শাসক কুম্ভলগড় কয়েকবার আক্রমণ করেন। মালবের সুলতান আজমীর দখল করে নিজের প্রতিনিধিকে শাসক হিসেবে সেখানে স্থাপন করেন। রাণা এইসব আক্রমণ প্রতিহত করেন। রণথম্ভোর ছাড়া আর সব অঞ্চল তাঁর অধিকারে ছিল। রাণা কুম্ভ একজন বিদ্বান লোক ছিলেন এবং পণ্ডিতদের তিনি পৃষ্ঠপোষকতা

করেন। তিনি জয়দেবের *গীতগোবিন্দের* ওপর টীকা লেখেন, রচনা করেন *সঙ্গীতরাগ, সঙ্গীত মীমাংসা* এবং *সুরপ্রবন্ধ*। তাঁর স্থপতি স্থাপত্যবিদ্যার ওপর গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি নির্মাণ করেন কুম্ভস্বামী, আদিবরাহ মন্দির এবং কীর্তিস্তম্ভ। জলসেচের জন্য তিনি অনেকগুলি সেচকূপ ও জলাশয় নির্মাণ করেন।

মেবারে বেশ কিছুকাল ধরে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব চলেছিল। কুম্ভের পুত্র উদয় তার পিতাকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন। সামন্তরা তাঁকে রাণা হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করলে তিনি পালিয়ে যান। রায়মল্ল সিংহাসনে বসেন এবং দীর্ঘ ছত্রিশ বছর (১৪৭৩-১৫০৯) রাজত্ব করেন। তিনি মেবার রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। মালব ও গুজরাটের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যান। তাঁর সময়ে মেবারে উপজাতি বিদ্রোহ হয়েছিল। মেবার রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা হলেন রাণা সঙ্গ। ১৫০৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি মেবারের রাণা হন এবং ১৫২৮ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। উত্তর ভারতে এই সময় মেবার ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ্য। রাণা সঙ্গ দিল্লি অধিকার করে রাজ্য স্থাপনের কথা ভেবেছিলেন। এই সময় মালব রাজ্য অভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্য দুর্বল হয়ে পড়েছিল। মালবের সঙ্গে প্রতিবেশী চান্দেরির রাজার বিরোধ চলেছিল। মালবের সুলতান গুজরাটের সাহায্যপ্রার্থী হন, চান্দেরির রাজা মেদিনী রায় রাণা সঙ্গের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে এক যুদ্ধে রাণা সঙ্গ মালবের সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদকে পরাস্ত করে বন্দী করেন। পূর্ব মালব চান্দেরি সহ রাণার রাজ্যভুক্ত হয়।

মালবের দুর্দশা দেখে দিল্লির লোদি সুলতান ইব্রাহিম সতর্ক হন। লোদি সুলতান মালবের অধিকার নিয়ে সঙ্গের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামেন। ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ রাজস্থানে ঘাটোলির যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদি বিপর্যয়ের মুখে পড়েন, সঙ্গ এই যুদ্ধে আহত হন। সঙ্গ আগ্রা অঞ্চলে প্রভাব বৃদ্ধির চেষ্টা করলে লোদি সুলতানের সঙ্গে তাঁর খণ্ডযুদ্ধ চলতে থাকে, লোদি-রাজপুত দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে বাবর ভারত আক্রমণ করেন। রাজস্থানের আর একটি উদীয়মান শক্তি হলো মাড়োয়ারের রাঠোর রাজ্য। মাড়োয়ার রাজ্যের শত্রু ছিল মেবার, জয়সলমীরের ভাট্টিরা এবং সিন্ধু অঞ্চলের মুসলমান শক্তি। মুসলমান শক্তির সহায়তা নিয়ে মল্লিনাথ ক্ষমতা দখল করলে আধুনিক মাড়োয়ার রাজ্যের ইতিহাস শুরু হয়। চুন্ড়া হলেন পরবর্তী শাসক। তিনি মান্দোর জয় করে রাজধানী নির্মাণ করেন। তাঁর পৌত্র যোধা মাড়োয়ারের আধুনিক রাজধানী যোধপুর প্রতিষ্ঠা করেন। ১৪২৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ রণমল্ল ছিলেন মাড়োয়ারের শাসক। তিনি মেবার রাজ্যেও প্রভাবশালী ছিলেন। আততায়ীর হাতে রণমল্ল নিহত হলে যোধা মাড়োয়ারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। মেবার ও মাড়োয়ারের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয় এবং পাঁচবছর ধরে তা চলেছিল। গুজরাট ও মালবের সুলতানরা মাড়োয়ারের সঙ্গে যোগ দেন। রাঠোররা চোকসি, কোসানো, মান্দোর, সোঝাত ও আজমীর অধিকার করেছিল।

রাঠোর 'খতে' এসবের জন্য কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছে রাজা যোধাকে। রাঠোররা পার্শ্ববর্তী অঞ্চল জয় করে স্বতন্ত্র সামন্ত রাজ্য স্থাপন করেছিল। সতলমীর, বিকানীর ও মার্তাতে রাঠোর রাজপুত্ররা অধিকার স্থাপন করেছিল। শেষপর্বে রাঠোর রাজপুত্রদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে লড়াই চলেছিল। রাঠোর রাজ্যটি ছিল অনেকগুলি সামন্তরাজ্যের সমষ্টি। রাজপুত রাজনৈতিক জীবনের বৈশিষ্ট্য হলো প্রত্যেক উপজাতির জন্য একটি করে পৃথক রাষ্ট্র (one clan one state)। কর্নেল টড ইউরোপের সামন্তব্যবস্থার সঙ্গে রাজপুতব্যবস্থার সাদৃশ্য লক্ষ করেছেন। ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে রাজপুত সামন্তব্যবস্থার মৌল পার্থক্য লক্ষ করা যায়। এখানে রাজা নন, সমগ্র রাজ্য হলো সমগ্র উপজাতির (the state belonged to the clan, the king being only the mouthpiece of the same.) রাজা হলেন উপজাতির মুখপাত্র। সর্দাররা ছিল অত্যন্ত প্রভাবশালী। ইউরোপের মতো নিরঙ্কুশ স্বৈরাচার রাজপুতদের উপজাতি রাষ্ট্রব্যবস্থায় ছিল না। রাজস্থানে উপজাতি ভ্রাতৃত্বের ধারণা ছিল (ভায়াদ)। রাজা হলেন সমাজের প্রধান, অবৈধ সন্তান সিংহাসন পেত না। দিল্লি সুলতানি ব্যবস্থার প্রভাবে রাজপুত রাজারা স্বৈরাচারের পথে পা বাড়িয়েছিলেন। প্রত্যেক রাজপুত রাজ্যে শাসকগোষ্ঠী ছিল সংখ্যালঘু, সংখ্যাগুরু মানুষ ছিল অরাজপুত। রাজপুতদের শাসন ছিল মুষ্টিমেয় শাসকগোষ্ঠীর শাসন। সামরিক ব্যবস্থায় সামন্তপ্রথা ছিল, রাজাকে সৈন্য সরবরাহ করত সামন্তরা। এরা তাদের উপজাতি নেতার নেতৃত্বে লড়াই করত। এই ব্যবস্থার ধীরে ধীরে পরিবর্তন এসেছিল। রাজারা নিজেদের অধীনে বেতনভুক সৈন্যবাহিনী গঠন করে রাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করেন। সুলতানি শাসনের প্রভাব পড়েছিল রাজপুত সামরিক সংগঠনের ওপর।

বিজয়নগর

চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে দিল্লি সুলতানির পতনের যুগে দক্ষিণে বিজয়নগর ও বাহমনি রাজ্য স্থাপিত হয়। এই দুই রাজ্য দক্ষিণ ভারতে দুশো বছর ধরে কর্তৃত্ব বজায় রেখেছিল (১৩৫০-১৫৬৫)। এই দুটি রাষ্ট্র পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল, কিন্তু শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করেছিল, শাসন বজায় রেখেছিল। শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি হয়েছিল, অনেকগুলি শহরও গড়ে উঠেছিল। শাসকরা কৃষি ও শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিতে উৎসাহ দেন, রাজধানী সহ অন্যান্য শহর গড়ে তোলেন। এদের উৎসাহে সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নতি হয়। পঞ্চদশ শতকের শেষদিকে বাহমনি রাজ্য পাঁচটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়, বিজয়নগর রাজ্য তালিকোটার যুদ্ধের পর (১৫৬৫) ভেঙে পড়েছিল। এই পর্বে পর্তুগিজরা ভারত মহাসাগরে তাদের নৌসাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল (এস্টাডো দ্য ইন্ডিয়া)।

বিজয়নগর রাজ্যের উৎপত্তির সঙ্গে বহু জনশ্রুতি জড়িয়ে আছে। হরিহর ও বুক্কা হলেন এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ১৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে হাম্পি-হস্তিনাবতীতে হরিহরের অভিষেক হয় এবং তিনি রাজধানী বিজয়নগর স্থাপন করেন। ঐতিহ্য অনুসারে হরিহর ও বুক্কা কাকতীয়দের বরঙ্গল রাজ্যের কর্মচারী ছিলেন, পরে কর্ণাটকের কাম্পিলি রাজ্যের অধীনে চাকরি নেন। মহম্মদ বিন তুঘলক কাম্পিলি আক্রমণকালে এদের বন্দী করেন, এরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন, পরে এরা বিদ্রোহী হন, ইসলাম ত্যাগ করে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে ধর্মের রক্ষক হন। আধুনিক ঐতিহাসিকরা এই ঐতিহ্য বাতিল করে দিয়েছেন। এদের মতে, শৈব হরিহর ও বুক্কা ছিলেন বিদ্রোহী কর্ণাটকের নায়ক। এঁরা রাজ্য স্থাপন করে তামিল, তেলেগু ও কানাড়া ঐতিহ্য বহন করেন, তাঁরা হয়ে ওঠেন সমগ্র দক্ষিণ ভারতের নেতা। তুঘলক শাসনের অধঃপতনের যুগে দক্ষিণে জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। পুরনো রাজবংশ কাকতীয়, হৈসল ইত্যাদি অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছিল, অন্যদিকে অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপিত হয়। নতুন রাজ্যগুলি হলো মাদুরাইয়ের সুলতানি রাজ্য, বরঙ্গলে ভালেমাদের রাজ্য এবং তেলেঙ্গানায় রেড্ডিদের রাজ্য। পরে বিজয়নগরের উত্তরে বাহমনি রাজ্য স্থাপিত হয়। এই রাজ্যগুলি পরস্পরের সঙ্গে সর্বদা কলহে লিপ্ত ছিল, পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য এরা জোট বাঁধত। মাদুরাই সুলতানের সঙ্গে হৈসলরাজা তৃতীয় বল্লালের বিরোধ ছিল, সুলতান তাকে পরাস্ত ও নিহত করেন (১৩৪২)। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে হরিহর ও বুক্কা সম্প্রসারণবাদী অভিযান শুরু করেন, হৈসল রাজ্য বিজয়নগরের অন্তর্ভুক্ত হয়। মাদুরার সুলতানের সঙ্গে বিজয়নগর দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। ১৩৭৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বিজয়নগরের ক্রমাগত আক্রমণে মাদুরাই সুলতানির পতন ঘটেছিল।

১৩৭৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বিজয়নগর রাজ্য দক্ষিণে রামেশ্বরম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, কেরালার যে অংশ মাদুরাই সুলতানির মধ্যে ছিল তা বিজয়নগরের অন্তর্ভুক্ত হয়। হরিহর ১৩৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন, তাঁর গুরু ছিলেন বিদ্যারণ্য। হরিহর কৃষির সম্প্রসারণে উৎসাহ দেন, জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষ বসানো হয়। দেশটি শাসনের জন্য তিনি স্থল, নাড়ু ও সীমায় ভাগ করে রাজস্ব সংগ্রহ ও শাসনের ব্যবস্থা করেন। হরিহরের ভ্রাতা বুক্কা (১৩৫৬-৭৭) এই ক্ষুদ্র রাজ্যটিকে সম্প্রসারিত করার জন্য বিজয় অভিযান শুরু করেন। সমগ্র দক্ষিণ ভারতে আধিপত্য স্থাপন করা ছিল তার উদ্দেশ্য (to conquer the entire south and bring it under his hegemony.)। তাঁর নেতৃত্বে বিজয়নগর তামিল অঞ্চল জয় করে রাজ্যভুক্ত করেছিল। বিজয়নগর রাজ্যের সঙ্গে উত্তরের বাহমনি রাজ্যের দীর্ঘস্থায়ী শত্রুতা চলেছিল। বরঙ্গল ও তেলেঙ্গানার শাসকরা বিজয়নগরের উত্থানে আতঙ্কিত হয়ে বাহমনির সঙ্গে

বন্ধুত্ব করেছিল। এরা মনে করেন যে বাহমনি রাজ্য দক্ষিণের রাজগুলির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করবে। বাহমনি রাজ্যের সঙ্গে বিজয়নগরের বিরোধের প্রধান কারণ ছিল তিনটি। কৃষ্ণা-তুঙ্গভদ্রা দোয়াব, কৃষ্ণা-গোদাবরী উপত্যকা ও মারাঠা অঞ্চল নিয়ে বিরোধের সৃষ্টি হয়। কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার মধ্যবর্তী অঞ্চল ছিল উর্বর এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধ। চোল-চালুক্য এবং যাদব ও হৈসলদের মধ্যে এই অঞ্চল নিয়ে আগে বিরোধ হয়েছিল। কৃষ্ণা-গোদাবরী উপত্যকা শুধু উর্বর নয়, বড় বড় বন্দরগুলি ছিল এই অঞ্চলে। পশ্চিম উপকূলের কোঙ্কন নিয়ে বিজয়নগর-বাহমনি বিরোধ ছিল। পশ্চিমঘাট ও সমুদ্রের মধ্যবর্তীস্থলে অবস্থিত এই অঞ্চলের বড় বন্দর ছিল গোয়া।

প্রায় দুশো বছর ধরে বিজয়নগর-বাহমনি দ্বন্দ্ব চলেছিল। দুটি রাষ্ট্রব্যবস্থার ওপর এর অবশ্যম্ভাবী প্রভাব পড়েছিল, দুটি রাজ্য সামরিক খাতে ব্যয় বাড়াতে বাধ্য হয়েছিল। প্রায় যুদ্ধরাষ্ট্রের মতো মর্যাদা লাভ করেছিল। দুই রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী ছিল দুই ধর্মমতের, এজন্য সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ তৈরি হয়েছিল। তবে ধর্ম রাজনৈতিক আচরণে প্রাধান্য পায়নি, রাজনৈতিক কারণে দক্ষিণের রাজারা বন্ধুত্ব করতেন। বিজয়নগরের সৈন্যবাহিনীতে বহু মুসলমান সৈন্য ছিল। বিজয়নগরের রাজারা হিন্দু রাজাদের বিরুদ্ধে সমানভাবে আক্রমণাত্মক আগ্রাসী নীতি অনুসরণ করেছিলেন। ওড়িশার গজপতি শাসকরা বিজয়নগরের কিছু অংশ অধিকার করলে বিজয়নগর ও বাহমনি রাজ্য ওড়িশার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। বিজয়নগর-বাহমনি দ্বন্দ্ব শুরু হলে ধর্মীয় আবেগ প্রবল হয়ে ওঠে, জীবন, সম্পত্তি ও শহরগুলির প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। হরিহরের মৃত্যুর পর থেকে বিজয়নগর-বাহমনি দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়।,পুরুষানুক্রমে দুই রাজ্যের মধ্যে লড়াই চলতে থাকে। বুক্কার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় হরিহর রাজা হন। বুক্কা ছিলেন বিজয়নগর রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা (the real architect of the Vijayanagar empire)। তিনি ধর্মীয় সহনশীলতার নীতি অনুসরণ করে রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করেন।

বিজয়নগর রাজ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ছিল, নায়করা বিদ্রোহ করতেন, রাজপুত্ররা সিংহাসন নিয়ে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়তেন। দ্বিতীয় হরিহর (১৩৭৭-১৪০৪) উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিমে সম্প্রসারণবাদী নীতি অনুসরণ করেন। কিন্তু বাহমনি-বরঙ্গল মৈত্রীর জন্য তিনি তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারেননি, তবে পশ্চিমে তিনি বেলগাঁও ও গোয়া অধিকার করতে সক্ষম হন। উত্তর শ্রীলঙ্কায় তিনি সামরিক অভিযান পাঠিয়েছিলেন। তাঁর পরবর্তী শাসক হলেন প্রথম দেবরায় (১৪০৪-২২)। এই সময়ে তুঙ্গভদ্রা দোয়াব নিয়ে বাহমনির সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছিল। এই দ্বন্দ্ব চলা সত্ত্বেও তিনি বিজয়নগরের রাজ্যসীমা বর্ধিত করেন। ওড়িশার গজপতি শাসকদের সঙ্গে কোন্দাবিদু ও রাজামুন্দ্রি নিয়ে তাঁর বিরোধ বেধেছিল। দ্বিতীয়

দেবরায় (১৪২২-১৪৪৬) বাহমনি রাজ্যের সঙ্গে দুবার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। বাহমনি সুলতান দ্বিতীয় আলাউদ্দিন আক্রমণ শুরু করেছিলেন, মুদগান ও রায়চুর নিয়ে লড়াই হয়েছিল। দেবরায়ের সময়ে বিজয়নগর সর্বাধিক বিস্তৃত হয়। কৃষ্ণা থেকে শ্রীলঙ্কা এবং আরব সাগর থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল। কুইলন, শ্রীলঙ্কা, পুলিকট, পেগু, তেনাসেরিম ও মালয়ের রাজারা তাঁকে উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন।

বিজয়নগর রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রাজা হলেন কৃষ্ণদেব রায় (১৫০৯-১৫২৯)। এইসময় রাজ্যে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব চলেছিল, অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ছিল, গজপতি শাসকরা পূর্বদিকে আগ্রাসী ছিলেন, বাহমনি রাজ্য ভেঙে পড়লেও উত্তরের মুসলিম শাসকরা বিজয়নগরকে শত্রুরাজ্য বলে গণ্য করতেন। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব শিথিল হয়ে পড়েছিল। শাসনের শুরুতে তিনি তাঁর রাজ্যের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিকে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। বাহমনি সুলতান মাহমুদ শাহ্ তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কৃষ্ণদেব রায় বাহমনি সুলতান মাহমুদকে পরাস্ত করে তাঁকে রাজ্য ফিরিয়ে দেন। এজন্য তিনি উপাধি নেন 'যবনরাজ্য স্থাপনাচার্য'। উম্মাত্তুরের পলিগারদের পরাস্ত করে তিনি কর্তৃত্ব স্থাপন করেন, ওড়িশার আগ্রাসন দমন করার জন্য তিনি উদয়গিরি ও কোন্দাবিদু আক্রমণ করেন। বেজওয়াদা ও কোন্দাপল্লি জয় করে তিনি তেলেঙ্গানা ও বেঙ্গি আক্রমণ করেন, এগুলি এইসময় ওড়িশা রাজ্যভুক্ত ছিল। গজপতির রাজধানী কটক আক্রান্ত হলে তিনি ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হন। দুই রাজপরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

গোলকুণ্ডার কুতুবশাহী শাসক কুলি কুতুব শাহ্ ছিলেন তাঁর বিরোধী শক্তি। তিনি তেলেগু অঞ্চলগুলি জয় করার চেষ্টা করলে কৃষ্ণদেব রায় বাধা দেন। কৃষ্ণদেব রায় তার এই প্রয়াস ব্যর্থ করে দেন। বিজাপুর সুলতান ইসমাইল আদিল খানের সঙ্গে তিনি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। আদিল খান কৃষ্ণদেব রায়ের কাছে পরাস্ত হয়ে বিজয়নগরের দাবিগুলি মেনে নিতে বাধ্য হন। শালুব তীম্মের বিদ্রোহ দমন করে তিনি অচ্যুতকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কৃষ্ণদেব রায় পর্তুগিজদের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন, মূল ভূখণ্ডে পর্তুগিজ সম্প্রসারণের তিনি বিরোধিতা করেন। ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে সমগ্র দক্ষিণ ভারতে কৃষ্ণদেব রায় ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ সেনাপতি। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করতেন। বহু শহর ও রাজধানীতে তিনি তাঁর বরাহ-লাঞ্ছিত পতাকা উত্তোলন করেন। কটক, বিদর, গুলবর্গা ও বিজাপুরে তাঁর বিজয় পতাকা উড়েছিল। অসাধারণ দক্ষতা ও কৌশলে যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি সব বাধা অতিক্রম করতেন, সৈন্যদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। সারাজীবন যুদ্ধবিগ্রহে কাটলেও তিনি শাসনকে কখনো

অবহেলা করেননি। তাঁর আগে শাসনব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা চলেছিল, নায়করা অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল। প্রজাদের ওপর অত্যাচার ও উৎপীড়ন বন্ধ করার জন্য তিনি রাজ্য পরিদর্শনে বের হতেন। কৃষিক্ষেত্রে জল সরবরাহের জন্য তিনি কূপ খনন করেন, জলাশয় নির্মাণ করে দেন। বিবাহ করের মতো অত্যাচারমূলক করগুলি তিনি তুলে দেন। বহু অনাবাদী, জঙ্গলজমি পরিষ্কার করে তিনি চাষের আওতায় আনেন।

কৃষ্ণদেব রায় ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ নির্মাতা। নাগলাপুর নামে তিনি একটি নতুন শহর নির্মাণ করেন, এই শহরের অনেক সুন্দর মন্দির ও অট্টালিকা হলো তাঁর অবদান। প্রদেশগুলিতেও তিনি বহু অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলেন। মন্দিরের মণ্ডপ ও গোপুরম নির্মাণ করে মন্দির ও প্রাসাদগুলিকে তিনি বৈশিষ্ট্য দান করেন। কৃষ্ণদেব রায়ের সবচেয়ে বড় পরিচয় হলো তিনি ছিলেন সংস্কৃতি ও সাহিত্যের উৎসাহী সমর্থক। দেশের সব শিল্পী ও কারিগরকে তিনি নির্মাণের কাজে লাগিয়েছিলেন। সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য তাঁর উপাধি হয় 'অন্ধ্রভোজ'। পণ্ডিত, কবি, দার্শনিক ও ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করেন। তাঁর রাজসভার আটজন বিদগ্ধ পণ্ডিতকে বলা হয় 'অষ্টদিগ্‌গজ'। সংস্কৃত, তামিল, তেলেগু ও কানাড়া ভাষার চর্চা উৎসাহিত হয়েছিল। তেলেগু কবি ও সাহিত্যিকদের তিনি বিশেষ উৎসাহ দেন। কৃষ্ণদেব রায় ছিলেন একজন পণ্ডিত রাজা। *আমুক্তমাল্যদা* হলো তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্বের ওপর লেখা গ্রন্থ। তাঁর রাজসভা ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র। এখান থেকে তিনি সারাদেশে সাহিত্য ও সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেন। তাঁর কাছ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে প্রাদেশিক শাসক ও নায়করা সারাদেশে সংস্কৃতি ও শিক্ষার বিস্তারে নেতৃত্ব দেন। তেলেগু ভাষা ও সাহিত্যের অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছিল।

রাজা কৃষ্ণদেব রায় ছিলেন ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধের একজন শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনেতা। বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে দক্ষিণের এই শক্তিশালী রাজ্যটির কথা উল্লেখ করেছেন। তুঘলক শাসনের শেষ পর্বে দক্ষিণ ভারতে প্রচণ্ড রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছিল। অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পত্তন হয়। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়েছিল। সেই পর্বে বিজয়নগর রাজ্যটি গড়ে উঠেছিল। ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি নিয়ে বিজয়নগর একটি সমৃদ্ধ শক্তিশালী রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠন করেছিল। দক্ষিণের নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী নায়কদের দমন করে রেখেছিল। বিজয়নগরের উত্তরে বাহমনি রাজ্য গড়ে উঠেছিল, পূর্বদিকে ছিল গজপতি শাসকদের ওড়িশা রাজ্য। এই তিনটি রাজ্য সমান আগ্রাসী ও আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ করে চলেছিল। উর্বর কৃষ্ণা-গোদাবরী দোয়াব নিয়ে বাহমনিদের সঙ্গে বিজয়নগরের দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষ চলেছিল। দক্ষিণের রাজনীতিতে ভারসাম্য ও স্থিতাবস্থার অভাব দেখা দিয়েছিল, কৃষ্ণদেব রায় এই ভারসাম্য ফিরিয়ে আনেন। তাঁর সামরিক

প্রতিভার জন্য তা সম্ভব হয়। তিনি বিজয়নগর ও গোলকুণ্ডার শাসক ও ওড়িশার গজপতি শাসকদের পরাস্ত করে বিজয়নগরের রাজনৈতিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেন। বিজয়নগর তাঁর শাসনকালে গৌরবের স্বর্ণ শিখরে পৌঁছেছিল, আর কোনো শাসক তাকে এত গৌরব ও মর্যাদা দিতে পারেনি। কৃষ্ণদেব রায় দক্ষিণ ভারতের রাজনীতির নিয়ন্তা হয়ে অস্থিরতা দূর করেন, স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনেন। অন্তত কিছুকাল তাঁর নেতৃত্বে দক্ষিণের জীবনে শান্তি, স্থিতি ও সমৃদ্ধির যুগ চলেছিল। তিনি হলেন দক্ষিণ ভারতের সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ রাজা।

বাহমনি রাজ্য

বাহমনি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হলেন আলাউদ্দিন হাসান বাহমন শাহ্। ১৩৪৭ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে বিজয়নগরের উত্তরে এই রাজ্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়। জনশ্রুতি অনুযায়ী হাসান প্রথম জীবনে গঙ্গু নামক এক ব্রাহ্মণের দাস ছিলেন। সুলতান হবার পর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তিনি গঙ্গু উপাধি নেন, ফিরিস্তা এই জনশ্রুতির কথা উল্লেখ করেছেন। হাসান জাতিতে ছিলেন আফগান, আলাউদ্দিন খল্‌জির সময় থেকে তাঁর উন্নতি হয়। আলাউদ্দিন হাসান সুলতানি প্রতিষ্ঠা করার পর ইরানের জাতীয় বীর ইস্ফান্দার ও বাহমনের বংশধর বলে নিজের পরিচয় দেন এবং নামের সঙ্গে বাহমন শাহ্ উপাধি যুক্ত হয়। রাজবংশের নাম হয় বাহমনি। বাহমন শাহের অভিষেক হয় দৌলতাবাদে, কিন্তু গুলবর্গায় তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন, পরে বিদর হয় এই রাজ্যের রাজধানী। বাহমন শাহ্ দেশের বিদ্রোহীদের পরাস্ত করে রাজতন্ত্রের কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। বিজাপুরের হিন্দু প্রধান নারায়ণকে তিনি দমন করে শান্তি স্থাপন করেন, কারহাদ ও কোলাপুরে তিনি অভিযান পরিচালনা করেন। বাহমন শাহের দুই প্রতিবেশী হিন্দু রাজ্য হলো বরঙ্গল ও বিজয়নগর। বরঙ্গলের ওপর তিনি কর্তৃত্ব স্থাপন করেন, কিন্তু বিজয়নগরের সঙ্গে তাঁর সমঝোতা হয়নি। তাঁর পুত্র মুহম্মদ শাহের রাজত্বকালে বিজয়নগরের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্বের সূচনা হয়েছিল।

বাহমনি রাজবংশের একজন উল্লেখযোগ্য শাসক হলেন ফিরুজ শাহ্ (১৩৯৭-১৪২২)। তিনি ছিলেন একজন পণ্ডিত রাজা, ধর্ম, দর্শন, আইন, যুক্তিবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, জ্যামিতি ও উদ্ভিদবিদ্যায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। তিনি অনেকগুলি ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন, আরবি, ফার্সি, তুর্কি ছাড়াও তিনি তেলেগু, কানাড়া ও মারাঠি শিখেছিলেন। ফিরুজ বিজয়নগরের বিরুদ্ধে তিনবার অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। তিনি মধ্যপ্রদেশের গণ্ড রাজ্য ও বেরার আক্রমণ করে কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। ফিরুজ ছিলেন একজন জ্ঞানদীপ্ত শাসক। তিনি দাক্ষিণাত্যকে সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে

গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। দিল্লি সুলতানির আশ্রিত অনেক কবি, সাহিত্যিক ও ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি তাঁর আনুকূল্য লাভ করেন। ইরান ও ইরাক থেকে অনেক বিদ্বান ব্যক্তি তাঁর রাজসভায় এসেছিলেন। সব ধর্মের প্রতি তিনি উদার ও সহিষ্ণু ছিলেন, তিনি বাইবেল পড়েছিলেন, সঙ্গীত ভালোবাসতেন। তিনি ভীমা নদীতীরে নতুন রাজধানী ফিরুজাবাদ নির্মাণ করেন। বাহমনি রাজ্য শাসনের জন্য তরফ, সরকার, পরগণা ও গ্রামে ভাগ করা হয়। এই বংশের শাসক আহম্মদ শাহ্ গুলবর্গা থেকে রাজধানী বিদরে সরিয়ে নেন। ফিরুজ শাহ্ তাঁর শাসনব্যবস্থায় হিন্দুদের গ্রহণ করেন, দক্ষিণের ব্রাহ্মণরা উচ্চপদ পেয়েছিল। বিদেশ থেকে আফাকিরা এসেছিল, শাসনব্যবস্থায় এরা পারস্য প্রভাব নিয়ে এসেছিল। বিদেশীদের বেশিরভাগ ছিল শিয়া। বাহমনি সুলতানরা সুন্নি মুসলমান হলেও অমুসলমানদের ওপর জিজিয়া স্থাপন করেননি। ফিরুজ শাহ্ জ্যোতির্বিদ্যায় আগ্রহী ছিলেন, দৌলতাবাদে তিনি একটি মানমন্দির নির্মাণ করেন। বাহমনি শাসকরা বন্দর ও পোতাশ্রয় (চাউল ও দাভোল) রক্ষার দিকে নজর দেন। পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগর হয়ে বিদেশী জাহাজ এসব বন্দরে পণ্য নিয়ে আসত।

ফিরুজের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা আহম্মদ শাহ্ সুলতান হন। তিনি ওয়ালি বা সন্ত নামে পরিচিত ছিলেন। সুফি দরবেশ জেসু দরাজের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল, হিন্দুরাও তাঁকে সন্ত বলে মনে করত। বিজয়নগর, গুজরাট ও মালবের সঙ্গে তিনি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। তিনি বরঙ্গল জয় করে তাঁর রাজ্যভুক্ত করে নেন। মালব, গণ্ডোয়ানা ও কোঙ্কনের বিরুদ্ধে তিনি সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাহমনি রাজ্য দক্ষিণের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ্য রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, রাজনৈতিক ভারসাম্য ছিল বাহমনি রাজ্যের পক্ষে। বিজয়নগর রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিরোধের সুযোগ নিয়ে বাহমনি রাজ্য দক্ষিণ, উত্তর ও পশ্চিমে সম্প্রসারণ চালিয়েছিল। বেরার, খান্দেশ ও কোঙ্কনে তাদের অধিকার স্থাপিত হয়, মালব ও গুজরাটের সঙ্গে দ্বন্দ্ব শুরু হয়।

বিজয়নগর-বাহমনি দ্বন্দ্ব

দক্ষিণ ভারতের দুশ বছরের ইতিহাসে (১৩৫০-১৫৬৫) সবচেয়ে বড় ঘটনা হল বিজয়নগর-বাহমনি দ্বন্দ্ব। প্রায় একই সময়ে তুঘলক বংশের পতনের পর দক্ষিণ ভারতে বাহমনি ও বিজয়নগর রাজ্য স্থাপিত হয়। বাহমনি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হলেন আলাউদ্দিন হাসান বাহমন শাহ্। তাঁর উপাধি অনুসারে তার প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের নাম হয় বাহমনি রাজ্য, এর রাজধানী প্রথমে ছিল গুলবর্গা, পরে বিদর। পরে এই রাজ্য বিভক্ত হয়ে পাঁচটি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়—আহম্মদনগর, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা,

বেরার ও বিদর। বাহমনি রাজ্য বিভক্ত হলেও বিজয়নগরের সঙ্গে শত্রুতার অবসান হয়নি। ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে তালিকোটার যুদ্ধে দক্ষিণের এই পাঁচটি মুসলিম রাষ্ট্র বিজয়নগরের সঙ্গে যৌথভাবে লড়াই করেছিল। এই যুদ্ধে বিজয়নগর পরাস্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হলেন শৈব দুই ভ্রাতা হরিহর ও বুক্কা। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে অবস্থিত বিজয়নগর। দুশ ত্রিশ বছর এই রাজ্যটি টিকে ছিল কিন্তু বাহমনি রাজ্যের সঙ্গে বিরোধ মেটেনি। এই দীর্ঘ সময়কালে এদের মধ্যে যে সবসময় বিরোধ চলেছিল তা নয়, মাঝে মাঝে শান্তি স্থাপিত হতো, আপসে বিরোধ মেটানো হতো কিন্তু বিরোধের স্থায়ী মীমাংসা করা সম্ভব হয়নি। লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তার *তুঙ্গভদ্রার তীরে* উপন্যাসে দেখিয়েছেন যে বিজয়নগরের সাধারণ মানুষজন এবং রাজতন্ত্র সর্বদা উত্তরের বাহমনি রাজ্যের আক্রমণের ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকত। রাজারা প্রতিরক্ষাখাতে রাষ্ট্রের আয়ের পঞ্চাশ শতাংশ ব্যয় করতেন, এজন্য নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী বিজয়নগরকে যুদ্ধরাষ্ট্র বলে উল্লেখ করেছেন।

চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধে দক্ষিণ ভারতে তুঘলক শাসনের অবসান ঘটলে সেখানে রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়, দেখা দেয় নৈরাজ্য ও অশান্তি। এই সময়ে কর্ণাটক অঞ্চলে ৭৫ জন শক্তিশালী সামন্ত শাসক নায়করা ছিলেন, এদের দু'জন হলেন হরিহর ও বুক্কা। মহীশূর অঞ্চলে হৈসল বংশীয় শাসকরা ছিলেন, মাদুরাইতে সুলতানি শাসন ছিল, বরঙ্গল অঞ্চলে ভালেমা শাসকরা শাসন স্থাপন করেছিল, তেলেঙ্গানায় ছিল রেড্ডি শাসকরা। এদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াই চলেছিল, ঠিক সেই সময়ে উত্তরে বাহমনি রাজ্যটি স্থাপিত হয়। মাদুরাই সুলতান ও হৈসল শাসকদের মধ্যে লড়াই উভয় পক্ষকে দুর্বল করে দিয়েছিল, তার সুযোগ নিয়ে হরিহর ও বুক্কা মাদুরা ও মহীশূর অধিকার করে নিয়ে দক্ষিণে রামেশ্বরম পর্যন্ত এগিয়ে যান, গঠিত হয় বিজয়নগর রাজ্য। ঐতিহ্য অনুযায়ী গুরু মাধব বিদ্যারণ্যের পরামর্শ অনুযায়ী তাঁরা এই হিন্দু রাজ্য স্থাপন করেন। উদ্দেশ্য হল হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করা। এই ঐতিহ্য অনুসরণ করে আধুনিককালে এ. এল. শ্রীবাস্তব লিখেছেন যে মুসলিম আগ্রাসন থেকে ধর্ম ও সংস্কৃতিকে বাঁচানোর জন্য বিজয়নগর রাজ্য স্থাপন করা হয়েছিল (The Vijayanagara empire served a high historial purpose by acting as a champion of Hindu religion and culture against the aggressions of the Muslims in Southern India.)।

আধুনিক ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে বিজয়নগর-বাহমনি দ্বন্দ্বের আসল কারণ হল ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। বিজয়নগরের শাসকরা দক্ষিণে আগ্রাসী নীতি অনুসরণ করতে থাকেন। উত্তর-পূর্বে ও পশ্চিমে তাঁরা সম্প্রসারণের কথা ভেবেছিলেন।

ওড়িশার গজপতি শাসক ও বাহমনি রাজ্যের সঙ্গে তাদের বিরোধ ছিল অবশ্যম্ভাবী। এই রাজনৈতিক বিরোধে দক্ষিণের হিন্দু শাসকরা অনেকে বাহমনি রাজ্যের পক্ষ নিয়েছিল। তারা মনে করেছিল রাজনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে হলে বিজয়নগরের আগ্রাসন বন্ধ করা দরকার। বরঙ্গলের হিন্দু রাজাদের সঙ্গে বাহমনি শাসকদের রাজনৈতিক বন্ধুত্ব ছিল। আধুনিক ঐতিহাসিকরা দেখিয়েছেন যে দক্ষিণের দ্বন্দ্বটা ছিল আসলে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। গজপতি শাসক বিজয়নগর আক্রমণ করলে বাহমনি সুলতান বিজয়নগরের পক্ষে যোগ দিয়ে আক্রমণ প্রতিহত করেন। আবার বিজয়নগর ও বাহমনির মধ্যে আপস হতো, শান্তি রক্ষা করা সম্ভব হতো। বিজনগরের রাজা প্রথম দেবরায় সুলতান ফিরুজশাহের কাছে পরাস্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে সন্ধি করেন এবং নিজ কন্যার সঙ্গে সুলতানের বিবাহ দেন। বিজয়নগরের রাজারা শৈব মতাবলম্বী হলেও অন্য ধর্মালম্বীদের প্রতি অসহিষ্ণু ছিলেন না। তাদের সৈন্যবাহিনীতে বহু মুসলমান সৈনিক কাজ পেয়েছিল। বিদেশী আবদুর রজ্জাক বিজয়নগরের রাজাদের ধর্মীয় সহিষ্ণুতার কথা উল্লেখ করেছেন, সব ধর্মের মানুষ নির্ভয়ে বিজয়নগরে বসবাস করত।

অধ্যাপক সতীশচন্দ্র জানিয়েছেন যে বিজয়নগর-বাহমনি দ্বন্দ্বের একটি প্রধান কারণ হল অর্থনৈতিক। তিনটি অঞ্চল নিয়ে বিজয়নগর ও বাহমনি রাজ্যের মধ্যে বিরোধ বেধেছিল। এই তিনটি অঞ্চল হল তুঙ্গভদ্রা দোয়াব, কৃষ্ণা-গোদাবরী বদ্বীপ অঞ্চল এবং পশ্চিমের মারাঠা অধ্যুষিত পশ্চিমঘাট পর্বত ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী কোঙ্কন অঞ্চল। কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার মধ্যবর্তী অঞ্চল ছিল খুবই উর্বর। এই অঞ্চলে ভালো অর্থনৈতিক কাজকর্ম হত, এই অঞ্চল নিয়ে আগে চালুক্য ও চোলদের মধ্যে বিরোধ বেধেছিল। পরে যাদব ও হৈসল শাসকরা এই অঞ্চলের অধিকার নিয়ে লড়াই করেছিল। কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল বেশ সমৃদ্ধ ছিল, এই অঞ্চলে ছিল অনেকগুলি বন্দর, এদের মধ্য দিয়ে বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য চলত। কোঙ্কন নিয়ে বিরোধের আসল কারণ হল গোয়া বন্দরের ওপর কর্তৃত্ব। সুতরাং রাজনৈতিক বিরোধের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল অর্থনৈতিক স্বার্থ, সম্পদই হল শক্তির উৎস।

বিজয়নগর ও বাহমনি রাজ্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলেছিল শেষঅবধি। মধ্যযুগের ঐতিহাসিক ফিরিস্তা একে ধর্মীয় দ্বন্দ্ব হিসেবে দেখিয়েছেন (The ruler of Vijaÿanagara, who had reduced all the rajas of the carnatic to his yoke, required to be checked and his influence should be removed from the countries of Islam in order that their people might repose in safety from the oppressions of unbelievers and their mosques and holy places no longer be subject to pullution from infidels.)। ফিরিস্তাকে অনুসরণ করে

আধুনিককালে এইচ. কে. শেরওয়ানি জানিয়েছেন যে তালিকোটা যুদ্ধের একটি প্রধান কারণ হল আহম্মদনগরের ওপর রামরাজের সৈন্যবাহিনীর বীভৎস আক্রমণ ও লুণ্ঠন। একথা ঠিক এই দ্বন্দ্বের মধ্যে একটি ধর্মীয় আবেগ সবসময় ছিল, একপক্ষ পরাস্ত হলে অন্যপক্ষ বীভৎস তাণ্ডব চালাত। উভয়পক্ষে এই অপরাধে অপরাধী ছিল (The religious dimension cannot, however, be ignored altogether)।[৩] সেই যুগটা ছিল এরকম, উদারতা ও সহনশীলতা অবশ্যই কম ছিল। সবকিছুকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হতো, ব্যাখ্যা করা হতো। একবার বিজয়নগরের রাজা মল্লিকার্জুন রায় মুসলিমদের নির্বিচারে হত্যার নির্দেশ দেন কারণ মুসলিম বণিকরা বাহমনি সুলতানের কাছে আমদানি করা সব ঘোড়া বিক্রি করেছিল। মুসলমানরা অনেকে গোয়াতে পালিয়ে গিয়েছিল। এই ধরনের ঘটনার পর বাহমনি সুলতান বিজয়নগর রাজ্য আক্রমণ করেন। আপাতদৃষ্টিতে ধর্ম প্রাধান্য পেলেও আসলে বিজয়নগর রাজ্যের সম্পদ, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বাহমনি রাজ্যের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। তাদের রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থিত এই শক্তিশালী রাজ্যটিকে ধ্বংস করার জন্য তারা সচেষ্ট ছিল। ধর্ম আবেগ ও উৎসাহ জুগিয়েছিল, অনেকসময় বিজয়নগরের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা হতো।

পঞ্চদশ শতকের গোড়ারদিকে বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে ঐ সময়ে সমগ্র দক্ষিণ ভারতে বিজয়নগর ছিল সবচেয়ে সম্পদশালী ও শক্তিশালী রাজ্য। এই রাজ্য সম্পর্কে এমন একটি মতও প্রচলিত যে এটি হল 'হিন্দু রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামির দুর্গ' (a citadel of Hindu orthodoxy and conservatism)। স্বাভাবিকভাবে উত্তরের বাহমনি রাজ্য এমন একটি প্রতিপক্ষকে সহ্য করতে পারেনি। বিজয়নগর রাজ্যে সদাশিব ছিলেন নামমাত্র রাজা, আসল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিল রামরাজের হাতে। অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রের ফলে বাহমনি রাজ্য ভেঙে পাঁচটি রাজ্য গড়ে উঠেছিল, এদের মধ্যেও সদ্ভাব ছিল না। কিন্তু হিন্দু বিজয়নগরের বিরুদ্ধে এই উত্তরাধিকারী রাজ্যগুলি জোট বেঁধেছিল এবং বিজয়নগর রাজ্য আক্রমণ করে ধ্বংস করে দিয়েছিল। এইচ. কে. শেরওয়ানি ফিরিস্তাকে উদ্ধৃত করে লিখেছেন যে রামরাজ ও তাঁর সৈন্যবাহিনী আহম্মদনগর আক্রমণ করে মসজিদ অপবিত্র করেছিল এবং মহিলাদের সম্মানহানি ঘটেছিল, বহু লোক মারা যায় (No state had suffered more than Ahmadnagar at the hands of the armies of the southern empire, for they polluted the mosque and dishonoured women and put to fire and sword everything and every person who came in their way...)।

৩. সতীশচন্দ্র, *মিডাইভাল ইন্ডিয়া*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৭৮।

ধর্মভিত্তিক বৈরিতা ও বিদ্বেষ ছিল না একথা বলা যাবে না। এজন্য দুই রাজ্যের সাধারণ মানুষজন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুই দেশ প্রতিরক্ষা খাতে প্রচুর অর্থব্যয় করেছিল, জনগণের ওপর করের চাপ বেড়েছিল। বিজয়নগর রাজ্যে জনগণ করভারে পীড়িত ছিল, মাঝে মাঝে বিদ্রোহ হতো। অবিরাম সংঘর্ষের জন্য দুই রাজ্যের জনকল্যাণমূলক কাজকর্ম অবশ্যই ব্যাহত হয়েছিল। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য অল্পবিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ফলে দুই রাজ্যের জনগণের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ব্যাহত হয়। শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারা রুদ্ধ হয়ে পড়ে।

মাহমুদ গাওয়ান (১৪৬৩-১৪৮১)

মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে অল্প কয়েকজন প্রশাসক তাঁদের প্রতিভা, দক্ষতা ও ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন মাহমুদ গাওয়ান তাঁদের মধ্যে অন্যতম। মধ্যযুগের দক্ষিণ ভারতে মাহমুদ গাওয়ান ছিলেন নিঃসন্দেহে একজন বিচক্ষণ রাষ্ট্রনেতা ও প্রতিভাবান শাসক। তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সততা, বাহমনি রাজবংশের প্রতি অবিচল আনুগত্য, রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও সামরিক কৃতিত্বের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর বাস্তববোধ ও দূরদর্শিতা ছিল অসাধারণ। পারস্যের গাওয়ান অঞ্চলের অধিবাসী গাওয়ান পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে বাণিজ্যের সূত্র ধরে দক্ষিণ ভারতে আসেন। তাঁর পূর্বপুরুষরা পারস্যের শাহের দরবারে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। উচ্চ দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করার পারিবারিক ঐতিহ্য তাঁর ছিল। বাহমনি রাজ্যের সুলতান দ্বিতীয় আলাউদ্দিনের (১৪৩৬-৫৮) রাজসভায় তিনি আমীরের পদ লাভ করেন। দ্বিতীয় আলাউদ্দিনের পুত্র হুমায়ুন তাঁকে 'মালিক-উৎ-তুজ্জর' (বণিক শ্রেষ্ঠ) উপাধি দেন। তিনি বিজাপুরের গভর্নর এবং 'ভকিল-ই-সুলতানাত' পদ লাভ করেন। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর ১৪৮১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত মাহমুদ গাওয়ান ছিলেন বাহমনি রাজ্যের কর্ণধার। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি এই রাজ্যের সেবা করেন। মহম্মদ শাহের রাজত্বের গোড়ার দিকে প্রধানমন্ত্রী খাজা জাহান তুর্ক প্রকাশ্য দরবারে নিহত হলে মাহমুদ গাওয়ান প্রধানমন্ত্রীর পদ ও 'খাজা জাহান' উপাধি পান।

১৪৫৮ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন শাহের শাসনের শুরু থেকে মাহমুদ গাওয়ান ক্রমশ উচ্চপদে উঠতে থাকেন। হুমায়ুন শাহ মাহমুদ গাওয়ানকে খুব পছন্দ করতেন। তাঁর বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য সম্পর্কে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না। যদিও ফিরিস্তা হুমায়ুন শাহকে 'জালিম' (নিষ্ঠুর) বলে উল্লেখ করেছেন, মাহমুদ গাওয়ান তাঁর গুণমুগ্ধ ছিলেন। হুমায়ুন শাহের রাজত্বকালে তাঁর ভ্রাতা হাসান খাঁ ও আত্মীয় সিকান্দার বিদ্রোহ করে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেন। সেই সময় মাহমুদ গাওয়ান হুমায়ুন-বিরোধী সব ষড়যন্ত্র

ব্যর্থ করে দেন, বিদ্রোহ দমনে তিনি হুমায়ুন শাহকে সাহায্য করেন। সুলতান বিদ্রোহীদের কঠোর শাস্তি দিতে উদ্যত হলে গাওয়ান তাঁকে শান্তি ও ঐক্যের স্বার্থে সহনশীল হবার পরামর্শ দেন। হুমায়ুন শাহের মৃত্যুর পর তাঁর বালক পুত্র তৃতীয় আহম্মদ সুলতান হলে (১৪৬১-৬৩) খাজা জাহান তুর্ক, মাহমুদ গাওয়ান ও রাজমাতা নার্গিস বেগম তিনজনে তার অভিভাবকত্বের দায়িত্ব নেন। দেশের মধ্যে ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি অনলস প্রয়াস চালিয়ে যান। বিরোধী দলগুলির মধ্যে তিনি সদ্ভাব স্থাপনের চেষ্টা করেন। এই সময় বাহমনি রাজ্যের অভিজাতরা দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল—বিদেশী (পরদেশী) ও দখিনী অভিজাত। এদের মধ্যে ধর্মীয় বিভাজনও ছিল, বিদেশীরা বেশিরভাগ ছিল শিয়া, দখিনীরা সুন্নি। গাওয়ান রাজবন্দীদের মুক্তি দিয়ে দুই গোষ্ঠীর বিদ্বান, বিচক্ষণ ব্যক্তিদের উচ্চ রাজপদে নিয়োগ করেন। দখিনী আমীররা উচ্চপদে গাওয়ানের নিয়োগ ভালোচোখে দেখেনি। আবার আফাকিরা (বিদেশীরা) তাঁর উদার রাষ্ট্রনীতিকে পছন্দ করত না।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে গাওয়ান বাহমনি রাজ্যকে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌঁছে দেন। ১৪৬৩-৮১ পর্যন্ত তিনি বাহমনি রাজ্যের সম্প্রসারণের জন্য অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকেন। এই রাজ্যের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার জন্য তাঁকে সামরিকব্যবস্থা নিতে হয়। উত্তরে বাহমনি রাজ্যের শত্রু ছিল মালবের সুলতান মাহমুদ খল্‌জি। তাঁর সঙ্গে যোগ দেন ওড়িশার গজপতি শাসক কপিলেশ্বর এবং খান্দেশের শাসক। এই তিন শক্তি কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে বাহমনি রাজ্য সংকটের মধ্যে পড়েছিল। এই সংকট মুহূর্তে বাহমনি রাজ্যকে রক্ষার জন্য তিনি পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন করেন। তিনি গুজরাট রাজ্যের তরুণ শাসক সুলতান মাহমুদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। গুজরাটের শাসক সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলে মালব সুলতান দেশে ফিরে যান। এরপরেও মালব সুলতান আবার বাহমনি রাজ্য আক্রমণ করেন, তিনি বেরার প্রদেশটি দখল করার প্রয়াস চালিয়ে ব্যর্থ হন। গাওয়ান মালবের সঙ্গে চুক্তি করে বিরোধ মিটিয়ে নেন, পরবর্তীকালে মালব বাহমনি রাজ্যের স্থায়ী বন্ধু হয়।

বাহমনি রাজ্যের পূর্ব দিকে ওড়িশার গজপতি শাসকরা রাজত্ব করতেন। এই বংশের রাজা কপিলেশ্বর বাহমনি রাজ্য আক্রমণ করেন। যদিও বিজয়নগর ও বাহমনি রাজ্যের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না, এরা একসঙ্গে ওড়িশার আক্রমণের মোকাবিলা করেছিল। কপিলেশ্বরের মৃত্যুর পর ওড়িশার সিংহাসন নিয়ে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব শুরু হলে গাওয়ান তাতে হস্তক্ষেপ করেন। পুরুষোত্তম সিংহাসন লাভ করেন, কিন্তু কোন্দাবিদু ও রাজামুন্দ্রি বাহমনি রাজ্য অধিকার করেছিল। পূর্ব সীমান্ত সুরক্ষিত করে মাহমুদ গাওয়ান পশ্চিম দিকে রাজ্যবিস্তারে মন দেন। পশ্চিমের উপকূল এবং মক্কার জলপথ সুরক্ষিত করার জন্য তিনি সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। ১৪৬৯-৭৩ পর্যন্ত

তিনি পশ্চিমাঞ্চলে ছিলেন, তাঁর অভিযানের ফলে পশ্চিমে হুবলি, বেলগাঁও, খেলনা, সঙ্গমেশ্বর, কোঙ্কন, কর্ণাটক ও গোয়া বাহমনি রাজ্যের অধীনে স্থাপিত হয়। পশ্চিম সীমান্তে সামরিক অভিযান শেষ করে গাওয়ান পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হন। ওড়িশার শাসক পুরুষোত্তম রাজামুন্দ্রি ও কোন্দাবিদু দখলের চেষ্টা করলে গাওয়ান তাঁকে বাধা দেন। ১৪৭৮ খ্রিস্টাব্দে গোদাবরী তীরে ওড়িশার সৈন্যবাহিনী পরাস্ত হয়, এই যুদ্ধের পর সুলতান তৃতীয় মহম্মদ গাজি উপাধি নেন। শুধু উত্তর, পূর্ব বা পশ্চিমে নয়, মাহমুদ গাওয়ান দক্ষিণে বিজয়নগর রাজ্যের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হন। এই অঞ্চলে গোদাবরী-কৃষ্ণা দোয়াব ছিল সবচেয়ে সমৃদ্ধ, এই অঞ্চল নিয়ে বিজয়নগর-বাহমনি বিরোধ চলেছিল বহুকাল ধরে। শালুব বংশীয় নরসিংহ ছিলেন এই সময় বিজয়নগরের রাজা। মাহমুদ গাওয়ান বিজয়নগরকে পরাস্ত করে দক্ষিণে কাঞ্চি পর্যন্ত অগ্রসর হন। মাহমুদ গাওয়ানের আগে বাহমনি রাজ্যের আর কোনো প্রশাসক দক্ষিণে এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারেননি। এইচ. কে. শেরওয়ানি লিখেছেন যে মাহমুদ গাওয়ানের প্রধানমন্ত্রীত্বকালে বাহমনি রাজ্য সাফল্যের চরম শিখরে পৌঁছেছিল। উত্তরে বেরার, দক্ষিণে কৃষ্ণা-গোদাবরী দোয়াব, পশ্চিমে আরবসাগর এবং পূর্বে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বাহমনি রাজ্য বিস্তৃত হয়। খান্দেশের শাসক আদিল খান বাহমনি সুলতানের আধিপত্য স্বীকার করে নেন। সন্দেহ নেই মাহমুদ গাওয়ানের প্রতিভা ও দক্ষতা এই রাজ্যকে সাফল্য ও গৌরব এনে দিয়েছিল।

প্রথম মহম্মদের রাজত্বকাল থেকে বাহমনি রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। ইতিমধ্যে বাহমনি রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছিল, নতুন নতুন অঞ্চল পুরনো প্রদেশগুলির সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় এদের আয়তন বিশাল হয়েছিল। প্রাদেশিক শাসকরা ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। দূরদর্শী মাহমুদ গাওয়ান সংস্কারের প্রয়োজন অনুভব করেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে প্রশাসনিক সংস্কার না হলে কেন্দ্রীয় সরকার ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়বে। প্রাদেশিক শাসকদের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা হ্রাস করার জন্য তিনি সংস্কারের কাজে হাত দেন। দুভাবে তাঁর উদ্দেশ্য সাধিত হয়। সংস্কারের আগে বাহমনি রাজ্যে চারটি প্রদেশ ছিল (শিক), এই চারটি প্রদেশ ভেঙে তিনি আটটি প্রদেশ গঠন করেন। প্রত্যেক প্রদেশের কিছু অঞ্চল তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে স্থাপন করেন, এগুলি হলো সরকারের খাসজমি। এদুটি প্রধান সংস্কার ছাড়া প্রাদেশিক শাসকদের ওপর কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য তিনি প্রদেশগুলির মধ্যস্থিত দুর্গগুলির অধিপতিদের সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে স্থাপন করেন।

ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে মাহমুদ গাওয়ানের মৌলিক অবদান ছিল। সমগ্র রাজ্যের জমি পরিমাপ করে তিনি বিস্তৃত 'হস্তবুদ' (ভূমি ও রাজস্বের হিসেব) তৈরি করেন।

এসব নথিপত্রে কৃষকের অধিকার এবং সরকারি প্রাপ্য সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়। তাঁর সময়ে এই রাজ্যের অনেক জমি জাগিরদারদের হাতে ছিল, তাঁরা বিভিন্ন প্রদেশে ভূমি রাজস্ব সংগ্রহের কাজ করতেন। সংগৃহীত রাজস্বের একাংশ প্রাদেশিক সৈন্যবাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয় করা হতো। গাওয়ান এই ব্যবস্থা বজায় রাখেন। তবে জাগিরদারদের ওপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য তিনি তাঁদের নিয়মিতভাবে হিসেবপত্র পেশ করার নির্দেশ দেন। শেরওয়ানি মন্তব্য করেছেন যে আকবরের রাজস্ব মন্ত্রী রাজা তোডরমলের সংস্কারের একশ বছর আগে মাহমুদ গাওয়ান প্রায় একই ধরনের সংস্কার এই রাজ্যে প্রবর্তন করেন। গাওয়ান দক্ষিণে বিবদমান দুই গোষ্ঠী পরদেশী ও দখিনীদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়াস চালিয়েছিলেন। তিনি এদের মধ্যে প্রাদেশিক গভর্নরের পদগুলি সমানভাবে ভাগ করে দেন, গুরুত্বপূর্ণ বিজাপুরের গভর্নরের পদটি তিনি নিজের জন্য রেখেছিলেন।

গাওয়ান প্রধানত ছিলেন সৈনিক, প্রশাসক ও রাষ্ট্রনেতা। সৈনিক হিসেবে তিনি সাফল্য লাভ করেন, প্রশাসক হিসেবে অনেকগুলি সংস্কার প্রবর্তন করে তিনি রাজ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। এসব ছাড়া তাঁর আর একটি পরিচয় আছে। তিনি ছিলেন একজন কবি। তাঁর পৃষ্ঠপোষক সুলতান হুমায়ুন শাহের উদ্দেশ্যে তিনি কবিতা রচনা করেন। সমকালীন লেখকদের বিবরণী থেকে জানা যায় যে শিক্ষা, শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি এই রাজ্যে অনেকগুলি মাদ্রাসা ও পুস্তকাগার নির্মাণ করেন। রুশদেশীয় পরিব্রাজক নিকিতিন তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা ও পুস্তকাগারের প্রশংসা করেছেন। স্থাপত্য ও চারুশিল্পের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল। তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্বকালে এই রাজ্যে অনেকগুলি সুন্দর অট্টালিকা, মসজিদ ও স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়। তাঁর শাসনকালে এই রাজ্য গৌরবের শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করেছিল, আবার এই সময় থেকে তাঁর পতনের সূচনা হয়েছিল। এজন্য তৎকালীন শাসক তৃতীয় মহম্মদ অনেকখানি দায়ী ছিলেন। সুলতান দখিনী আমীরদের চক্রান্তে বিভ্রান্ত হয়ে এই সৎ, সুদক্ষ, অনুগত প্রশাসককে মৃত্যুদণ্ড দেন। ১৪৮১ খ্রিস্টাব্দের ৫ই এপ্রিল তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করা হয়, এই ঘটনার এক বছরের মধ্যে সুলতানের মৃত্যু হয়।

তৃতীয় মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্র মাহমুদ (১৪৮২-১৫২৮) বাহমনি রাজ্যের সুলতান হন। শিশু সুলতানের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে প্রভাবশালী আমীর হাসান নিজাম-উল-মুলক-বাহরি ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেন। হাসান ছিলেন দখিনী আমীরদের নেতা, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করেছিল। এইসময় এক গুপ্ত ঘাতকের হাতে হাসান নিহত হলে পরদেশী আমীররা ক্ষমতা নিজেদের হাতে তুলে নেন। দখিনীরা ক্ষমতা হস্তগত করার জন্য সুলতানকে হত্যার চেষ্টা করেছিল। সুলতান পরদেশী আমীরদের সহায়তা নিয়ে নিজেকে রক্ষা করেন,

তিনি দখিনী আমীরদের হত্যার নির্দেশ দেন। এই রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে কাশিম বারিদ নামে এক তুর্কি আমীর দেশের প্রকৃত শাসক হয়ে বসেন। সুলতান মাহমুদ নামমাত্র সুলতান হিসেবে টিকে ছিলেন। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে পরাস্ত হয়ে দখিনী আমীররা নিহত হাসানের পুত্র আহম্মদ নিজাম-উল-মুলকের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হন। আহম্মদ প্রাদেশিক রাজধানী আহম্মদনগরে স্বাধীনভাবে চলতে থাকেন, তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব মানতেন না। কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পাঠিয়ে ব্যর্থ হয়। বাহমনি রাজ্যে ভাঙন শুরু হয়ে যায়। আহম্মদনগরের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে বিজাপুর ও বেরারের শাসকরাও স্বাধীন হয়ে যান। সুলতান মাহমুদ শাহের মৃত্যুর পর আরো চারজন সুলতান বাহমনি রাজ্যের সিংহাসনে বসেছিলেন। এদের ক্ষমতা ক্রমশ সঙ্কুচিত হতে থাকে, কলিমুল্লাহ্ ছিলেন এই রাজবংশের শেষ সুলতান। তাঁর মৃত্যুর পর বাহমনি রাজ্য পাঁচটি স্বতন্ত্র, স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। এই পাঁচটি রাজ্য হলো আহম্মদনগরে নিজামশাহী, বিজাপুরে আদিলশাহী, গোলকুণ্ডায় কুতুবশাহী, বিদরে বারিদশাহী এবং বেরারে ইমাদশাহী রাজ্য। বাহমনি সুলতানদের দুর্বলতা, দখিনী ও পরদেশী আমীরদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, সৈন্যবাহিনীতে ভাঙন, প্রাদেশিক শাসকদের উচ্চাকাঙক্ষা এবং প্রতিভাবান রাষ্ট্রনেতার অভাব এই রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী ছিল।

বাহমনি রাজ্যের ঐতিহাসিক গুরুত্ব হলো উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে এই রাজ্যটি যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিল। পশ্চিম এশিয়ার দেশ ইরান ও তুরস্কের সঙ্গে এই রাজ্যের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। উত্তরের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখলেও বাহমনি রাজ্য নিজস্ব সংস্কৃতির ধারা গড়ে তুলেছিল। উত্তরাধিকারী রাজ্যগুলি এই ধারা বহন করেছিল এবং মুঘল সংস্কৃতির ওপর প্রভাব রেখেছিল।

বাংলা

সুলতানি যুগে বাংলা প্রায় স্বাধীন হয়ে চলেছিল। বলবনপুত্র বুঘরা খান ও তাঁর বংশধররা স্বাধীন রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। মহম্মদ বিন তুঘলকের শাসনকালে (১৩২৫-৫১) বাংলা পুরোপুরি স্বাধীন হয়ে যায়। ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে ইলিয়াস খান লক্ষ্মণাবতী ও সোনারগাঁ দখল করে স্বাধীন সুলতানি প্রতিষ্ঠা করেন। দুশো বছর বাংলা তার স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল (১৩৪২-১৫৩৮)। ইলিয়াসশাহী বংশের শাসকরা রাজ্যের বিস্তার ঘটান এবং ভারতের বাইরে অনেক দেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন। ইলিয়াস শাহ্ পশ্চিমে কাশী পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন, উত্তরে নেপাল ও পশ্চিমে ওড়িশার বিরুদ্ধে তিনি সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। দিল্লির সুলতান ফিরুজ তুঘলক তার আগ্রাসনে ভীত হয়ে বাংলা আক্রমণ করেন। ইলিয়াস

শাহ্ একডালা দুর্গে আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করেন। সুলতান নানারকম প্রলোভন দেখিয়েও রাজধানীর অধিবাসীদের নিজের পক্ষে আনতে পারেননি। ফিরুজ ইলিয়াস শাহের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করেন, কোশী নদী দুই রাজ্যের মধ্যে সীমান্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়। ইলিয়াস শাহ্ ফিরুজ তুঘলককে উপঢৌকন পাঠাতেন কিন্তু তিনি তাঁর অধীন ছিলেন না। ইলিয়াস শাহ্ বাংলার ইতিহাসের এক গৌরবময় যুগের সূচনা করেন (He may justly be said to have inaugurated a glorious period in the history of Bengal.)। তিনি আসামের বিরুদ্ধেও এক সামরিক অভিযান পরিচালনা করে বাংলার রাজনৈতিক গৌরব বৃদ্ধি করেন। ইলিয়াস শাহের সুযোগ্য পুত্র হলেন সিকান্দর শাহ্। তাঁর শাসনকালে ফিরুজ তুঘলক দ্বিতীয়বার বাংলা আক্রমণ করে ব্যর্থ হন। সিকান্দর পিতার মতো একডালা দুর্গে আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করেন। গৌড়ের বিখ্যাত আদিনা মসজিদ তিনি নির্মাণ করেন।

এই বংশের আর একজন শ্রেষ্ঠ শাসক হলেন গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ্। তিনি আসাম আক্রমণ করে সাফল্য লাভ করতে পারেননি, কিন্তু সুশাসনের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। ন্যায় বিচারক হিসেবে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। পারস্যের কবি হাফিজের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ ছিল, তিনি শিল্প ও সাহিত্যের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। তাঁর শাসনকালে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি হয়েছিল। ইলিয়াসশাহী বংশের পতন ঘটিয়ে দিনাজপুরের জমিদার[৪] গণেশ ক্ষমতা দখল করেন। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে বাংলার হিন্দু অভিজাতরা রাজনীতিতে প্রভাবশালী ছিলেন। হিন্দু গণেশ ক্ষমতা দখল করলে দরবেশ কুতুব-উল-আলম জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কিকে বাংলাদেশ আক্রমণের জন্য আহ্বান জানান। গণেশের পুত্র যদু জালালুদ্দিন নাম নিয়ে সুলতান হন, গণেশ সিংহাসন ত্যাগ করেন। ১৪৩৭ খ্রিস্টাব্দে এই বংশের পতন ঘটিয়ে ইলিয়াসশাহীরা পুনরায় ক্ষমতা দখল করেন। পঞ্চদশ শতকের শেষে হাবসিরা সিংহাসন দখল করেছিল (১৪৮৭-১৪৯৩), বারবাক শাহ্ ও সৈফুদ্দিন ফিরুজ ছিলেন দুজন হাবসি শাসক। এদের দমন করে আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্ হুসেনশাহী রাজবংশ স্থাপন করেন (১৪৯৩-১৫৩৮)। হুসেন শাহের উদার শাসন নীতি, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং সামরিক জয় বাংলার গৌরবময় যুগের সূচনা করেছিল। অভ্যন্তরীণ শান্তি স্থাপন করে তিনি শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির পথ প্রশস্ত করে দেন। ওড়িশা ও পূর্ব দিকে সামরিক অভিযান চালিয়ে তিনি নতুন অঞ্চল জয় করেন, চট্টগ্রাম ও আরাকান বাংলার অন্তর্ভুক্ত হয়। বিহার ও ত্রিপুরাতে তিনি অভিযান চালিয়েছিলেন। সুলতানি যুগে বহু সুফি দরবেশ বাংলায় এসেছিলেন, বাংলার সুলতানরা

৪. অন্যমতে, রাজশাহীর।

এঁদের শ্রদ্ধা করতেন। বাংলায় ইসলাম ধর্মের বিস্তারে এঁদের অবদান ছিল। শিল্প, স্থাপত্য ও সাহিত্যের অসাধারণ উন্নতি ঘটেছিল। হুসেন শাহের শাসনকালে সর্বক্ষেত্রে এমন উন্নতি হয়েছিল যা আগে কখনো হয়নি (under Sultan Hussain Shah Bengal enjoyed such a spell of peace, prosperity and all round progress as she had not done before under any other Sultan.)। হুসেন শাহের পুত্র নসরত শাহ্ পিতার মতো উদ্যোগী ও বিচক্ষণ শাসক ছিলেন। তিনি ত্রিহুত জয় করেন, বাবরের সঙ্গে সন্ধি করে তিনি সীমান্ত সুরক্ষিত করেন। কামতা-কামরূপের বিরুদ্ধেও তিনি অভিযান চালিয়েছিলেন। তিনি পিতার মতো বিদ্যানুরাগী, সহনশীল এবং সংস্কৃতিবান শাসক ছিলেন। বড় সোনা মসজিদ (১৫২৬) তিনি নির্মাণ করেন। গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ্ হলেন এই বংশের শেষ শাসক (১৫৩৩-৩৮), তাঁকে পরাস্ত করে আফগান নেতা শেরশাহ্ শূর বাংলা অধিকার করেন।

বাংলার ইতিহাসে ইলিয়াস শাহী বংশের অবদান

ইলিয়াস শাহী রাজবংশ বাংলায় স্বাধীন সুলতানির প্রতিষ্ঠা করেছিল। মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বের শেষদিকে অরাজকতা ও বিদ্রোহ দেখা দিলে সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্ তার সুযোগ নিয়ে বাংলায় স্বাধীন সুলতানির প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাংলার স্বাধীন সুলতানির প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৩৫৮ পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ শাসন করেন। তাঁর রাজবংশ একশো বছরের অধিককাল বাংলা শাসন করেছিল। এই রাজবংশের আর দুজন শ্রেষ্ঠ শাসক হলেন সিকান্দর শাহ্ (১৩৫৮-৯২) এবং গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ্ (১৩৯২-১৪১১)। রাজা গণেশ ও তাঁর পুত্র যদু (জালালুদ্দিন) এই রাজবংশকে ক্ষমতাচ্যুত করে কিছুকাল ক্ষমতা ভোগ করেছিলেন। ইলিয়াস শাহের বংশধররা এদের হাত থেকে ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে পঞ্চদশ শতকের শেষ অবধি শাসন ক্ষমতায় ছিলেন। ইলিয়াস শাহ্ সিংহাসন অধিকার করে নিজের নামে মুদ্রার প্রচলন করেন (১৩৪৬)। তিনি নেপাল আক্রমণ করে ধনসম্পদ অধিকার করেন, সোনারগাঁ দখল করে বাংলার অন্তর্ভুক্ত করে নেন। পূর্ববঙ্গে স্বাধীন সুলতানির অবসান ঘটে। তিনি রাজ্যবিস্তারের নীতি অনুসরণ করে ওড়িশা (জাজনগর) আক্রমণ করেন। ইলিয়াস শক্তিশালী হয়ে বিহার আক্রমণ করেন। ইলিয়াস শাহ্ রাজ্যবিস্তারের প্রয়াস চালালে সুলতান ফিরুজ তুঘলক তাঁকে বাধা দেবার জন্য বাংলা আক্রমণ করেন। সুলতান তাঁকে অত্যাচারী শাসক বলে উল্লেখ করেন। ইলিয়াস শাহ্ একডালা দুর্গে আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করেছিলেন। ফিরুজ রাজধানীর অধিবাসীদের নানা প্রলোভন দেখিয়েও নিজের পক্ষে আনতে পারেননি।

ফিরুজ তুঘলক বাংলা জয় করতে পারেননি। কোশি নদী সুলতানি রাজ্য ও বাংলার সীমান্ত বলে চিহ্নিত হয়। ইলিয়াস শাহ্ সুলতানকে উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু দিল্লির অধীনতা স্বীকার করেননি। দিল্লির অভিযান থেকে মুক্ত হয়ে তিনি কামরূপ আক্রমণ করেন এবং ত্রিপুরা রাজ্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করেন। সম্ভবত তিনি কামরূপের কিছু অংশ জয় করেছিলেন। ইলিয়াস শাহ্ নিপুণ সমরনায়ক ছিলেন, জনপ্রিয় শাসক ছিলেন। দুই অংশকে যুক্ত করে তিনি সমগ্র বাংলার অধীশ্বর হন। দিল্লির সমকালীন ঐতিহাসিকরা তাঁকে প্রজাপীড়ক বলে উল্লেখ করেছেন, একথা ঠিক নয়। তিনি বাংলায় উদার রাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করেন, হিন্দুদের উচ্চপদে বসিয়েছিলেন। *তারিখ-ই-মুবারকশাহীতে* তাঁর হিন্দু সেনাপতি সহদেবের নাম পাওয়া যায়। আফিফ তাঁকে 'সুলতান-ই-বাঙ্গালা' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি হিন্দু-মুসলমান সব বাঙালির সুলতান ছিলেন। সিকান্দর শাহ্ তাঁর পিতার নীতি অনুসরণ করেন। ফিরুজ দ্বিতীয়বার বাংলা আক্রমণ করলে তিনি পিতার মতো একডালা দুর্গে আশ্রয় নিয়ে তা ব্যর্থ করে দেন, বাংলা স্বাধীন থেকে যায়। তিনি পিতার মতো সুশাসক ছিলেন। পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ হলো তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। বাংলার সুলতানদের মধ্যে সিকান্দর শাহ্ ইমাম বা খলিফা উপাধি ধারণ করেন। পিতা ও পিতামহের মতো গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ্ দক্ষ সুলতান ছিলেন। তিনি রাজ্যবিস্তারের দিকে মন দেননি। তিনি বিদ্বান, কবি ও সাহিত্যিকদের পোষণ করেন, সুফি দরবেশদের তিনি শ্রদ্ধা করতেন। তিনি নিজে বিদ্বান ছিলেন, ফার্সি ও আরবি ভাষায় কবিতা লেখেন। তিনি ইসলামের পীঠস্থান মক্কা ও মদিনায় মাদ্রাসা স্থাপন করেন। ইরানের কবি হাফিজকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে সুলতানের পত্রালাপ ছিল। আজম শাহ্ সম্ভবত কামরূপের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। এই রাজ্যের কিছু অংশ অধিকার করে তিনি বাংলার অন্তর্ভুক্ত করে নেন। আজম শাহ্ তার ন্যায়বিচারের জন্য ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। চীনের সম্রাটের সঙ্গে তিনি সম্পর্ক স্থাপন করেন। চীনের সম্রাট তাঁর কাছে উপঢৌকনসহ দূত পাঠিয়েছিলেন। আজম শাহ্ চীন সম্রাটের অনুরোধ অনুযায়ী কয়েকজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে চীনে পাঠিয়েছিলেন। আজম শাহের উত্তরাধিকারী সুলতান সৈফুদ্দিন চীন সম্রাটের কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন।

চীনা দূতদের বিবরণ এবং ইবন বতুতার সাক্ষ্য থেকে বাংলাদেশের সেই সময়কার আর্থ-সামাজিক অবস্থার কথা জানা যায়। ইবন বতুতা চট্টগ্রাম বন্দরের কথা উল্লেখ করেছেন। এই বন্দর দিয়ে বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য চলত, সাতগাঁ ও শ্রীপুর ছিল অন্যান্য বন্দর। বাংলায় প্রচুর কৃষিজ ও শিল্পপণ্য উৎপন্ন হতো। রেশমের চাষ ছিল, উৎকৃষ্ট বস্ত্র উৎপন্ন হতো। বাংলাদেশের অধিবাসীরা হিন্দু ও মুসলমান এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। বাংলায় দরবেশদের প্রভাব ছিল, এদের প্রভাবে বহু লোক ইসলাম ধর্ম

গ্রহণ করেছিল। বাংলাদেশের মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল। সকল লোকে বাংলা ভাষায় কথা বলত, তবে অফিসে ফার্সি ভাষার চলন ছিল। হিন্দু ও মুসলমান সকলে পাগড়ি পরত। মহিলারা অলংকার পরিধান করত। সাধারণ স্ত্রী-পুরুষ সকলে একসঙ্গে ক্ষেতে কাজ করত। বস্ত্রবয়ন ছিল বাংলাদেশের একটি প্রধান শিল্প। চীনা বিবরণে বাংলাদেশের চাষিদের খুব প্রশংসা করা হয়েছে। তারা সারাবছর ধরে চাষ করত, ক্ষেতগুলি ছিল শস্যসমৃদ্ধ, জমি পতিত থাকত না। কৃষিজ পণ্যের দাম ছিল খুব সস্তা। প্রধান কৃষিজ পণ্য ছিল ধান, গম, সরিষা, ডাল, নারিকেল, পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি। বাংলাদেশে চা উৎপন্ন হতো না, বাঙালিরা পান খেত। ফলের মধ্যে ছিল কলা, আম, আখ, কাঁঠাল ইত্যাদি। গরু, মহিষ, ভেড়া, ঘোড়া, ছাগল প্রভৃতি পশু পাওয়া যেত। বাঙালি জাতি হিসেবে শান্ত ও সমৃদ্ধ ছিল। কৃষিকাজের প্রতি বাঙালির অনুরাগ ছিল। বাংলার সুতিবস্ত্র ছিল বিখ্যাত, মোটা ও সূক্ষ্ম সব ধরনের বস্ত্র বাংলাদেশে উৎপন্ন হতো। বাংলাদেশে গাছের ছাল থেকে কাগজ তৈরি হতো। বাংলায় সোনা ও রুপোর টাকা এবং কড়ির চলন ছিল, সৈন্যরা নিয়মিত বেতন পেত। জ্যোতিষী, চিকিৎসক, শাস্ত্রবিদ, যাদুকর প্রভৃতি সামাজিক গোষ্ঠীর কথাও জানা যায়। ইলিয়াস শাহী বংশের রাজত্বকালে বাংলাদেশে যে প্রাচুর্য ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ইবন বতুতা জানিয়েছেন যে বাংলাদেশে জীবনযাত্রার ব্যয় খুব কম ছিল। ইলিয়াসী শাসকরা ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করেন। আবদুল করিম লিখেছেন যে সম্ভবত আজম শাহ্ কৃত্তিবাসকে বাংলায় রামায়ণ রচনার কথা বলেন।[৫] ইলিয়াস শাহী রাজারা পরবর্তীকালের হুসেন শাহী শাসকদের মতো সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেন। আসলে তাঁরাই ছিলেন পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের বাংলার নবজাগরণের পথপ্রদর্শক। বাংলার শান্তি ও নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, ইলিয়াস শাহী বংশের সুশাসন, শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ বাঙালি মনীষার বিকাশের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। এই শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে হুসেন শাহী শাসকরা বাংলার নবজাগরণের নেতৃত্বে দেন। ইলিয়াস শাহী শাসকরা বাংলার হিন্দু ও মুসলমানকে নিয়ে যৌথ জাতীয় রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ার সূচনা করেছিলেন।

বাংলার ইতিহাসে হুসেন শাহী বংশের অবদান

হুসেন শাহী বংশের চারজন শাসক চুয়াল্লিশ বছর ধরে (১৪৯৪-১৫৩৮) বাংলাদেশ শাসন করেছিলেন। এই চারজন শাসক হলেন আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্ (১৪৯৪-১৫১৯), নাসিরুদ্দিন নসরত শাহ্ (১৫১৯-৩২), আলাউদ্দিন ফিরুজ শাহ্ (১৫৩২-৩৩) এবং গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ্ (১৫৩৩-১৫৩৮)। এই চারজন শাসকের মধ্যে

৫. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল*, পৃ. ২১৫।

আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্ নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। হুসেন শাহ্ ও তাঁর পুত্রের সুশাসন, সামরিক কৃতিত্ব ও বিদ্যোৎসাহিতার জন্য এ বংশের শাসনকাল বাঙালির স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তিনটি বিশেষ কারণে হুসেন শাহী বংশের শাসন খ্যাতিলাভ করেছে। প্রথমত, এই বংশের শাসনকালে বাংলার আয়তন সর্বাধিক বিস্তৃতি লাভ করেছিল। মধ্যযুগের আর কোনো রাজবংশ বাংলাকে কেন্দ্র করে এত বড় রাজ্য গড়ে তুলতে পারেনি। দ্বিতীয়ত, হুসেন শাহী যুগের শাসন সম্পর্কে বহু ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। সাহিত্য, শিল্প, মুদ্রা, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ইত্যাদি থেকে হুসেন শাহী যুগের তথ্যসমৃদ্ধ নির্ভরযোগ্য ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হয়েছে। হুসেন শাহী শাসকদের প্রবর্তিত স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে। মধ্যযুগের বাংলার আর কোনো রাজবংশ সম্পর্কে এমন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। তৃতীয়ত, বাংলার ইতিহাসে হুসেন শাহী যুগ বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্য লাভ করেছে এইজন্য যে সুলতান হুসেন শাহ্ ও তাঁর পুত্র নসরত শাহ বৈষ্ণব গুরু চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন। হুসেন শাহ্ চৈতন্যদেবকে আনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতা দেন। তাঁর উদার পরমতসহিষ্ণু মানবিক আচরণের জন্য বাংলায় নবজাগরণ সম্ভব হয়েছিল। ধর্ম, দর্শন, শিল্প ও সাহিত্যক্ষেত্রে এই নবজাগরণ ঘটেছিল। হুসেন শাহের পুত্র নসরত শাহ্ সামরিক প্রতিভাবলে এক বিশাল রাজ্য গঠন করেন। বাংলার প্রায় সমগ্র অঞ্চল এবং বিহারের একটি বড় অঞ্চল তাঁর রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। হুসেন শাহ্ চট্টগ্রাম ও আরাকান জয় করেন। কামরূপ, ওড়িশা ও ত্রিপুরার কিছু অঞ্চল তাঁদের সামরিক অভিযানের ফলে বাংলার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। হুসেন শাহ্ ও তাঁর পুত্র প্রায় সমগ্র পূর্ব ভারতের অধীশ্বর ছিলেন।

এ. বি. এম. হবিবুল্লাহ হুসেন শাহ্কে মুঘল সম্রাট আকবরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর মতে, হুসেন শাহ্ হলেন মধ্যযুগে 'বাংলার আকবর'। আকবরের সঙ্গে হুসেন শাহের দুটি বিষয়ে মিল নেই। উভয়ে সুশাসক, উদার পরমতসহিষ্ণু এবং অন্যান্য মানবিক গুণে ভূষিত ছিলেন। হুসেন শাহ্ আকবরের মতো ভাগ্যবান ছিলেন না। আবুল ফজলের মতো বন্ধু ও জীবনীকার তাঁর ছিল না। ঠিক এই কারণে তাঁর শাসনকাল আধুনিককালের মানুষের কাছে খানিকটা অস্পষ্ট ও অজ্ঞাত রয়ে গেছে। দ্বিতীয় অমিল হলো তিনি আকবরের মতো বিশাল, বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র পাননি। আকবর উত্তরাধিকার সূত্রে সাম্রাজ্য, সৈন্যবাহিনী, রাজকোষ সবই পেয়েছিলেন। হুসেন শাহ্ বাংলার এক অশান্ত রাজনৈতিক যুগে হাবসি শাসকদের দমন করে নিজ বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রতিভা, কর্মদক্ষতা ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতার ক্ষেত্রে আকবর ও হুসেন শাহের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না।

সৈয়দ বংশীয় এই বিদেশী হুসেন শাহ্ সাধারণ অবস্থা থেকে জীবন শুরু করে নিজের প্রতিভাবলে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদ লাভ করেছিলেন। বাংলার এক দুঃসময়ে তিনি

শাসন ক্ষমতা অধিকার করেন। দেশে অশান্তি ও অরাজকতা চলেছিল। বিদেশী হাবসি অভিজাত ও সৈন্যবাহিনী রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করেছিল। এদের অত্যাচার ও উৎপীড়নের শেষ ছিল না, জনগণ এদের অপশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। হুসেন শাহ্ বাংলাদেশকে এই হাবসি অপশাসন থেকে মুক্ত করেছিলেন। ক্ষমতা দখল করে তিনি হাবসি অভিজাতদের দেশ থেকে বিতাড়িত করেন, উচ্ছৃঙ্খল হাবসি সৈন্যবাহিনী তিনি ভেঙে দেন। এরপর ধীরে ধীরে তিনি দেশে শান্তি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেন। সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার, উৎপীড়ন বন্ধ হয়। কৃষকরা উৎপীড়নমূলক কর থেকে মুক্তি পেয়েছিল। সুলতান হুসেন শাহের উৎসাহে বাংলায় অর্থনৈতিক কাজকর্ম বৃদ্ধি পেয়েছিল। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বেড়েছিল, বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য চলেছিল, কৃষি ও শিল্পের উন্নতি হয়। বাংলায় নানা ধরনের শিল্পপণ্য উৎপন্ন হতো। এদের মধ্যে ছিল নানা ধরনের বস্ত্র, রেশম ও চিনি। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বাংলায় সাংস্কৃতিক নবজাগরণের পটভূমি তৈরি করে দিয়েছিল।

সুলতান হুসেন শাহ্ ও তাঁর পুত্র নসরত শাহ্ বাঙালি হয়ে যান। বাংলার আশা-আকাঙ্ক্ষা, ইতিহাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁরা নিজেদের মিলিয়েছিলেন। বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে নসরত শাহ্কে বাঙালি বলে উল্লেখ করেছেন। *তবাকৎ-ই-আকবরী*, *তারিখ-ই-ফিরিস্তা* এবং গোলাম হোসেনের *রিয়াজ-উস-সালাতিনে*-এ হুসেন শাহ্কে সুশাসক, জ্ঞানী এবং বিদ্বান ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পিতাপুত্রের উৎসাহে বাংলার মনন ও চিন্তার জগতে এক বিপ্লব ঘটে যায়। এই চিন্তাবিপ্লবের পরিবেশ তাঁরা গঠন করে দেন। হুসেন শাহ্ দেশে বহু জনহিতকর কাজের ব্যবস্থা করেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে তিনি সরাইখানা, মাদ্রাসা, মসজিদ ইত্যাদি নির্মাণ করেন। এসব প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের জন্য হুসেন শাহ্ ও তাঁর পুত্র অকাতরে অর্থ ব্যয় করেন। এই বংশের শাসকদের স্থাপত্য ও শিল্পের প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল। এঁরা গৌড়ে বহু সুন্দর সুন্দর মসজিদ, ফটক ও স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন। এইসব নির্মাণ কাজের সঙ্গে বহুলোক যুক্ত ছিল। গৌড়ের ছোটো সোনা মসজিদ ও গুমতি ফটক শিল্প সৌন্দর্যে অসাধারণ বলে রসিকজনের স্বীকৃতি লাভ করেছে। স্টুয়ার্ট লিখেছেন যে হুসেন শাহ্ বাংলার প্রত্যেক জেলায় মসজিদ, মাদ্রাসা, সরাইখানা ও চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। তাঁর শাসনকালে দেশের বিদ্বান ও ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিদের রাজকোষ থেকে পেনসন দানের ব্যবস্থা হয়েছিল। দরবেশ কুতব-উল-আলমের স্মৃতিসৌধের জন্য তিনি বহু ভূসম্পত্তি দান করেন।

বাংলার ইতিহাসে হুসেন শাহী শাসন উদার, মানবিক, পরমতসহিষ্ণু রাষ্ট্রনীতির জন্য স্মরণীয় হয়ে আছে। নিজ ধর্মে অবিচল খাঁটি মুসলমান হুসেন শাহ্ ও তাঁর বংশধররা বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের পথে এগিয়েছিলেন। হবিবুল্লাহ

লিখেছেন যে উত্তর ভারতের অসহিষ্ণু মুসলমান শাসকদের মতো এঁরা অনুদার ও পরধর্মদ্বেষী ছিলেন না। হুসেন শাহের চরিত্রে কৃতজ্ঞতা এবং শরণাগতকে আশ্রয়দানের মতো মহৎ গুণ ছিল। প্রতিবছর হুসেন শাহ্ তাঁর রাজধানী থেকে পাণ্ডুয়ায় তাঁর ধর্মগুরু কুতব-উল-আলমের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাতে যেতেন। ইসলাম ধর্ম, ফারসি সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারক হয়েও হুসেন শাহ্ ও তাঁর বংশধররা বাংলা ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করেন। হুসেন শাহী বংশের শাসকদের সহিষ্ণুতা ছাড়া বাংলায় বৈষ্ণবধর্ম ও সাহিত্যের বিকাশ সম্ভব হতো না। ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে বাংলায় যে নবজাগরণ ঘটেছিল তার কেন্দ্রস্থলে ছিল হুসেন শাহী রাজবংশ। তাদের শাসনকালে হিন্দুরা প্রশাসনে উচ্চপদ পেয়েছিল। হুসেন শাহের কয়েকজন মন্ত্রী ও সেনাপতি ছিলেন হিন্দু। চৈতন্যদেবের পার্শ্বচর রূপ ও সনাতন হুসেন শাহের মন্ত্রী ও সচিব ছিলেন, গোপীনাথ বসু ছিলেন তাঁর আর একজন মন্ত্রী। মুকুন্দ দাস ছিলেন সুলতানের চিকিৎসক, কেশব ছত্রী তাঁর দেহরক্ষী, অনুপ টাঁকশালের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। জগাই, মাধাই, যশোরাজ খান, দামোদর, রামচন্দ্র ও গোপাল চক্রবর্তী উচ্চ রাজপদে ছিলেন। ত্রিপুরায় সামরিক অভিযান পরিচালনকালে হুসেন শাহ্ তাঁর হিন্দু সৈন্যদের মূর্তি স্থাপন করে পূজা করার অনুমতি দেন। বৈষ্ণব সন্ন্যাসী চৈতন্যদেবের প্রতি সুলতান শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। হুসেন শাহ্ তাঁর কর্মচারীদের আদেশ দেন চৈতন্যদেব যেন বিনা বাধায় ধর্ম প্রচার করতে পারেন। এই বংশের সহনশীলতার জন্য যবন হরিদাসের পক্ষে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছিল। সুলতান ফিরুজ তুঘলক বা আওরঙ্গজেবের শাসনকালে এ ধরনের ঘটনার কথা চিন্তা করা যায় না।

হুসেন শাহী বংশের শাসকরা সাহিত্য ও শিল্পের প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত ছিলেন। যশোরাজ খান হুসেন শাহকে 'জগৎভূষণ', 'নৃপতিতিলক' এবং কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁকে 'কৃষ্ণের অবতার' বলে উল্লেখ করেছেন। মালাধর বসু, বিপ্রদাস, বিজয় গুপ্ত ও শ্রীকর নন্দী সকলে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে হুসেন শাহ্ ও তাঁর পুত্র নসরত শাহের নাম উল্লেখ করেছেন। বাংলা সাহিত্য কৃত্তিবাস ও চণ্ডীদাসের দানে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে বিশাল জীবনী সাহিত্য গড়ে উঠেছিল। হুসেন শাহী বংশের অধীনস্থ চট্টগ্রামের প্রাদেশিক গভর্নর পরাগল খান ও ছুটি খানের পৃষ্ঠপোষকতায় পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী বাংলায় মহাভারত লেখেন। জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের পদাবলী সাহিত্যের পটভূমি তৈরি হয়েছিল। মনসামঙ্গলের কবি বিজয় গুপ্ত হুসেন শাহের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি মহাভারতের অর্জুনের সঙ্গে হুসেন শাহের তুলনা করেছেন। কবিশেখর, দামোদর ও যশোরাজ খান পদ রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। বল্লভ, শ্রীকান্ত ও চিরঞ্জীব সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশে অবদান রেখেছিলেন। শুধু বাংলা সাহিত্য নয়, এই রাজবংশ আরবি ও ফার্সি

সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। হুসেন শাহের আনুকূল্যে দুজন মুসলমান পণ্ডিত দুখানি ফার্সি গ্রন্থ রচনা করেন। এর একখানি ছিল ধনুর্বিদ্যা ও অন্যখানি অর্থশাস্ত্র বিষয়ক, কয়েকখানি ফার্সি গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ হয়েছিল।

হুসেন শাহী বংশের শাসকরা শুধু সাহিত্য-সংস্কৃতি নয়, ধর্ম, দর্শন, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এই যুগের শিল্পকর্মের মধ্যে তিনটি নিদর্শন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুলতান হুসেন শাহ্ ছোটো সোনা মসজিদ নির্মাণ করেন। ইটের তৈরি এই মসজিদের বাইরের দেওয়াল পাথর দিয়ে বাঁধানো, পাথরের ওপর অপূর্ব নকশা ও কারুকাজ ছিল। কোনো কোনো গম্বুজের ভেতরের দিক সোনা দিয়ে মোড়া ছিল। এই বংশের অন্য দুটি শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য কীর্তি হলো বড় সোনা মসজিদ ও কদম রসুল মসজিদ, এদুটি নির্মাণ করেন নসরত শাহ্। এদুটি মসজিদের দেওয়ালে পাথর, নকশা, কারুকাজ ও গম্বুজে সোনার কাজ ছিল। আয়তনের বিশালতা ও কারুকাজের সূক্ষ্মতা হলো এসব স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য। ফার্গুসন মনে করেন যে বড় সোনা মসজিদ হলো গৌড়ের স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কদম রসুল হলো মিনার ও স্তম্ভ সজ্জিত স্মৃতিসৌধ ও মসজিদ। এই তিনটি প্রধান স্থাপত্য ছাড়াও এই বংশের শাসকরা অসংখ্য সৌধ, মাদ্রাসা, সরাইখানা, ফটক ইত্যাদি নির্মাণ করেন।

হুসেন শাহ্ ও তাঁর বংশধররা অরাজকতা দূর করে বাংলায় শান্তি, স্থিতি ও সমৃদ্ধির সূচনা করেন। এম. আর. তরফদার, আবদুল করিম ও হবিবুল্লাহ মনে করেন যে এই যুগে বাংলার সৃজনী প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল। বাংলার চিন্তাশীল মনীষী, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, ধর্মপ্রচারক সকলে নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল বাংলায় বিদ্রোহ, অশান্তি ও অরাজকতা ছিল না, দেশে শান্তি থাকায় অর্থনৈতিক কাজকর্ম বেড়েছিল। অর্থনৈতিক উন্নতি ও অনুকূল সামাজিক পরিবেশ সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প, ধর্ম ও দর্শনের উন্নতি ঘটিয়েছিল। হুসেন শাহী যুগে ১৫০৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে একবার দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, এজন্য বাংলার মানুষকে কষ্টের মধ্যে পড়তে হয়। এই বংশের শাসকরা অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন, এজন্য বাংলার মানুষকে অর্থ জোগাতে হয়। এই রাজবংশের শাসকরা অনেক যুদ্ধ করেন কিন্তু তাদের সাফল্য ছিল সীমিত। এসব সত্ত্বেও বলা যায় যে হুসেন শাহী শাসকরা দেশকে স্থিতিশীলতা ও শান্তি দিয়েছিলেন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটেছিল। হুসেন শাহী রাজবংশ বাংলার শ্রেষ্ঠ শাসক ছিল কিনা বলা যায় না, তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তাঁরা বাংলার সাংস্কৃতিক নবজাগরণে নেতৃত্ব দেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায় | সমাজ ও অর্থনীতি

বিজয়নগর ও বাহমনি

দক্ষিণে বিজয়নগর ও বাহমনি রাজ্য দুশো বছর ধরে তাদের আধিপত্য বজায় রেখেছিল (১৩৫০-১৫৬৫)। এই রাজ্যগুলি সবসময় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকত, এজন্য এদের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে অনেকে 'যুদ্ধ-রাষ্ট্র' বলে উল্লেখ করেছেন। বিজয়নগর ও বাহমনি রাজ্য সর্বদা পরস্পরের সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত থাকত। এই দুই রাজ্যে বহু সামন্তরাজা ছিলেন এবং দেশের মধ্যে বহু দুর্গ নির্মিত হয়। বিজয়নগরে দুর্গাধিপতি হিসেবে কাজ করতেন ব্রাহ্মণরা। পঞ্চদশ শতকে এথেনেসিয়াস নিকিতিন বাহমনি রাজ্যে এসেছিলেন (১৪৬৯-৭৪)। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে বেশ কয়েকজন বিদেশী পর্যটক বিজয়নগর রাজ্যে এসেছিলেন। এদের লেখায়, স্থানীয় লেখতে এবং সমকালীন সাহিত্যে বিজয়নগর ও বাহমনি রাজ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকে ভেনিসবাসী নিকোলো কন্টি বিজয়নগরে এসেছিলেন। এই শতকের মধ্যভাগে পারস্য দেশীয় পরিব্রাজক আবদুর রজ্জাক বিজয়নগর রাজ্য পরিভ্রমণ করেন। পর্তুগিজ পর্যটক ডমিংগো পেজ বিজয়নগরের বাণিজ্য পণ্য ও বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে দুয়ার্তে বারবোসা বিজয়নগরের বিশালতা, জনসংখ্যা ও বহির্বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। নিকিতিন লিখেছেন যে বাহমনি রাজ্যে বহুলোক বাস করে। সাধারণ গ্রামীণ মানুষ দারিদ্র্যের মধ্যে থাকে, অভিজাতরা বিলাস-ব্যসনের মধ্যে বাস করেন (The land is overstocked with people ; but those in the country are very miserable whilst the nobles are extremely opulent and delight in luxury.)।

পর্তুগিজ বণিক ফারনাও নুনিজ তিন বছর বিজয়নগর রাজ্যে কাটিয়েছিলেন। তিনি এই রাজ্যের ভূমিব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। পেজ এই রাজ্যের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কথা বলেছেন, রাজার বিশাল ধনসম্পদের কথা তিনি জানিয়েছেন। সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হলো দেশের সব শ্রেণীর মানুষ ধনী-দরিদ্র সকলে রত্নালংকার পরিধান করত। রাজধানী বিজয়নগর ছিল পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ শহর। নিকিতিন বাহমনি রাজ্যের রাজধানী বিদরকে বলছেন ইসলামী প্রাচ্যের সবচেয়ে বড় শহর। পেজ জানিয়েছেন যে বিজয়নগরের রাজা এত শক্তিশালী ও ধনবান যে তিনি এক বিশাল সৈন্যবাহিনী পোষণ করেন। বাহমনি রাজারাও বড় সৈন্যবাহিনী পোষণ করতেন।

বিজয়নগর রাজ্যের রাজকবি আল্লাসনি পেদ্দন তাঁর *মনুচরিত্রমে* দক্ষিণের চারজাতির কথা উল্লেখ করেছেন, এই চারজাতি হলো ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। সমাজের সবচেয়ে সুবিধাভোগী গোষ্ঠী ছিল ব্রাহ্মণরা; প্রথাগত শিক্ষক ও পুরোহিতের কাজ ছাড়াও ধর্ম, সমাজ, প্রশাসন ও সামরিক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের ভূমিকা ছিল। বিজয়নগর রাজ্যের দুর্গাধিপতি হিসেবে ব্রাহ্মণরা কাজ করতেন, সৈন্য পরিচালনা করতেন। অনেক ব্রাহ্মণ প্রশাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বাহমনি রাজ্যে হিন্দুরা উচ্চপদে ছিলেন, রাজস্ব বিভাগে তাঁরা প্রাধান্য পান। পেজ জানিয়েছেন যে ব্রাহ্মণরা বেশিরভাগ ছিল নিরামিষাশী। এরা ছিল সৎ, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী, ভালো হিসেবরক্ষক, শীর্ণকায়, পরিশ্রমসাধ্য কাজে অপারগ। ক্ষত্রিয়রা যুদ্ধ বিগ্রহ ও রাষ্ট্র পরিচালনার কাজ নিয়ে থাকত। বাহমনি রাজ্যে মুসলমান অভিজাতরা রাষ্ট্র পরিচালনার কাজ করত। বৈশ্যরা ছিল বণিক, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য এরা পরিচালনা করত, শূদ্ররা ছিল সমাজে অবহেলিত। এরা কায়িক ও শ্রমসাধ্য কাজগুলি করত, জীবিকা অর্জনের জন্য এদের বহু ধরনের বৃত্তি গ্রহণ করতে হতো। বিজয়নগর সমাজে নারীদের উচ্চ স্থান ছিল। বাহমনি সুলতানরা হারেম রাখতেন; বিজয়নগরের নারীরা রাজনীতি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিত। সাধারণ শিক্ষা, শিল্প-সঙ্গীত ছাড়াও বিজয়নগরের নারীরা অসি-চালনা, মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা নিত। ফারনাও নুনিজ জানাচ্ছেন যে বিজয়নগরের রাজারা মহিলা মল্লযোদ্ধা, মহিলা জ্যোতিষী ও মহিলা হিসাবরক্ষক রাখতেন। প্রাসাদরক্ষী হিসেবেও মহিলাদের নিয়োগ করা হতো। নৃত্য, সঙ্গীত ও শিক্ষায় মহিলারা পারদর্শিতা অর্জন করেছিল। গঙ্গাদেবী, হোনাম্মা ও তিরমালাম্মা ছিলেন এই রাজ্যের অতি বিদুষী মহিলা। বিজয়নগরে বাল্যবিবাহ প্রথা ছিল, ব্রাহ্মণরা একপত্নী গ্রহণ করতেন। অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা ছিল, মুসলমান অভিজাতরা বহু পত্নী গ্রহণ করতেন। বিজয়নগরে দেবদাসী প্রথা ছিল, উৎসবের সময় এরা নৃত্য, গীত পরিবেশন করতেন, সমাজে সম্মান পেতেন।

নুনিজ জানিয়েছেন যে ব্রাহ্মণরা ছাড়া আর সকলে মাংস খেতেন, প্রচুর পশুপাখি মারা হতো। মহানবমীর দিনে বিজয়নগরের রাজারা পশুবলির ব্যবস্থা করতেন। বিজয়নগরের রাজারা শৈব ও বৈষ্ণব হলেও সব ধর্মের প্রতি সমান সহনশীল ছিলেন। বিদেশীরা রাজাদের ধর্মীয় সহনশীলতার প্রশংসা করেছেন। জৈনরা বিজয়নগরের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। বাহমনি রাজারা ধর্মীয় কারণে কারও প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করতেন না। বিজয়নগর ও বাহমনি রাজ্যে ধর্ম নিয়ে সংঘাত ছিল না। কৃষ্ণদেব রায় ও ফিরুজ শাহ্ নিজেরা বিদ্যানুরাগী পণ্ডিত ছিলেন। ফিরুজ শাহ্ দখিনি ব্রাহ্মণদের শাসনব্যবস্থায় প্রাধান্য দেন। রাজা ও সুলতানরা বিদ্বান ও ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ফিরুজ শাহ্ বাহমনি রাজ্যকে একটি সংস্কৃতি কেন্দ্র

হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। বিজয়নগর ও বাহমনি শাসকরা কৃষিকে অগ্রাধিকার দেন কারণ কৃষি ছিল বেশিরভাগ মানুষের জীবিকা। শাসকরা কৃষি জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করে দেন। কৃষি জমির একাংশ ছিল শাসকদের খাস জমি। বিজয়নগরে জমির একাংশ ছিল মন্দিরের, বাকি অংশের মালিক ছিল সামন্তরা (নায়করা)। শুধু সামন্তরা নন, জমির সঙ্গে আরো অনেক মধ্যস্বত্বভোগী যুক্ত ছিলেন। উৎপন্ন ফসলের একাংশ রাষ্ট্রকে খাজনা হিসেবে দিতে হতো। বাহমনি রাজ্যের সুদক্ষ মন্ত্রী মাহমুদ গাওয়ান জমি জরিপ করে রাজস্ব ধার্য ও সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। ভূমি কর ছাড়াও চারণ কর, বিবাহ কর ইত্যাদি ছিল। বাহমনি রাজ্যে হিন্দুদের জিজিয়া দিতে হতো। ঐতিহাসিকদের অনুমান এই দুই রাজ্যে করের চাপ বেশি ছিল।

বাহমনি ও বিজয়নগর রাজ্যে শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি হয়েছিল। দুই রাজ্যে অস্ত্রশস্ত্র, ধাতু, বস্ত্র, খনি ও অলংকার শিল্প ছিল। দুই রাজ্যের অভিজাতরা বিলাসব্যসনে থাকতেন, এজন্য তাদের বিলাসপণ্যের প্রয়োজন হতো। বিদেশী বণিকরা এসব সরবরাহ করত। দক্ষিণে বহু শহর গড়ে উঠেছিল, প্রধান শহর হলো বিজয়নগর, বিদর, গুলবর্গা, ফিরুজাবাদ, দৌলতাবাদ বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা। প্রশাসনিক কেন্দ্র, বন্দর, ধর্মস্থান ঘিরে শহর স্থাপিত হয়েছিল। উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত কারিগরদের গিল্ড ছিল, বণিকরা পৃথকভাবে গিল্ড গঠন করেছিল। বিজয়নগর ও বাহমনি রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য ছিল বেশ উন্নত। বিজয়নগর রাজ্যে তিনশো বন্দর ছিল, শতাধিক শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। শাসকরা শিল্প ও বাণিজ্যকে উৎসাহ দিতেন, বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্ব তারা উপলব্ধি করেছিলেন। বিদেশ থেকে আমদানি করা হতো প্রধানত ঘোড়া, রেশম, হীরে, বিলাসপণ্য। রপ্তানি করা হতো বস্ত্র, লোহা, চাল, চিনি, মশলা ও সোরা। বৈদেশিক বাণিজ্য ছিল পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, পশ্চিম এশিয়া, পর্তুগাল ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে। মালদ্বীপে তৈরি জাহাজ শাসকরা কিনতেন। সোনা, রুপো ও তামার মুদ্রা বাণিজ্যিক লেনদেনে ব্যবহার করা হতো। ভোগ্যপণ্যের দাম ছিল সস্তা। অভিজাতদের জীবন ছিল উন্নতমানের, সাধারণ মানুষের অবস্থা ভালো ছিল না। তাদের চরম দারিদ্র্যের কথা সমকালীন পর্যবেক্ষকরা উল্লেখ করেছেন। সামরিক খাতে ব্যয় হতো খুব বেশি, এজন্য শাসকরা নানা ধরনের কর বসিয়েছিলেন। করের চাপ বেশি হওয়ার জন্য মাঝে মাঝে বিদ্রোহ হতো, শাসকরা সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে জনগণের বিদ্রোহ দমন করতেন।

বিজয়নগরের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন

খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে বেশ কয়েকজন বিদেশী পর্যটক বিজয়নগর রাজ্য পরিভ্রমণে এসেছিলেন। পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকে ইতালীয় পরিব্রাজক

নিকোলো কন্টি প্রথম দেবরায়ের রাজত্বকালে বিজয়নগরে এসেছিলেন। তাঁর বর্ণনায় বিজয়নগর শহর ও রাজ্যের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে দ্বিতীয় দেবরায়ের সময়ে পারস্য দেশীয় পরিব্রাজক আবদুর রজ্জাক এই রাজ্য পরিভ্রমণ করেন। তাঁর বর্ণনায় এই রাজ্যের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কথা আছে। তিনি জানিয়েছেন যে দেশটি হল সমৃদ্ধ, রাজার ধন-সম্পদ এত বিশাল যে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। দেশের সব শ্রেণীর মানুষ, ধনী-দরিদ্র সকলে রত্নালঙ্কার পরিধান করে। তাঁর মতে, বিজয়নগর সারা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ শহর। পর্তুগিজ পর্যটক ডমিংগো পেজ (Paes) এই রাজ্যের বিস্তৃত বর্ণনা রেখে গেছেন। বহু জাতির লোক এই দেশে বাস করত, বহু দেশের সঙ্গে বিজয়নগরের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। বিজয়নগর বাজারে পণ্যসম্ভার ও শস্যের প্রাচুর্য পেজকে মুগ্ধ করেছিল। পেজ জানিয়েছেন যে রাজা ছিলেন শক্তিশালী ও ধনবান, হাতি-ঘোড়াসহ এক বিশাল সৈন্যবাহিনী তিনি পোষণ করেন। ষোড়শ শতকে কৃষ্ণদেব রায়ের রাজত্বকালে এসেছিলেন দুয়ার্তে বারবোসা। তিনি এই রাজ্যের বিশালতা, জনসংখ্যা ও বহির্বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি এই রাজ্যের সঙ্গে মালাবার, পেগু, চীন ও আলেকজান্দ্রিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্কের কথা জানিয়েছেন। ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে আসেন ফারনাও নুনিজ, শেষের দিকে এসেছিলেন সিজার ফ্রেডারিক। ষোড়শ শতকের গোড়ারদিকে কারটাস (Cartas) এই রাজ্য ভ্রমণ করে পর্তুগিজদের সঙ্গে বিজয়নগরের বাণিজ্যের কথা বলেন। নুনিজ বিজয়নগরে তিন বছর কাটিয়েছিলেন। তাঁর রচনা থেকে ঐ রাজ্যের ভূমি ও জলসেচ ব্যবস্থার কথা জানা যায়। বিদেশী ভ্রমণকারীরা বিজয়নগরের উন্নত জলসেচ ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বিদেশীদের সাক্ষ্য ছাড়াও সমকালীন সংস্কৃত ও তেলেগু সাহিত্যে এযুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের অনেক উপাদান ছড়িয়ে আছে। অসংখ্য লেখ থেকেও আর্থ-সামাজিক জীবনের কথা জানা যায়।

বিজয়নগরের রাজকবি আল্লাসনি পেদ্দন তাঁর *মনুচরিত্রমে* বিজয়নগরের চার জাতির কথা উল্লেখ করেছেন। এই চার জাতি হলো বিপ্রলু (ব্রাহ্মণ), রাজলু (ক্ষত্রিয়), মতিকীরাতলু (বৈশ্য) ও নলভজাতিভরু (শূদ্র)। সমাজের সবচেয়ে সুবিধাভোগী গোষ্ঠী ছিল ব্রাহ্মণরা। প্রথাগত শিক্ষক ও পুরোহিতের কাজ ছাড়াও ধর্ম, সমাজ, প্রশাসন ও সামরিক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের ভূমিকা ছিল। বিজয়নগর রাজ্যের দুর্গাধিপতি হিসেবে ব্রাহ্মণরা কাজ করতেন, সৈন্য পরিচালনা করতেন। অনেক ব্রাহ্মণ প্রশাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। পেজ জানিয়েছেন যে ব্রাহ্মণরা বেশিরভাগ ছিল নিরামিষাশী। এরা ছিল সৎ, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী, ভালো হিসেব-রক্ষক, শীর্ণকায়, পরিশ্রমসাধ্য কাজে অপারগ। ক্ষত্রিয়রা যুদ্ধবিগ্রহ ও রাষ্ট্র পরিচালনার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকত। বৈশ্যরা ছিল বণিক, দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক

বাণিজ্য এরা পরিচালনা করত। শূদ্ররা ছিল সমাজে অবহেলিত, কায়িক শ্রমসাধ্য কাজগুলি এরা করত, জীবিকা অর্জনের জন্য বহু ধরনের বৃত্তি এদের গ্রহণ করতে হতো।

বিজয়নগর সমাজে নারীদের উচ্চস্থান ছিল, পুরুষদের মতো নারীরা রাজনীতি, সামাজিক কাজকর্ম ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিত। সাধারণ শিক্ষা, শিল্প-সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি ছাড়াও তাদের অসি চালনা, মল্লযুদ্ধ ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হতো। ফারনাও ন্যুনিজ জানাচ্ছেন যে বিজয়নগরের রাজারা মহিলা মল্লযোদ্ধা, মহিলা জ্যোতিষী ও মহিলা হিসেবরক্ষক রাখতেন। নুনিজ আরও জানিয়েছেন যে বিজয়নগরের রাজারা প্রাসাদ রক্ষার কাজে মহিলাদের নিযুক্ত করেছিলেন। নৃত্য, সঙ্গীত ও শিক্ষায় মহিলারা পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। গঙ্গাদেবী লেখেন বিখ্যাত কাব্য *মাদুরাবিজয়ম*, হোনাম্মা ছিলেন রাজপ্রাসাদের বিদুষী মহিলা। তিরমালম্মা ছিলেন বিজয়নগরের বিখ্যাত মহিলা সংস্কৃত কবি। বারবোসা জানাচ্ছেন যে শৈশব থেকে বিজয়নগরের মহিলাদের সঙ্গীত, নৃত্য ও খেলাধুলা শেখানো হতো। এরাজ্যে বাল্যবিবাহ প্রথা ছিল, ব্রাহ্মণরা ছাড়া আর সকলে একাধিক পত্নী গ্রহণ করত। সমাজের সচ্ছল শ্রেণীর মানুষরা বিবাহে যৌতুক নিত। সতীপ্রথার বহুল প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। বিজয়নগরের মহিলারা অলংকার পরতে খুব ভালোবাসত, পেজ নারী সমাজের অলংকার প্রীতির কথা উল্লেখ করেছেন। সমাজে দেবদাসী প্রথা ছিল, মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত দেবদাসীরা সঙ্গীত ও নৃত্যে পারদর্শিনী হতেন। উৎসবের সময় এরা নৃত্য, গীত পরিবেশন করত, সমাজে এদের বিশেষ মর্যাদা ছিল।

বিদেশী পর্যটকরা জানাচ্ছেন যে বিজয়নগরের ব্রাহ্মণরা মাংস খেত না, তবে ব্রাহ্মণরা ছাড়া আর সকলে মাংস খেত। গরু ও মোষের মাংস খাওয়া হত না। এরাজ্যের মানুষ বহু রকমের পশু-পাখি শিকার করে মাংস খেত। নুনিজ এসব পশু-পাখির বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। সাধারণ মানুষের প্রধান খাদ্য ছিল ভাত ও মাছ। উৎসবের সময় হাজার হাজার পশু বলি হতো, পেজ জানাচ্ছেন যে মহানবমীর সময় রাজারা পশুবলির ব্যবস্থা করতেন। হোলি উৎসব হতো, বিদেশীরা হোলি উৎসবের কথা উল্লেখ করেছেন। বিজয়নগরের প্রথম দিককার রাজারা ছিলেন শৈব, বিরূপাক্ষ শিব ছিলেন তাঁদের উপাস্য দেবতা। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব ধর্মাচার্যদের প্রভাবে তাঁরা বিষ্ণুভক্ত হন। বিষ্ণুর উপাসনা করলেও তাঁরা কখনও শৈবদের প্রতি বিরূপ হননি। রাজা কৃষ্ণদেব রায় একই সঙ্গে বিষ্ণু, শিব ও তিরুপতির পূজা করতেন। সদাশিব শিব, বিষ্ণু ও গণেশের ভক্ত ছিলেন। শৈব ও বৈষ্ণবধর্মের পাশাপাশি বিজয়নগরে বৈদিক হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল। বেদের বিখ্যাত ভাষ্যকার সায়ন ও তাঁর ভ্রাতা মাধব বৈদিক ধর্মের পুনরুজ্জীবনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন।

জৈনরাও বিজয়নগরের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে মহাকাব্য ও পুরাণ খুব জনপ্রিয় ছিল। মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইহুদিরা বিজয়নগরে স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণ করতে পারত। পেজ বিজয়নগরের মুসলমান অধ্যুষিত এলাকার কথা উল্লেখ করেছেন। বিদেশী পর্যটকদের সকলে বিজয়নগরের রাজাদের ধর্মীয় সহনশীলতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁদের শাসনকালে এই রাজ্যে কোনো ধর্মীয় দ্বন্দ্ব বা সংঘাত ছিল না।

বিজয়নগরের রাজারা শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করেন। রাজারা সংস্কৃত, তেলেগু, তামিল ও কানাড়া ভাষায় সাহিত্য চর্চাকে উৎসাহ দেন। কৃষ্ণদেব রায়ের শাসনকালে সংস্কৃতিক্ষেত্রে চরম উন্নতি ঘটেছিল। আটজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও কবি 'অষ্ট দিগ্‌গজ' তাঁর সভা অলংকৃত করেন। বিজয়নগর রাজ্যের সূচনা থেকে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে উন্নতি শুরু হয়েছিল। রাজা প্রথম বুক্কা তেলেগু সাহিত্যকে উৎসাহ দেন। এই পর্বে বিখ্যাত তেলেগু কবি নাচানাসোম তেলেগু ভাষায় কাব্য রচনা করেন। রাজা দ্বিতীয় দেবরায় চৌত্রিশ জন কবি-সাহিত্যিককে পৃষ্ঠপোষকতা দেন। খ্যাতনামা তেলেগু কবি আল্লাসনি পেদ্দন কৃষ্ণদেব রায়ের রাজসভায় ছিলেন। রাজা নিজে একজন সুসাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর *আমুক্তমাল্যদায়* বিজয়নগরের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ইতিহাসের তথ্য পাওয়া যায়। এই রাজ্যের রাজারা শুধু সাহিত্য নয়, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে এই রাজ্যে অনেক শহর, প্রাসাদ ও মন্দির নির্মিত হয়। কৃষ্ণদেব রায় নগলপুর শহরটি নির্মাণ করেন, শহরে জল সরবরাহের ভালো ব্যবস্থা ছিল। পম্পাপতি, হাজারা রামস্বামী ও বিট্ঠলস্বামী মন্দির হলো স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। মন্দির গাত্র অসংখ্য মূর্তি ও চিত্র দিয়ে শোভন করা হয়। শিল্প সমালোচক পার্সি ব্রাউন বিজয়নগরের শিল্পের প্রশংসা করেছেন, বিজয়নগরের শিল্পীরা একটি স্বতন্ত্র রীতি গড়ে তুলেছিল, এই শৈলী দ্রাবিড় শৈলী থেকে অনেকক্ষেত্রে স্বতন্ত্র।

বিদেশীরা বিজয়নগরের অর্থনৈতিক জীবনের বিস্তৃত পরিচয় রেখে গেছেন। লেখ, মুদ্রা ও সমকালীন তেলেগু ও তামিল সাহিত্যে এই সমৃদ্ধির কথা আছে। এই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ভিত্তি ছিল উন্নত কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য। বিজয়নগরের রাজারা কৃষিকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিস্তৃত জলসেচের ব্যবস্থা করে দেন। নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী জানাচ্ছেন যে বাঁধ দিয়ে বা কূপ খনন করে চাষের জমিতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন বেড়েছিল, রাষ্ট্রের আয় বৃদ্ধি পায়। বিজয়নগরের সব জমি তিনভাগে বিভক্ত ছিল—মান্য, ভাণ্ডার ও অমর। মান্য হলো ব্রাহ্মণ, মন্দির ও মঠের জন্য নির্দিষ্ট নিষ্কর জমি। যে জমি থেকে রাজা সরাসরি রাজস্ব পেতেন তার নাম হলো ভাণ্ডার (crownland)। এই আয়ের একাংশ বিজয়নগরের

দুর্গগুলি রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ব্যয় করা হতো। অমর হলো সামন্ত নায়কদের অধীনে স্থাপিত জমি। নুনিজ জানাচ্ছেন যে এই রাজ্যে দুই শতাধিক সামন্ত নায়ক ছিল, এদের অধীনে স্তরবিন্যস্ত মধ্যস্বত্বভোগীরা ছিল। মোট জমির একাংশ ছিল মন্দিরগুলির সম্পত্তি।

রাজস্ব স্থাপন ও সংগ্রহের জন্য রাজারা পৃথক রাজস্ব বিভাগ গঠন করেন। জমিকে তিনভাগে ভাগ করে রাজস্ব ধার্য করা হত। জমির তিনভাগ হলো শুষ্ক, জলা, বাগান ও জঙ্গল জমি। উৎপন্ন ফসল অনুযায়ী জমির মালিককে রাজস্ব বা খাজনা দিতে হতো। বিজয়নগরের রাজাদের অর্থের খুব দরকার হতো। বাহমনি রাজ্যের সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্ব ছিল, তাদের প্রায় ছয় লক্ষ সৈন্য ছিল। এজন্য উৎপন্ন শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ ছাড়াও অতিরিক্ত ভূমিকর আদায় করা হতো। ভূমিরাজস্বের ওপর কৃষকদের চারণ কর, বিবাহ কর ইত্যাদি দিতে হতো। রাজারা আমদানি-রপ্তানি পণ্যের ওপর শুল্ক আদায় করতেন, শহর বিজয়নগরের আমদানি-রপ্তানি পণ্যের ওপরও স্থানীয় শুল্ক দিতে হতো। এসব ছাড়াও ছিল আবগারি কর ও বিভিন্ন রকমের বৃত্তির ওপর স্থাপিত কর। রাজারা কর আদায়ের ব্যাপারে কঠোর ছিলেন, সাধারণ মানুষের ওপর করের চাপ ছিল বেশি। প্রাদেশিক শাসকরা বাড়াবাড়ি করে কর আদায় করত। প্রাদেশিক শাসক ও নায়কদের বিরুদ্ধে অত্যাচার করে কর আদায়ের অভিযোগ উঠত। বিক্ষুব্ধ জনগণের কাছ থেকে অভিযোগ পেলে রাজারা তার প্রতিকার করার প্রয়াস চালাতেন।

বিজয়নগরের ঐশ্বর্য ও জাঁকজমকের পশ্চাতে ছিল উন্নত শিল্প ও বাণিজ্য। বিজয়নগরে অস্ত্রশস্ত্র, ধাতু, বস্ত্র, খনি ও অলংকার শিল্প ছিল। রাজাদের বিশাল সৈন্য-বাহিনী ছিল, অনেকে একে যুদ্ধরাষ্ট্র বলেছেন। সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজনে অনেকগুলি শিল্প গড়ে উঠেছিল। এসব শিল্প সৈন্যবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করত। বিজয়নগরের অভিজাতরা বিলাসব্যসন ও ঐশ্বর্যের মধ্যে থাকতেন। বিজয়নগরে নাগরিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, এজন্য বিলাস পণ্যের প্রয়োজন হতো। বিজয়নগরে অনেক শহর ও বন্দর ছিল। প্রশাসনিক কেন্দ্র, বন্দর ও ধর্মস্থানকে কেন্দ্র করে শহরগুলি গড়ে উঠেছিল। এসব শহরের প্রয়োজন মেটাত শিল্পী ও কারিগররা, বিদেশ থেকেও বিলাসপণ্য আমদানি করা হতো। শিল্প উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত কারিগররা গিল্ড গঠন করেছিল, গিল্ডগুলি উৎপাদন ও সরবরাহ বজায় রাখত। ডমিংগো পেজ ও আবদুর রজ্জাক শিল্পী ও বণিকদের পৃথক মহল্লার কথা উল্লেখ করেছেন।

পর্যটকরা বিজয়নগরের সমৃদ্ধ বাণিজ্যের কথা বলেছেন। সাহিত্য, মুদ্রা ও লেখ থেকেও বাণিজ্য সমৃদ্ধির কথা জানা যায়। বিজয়নগরের মধ্যে কমপক্ষে আশিটি

বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। এই কেন্দ্রগুলিতে বাণিজ্যিক লেন-দেন ও প্রশাসনিক কাজকর্ম হতো। অনেকগুলি বাণিজ্যকেন্দ্র তীর্থস্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। শিল্পী ও কারিগরদের মতো বণিক, ব্যাঙ্কার ও মহাজনরা সংঘবদ্ধ হয়ে বাস করত। অনেক সময় একবর্ণের বণিকরা মিলে একটি মহল্লায় বাসস্থান গড়ে তুলত। অনেক সময় দেখা যেত একটি বণিক বা কারিগর গোষ্ঠী একটি বিশেষ অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হয়ে শিল্প-বাণিজ্য পরিচালনা করছে। তেলেগু ভাষী তেল ব্যবসায়ীরা কৃষ্ণা জেলার বেজুয়াদা শহরে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। কোমতি বণিকরা গোদাবরী জেলার পশ্চিমে পেনুগোণ্ডা শহরে সমবেত হয়। গুন্টুর জেলাতেও বণিকদের সংঘবদ্ধ হয়ে বাণিজ্য করতে দেখা যায়। রাজারা শিল্প-বাণিজ্যকে উৎসাহ দিতেন, বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্ব তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন। বিজয়নগর রাজ্যে তিনশত বন্দর ছিল, যাতায়াত ও পরিবহনের ভালো ব্যবস্থা ছিল। বিদেশ থেকে আমদানি করা হতো প্রধানত ঘোড়া, রেশম, হীরে ও বিলাস পণ্য। রপ্তানি করা হতো বস্ত্র, লোহা, চাল, চিনি, মশলা ও সোরা। বৈদেশিক বাণিজ্য ছিল পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ব্রহ্মদেশ, পশ্চিম এশিয়া, পর্তুগাল ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে। রাজারা মালদ্বীপে তৈরি জাহাজ কিনতেন। মন্দিরগুলির নথিপত্র থেকে জানা যায় বণিক, শিল্পী, কারিগর ও ব্যাঙ্কারদের অবস্থা ভালো ছিল। রাজা কৃষ্ণদেব রায় *আমুক্তমাল্যদায়* বণিক ও বাণিজ্যকে রক্ষা করার কথা বলেছেন। নুনিজ জানাচ্ছেন যে রাজা প্রতিবছর পশ্চিম এশিয়া থেকে তেরো হাজার ঘোড়া কিনতেন। বিপুল বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে বিজয়নগর লাভবান হতো। সোনা, রুপো ও তামার মুদ্রা বাণিজ্যিক লেন-দেনে ব্যবহার করা হতো। ভোগ্যপণ্যের দাম ছিল সস্তা। অভিজাতদের জীবনযাত্রা ছিল উন্নতমানের, সাধারণ মানুষের অবস্থা ভালো ছিল না, তাদের ওপর করভার ছিল বেশি। উৎপাদক ন্যায্য মূল্য পেত না, মজুরি ছিল কম। সম্ভবত উৎপাদকদের ওপর বলপ্রয়োগ করা হতো। সমকালীন পর্যবেক্ষকরা সাধারণ মানুষের দারিদ্র্যের কথা উল্লেখ করেছেন। সামরিক খাতে ব্যয় ছিল খুব বেশি, জনগণ ছিল করভারে পীড়িত, এজন্য মাঝে মাঝে বিদ্রোহ হতো। রাজারা সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে বিদ্রোহ দমন করতেন।

দক্ষিণে নগরায়ণ ও বাণিজ্য

ত্রয়োদশ শতকে দক্ষিণের আর্থ-সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছিল। এই আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের একটি বড় দিক হলো নগরায়ণ। দক্ষিণ ভারতের ধ্রুপদী যুগে নগরায়ণের ক্ষেত্রে এত বৃহৎ আকারে পরিবর্তন ছিল না। ধ্রুপদী যুগে যে নগরায়ণ হয় তার পশ্চাতে ছিল বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতি, প্রধানত ভারত-রোমান বাণিজ্য।

ত্রয়োদশ শতকে যে নগরায়ণ পর্ব শুরু হয়েছিল তার আর্থ-সামাজিক কারণ হলো উন্নততর প্রশাসনিক ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক কাজকর্ম বৃদ্ধি এবং মন্দির নির্মাণ (larger units of governance, economic co-operation and temple construction)। চোল রাজা রাজরাজ ও তাঁর পুত্র প্রথম রাজেন্দ্র নাডুকে কেন্দ্র করে যে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলেন তা নগরায়ণের পথ প্রশস্ত করেছিল। নাডুগুলি শুধু প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল না, এগুলি ছিল বাণিজ্য কেন্দ্র, মন্দিরের সরবরাহ কেন্দ্র এবং প্রতিরক্ষা ঘাঁটি। কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুতে এগুলির নাম হয়েছিল মহানাডু ও পেরিয়ানাডু। তামিল অঞ্চলে কাবেরী উপত্যকায় ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে চোল রাজারা সামরিক প্রয়োজনে সম্ভবত নাডু স্থাপন করেছিলেন। সমকালীন লেখ থেকে জানা যায় যে এগুলি ছিল সম্পন্ন কৃষকদের বাসকেন্দ্র, এদের প্রতীক চিহ্ন ছিল লাঙ্গল। এইসব নাডুর অধিবাসীরা নিজেদের 'ভূমিপুত্র' (Son of the soil) বলে উল্লেখ করত। এই নাডুগুলি নানাধরনের আর্থ-সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। এইসব নাডুতে বিবাহ সম্পন্ন হতো, জাতি ও উপজাতির জন্য মন্দির স্থাপিত হয় এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উৎপন্ন কৃষিজ পণ্যের বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে এগুলি কাজ করত। এই নাডুগুলিকে কেন্দ্র করে দক্ষিণে নগরায়ণের নব-পর্যায় শুরু হয়েছিল। ভক্তি ধর্ম প্রচারিত হলে এবং দেবদেবীর মন্দির স্থাপিত হলে এইসব নাডুর কাজকর্ম বেড়েছিল।

দক্ষিণে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে কেন্দ্র করে সামাজিক প্রতিষ্ঠান 'ব্রহ্মদেয়' গড়ে উঠেছিল। ব্রাহ্মণদের দান করা ভূমিতে নগর স্থাপিত হয়। রাজারা ও অভিজাতরা এধরনের ব্রাহ্মণ উপনিবেশ গঠনে উৎসাহ দেন। ত্রয়োদশ শতকের পর নতুন করে ব্রহ্মদেয় উপনিবেশ স্থাপিত হয়নি, শুধু দক্ষিণের পাণ্ড্য রাজ্যে এধরনের উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। পুরনো ব্রহ্মদেয় উপনিবেশের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ও মর্যাদা ছিল, নতুনগুলিকে কেন্দ্র করে মন্দির শহর গড়ে ওঠে। ব্রহ্মদেয় উপনিবেশে শুধু ব্রাহ্মণ নয়, কারিগর, বণিক ও কৃষকরাও বাস করত, এজন্য এগুলি ঘিরে শহর গড়ে ওঠা ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। এই সব কর্মজীবী মানুষ ব্রাহ্মণ উপনিবেশের খাদ্যশস্য ও ভোগ্যপণ্যের প্রয়োজন মেটাত। প্রথম রাজেন্দ্রের কারান্দাই লেখ থেকে জানা যায় তাঞ্জাভুরের পাপনাশম তালুকে ১০৮৩ জন ব্রাহ্মণ নিয়ে একটি ব্রহ্মদেয় উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। ব্রহ্মদেয়ের পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত ছিল মন্দিরের পূজা-পদ্ধতির পরিবর্তন। দেবতাদের সঙ্গে দেবীদের জন্য পৃথক পূজার প্রচলন হয়, বৈদিক দেবতাদের পাশে দেবীরা স্থান লাভ করেন। বৈষ্ণবধর্মের উত্থানের ফলে ধর্মীয় আন্দোলন জোরদার হয়েছিল। অনেক নতুন মন্দির নির্মিত হয়, অনেক বড় বড় মন্দির শহর স্থাপিত হয়। মন্দির নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত ছিল বণিক, কারিগর ও শ্রমিকরা। মন্দির ও মন্দিরের শহরের

জন্য কারিগরি কৌশল, মালমশলা এবং অন্যান্য অনেক পরিষেবার প্রয়োজন হতো। নগরায়ণের এক বৈশিষ্ট্য হলো পাহাড়ের পাদদেশে শহরগুলি স্থাপিত হয়েছিল, পাহাড়ের ওপরে মন্দিরগুলি স্থাপিত হয়। তিরুপতি মন্দিরের অবস্থান এই রকমের (An almost ubiquitous feature of urbanisation of the time was the development of towns at the base of hills on which much of the new temple-building took place.)। শহরগুলির যাত্রা শুরু হয়েছিল মন্দিরের জন্য শ্রমিক ও মালমশলা সরবরাহের ঘাঁটি হিসেবে। সম্পন্ন কৃষক সমাজ, কারিগর ও বণিকদের মধ্যে আদান-প্রদান, লেনদেন চলেছিল। ত্রয়োদশ শতকের লেখগুলিতে এই সহযোগিতার কথা আছে। শহরের কারিগর ও বণিকদের গিল্ডের লেখগুলিতে কারিগর ও বণিকদের সামাজিক মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারিগর ও বণিকশ্রেণী উদীয়মান শহরগুলির সামাজিক জীবনের অচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়।

ত্রয়োদশ শতক থেকে যে নতুন নগরায়ণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তার পেছনে ছিল বাণিজ্যের বিস্তার। একাদশ ও দ্বাদশ শতকের নথিপত্র থেকে জানা যায় যে শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রম বিভাজন অনেকদূর এগিয়েছিল, পণ্য উৎপাদন বেড়েছিল। জলা ও আধা শুষ্ক অঞ্চলে বণিকরা বহুজাতিক নগরে (পুরম) নিজেদের বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করেছিল। নগরত্তর (Nagarattar) শব্দটির অর্থ হলো বণিকগোষ্ঠী। এরা কৃষিজ পণ্যে বাণিজ্য করত, শঙ্করপাদিয়ার হলো ছোট বণিক ও কারিগর-বণিকদের সংস্থা। এরা শহরের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বাস করত, গিল্ড (শ্রেণী) গঠন করেছিল এবং বিশেষ পণ্য নিয়ে বাণিজ্য করত। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকের নগরায়ণের একটি বৈশিষ্ট্য হলো পুরনো বাণিজ্য মেলা, বাণিজ্য কেন্দ্রের পরিবর্তে দেশে শহর-কেন্দ্রিক বাণিজ্য গড়ে উঠেছিল। কঙ্গু, কর্ণাটক ও পাণ্ডিমণ্ডলমে সমৃদ্ধ কৃষি অঞ্চলের উদ্ভব হয়। মন্দির ও তীর্থযাত্রীদের যাতায়াত বাণিজ্যর সহায়ক পরিমণ্ডল তৈরি করেছিল, বাণিজ্য বেড়েছিল। মন্দিরগুলির প্রচুর পণ্যের প্রয়োজন হতো, মন্দিরে পূজাঅর্চনা ও প্রসাদের জন্য মন্দির কর্তৃপক্ষ প্রচুর পণ্য কিনত। মন্দির শহরের বণিক ও কারিগররা মন্দির ও মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত নানাধরনের লোকজনের চাহিদামতো পণ্য সরবরাহ করত। মন্দির-কেন্দ্রিক শহরগুলি কারিগর ও বণিকদের ওপর পুরনো নিয়ন্ত্রণ অনেকখানি শিথিল করে দিয়েছিল। নাড়ু-কেন্দ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর-পুরনো বিধিনিষেধ বাতিল হয়েছিল। মেলা (সন্থে) এবং ভ্রাম্যমাণ বণিকদের সঙ্গে বণিক সংঘের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। নতুন শহরগুলিতে বণিকরা এসে সমবেত হয়েছিল, পুরনো জাতিগত বিধিনিষেধ থেকে বণিকসমাজ মুক্ত হয়েছিল। শহরের অভিজাত ও যোদ্ধারা বণিকশ্রেণীর সরবরাহ করা পণ্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। নগর জীবনের এক বিশিষ্ট অঙ্গ হলো বণিক ও কারিগররা।

বিজয়নগরের সমৃদ্ধির কারণ হলো এর সমৃদ্ধ অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য। এই সাম্রাজ্যের মধ্যে কমপক্ষে আশিটি বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। মন্দির, বন্দর, প্রশাসনিক কেন্দ্রে বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি গড়ে উঠেছিল। বণিক, ব্যাঙ্কার, মহাজন ও কারিগররা সংঘবদ্ধভাবে পৃথক পৃথক অঞ্চলে বাস করত। অনেক সময় একই জাতিগোষ্ঠীর লোক একটি বিশেষ অঞ্চলে বাস করত। অনেক সময় একটি জেলা বা শহরকে কেন্দ্র করে একটি বিশেষ শিল্প বা বণিকগোষ্ঠী গড়ে উঠত। তেলেগুভাষী তৈল ব্যবসায়ীরা কৃষ্ণা জেলার বেজওয়াড়া শহরে সংগঠিত হয়েছিল।[১] কোমতি বণিকরা গোদাবরী জেলার পশ্চিমে পেনুগোণ্ডাতে সমবেত হয়েছিল। কারিগরদের সংঘ ছিল গুন্টুর জেলার পেমডোটাতে। বিজয়নগরের রাজারা যাতায়াত ও পরিবহনের উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তুলেছিলেন, এজন্য অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উন্নতি হয়েছিল। নৌকা, জাহাজ, বলদ ও ঘোড়ার গাড়ি পরিবহনের জন্য ব্যবহার করা হতো। দেশের সামন্তরা বণিক ও বাণিজ্যকে সযত্নে রক্ষা করতেন। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রধান পণ্য ছিল খাদ্যশস্য, সবজি, লবণ, ফল, চিনি, তৈলবীজ, তুলো, সুতো, বস্ত্র, চট ও নানা ধরনের ধাতব দ্রব্য। বিদেশীদের বর্ণনা এবং মন্দিরগুলির নথিপত্র থেকে বণিক, শিল্পী, ব্যাঙ্কার ও কারিগরদের ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধির কথা জানা যায়।[২]

বিজয়নগরের রাজারা বৈদেশিক বাণিজ্যকে খুব গুরুত্ব দিতেন। বিদেশ থেকে কয়েক হাজার ঘোড়া তাঁদের প্রতিবছর আমদানি করতে হতো। নুনিজের বর্ণনা অনুযায়ী পশ্চিম এশিয়া থেকে এই উত্তম জাতের ঘোড়া আমদানির ব্যবস্থা ছিল। রাজা কৃষ্ণদেব রায় (১৫০৯-১৫২৯) *আমুক্তমাল্যদায়* বণিকদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করতে বলেছেন। তিনি বন্দর ও পোতাশ্রয়ের উন্নতির ব্যবস্থা করতে বলেছেন। বিদেশ থেকে বিজয়নগর ঘোড়া, হাতি, মূল্যবান রত্ন, চন্দনকাঠ, মুক্তো ও অন্যান্য সামগ্রী আমদানি করত (A king should improve the harbour of his country and so encourage its commerce that horses, elephants, precious gems, sandal wood, pearls and other articles are freely imported.)। বিদেশী বণিকদের সযত্নে রক্ষার ব্যবস্থা ছিল, বহু বিদেশী বণিক এই রাজ্যে বাস করত। আবদুর রজ্জাক লিখেছেন যে বিজয়নগর রাজ্যের উপকূলে তিনশো বন্দর ছিল। পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, পশ্চিম এশিয়া ও পর্তুগালের সঙ্গে বিজয়নগরের বাণিজ্য চলত। বিজয়নগর এইসব দেশে রপ্তানি করত বস্ত্র, লোহা, চাল, চিনি, নানাধরনের মশলা ও সোরা। আমদানি করা হতো হীরে, রেশম, তামাক, পারদ, ভেলভেট, প্রবাল, হাতি, ঘোড়া প্রভৃতি। মালদ্বীপে

---

১. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *মধ্যযুগে ভারতের অর্থনৈতিক জীবন*, পৃ. ৪৩।

২. *স্টেইন বার্টন*, *কেম্ব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১২০।

জাহাজ তৈরি হতো, বিজয়নগরের রাজারা এইসব জাহাজ কিনত। বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে বিজয়নগর লাভবান হতো। দক্ষিণে বিনিময় মাধ্যম ছিল সোনা, রুপো ও তামার মুদ্রা। উন্নত কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের জন্য সব ভোগ্যপণ্যের দাম ছিল খুব সস্তা। অভিজাতদের জীবন ছিল উন্নতমানের, ব্যয়বহুল, সাধারণ মানুষের অবস্থা ভালো ছিল না, করের চাপ বেশি ছিল।

একাদশ শতক থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে তামিল বণিকরা ছড়িয়ে পড়েছিল। তামিল বণিকদের সংঘ ছিল মণিগ্রামম (আইনুরুবার), এগুলি চোল রাজাদের সহযোগিতা লাভ করেছিল। চোল রাজারা চীনে দূত পাঠিয়েছিলেন। একাদশ শতকে চোল রাজারা শ্রীবিজয় আক্রমণ করেন, চোল রাজা বীর রাজেন্দ্র কেদা অধিকার করেন। এতে বাণিজ্য সম্পর্ক অবশ্যই নষ্ট হয়েছিল। ত্রয়োদশ শতকে বাণিজ্যে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ বন্ধ হয়েছিল। মুসলিম বণিকরা ভারতের উপকূল বাণিজ্যে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। মালাবার ও করমণ্ডল উপকূলের বাণিজ্যে ভারতীয় মুসলিম বণিকদের আধিপত্য স্থাপিত হয়। এই মুসলিম বণিকরা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। রাষ্ট্র তাদের পৃষ্ঠপোষকতা দেয়নি, রক্ষার ব্যবস্থা করেনি। দক্ষিণ ভারতের বাণিজ্যের ধরনে বড় রকমের পরিবর্তন ঘটেনি। পেরিপ্লাস, টলেমি ও প্লিনি থেকে যে বাণিজ্যের পরিচয় পাওয়া যায় তার পরিবর্তন ঘটেনি। পশ্চিম উপকূল থেকে পারস্য, আরব, পূর্ব আফ্রিকা ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে পাঠানো হতো মশলা, জায়ফল, লবঙ্গ, কাঠ, রঙ, চিনি, এবং মূল্যবান পাথর। খাদ্যশস্য, ডাল, নারিকেল এবং বস্ত্র ছিল অন্যান্য রপ্তানি পণ্য। কান্নানোর, কালিকট, ক্র্যাঙ্গানোর, কোচিন ও কুইলন হলো পশ্চিমের বন্দর। এসব বন্দরে পশ্চাদভূমি থেকে কৃষিজ ও শিল্পপণ্য এনে মজুত করা হতো। বাণিজ্যপোত পাহারা দিত সশস্ত্র রক্ষীরা। মুসলিম বণিকরা দক্ষিণে আমদানি করত সুগন্ধ দ্রব্য, বস্ত্র, মোম, শাঁখ, সোনা ও মূল্যবান পাথর। মালয় ও চীন থেকে আমদানি করা হতো কর্পূর, মালয় থেকে ভেষজ দ্রব্য এবং চীনের বাসনপত্র, বস্ত্র, রেশম আমদানি হতো।

চীনা লেখক চাওজুকুয়া এবং মুসলিমদের বর্ণনা থেকে করমণ্ডলের বাণিজ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মার্কোপোলো দক্ষিণের বাণিজ্য সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করেছেন। মরিচ, বস্ত্র, মূল্যবান পাথর এই অঞ্চল থেকে বিদেশে পাঠানো হতো। দক্ষিণ ভারতের আকরে বৈদেশিক বাণিজ্যকে অবহেলা করা হয়েছে। কাকতীয় রাজা শুল্ক ও বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধার কথা উল্লেখ করেছেন (অভয় শাসনম, ১২৪৪)। বণিকরা জীবন বিপন্ন করে অর্থের লোভে বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশ নিত। দক্ষিণ ভারতের অর্থনীতির ওপর বৈদেশিক বাণিজ্যের বেশি প্রভাব ছিল না, পূজার জন্য কর্পূর এবং যুদ্ধের জন্য হাতি-ঘোড়ার প্রয়োজন হতো। এজন্য রাজাদের কাছে

বণিকদের তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল না। নতুন শহরের বাণিজ্যের সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। সামগ্রিকভাবে নগরায়ণ ও বাণিজ্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল।

বাংলার সমাজ ও অর্থনীতি

প্রায় দুশো বছর ধরে বাংলায় স্বাধীন সুলতানি শাসন ছিল। বাংলায় স্বাধীন সুলতানির প্রতিষ্ঠাতা হলেন শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্ (১৩৪২-৫৮)। তাঁর পরে তাঁর বংশের সিকান্দর শাহ্ (১৩৫৮-৯২) এবং গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ্ (১৩৯২-১৪১১) বাংলা শাসন করেন। এই রাজবংশ উচ্ছেদ করে রাজা গণেশ ও তাঁর পুত্র জালালুদ্দিন কিছুকাল রাজত্ব করেন। এঁদের অপসারিত করে ইলিয়াস শাহী বংশের শাসকরা ক্ষমতা দখল করেন। এঁদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল হাবসিরা, আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্ এঁদের দমন করে হুসেন শাহী রাজবংশ স্থাপন করেন। এই রাজবংশ ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছিল। ১৪০৫ থেকে ১৪৩৮-৩৯ পর্যন্ত কয়েকজন চীনা দূত বাংলাদেশে এসেছিলেন। চীনারা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিবরণ রেখে গেছেন। চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে ইবন বতুতা বাংলাদেশে এসেছিলেন, তিনি এখানকার বাণিজ্য ও পণ্যমূল্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বহুদেশ ভ্রমণ করেছিলেন, ভারতবর্ষের বহু জায়গায় তিনি গিয়েছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম বন্দর, সোনারগাঁ ও শ্রীহট্ট দেখেছিলেন। তিনি জানিয়েছেন যে বাংলাদেশে খাদ্যসামগ্রী খুব সস্তা ছিল, এমন সস্তা খাদ্যসামগ্রী তিনি আর কোথাও দেখেননি। তিনি বাংলাদেশের কিছু পণ্যের বাজার দামের কথা উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপক নীরদ ভূষণ রায় ইবন বতুতা প্রদত্ত জিনিসপত্রের দামকে আধুনিক মুদ্রায় রূপান্তরিত করেছেন।[৩]

বাংলাদেশে ধান ও চাল খুব সস্তা ছিল, তিন মণ চাল পাওয়া যেত সাত টাকায়, ঐ টাকায় সাত মণ ধান কেনা যেত। সাড়ে তিন টাকায় চোদ্দ সের ঘি মিলত, চোদ্দ সের চিনির দাম ছিল সাড়ে তিন টাকা। পনেরো গজ কাপড় চোদ্দ টাকা, একটি দুগ্ধবতী গাভীর দাম পড়ত একুশ টাকা। সাত টাকায় একজন সুন্দরী দাসী পাওয়া যেত। একজন মরক্কোবাসী ভদ্রলোক বাংলাদেশে কিছুকাল বাস করেছিলেন। তিনি ইবন বতুতাকে জানিয়েছিলেন যে তিনজনের পরিবারের সারাবছরের খাদ্যশস্যের দাম পড়ত মাত্র সাত টাকা। বাংলাদেশের লোকেরা মনে করত জিনিসপত্রের দাম অনেক চড়া। খাদ্যশস্যের প্রাচুর্যের জন্য বিদেশীরা বাংলাদেশকে খুব পছন্দ করত, কিন্তু এখানকার জলবায়ু তাদের পছন্দ হতো না। এজন্য বহিরাগতরা বাংলাদেশকে বলত

৩. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস, সুলতানি আমল*, পৃ. ১৭৯।

'ধনসম্পদে পরিপূর্ণ এক নরক'। ইবন বতুতা দেশের সুফি দরবেশদের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি নিজে শ্রীহট্টের দরবেশ শাহ্ জালালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রাষ্ট্র দরবেশদের নানাভাবে সাহায্য করত। তিনি চট্টগ্রাম বন্দরে অনেক জাহাজ দেখেছিলেন, বাংলাদেশে জাহাজ নির্মাণের ব্যবস্থা ছিল। বাংলায় উন্নত মানের বস্ত্র তৈরি হতো। চীনা পর্যটক মাহুয়ান (Mahuan) লিখেছেন যে বাংলাদেশে রেশম উৎপন্ন হতো এবং উন্নত মানের কাগজ তৈরি হতো। শ্রীহট্ট থেকে নদীপথে সোনারগাঁ আসার সময় তিনি নদীতীরে শ্যামল বনানীর শোভা দেখে মুগ্ধ হন।

চীনাদের বিবরণীতে বলা হয়েছে বাংলাদেশের জমি ছিল বেশ উর্বর। এখানে বছরে দুবার শস্য উৎপন্ন হতো, সেচের ব্যবস্থা তেমন ছিল না, বৃষ্টির জলে চাষ হতো। নারী-পুরুষ উভয়ে কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত হতো। চাষের সময় ছাড়া গ্রামবাংলার মানুষ তাঁতে কাপড় বুনত। কৃষিজ পণ্যের মধ্যে ছিল ধান, ডাল, বজরা, আদা, সরিষা, পেঁয়াজ, রসুন, নারিকেল প্রভৃতি। ফলের মধ্যে ছিল কলা, কাঁঠাল ও আখ। বাংলায় চিনি উৎপন্ন হতো, মাখন ও ঘি পাওয়া যেত। চীনা লেখকরা বাংলার শিল্পগুলির উল্লেখ করেছেন। গাছের ছাল থেকে কাগজ তৈরি হতো, বিভিন্ন ধরনের সুতিবস্ত্র উৎপন্ন হতো, চীনারা বাংলাদেশে তুঁতে গাছের চাষ লক্ষ করেছিলেন। বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল, শহরগুলিতে নানা পণ্যের বাজার ছিল। চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ছিল। সোনা-রুপো, রেশম, পোর্সিলিন, পারদ ইত্যাদি পণ্যের বাণিজ্য চলত। চীনারা বলেছেন যে বাংলাদেশের লোক ছিল বেশ উদার, সম্পদশালী ও সভ্য। বাংলাদেশের প্রচলিত মুদ্রাকে টঙ্কা বলা হতো, খুচরো লেনদেনে কড়ির ব্যবহার ছিল।

চীনা বিবরণীতে বলা হয়েছে যে বাংলাদেশের সমাজ দুভাগে বিভক্ত ছিল—হিন্দু ও মুসলমান। এদের সামাজিক আচরণ পৃথক ছিল, হিন্দুরা গরুর মাংস খেত না, বিধবাদের বিবাহের নিয়ম ছিল না। বাংলাদেশের মানুষ ছিল সৎ, ব্যবসায়ে অর্থ লগ্নি করত, ক্ষতি হলেও কাউকে প্রতারণা করত না। বাংলা ভাষায় সকলে কথা বলত, তবে সরকারি কাজে ফার্সির চলন ছিল এবং অভিজাতরা ফার্সি ভাষা ব্যবহার করত। হিন্দু ও মুসলমান সকলে পাগড়ি পরত, একই ধরনের পোশাক চালু ছিল। বাঙালি মহিলারা অলংকার পরিধান করত, অভিজাত মুসলমানরা মাথায় টুপি পরত। হিন্দুদের নিম্নবর্গের অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। চীনা বিবরণে বাংলাদেশের চাষীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। চাষীরা সারাবছর ধরে চাষ করত, সেজন্য তাদের কৃষিক্ষেত্রগুলি শস্যসমৃদ্ধ থাকে, তাদের জমি পতিত থাকে না। বাংলার কৃষিতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হতো এবং এজন্য খাদ্যশস্যের দাম সস্তা থাকত। বাংলাদেশে চা উৎপন্ন হতো না, বাঙালি পান খেত এবং পান দিয়ে অতিথি আপ্যায়ন করত। বাংলাদেশে অসংখ্য

পশুপাখি পাওয়া যেত। বাংলার লোকেরা পরিশ্রম করে সম্পদের অধিকারী হয়েছিল। সততা ও সম্পদে এরা জাভার লোকদের সমান ছিল। বাংলার মুসলমানরা বাণিজ্যে খুব তৎপর ছিল। সৈন্যদের নিয়মিতভাবে বেতন দেওয়া হতো এবং রসদ সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল। বাঙালিদের মধ্যে সৈনিক ছাড়া অন্যান্য বৃত্তিধারী লোকেরা হলেন চিকিৎসক, জ্যোতিষী, শাস্ত্রবিদ্, গায়ক, নর্তকী এবং বহু ধরনের কারিগর। গায়ক ও যন্ত্রশিল্পীরা অভিজাতদের চিত্ত বিনোদন করত। চীনাদের বিবরণ অনুযায়ী বাংলাদেশে সুস্থিতি, শান্তি ও সমৃদ্ধি ছিল।

হুসেন শাহী শাসকরা দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে অর্থনৈতিক অগ্রগতির ব্যবস্থা করেন। ভূমিরাজস্ব ছিল সুলতানদের আয়ের প্রধান উৎস। বাণিজ্য শুল্ক, বন্দর, ফেরিঘাট ইত্যাদি থেকেও শাসকদের আয় হতো। হুসেন ও নসরত শাহের জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছিল। এরা প্রাসাদ, দুর্গ, মসজিদ, মাদ্রাসা, স্মৃতিসৌধ ইত্যাদি নির্মাণ করেন। শিল্প ও সাহিত্য ক্ষেত্রে নবজাগরণের সূচনা হয়। শহর গড়ে উঠেছিল। গৌড়, পাণ্ডুয়া, সাতগাঁ, সোনারগাঁ ছাড়াও বহু নতুন শহর ও বন্দর গড়ে ওঠে। নগরায়ণের সঙ্গে শিল্পের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। বস্ত্রশিল্প ছিল প্রধান, এই শিল্পের সঙ্গে বহু লোক যুক্ত ছিল। বস্ত্র বিদেশে রপ্তানি করা হতো, বাংলার মস্‌লিন পৃথিবীর বাজারে সমাদর পেয়েছিল। বাংলাদেশে প্রচুর রেশম উৎপন্ন হতো। বাংলার কারিগররা স্বর্ণালংকার নির্মাণে দক্ষ ছিল। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উন্নতি হয়েছিল, সমকালীন সাহিত্যে বণিক ও বাণিজ্যের উল্লেখ আছে। বৈদেশিক বাণিজ্যে বাঙালি বণিকরা অংশগ্রহণ করত। বাংলাদেশে আমদানি করা হতো লবণ, মূল্যবান পাথর, চীনামাটির বাসনপত্র। রপ্তানি পণ্যের মধ্যে ছিল চাল, গম, তুলো, বস্ত্র, চিনি ও রেশমী বস্ত্র। বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য দেশে সোনার আমদানি বেড়েছিল। হুসেন শাহী যুগের স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে, রুপোর টঙ্কার প্রচলন ছিল বেশি। বাংলা থেকে ফল, তেল, আদা, সুপারি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হতো। মাহুয়ান বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। পর্তুগিজরা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বাংলায় এসেছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে বাংলার বাণিজ্য চলেছিল, চট্টগ্রাম ছিল একটি বড় বন্দর (Porto Grander), সাতগাঁ ছিল ছোট বন্দর। পর্তুগিজরা চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে বাণিজ্য পরিচালনা করত। ইবন বতুতা চট্টগ্রাম বন্দরের কথা (সুদকাওয়ান) উল্লেখ করেছেন। বারোস (Joa de Barros, ১৪৯৬-১৫৭০) জানিয়েছেন যে গৌড় একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। শিল্প ও বাণিজ্যের পাশাপাশি বাংলার কৃষি ছিল উন্নত, বিদেশীরা বাংলার উন্নত কৃষির কথা উল্লেখ করেছেন। ভোগ্যপণ্যের প্রাচুর্য ও সস্তা দামের কথা জানা যায়। তবে সমকালীন সাহিত্যে প্রাচুর্যের পাশাপাশি দারিদ্র্যের কথাও

উল্লেখ করা হয়েছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে নিম্নবর্গের মানুষের নিদারুণ দারিদ্র্যের কথা জানা যায় (ফুল্লরার বারমাস্যা)।

ভারত মহাসাগরে বাণিজ্য

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের ভারতের বহির্বাণিজ্যের একটি দিক হলো ভারত মহাসাগরে বাণিজ্য। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এই বাণিজ্য অব্যাহত গতিতে চলেছিল ও ভারতীয় বণিকদের প্রাধান্য বজায় ছিল। এই বাণিজ্যে গুজরাটি মুসলিম বণিকরা প্রাধান্য বিস্তার করেছিল, জাহাজের মালিকানা ছিল তাদের। ক্যাম্বে থেকে মালাক্কা এবং পশ্চিমে লোহিত সাগরের বন্দর এডেন, জেদ্দা এবং পারস্য উপসাগরীয় বন্দর হরমুজ ও মোখার সঙ্গে ভারতীয়দের বাণিজ্য চলত। আরব সাগরের পরিবহন বাণিজ্য ছিল আরব বণিকদের হাতে। চীন ও মালয়ের মধ্যে বাণিজ্য পরিচালনা করত চীনারা, ইন্দোনেশিয়ার সমুদ্রে জাভা ও মালয়ের লোকেরা বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রেখেছিল। ভারতের উপকূলের বণিকরা ছিল হিন্দু, উপকূল বাণিজ্য পরিচালনা করত মুসলমান বণিকরা। ইউরোপীয়রা এই ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যের অংশীদার হয়েছিল, কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। ভারতীয় বণিকদের বাণিজ্য, ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির কাজকর্ম ও বেসরকারি ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্যিক লেনদেন এই বাণিজ্যের আয়তন ও চরিত্র বোঝায় সহায়ক হয়। টম পাইরেসের (Tome Pires) *সুমা ওরিয়েন্টাল* মালক্কা বাণিজ্যের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছে। ষোড়শ শতকের গোড়ায় মালক্কা এশীয় বাণিজ্যের একটি বড় অন্তর্বর্তী ঘাঁটি হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল। এখানে ভারতীয়, চীনা ও ইন্দোনেশিয়ার বণিকরা বাণিজ্যিক লেনদেনের জন্য মিলিত হতো। বাংলা ও করমণ্ডলের হিন্দু বণিকরা এখানে তাদের পণ্য নিয়ে হাজির হতো। জাহাজের মালিক ছিল মুসলমান বণিকরা। আরব ও পারস্যের বণিকরা ক্যাম্বে থেকে জাহাজে উঠে মালক্কায় বাণিজ্য করতে আসত। লোহিত সাগর ও মালক্কার মধ্যে সরাসরি বাণিজ্য ছিল। গোয়ার পর্তুগিজ গভর্নর আলবুকুয়ার্ক লিখেছেন যে প্রতিবছর মালক্কা থেকে পঞ্চাশখানি জাহাজ পণ্য নিয়ে মক্কায় যেত। এতে অবশ্যই কিছুটা অতিরঞ্জন আছে। ভারত ও চীন থেকে বণিকরা এখানে মশলা কিনতে যেত, কিছু পণ্য বিক্রিও করত।

ভারতীয়রা মালক্কা থেকে কিনত লবঙ্গ, জায়ফল ও জৈত্রি, চীনের রেশম ও পোর্সিলিনের বাসনপত্র। ভারতীয় বস্ত্রের চাহিদা ছিল এই অঞ্চলে। চীনারা এখান থেকে প্রচুর গোলমরিচ কিনত, এর একটা অংশ ছিল অবশ্যই মালাবারে উৎপন্ন পণ্য। ভারতীয় পণ্য আফিম, গন্ধদ্রব্য, চন্দনকাঠ ও মূল্যবান পাথর চীনারা কিনত। সম্ভবত চীনারা মালয়ে মশলা কেনার জন্য ভারত থেকে বস্ত্র কিনে নিয়ে যেত।

ভারত মহাসাগরের বন্দর

সূত্র ঃ সতীশচন্দ্র, *মিডাইভ্যাল ইন্ডিয়া*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৫

চীনা মহানাবিক চেঙ হো (Cheng Ho) ভারত মহাসাগর হয়ে লোহিত সাগর ও আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে পৌঁছেছিলেন। কিন্তু ভারতীয় পণ্যবাহী জাহাজ চীন সাগরে যেত না। মিঙ্‌ শাসকরা বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ করে দেন, চীনা জাঙ্কগুলি মাঞ্চুদের আমলে (১৬৪৪-১৯১১) মালয় পর্যন্ত আসত। ভারত মহাসাগরে এদের দেখা পাওয়া যেত না। ভারতের জাহাজগুলি উত্তর সুমাত্রার পিডি, পাসে, প্রিয়ামন, টিকু, বারোস ও সিংকেলে বাণিজ্য উদ্দেশ্যে গিয়ে হাজির হতো। মশলা দ্বীপে ভারতের জাহাজ সরাসরি যেত না, তবে এখানকার মশলা এবং ভারতীয় বস্ত্রের বিনিময় চলত। ইন্দোনেশিয়ার বন্দর গ্রিসে এই বাণিজ্যে সহায়ক হতো। ভারতীয়রা ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসীদের সঙ্গে যৌথভাবে মশলা বাণিজ্য পরিচালনা করত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় বণিকদের উপস্থিতি ছিল বেশ জোরালো।

পশ্চিম দিকে ভারতীয় বণিকদের বাণিজ্য ছিল লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে। লোহিত সাগর হয়ে ভারতীয় পণ্য আলেকজান্দ্রিয়া ও কায়রোয় পৌঁছে যেত। আবার পারস্য উপসাগর হয়ে ভারতীয় পণ্য যেত বসরা ও বাগদাদে। ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে মিশরের মামলুকরা এই অঞ্চলের বাণিজ্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। মক্কাকে ঘিরে এই অঞ্চলে ভারতীয় পণ্যের বড় বাজার গড়ে উঠেছিল। আরব ও ইয়েমেনের শহর এবং লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী আফ্রিকার শহরগুলিতে ভারতের পণ্য পৌঁছে যেত। পঞ্চদশ শতকে মিশর ও পশ্চিম ভারতের মধ্যে বাণিজ্য পরিচালনা করত মিশরের 'করিম' নামে একটি বাণিজ্য সংস্থা। গুজরাটের বানিয়ারা লোহিত সাগরের তীরবর্তী বন্দরগুলির সঙ্গে বাণিজ্য চালাত। এস. ডি. গোটিন কায়রোর জেনিজা দলিল উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে ভারত মহাসাগরের বাণিজ্য ছিল বহুজাতিক। পঞ্চদশ শতকের শেষে করিমদের প্রাধান্য কমেছিল, হিন্দু বানিয়া, মুসলমান বণিক, ইহুদি, আর্মানি সকলে এই বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়। পারস্য উপসাগরে হরমুজ ছিল বড় বাণিজ্য ঘাঁটি, সঙ্গে ছিল ওমান ও বসরা। ভারতীয় বণিকরা এসব স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে ব্যবসা চালাত। পূর্ব বাণিজ্যে মালাক্কার যে ভূমিকা, পশ্চিমের বাণিজ্যে হরমুজের সেই ভূমিকা লক্ষ করা যায়। আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে ভারতীয়দের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়, এখানে কিলওয়া, মোম্বাসা, মালিন্দি ও পেত ছিল ভারতীয়দের পরিচিত বন্দর। ভারতীয় বণিকরা এখানে বিক্রির জন্য নিয়ে যেত বস্ত্র, নিয়ে আসত গজদন্ত ও সোনা। এই বাণিজ্য বিবরণ প্রমাণ করে যে আরবদের সঙ্গে ভারতীয়দের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

ভারতীয়রা যেমন আরব দেশে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করত তেমনি আরববা ভারত মহাসাগরে নির্বিঘ্নে ব্যবসা করতে পারত। পঞ্চদশ শতকে পশ্চিম ভারতের বৃহত্তম বন্দর ক্যাম্বের অবক্ষয় শুরু হয়েছিল। ক্যাম্বের উত্তরাধিকারী বন্দর হলো সুরাট ও

দিউ। এই দুটি বন্দর লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্য পরিচালনা করত। আহম্মদনগর, বিজাপুর ও বিজয়নগরের উদীয়মান বন্দরগুলি হলো চাউল, দাভোল, গোয়া ও ভাতকল। মালাবারে ছিল কালিকট বন্দর, এখানে করিম বণিকরা এসে মিলিত হতো। এডেন ও মালাবারের মধ্যে আরব জাহাজের নিয়মিত যাতায়াত ছিল। দক্ষিণ করমণ্ডলে বড় বন্দর হলো পুলিকট ও নেগাপত্তম। পুলিকট ও ভাতকল হলো বিজয়নগরের পূর্ব ও পশ্চিমের বন্দর। উত্তর করমণ্ডলে উদীয়মান বন্দর হলো মসুলিপত্তম। পঞ্চদশ শতকের শেষে বাংলার বড় বন্দর হলো সাতগাঁ, চট্টগ্রাম ও শ্রীপুর, এইসময় সাতগাঁ অবক্ষয়ের মুখে পড়েছিল। সিন্ধুদেশে লাহোরি বন্দর ছিল বাণিজ্যের বড় ঘাঁটি। এসব বড় বন্দরের সহায়ক অনেক বন্দর ছিল, এরা আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের চলাচলে সহায়ক হতো। ভারতের রপ্তানি পণ্যের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো তার সুতিবস্ত্র। শুধু সূক্ষ্ম বস্ত্র নয়, বহু ধরনের মোটা বস্ত্র বিদেশের বাজারে পাঠানো হতো। ইন্দোনেশিয়া, মালয় ও আরব দেশগুলিতে সাধারণ মানুষ ভারতের মোটা বস্ত্র কিনত, মিহি বস্ত্র বেশি বিক্রি হতো না। ডাচ বণিকরা সূক্ষ্ম বস্ত্র কিনে গুজরাতি বণিকদের সঙ্গে বস্ত্র বাণিজ্যে পেরে উঠত না। শুধু বস্ত্র নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নতমানের দামি পণ্যের চাহিদা বেশি ছিল না, সাধারণ মানের পণ্যের চাহিদা বেশি ছিল। তবে এসব অঞ্চলের বাজারে বাংলা ও করমণ্ডলের দামি বস্ত্র বিক্রি হতো কারণ অভিজাতদের মধ্যে এর চাহিদা ছিল।

ভারত থেকে রপ্তানি করা হতো চাল, ডাল, গম ও তেল। বাংলা, ওড়িশা ও কর্ণাটক ছিল খাদ্যে উদ্বৃত্ত অঞ্চল। উপকূলের ঘাটতি অঞ্চল মালাবার ও সুরাটে খাদ্যশস্য পাঠানো হতো, বেশিরভাগ যেত মালাক্কা, হরমুজ ও এডেনে। খাদ্যশস্যের বাণিজ্যে লাভ তেমন বেশি হতো না কারণ পরিবহন ব্যয় বেশি পড়ত। তবে খাদ্যাভাব থাকলে স্বাভাবিক লাভের হার পাওয়া যেত। নারিকেল থেকে উৎপন্ন পণ্য, আদা, হলুদের মতো পণ্যও রপ্তানি তালিকায় স্থান পেত। বাংলা থেকে রপ্তানি হতো চিনি, কাঁচা রেশম, গুজরাট রপ্তানি করত কাঁচা তুলো, মালাবার রপ্তানি করত তার মশলা। গুজরাট বাংলায় তুলো পাঠাত এবং বাংলা থেকে গুজরাট নিত কাঁচা রেশম। বাংলা, করমণ্ডল ও গুজরাট নীল রপ্তানি করত। অন্যান্য ছোটখাটো পণ্য-তালিকায় ছিল বাংলার মোম ও লাক্ষা এবং করমণ্ডলের চামড়া। এসব পণ্য পরিবহনে এদেশী ও বিদেশী জাহাজ ব্যবহার করা হতো। ভারত বিদেশ থেকে আমদানি করত সোনা, রুপো, মালয়ের টিন, পূর্ব আফ্রিকার গজদন্ত এবং পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের রঙ। এসবের সঙ্গে ছিল কিছু ছোটখাটো পণ্য যেমন, মদ, গোলাপজল, ফল ও ওষুধ। মুঘল সাম্রাজ্য পারস্য উপসাগরীয় বন্দর মোখা থেকে সোনা ও রুপো

আমদানি করত। মোখাকে বলা হয়েছে 'মুঘলদের রত্নভাণ্ডার' (Treasure chest of the Mughals)। মুঘলদের মুদ্রাব্যবস্থা এই সরবরাহের ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত হতো না, অনেক সময় ভারতকে সোনা-রুপো দিয়ে বাণিজ্য ঘাটতি মেটাতে হতো। ইউরোপীয়রা ভারতে যে সোনা-রুপো নিয়ে আসত তা যথেষ্ট ছিল না। ইউরোপীয়রা জাপান থেকে অল্প পরিমাণে তামা আমদানি করত।

ভারত মহাসাগরের বাণিজ্য প্রধানত ভারতীয় বণিকদের নিয়ন্ত্রণে ছিল, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে ইউরোপীয়রা এই বাণিজ্যে ভাগ বসিয়েছিল। ভারতীয়দের সাফল্যের একটি বড় কারণ হলো ভারতীয় জাহাজের, ইউরোপীয় জাহাজের সঙ্গে তুলনায়, মাশুল ছিল অনেক কম। ইউরোপীয় জাহাজ প্রায় দু'গুণ ভাড়া দাবি করত। ভারতের জাহাজ মালিকরা তাদের সম্প্রদায়ের লোকদের নাবিক হিসেবে নিযুক্ত করত, এতে জাহাজ পরিচালনায় সুবিধা হতো, ব্যয় কম হতো। ভারতীয় বণিকরা বিভিন্ন পণ্যবাহী জাহাজে তাদের পণ্য বণ্টন করে দিত, এতে ঝুঁকি কম থাকত। একথা সত্যি যে ইউরোপীয় জাহাজগুলি অনেক বেশি মজবুত হতো, পাহারার ব্যবস্থাও যথেষ্ট ভালো ছিল, এজন্য তারা বেশি পণ্য বহন করতে পারত। তবে এই পর্বে ভারতীয় জাহাজ বাতিল হয়নি। ভারতীয়রা জাহাজ পরিবহনে বেশি অর্থ বিনিয়োগে আগ্রহ দেখাত না, জাহাজগুলি ছিল ব্যক্তিগত মালিকানায়, যৌথ মালিকানা প্রায় ছিল না বললেই চলে। জাহাজে অর্থ লগ্নি করে বেশি লাভ হতো না, বাণিজ্যিক মূলধন জমা পড়ে যেত। এই অর্থ বাণিজ্যে লগ্নি করলে কমপক্ষে ২০ শতাংশ বেশি লাভ হতো। জাহাজ বীমা করার প্রথা গড়ে ওঠেনি, পণ্য বীমার প্রথা ছিল। ভারতীয়রা জাহাজে লগ্নি করতে অনিচ্ছুক ছিল, ব্যতিক্রম হলো সুরাটের মুল্লা পরিবার। সাধারণত ভারতীয় বণিকদের একখানি বা দুখানি জাহাজ থাকত।

ভারতের বন্দরগুলির পশ্চাদভূমি হলো গুজরাট, বাংলা, বিজয়নগর ও বাহমনি রাজ্য। ইসলাম ভারতের উপকূল অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করেছিল, বাণিজ্যের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে বহু মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। গুজরাট থেকে বাংলা পর্যন্ত এই ধারা প্রবহমান ছিল। ভারতের জাহাজ মালিক ও নাবিকরা ছিল মুসলমান। হিন্দু বণিকদের জাহাজ ছিল না তা নয়, সাধারণত বন্দর থেকে তারা বাণিজ্য পরিচালনা করত। নিজেদের দু-একখানি জাহাজও ছিল। ভারতের বণিকদের তিনভাগে ভাগ করা যায়—ধনী বণিক, যিনি নিজেই পণ্য নিয়ে বিদেশে বাণিজ্য করতে যেতেন। ধনী বণিকদের প্রতিনিধিরা বিদেশে গিয়ে বাণিজ্য করতেন এবং তৃতীয় স্তরে ছিল অসংখ্য ছোট ও মাঝারি বণিক যারা বিদেশে তাদের পণ্য নিয়ে যেত। ভারতের নাখুদারা ছিল প্রথম দুই শ্রেণীর প্রতিনিধি। ভ্যান লিউর তৃতীয় শ্রেণীর বণিকদের কথা

বলেছেন। পণ্যবাহী জাহাজের নাবিকরাও কিছু বাণিজ্য করতেন। ভারতের বণিকদের বেশিরভাগ ছিল ক্ষুদ্র ও মাঝারি, তবে বন্দরে ধনী বণিকদের দেখা পাওয়া যেত। আবদুল গফুরের মতো অতি ধনী বণিক বাণিজ্যে একচেটিয়া আধিপত্য স্থাপন করতে পারেননি। তার লোহিত সাগরের বাণিজ্যে অনেক ছোটখাটো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, বণিকদের স্বাধীনতা বজায় ছিল। বণিক ও উৎপাদকদের মধ্যে যে চুক্তি হতো তা অনেকসময় পালিত হতো না। বেশি দাম পেলে উৎপাদক অনায়াসে চুক্তি ভঙ্গ করতে পারত, তবে তাকে অগ্রিমের টাকা ফেরত দিতে হতো। অষ্টাদশ শতকে ইংরেজরা ভারতের শিল্প-বাণিজ্যে নতুন চুক্তির ধারণা নিয়ে এসেছিল।

ভারতের বাণিজ্যের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো তার আয়তন ও সীমা নির্ধারণ করেছিল। সহযোগিতা ও সমঝোতা ছিল বাণিজ্য জগতের মূলনীতি। ভারত মহাসাগরের সঙ্গে যুক্ত বণিকদের অনেকে বন্দরের বণিক ও দালালদের মাধ্যমে পণ্য সংগ্রহ করত। এ ব্যাপারে আরব, ইরানি, ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। বণিক ও দালালরা রপ্তানি পণ্য সংগ্রহ করে দিত, আমদানি পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা করত। স্রফরা সোনা ও রুপো মুদ্রণের ব্যবস্থা করত, বিভিন্ন টাকার বিনিময় করত। ভারতীয় বন্দরগুলির পশ্চাদভূমি ছিল অনেক বড়, সুরাট ও হুগলীর পশ্চাদভূমি ছিল সমগ্র উত্তর ও পশ্চিম ভারত। ভারত মহাসাগরের বাণিজ্যের সঙ্গে বহুশ্রেণীর মানুষ যুক্ত ছিল। স্রফ, মহাজন, পণ্য সরবরাহকারী বণিক ও দালালরা বাণিজ্যের সংগঠনে নানাভাবে সাহায্য করত। ইউরোপীয় বণিকরা সাধারণত উৎপাদনস্থানে গিয়ে পণ্য কিনে লাভের অঙ্ক বাড়ানোর চেষ্টা করত। বিদেশীরা উৎপাদকদের কাছ থেকে সরাসরি পণ্য কিনতে গিয়ে অনেক সময় প্রবঞ্চনার শিকার হতো। ওলন্দাজ বণিক ম্যাথিয়াস ভ্যান হেকের এরকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল। শুধু মূলধন থাকলে ভারত মহাসাগরে বাণিজ্য করা যেত না, স্থানীয় সাহায্যের প্রয়োজন হতো। অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্ত লিখেছেন যে, কোনো বণিক এই বাণিজ্য কাঠামো নিয়ন্ত্রণ করতেন না। উৎপাদন ও সরবরাহের ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপিত হয়নি।[৪] সরকার বণিকদের ব্যাপারে সচরাচর হস্তক্ষেপ করত না, বন্দরগুলিতে শান্তি ছিল, সরকার রাজস্ব নিয়ে সন্তুষ্ট থাকত। কালিকট ও গুজরাটের শাসকরা রাজস্ব নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন। গোলকুণ্ডা, বিজয়নগর, মোগল সাম্রাজ্য কেউই সমুদ্র বাণিজ্য নিয়ে মাথা ঘামাত না। তাদের স্থানীয় শাসকরা বন্দরগুলি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিত। ভারতীয় শাসকদের একটি বড় দুর্বলতা হলো তাদের নৌবহর ছিল না, ভারত মহাসাগরে বাণিজ্যপোত রক্ষার শক্তি তাদের ছিল না।

৪. অশীন দাশগুপ্ত, *কেম্ব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬১।

প্রাদেশিক শাসকরা বাণিজ্যে অংশ নিয়ে তাদের সম্পদ বাড়াতেন। গোলকুণ্ডায় মীরজুমলা এবং বাংলায় শাহজাদা আজম এধরনের বাণিজ্য থেকে অর্থ রোজগার করেন। অনেক মোগল অভিজাত বাণিজ্যে অর্থলগ্নি করতেন, নিজেরা বাণিজ্য করতেন না। কেরালার ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের রাজা মার্তণ্ড বর্মা বাণিজ্যে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। এটা হলো অষ্টাদশ শতকের ঘটনা। ভারতের বণিক সমাজ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেনি, আবার রাষ্ট্রশক্তির ভয়ে তারা ভীত ও সন্ত্রস্ত ছিল একথাও ঠিক নয়। সমুদ্র বাণিজ্যে বণিকরা লাভবান হয়ে অর্থ সঞ্চয় করেছিল। পারিবারিক বিরোধ ও বাণিজ্যিক বিপর্যয়ের কারণে অনেক সময় তাদের সম্পদ নষ্ট হয়ে যেত। মোগল রাজপুরুষরা বলপ্রয়োগে বণিকদের সম্পত্তি কেড়ে নিত একথা ঠিক নয়। মুসলিম বণিকরা বিলাস-ব্যসনে থাকতেন, হিন্দু বণিকরা সহজ, সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিল। পণ্ডিচেরির আনন্দ রঙ্গপিল্লাই লিখেছেন যে 'হিন্দু বণিক দেবতার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করে কারণ তার ব্যয় করার মতো অনেক অর্থ আছে'। বিদেশ থেকে যে অর্থ ভারতে আসত শিল্প-বাণিজ্যে তা লগ্নি হতো। দেশ থেকে মূল্যবান ধাতুর বিদেশ গমন বণিকরা ভালো চোখে দেখত না। দেশের উৎপাদন এবং বিদেশের বাজারের ওপর পণ্যের দাম নির্ভর করত। খাদ্যমূল্য অন্যান্য পণ্যের মূল্য নির্ধারণে একটি বিশেষ উপাদান হিসেবে কাজ করত। তুলো, নীল ও রেশমের দাম বিদেশের বাজারের ওপর নির্ভরশীল ছিল। এই বিদেশী বাজার ছিল ক্ষুদ্রায়ত, অস্থির ও অনিশ্চিত (small, unstable and umpredictable)। মহাসাগরের বাজারের অনিশ্চয়তা বাড়িয়ে দিত রাজনৈতিক অস্থিরতা ও পরিবহনের অভাব। নীলস স্টীনসগার্ড এই অস্থির, ওঠা-নামা বাজারের কথা উল্লেখ করেছেন।

ভারত মহাসাগরের বাণিজ্যে অবশ্যই ওঠা-নামা ছিল। হজের সময় পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল এবং লোহিত সাগরে পণ্যের চাহিদা বেশি থাকত। রাজনৈতিক অশান্তি শুরু হলে ভারতীয় পণ্যের চাহিদা কমে যেত। জাহাজ এলে স্থানীয় পণ্যের দাম বেড়ে যেত, জাহাজ বন্দর ত্যাগ করলে রপ্তানি পণ্যের দাম নেমে যেত। ভারতীয় বণিকদের ব্যবসা ছিল প্রধানত পারিবারিক, দু-একটি ক্ষেত্রে অংশীদার নিয়ে ব্যবসা করা হতো। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যৌথ বাণিজ্য উদ্যোগ ছিল না। ভারতে জয়েন্ট স্টক কোম্পানির ধারণা জনপ্রিয় হয়নি যদিও ইংরেজ ও ডাচরা দক্ষিণ করমণ্ডলে তা প্রবর্তনের প্রয়াস চালিয়েছিল। বাংলাতে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। পারস্যে সাফাবি সাম্রাজ্য, ভারত মহাসাগরে পর্তুগিজ আধিপত্য এবং চীনে মাঞ্চু রাজবংশের প্রতিষ্ঠা ভারত মহাসাগরের বাণিজ্য কাঠামোয় বড় রকমের পরিবর্তন ঘটায়নি। তুর্কিরা এডেন দখল করে লোহিত সাগরের ওপর আধিপত্য স্থাপন করেছিল, বসরা তুর্কিদের অধিকারে এসেছিল। গুজরাট ও বাংলায় মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ভারত মহাসাগরের বাণিজ্যের

পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। মোগলরা স্থলপথে পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিল। ইয়েমেন কফি বাণিজ্যের বড় ঘাঁটি হয়ে উঠেছিল। ষোড়শ শতকের শেষে লোহিত সাগর হয়ে উঠেছিল ভারতীয় বাণিজ্যের এক বড় ঘাঁটি। পর্তুগিজরা মালাক্কা অধিকার করলে ভারতীয় বণিকরা পশ্চিমের বাণিজ্যে বেশি আগ্রহ দেখিয়েছিল। দুয়ার্তে বারবোসা পশ্চিম উপকূলের বাণিজ্যে মুসলিম বণিকদের প্রাধান্য হ্রাসের কথা উল্লেখ করেছেন। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে চীনের সঙ্গে আবার বাণিজ্য শুরু হয়েছিল। ভারতের মুসলমান বণিকরা পর্তুগিজদের আধিপত্য একেবারেই পছন্দ করেনি। মালাক্কা রক্ষার চেষ্টা করে এরা ব্যর্থ হয়েছিল। অচিন ও বান্টাম থেকে তারা এই অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্য চালাত। হিন্দু বণিকরা পর্তুগিজদের সঙ্গে সহযোগিতা করে বাণিজ্য সচল রেখেছিল। গুজরাতি বণিকরা অচিনের সঙ্গেও বাণিজ্য গড়ে তুলেছিল। এখানকার পণ্য তারা লোহিত সাগর অঞ্চলে নিয়ে যেত। পর্তুগিজরা রাজস্বের কারণে ভারতীয়দের সঙ্গে কঠোর আচরণ করত না, মুসলিম বিরোধী মনোভাব থেকেও পর্তুগিজরা সরে এসেছিল। ব্যক্তিগত বাণিজ্যের জন্য পর্তুগিজরা ভারতীয় বণিকদের প্রতি বিরোধিতার মনোভাব ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। গোয়া ও দিউতে বহু হিন্দু বণিক পর্তুগিজদের সঙ্গে যৌথ বাণিজ্য উদ্যোগ শুরু করেছিল, ভারতীয় বণিকরা তাদের বাণিজ্য মূলধন সরবরাহ করত।

ভারত মহাসাগরে পর্তুগিজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজদের বাণিজ্যের পরিমাণ তেমন বেশি ছিল না। মোরল্যান্ড এরকমের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কোনো কোনো পণ্যে হয়তো তাদের আধিপত্য ছিল কিন্তু সামগ্রিকভাবে মহাসাগরের বাণিজ্যে এদের আধিপত্য ছিল না। ভারতের বাণিজ্যের বেশিরভাগ ছিল ভারত মহাসাগরে এবং তাতে প্রাধান্য ছিল ভারতীয়দের। এর একটি কারণ হলো ভারতীয়দের বাণিজ্য ব্যয় হতো কম, ইউরোপীয়দের বেশি হতো। ভারতীয়রা বাজারের খুঁটিনাটির খোঁজ রাখত, ইউরোপীয়দের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। এদেশীয় রাজকর্মচারীদের সঙ্গে ভারতীয়দের ঘনিষ্ঠতা ছিল, রাজপুরুষরা বিদেশীদের চেয়ে এদের বেশি পছন্দ করত। পর্তুগিজদের শক্তির বাণিজ্য তেমন ফলপ্রসূ হয়নি। মোগলরা ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে হুগলী থেকে তাদের বিতাড়িত করেছিল। পর্তুগিজদের অধীনে মালাক্কা ও হরমুজের অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল। পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে পর্তুগিজরা বিতাড়িত হয়েছিল। ইয়েমেনের ইয়ারোবি নৌবহর পশ্চিম ভারতের বাণিজ্য পোতগুলি আক্রমণ করেছিল। ওলন্দাজ ও ইংরেজদের আগমনের ফলে পর্তুগিজ প্রভাবের অবসান ঘটে, মহাসাগরের বাণিজ্যের মুক্তি ঘটে। জিনিসপত্রের দাম বেড়েছিল। ওলন্দাজরা মশলা দ্বীপে আধিপত্য স্থাপন করেছিল। ভারতীয় বণিকরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যাতায়াত বন্ধ করেছিল। তারা পশ্চিমে লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরের বাণিজ্যে মনোনিবেশ করেছিল। পশ্চিম

এশিয়ায় ভারতীয় বণিকরা প্রচুর পরিমাণে বস্ত্র রপ্তানি করত। সপ্তদশ শতকের শেষে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও চীনে ভারতীয়রা যাতায়াত শুরু করেছিল। ম্যানিলাতে ভারতীয় পণ্যবাহী জাহাজ গিয়ে হাজির হয়। সপ্তদশ শতকে পূর্ব ভারতে মসুলিপত্তম হলো সবচেয়ে বড় বন্দর। শিয়া বণিকরা মসুলিপত্তম ও হুগলীকে আশ্রয় করেছিল, পূর্ব ভারতে পুলিকট, নেগাপত্তম, পোর্টোনোভো ও বালাশোর ছিল অন্যান্য ব্যস্ত বন্দর। পেগু, আরাকান, তেনাসেরিম ও অচিনের সঙ্গে বাণিজ্য চলেছিল।

সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে ভারত মহাসাগরের বাণিজ্য জোরালো ছিল, বস্ত্র বাণিজ্য তেজি ছিল (golden period of Indian maritime trade)। মোগলদের পতন, পারস্যের অবক্ষয় ও ইয়েমেনের গৃহযুদ্ধ—এই বাণিজ্যের ক্ষতি করেছিল। বাংলা ও গুজরাটের বাণিজ্যের অবনতি ঘটে, গুজরাতি বণিকদের পণ্য গুদামে মজুত হয়ে পড়েছিল। তবে লোহিত সাগরের সঙ্গে বাণিজ্য চলেছিল। গুজরাটের অবক্ষয় দেখা দেয়, ১৭০১ খ্রিস্টাব্দে গুজরাটে জাহাজের সংখ্যা ছিল ১১২, ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে এই সংখ্যা হলো মাত্র ২০। ইংরেজরা বাণিজ্য বাড়িয়ে চলেছিল, চীনের সঙ্গে বাণিজ্য চলেছিল। মাদ্রাজ পূর্ব উপকূলের বন্দর হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, মসুলিপত্তমের আগের গৌরব আর ছিল না। ম্যানিলার সঙ্গে আর্মানি নামের আড়ালে ইংরেজদের বাণিজ্য শুরু হয়েছিল। কলকাতা বন্দর উন্নতির পথ ধরেছিল।

চতুর্দশ অধ্যায়

সুলতানি রাষ্ট্রের চরিত্র

একটি দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থার চরিত্র নির্ভর করে সেই দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর। রাষ্ট্রের গঠনে ঐতিহ্য, চিন্তাভাবনা, সামাজিক কাঠামো (শাসকগোষ্ঠী ও সাধারণ মানুষ), উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্কের প্রভাব থাকে। প্রাচীন ভারতের অর্থশাস্ত্রে, মহাভারতে ও ধর্মশাস্ত্রে রাজনীতির কথা আছে। রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও চরিত্র নিয়ে আলোচনা আছে। মুসলমান চিন্তাবিদ আবু ইউসুফ ইয়াকুবি, আল ফারাবি, আল মাবারদি ও আলগজ্জালি রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও চরিত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন। আব্বাসীয় খলিফাতন্ত্রের পতন হলে স্বাধীন রাজ্যসমূহের উত্থান ঘটে। মুসলিম রাষ্ট্রনীতির গোড়ার দিকে ধারণা ছিল খলিফা হলেন রাষ্ট্র ও ধর্মের প্রধান। স্বাধীন রাজ্য গড়ে উঠলে তাকেও স্বীকার করে নেওয়া হয়, তবে খলিফার প্রতি আনুগত্যের ওপর জোর দেওয়া হয়। মুসলিম জাহানের ঐক্যের ধারণা রয়ে যায়, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সুলতানরা স্বাধীনভাবে চলতে থাকেন। তবে সুলতানদের ইসলামী আইনবিধি 'শরিয়া' মেনে চলতে হতো। তুর্কিরা ইসলামী রাষ্ট্রচিন্তার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন তবে তাঁরা উপজাতি ঐতিহ্য পুরোপুরি বিসর্জন দিতে পারেননি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তারা বাস্তবকে মেনে চলতেন, ইসলামী আইনবিধি মেনে চলার চেষ্টা করতেন।

মৈজুদ্দিন মহম্মদ ঘুরির ক্রীতদাস কুতুবুদ্দিন আইবক দিল্লি সুলতানির প্রতিষ্ঠা করেন (১২০৬)। কিন্তু আইবকের ওপর গজনির কর্তৃত্বের অবসান হয়নি। ইলতুৎমিস গজনির কর্তৃত্বের দাবি অস্বীকার করেন। তিনি বাগদাদের খলিফার কাছ থেকে ১২২৯ খ্রিস্টাব্দে অনুমোদন (মনশুর) আনিয়েছিলেন। এই সময় থেকে দিল্লির সুলতানরা মুদ্রায় খলিফার নাম উৎকীর্ণ করেন, শুক্রবারের প্রার্থনার সময় খলিফার নাম খুৎবায় উচ্চারিত হতো। দিল্লির সুলতানরা নিজেদের খলিফার সহকারী (নাসির-আমিরুল-মোমিনিন) বলে পরিচয় দিতেন। এজন্য অনেকে যুক্তি দেখিয়ে থাকেন যে সুলতানরা খলিফার অধীনস্থ ছিলেন, স্বাধীন ছিলেন না। জার্মানির পবিত্র রোমান সম্রাটের মতো খলিফার বিশেষ কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ ছিল না। সমকালীন মানুষ খলিফার অনুমোদনকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি, দিল্লির সুলতানদের স্বাধীন অস্তিত্বকে কেউ কখনো প্রশ্ন করেনি। আলাউদ্দিনের উত্তরাধিকারী মুবারক শাহ্ খলিফার প্রতি আনুগত্য অস্বীকার করে নিজেকেই খলিফা বলে ঘোষণা করেন। এতেও কেউ আপত্তি

করেনি। খলিফার অনুমোদনের কোনো আইনগত ভিত্তি ছিল না, ছিল শুধু নৈতিক ভিত্তি। এই খলিফার কর্তৃত্বের ধারণাটি ছিল অনেকটা কাল্পনিক (fictional), ইসলামী ঐক্যের ধারণা নানা কারণে ভেঙে পড়েছিল। বহু ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল, তুর্কিরা স্বাধীন রাজপাট স্থাপন করেছিল এবং মোঙ্গল আক্রমণ খলিফাতন্ত্রের পতন ঘটিয়েছিল।

মহম্মদ বিন তুঘলক বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থানে বিপর্যস্ত হয়ে কায়রোয় বসবাসকারী এক আব্বাসীয় বংশের খলিফার কাছ থেকে অনুমোদন আনিয়েছিলেন (investiture)। মোঙ্গল নেতা হালাকুর আক্রমণে বাগদাদের খলিফা নিহত হন (১২৫৯)। মহম্মদ বিন তুঘলক মুদ্রা থেকে নিজের নাম সরিয়ে নিয়ে খলিফার নাম উৎকীর্ণ করেন। এইসব ব্যবস্থা বিদ্রোহীদের মনোবল ভেঙে দিতে পারেনি। ফিরুজ তুঘলক ছিলেন একজন ধর্মভীরু শাসক, তিনি খলিফার কাছ থেকে দুবার অনুমোদন আনিয়েছিলেন। তিনি গোঁড়া উলেমাদের সমর্থন নিয়ে সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। মনে রাখা দরকার যে এই সময় সারা পৃথিবীতে আব্বাসীয় খলিফাদের মর্যাদা ক্রমশ কমতে থাকে। তৈমুর নিজেকে ইমাম (খলিফা) বলে ঘোষণা করেন, ভারতের মুঘল শাসকরা তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন। সুলতানি যুগের ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থায় খলিফাতন্ত্রের প্রাসঙ্গিকতা প্রায় ছিল না বললেই চলে। তুর্কিরা উত্তর ভারতে একটি নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করেছিল। সুলতান রাজধানীতে অনুগত সৈন্যবাহিনী নিয়ে থাকতেন, প্রদেশগুলিতে অভিজাতরা নতুন অঞ্চল জয় করে তুর্কি রাষ্ট্রের আয়তন বাড়াত। গোড়ার দিকে তুর্কি রাজ্য ছিল শিথিল বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা, বলবন এই বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপ দেন। কয়েকটি ব্যতিক্রমী ঘটনা বাদে চতুর্দশ শতকের শেষ অবধি দিল্লির সুলতানি রাষ্ট্র ছিল কেন্দ্রীভূত স্বৈরাচার। তুঘলকদের পতনের পর লোদিদের শাসনকালে আফগান ঐতিহ্য অনুযায়ী বিকেন্দ্রীভূত শাসন স্থাপনের চেষ্টা হয়েছিল। আফগান উপজাতি সর্দাররা ক্ষমতার অংশীদার হন, এই বিকেন্দ্রীভূত শাসন লোদিদের পতনের জন্য অনেকখানি দায়ী ছিল। শেরশাহ্ শূর আফগান ঐতিহ্য অনুসরণ করেননি, তিনি কেন্দ্রীভূত স্বৈরাচারী রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলেন।

সুলতানি রাজত্বের শুরু থেকে সুলতান ও অভিজাততন্ত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। এই সংঘাতের উত্থানপতন ছিল, বলবনের সময় থেকে সুলতান অভিজাততন্ত্রের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তুর্কি অভিজাতরা একটি ঐক্যবদ্ধ গোষ্ঠী হিসেবে কাজ করত না,, সুলতানকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো কোনো সংগঠন তারা গড়ে তুলতে পারেনি। সুলতানি রাষ্ট্রের চরিত্র সব সময় এক ছিল না, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে এর চরিত্রের পরিবর্তন হয়। ত্রয়োদশ শতকে এর রূপটি হলো বিদেশী তুর্কিরা নতুন দেশ জয় করে

তাকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। তুর্কি শাসকগোষ্ঠী এই দেশকে জানতো না, বুঝতো না, তাদের শহরের বাসস্থান বা দুর্গ থেকে তারা অধিকৃত অঞ্চলের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতো। সুলতানির গোড়ার দিকে সুফি দরবেশরা শাসক ও শাসিতের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছিল। ত্রয়োদশ শতকে দিল্লি সুলতানির ওপর তুর্কিদের আধিপত্য ছিল। খল্‌জিরা ছিলেন, কিন্তু তাদের তুর্কি মনে করা হতো না, তারা প্রদেশে গিয়ে নিজেদের অধীনস্থ অঞ্চল গঠনের কাজে মন দিয়েছিল। ইলতুৎমিসের সময় থেকে শাসনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অতুর্কি তাজিকরা। এরা ছিল পারস্য, আরব, ইয়েমেন প্রভৃতি অঞ্চলের লোক। এরা সাধারণত ধর্মীয় বিভাগ 'সদরের' সঙ্গে যুক্ত হতো। অতুর্কি তাজিকরা ফার্সি ভাষায় কথা বলতো এবং তুর্কিদের রুক্ষতার পাশে তারা ছিল পরিশীলিত সংস্কৃতিবান মানুষ। এজন্য তাদের কেন্দ্রীয় সরকারের নানাকাজে নিযুক্ত করা হতো। ইলতুৎমিসের উজির নিজামুল মুলক জুনাইদি ছিলেন একজন তাজিক। তুর্কিরা তাজিকদের পছন্দ করত না, ইলতুৎমিসের মৃত্যুর পর এদের অনেককে হত্যা করা হয়। রাজিয়া একজন আবিসিনিয়ার ক্রীতদাসকে উচ্চপদে নিয়োগ করলে তুর্কিরা অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল। তুর্কিরা সর্বদা সুলতানের ওপর নিজেদের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস চালিয়েছিল।

বলবনের শাসনব্যবস্থায় বহু স্ববিরোধিতা ছিল। তিনি ইলতুৎমিসের চল্লিশাকে (চিহলগনি) ধ্বংস করেন, কিন্তু নিম্নবর্গের মানুষকে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তুর্কিদের আধিপত্য বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিলেন, আবার নিজের বংশগরিমা প্রচারের জন্য পারস্যের বীর আফ্রাসিয়াবের বংশধর বলে নিজের পরিচয় দেন। পারস্যের রাজসভার আদব-কায়দা প্রবর্তন করেন, ইরানী ও তুরানী ঐতিহ্যকে তিনি মেলানোর চেষ্টা করেন। যদিও ক্রীতদাসরা সুলতানি রাষ্ট্রে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল এই রাজতন্ত্রকে দাসরাষ্ট্র বলা ঠিক নয়। অভিজাতদের অনেকে সুলতান বা অভিজাতের দাস হিসেবে জীবন শুরু করেছিলেন। উচ্চপদে নিযুক্ত হবার আগে তাঁরা প্রভুর কাছ থেকে মুক্তি পান। ইলতুৎমিস সিংহাসনে বসার পর উলেমাদের তাঁর মুক্তিপত্র দেখিয়েছিলেন। ইসলামী শাস্ত্র অনুযায়ী একজন স্বাধীন ব্যক্তি শুধু শাসক হতে পারেন। বলবনের প্রয়াস সত্ত্বেও রাষ্ট্রের ওপর তুর্কি আধিপত্য ক্রমশ কমতে থাকে। জীবনের শেষদিকে তিনি মোঙ্গলদের কয়েকজনকে অভিজাততন্ত্রে স্থান করে দেন, মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তিনি খল্‌জি অভিজাত জালালুদ্দিনকে নিয়োগ করেন। বাংলায় বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থতার জন্য তিনি তুর্কি অভিজাতদের পদচ্যুত করেন। পূর্ব উত্তরপ্রদেশের হিন্দু প্রধান ও স্থানীয় সৈন্যদের নিয়ে তিনি বাংলার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। খল্‌জি রাষ্ট্র তুর্কিদের আধিপত্যের অবসান ঘটিয়েছিল। তাঁরা তুর্কিদের সরিয়ে দেননি, তবে অন্যান্যদের উচ্চপদে ওঠার ব্যবস্থা

করে দেন। আলাউদ্দিনের উজির নসরত খান, যুদ্ধমন্ত্রী জাফর খান এবং সেনাপতি মালিক কাফুর সকলে অতুর্কি ছিলেন। আলাউদ্দিন ভারতীয় মুসলমান এবং অতুর্কিদের অভিজাততন্ত্রে স্থান দেন। ঠিক একারণে খসরু খানের নেতৃত্বে বরদুদের উত্থান সম্ভব হয়েছিল।

বলা হয় যে খল্‌জিদের সময় থেকে ভারতে একটি সমন্বিত মুসলিম রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল, এই রাষ্ট্রব্যবস্থায় সবশ্রেণীর মুসলমান স্থান পেয়েছিল। যোগ্যতা ও দক্ষতা ছিল মাপকাঠি, বংশগরিমার স্থান ছিল না। সুলতানি শাসকরা রক্তের গরিমায় বিশ্বাসী ছিলেন, উচ্চবংশজাত ব্যক্তি সরকারি ও ধর্মীয় ব্যবস্থায় প্রাধান্য পেত। ইলতুৎমিসের রাজত্বকালে রাষ্ট্রতত্ত্বের চিন্তাবিদ ফকর-ই-মুদাব্বির লিখেছিলেন যে রাজস্ব বিভাগের চাকরি শুধু শিক্ষিত ও ঐতিহ্যপূর্ণ পরিবারের লোকদের দেওয়া উচিত। বারানি *ফতোয়া-ই-জাহান্দারিতে* লিখেছেন যে প্রত্যেক মানুষ একটি নির্দিষ্ট গুণ নিয়ে জন্মায়। নিম্নবর্গের মানুষের বহুগুণ থাকলেও শাসনকার্যে নিযুক্ত করা উচিত নয়। অভিজাততন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে বারানির লেখায়। রাষ্ট্র এইসব চিন্তাভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, রাজকার্য ছিল মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ও পরিবারের একচেটিয়া। মহম্মদ বিন তুঘলক এই প্রথা ভেঙে নিম্নবর্গের হিন্দু ও মুসলমানকে রাজপদে নিয়োগ করে অভিজাতদের বিরাগভাজন হন। ফিরুজ তুঘলক পুরনো অভিজাততান্ত্রিক ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনেন, নিম্নবর্গের মানুষকে আর উচ্চপদে দেখা যেত না। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সমন্বিত রাষ্ট্রের কল্পনা করা বৃথা চেষ্টা। যেসব নিম্নবর্গের হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন তাদের অবস্থার উন্নতি হয়নি। একজন ধর্মান্তরিত ব্রাহ্মণ খানজাহান মকবুল উজির হয়েছেন, আর একজন প্রাদেশিক গভর্নরের পদ পেয়েছেন, এতে প্রমাণিত হয় না যে উচ্চবর্ণের হিন্দু ধর্মান্তর গ্রহণ করলে অভিজাত হতেন। মহম্মদ তুঘলক বহু বিদেশীকে অভিজাততন্ত্রে স্থান দেন (আইজ্জা)। এদের একজন বাহমনি রাজ্য স্থাপন করেন, আর একজন গুজরাটে রাজপাট গড়ে তোলেন। তুর্কি শাসনের ভিত্তি ছিল অভিজাতরা, এরা ইক্‌তার রাজস্ব ভোগ করত, সঙ্গে সৈন্যবাহিনী থাকত, স্থানীয় স্বার্থের সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠত না। সমাজ ও রাষ্ট্রে ছিল বহু স্তর, অভিজাতদের তিনটি স্তর ছিল—খান, মালিক ও আমীর। উলেমা ও দরবেশরা (মাশেখ) সম্মান পেতেন।

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার গোড়ার দিকে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কর্তৃত্ব এক হলেও পরবর্তীকালে তা পৃথক হয়ে যায়। আব্বাসীয় খলিফারা ধর্ম ও রাষ্ট্রকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস চালিয়েছিলেন, বাস্তবক্ষেত্রে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ধর্মের ওপর আধিপত্য স্থাপন করত। আব্বাসীয় খিলাফতের পতনের পর স্বাধীন রাজ্য গড়ে উঠেছিল, ইসলামের রাষ্ট্রীয় ঐক্য নষ্ট হয়ে যায়। তুর্কিরা ছিল সদ্য ধর্মান্তরিত উপজাতি।

এজন্য তাঁরা উলেমাদের বিশেষ সম্মানের আসনে বসিয়েছিলেন। উলেমাদের তাঁরা ইসলামী ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যাকার হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব তাঁরা নিজেদের হাতে রেখেছিলেন। সুলতান আলাউদ্দিন দিল্লির কোতোয়াল আলাউল মুলককে বলেছিলেন যে কেরানির কাছ থেকে তিনি কোনো পরামর্শ নিতে চান না। তিনি রাষ্ট্রের ব্যাপারে উলেমাদের পরামর্শ নিতেন না। কেউ কেউ বলেছেন যে তুর্কিদের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ছিল 'ধর্ম-রাষ্ট্র' কারণ ইসলামী 'শরিয়া' অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালিত হতো এবং শরিয়ার ভাষ্যকার ছিলেন উলেমারা। ধর্মরাষ্ট্রের ধারণা পাওয়া যায় ইহুদিদের রাষ্ট্রব্যবস্থায়। ঈশ্বর যাজকদের মাধ্যমে এই ধরনের রাষ্ট্র পরিচালনা করেন (government or state governed by God directly or through a sacerdotal class)। সংগঠিত যাজকরা ঈশ্বরের হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। মুসলমান উলেমারা সংগঠিত ছিলেন না, ভারতে ধর্মরাষ্ট্র স্থাপিত হয়নি, এই ধরনের রাষ্ট্র সমকালীন পৃথিবীর কোথাও ছিল না।

ভারতে উলেমারা ধর্মরাষ্ট্র স্থাপন করতে চাননি, তাঁরা যা নিয়ে আলোচনা করতেন তা হলো প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্র ভারতে স্থাপন করা সম্ভব কি না। ইসলামী আইন ভারতে প্রবর্তন করা সম্ভব কি না তা নিয়েও যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। সুলতানি যুগে এইসব প্রশ্ন উলেমারা আলোচনা করেন। সুলতানরা উলেমাদের শ্রদ্ধা করতেন কিন্তু রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাদের পরামর্শ নিতেন না। ইলতুৎমিস রাজিয়াকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করার ব্যাপারে উলেমাদের পরামর্শ নেননি। বলবন রাজসভায় পাইবস ও সিজ্‌দা প্রবর্তন করেন, এইসব প্রথাকে উলেমারা অইসলামী বলে মনে করতেন। আলাউদ্দিন কাজী মুঘিশউদ্দিনের শরিয়ত ব্যাখ্যা মানেননি। তিনি কাজীকে বলেছিলেন যে তিনি কোরান পড়েননি, ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিও নন, রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য যা প্রয়োজন তাই তিনি করেন। শরিয়তের সমর্থন আছে কিনা তাও তিনি জানেন না। বিদ্রোহ দমনের জন্য আলাউদ্দিন এরকম দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন। সব সময় তিনি 'শরা' অমান্য করে চলতেন না, বারানি মনে করেন যে আলাউদ্দিন রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে একটি বিভাজন রেখা তৈরি করে নেন। রাষ্ট্রের কাজ হলো শাসন, দায় হলো শাসকের, ধর্ম ব্যাখ্যার কাজ হলো কাজী ও মুফ্‌তিদের। মহম্মদ বিন তুঘলক শরিয়তের পরিপূরক কিছু রাষ্ট্রীয় আদেশ জারি করেন (জাবাবিত)। ফিরুজ তুঘলক গোঁড়া ও রক্ষণশীল ছিলেন, তবে তিনি শরিয়তের নির্দেশ অনুযায়ী অঙ্গচ্ছেদ ব্যবস্থা মেনে নেননি। বারানি এসব বিষয় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্র (দিনদারী) ভারতে সম্ভব নয়, ভারতে যে ইসলামী রাষ্ট্র সম্ভব তা হলো দুনিয়াদারি। এই ধরনের ইসলামী রাষ্ট্রে সুলতান হবেন প্রধান, তিনি হবেন ধর্মপ্রাণ মুসলমান। তিনি সৈয়দ, ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি ও শেখদের সম্মান ও পদ দেবেন। পার্শ্ববর্তী রাজা ও প্রধানদের বিরুদ্ধে জেহাদ

করবেন, মুসলিমরা যাতে ধর্মীয় বিধি-বিধান মেনে চলে সেদিকে লক্ষ রাখবেন। সুলতান ব্যক্তিগত জীবনে যা করেন বা প্রজা কি ভাবেন তার সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক নেই। সুলতানি রাষ্ট্র ধর্মরাষ্ট্র ছিল না, উলেমাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সুলতানরা চলতেন না। আপাতদৃষ্টিতে রাষ্ট্র ছিল ইসলামী, কিন্তু সামাজিক সাম্য ছিল না, বহুস্তরে বিভক্ত ছিল সমাজ ও রাষ্ট্র। সাধারণ হিন্দু ও মুসলমানের জীবনে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। উলেমারা সম্মান পেতেন, কিন্তু রাষ্ট্র তাদের পরামর্শ অনুযায়ী চলত না। রাষ্ট্র রাজনৈতিকভাবে চলত, শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থ অনুযায়ী নীতি নির্ধারিত হতো। সুলতান ও উলেমাদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিত। হিন্দুদের কতখানি ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়া হবে এই নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিত, রাষ্ট্রে তাদের ভূমিকা কী হবে তা নিয়েও মতবিরোধ ছিল।

মুসলিম শাসন নিঃশর্তে মেনে নিলে, আনুগত্য ও কর দিলে হিন্দুদের ধর্মীয় অধিকার মেনে নিতে সুলতানি রাষ্ট্র দ্বিধা করত না। এধরনের হিন্দুদের বলা হতো 'জিম্মি' (Protected persons)। জিম্মিদের ধর্মাচরণের অধিকার ছিল, পুরনো মন্দির সংস্কারের অধিকারও তারা ভোগ করত, কিন্তু নতুন মন্দির নির্মাণের অধিকার তাদের ছিল না। এই ধারণাটি খুব স্পষ্ট ছিল না, বিভিন্ন উলেমাগোষ্ঠী-এর নানা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যুদ্ধের সময় মুসলিম সৈন্য হিন্দুদের মন্দির ভেঙে দিত। কয়েকটি ক্ষেত্রে মন্দিরকে মসজিদে পরিণত করা হয়। তবে এই ব্যবস্থা বেশি দিন চলেনি, তুর্কি শাসকরা নিজেরা মসজিদ বানিয়েছিলেন। সারাদেশে তুর্কি শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে শাসকদের শাসিতের প্রতি সহনশীলতা বেড়েছিল। হিন্দুরা মুসলমান শাসকদের আনুগত্য ছাড়াও জিজিয়া দিত। সামরিক কাজের বিনিময়ে মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলমানকে এই কর দিতে হতো। সাধারণত ভূমিকর খারাজের সঙ্গে জিজিয়া সংগ্রহ করা হতো (জিজিয়া-খারাজ)। মুসলমান রাষ্ট্রে হিন্দুদের সামনে তিনটি বিকল্প ছিল—ইসলাম ধর্ম গ্রহণ, মৃত্যুবরণ অথবা জিজিয়া প্রদান। হানাফি মতবাদে বিশ্বাসীরা তৃতীয় বিকল্পটি হিন্দুদের গ্রহণ করতে বলত। কীভাবে জিজিয়া ধার্য ও সংগ্রহ করা হতো নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। আলাউদ্দিনের করের তালিকায় জিজিয়া নেই। ফিরুজ জিজিয়া ধার্য করেন, ব্রাহ্মণ, মহিলা, শিশু ও দরিদ্র মানুষ এই কর থেকে রেহাই পেত।

অল্পসংখ্যক সম্পন্ন হিন্দু জিজিয়া দিত। জিজিয়ার মাধ্যমে হিন্দুদের ধর্মান্তরকরণে উৎসাহ দেওয়া হতো বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন। উলেমারা এই করটিকে হিন্দুদের হেনস্তা ও অসম্মান করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন। ইসলামী ধর্মশাস্ত্রবিদ্‌দের অনেকে মনে করেন যে হিন্দুরা পৌত্তলিক, জিজিয়ার অনুপযুক্ত, এজন্য তাদের দুটি বিকল্প হলো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ অথবা মৃত্যুবরণ। দিল্লির কয়েকজন উলেমা ইলতুৎমিসকে

এধরনের কথা বলেছিলেন। তাঁর প্রধানমন্ত্রী এর উত্তরে বলেছিলেন যে এধরনের রাষ্ট্রনীতি ঐতিহ্য বিরোধী এবং অবাস্তব কারণ ভারতে হিন্দুরা হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ। তুর্কি সুলতানরা সিন্ধুর আরব শাসকদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে হিন্দুদের জিজিয়া দানের অধিকার দেন এবং বেসামরিক প্রশাসনে তাদের নিযুক্ত করেন। হিন্দুরা খুত, মুকাদ্দম ও চৌধুরী হিসেবে গ্রামীণ অঞ্চলে রাজস্ব ধার্য ও সংগ্রহের সঙ্গে যুক্ত ছিল, মহাজন ও বণিকরা শিল্প-বাণিজ্যের লেনদেন পরিচালনা করত। বানজারা বণিকরা পরিবহনের কাজ করত। কাজী মুঘিশউদ্দিন বা উলেমা বারানি হিন্দুদের স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রতিপত্তি পছন্দ করেননি। বারানি দুঃখ করে লিখেছেন যে সুলতানরা এইসব পৌত্তলিকদের গভর্নরসহ অন্যান্য উচ্চপদে নিয়োগ করেন। মহম্মদ বিন তুঘলকের আগে কোনো হিন্দু উচ্চপদে নিযুক্ত হননি, বারানি অতিরঞ্জিত করেছেন তাঁর বক্তব্যকে। তবে বারানির লেখা থেকে অনুমান করা যায় যে শাহ্ (ব্যাঙ্কার), মেহতা (প্রশাসক) ও পণ্ডিতরা স্বাচ্ছন্দ্যে ছিলেন, সুন্দর সুন্দর গৃহ নির্মাণ করে সুখে বসবাস করতেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সচ্ছল মানুষের সংখ্যা ছিল খুবই কম, সাধারণ হিন্দু ও মুসলমান ছিল দরিদ্র, শাসকশ্রেণী তাদের শোষণ করত।

হিন্দুদের প্রাত্যহিক জীবনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ছিল না। রাষ্ট্রের প্রাপ্য রাজস্ব দিলে তাদের ওপর উৎপীড়ন হতো না। দুর্ভিক্ষ হলে বা যুদ্ধ বাধলে সাধারণ মানুষ দুর্দশার মধ্যে পড়ে যেত। স্থানীয় প্রধান সরকারি রাজস্ব জমা না দিলে তুর্কিরা তাদের আক্রমণ করতেন। বিচারের ক্ষেত্রে হিন্দুদের জাতি পঞ্চায়েতে হিন্দু আইন অনুযায়ী তাদের বিচার হত। গ্রামের সর্দার তাদের বিচার করতেন। কাজীরা মুসলিম আইন অনুযায়ী মুসলমানদের বিচার করত বা হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ নিষ্পত্তি করত। তুর্কিদের কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাষ্ট্রের প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। আলাউদ্দিন ও মহম্মদ বিন তুঘলক সারা দেশে একই ধরনের রাজস্বব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ধর্মের ক্ষেত্রে অনেকখানি স্বাধীনতা দেওয়া হয়। জালালুদ্দিন খল্‌জির সময়ে হিন্দুরা শোভাযাত্রা করে তাদের প্রতিমা বিসর্জন দিতে যেত। মহম্মদ বিন তুঘলক হিন্দু উৎসব হোলিতে অংশ নিতেন, যোগী ও সাধুদের সঙ্গে ধর্ম আলোচনা করতেন। তবে স্বৈরাচারী রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনগণের অধিকার বলে কিছু ছিল না, সুলতান অনুগ্রহ করে এসব অধিকার দান করেছিলেন। স্থানীয় স্বেচ্ছাচারীরা (ইক্‌তাদাররা) উলেমাদের পরামর্শ অনুযায়ী হিন্দুদের প্রতি কঠোর আচরণ করতেন। ফিরুজ তুঘলক একজন ব্রাহ্মণকে পুড়িয়ে মেরেছিলেন কারণ তিনি একজন মুসলমানকে ধর্মান্তরিত করেন। অনেকগুলি মন্দির তিনি ধ্বংস করে দেন। আবার এই উলেমারা সিকান্দর লোদিকে হিন্দুদের পুরনো মন্দির ধ্বংস করা বা তীর্থস্থান অপবিত্র করা থেকে বিরত হতে বলেন। বলা যায় সাধারণত সুলতানরা ধর্মের ক্ষেত্রে সহনশীলতার

নীতি অনুসরণ করেন, দু-একটি ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল। এ প্রসঙ্গে ইউরোপের খ্রিস্টান রাজাদের অসহিষ্ণুতার কথা উল্লেখ করা যায়। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ইউরোপে ধর্ম নিয়ে হানাহানি চলেছিল। শুধু অখ্রিস্টানদের প্রতি নয়, খ্রিস্টানদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিও তাঁরা সহনশীল ছিলেন না। বারানি মনে করেন যে ভারতে সুলতানি রাজ্য ছিল একটি ইসলামী রাষ্ট্র, মুসলিমরা এই রাষ্ট্রে একটি সুবিধাভোগী সম্প্রদায়। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো মুসলমানদের নৈতিক ও পার্থিব উন্নতির দিকে নজর রাখা। বিশেষ গোষ্ঠীকে বিশেষ রাষ্ট্রীয় সুবিধাদান ভারতে নতুন নয়। রাজপুত রাজারা এধরনের রাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করেন, তাদের রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজপুত ও ব্রাহ্মণরা বিশেষ সুবিধাভোগী গোষ্ঠী ছিল।

মুসলিম রাষ্ট্রচিন্তাবিদরা রাষ্ট্রের চরিত্র, উদ্দেশ্য, নৈতিক ভিত্তি এবং সুলতানের অধিকার নিয়ে আলোচনা করেছেন। এরা মনে করেন যে সামাজিক নৈরাজ্য থেকে রক্ষা পাবার একমাত্র উপায় হলো রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা। নারীর সম্মান ও সম্পত্তির অধিকার রক্ষার জন্য রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োজন। এই রাষ্ট্রচিন্তাবিদরা একজন শাসকের শাসন পছন্দ করেন। তিনি অনেক গুণে ভূষিত হবেন, ঈশ্বরের ইচ্ছায় তিনি শাসন করবেন, অভিজাতদের ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করবেন। স্বৈরাচারী শাসনের কথা নিয়েও চিন্তাবিদরা আলোচনা করেন। বারানি স্বৈরাচারকে অইসলামী বলে উল্লেখ করেছেন। ধর্ম স্বৈরাচারী শাসকের একমাত্র নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করতে পারে। সুলতান স্বৈরাচারী হলেও জনগণ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবেন না, সুলতান শরিয়া ভঙ্গ করলে বিদ্রোহ সমর্থন করা যেতে পারে। ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বারানি স্বৈরাচারকে সমর্থন করেছেন কারণ এখানে কঠোর শাসনের প্রয়োজন ছিল। নিম্নস্তরের মানুষের সংখ্যা সমাজে খুব বেশি, এদের দমন করে রাখার জন্য স্বৈরাচারী শাসকের প্রয়োজন। বারানি স্বৈরাচারের সামাজিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

সুলতান তাঁর নৈতিক কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য 'আদল' বা ন্যায়বিচারের আশ্রয় নেবেন। ন্যায়বিচার সুলতানের কর্তৃত্বকে তুলে ধরবে। ধনী-নির্ধন, অভিজাত-অনভিজাত, আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলের প্রতি শাসক সুবিচার করবেন। *সিয়াসতনামায়* নিজামুদ্দিন এই ন্যায়বিচারের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। ধর্মীয় কর্তব্যের চেয়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হলো সুলতানের অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বারানি বলেছেন যে সত্তর বছরের নামাজের চেয়ে ন্যায়বিচার হলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই ন্যায়বিচারের অর্থ হলো সমাজ ব্যবস্থা বজায় রাখা। এই সমাজে নিম্নবর্গের মানুষকে (mean and ignoble) দমন করে রাখবেন শাসক। ন্যায়বিচার শাসকের স্বৈরাচারের ওপর নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করত, অভিজাত ও রাজকর্মচারীরা অত্যাচারী হতে পারতেন না। শাসক প্রজাকল্যাণমূলক

নীতি অনুসরণ করবেন এই ধারণাও ন্যায়বিচারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাধু ও দরবেশরা শাসকগোষ্ঠীর কাছে এই ধারণা প্রচার করেন। তাঁরা শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বৈষম্যের কথা তুলেছিলেন। সন্ত ও দরবেশরা সব মানুষের সাম্যের কথা প্রচার করেন, সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তাঁরা এভাবে ব্যক্ত করেন। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে নিপীড়িত মানুষ তাদের কাছ থেকে আশার কথা শুনেছিল। শাসকরা জনকল্যাণের নীতিকে মৌখিকভাবে সমর্থন করতেন, আন্তরিকতা ছিল না। ব্যতিক্রম হলেন শেরশাহের মতো শাসক। ফিরুজ তুঘলক এধরনের প্রজামঙ্গলকর রাষ্ট্রের কথা বলেছিলেন। মুসলমান প্রজাদের জন্য তিনি যেসব জনকল্যাণকর ব্যবস্থা নেন তাতে হিন্দুরাও উপকৃত হয়েছিল।

এই ধরনের সামরিক শক্তি-নির্ভর কেন্দ্রীভূত, স্বৈরাচারী রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির সহায়ক ছিল কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। শাসকগোষ্ঠী নিয়ন্ত্রিত, শ্রেণীবিভক্ত ছিল সমাজ। এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সুলতানি যুগে কেন্দ্রে ও প্রদেশে স্থাপত্য, শিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীতের উন্নতি হয়েছিল। এই সংস্কৃতিতে হিন্দু ও মুসলমানের অবদান ছিল। সুফি ও ভক্তি আন্দোলন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে দ্বন্দ্বের তীব্রতা কমিয়েছিল, পরস্পরের ভাববিনিময়ের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল। কয়েকজন শাসক যেমন মহম্মদ ও ফিরুজ তুঘলক কৃষির উন্নতির জন্য ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। দেশের রাজস্বব্যবস্থা কৃষি উদ্বৃত্তের একটি অংশ আত্মসাতের ব্যবস্থা করেছিল। গ্রামীণ জীবনে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। এই কৃষি উদ্বৃত্ত নিয়ে অভিজাতশ্রেণী শহর স্থাপন করে, সৌখিন ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করে। দেশের অভ্যন্তরে এবং বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য বেড়েছিল, দেশে স্থিতিশীল রুপোর মুদ্রা ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য চলেছিল। পর্তুগিজরা যখন ভারতে আসে এদেশে অর্থনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছিল। তবে ভারতে প্রাচুর্যের পাশাপাশি কঠোর দারিদ্র্যের সহাবস্থান চলেছিল। সুলতানি যুগ ভারতের ইতিহাসে অন্ধকায়ময় যুগ নয়। ভারতের কঠোর সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধি-নিয়ম ভেঙে তুর্কি ও আফগান শাসন নতুন যুগের সূচনা করেছিল। উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে উঠতে থাকে, তবে স্বীকার করতে হয় এই উন্নতি ছিল অবশ্যই সীমিত।

দিল্লি সুলতানির পতনে ফিরুজ তুঘলকের দায়িত্ব

সুলতান ফিরুজ তুঘলকের দীর্ঘ শাসনকালে (১৩৫১-৮৮) দিল্লি সুলতানি রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সুলতানের মৃত্যুর আগে থেকে (১৩৮৮) সুলতানি রাজ্য ভাঙতে শুরু করেছিল। সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহম্মদ ও তাঁর উজির দ্বিতীয় খান জাহানের মধ্যে

ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল। মুহম্মদ তাঁর পিতাকে স্বপক্ষে টানতে সক্ষম হন, খান জাহান ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে দূরে সরে যেতে বাধ্য হন। ফিরুজ যুবরাজকে তাঁর শাসনের সঙ্গে যুক্ত করেন এবং কার্যত তিনি যুগ্ম শাসক হিসেবে কাজ করতে থাকেন। ফিরুজের লক্ষাধিক ক্রীতদাস যুবরাজ মনোনয়ন মেনে নেয়নি, মুহম্মদ তাদের পছন্দের রাজপুত্র ছিল না। রাজপুত্র মুহম্মদের সঙ্গে ফিরুজের ক্রীতদাসদের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল। এই অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার দ্বন্দ্বে ফিরুজ অবিবেচকের মতো ক্রীতদাসদের পক্ষ নেন, রাজপুত্র মুহম্মদ ক্ষমতাচ্যুত হন। ১৩৮৮ খ্রিস্টাব্দে ফিরুজের মৃত্যু হলে প্রভাবশালী ক্রীতদাসরা ক্ষমতার দ্বন্দ্বে মেতেছিল, সিংহাসন নিয়ে ফিরুজের পুত্র ও পৌত্ররা সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছিল। ক্রীতদাসরা ক্ষমতার নিয়ামক হতে চেয়েছিল (king maker)। একের পর এক রাজপুত্র সিংহাসনে বসলেন ও ক্ষমতাচ্যুত হলেন। ১৩৯৪ খ্রিস্টাব্দে নাসিরুদ্দিন মাহমুদ ক্ষমতা দখল করেন, তুঘলক বংশের শেষ অবধি তিনি ক্ষমতায় ছিলেন (১৪১২)।

কেন্দ্রে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব চলাকালীন (১৩৮৮-৯৪) প্রাদেশিক শাসকরা স্বাধীন হয়ে যান। গুজরাটের শাসক প্রথম বিদ্রোহ করে স্বাধীন হন, পাঞ্জাবের খোক্করররা এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন, মালব ও খান্দেশ স্বাধীন হয়েছিল। বাংলা, বিজয়নগর ও বাহমনি রাজ্য আগেই স্বাধীন হয়েছিল। নাসিরুদ্দিন মাহমুদের উজির খাজা জাহান কনৌজ থেকে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল শাসনের অধিকার লাভ করেন। জৌনপুর সুলতানির প্রতিষ্ঠা হয়। শুধু তাই নয়, দিল্লি সুলতানির অধীনস্থ হিন্দু সর্দাররা রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করেন। সমকালীন মানুষ কৌতুক করে বলতে থাকে জাঁহাপনার সাম্রাজ্য হলো দিল্লি থেকে পালাম। দিল্লি সুলতানি রাজধানী দিল্লি ও তার আশপাশের অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল।

দিল্লি সুলতানি শাসনের ওপর চরম আঘাত হেনেছিলেন তৈমুর লঙ্। ১৩৯৮-৯৯ খ্রিস্টাব্দে সমরকন্দের শাসক তৈমুর দিল্লি ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বীভৎস তাণ্ডব চালিয়েছিলেন। তৈমুরের পৌত্র উছ্ ও দিপালপুর জয় করেন ১৩৯৬-৯৭ খ্রিস্টাব্দে, মুলতান অবরোধ করেছিলেন। দিল্লির তুঘলক বংশীয় শাসকরা এর বিরুদ্ধে কোনো সামরিক ব্যবস্থা নেননি, তৈমুরকে বাধাদানের কোনো সামরিক প্রস্তুতি ছিল না। তৈমুর শুধু হত্যা ও ধ্বংস চালাননি, বহু সম্পদ ও এদেশের কারিগর ও শিল্পীদের নিজের দেশে নিয়ে যান। লাহোর, দিপালপুর ও মুলতান তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেন। দিল্লি সুলতানির অন্তঃসারশূন্যতা সকলের কাছে প্রকট হয়ে পড়ে। তৈমুরের অনায়াসে ভারত জয় বাবরকে ভারত জয়ে উৎসাহ জুগিয়েছিল, বাবর তৈমুরের উত্তরাধিকারী হিসেবে ভারতবর্ষ দাবি করেন।

অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মনে করেন যে, কোনো সুলতানকে ব্যক্তিগতভাবে সুলতানি শাসনের পতনের জন্য দায়ী করা ঠিক নয়। আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক কারণে সুলতানি রাষ্ট্রের পতন ঘটেছিল। মধ্যযুগের ভারতে আঞ্চলিক ও বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তিগুলি সক্রিয় ছিল, ভারতের সর্বত্র বহু স্থানীয় প্রধান ছিলেন। কোনো বিশেষ অঞ্চলে এদের ক্ষমতার কেন্দ্র ছিল বা এরা কোনো জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হলে এরা বিদ্রোহের পতাকা তুলতেন, স্বাধীন হবার চেষ্টা করতেন। তুর্কি সুলতানরা দুভাবে এই বিচ্ছিন্নতাকামী প্রবণতা রোধ করার চেষ্টা করেন। নিজেদের ব্যক্তিগত ক্রীতদাস বাহিনী গঠন করে এবং অনুগত, নির্ভরশীল অভিজাততন্ত্র স্থাপন করে। ইক্‌তা ব্যবস্থার মাধ্যমে এই অভিজাততন্ত্র গঠন করা হয়। কিন্তু তুর্কি অভিজাতরা সংখ্যায় নগণ্য হলেও ছিল প্রভাবশালী এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী। এরা সুযোগ পেলেই স্বাধীন ক্ষমতাকেন্দ্র গড়ে তোলার চেষ্টা করত। কেন্দ্রের সুলতানি শাসন দূরবর্তী প্রদেশ বাংলা, সিন্ধু, গুজরাট ও দৌলতাবাদের ওপর যথাযথ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারেনি। বলবন জাতিগোষ্ঠী নির্ভর (তুর্কি) অভিজাততন্ত্র গঠন করে ক্ষমতা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করতে চেয়েছিলেন। আলাউদ্দিন সব গোষ্ঠীকে নিয়ে অভিজাততন্ত্রের মধ্যে ভারসাম্য গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। গুপ্তচর ব্যবস্থা ছিল তাঁর সহায়ক। মহম্মদ বিন তুঘলক আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে দেশী-বিদেশী সর্বস্তরের লোক নিয়ে অভিজাততন্ত্র গঠন করেন। ফিরুজ তুঘলক বংশানুক্রমিক ক্ষুদ্র অভিজাততন্ত্র গঠন করে এদের নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস চালিয়েছিলেন। কিন্তু কেউই সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করেননি, সুলতানরা অভিজাতদের কাছ থেকে নিঃশর্ত আনুগত্য ও সেবা পাননি।

অভিজাতনির্ভর শাসনব্যবস্থায় ধর্ম বিশেষ সহায়ক ছিল না। সুলতানি রাজ্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পর হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মৌল বিরোধ ছিল না। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ছিল মুসলমানদের মধ্যে। হিন্দু রাজাদের বিরুদ্ধে ধর্মের জিগির তোলা হতো তাদের সম্পদ লুঠ করার জন্য, কৃষকরাও অব্যাহতি পেত না। সুলতানি শাসকদের একটি বড় সমস্যা ছিল সৈন্যবাহিনীর গঠন। মোঙ্গল আক্রমণের ফলে মধ্য এশিয়া থেকে অভিবাসন বন্ধ হলে তুর্কিদের প্রাধান্য কমে যায়। সুলতানরা আফগান, তুর্কি বংশধর, মোঙ্গল, ভারতীয় ধর্মান্তরিত মুসলমান এবং হিন্দুদের সৈন্যবাহিনীতে গ্রহণ করেন। এইসব জাতিগোষ্ঠীর সৈন্যদের নিজস্ব সমস্যা ছিল। ফিরুজ তাঁর সৈন্যবাহিনীতে বংশানুক্রমিক নীতি প্রবর্তন করেন, তুর্কি ও মোঙ্গলদের প্রাধান্য দেন। তাঁর ক্রীতদাসদের মধ্যে ভারতীয় ধর্মান্তরিত মুসলমানদের স্থান দেন। তাঁর এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা সফল হয়নি। তাঁর বংশানুক্রমিক সৈন্যরা দক্ষ ছিল না, তাঁর দাসবাহিনী ছিল স্বার্থপর ও

অবাধ্য। অভিজাত, সৈন্যবাহিনী ও ক্রীতদাসরা পরস্পরের প্রতি শত্রুতার মনোভাব পোষণ করত, এদের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না।

সুলতানের আরও একটি বড় সমস্যা ছিল। দিল্লি সুলতানির কোনো নির্দিষ্ট উত্তরাধিকার নীতি ছিল না, জ্যেষ্ঠ পুত্রের উত্তরাধিকার সকলে মানতো না। সুলতানের মনোনীত ব্যক্তিকে অভিজাতরা মেনে নিতে রাজী হলেও রাজপরিবারের মধ্যে বিরোধিতা দেখা দিত। রাজিয়ার সময় এরকম পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। রাজপুত্রদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে লড়াই শুরু হলে অভিজাতরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাতে জড়িয়ে পড়তেন। ক্রীতদাস বাহিনী ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছিল, ক্ষমতা দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিল। ফিরুজ তুঘলকের জীবনের শেষপর্বে এরকম পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। ক্রীতদাসরা কিছুকাল রাজপুত্রদের ক্রীড়নক করে রেখেছিল।

সুলতানি রাষ্ট্রকে কি ধর্ম-রাষ্ট্র বলা যায়?

খ্রিস্ট্রীয় সপ্তম শতকে পয়গম্বর হজরত মহম্মদ রাষ্ট্র ও ধর্ম ব্যবস্থার যে রূপরেখা দিয়ে যান তাকে কেন্দ্র করে ইসলামী রাষ্ট্র ও ধর্ম ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। ঈশ্বরের বাণী হলো পবিত্র কোরান, আর কোরানের পয়গম্বর কৃত ব্যাখ্যা হলো হাদিস। এই কোরান ও হাদিস নিয়ে গড়ে ওঠে ইসলামের নতুন রাষ্ট্র ও ধর্ম দর্শন। পয়গম্বরের মৃত্যুর পর চার জন খলিফা (আবুবকর, ওমর, ওসমান ও আলি) আমীর-উল-মুমিনিন বা বিশ্বাসীদের প্রধান হিসেবে ইসলামী রাষ্ট্র ও ধর্ম পরিচালনা করেন। ধর্মপ্রাণ পয়গম্বর দারিদ্র্যের মধ্যে সহজ, সরল, অনাড়ম্বর জীবনচর্যাকে আদর্শ জীবন বলে প্রচার করেন। আলির সময়ে থেকে খিলাফত নিয়ে বিরোধ শুরু হয়। প্রথমে উম্মাইদরা, পরে আব্বাসীয়রা খিলাফত অধিকার করেছিল। দামাস্কাস, পরে বাগদাদ হলো ইসলামী সাম্রাজ্যের কেন্দ্র। ইসলাম পার্শ্ববর্তী দেশগুলি জয় করে আফ্রিকা ও ইউরোপে প্রবেশ করেছিল শাসকদের কাছে এসেছিল প্রচুর সম্পদ, ভোগ-বিলাসের নানা উপকরণ। ইসলামী রাষ্ট্র ও ধর্মাদর্শের দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে কারণ সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিজিতের ঐতিহ্য, ধর্ম, দর্শন, রাষ্ট্রব্যবস্থা, আচার-আচরণ ইসলামী ব্যবস্থার মধ্যে ঢুকে পড়ে।

দ্বাদশ শতকে ভারতে ইসলামী রাষ্ট্র স্থাপিত হয়। তার আগে অষ্টম শতকে উত্তর-পশ্চিমের সিন্ধুদেশে আরবদের শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছিল। ত্রয়োদশ শতকে দিল্লি হলো সুলতানি রাষ্ট্রের রাজধানী। ইসলাম দ্বিতীয়বারের অভিযানে আরবদের মাধ্যমে ভারতে প্রবেশ করেনি। গজনি ও ঘুর ছিল তুর্কিদের ক্ষমতাকেন্দ্র, সেখান থেকে ইসলাম বারবার অভিযান চালিয়ে রাজপুতদের পরাস্ত করে ইসলামী সুলতানাত গঠন করেছিল। দিল্লি সুলতানির প্রধান হলেন সুলতান, সুলতানির প্রথম একশো বছর সব

সুলতান ছিলেন ইলবারি তুর্কি, শাসকগোষ্ঠীর লোকেরাও ছিল তুর্কি। ভারতে ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলো। এই ইসলামী রাষ্ট্র ধর্ম-রাষ্ট্র ছিল কিনা সেটাই হলো বিতর্কের বিষয়। এবিষয়ে ঐতিহাসিকরা একমত হতে পারেননি। অধ্যাপক এ. এল. শ্রীবাস্তব ও ঈশ্বরীপ্রসাদের মতো ঐতিহাসিক একে ধর্ম-রাষ্ট্র না বললেও ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্র বলেছেন। অপরদিকে আই. এইচ. কুরেশির মতো ঐতিহাসিক একে ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্র বলে মেনে নিতে পারেননি। অধ্যাপক এ. বি. এম. হবিবুল্লাহ্ও একে ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্র বলতে চান না।

সুলতানি রাষ্ট্রের প্রধান সুলতানরা খলিফাকে মেনে চলতেন, তাঁর অনুমোদন লাভের চেষ্টা করতেন। খুৎবায় খলিফার নাম উচ্চারিত হতো, মুদ্রায় খলিফার নাম উৎকীর্ণ করার প্রথা ছিল। খল্জি শাসকেরা এই ঐতিহ্য থেকে খানিকটা সরে যান। সুলতানি রাষ্ট্রকে ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্র বলার অনেকগুলি কারণ দেখানো হয়। সুলতানি যুগের ঐতিহাসিকদের অনেকে শাসিত জনগণকে জিম্মি বলে উল্লেখ করেছেন। জিম্মিদের কোনো অধিকার থাকে না, তারা হলো ইসলামী রাষ্ট্রের আশ্রিত ব্যক্তি। হিন্দুদের কোরান নির্দেশিত জিজিয়া কর দিতে হতো, সামরিক কাজকর্মের পরিবর্তে তারা এই কর দিত। রাষ্ট্র তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিত। সুলতানদের বিরুদ্ধে আরো অভিযোগ হলো তারা হিন্দু মন্দির ও মূর্তি ভেঙে দেন, হিন্দু মন্দির ভেঙে মসজিদ বানিয়েছেন। মন্দিরগুলি লুট করে ধনরত্ন আত্মসাৎ করেছেন। বিচারের ক্ষেত্রে হিন্দুদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হতো। তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ভারতে যে সুলতানি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তার আদর্শ হলো পারস্যের রাজতন্ত্র ও রাজকীয় আদব-কায়দা। পারস্যের সাসানীয় বংশীয় শাসকদের দরবার, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ ভারতীয় সুলতানরা অনুকরণ করেছিলেন। এই রাষ্ট্রাদর্শের মূল কথা হলো রাজা হলেন ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব (Reflection of God), তার মাধ্যমে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে। সুলতানি শাসনের শুরু থেকে উলেমারা প্রচার করতেন যে শাসন ও শৃঙ্খলার জন্য সুলতানের প্রয়োজন, ধর্ম ও রাষ্ট্র হলো পরস্পরের পরিপূরক। শাসককে মানা হলো ঈশ্বরের বিধান, এই বিধান ভঙ্গ করলে আইন ভঙ্গকারী অধর্মের জন্য দায়ী হন, তার শাস্তি প্রাপ্য। সুলতানি শাসনের দুটি স্তম্ভ হলো অভিজাততন্ত্র ও উলেমাতন্ত্র। অভিজাততন্ত্রের বেশিরভাগ ছিল বিদেশী, ভারতীয় মুসলমানরা সুলতানি যুগের শাসনব্যবস্থায় স্থান করে নিতে পারেনি। অশিক্ষা ও অনগ্রসরতা হলো এর কারণ। সুলতানরা অভিজাততন্ত্রকে দমন করে স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠা করেন, রাজতন্ত্র বংশানুক্রমিক হয়ে যায়। নিরঙ্কুশ স্বৈরাচার শোষণ ও উৎপীড়নের ওপর নির্ভর করেছিল, সামরিক শক্তি ছিল এর ভিত্তি। উলেমারা সকলে রাষ্ট্র ও সুলতানকে সমর্থন করেনি। সুফি সন্ত ও দরবেশদের একটা অংশ সুলতানি শাসন থেকে দূরে সরে ছিল।

নিজামুদ্দিন আউলিয়া হলেন এর উদাহরণ। অন্য একটি গোষ্ঠী সুলতানদের সঙ্গে সহযোগিতা করে সুলতানের ভাবমূর্তি গঠনে সহায়ক হতো। এরা সুলতানকে অমুসলমানদের বিরুদ্ধে জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধ করতে বলত। সুলতানরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতেন। হিন্দু সামন্ত রাজাদের সঙ্গে লড়াইয়ের সময় মুসলমান সৈন্যদের অনুপ্রাণিত করার জন্য জেহাদ ঘোষণা করা হতো। যুদ্ধে জয়ী হয়ে সুলতান গাজী উপাধি নিতেন।

সিন্ধু জয়ের পর মহম্মদ বিন কাশিম জিজিয়া কর স্থাপন করেন। জিজিয়া স্থাপিত হলেও দরিদ্র, শিশু, নারী ও ব্রাহ্মণদের তা দিতে হতো না। হিন্দু মন্দির লুণ্ঠিত হয়েছে, দেব বিগ্রহ ভাঙচুর হয়েছে, এসব ঐতিহাসিক সত্য। সেই যুগটা ছিল সংকীর্ণ, ধর্মীয় দৃষ্টিতে বা তার আবরণের মধ্য দিয়ে সবকিছু দেখা হতো। ঠিক এই সময়ে মহামান্য পোপরা স্বধর্মীদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড পরিচালনা করেছেন। ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকজন ছিল অমুসলমান। উঁচু তলার কিছু মুসলমান শাসনের সঙ্গে যুক্ত হলেও নীচের তলায় অমুসলিম জনসমুদ্রে শাসকগোষ্ঠীর লোকেরা ছিল হিন্দু রাজা, রায়, রায়ান ও মুকাদ্দামরা। এলাহাবাদে বলবনের সভায় বহু হিন্দু সামন্তরা উপস্থিত ছিলেন, সমকালীন ঐতিহাসিকরা এদের পরিচয় রেখে গেছেন। উঁচু ও নিচু তলার মধ্যে যোগাযোগ ও সম্পর্ক ছিল, কর ও আনুগত্য দিয়ে হিন্দুরা শাসনের অধিকার বজায় রেখেছিল। বলপূর্বক ধর্মান্তরের দু-একটি ঘটনা বিরল নয়। তবে সামগ্রিকভাবে হিন্দুরা তাদের পুজার্চনা করত, শোভাযাত্রা করে মূর্তি বিসর্জনের ঘটনা দিল্লিতেই ঘটেছে, জালালুদ্দিন খল্‌জির উক্তিতে তার প্রমাণ আছে। আলাউদ্দিন খল্‌জি উলেমাদের পরামর্শ অনুযায়ী চলতেন না। তিনি যে রাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করেন তাকে আধুনিক রাষ্ট্র নীতি বললে অত্যুক্তি হয় না (statism)। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও সমস্যা ভিন্ন ধরনের, এর সঙ্গে ধর্মীয় অনুশাসনের কোনো সম্পর্ক নেই। মহম্মদ বিন তুঘলক আরো একধাপ এগিয়ে যান, হিন্দুদের তিনি উচ্চপদে নিয়োগ করেন, হিন্দু ও জৈন সন্তদের সঙ্গে তিনি মেলামেশা করতেন। ইবন বতুতাকে তিনি একজন হিন্দুযোগীর অলৌকিক অদ্ভুত কার্যকলাপ দেখিয়েছিলেন। সাংস্কৃতিক স্তরেও হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে লেন-দেন ছিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলেছিল, রাজস্ব বিভাগে হিন্দুরা কাজ পেয়েছিল।

ভারতে সুলতানি রাষ্ট্র কখনো ধর্ম-রাষ্ট্র ছিল না। কোরান ও হাদিসের নির্দেশ অনুযায়ী এই রাষ্ট্র পরিচালিত হয়নি। শরিয়ত অনুযায়ী রাষ্ট্র-নীতি নির্ধারিত হতো না, দেশের প্রচলিত নিয়মকানুন অনুযায়ী রাজস্ব ও শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হতো। মধ্য এশিয়া থেকে এসেছিল ইক্‌তা ব্যবস্থা। মধ্যএশিয়ার প্রভাব ছিল তাদের সামরিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার ওপর। সুলতানরা বাইরে ধর্মীয় নিয়ম-কানুন পালন করে চলতেন,

মুসলিম জনসমর্থন আদায়ের এটি ছিল এক কৌশল। আসলে অন্য আর পাঁচটি স্বৈরাচারী শাসকের মতো তাঁরা নিরঙ্কুশ স্বৈরাচার স্থাপন করেছিলেন। আল্লার বাণী অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালিত হতো না, এজন্য একে ধর্ম-রাষ্ট্র আখ্যা দেওয়া ঠিক নয়। বলা যায় সমগ্র পৃথিবীতে কোথাও পরিপূর্ণ ধর্ম-রাষ্ট্র ছিল না, ধর্মের কিছু প্রভাব ছিল রাষ্ট্রের ওপর। ইহুদিদের ধর্মশাস্ত্রে ধর্ম-রাষ্ট্রের কথা আছে। ঈশ্বরের রাষ্ট্র পরিচালনা করেন যাজকরা। এধরনের ধর্ম-রাষ্ট্র ভারতে কখনো ছিল না, প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর কোথাও ছিল না। উলেমাদের খুশি করার জন্য সুলতানরা তাঁদের দু-একটি উপদেশ গ্রহণ করতেন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন স্বেচ্ছাচারী। স্বেচ্ছাচারী মুসলমান সুলতানের শাসনকে ধর্ম-রাষ্ট্র আখ্যা দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। দিল্লির সুলতানরা কেউই ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ শাসক ছিলেন না। আর পাঁচজন শাসকের মতো তাঁরা ছিলেন প্রখর বাস্তববাদী। ধর্মকে তাঁরা কখনো কখনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করেছিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

পর্তুগিজ বাণিজ্য ও নৌসাম্রাজ্য

১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজ ভাস্কো-ডা-গামা তিনখানি জাহাজ নিয়ে স্থানীয় নাবিক আবদুল মজিদের সঙ্গে কালিকটে এসে হাজির হন। এই ঘটনাটি ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে সম্পর্ক এবং পৃথিবীর ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। ভারতে বাণিজ্য করা ছিল পর্তুগিজদের একটি উদ্দেশ্য, ভারত বাণিজ্যে আরব ও তুর্কিরা আধিপত্য স্থাপন করেছিল। এরা ছিল খ্রিস্টানদের শত্রু, ইউরোপেও এরা আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছিল। ইউরোপ থেকে সরাসরি ভারতে আসা সম্ভব হলে মশলা বাণিজ্যের ওপর আরব ও তুর্কিদের একাধিপত্যের অবসান হবে। আফ্রিকার প্রবাদ-রাজা প্রেস্টারজনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হলে দুই দিক থেকে মুসলমানদের আক্রমণ করা সহজ হবে। ভারতে পর্তুগিজ অভিযানের কারণ ছিল প্রধানত দুটি—ধর্ম ও বাণিজ্য। জেনোয়া থেকে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা হয়েছিল। ১২৯১ খ্রিস্টাব্দে জেনোয়াবাসী উগোলিনো দ্য ভিভালদো সমুদ্রপথে ভারতের খোঁজে বেরিয়ে হারিয়ে যান। পরবর্তীকালে পর্তুগাল ভারতের সমুদ্রপথ আবিষ্কারের নেশায় মেতেছিল। ১৪১৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে পর্তুগালের শাসক হেনরি দ্য নেভিগেটর প্রতিবছর আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে সামুদ্রিক অভিযান পাঠাতেন। পর্তুগাল আফ্রিকায় প্রবেশ করে গজদন্ত, ক্রীতদাস ও স্বর্ণরেণু সংগ্রহ করেছিল। পর্তুগিজদের উচ্চাশা জাগরিত হয়। ১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দে ম্যাগেলান উত্তমাশা অন্তরীপে হাজির হলে ভারতে পৌঁছনোর সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছিল, দশ বছর পরে ভাস্কো-ডা-গামা এই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করেন।

ইউরোপীয়রা নিজেদের লক্ষ্য সামনে রেখে ভারতে অভিযান চালিয়েছিল। আরবদের জন্য প্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্যের ক্ষতি হয়েছে বা প্রাচ্যপণ্যের দাম বেড়েছে এটা আসল কারণ নয়। আরবরা পৃথিবীর বাণিজ্যে স্থান করে নিয়েছিল, দূর বাণিজ্যে তাদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। ইউরোপের সঙ্গে এবং পশ্চিম এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ভারত, পূর্ব আফ্রিকা ও চীনের সঙ্গে তারা বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। তুর্কিরা বাণিজ্য বিরোধী ছিল না। পারস্য উপসাগর হয়ে এশিয়ার বাণিজ্য পণ্য পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে পৌঁছে যেত। লোহিত সাগরের জেদ্দা হয়ে পণ্য যেত কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়ায়। কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী দেশগুলির সঙ্গে আরবদের স্থলপথে বাণিজ্য ছিল। আরব ও তুর্কি শাসকরা বাণিজ্য শুল্ক থেকে রাষ্ট্রের আয় বাড়িয়েছিলেন, এজন্য তাঁরা বাণিজ্য ও বণিককে রক্ষা করতেন। পোপ অখ্রিস্টানদের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ করতে

রামর্শ দিলেও জেনোয়া ও ভেনিসের বণিকরা প্রাচ্যদেশের সঙ্গে বাণিজ্য চালিয়েছিল। ভেনিসের বণিকরা মিশর ও লেভান্টের প্রাচ্যপণ্যে একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করেছিল। এই পণ্য তারা ইউরোপের সব দেশে বিক্রির জন্য নিয়ে যেত। তুর্কিদের সঙ্গে ভেনিসের দীর্ঘস্থায়ী নৌযুদ্ধ চলেছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে বাণিজ্য বন্ধ হয়নি। ইউরোপে ভেনিসের শত্রু ছিল জেনোয়া। জেনোয়া প্রাচ্যপণ্য ইউরোপের বাজারে বিক্রি করত, ভেনিসের প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য তাদের ব্যবসায়ের অবনতি হয়। তুর্কিরা ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে কনস্ট্যান্টিনোপল অধিকার করলে জেনোয়ার কৃষ্ণসাগর অঞ্চলের বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এই অঞ্চলে তারা প্রাচ্যপণ্য বিক্রি করত। ভেনিসের সঙ্গে শত্রুতা এবং বাণিজ্যের অবনতির জন্য জেনোয়া পর্তুগাল ও স্পেনকে জাহাজ, অর্থ ও নৌকৌশল দিয়ে ভারতের সমুদ্রপথ আবিষ্কারে সহায়তা করেছিল। ভারতে সমুদ্রপথ আবিষ্কারে রেনেসাঁস ছিল একটি চালিকা শক্তি। রেনেসাঁস পুরনো ধ্যানধারণা বাতিল করেছিল, দুঃসাহসী অভিযান পরিচালনার মানসিকতা তৈরি করে দিয়েছিল। একাদশ শতক থেকে ইউরোপের অর্থনীতির উন্নতি হয়েছিল। ইউরোপে সমৃদ্ধি এলে এখানকার মানুষের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তিত হয়ে যায়, মানুষ বেশি করে মাংস খেত, মাংসের জন্য প্রচুর মশলার প্রয়োজন হয়। ত্রয়োদশ শতক থেকে বেশ কয়েকজন জেনোয়ার বণিক ভারত মহাসাগরে এসেছিল। ভেনিসবাসী নিকোলো কন্টি, বারবোসা ও রুশ দেশীয় নিকিতিন ভারতে এসেছিলেন। পোপ প্রাচ্যের আবিষ্কৃত জমিতে পর্তুগালকে কর্তৃত্ব দেন, খ্রিস্টানধর্ম প্রচার করতে বলেন।

আধুনিক কালের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, ইউরোপ ও এশিয়ার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কাঠামোয় বড় ধরনের পার্থক্য ছিল না। ইউরোপ ও এশিয়ার বণিকরা যে অঞ্চলে বাণিজ্য করত সেখানকার বাজার সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহ করত। এশিয়ার বৃহৎ বণিকরা বাণিজ্য ব্যাপারে খুব উদার ছিল। যে পণ্যে লাভ বেশি হতো সেই পণ্যে তারা বেশি আগ্রহ দেখাত। সেই যুগে বাণিজ্য নিয়ে ফাটকাবাজি অনেক কম ছিল। বড় ব্যবসায়ী ও খুচরো ব্যবসায়ীদের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য ছিল। বড় বণিকরা বাণিজ্যকেন্দ্র ও দূরবর্তী বাণিজ্যে অংশ নিত, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে সমানভাবে সক্রিয় ছিল। ভারতের বড় বণিকরা শুধু বাণিজ্য করত না, তারা ছিল ব্যাঙ্কার, মহাজন ও বীমা ব্যবসায়ী। এদের বাণিজ্যপোত ছিল, তবে পরিবহন ছিল বিশেষ ধরনের বণিকদের ব্যবসা। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ও বন্দরের মধ্যে যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে বণিকরা গুজরাট ও মালাবারের বন্দরে এসে হাজির হতো। গুজরাট, মালাবার ও করমণ্ডলের বন্দরগুলি থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে পণ্য পাঠানো হতো। চীনের জাঙ্ক ও বণিকরা আগে মালাবারে আসত। পঞ্চদশ শতকে মিঙ্ শাসকরা বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলে চীনা বণিকরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে শুধু বাণিজ্য করতে যেত।

জাহাজ পরিবহনের সঙ্গে যুক্ত ছিল দক্ষ আরব, ভারতীয়, মালয়ী ও চীনা নাবিকরা। ভারতীয় জাহাজের ক্যাপ্টেন নাখুদারা খুব দক্ষ ছিল, এরা ভালো বেতন পেত, লভ্যাংশের একটি অংশ তারা পেত। ভারতীয় জাহাজে শুধু ধনী বণিকদের পণ্য থাকত না, ক্ষুদ্র ও মাঝারি বণিকদের পণ্য স্থান পেত। ধনী বণিকরা সাধারণত বন্দরে বসে বাণিজ্য পরিচালনা করত। ভারতীয় বণিকদের বাণিজ্য ছিল প্রধানত পারিবারিক, সম্প্রদায়গত যৌথ বাণিজ্যও ছিল। এডেনে 'করিমি' বণিকদের সংস্থা চীন পর্যন্ত বাণিজ্য করতে যেত। দক্ষিণ ভারতীয় বণিকদের সংস্থা হল 'মণিরমন', এই সংস্থা অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যে সমানভাবে সক্রিয় ছিল।

ভারত মহাসাগরের বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ধনী ইরানীয় বণিক রমিস্ট (Ramist)। তিনি এডেন থেকে চীন পর্যন্ত বাণিজ্য চালাতেন। গামেল অলদিন ইব্রাহিম তিবে একশো খানা জাহাজের মালিক ছিলেন। এই জাহাজগুলি দক্ষিণ ভারত ও দূর প্রাচ্যের বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল। গুজরাটে ধনী বণিকরা হলেন বস্তুপাল ও তেজপাল। তামিলনাড়ুতে চেট্টি বণিকরা ধনী ছিলেন, মালাবারে মারাক্কর এবং বাংলায় ধনী বণিকরা ছিলেন। ইউরোপের চেয়ে এযুগে এশিয়ার বাণিজ্য আয়তনে অনেক বড় ছিল। অনেকে মনে করেন যে এশিয়ার মোট বাণিজ্য ইউরোপের দশগুণ ছিল। বাণিজ্য জগতের কয়েকজন সেরা ধনী বণিক এশিয়াতে ছিলেন। অথচ কয়েকজন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক নির্বিচারে এদের 'ফেরিওয়ালা' বলে উল্লেখ করেছেন। এশিয়ার বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল বহুসংখ্যক বণিক, এদের ব্যবসায়ী কাজকর্ম ছিল বিভিন্ন রকমের, সম্পদ ও উদ্যোগের অভাব ছিল না, অভাব ছিল না বাণিজ্যপোতের। এশিয়া ও ভারতের বণিকরা রাজসমর্থনের ওপর নির্ভরশীল ছিল না। এশিয়ার বাণিজ্য পণ্য নিয়ে বলা হয় যে এটা হলো মূলত সৌখিন পণ্যের ব্যবসা (great and the trifling)। দামি বস্ত্র ও সৌখিন দ্রব্য হলো এই বাণিজ্যের প্রধান পণ্য। ইউরোপ এশিয়া থেকে এধরনের পণ্য আমদানি করত। চীন থেকে রেশম, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে মশলা এবং মধ্যপ্রাচ্য থেকে বস্ত্র ইউরোপ আমদানি করত। ভারত মহাসাগরের বাণিজ্যে বহু ধরনের পণ্যের লেনদেন হতো। এই বাণিজ্যের পণ্য ছিল লবণ, খাদ্যশস্য, চিনি, বস্ত্র, মশলা, ঘোড়া, সৌখিন দ্রব্য ও রেশম। এদের অনেকগুলি হলো নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে খাদ্যশস্য ও বস্ত্রের চাহিদা ছিল, খাদ্যশস্য, লবণ ও চিনির চাহিদা ছিল মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে। জাহাজ পরিবহনের জন্য ভারী মালের প্রয়োজন হতো। চীন ও ভারত ভারী পণ্য, খেজুর, চিনি, ইমারতি দ্রব্য ও কাঠ আমদানি করত। আবহাওয়ার ওপর বাণিজ্য অনেকখানি নির্ভর করত। মধ্যপ্রাচ্যের জাহাজগুলি বর্ষার আগে ভারতীয় বন্দরে পৌঁছে যেত, এখান থেকে পণ্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও চীনে পৌঁছে যেত।

মালাক্কা ছিল এশিয়ার অন্তর্বাণিজ্যের একটি বড় ঘাঁটি। চীনারা জাভা ও সুমাত্রার বাইরে আর যেত না, ভারতীয় ও আরবরা চীন পর্যন্ত যেত। পর্তুগিজদের আগমনের আগে ভারতীয় বাণিজ্য ছিল ব্যাপক আয়তনের এবং পণ্যও ছিল বহু ধরনের। বলা হয় যে ভারতের জাহাজ ও নৌ-পরিবহন বিদ্যা ছিল অনুন্নত, দূরপাল্লার সমুদ্র বাণিজ্যের অনুপযোগী। ভারতীয় বণিকরা ভারত ও এডেনের মধ্যে বাণিজ্য শুরু করেছিল, পূর্ব আফ্রিকা পর্যন্ত তা বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে তাদের নিয়মিত বাণিজ্য ছিল। ভাস্কো-ডা-গামা পূর্ব আফ্রিকার মালিন্দি বন্দর থেকে কালিকট অভিমুখে যাত্রা শুরু করেছিলেন। সেই সময় সেখানে তিনি চারখানি ভারতীয় জাহাজ দেখেছিলেন। ভারতীয়দের ছোট জাহাজ স্বচ্ছন্দে সমুদ্র পাড়ি দিত, বাণিজ্যের কোনো অসুবিধা হতো না। ভারতীয়রা সেলাইকরা ও পেরেক-আঁটা দুধরনের জাহাজ ব্যবহার করত (sewn and nailed ships)। ভারতীয়দের জাহাজগুলি খুব ছোটো ছিল বলা যায় না। জাহাজগুলিতে বেশ কয়েকখানা মাস্তুল থাকত, ৩৫০-৪০০ টন মাল বহন করতে পারত। চীনাদের জাঙ্কগুলি উন্নত ধরনের ছিল, অনেক বেশি মাল বহন করতে পারত। আরবদের 'বুম' (Boom) মডেলের জাহাজগুলি ভারত মহাসাগরে যাতায়াত করত। এই জাহাজগুলির বেশিরভাগ তৈরি হতো গুজরাট ও মালাবার অঞ্চলে। আরব ও ভারতীয়দের জাহাজ ইউরোপীয়দের চেয়ে নিকৃষ্ট মানের ছিল না। আরব ও ভারতীয় নাবিকরা তারা দেখে গভীর সমুদ্রে দিক নির্ণয় করত। কম্পাস কার্ড 'কমল' এজন্য ব্যবহার করা হতো। অজানা সমুদ্রে পাড়ি দেবার জন্য কম্পাসের প্রয়োজন হতো।

এশীয় বাণিজ্যে অংশগ্রহণকারী বণিকরা কতকগুলি প্রথাগত নিয়মকানুন মেনে চলত। এশীয় বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল আরব, ইরানীয়, ইহুদি, আর্মানি ও জেনোয়ার লোকেরা। গুজরাতি বানিয়া, তামিল চেট্টি ও জাভার লোকেরা এই বাণিজ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। শাসকরা বণিক ও বাণিজ্যকে রক্ষা করতেন, বাণিজ্যের পৃথক আইনবিধি তৈরি হয়েছিল। সহনশীল হারে বাণিজ্য শুল্ক ধার্য করা হতো। রাজারা বণিকদের ক্ষতি করতেন না কারণ সেক্ষেত্রে তাঁর সামগ্রিক আয় কমে যাবার সম্ভাবনা ছিল। শাসকরা বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য সমুদ্রবক্ষে অভিযান চালাতেন না, তবে স্থলপথে সম্প্রসারণের সময় তাঁরা বাণিজ্যিক সুবিধার কথা মনে রাখতেন। প্রাচ্যের বাণিজ্যপথ নিরাপদ ছিল না, দস্যু তস্করের উৎপাত ছিল, বাণিজ্যপোত পাহারা দেবার জন্য সশস্ত্র পাহারাদার রাখা হতো। চোল রাজারা জাভা ও সুমাত্রায় নৌঅভিযান চালিয়েছিলেন, চীনা মহানাবিক চেঙ হো পূর্ব আফ্রিকা ও জেদ্দা পর্যন্ত গিয়েছিলেন। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে ভারত মহাসাগরে বাণিজ্যের সমৃদ্ধি ঘটেছিল। পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে এই বাণিজ্য থেকে চীনারা সরে যায়, ইয়েমেনের 'করিমি' বণিকদের অবনতি ঘটে এবং

ইহুদিরা বাণিজ্য বন্ধ করেছিল। তবে ভারত মহাসাগরের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শূন্যতার সৃষ্টি হয়নি (Commercial vacuum)। পশ্চিম ভারতের বাণিজ্যে আরব আধিপত্য ছিল বলা যায় না। তবে এই অঞ্চলের বাণিজ্যে আরবরা ছিল ধনী, উদ্যোগী বণিকগোষ্ঠী। পর্তুগিজরা এশীয় বাণিজ্য দখল করার বাসনা নিয়ে ভারতে এসেছিল, বলপ্রয়োগে এশীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একাধিপত্য স্থাপনের প্রয়াস চালিয়েছিল।

ভাস্কো-ডা-গামা কালিকটে এলে জামোরিন (Zamorin) তাকে কুঠি স্থাপন করে মশলা বাণিজ্য করার অনুমতি দেন। গামা যে মশলা নিয়ে ইউরোপে পৌঁছেছিলেন তার দাম ছিল তার অভিযানের মোট ব্যয়ের ষাটগুণ। পর্তুগালের শাসক এতে খুশী হননি। পর্তুগিজরা প্রাচ্যের মশলা বাণিজ্যে একাধিপত্য স্থাপন করতে চেয়েছিল, আরব বণিকদের বাণিজ্যপোত অনুসন্ধানের দাবি করেছিল। এই নিয়ে আরব বণিকদের সঙ্গে তাদের সংঘাত বাধে, পর্তুগিজ কুঠির অনেকে নিহত হন। পর্তুগিজ জাহাজগুলি এর প্রতিশোধ নেবার জন্য কালিকটের ওপর গুলিবর্ষণ করেছিল। ১৫০২ খ্রিস্টাব্দে ভাস্কো-ডা-গামা পঁচিশখানা জাহাজ সঙ্গে নিয়ে কালিকটে এসেছিলেন এবং কালিকটের জামোরিনের কাছে দাবি করেছিলেন যে সব মুসলিম বণিকদের কালিকট থেকে বিতাড়িত করতে হবে। জামোরিন পর্তুগিজদের এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেন এবং ঘোষণা করেন যে এখানে সকলে বাণিজ্য করার অধিকার পাবে। গামা এর উত্তরে কালিকট আক্রমণ করেন, কোচিন, কুইলন ও অন্যত্র দুর্গ বানিয়ে মালাবারে নিজেদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করেন। ইউরোপীয়দের সঙ্গে ভারতীয়দের দৃষ্টিভঙ্গিতে মৌল পার্থক্য ছিল। ভারতীয়রা বাণিজ্যের ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করত, সকলের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়াস চালাত। সামরিক বাহিনী বাণিজ্যের ব্যাপারে ব্যবহার করার পক্ষপাতী ছিল না। অপরদিকে পর্তুগিজরা ইউরোপীয় বাণিজ্যিক ঐতিহ্য বহন করে নিয়ে এসেছিল। ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল রাজনীতি, সামরিক ও নৌ-অভিযান। এশিয়ার বণিকরা এই ধরনের বাণিজ্যিক কাজকর্মের সঙ্গে পরিচিত ছিল না। মালাবারের ছোটো ছোটো রাজ্যগুলি বাণিজ্যের ওপর নির্ভর করত কিন্তু বাণিজ্যের জন্য যুদ্ধবিগ্রহের পথে পা দিত না। এরা অবাধ বাণিজ্যে বিশ্বাসী ছিল। ভারত মহাসাগরে পর্তুগিজদের ক্রমবর্ধমান শক্তিবৃদ্ধিতে ভীত হয়ে মিশরের সুলতান ভারতে একটি নৌবহর পাঠিয়েছিলেন। গুজরাটের শাসক তাঁর নৌবহর নিয়ে এদের সঙ্গে যোগ দেন। কালিকট, বিজাপুর ও আহম্মদনগরের শাসকরা এই অভিযানে শামিল হন। প্রাথমিক পর্বে এই যৌথ অভিযান খানিকটা সফল হয়েছিল, কিন্তু ১৫০৯ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজ নৌবহর এদের ধ্বংস করে দিয়েছিল। এই জয়ের ফলে ভারত মহাসাগরে পর্তুগিজরা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল। পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল ও লোহিত সাগরে পর্তুগিজরা তাদের বাণিজ্যিক কাজকর্ম বাড়িয়েছিল। অল্পকাল পরে

আলবুকুয়ার্ক প্রাচ্যের গভর্নর নিযুক্ত হয়ে আসেন। তিনি প্রাচ্যের সমগ্র বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে দুর্গ নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। এর সঙ্গে তিনি শক্তিশালী নৌবহর ভারত মহাসাগরে মোতায়েন করেন। নৌপ্রাধান্যের জন্য দুর্গ ও নৌবহর উভয়ের প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেন।

১৫১০ খ্রিস্টাব্দে বিজাপুরের কাছ থেকে গোয়া দখল করে নিয়ে তিনি পর্তুগিজ নৌসাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন করেন। গোয়ার ভৌগোলিক অবস্থান, স্বাভাবিক পোতাশ্রয় ও মালাবারের ওপর আধিপত্য স্থাপনের সুবিধা ইত্যাদির কথা বিবেচনা করে এখানে দুর্গ বানানো হয়। গোয়া গুজরাটের খুব কাছে অবস্থিত। গোয়া হলো প্রাচ্যের পর্তুগিজ রাজধানী ও বাণিজ্যকেন্দ্র। এখান থেকে পর্তুগিজরা বিজাপুরের বন্দর দণ্ড-রাজৌরি ও দাভোলের ওপর আক্রমণ চালাত। শ্রীলঙ্কায় তারা দুর্গ বানিয়েছিল, সুমাত্রার অচিনে দুর্গ বানিয়ে এবং মালাক্কার ওপর আধিপত্য স্থাপন করে পর্তুগিজরা এখানকার মশলা বাণিজ্যে কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিল। লোহিত সাগরের মুখে সোকত্রায় তাদের ঘাঁটি গড়ে উঠেছিল। তারা এডেন দখল করতে পারেনি তবে ওরমুজের শাসকের সঙ্গে চুক্তি করে পারস্য উপসাগরের প্রবেশমুখে ঘাঁটি বানিয়েছিল। পর্তুগিজরা দিউ ও ক্যাম্বের ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের চেষ্টা করেছিল কারণ এই দুই বন্দর দিয়ে লোহিত সাগরের সঙ্গে বাণিজ্য চলত। ১৫২০-২১ খ্রিস্টাব্দে তাদের অভিযান ব্যর্থ হয়ে যায়। অটোমান তুর্কিরা ইউরোপ ও এশিয়ায় আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেছিল। ভিয়েনার ওপর তাদের আক্রমণ পোলদের হস্তক্ষেপের জন্য ব্যর্থ হয়েছিল। তুর্কিরা পারস্যের শাহ্‌কে পরাস্ত করেছিল, সিরিয়া, মিশর ও আরবদেশ জয় করেছিল। এর ফলে ভারত মহাসাগরে তুর্কিদের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল। গুজরাটের সুলতান অটোমান সুলতানের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন। সুলতান পর্তুগিজদের দমনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অটোমান নৌবহর লোহিতসাগর থেকে পর্তুগিজদের বিতাড়িত করেছিল (১৫২৯)। গুজরাটের সুলতানের সাহায্যার্থে তিনি নৌ-অভিযান পাঠিয়েছিলেন। পর্তুগিজরা দমন ও দিউ আক্রমণ করলে গুজরাটের শাসক তাদের পরাস্ত করেন। পর্তুগিজরা গুজরাটের নীচের দিকে চাউল বন্দরটি দখল করেছিল। গুজরাটের বিরুদ্ধে মোগল অভিযান শুরু হলে গুজরাটের শাসক পর্তুগিজদের সাহায্য নিতে বাধ্য হন। পর্তুগিজরা বেসিন অধিকার করেছিল, কিন্তু দিউ দখল করতে পারেনি।

১৫৩৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তুরস্কের সুলতান পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে নৌ-অভিযান পাঠিয়েছিলেন। এই বাহিনীর অধ্যক্ষ মিশরের গভর্নর সুলেমান পাশা দিউ অবরোধ করেন। গুজরাটের শাসকের সঙ্গে পাশার মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি এই অভিযান থেকে সরে যান। পর্তুগিজদের বড় নৌবহর আসছে খবর পেয়ে পাশা অবরোধ তুলে নেন। আরও দুদশক ধরে তুর্কিরা ভারত মহাসাগরে পর্তুগিজদের বিরোধিতা করেছিল।

তুর্কি নৌ-সেনাপতি পেরি রাইস জামোরিনের সাহায্য নিয়ে মস্কট ও ওরমুজের পর্তুগিজ দুর্গ আক্রমণ করেন। ইতিমধ্যে পর্তুগিজরা দমন দখল করেছিল। ১৫৫৪ খ্রিস্টাব্দে তুর্কি আলি রাইস পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে নৌ-অভিযান পরিচালনা করেন। এরপর ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে তুর্কি ও পর্তুগিজরা প্রাচ্যের মশলা বাণিজ্য নিয়ে সমঝোতা করেছিল, আরব সাগরে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে না পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। অটোমান তুর্কিরা ইউরোপের রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, ভারত মহাসাগরে কিছুকাল পর্তুগিজদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। ভারত মহাসাগরের অবাধ বাণিজ্যের দিন শেষ হয়েছিল। মুসলমান বণিকদের একচেটিয়া বাণিজ্য শেষ হয়েছিল। তবে পর্তুগিজরা এই লক্ষ্য পূরণে পুরোপুরি সফল হয়নি। প্রাচ্যপণ্যের বাণিজ্য এবং পশ্চিম এশিয়ার বাণিজ্যের ওপর তাদের একচেটিয়া অধিকার স্থাপিত হয়নি। পর্তুগাল প্রাচ্য দেশ থেকে প্রচুর পণ্য আমদানি করত। কৃষ্ণসাগর, লেভান্ট ও মিশর প্রাচ্যপণ্যের বাণিজ্য বজায় রেখেছিল। পর্তুগালের রাজা প্রাচ্যের পণ্য মশলা, বস্ত্র, রেশম, নীল, তামা, রঙ, সোনা, রুপো ইত্যাদিকে একচেটিয়া বলে ঘোষণা করেন। কোনো বণিক প্রাচ্যের এইসব পণ্যে বাণিজ্য করতে পারত না। ভারত মহাসাগরের অন্য কোনো বণিককে বাণিজ্য করতে হলে পর্তুগিজদের লাইসেন্স (কার্তাজ) নিতে হতো। এটাই হলো ভারত মহাসাগরে পর্তুগিজ নৌসাম্রাজ্য 'এস্টাডো দ্য ইন্ডিয়া'। লোহিত সাগর, পারস্য উপসাগরগামী বা মালক্কাগামী জাহাজকে গোয়ার লাইসেন্স নিতে হতো, শুল্ক দিতে হতো। কোনো জাহাজ বেআইনি পণ্য বহন করলে পর্তুগিজরা তা অনুসন্ধান করে দেখত, প্রয়োজন হলে জাহাজ অধিকার করে নিত।

পর্তুগিজদের এই নৌসাম্রাজ্য তাদের বাণিজ্যের বিস্তার ঘটায়নি। সমুদ্রে ভারতীয় বণিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হলে স্থলবাণিজ্যে তারা তাদের এড়িয়ে চলত, শাসকরা তাদের বাণিজ্যের অধিকার দিত না। তাদের এলাকা থেকে পর্তুগিজদের তাড়িয়ে দিত (They stood to lose more on land than gain on sea.)। পর্তুগিজ নৌসাম্রাজ্যের দুর্বলতা হলো সমগ্র উপকূলভাগ পাহারা দেবার মতো নৌবহর তাদের ছিল না। ওমান, মালাবার ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জলদস্যুরা বণিক ও শাসকদের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে পর্তুগিজ জাহাজের ওপর আক্রমণ চালাত। এজন্য পর্তুগিজরা খুব উদারভাবে 'কার্তাজ' (লাইসেন্স) দিত, মুসলমান বণিকরাও বাদ যেত না। মুসলিম বণিকরা ঘোড়া, বস্ত্র, কাঁচ, গন্ধদ্রব্য ও কফির ব্যবসা করত। এসব পণ্যে বাণিজ্য করার মতো জাহাজ ও অর্থ দুটোর কোনোটাই পর্তুগিজদের ছিল না। বাণিজ্য ও লাভের কথা চিন্তা করে পর্তুগিজরা ধর্মীয় আবেগকে সংযত করেছিল। গোলমরিচ ও মশলার বাণিজ্য তারা একচেটিয়া করতে পারেনি। বেসরকারি পর্তুগিজ বণিকরা এসব পণ্যে রাজার একচেটিয়া অধিকার পছন্দ করেনি। রাজকর্মচারীরা বেসরকারি বণিক, গুজরাটি ও

আরবদের সঙ্গে গোপনে লেনদেন করত। এসব কারণে 'কার্তাজ' ব্যবস্থা ছিল দুর্নীতিগ্রস্ত ও দুর্বল। আরব ও গুজরাতি বণিকরা পর্তুগিজ বিধিনিষেধ এড়িয়ে যেত। পর্তুগিজরা এডেন দখল করতে পারেনি। তুর্কিরা সিরিয়া, মিশর ও আরব জয় করে পারস্য উপসাগর ও পূর্ব ভূমধ্যসাগরের ওপর আধিপত্য স্থাপন করেছিল। পূর্ব দিকে মশলাদ্বীপের ওপর পর্তুগিজদের আধিপত্য দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সুমাত্রার সুলতান আলি মুখায়াত শাহ্ পর্তুগিজ নৌবহরের সঙ্গে সংঘর্ষে জয়ী হন, তিনি আখে (Acheh) বন্দরকে সুরক্ষিত করেন। অটোমান সুলতানের কাছে তিনি সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি তুর্কিদের কাছ থেকে উন্নতমানের কামান পেয়েছিলেন। পর্তুগিজদের অধীন মালাক্কার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আখে বন্দর গড়ে উঠেছিল। মালাক্কার আরব ও গুজরাটি বণিকরা আখে থেকে মশলা সংগ্রহ করে লাক্ষাদ্বীপ হয়ে লোহিত সাগর অঞ্চলে পণ্য পাঠাত, পর্তুগিজ নিয়ন্ত্রিত মালাবার উপকূল তারা এড়িয়ে যেত।

নানা কারণে ভারত মহাসাগরে পর্তুগিজ নৌসাম্রাজ্য এস্টাডো দ্য ইন্ডিয়া এবং তাদের কার্তাজ ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এখানকার আরব, গুজরাটি, তামিল বণিকগোষ্ঠী ছিল সম্পদশালী, তুরস্ক ও সুমাত্রা সামরিকভাবে পর্তুগিজদের প্রতিরোধ করেছিল, তাদের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ছিল। এসব কারণে তাদের নৌসাম্রাজ্যের পরিকল্পনা সফল হয়নি। পর্তুগাল ছিল একটি ক্ষুদ্র দেশ, এর সম্পদ ও জনসংখ্যা ছিল সীমিত। লিসবনে যেসব পণ্য আমদানি করা হতো তা বণ্টনের দায়িত্ব নিত ইতালি ও জার্মানির বণিকরা। এই বাণিজ্যের আর একটি সমস্যা হলো ইউরোপে প্রাচ্য পণ্যের চাহিদা বাড়লেও প্রাচ্যে ইউরোপীয় পণ্যের চাহিদা ছিল না। এজন্য ইউরোপ থেকে মূল্যবান ধাতু রপ্তানি করতে হতো। পর্তুগালের রৌপ্যখনি ছিল না, এজন্য তাদের ইতালি ও জার্মানির ব্যাঙ্কারদের ওপর নির্ভর করতে হতো। পর্তুগালের রাজা আশা করেছিলেন যে পর্তুগাল ভারতের উপকূল বাণিজ্যে যে লাভ করবে তা দিয়ে প্রাচ্যের রপ্তানি পণ্য কিনতে পারবে। বাস্তবে তা সম্ভব হয়নি। এজন্য পর্তুগিজ বাণিজ্যের আয়তন বৃদ্ধি পায়নি, বছরে বারো-তেরোখানি জাহাজ ভারত থেকে পর্তুগালে পণ্য বহন করে নিয়ে যেত। ষোড়শ শতকে এসে অবস্থার আরও পরিবর্তন হয়। পর্তুগিজ বেসরকারি বণিকদের বাণিজ্য বেড়েছিল, সরকারি বাণিজ্য কমেছিল। নতুন পণ্য হলো বস্ত্র ও মূল্যবান পাথর। বেসরকারি বণিকরা এশিয়ায় বাণিজ্য করে রপ্তানি পণ্যের মূল্য সংগ্রহ করত। পর্তুগিজ সরকারি বাণিজ্য পশ্চিমাঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। স্টীনসগার্ড মনে করেন যে পর্তুগিজদের এই বাণিজ্য ছিল প্রধানত অন্যের বাণিজ্যের ওপর শুল্ক স্থাপন করে অর্থ সংগ্রহ করা (redistributive enterprise)। সরকার বাণিজ্যের বিস্তার করেনি, নতুন বাণিজ্য গড়ে তোলেনি। সপ্তদশ শতকে ডাচ ও ইংরেজরা এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটিয়েছিল।

দূরপ্রাচ্যে পর্তুগিজরা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ এবং নতুন বাণিজ্য গঠনে সফল হয়েছিল। তারা করমণ্ডল থেকে বস্ত্র নিয়ে যেত ইন্দোনেশিয়ায় ; এখানে বস্ত্রের বিনিময়ে তারা মশলা কিনত। এখানে একচেটিয়া আধিপত্য তারা স্থাপন করতে পারেনি, কারণ ইন্দোনেশিয়া ও মালয়ের অধিবাসীরা এই বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল। পর্তুগিজরা এখান থেকে মশলা নিয়ে চীনে যেত, কিনত রেশম। জাপানে রেশম বিক্রি করে তার রুপো সংগ্রহ করত। চীনের ম্যাকাও বন্দরে পর্তুগিজদের বাণিজ্য ছিল। ফিলিপিন হয়ে দক্ষিণ আমেরিকার সঙ্গে পর্তুগিজরা বাণিজ্য করত। ফিলিপিনে ভারতীয় সুতিবস্ত্রের চাহিদা ছিল। স্পেন অধিকৃত ফিলিপিনে মুসলমান ও প্রোটেস্টান্টরা প্রবেশ করতে পারত না, এজন্য পর্তুগিজরা খানিকটা সুবিধা পেয়েছিল। পর্তুগিজদের সঙ্গে কিছু আর্মানি ও গুজরাতি বণিক ফিলিপিনে বাণিজ্য করতে যেত। ফিলিপিন থেকে স্পেন ভারতীয় বস্ত্র দক্ষিণ আমেরিকায় নিয়ে যেত। দূরপ্রাচ্যের বাণিজ্যে পর্তুগালের ভালো লাভ হতো, ভারতের মশলা বাণিজ্যের মন্দা তারা এই বাণিজ্য দিয়ে সামলাত। ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পর্তুগিজ ও এশীয় বণিকদের মধ্যে বাণিজ্যিক সমঝোতা হয়েছিল। আরব ও গুজরাতি বণিকরা পর্তুগিজ জাহাজে পণ্য পাঠিয়ে লাভবান হতো, বেসরকারি পর্তুগিজ বণিকরা এশীয় জাহাজ ব্যবহার করে সরকারি একচেটিয়া বাণিজ্যের বিধি-নিষেধ এড়িয়ে যেত।

পর্তুগিজরা প্রাচ্যে বহু স্থানে ফ্যাক্টরি ও গুদামঘর বানিয়েছিল। বাজার ও মূল্যস্তর স্থিতিশীল হয়েছিল। আধুনিক গবেষকরা মনে করেন যে মূল্যস্তরের ওঠানামা ছিল। মূল্যের ওঠানামার সুযোগ নেবার জন্য আরব ও গুজরাতি বণিকরা গুদামঘর বানিয়েছিল। কফি ছিল এধরনের পণ্য, বস্ত্র ও মশলার দাম আগেই নির্ধারিত হয়ে যেত। নিজেদের সংগঠন ও পারিবারিক ব্যবস্থার মাধ্যমে এশীয় বণিকরা পণ্য সংগ্রহ করত। পর্তুগিজরা স্থানীয় শাসকদের মাধ্যমে মালাবার থেকে দাদন প্রথায় গোলমরিচ সংগ্রহের ব্যবস্থা করেছিল। উৎপাদকদের সঙ্গেও সরাসরি যোগাযোগ করত। পর্তুগিজদের এই দাম কমানোর নীতি ফলপ্রসূ হয়নি, প্রতিযোগীদের তারা হঠিয়ে দেবার চেষ্টা করত। মশলার উৎপাদন বাড়লেও কৃষক লাভবান হতো না। পর্তুগিজরা দাবি করত যে তারা হলো 'প্রাচ্যের প্রভু' (lord of the territories of the East)। ভারতের রাজনীতির ওপর পর্তুগিজদের প্রভাব ছিল সামান্য। পর্তুগিজদের সংখ্যা এত কম ছিল যে-কোনো বড় অঞ্চল দখল করে শাসন করার মতো জনবল তাদের ছিল না। এজন্য তারা সমুদ্র উপকূলে দুর্গ ও ঘাঁটি বানিয়ে নিজেদের বাণিজ্য রক্ষা করত, নৌবহর এগুলি পাহারা দিত। উপকূলের ক্ষুদ্র শাসকদের ভয় দেখিয়ে (কালিকট, কোচিন, ক্র্যাকনোর) তারা রপ্তানি পণ্য মশলা সংগ্রহ করত।

প্রাচ্যে পর্তুগিজদের সদর কার্যালয় ছিল গোয়া। একজন গভর্নর-জেনারেল ও তার কাউন্সিল শাসনের সব দায়িত্ব পালন করতেন। পর্তুগিজদের সংখ্যা কম থাকার জন্য তারা এদেশে বিবাহ করে ইন্দো-পর্তুগিজ সমাজের পত্তন করেছিল। তবে রাষ্ট্র ও সমাজে বৈষম্য ছিল, খাঁটি পর্তুগিজরা শাসনের শীর্ষে ছিল, মিশ্র পর্তুগিজরা ছিল সমাজের নিম্নস্তরে। এরা রাজনৈতিক ক্ষমতা পেত না। খ্রিস্টানদের মধ্যে ধর্মদ্রোহিতা বন্ধ করার জন্য চার্চ পুড়িয়ে মারার ভয়ঙ্কর নীতি অনুসরণ করত (burning at the stake to root out heresy among Christians)। রাজনীতি ও বিশ্ববাণিজ্যে পর্তুগিজদের ভূমিকা ছিল নগণ্য। পর্তুগিজদের সবচেয়ে বড় অবদান হলো প্রাচ্যের জলপথ আবিষ্কার। ভারতের সঙ্গে বিশ্ববাজারের যোগাযোগ স্থাপিত হয়, ভারতে বাজার অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা হয়। কীর্তি চৌধুরী জানিয়েছেন যে পর্তুগিজদের আগমনের ফলে ভারতের সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতা দূর হয়েছিল। দক্ষিণ-আমেরিকার পণ্য আলু, শস্য, আনারস ভারতে প্রবেশ করেছিল, ভারতীয় কৃষক নতুন পণ্যকে গ্রহণ করেছিল। পর্তুগিজদের অধীনে কোচিনে আধুনিক জাহাজ নির্মাণ কারখানা স্থাপিত হয়। পর্তুগিজরা মুদ্রণযন্ত্র, ঘড়ি এসব গোয়াতে এনেছিল, কিন্তু ভারতীয়রা এগুলি সাদরে গ্রহণ করেনি।

পর্তুগালের মতো একটি ক্ষুদ্র দেশ প্রায় একশো বছর ধরে ভারত মহাসাগরে আধিপত্য চালিয়েছিল। সপ্তদশ শতকে ডাচ ও ইংরেজরা এই আধিপত্যের অবসান ঘটিয়েছিল। আরব ও ভারতীয়দের জাহাজগুলি নিম্নমানের ছিল না, এদের পণ্য বহন ক্ষমতাও কম ছিল না। তবে এশিয়ার জাহাজগুলি ছিল কম গতিসম্পন্ন, অপরদিকে পর্তুগিজ ক্যারাভেল ছিল দ্রুত গতিসম্পন্ন এবং সমুদ্রে যাতায়াতের পক্ষে এগুলি বেশ মজবুত ছিল। এগুলি নিয়ন্ত্রণ করা সহজ ছিল। পর্তুগিজ নাবিকদের মনোবল ছিল বেশ দৃঢ়, দুঃসাহসী অভিযানে, যুদ্ধে তারা ভয় পেত না। ভারতের শাসকরা নৌশক্তির গুরুত্ব বোঝেননি। শক্তিশালী নৌবহর গঠন করে সমুদ্রের ওপর আধিপত্য স্থাপনের কথা তাঁরা ভাবেননি। সামরিক ও নৌদক্ষতা পর্তুগিজদের বেশি ছিল। ভারতের শাসকরা উপকূলের কর্তৃত্ব পর্তুগিজদের হাতে ছেড়ে দিয়ে স্থলরাজ্য নিয়ে নিজেদের নিরাপদ বোধ করেন। বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে তাদের যে স্বাভাবিক আয় হতো তাও তেমন কমেনি। এজন্য তাঁরা পর্তুগিজদের সঙ্গে অনিশ্চিত নৌসংঘাতে জড়িয়ে পড়তে চাননি।

ষোড়শ অধ্যায়

আফগান স্বৈরাচার—শেরশাহের শাসন, রাজস্বব্যবস্থা—শেরশাহ্ কি আকবরের পূর্বসূরি ?—মোগল সাম্রাজ্য স্থাপনে বাবরের ভূমিকা—মোগল-আফগান দ্বন্দ্ব—হুমায়ুনের ভাগ্য বিপর্যয়—সুলতানি যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

আফগান স্বৈরাচার

দিল্লি সুলতানির প্রথমদিককার শাসকরা ছিলেন তুর্কি, শেষদিককার লোদি ও শূররা ছিলেন আফগান। আফগান শাসকরা নিজেদের শাসনব্যবস্থা ও ভারতীয় ঐতিহ্যকে মিলিয়ে এক নতুন ধরনের স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠা করেন। তুর্কি স্বৈরাচারের সঙ্গে আফগান স্বৈরাচারের পার্থক্য ছিল। তুর্কিরা ভারতবর্ষকে বিজিত দেশ হিসেবে গণ্য করেছিল, আফগানরা ভারতবর্ষকে নিজেদের দেশ বলে গণ্য করত। তুর্কি অভিজাতরা জনগণ থেকে অনেকটা দূরে ছিলেন, আফগান শাসকরা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নিজেদের মিলিয়েছিলেন। আফগানরা নিজেদের উপজাতি সর্দারদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার মেনে নেন। এই শাসনকে মেনে নিয়ে বিকেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলেন। আফগানিস্তানে রাজতন্ত্র ছিল দুর্বল, বিকেন্দ্রীভূত। ভারতের ক্ষেত্রে আফগান শাসকরা কেন্দ্রীভূত স্বৈরাচার গড়ে তোলেন, উপজাতি সর্দাররা সার্বভৌমত্বের অংশীদার ছিল না। উপজাতি জীবন ভিত্তিক বিকেন্দ্রীভূত শাসন ভারতের পক্ষে উপযুক্ত হতো না। আফগান শাসকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন শূর বংশীয় শাসক শেরশাহ্। তিনি শুধু আফগান শাসকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নন, তিনি হলেন অনেকের মতে মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক। তাঁর জীবনীকার কানুনগোর মতে, শেরশাহ্ প্রতিভা ও শাসন দক্ষতায় আকবর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি মাত্র পাঁচবছর (১৫৪০-১৫৪৫) শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি শুধু বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করেননি, এর সুশাসনের জন্য বিস্তৃত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গঠন করেন। তাঁর সাম্রাজ্যের মধ্যে ছিল প্রায় সমগ্র উত্তর ভারত, শুধু আসাম, কাশ্মীর ও গুজরাট তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল না। পূর্বে সোনারগাঁ থেকে পশ্চিমে খোক্করদের দেশ, উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বতমালা পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

এই বিশাল সাম্রাজ্য শাসনের জন্য শেরশাহ্ নতুন রাষ্ট্রাদর্শ প্রবর্তন করেন। আফগান স্বৈরাচারের নতুন বৈশিষ্ট্য হলো শুধু শাসন, আইন-শৃঙ্খলারক্ষা, করস্থাপন ও কর

আদায়ের ওপর জোর দেওয়া হয়নি। এই স্বৈরাচারের আদর্শ হলো জনগণের মঙ্গলসাধন এবং জনকল্যাণকর কাজ করা। শেরশাহ্ উত্তর ভারতের প্রচলিত শাসনের কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটাননি। পুরনো প্রশাসনিক কাঠামোকে তাঁর প্রতিভাবলে জনকল্যাণমূলক কাজের উপযুক্ত করে তুলেছিলেন। পূর্ববর্তী শাসকদের মতো আফগান শাসকরা স্বৈরাচারী ছিলেন; এই স্বৈরাচার কেন্দ্রীভূত শাসন গড়ে তুলেছিল। শাসনব্যবস্থার প্রধান ছিলেন সুলতান। আফগান শাসক শেরশাহ্ স্বৈরাচারী হলেও ছিলেন উদারচেতা ও জ্ঞানদীপ্ত শাসক, জনগণের মঙ্গলের জন্য শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন। শাসনের ব্যাপারে তিনি ধর্মনিরপেক্ষ উদারনীতি অনুসরণ করেন, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তিনি শাসন করতেন। এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন মহামতি আকবরের পথ প্রদর্শক। কেন্দ্রীয় শাসনকে তিনি কয়েকটি বিভাগে ভাগ করেছিলেন, বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনার জন্য মন্ত্রীরা ছিলেন। কিন্তু মন্ত্রীরা স্বাধীনভাবে দপ্তর পরিচালনা করতে পারতেন না, স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার তাদের ছিল না। কার্যত শেরশাহের মন্ত্রীরা ছিলেন তাঁর সচিব। দিল্লির সুলতানদের মতো আফগান শাসকদের শাসন চারটি বিভাগে বিভক্ত ছিল— দেওয়ান-ই-উজিরাৎ, দেওয়ান-ই-আরজ, দেওয়ান-ই-রিসালত ও দেওয়ান-ই-ইন্‌সা। উজির ছিলেন অর্থদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, দেওয়ান-ই-আরজ ছিল যুদ্ধ বিভাগ। দেওয়ান-ই-রিসালত হলো পররাষ্ট্র দপ্তর আর দেওয়ান-ই-ইন্‌সা ছিল যোগাযোগ দপ্তর। এরা ছাড়া বিচার ও গোয়েন্দা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকরা ছিলেন। প্রধান কাজী ছিলেন বিচার বিভাগের প্রধান, গোয়েন্দা দপ্তরের প্রধান ছিলেন দেওয়ান-ই-বারিদ। দেওয়ান-ই-বারিদ ডাক বিভাগের প্রধান হিসেবেও কাজ করতেন।

শেরশাহের সময় থেকে ভারতে প্রাদেশিক সুবা (ইক্‌তা) কেন্দ্রিক শাসন গড়ে উঠতে থাকে। এরই পরিণত রূপ হলো আকবরের সুবা কেন্দ্রিক শাসন। শেরশাহ্ আজমীর, পাঞ্জাব ও মালবে সামরিক গভর্নর নিযুক্ত করেন। প্রদেশগুলিকে সরকারে ভাগ করে তিনি বেসামরিক অফিসারদের হাতে শাসনভার দেন। সরকারগুলিকে পরগণায় ভাগ করা হয়, কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি পরগণা গঠন করা হতো। প্রত্যেক সরকারে বিচারকার্য, রাজস্ব ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যথাক্রমে কাজী, মুন্সেফ ও শিকদার ছিলেন। শিকদার ফৌজদারি মামলা ও মুন্সেফ দেওয়ানি মামলা নিষ্পত্তি করতে পারত। প্রত্যেক পরগণায় শিকদার, মুন্সেফ, আমিন ও কারকুনরা ছিলেন। অনেক সময় এদের সঙ্গে একজন করে কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হতো। শেরশাহ্ সরকারি কর্মচারীদের দুই বা তিন বছর অন্তর বদলি করে দিতেন। গ্রামে পঞ্চায়েত ছিল। বংশানুক্রমিক চৌকিদার ও পাটোয়ারিরা পঞ্চায়েতের সাহায্য নিয়ে রাজস্ব সংগ্রহ, শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জলসেচ ব্যবস্থা ইত্যাদির তদারকি করত। পঞ্চায়েতগুলি ছোটখাটো মামলার বিচার করতে পারত।

স্বৈরাচারের ভিত্তি হলো সৈন্যবাহিনী, সব স্বৈরাচারী শাসকের মতো শেরশাহ্ কেন্দ্রীয় সৈন্যবাহিনীর গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। আফগান উপজাতি সর্দারদের নেতৃত্বে গঠিত সৈন্যবাহিনীর দুর্বলতার কথা তিনি জানতেন। এজন্য তিনি সুলতান আলাউদ্দিনের মতো নিজের অধীনে কেন্দ্রীয় সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। এই বাহিনীর অফিসাররা জাগির পেত, সৈন্যরা রাজকোষ থেকে নগদ বেতন পেত। এই বাহিনীর নিয়োগ, শিক্ষা, অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ ও পরিচালনার ওপর সুলতান নজর রাখতেন। সুলতানের একজন যুদ্ধমন্ত্রী ছিলেন। আলাউদ্দিনকে অনুসরণ করে শেরশাহ্ সামরিক বিভাগে 'দাগ' ও 'হুলিয়া' প্রথার প্রবর্তন করেন। সরকারি ঘোড়াগুলিতে 'দাগ' দিয়ে চিহ্নিত করা হতো এবং সৈনিকদের বিবরণ (হুলিয়া) সরকারি দপ্তরে নথিবদ্ধ করে রাখা হতো। তাঁর এই ব্যবস্থার ফলে সামরিক বিভাগের দুর্নীতি দূর হয়, শৃঙ্খলা ফিরে আসে। শেরশাহ্ দ্রুতগামী অশ্বারোহী বাহিনী পছন্দ করতেন। তাঁর সৈন্যবাহিনীতে দেড় লক্ষ অশ্বারোহী, পঁচিশ হাজার পদাতিক ও তিনশো হাতি ছিল। পদাতিক বাহিনীকে তিনি ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করেন। তাঁর বাহিনীতে সবচেয়ে দুর্বল অঙ্গ ছিল গোলন্দাজ বাহিনী। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সৈন্যবাহিনী রাখার ব্যবস্থা করে তিনি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করেন। শেরশাহের ব্যবস্থার ফলে সৈন্যবাহিনীর দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, বিদ্রোহের সম্ভাবনা দূর হয়, সাম্রাজ্য নিরাপদ হয়।

আফগান স্বৈরাচারের এক উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য হলো ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠা। তিনি নিজে বিচার বিভাগের প্রধান ছিলেন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে তিনি জনগণের শ্রদ্ধা অর্জন করেন। সুলতানের অধীনে প্রধান কাজী প্রধান বিচারক হিসেবে কাজ করতেন। বিচারের ক্ষেত্রে শেরশাহ্ ধনী-নির্ধন, অভিজাত-অনভিজাত, আত্মীয়-অনাত্মীয় ভেদাভেদ করতেন না। প্রধান কাজীর অধীনে জেলা শহর ও অন্যান্য শহরে কাজীরা ছিলেন। কাজীরা ছাড়াও শিকদার ও মুন্সেফরা বিচারের কাজ করতেন। শেরশাহ্ বিচারব্যবস্থার মাধ্যমে শোষিত, নির্যাতিত মানুষদের রক্ষার চেষ্টা করতেন। সরকারি কর্মচারী ও ধনীদের প্রতি তিনি কঠোর ছিলেন, অপরাধ করলে তাঁর নিকট আত্মীয়রা রেহাই পেত না।

শেরশাহের পুলিশী ব্যবস্থা ছিল শান্তির প্রহরী। সেযুগে আলাদা পুলিশ বিভাগ ছিল না, সাধারণভাবে সৈন্যবাহিনী দেশের শান্তিরক্ষার কাজ করত। সরকার ও পরগণায় শিকদার শান্তি রক্ষার কাজ করত। শেরশাহ্ স্থানীয় অপরাধের জন্য স্থানীয় দায়িত্ব নীতি (local responsibility for local crime) প্রবর্তন করেন। একটি অঞ্চলের প্রধান সেই অঞ্চলের শান্তিরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করত। কোনো অপরাধের ঘটনা ঘটলে স্থানীয় কর্মচারীকে তার জন্য দায়ী করা হতো। মধ্যযুগের সব ঐতিহাসিক শেরশাহের পুলিশী ব্যবস্থার প্রশংসা করেছেন। আব্বাস সারওয়ানি ও ফিরিস্তা উভয়ে জানিয়েছেন যে শেরশাহের শাসনকালে জননিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা এত সুন্দর ছিল যে বণিক তার

পণ্যাদি পথপার্শ্বে রেখে নির্ভয়ে নিদ্রা যেত। শেরশাহ্ দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছিলেন। কয়েকটি বড় বড় রাজপথ নির্মাণ করে তিনি রাজধানীর সঙ্গে প্রদেশগুলির যোগাযোগের ব্যবস্থা করেন। তাঁর এই ব্যবস্থার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহন ও যোগাযোগের উন্নতি হয়। শেরশাহ্ চারটি বড় রাজপথ নির্মাণ করেন। বাংলার সোনারগাঁ থেকে সিন্ধু পর্যন্ত বিস্তৃত গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড হলো প্রধান। রাজধানী থেকে চিতোর, আগ্রা থেকে বুরহানপুর এবং লাহোর থেকে মুলতান পর্যন্ত আরো তিনটি বড় রাস্তা তিনি নির্মাণ করেন। পথিকদের সুবিধার জন্য তিনি রাস্তার পাশে বৃক্ষ রোপণ করেন, প্রতি চার মাইল অন্তর পান্থশালা নির্মাণ করে দেন। এই পান্থশালাগুলি সরকারি ডাকচৌকি হিসেবে কাজ করত। সাম্রাজ্যের সমস্ত স্থান থেকে সংবাদ সংগ্রহের তিনি ব্যবস্থা করেন। দারোগা-ই-ডাকচৌকি গুপ্তচরদের তদারকি করত। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সুলতানকে দ্রুত জানানোর ব্যবস্থা ছিল। এজন্য ডাকচৌকিগুলিতে দ্রুতগামী অশ্ব মোতায়েন করে রাখা হতো। শেরশাহের শাসনব্যবস্থার সাফল্যের একটি কারণ হলো তাঁর দক্ষ গুপ্তচর বিভাগ।

শেরশাহ্ মাত্র পাঁচ বছর শাসন করেছিলেন, এই পাঁচ বছর তাঁকে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকতে হয়। তা সত্ত্বেও তিনি শিল্প ও স্থাপত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগের স্বাক্ষর রেখে যান। সাসারামে তাঁর সমাধি, দিল্লিতে নির্মিত তাঁর মসজিদ এবং পাঞ্জাবের রোটাস দুর্গের স্থাপত্য কৌশল তাঁর শিল্পকীর্তির সাক্ষ্য বহন করছে। শেরশাহের জীবনীকার কালিকারঞ্জন কানুনগো লিখেছেন যে শেরশাহ্ শাসক হিসেবে সহনশীল ছিলেন। তিনি যে রাষ্ট্রনীতির সূচনা করেন আকবর তার পরিপূর্ণ রূপ দেন। তিনি জনকল্যাণকে রাষ্ট্রাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন, অনেকে তাঁকে আকবরের পূর্বসূরি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপক পি. শরণ ও আর. পি. ত্রিপাঠী মনে করেন যে, শেরশাহ্ শাসনকার্যে মৌলিকতার স্বাক্ষর রাখেননি। কেন্দ্রীয় শাসন, রাজস্বব্যবস্থা, সৈন্যবাহিনীর সংস্কার সব আলাউদ্দিন প্রবর্তন করেন। শেরশাহ্ পুরনো শাসনব্যবস্থাকে নিজ প্রতিভাবলে উজ্জীবিত করেন। তাঁর প্রতিভার স্পর্শে পুরনো ব্যবস্থা জনকল্যাণকামী হয়ে উঠেছিল, এজন্য তাঁর শাসন স্মরণীয় হয়ে আছে। আফগান স্বৈরাচার স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর হয়ে উঠেছে।

শেরশাহের শাসন

স্যার উলস্‌লি হেগ শেরশাহ্‌কে মুসলমান শাসকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে উল্লেখ করেছেন। এইচ. জি. কীন ও রাসব্রুক উইলিয়ামস তাঁকে ভারতের সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ শাসক বলেছেন। কীন বলেছেন যে শেরশাহ্ ব্রিটিশ শাসকদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আধুনিক ঐতিহাসিক পি. শরণ, আর. পি. ত্রিপাঠী এবং শেরশাহের আধুনিক জীবনীকার কে. আর. কানুনগো তাঁকে মধ্যযুগের একজন শ্রেষ্ঠ শাসক বলে উল্লেখ

করেছেন। কানুনগোর মতে, প্রতিভা এবং শাসন দক্ষতায় তিনি আকবরের চেয়েও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। শেহশাহ্ মাত্র পাঁচ বছর শাসন করেছিলেন (১৫৪০-১৫৪৫)। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি শুধু সাম্রাজ্য স্থাপন করেননি, সুশাসনের জন্য বিস্তৃত শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তাঁর সাম্রাজ্যের মধ্যে ছিল প্রায় সমগ্র উত্তর ভারত, শুধু আসাম, কাশ্মীর ও গুজরাট তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত হয়নি। পূর্বে সোনারগাঁ থেকে পশ্চিমে খোক্করদের দেশ, উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

উত্তর ভারতের বিস্তৃত অঞ্চল শাসনের জন্য তিনি একটি নতুন রাষ্ট্রাদর্শ প্রবর্তন করেন। বলা হয় যে, শেরশাহের রাষ্ট্র হলো আফগান ও তুর্কিদের রাষ্ট্রতত্ত্বের মিশ্রণ (a compromise between the Afghan and Turkish theories of sovereignty.)। আফগানদের মধ্যে সমতা ও স্বাধীনতার আদর্শ ছিল প্রবল। শেরশাহ্ আফগান সর্দারদের সার্বভৌমত্বের অংশীদার করেননি, আফগান অভিজাতদের ওপর তিনি পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেন। স্বৈরাচারী শাসক হলেও তিনি অধীনস্থ অভিজাতদের সুযোগ-সুবিধা দেন, সৈন্যদের সঙ্গেও তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। তিনি তাঁর অধীনস্থ অভিজাতদের ইক্তা দেন, সৈন্যদের ইক্তা থেকে বেতনদানের ব্যবস্থা করেন। শেরশাহ্ জনকল্যাণের আদর্শ গ্রহণ করেন। আইনশৃঙ্খলা প্রবর্তন করা ছিল তাঁর প্রথম কাজ। সাম্রাজ্যের দুঃস্থ, আর্ত, পীড়িত মানুষদের হিসেব তৈরি করে রাষ্ট্র থেকে তাদের অনুদানের ব্যবস্থা করেন। বিরাট লঙ্গরখানা স্থাপন করে শেরশাহ্ দরিদ্র ও দুঃস্থদের আহারের ব্যবস্থা করেন। তাঁর প্রাদেশিক শাসকরা ও অভিজাতরা তাঁর আদর্শ অনুসরণ করেন। ধর্মভীরু এই শাসক ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন, কিন্তু তিনি কখনো অসহিষ্ণু ছিলেন না। জিজিয়া তিনি তুলে দেননি, গ্রামে রাজস্বের সঙ্গে জিজিয়া আদায় করা হতো, শহরে পৃথকভাবে অমুসলমানদের জিজিয়া দিতে হতো। তিনি কোনো মন্দির ভাঙেননি, হিন্দু, মুসলিম বিদ্বান ব্যক্তি ও বিদেশী সকলকে তিনি নিষ্কর ভূমি দেন। ইসলাম শাহ্ শাসন সংক্রান্ত বিস্তৃত নির্দেশ দিয়ে উলেমাদের হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা কমিয়ে দেন। হিন্দুরা প্রশাসনে, বিশেষ করে রাজস্ব বিভাগে, উচ্চপদ পেয়েছিল।

শেরশাহ্ শাসনব্যবস্থায় বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটাননি। শাসনের নিম্নতম একক ছিল পরগণা, পরগণা ছিল কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি। প্রত্যেক গ্রামে ছিল একজন মুকাদ্দম (গ্রাম প্রধান), গ্রামের রাজস্বের হিসেব রাখত একজন পাটোয়ারি। এরা সরকারি কর্মচারী ছিল না, তবে সংগৃহীত রাজস্বের একাংশ তারা পারিশ্রমিক হিসেবে পেত। মুকাদ্দম গ্রামের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ করত। পরগণায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ভারপ্রাপ্ত ছিল শিকদার, মুন্সেফ (আমিল) জমি জরিপ করে রাজস্ব ধার্য করত। দুজন করণিক ফার্সি ও হিন্দাবি ভাষায় রাজস্বের হিসেব রাখত। এদের সঙ্গে একজন খাজনাদার (পোদ্দার) থাকত যে সংগৃহীত রাজস্ব জমা রাখত। শেরশাহের সময়ে

আমিলের পদটি ছিল লোভনীয়, সম্ভবত নির্ধারিত রাজস্বের বাইরে তারা কিছু আদায় করত, শেরশাহ্ এদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন না।

পরগণার ওপরে ছিল শিক, এই শিকের নতুন নাম হয় সরকার। সরকারে একজন করে ফৌজদার থাকতেন, মুন্সেফ-ই-মুনসিফান রাজস্ব আদায় ও সংগ্রহের কাজ করত। শেরশাহ্ পুরোপুরি প্রাদেশিক শাসন গঠন করেছিলেন কিনা নিশ্চিত করে বলা যায় না। গোটা সুলতানি যুগে মোগলদের মতো প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা ছিল না। শিকগুলি যুক্ত করে খিত্তা (বিলায়েত) গঠন করা হতো বলে জানা যায়। প্রত্যন্ত অঞ্চলে, বাংলা, পাঞ্জাব ও বিদ্রোহপ্রবণ অঞ্চলে এধরনের প্রশাসনিক কাঠামো ছিল। লাহোর, বিহার, মুলতান, যোধপুর, রণথম্ভোর ও নগরকোট অঞ্চলে সামরিক অফিসার মুক্তা হিসেবে শাসন করত। হায়বত খান ছিলেন পাঞ্জাবের শাসক, হাজি খান ছিলেন মালবে, এবং খাবাশ খান যোধপুর শাসন করতেন। বিদ্রোহের সম্ভাবনা ছিল বলে বাংলাকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছিল। শেরশাহ্ পরগণা, সরকার ইত্যাদির সীমা নির্দিষ্ট করে দেন, মোগলরা এর ওপর বিস্তৃত প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা গঠন করেছিল।

শেরশাহ্ মুঘলদের কেন্দ্রীয় শাসন পছন্দ করতেন না। মুঘলদের ব্যবস্থায় মন্ত্রীদের হাতে প্রচুর ক্ষমতা ছিল, অনেকে দুর্নীতিগ্রস্ত ছিল। শেরশাহের কেন্দ্রীয় সরকারের কাঠামোটি কেমন ছিল নিশ্চিত করে বলা যায় না। শেরশাহ্ কেন্দ্রীয় সরকারের সব ক্ষমতা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করেন। তাঁর মন্ত্রীরা ছিলেন, কিন্তু তাঁরা স্বাধীনভাবে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারত না। সম্ভবত শেরশাহের অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের চারটি বিভাগ ছিল—উজিরাৎ, আরজ, সদর ও রিসালৎ। উজিরাত ছিল রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত, আরজ হলো প্রতিরক্ষা বিভাগ, রিসালৎ পররাষ্ট্র বিভাগ এবং সদর ধর্মসংক্রান্ত নিষ্কর ভূমির তদারকি করত। শেরশাহ্ সামরিক বাহিনী গঠনের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দেন কারণ এটি ছিল তাঁর অতিকেন্দ্রীভূত স্বৈরাচারের ভিত্তি। তিনি সৈন্যদের নিজে নিয়োগ করতেন, দাগ ও হুলিয়া (চেহরা) ব্যবস্থা প্রবর্তন করে সৈন্য বাহিনীতে দুর্নীতি দূর করেন, শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। শেরশাহের অভিজাতরা সম্ভবত নিজেদের অধীনে সৈন্যবাহিনী রাখতেন, ইক্তার আয় থেকে অফিসার ও সৈন্যদের বেতন দেওয়া হতো।

শেরশাহ্ বিচারব্যবস্থার সংগঠন ও ন্যায় বিচারের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। রাষ্ট্র বিচারের ক্ষেত্রে কারও প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না এই ছিল তাঁর নীতি। দুর্বলকে রক্ষা করা হবে সবলের অত্যাচার থেকে। তিনি বলতেন যে ন্যায় বিচার হলো সবচেয়ে বড় ধর্মীয় আচরণ, ধার্মিক ও ধর্মদ্রোহী, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী শাসক সকলে এবিষয়ে একমত (Justice is the most excellent of religious rites, and is

approved alike by the King of infidels and of the faithful.)। শেরশাহের অধীনে শক্তিশালী গুপ্তচর ব্যবস্থা ছিল। কীভাবে বিচারব্যবস্থা চলত সঠিকভাবে জানা যায় না। গ্রামের পঞ্চায়েত ও জাতিসভা হিন্দুদের বিচার করত। জমিদার ও শিকদার ফৌজদারি মামলার বিচার করতেন, শহরে কাজীরা বিচার করতেন। শিকদার ও মুন্সেফরাও বিচার করতেন। শেরশাহ্ সমাজের দুর্বল শ্রেণীকে বিচারব্যবস্থার মাধ্যমে রক্ষার প্রয়াস চালিয়েছিলেন। গ্রামে শেরশাহ্ স্থানীয় অপরাধের জন্য স্থানীয় দায়িত্বের নীতি প্রবর্তন করেন (local responsibility for local crime)। একটি অঞ্চলের শান্তিরক্ষার দায়িত্ব ছিল সেই অঞ্চলের প্রধানের ওপর। সেই অঞ্চলে কোনো অপরাধমূলক ঘটনা ঘটলে স্থানীয় প্রধানকে দায়ী করা হতো। মধ্যযুগের সব ঐতিহাসিক শেরশাহের জননিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার প্রশংসা করেছেন।

অধ্যাপক সতীশচন্দ্র লিখেছেন যে শেরশাহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান হলো যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি। তিনি চারটি বৃহৎ রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন, এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো সোনারগাঁ থেকে সিন্ধু পর্যন্ত প্রসারিত গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড। আগ্রা থেকে চিতোর, আগ্রা থেকে বুরহানপুর এবং লাহোর থেকে মুলতান পর্যন্ত রাস্তাগুলি নির্মাণ করে তিনি যোগাযোগের উন্নতি ঘটিয়েছিলেন। রাস্তার ধারে ধারে তিনি সরাইখানা নির্মাণ করেন, এগুলি সুরক্ষার ব্যবস্থা ছিল, এগুলিকে তিনি ডাকচৌকি হিসেবেও ব্যবহার করেন।

শেরশাহ্ অতিকেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা গঠন করেছিলেন। কোনো প্রতিভাবান শাসক না থাকলে এধরনের শাসনব্যবস্থা সচল রাখা সম্ভব হয় না (such over centralization proved harmful once a masterful man like Shershah had been removed from the scene.)। শেরশাহ্ শাসন কাঠামোর কোনো মৌল পরিবর্তন ঘটাননি, তাঁর আগে আলাউদ্দিন শাসন, রাজস্ব ও সামরিক বিভাগে এধরনের সংস্কার প্রবর্তন করেছিলেন, শেরশাহ্ নিজ প্রতিভাবলে প্রচলিত শাসনব্যবস্থাকে উজ্জীবিত করেছিলেন। তাঁর দক্ষতা ও প্রতিভায় পুরনো ব্যবস্থা জনকল্যাণকামী হয়ে উঠেছিল। শেরশাহ্ স্থাপত্য ও শিল্পের অনুরাগী ছিলেন। সাসারামে তাঁর নিজের সমাধি এবং দিল্লিতে নির্মিত তাঁর শহর ও মসজিদ তাঁর শিল্পানুরাগের পরিচয় বহন করে। শূরদের শাসনকালে মালিক মুহম্মদ জায়সি পদ্মাবত কাব্য রচনা করেন। শিল্পী, সাহিত্যিক ও ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিদের শেরশাহ্ পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

শেরশাহের রাজস্বব্যবস্থা

শেরশাহ্ তাঁর রাজস্বব্যবস্থার জন্য ভারত ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। পরবর্তীকালের শাসকরা তাঁর রাজস্বব্যবস্থার অনুসরণ করেছিলেন। ব্রিটিশ ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার

ওপর তাঁর রাজস্ব নীতির প্রভাব পড়েছিল। বিহারের সাসারামে তিনি পিতার জাগির পরিচালনা করেছিলেন। জমি জরিপ করে রাজস্ব ধার্য করার পদ্ধতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। ১৫৩০-৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বিহারের শাসক হিসেবে কাজ করেছিলেন। ঐ সময় তিনি ভূমিরাজস্ব এবং রাজস্বব্যবস্থার অন্যান্য দিক সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। শেরশাহের সময় রাষ্ট্রীয় আয়ের প্রধান উৎসগুলি হলো ভূমিরাজস্ব, উত্তরাধিকারীহীন সম্পত্তি, বাণিজ্য শুল্ক, টাঁকশালের আয়, লবণ কর, লুণ্ঠিত দ্রব্যের এক পঞ্চমাংশ (খোম), অমুসলমানদের দেয় জিজিয়া, ধনী মুসলমানদের দেয় জাকাত এবং সামন্তরাজাদের দেয় কর। রাষ্ট্রীয় আয়ের বেশিরভাগ ব্যয় হতো সৈন্যবাহিনী, আমলাতন্ত্র, জনহিতকর কাজ এবং প্রাসাদের জন্য। ভূমিরাজস্ব ছাড়াও আবওয়াব নামে স্থানীয় কর ছিল, এগুলি বাণিজ্য, পেশা ও পরিবহন ব্যবস্থার ওপর স্থাপন করা হতো।

শেরশাহের রাজস্বব্যবস্থার প্রধান উৎস ছিল ভূমিরাজস্ব। পিতার জাগির পরিচালনা কালে তিনি বুঝেছিলেন যে রাষ্ট্রের মঙ্গলের ভিত্তি হলো কৃষকশ্রেণী। কৃষক হলো প্রধান উৎপাদক, কৃষকের ক্ষতি করে রাষ্ট্রের উন্নতি ঘটানো যায় না। কৃষির ভিত্তি হলো কৃষক। যদি তারা দুর্দশার মধ্যে থাকে, কৃষির উৎপাদন কমে যাবে, সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের ক্ষতি হবে (I know that the humble raiyats are the pivot of agriculture. If they are happy the cultivation will thrive. If the raiyats are in a bad condition, the agricultural output will diminish.)। শেরশাহ্ রাজস্বব্যবস্থার উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করেন এবং কয়েকটি ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। শেরশাহ্ তাঁর সাম্রাজ্যের কয়েকটি অঞ্চলে যে ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন তাকে রায়তওয়ারি বলা হয়েছে। রাষ্ট্র রাজস্ব ধার্য করে সরাসরি কৃষকের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছিল, তবে সাম্রাজ্যের সর্বত্র এই ধরনের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব হয়নি। মুলতান, মালব ও রাজস্থানে জাগিরদারি ব্যবস্থা ছিল। শেরশাহ্ অনুমানের ওপর নির্ভর করে রাজস্ব ধার্য করা বা উৎপন্ন ফসল রাষ্ট্র ও কৃষকের মধ্যে বণ্টন করার পদ্ধতি অনুসরণ করেননি। গ্রামের সম্পন্ন কৃষক বা গ্রাম প্রধান তার দেয় খাজনা দুর্বলদের ওপর চাপিয়ে দিত। এজন্য শাসক হিসেবে শেরশাহ্ জমি জরিপ করার ওপর জোর দেন, এর সমকালীন নাম হলো জাবত (Zabt)। কৃষি জমির মাপার বিষয়টি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে চালু ছিল। শেরশাহ্ জরিপ পদ্ধতির প্রবর্তন করেননি, তার আগে আলাউদ্দিন খল্‌জি কর্ষিত জমি পরিমাপের ব্যবস্থা করেছিলেন। শেরশাহ্ যে পরিমাপ পদ্ধতির প্রবর্তন করেন তা ছিল একটু স্বতন্ত্র ধরনের। আগেকার পদ্ধতিতে কর্ষিত জমির উৎপন্ন ফসলের সামান্য অংশের হিসেব থেকে পুরো হিসেব তৈরি করা হতো (the crop yield was estimated on the basis of sample cuttings in the sown area.)। শেরশাহ্

জমিকে ভালো, মাঝারি, খারাপ এই তিনভাগে ভাগ করে এদের উৎপাদনের ওপর ভিত্তি করে গড় হিসেব তৈরি করেন। আমিনরা জমি জরিপ করে রাজস্ব ধার্য করতেন আবার রাজস্ব আদায় করতেন। সুলতান আশা করেন যে তারা রাষ্ট্র ও কৃষকের মধ্যে নিরপেক্ষ মধ্যস্থ হিসেবে কাজ করবে (He was to discharge his function as an impartial umpire between the state demanding revenue and the individual raiyats paying it.)।

জমি জরিপ করে শেরশাহ্ প্রত্যেক কৃষকের উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ নির্ধারণ করেন। প্রত্যেক কৃষকের অধীনে কী ধরনের কতখানি জমি আছে তা ঠিক করে নেওয়া হয়। প্রত্যেক কৃষকের গড় উৎপাদন ঠিক করে নিয়ে উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব ধার্য করা হয়। রাজস্বের হার নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। আইন-ই-আকবরী ও মাখযান অনুযায়ী এই হার ছিল এক-তৃতীয়াংশের কম, সম্ভবত এক-চতুর্থাংশ। এই হারে একটি ফসলের উৎপাদন হার (a crop-rate, ray) তৈরি করে রাখা হতো। জমিতে চাষ বসলে রাষ্ট্রের প্রাপ্য নির্ধারণ করা যেত, স্থানীয় হারের নিরিখে রাজস্ব টাকায় ধার্য করা সহজ হতো। কৃষক উৎপন্ন ফসলে বা নগদে খাজনা দিতে পারত, তবে শেরশাহ্ নগদ অর্থে রাজস্ব আদায় পছন্দ করতেন। জমিতে যে ফসল উৎপন্ন হতো সেই অনুযায়ী রাজস্বের হার নির্ধারিত হতো (land was divided into several classes according to the nature of the crops cultivated there in, and the rate of assessment was fixed for every one of them)।[১] সুলতান তাঁর কর্মচারীদের রাজস্ব ধার্যের সময় কৃষকের প্রতি সব ধরনের উদারতা দেখাতে বলেছিলেন। তবে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে তাদের কঠোর হতে বলা হয়। যুদ্ধের সময় সৈন্যবাহিনী যাতে কৃষিক্ষেত্রের ক্ষতি না করে সেদিকে তিনি লক্ষ রেখেছিলেন, এজন্য তিনি ব্যবস্থাও করেছিলেন। যুদ্ধের সময় অশ্বারোহী সৈন্যরা কৃষকের শস্যক্ষেত্র পাহারা দিত। আব্বাস খান জানাচ্ছেন যে-কোনো কারণে কৃষিক্ষেত্রের ক্ষতি হলে তিনি আমিন দিয়ে জরিপ করে রায়তের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে দিতেন। প্রাকৃতিক বিপর্যয় খরা, বন্যা ইত্যাদি কারণে ফসলের ক্ষতি হলে তিনি রাজস্ব মকুবের ব্যবস্থা করতেন।

শেরশাহ্ জমি জরিপের জন্য একটি দেয় হার ধার্য করেন, কৃষক এই নির্দিষ্ট হারে আমিনের প্রাপ্য অর্থ দিত। প্রত্যেক বছর রাজস্ব ধার্যের জন্য জমি জরিপ করা হতো। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন শস্যের দাম তিনি ধার্য করে দেন। এই হারে কৃষক উৎপন্ন ফসলে রাজস্ব দিতে পারত। দেশে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ হতো। এজন্য শেরশাহ্ শস্যের মজুদ

১. পি. শরণ, *স্টাডিজ ইন মিডাইভ্যাল ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি*, পৃ. ৮৫।

তহবিল গঠন করেন, এটি ছিল একধরনের কৃষি বীমা। উৎপন্ন ফসলের ২.৫ শতাংশ (অন্যমতে প্রতি বিঘায় আড়াই সের শস্য) রাষ্ট্র জমা রাখত। বিপর্যয়ের সময় কৃষককে তা ফেরত দেওয়া হতো। কৃষক তার দেয় রাজস্ব দুই কিস্তিতে দিতে পারত। শেরশাহ্ ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় পাট্টা ও কবুলিয়ত প্রথার প্রবর্তন করেন। রাষ্ট্র কৃষকের দেয় রাজস্ব, অধিকার ইত্যাদি উল্লেখ করে যে দলিল দিত তার নাম হলো পাট্টা। আর কৃষক রাষ্ট্রকে দেয় রাজস্ব, দায়দায়িত্ব স্বীকার করে যে দলিল দিত তার নাম কবুলিয়ত। এই লিখিত চুক্তির বাইরে গিয়ে রাষ্ট্র কৃষকের কাছ থেকে বর্ধিত হারে রাজস্ব আদায় করতে পারত না। কৃষক রাষ্ট্রকে আরও দুটি কর দিত—জুঁরিবানা ও মহসিলানা। প্রথমটি হলো জমি জরিপকারীর ফি, দ্বিতীয়টি কর সংগ্রাহকের প্রাপ্য, কৃষকের উৎপন্ন ফসলের ২.৫-৫ শতাংশ ছিল এই দুটি কর।

আবুল ফজল তাঁর আইন-ই-আকবরীতে বলছেন যে শেরশাহ্ ও ইসলাম শাহের আমলে হিন্দুস্তানের রাজস্বব্যবস্থায় স্থায়ী পরিবর্তন ঘটে যায়। আগে অনুমানের ভিত্তিতে রাজস্ব ধার্য করে তা আদায় করা হতো, উৎপন্ন ফসল রাষ্ট্র ও কৃষকের মধ্যে বণ্টিত হতো। এই পদ্ধতির পরিবর্তন হয়, পরিমাপ পদ্ধতির চলন হয়। ইরফান হাবিব আকবরের রাজস্বব্যবস্থার যে বিস্তৃত বর্ণনা রেখেছেন তাতে দেখা যায় সাম্রাজ্যের কয়েকটি স্থিতিশীল অঞ্চলে শুধু জরিপের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছিল। অঞ্চলগুলি হলো দোয়াব, পাঞ্জাব ও মালব, এমনকি এসব অঞ্চলের সব জমি জরিপ করা সম্ভব হয়নি। শেরশাহ্ জাবত বা জরিপের ব্যবস্থা করেছিলেন এটি নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। জমি জরিপ করে তিনি রাজস্ব ধার্য করেছিলেন এজন্য আধুনিক ঐতিহাসিকদের অনেকে তাঁর ব্যবস্থাকে রায়তওয়ারি বলে উল্লেখ করেছেন। ব্রিটিশ আমলে সরকার রায়তের সঙ্গে যে ভূমি বন্দোবস্ত করেছিল তাকে রায়তওয়ারি বলা হয়েছে। আধুনিক গবেষণা প্রমাণ করেছে যে শেরশাহের ব্যবস্থা রায়তওয়ারি ছিল না।[২] কৃষকের দায়দায়িত্ব নির্ধারণের চেষ্টা হয়েছিল ঠিকই কিন্তু কর ধার্য ও সংগ্রহের ক্ষেত্রে স্থানীয় গ্রাম প্রধান ও জমিদারদের সাহায্য নেওয়া হয়। এজন্য তাদের বেতন দেওয়া হতো। শেরশাহ্ মুকাদ্দম ও জমিদারদের সরিয়ে দেননি, কারণ সে-যুগে তা সম্ভব ছিল না। শেরশাহ্ যা করেছিলেন তা হলো তিনি এই মধ্যস্বত্বভোগীদের বেআইনি আদায় সীমিত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

শেরশাহের রাজস্বব্যবস্থার কয়েকটি ত্রুটির কথা ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন। তিনি অনুগত করপ্রদানকারী রায়তের প্রতি সদয় ছিলেন। যেসব জমিদার ও রায়ত আমিলের কাছারিতে হাজিরা দিত না, নিয়মিতভাবে রাজস্ব দিত না, তিনি বলপ্রয়োগে

২. সতীশচন্দ্র, *মিডাইভ্যাল ইন্ডিয়া*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৫।

তাদের দমন করেন! তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হতো, জমিতে নতুন প্রজা বসানো হতো। এই প্রথাগত ধারার তিনি ব্যতিক্রম ছিলেন না। শেরশাহ্ সব কৃষি জমিকে তিনভাগে ভাগ করেছিলেন, কর ধার্য করা হতো গড় উৎপাদনের ওপর ভিত্তি করে। এতে মাঝারি ও খারাপ জমির মালিক কৃষককে অপেক্ষাকৃত বেশি হারে রাজস্ব দিতে হতো। কৃষকের ওপর করের বোঝা নেহাত কম ছিল না। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কৃষিজ পণ্যের দামে হেরফের ছিল, অথচ কৃষককে একই হারে সর্বত্র রাজস্ব দিতে হতো। শেরশাহ্ প্রতিবছর জমি জরিপ করে রাজস্ব ধার্যের ব্যবস্থা করেছিলেন। এতে কৃষক ও রাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারী সকলেরই অসুবিধা হতো। জাগিরদারি অঞ্চলে সুলতান তাঁর রাজস্বব্যবস্থা সম্প্রসারিত করেননি, এজন্য এসব অঞ্চলের কৃষকরা তাঁর সংস্কারের সুবিধা লাভ করেনি। সমকালীন লেখকরা জানিয়েছেন যে রাজস্ব বিভাগে দুর্নীতি ছিল, শেরশাহ্ এসব দুর্নীতি দূর করতে পারেননি, কৃষকশ্রেণী এজন্য অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হতো।

শেরশাহের রাজস্বব্যবস্থা অনেকাংশে সফল হয়েছিল। কৃষকেরা লাভবান হয়েছিল, চাষ বেড়েছিল এবং সাম্রাজ্যের রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল (His salutary reforms benefited the peasants, enhanced cultivation and increased the revenue of the empire)। ব্রিটিশ ভূমিব্যবস্থার সঙ্গে তুলনায় এই ব্যবস্থা নিম্নমানের ছিল না। আকবরের আগে আর কোনো শাসক এরকম উন্নতমানের রাজস্বব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি। তুলনামূলকভাবে তিনি কৃষকদের কাছ থেকে বেশি রাজস্ব আদায় করেননি। যেসব সরকারি কর্মচারী কৃষকদের হয়রানি করত তিনি তাদের শাস্তি দিতেন। কৃষকের স্বার্থরক্ষার জন্য তিনি সদা সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর জীবনীকার কে. আর. কানুনগো লিখেছেন যে, শেরশাহ্ যদি আরও এক বা দুই দশক বাঁচতেন জমিদারশ্রেণী উৎখাত হতো। সমগ্র হিন্দুস্তান এক বিশাল কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হতো, ঝোপ-ঝাড় নির্মূল করে ভারতের পরিশ্রমী কৃষক কৃষির সম্প্রসারণ ঘটাত (Had Shershah been spared for a decade or two more, the Zamindars as a class would have disappeared and Hindustan could have become one vast expanse of arable land without a bush or bramble, cultivated under zealous care of indefatigable farmers.)।

শেরশাহ্ দেশের মুদ্রা ও শুল্ক ব্যবস্থার সংস্কার করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ব্যবস্থা করেছিলেন। শেরশাহের সময়ে দেশের মুদ্রাব্যবস্থার ভয়ানক অবনিত ঘটেছিল, দেশের অর্থনৈতিক কাজকর্মের তুলনায় মুদ্রার সরবরাহ ছিল খুব কম, মুদ্রায় খাদের পরিমাণ বেড়েছিল, বিভিন্ন মুদ্রার মধ্যে বিনিময় হার নির্দিষ্ট ছিল না। শেরশাহ্ নতুন করে মুদ্রাব্যবস্থা গড়ে তোলেন। সোনা ও অন্যান্য ধাতুর মিশ্রিত মুদ্রা তিনি

তুলে দেন। তিনি নতুন করে সোনা, রুপো ও তামার মুদ্রা চালু করেন। এদের মান নির্দিষ্ট করে দেন। তাঁর সোনার মুদ্রার ওজন ছিল ১৬৫.৫ গ্রেন ও রুপোর টাকা ১৭৫ গ্রেন। তিনি অনেক তামার মুদ্রার প্রবর্তন করেন, এদের নাম হলো দাম। রুপোর টাকা ও তামার দামের আধুলি, সিকি, দুআনি, একআনি ইত্যাদি তিনি চালু করেন। সোনা ও রুপোর টাকার মধ্যে বিনিময় হার নির্দিষ্ট করে দেন। ৬৪টি তামার দামের সমান ছিল একটি রুপোর টাকা। সাধারণ মানুষ ও বণিকরা তাঁর মুদ্রাব্যবস্থার সংস্কারের ফলে লাভবান হয়েছিল, বাজারে লেনদেনের ক্ষেত্রে সুবিধা হয়। অসুবিধা ও হয়রানি দূর হয়েছিল। শেরশাহের মুদ্রাব্যবস্থা সারা মোগল যুগে চালু ছিল, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই ব্যবস্থা বজায় রেখেছিল। ব্রিটিশ মুদ্রাব্যবস্থার ভিত্তি ছিল শেরশাহের এই ব্যবস্থা (The reformed system of currency of Shershah lasted throughout the Mughal period, was maintained by the East India Company down to 1835 and is the basis of British currency.)।

শেরশাহ্ বাণিজ্যের উন্নতির জন্য অনেকগুলি শুল্ক তুলে দেন। তিনি মাত্র দুটি স্থান থেকে শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা করেন—আমদানি পণ্য যেস্থানে দেশে প্রবেশ করে সেখানে শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা হয়, আর পণ্য বিক্রয়কেন্দ্র থেকে শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা হয়েছিল। শেরশাহ্ দেশে শান্তি স্থাপন করেছিলেন, তাঁর উন্নত পুলিশী ব্যবস্থা দেশে শান্তি অব্যাহত রেখেছিল। তিনি বণিকদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার নির্দেশ দেন। এতে দেশে শিল্প ও বাণিজ্য উৎসাহিত হয়েছিল, শিল্প ও বাণিজ্য থেকে রাষ্ট্রের আয় বৃদ্ধি পেয়েছিল।

শেরশাহ কি আকবরের পূর্বসূরি?

শূরবংশীয় পাঠান সম্রাট শেরশাহ মোগলদের সরিয়ে পাঁচ বছর দিল্লিতে রাজত্ব করেছিলেন (১৫৪০-১৫৪৫)। আকবর হলেন তৈমুর বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক (১৫৫৬-১৬০৫)। দুজনেই মধ্যযুগের ভারত ইতিহাসের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। এযুগের রাষ্ট্র, ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি সববিষয়ে এঁরা স্থায়ী অবদান রেখে গেছেন। এঁদের কার্যকলাপের ফলে ভারতের মানুষ উন্নততর জীবনের সন্ধান পেয়েছেন। শেরশাহ পূর্বসূরি, আকবর উত্তরসূরি। সাধারণত ইতিহাসের বিভিন্নপর্বে দেখা যায় পূর্বসূরি উত্তরসূরিকে নানাভাবে চিন্তায় ও কাজে প্রভাবিত করে থাকেন। পাঠান শাসক শেরশাহ আকবরকে কতখানি প্রভাবিত করেছেন তা নিয়ে বিতর্কমূলক প্রশ্ন উঠেছে। আদৌ কি আকবর শেরশাহের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, না নিজ প্রতিভাবলে মৌলিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সংস্কার প্রবর্তন করে তিনি মোগল সাম্রাজ্যকে স্থায়িত্ব দেন। শেরশাহ ও আকবর উভয়ে নিজ

নিজ প্রতিভাবলে সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। উত্তরাধিকারসূত্রে পূর্বসূরিদের কাছ থেকে তাঁরা বিশেষ কিছু লাভ করেননি। শাসনের ক্ষেত্রে আকবর শেরশাহের কাছ থেকে কতখানি পেয়েছিলেন সেটাই হল বিচার্য বিষয়।

শেরশাহ ও আকবরের মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল রয়েছে। উভয়ে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রকে ভারতের মাটিতে স্থায়িত্ব দেন। অভিজাততন্ত্রকে উভয়ে দমন করে রাজতন্ত্রকে মর্যাদা ও সম্মানের আসনে বসিয়েছিলেন। অভিজাতদের বিদ্রোহ তাঁরা উভয়ে সাফল্যের সঙ্গে দমন করেন। উভয়ে ছিলেন প্রজাকল্যাণকামী শাসক, জনগণের সুখ-সুবিধার দিকে নজর রেখে এঁরা শাসননীতি নির্ধারণ করেন। ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ অমুসলমান একথা মনে রেখে তাঁরা সমন্বয়বাদী উদার মানবতাবাদী দৃষ্টি গ্রহণ করেন। সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণতা এঁদের প্রভাবিত করেনি, উদার, মানবিক জনকল্যাণকামী মনোভাব নিয়ে তাঁরা শাসন করেছিলেন। জাতি বা ধর্মের ভিত্তিতে তাঁরা দেশ শাসন করেননি, কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করেননি। এক্ষেত্রে আকবর আরো একধাপ এগিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা ভেবেছিলেন। তিনি হিন্দুদের ওপর থেকে বৈষম্যমূলক তীর্থকর, জিজিয়া ইত্যাদি তুলে দেন। হিন্দুদের সমাজে নানা কুসংস্কার ছিল, এগুলি সংস্কারের জন্য তিনি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সতীপ্রথার ওপর বিধিনিষেধ আরোপিত হয়, বিধবাদের পুনর্বিবাহের কথা তিনি বলেছিলেন, জবরদস্তি ধর্মান্তরকরণের তিনি বিরোধী ছিলেন, এমনকি জবরদস্তি ধর্মত্যাগের ক্ষেত্রে তিনি স্বধর্মে ফেরার অনুমতি দেন। এক্ষেত্রে তিনি যুগোত্তীর্ণ রাষ্ট্রনায়ক। সেযুগে সৈন্যবাহিনী রাজস্ব দেয়নি এই অভিযোগে গ্রাম আক্রমণ করে পুরুষদের বন্দী করে মহিলা ও শিশুদের বিক্রি করে দিত। আকবর এই অমানবিক প্রথা বন্ধ করে দেন। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আকবরের স্থায়ী অবদান সর্বাধিক। তিনি ধর্মীয় বিরোধ দূর করে রাষ্ট্রীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য যে উদ্যোগ নেন শেরশাহ্ তা করেননি। শেরশাহ্ চিন্তাভাবনায় এতখানি অগ্রগামী ছিলেন না। সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে আকবর যে পৃষ্ঠপোষকতা দেন শেরশাহ্ তা করে উঠতে পারেননি। এর একটি কারণ হল তিনি মাত্র পাঁচ বছর শাসন ক্ষমতায় ছিলেন আর আকবর ক্ষমতা ভোগ করেন পঞ্চাশ বছর। মানসিকতায় ও চিন্তায় শেরশাহের চেয়ে আকবর অনেকবেশি এগিয়ে ছিলেন। আকবর হলেন ভারত ইতিহাসে যুগান্তরের রাষ্ট্রনায়ক।

সাধারণত মনে করা হয় আকবর শেরশাহের সংস্কারগুলির অনুকরণ করেছিলেন। আবুল ফজল শেরশাহের কৃতিত্বকে লঘু করে দেখিয়েছেন, বলেছেন শেরশাহের সংস্কারগুলি হলো আলাউদ্দিন খল্‌জির সংস্কারের অনুকরণ। আবুল ফজল আরো জানাচ্ছেন যে শেরশাহের দ্বারা আকবর তেমন প্রভাবিত হননি। তিনি ঈশ্বর আদিষ্ট

পুরুষ, নিজ প্রতিভাবলে তিনি মোগল প্রশাসনিক কাঠামো নির্মাণ করেন। আবুল ফজল যাই বলুন, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আকবর শেরশাহের দ্বারা অনেকখানি প্রভাবিত হন। প্রশাসনিক স্তর পরগণা, সরকার ও সুবার ধারণা শেরশাহের শাসন থেকে চলে এসেছিল, আকবর এগুলিকে আরো সম্প্রসারিত ও সুগঠিত রূপ দেন। এগুলি আকবরের সময়ে টিকে ছিল, প্রশাসনিক ও রাজস্ব ইউনিট হিসেবে গণ্য হয়। বলা হয় আকবরের রাজস্ব ব্যবস্থা হল শেরশাহের অবদান। শেরশাহ্ ও আকবরের রাজস্ব ব্যবস্থার মধ্যে মিল সামান্য, অমিলটাই বেশি। শেরশাহ্ যে পাট্টা ও কবুলিয়ত প্রথার প্রবর্তন করেন আকবরের সময়ে তার তেমন চলন ছিল না। জমি জরিপ করার প্রথা আলাউদ্দিনের সময় থেকে চলে এসেছিল। এটি শেরশাহের মৌলিক উদ্ভাবন নয়। শেরশাহের জীবনীকার কালিকারঞ্জন কানুনগো জানিয়েছেন যে শেরশাহ বড় কিছু উদ্ভাবন করেননি, তিনি পুরনো ব্যবস্থাকে কার্যকর করে তোলেন, কৃষির সম্প্রসারণ ঘটিয়েছিলেন। আকবর কৃষির সম্প্রসারণে তেমন উল্লেখযোগ্য বড় ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারেননি। শেরশাহ্ খালসা জমির পরিমাণ বাড়িয়ে রাজকীয় কোষাগারের আয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা করেছিলেন। সম্ভবত আকবর শেরশাহের এই দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ক্রোরি ব্যবস্থার মাধ্যমে খালসার পরিমাণ বাড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু অভিজাতশ্রেণীর আয় কমে যাওয়ায় তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল, আকবর এই ব্যবস্থা বাতিল করে দেন। আকবরের জাবতি ব্যবস্থার সঙ্গে শেরশাহের ভূমি বন্দোবস্তের তেমন মিল নেই। দশ বছরের গড় উৎপাদন ও বাজার মূল্যের গড়ের ওপর তিনি স্থায়ীভাবে রাজস্ব ধার্য করেন। শেরশাহ্ জমি জরিপ করে উৎপন্ন ফসলের ওপর রাজস্ব ধার্যের ব্যবস্থা করেন, পণ্য মূল্যের সঙ্গে শেরশাহ্ কর্তৃক ধার্য রাজস্বের কোনো সম্পর্ক ছিল না। শেরশাহ্ শস্যহানি ঘটলে রাজস্বের একাংশ মকুব করে দিতেন, কৃষককে রাষ্ট্রীয় ঋণ তাকাভি দেবার ব্যবস্থা করেন, আকবর এসব কিছুই করেননি।

শেরশাহ্ সৈন্যবাহিনীর সংস্কার করেছিলেন। রাজবংশের নেতৃত্বে তিনি কেন্দ্রীয় বাহিনী গঠন করেন। সৈন্যদের তিনি নগদ বেতন দিতেন, হুলিয়া ও দাগ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন। আকবরের সঙ্গে তাঁর সামরিক সংস্কারের মিল নেই। আকবর দশমিক পদ্ধতিতে মনসবদারদের অধীনে তাঁর সৈন্যবাহিনী গঠন করেন, শেরশাহের সঙ্গে এর মিল নেই। আকবরের সৈন্যরা সরাসরি রাজকোষ থেকে বেতন পেত না, মনসবদাররা তাদের নির্দিষ্ট জাগিরের আয় থেকে সৈন্যদের বেতন ও ভাতা দিত। শেরশাহের মতো আকবর হুলিয়া ও দাগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এই দুই ব্যবস্থা শেরশাহের উদ্ভাবন নয়, এগুলি প্রথম প্রবর্তন করেন আলাউদ্দিন খলজি। মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কারের ক্ষেত্রে শেরশাহ্ অবশ্যই পথ দেখিয়েছিলেন। সোনা, রুপোর মুদ্রা

ও তামার পয়সার স্থিতিশীল উন্নতমানের মুদ্রা ব্যবস্থা প্রথম চালু করেন শেরশাহ। আকবর এই ব্যবস্থা বজায় রেখেছিলেন, সময়ের সঙ্গে তাল রেখে শিল্পবাণিজ্যের প্রয়োজনে তিনি অনেকবেশি মুদ্রা বাজারে ছেড়েছিলেন। এক্ষেত্রে শেরশাহ্ ছিলেন আকবরের পূর্বসূরি।

শেরশাহ্ শুধু শাসক ছিলেন না, তিনি শিক্ষা ও সংস্কৃতির উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। তিনি শিল্পকে অবহেলা করেননি। তাঁর সময়ে শিক্ষা ও দাতব্য কাজকর্ম অবহেলিত ছিল না। শেরশাহের কার্যকলাপ ছিল অনেকখানি সীমিত। আকবর এই ক্ষেত্রকে অনেকখানি প্রসারিত করে শিক্ষা ও সংস্কৃতির আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে দেন। আকবর ও শেরশাহ্ উভয়ে উদার, মানবতাবাদী ও অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করেন। ধর্মীয় চিন্তার ক্ষেত্রে শেরশাহের চেয়ে আকবর অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিলেন। ধর্মীয় হানাহানি দূর করে আকবর ধর্মীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার কথা ভেবেছিলেন। দীন-ই-ইলাহি হলো তাঁর এই ধর্মীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের ফল। শেরশাহ এধরনের কোনো প্রকল্পের কথা ভাবেননি। এক্ষেত্রে আকবর যুগোত্তীর্ণ রাষ্ট্র নেতা। তাঁর সমকক্ষ কেউ নন। আকবর জাতীয় রাষ্ট্র ও জাতীয় প্রতিষ্ঠান তৈরির কথা ভেবেছিলেন, শেরশাহ্ এধরনের দূরদর্শী, উচ্চতর আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হননি। সুতরাং শেরশাহ্ যে আকবরের পূর্বসূরি একথা জোর দিয়ে বলা যায় না, আবার আকবর শেরশাহের কাছ থেকে কোনোকিছুই পাননি একথাও ঠিক নয়। ঐতিহাসিক সত্যের অবস্থান হলো এই দুই বক্তব্যের মাঝামাঝি স্থানে। সর্বযুগে পূর্ববর্তী শাসক পরবর্তীকালের শাসকদের অল্পবিস্তর প্রভাবিত করে থাকেন, শেরশাহ্ ও আকবরের ক্ষেত্রে ঠিক তাই ঘটেছিল।

মোগল সাম্রাজ্য স্থাপনে বাবরের ভূমিকা

ভিনসেন্ট স্মিথ লিখেছেন যে তাঁর যুগে সমগ্র এশিয়ায় বাবর ছিলেন সবচেয়ে প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব। এশিয়ার যে-কোনো দেশের যে-কোনো শাসকের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা যায়। তারিখ-ই-রশিদির লেখক মির্জা হায়দার বাবরের বহু গুণাবলীর উল্লেখ করেছেন। মানবিকতা, বীরত্ব ও চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্য তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল আকর্ষণীয় এবং উচ্চমানের। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন খুব সাহসী ও অসাধারণ কষ্টসহিষ্ণু। মধ্য এশিয়ায় তিনি সাফল্য লাভ করতে পারেননি, আফগানিস্তানে তাঁর সাফল্য খুব গৌরবজনক ছিল না। ভারতবর্ষ জয় করে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন করে তিনি স্মরণীয় হয়েছেন। আর. পি. ত্রিপাঠী জানিয়েছেন যে বাবর শুধু মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা নন, তিনি এর নীতি ও ঐতিহ্যের সূচনা করে যান।

জাহিরুদ্দিন মহম্মদ বাবর মাত্র এগারো বছর বয়সে মধ্য এশিয়ার ক্ষুদ্র ফারগানা রাজ্যের শাসক হন (১৪৯৪)। বাবরের ধমনীতে এশিয়ার দুই দিগ্বিজয়ী বীরের রক্ত ছিল। পিতার দিক থেকে তৈমুর লঙ্ এবং মাতার দিক থেকে তিনি চিঙ্গিজ খানের বংশের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৪৯৪-১৫০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মধ্য এশিয়ার অশান্ত, উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তাঁকে প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছিল। নিজের রাজ্য ফারগানায় তাঁর আত্মীয়রা তাঁর শত্রু ছিল। তাদের শত্রুতার ফলে বাবর নিজের রাজ্য হারিয়েছিলেন, নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য তিনি দুর্দশার মধ্যে পড়েছিলেন। তৈমুরের রাজধানী সমরকন্দ অধিকার করার জন্য তিনি তিনবার প্রয়াস চালিয়ে ব্যর্থ হন। এই সময় মধ্য এশিয়ার রাজনীতিতে দুই প্রবল প্রতিপক্ষ হলো পারস্যের সাফাবি বংশীয় শাসক শাহ্ ইসমাইল এবং উজবেগ নেতা শাইবানি খান। বাবর পারস্যের সহায়তা নিয়ে উজবেগদের পরাস্ত করার কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু তা বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়নি। ১৫০৩ খ্রিস্টাব্দে আর্চিয়ানের যুদ্ধে তিনি উজবেগদের কাছে পরাস্ত হন।

১৫০৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ মধ্য এশিয়ার উষর প্রান্তরে উদ্দেশ্যহীনভাবে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। এই সময় তাঁর সামনে আকস্মিকভাবে একটি সুযোগ এসেছিল, আফগানিস্তানের উজবেগ শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। এই দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে বাবর প্রায় বিনাবাধায় আফগানিস্তান দখল করে নেন। গজনি ও কাবুল অধিকার করে বাবর মোগল পাদশাহী (বাদশাহী) প্রতিষ্ঠা করেন (১৫০৭)। দিল্লিতে লোদি সাম্রাজ্য অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে দুর্বল হয়ে পড়েছিল, ইব্রাহিম লোদির প্রাদেশিক শাসক ও আত্মীয়রা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। রাণা সঙ্গের নেতৃত্বে রাজপুতরা খানিকটা সংঘবদ্ধ ছিল কিন্তু তাদের মধ্যেও অনৈক্য ছিল। রাজপুত নেতা রাণা সঙ্গ বাবরকে ভারত আক্রমণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ইব্রাহিম লোদির সঙ্গে রাণা সঙ্গের বিরোধ ছিল। ভারতের অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা বাবরকে ভারত জয়ে উৎসাহ জুগিয়েছিল। প্রথম পানিপথের যুদ্ধের আগে বাবর অন্তত চারবার ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। ১৫২৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতের প্রবেশ পথ পাঞ্জাব তিনি দখল করে নেন। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে পানিপথে ইব্রাহিম লোদিকে পরাস্ত ও নিহত করে তিনি দিল্লি ও আগ্রা অধিকার করেন।

ইব্রাহিম লোদি পরাস্ত হলেও ভারতে রাজপুত ও আফগানরা শক্তিশালী ছিল। ইব্রাহিম লোদির ভ্রাতা মাহমুদ লোদি বিচ্ছিন্ন আফগান শক্তিকে সংঘবদ্ধ করার প্রয়াস চালিয়েছিলেন। পানিপথের যুদ্ধের পর রাজপুত নেতা রাণা সঙ্গ দিল্লি দখলের পরিকল্পনা করেন। তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে তৈমুরের মতো বাবর দিল্লি লুণ্ঠন করে দেশে ফিরে যাবেন। তিনি যখন দেখলেন যে বাবর সাম্রাজ্য স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, তিনি আফগানদের সঙ্গে মিলিতভাবে বাবরকে ভারত

থেকে বিতাড়নের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি মাহমুদ লোদিকে দিল্লির সুলতান বলে ঘোষণা করেন। বাবরের সৈন্যবাহিনী আগ্রার নিকটবর্তী বায়ানা, ঢোলপুর, কলপি প্রভৃতি স্থানগুলি দখল করতে উদ্যোগী হলে রাণা সঙ্গ বাধা দিতে এগিয়ে আসেন। রাজপুত প্রতিরোধকে বাবর পানিপথের যুদ্ধের চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। রাজপুতরা ছিল যুদ্ধ কুশলী, আর তাদের নেতা ছিলেন একজন অভিজ্ঞ সমরনায়ক। বাবর তাঁর সৈন্যদের উদ্দীপিত করার জন্য জেহাদ ঘোষণা করেন। ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে *খানুয়ার* যুদ্ধে রাণা সঙ্গকে পরাস্ত করে তিনি 'গাজি' হন। খানুয়ার যুদ্ধের পর মোগল সাম্রাজ্য অনেকখানি নিরাপদ হয়েছিল।

খানুয়ার যুদ্ধের পর বাবর মধ্যপ্রদেশের চান্দেরির রাজা মেদিনী রায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। এই মেদিনী রায় রাণা সঙ্গের সাথে যোগ দিয়েছিলেন। চান্দেরি অধিকার করে তিনি রাজ্য ভুক্ত করে নেন। পূর্ব ভারতের আফগান দলপতিরা বাবরের বিরুদ্ধে জোট বেঁধেছিলেন। মাহমুদ লোদির নেতৃত্বে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের আফগান দলপতিরা সংঘবদ্ধ হয়েছিল, বাংলার শাসক নসরত শাহ্ এদের সঙ্গে যোগ দেন। বাবর পূর্ব ভারতের আফগান দলপতিদের বিরুদ্ধে কূটনীতি ও যুদ্ধ একই সঙ্গে প্রয়োগ করেন। বাংলার শাসক নসরত শাহ্ আফগানদের পক্ষ ত্যাগ করে যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ান। বিহারের কয়েকজন আফগান দলপতি বিনাযুদ্ধে বাবরের বশ্যতা স্বীকার করেন। ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে *ঘর্ঘরার* যুদ্ধে বাবর আফগানদের পরাস্ত করেন। নসরত শাহ্ বাবরের সঙ্গে আপস করেন, বিহারের একাংশ বাবর মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেন। বাকি অংশে আফগান দলপতিরা মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করে স্বশাসনের অধিকার লাভ করেন। ভারতে মোগলদের দুই প্রধান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী রাজপুত ও আফগানরা বাবরের কাছে পরাস্ত হন। পশ্চিম ভারতে আফগানরা ক্ষমতায় থাকলেও মোগলদের আক্রমণ করার মতো শক্তি তাদের ছিল না।

১৫৩০ খ্রিস্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর বাবর আগ্রাতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। সেই সময়কার প্রচলিত জনশ্রুতি হলো হুমায়ুনের আরোগ্য প্রার্থনা করে নিজের জীবন তিনি উৎসর্গ করেন। আসলে শেষ কয়েক বছর তিনি খুবই অসুস্থ ছিলেন। তিনি নিজে জানিয়েছেন যে ১৫২৮-২৯ তিনি অন্তত দুবার অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। দীর্ঘস্থায়ী সামরিক অভিযান, কঠোর শিবির জীবন এবং ভারতের উষ্ণ জলবায়ুর জন্য তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এধরনের উষ্ণ জলবায়ুর মধ্যে থাকতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না। আফগানিস্তান তিনি পছন্দ করেছিলেন, ভারতের অনেক কিছুই তাঁর পছন্দ হয়নি তবু তিনি মনে করেন যে এখন থেকে ভারত হলো তাঁর ভাগ্য, আবাস, তাঁর সাম্রাজ্যের ভিত্তিভূমি। তাঁর অধীনস্থ অনুচরদের অনেকের ভারত ভালো লাগেনি, খানুয়ার যুদ্ধের পর তিনি এদের অনেককে দেশে ফিরে যাবার অনুমতি দেন।

বাবর আফগানিস্তান ও ভারতকে নিয়ে একটি সাম্রাজ্য স্থাপন করেন, এটি হলো অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। প্রাচীনকালে আফগানিস্তান ভারতের অঙ্গ ছিল, মধ্যযুগে একে বলা হতো 'ক্ষুদ্র ভারত'। কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের পর আফগানিস্তান আর ভারত সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল না। আফগানিস্তানের সঙ্গে ভারতের যেটুকু যোগাযোগ ছিল শাহি রাজ্যের পতন হলে তা ছিন্ন হয়ে যায়। গজনির মামুদ শাহি রাজাদের পরাস্ত করে আফগানিস্তান দখল করে নেন। প্রাচীনকাল থেকে বিদেশীরা আফগানিস্তান থেকে ভারতে প্রবেশ করেছে। আফগানিস্তানের ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে বাবর ও তাঁর বংশধররা দুশো বছর ধরে বৈদেশিক আক্রমণ থেকে ভারতকে রক্ষা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, আফগানিস্তানের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকার জন্য মুঘলরা মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল। এই অঞ্চলের শাসক তুরানি, ইরানি, অটোমান ও অন্যান্যরা মোগলদের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রেখেছিল, অনেক সময় মোগলদের সাহায্যও প্রার্থনা করত। বাবর ও তাঁর বংশধররা মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। এই অঞ্চলে দূত পাঠাতেন। বাবরের আগমনের সঙ্গে ভারতের পররাষ্ট্রনীতিতে যেমন পরিবর্তন ঘটে গেল তেমনি সামরিক ধ্যানধারণাও পাল্টে যায়। বাবর হিন্দুকুশের অপর পারে বাদাখশান এমনকি অক্সাস নদী পর্যন্ত প্রভাব বজায় রাখার প্রয়াস চালিয়েছিলেন। মধ্য এশিয়ার উজবেগ নেতা ওবায়দুল্লাহ পারস্যের শাহ্ তাহমাস্পের হাতে পরাস্ত হলে (১৫২৮) বাবর পারস্যের সাহায্য নিয়ে সমরকন্দ অধিকারের কথা ভেবেছিলেন। এই মর্মে তিনি পুত্র হুমায়ুনকে নির্দেশও দিয়েছিলেন। পারস্য সাহায্য দিতে রাজী না হওয়ায় তিনি এই পরিকল্পনা বাতিল করেন।

আফগানিস্তানের ভারতভুক্তির অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য কম নয়। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য বেড়ে গিয়েছিল। বাবর আত্মজীবনীতে লিখছেন ঃ 'ভারত থেকে খোরাসান পর্যন্ত স্থলপথে দুটি বাণিজ্যকেন্দ্র আছে—একটি কাবুল, অপরটি কান্দাহার'। চীন, তুর্কিস্তান, ট্রান্স অক্সিয়ানা থেকে বণিকরা কাশগড়ে বাণিজ্য করতে আসত, সেখান থেকে ক্যারাভান আসত কাবুলে। ইরান ও পশ্চিম এশিয়া থেকে ক্যারাভান আসত কান্দাহারে। বাবর আরো জানিয়েছেন যে কাবুলের বাজারে পাওয়া যায় খোরাসান, তুরস্ক (রুম), ইরাক ও চীনের পণ্য, আর একে বলা যায় হিন্দুস্তানের নিজের বাজার। কাবুল ও কান্দাহার ভারতের অন্তর্ভুক্ত হলে এশিয়ার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারতের ভূমিকা বৃদ্ধি পেয়েছিল, সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বেড়েছিল।

ইব্রাহিম লোদি ও রাণা সঙ্গকে পরাস্ত করে বাবর ভারতের পুরনো রাজনৈতিক ব্যবস্থার পতন ঘটিয়েছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে ভারতে নতুন রাজনৈতিক ভারসাম্য গড়ে উঠেছিল। তিনি নতুন করে ভারতীয় সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। এই সাম্রাজ্য

স্থাপনের কাজ তিনি শেষ করতে পারেননি। হুমায়ুন তাঁর আরব্ধ কাজ এগিয়ে নিয়ে যান, শেরশাহ্ ও আকবর একে পরিণত রূপ দেন। বলা হয় যে বাবর হলেন ভারতে কামান ও বন্দুকের প্রবর্তক। ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে ভারতে বারুদের ব্যবহার শুরু হয়েছিল, চীন থেকে বারুদের প্রযুক্তি ভারতে এসেছিল। দুর্গ প্রাকার উড়িয়ে দেবার জন্য এধরনের বারুদ ব্যবহার করা হতো। কামান ও বন্দুকের গোলা-বারুদ ব্যবহার প্রযুক্তি ইউরোপ থেকে মধ্য এশিয়া হয়ে ভারতে এসেছিল। ইরান ও মধ্য এশিয়ায় এর ব্যবহার হলে বাবর তা দ্রুত আয়ত্ত করেন। বাবর ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে এর প্রথম ব্যবহার করেন, পানিপথ ও খানুয়ার যুদ্ধে তিনি কামান ও বন্দুকের ব্যবহার করেন। এর রাজনৈতিক প্রভাব হলো ছোট রাজ্যগুলি, জমিদার ও অন্যান্যরা বৃহৎ শক্তির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাস্ত হয়, ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন করা সম্ভব হয়। নতুন আগ্নেয়াস্ত্র ভারতে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র গঠনে সহায়ক হয়, তবে যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়।

বাবর ভারতে নতুন সমরকৌশল প্রবর্তন করেন, অটোমান ও উজবেগদের কাছ থেকে তিনি এই সমরকৌশল শিখেছিলেন। সৈন্য সমাবেশের নতুন কৌশল তিনি ভারতে নিয়ে আসেন। পরিখা কেটে সৈন্যবাহিনীকে সুরক্ষিত করা হয়, পার্শ্বদেশ রক্ষার ব্যবস্থা হয় (তুলঘুমা)। নতুন অস্ত্র ও রণকৌশল শুধু বাবরকে জয় এনে দেয়নি তাঁর কুশলী নেতৃত্ব, সংগঠন, সৈন্য সমাবেশ, রণক্ষেত্র নির্বাচন ইত্যাদি তাঁর জয়ের ক্ষেত্র তৈরি করে দেয়। বাবরের আর একটি অবদান হলো তিনি ভারতে শক্তিশালী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। সিকান্দর লোদি ও ইব্রাহিম লোদি শক্তিশালী রাজতন্ত্র স্থাপনের প্রয়াস চালিয়েছিলেন কিন্তু তাঁরা সফল হতে পারেননি, কারণ আফগান উপজাতি সর্দারদের মধ্যে সাম্য ও স্বাধীনতার ঐতিহ্য ছিল। তৈমুর ও চিঙ্গিজের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী বাবর রাজতন্ত্রের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন ছিলেন মোঙ্গল ও ইরানীয় ঐতিহ্য অনুসরণ করে তিনি তাঁর অধীনস্থ বেগদের ওপর পূ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখেন। তারা কখনো নিজেদের রাজার সমকক্ষ বলে মনে করত না রাজতন্ত্রকে এরা দৈবানুগৃহীত বলে স্বীকার করে নিয়ে তার সেবা করত। বাবরের কোনো অভিজাত (বেগ) তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না, বাদশাহ হবার বাসনা পোষণ করেনি বাবর বিস্মিত হলেন যখন জানলেন যে বাংলায় বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার নীতি নেই কোনো ব্যক্তি বাদশাহকে হত্যা করলে আমির, উজির, সৈন্যরা তাকে স্বীকার করে নেয়। বাবর রাজসভায় কঠোর শৃঙ্খলা প্রবর্তন করেন, রাজা ও সভাসদদের অবস্থান নির্ধারিত হয়ে যায়। সব বেগকে সভায় দাঁড়িয়ে থাকতে হতো, কেউ বাদশার সামনে আসন গ্রহণ করতে পারত না। ইব্রাহিম লোদির একজন অভিজাত বিবন বাবরের রাজসভায় বসার অনুমতি চাইলে বাবর বিস্মিত হন।

বাবর ও তাঁর অভিজাতদের মধ্যে অবস্থান ও সম্পর্ক নির্দিষ্ট হলেও তিনি তাদের সঙ্গে সহৃদয় ব্যবহার করতেন। কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার আগে তিনি তাদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন, হুমায়ুনকে তিনি সেই পরামর্শ দেন। তিনি তাঁর বেগদের উদারভাবে পুরস্কার ও পারিতোষিক দিতেন, তাদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত আন্তরিক ও সহজ। আনন্দোৎসবে বাদশাহ্ ও বেগরা একসঙ্গে পানাহার করতেন, নৃত্য, গীত ও কবিতা পাঠের ব্যবস্থা হতো। বাবর মদ্যপান ত্যাগ করার পর তাদের সঙ্গে আফিম খেতেন, তাদের সঙ্গে ঘোড়া নিয়ে খেলা করতেন। বাবর তাঁর বেগদের সঙ্গে দুঃখ ও কষ্ট সমানভাবে ভাগ করে নিতেন। বাবর নিজে ছিলেন খুবই শৃঙ্খলাপরায়ণ ব্যক্তি। যুদ্ধে অযোগ্যতার অভিযোগে তিনি বেগদের পদচ্যুত করে তাদের অধীনস্থ নিষ্কর ভূমি কেড়ে নিতেও কুণ্ঠিত হতেন না। এসব অক্ষম ব্যক্তিদের তিনি প্রকাশ্যে অসম্মান করতে ছাড়তেন না।

বাবর ছিলেন ধর্মভীরু মুসলমান, দিনে পাঁচবার নামাজ পড়তেন, রোজা রাখতেন। নকশাবন্দি সন্ত শেখ ওবায়দুল্লাহ অহররের তিনি ভক্ত ছিলেন। শেখ ভক্তকে শরিয়া মেনে চলতে বলেন, কিন্তু বাবর কখনো সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাব দ্বারা পরিচালিত হননি। মধ্যপ্রাচ্যে রক্ষণশীলদের প্রাধান্য ছিল না, ধর্মের ক্ষেত্রে ব্যক্তি অনেকখানি স্বাধীনতা ভোগ করত। এই অঞ্চলে নারী-পুরুষ প্রায় সকলে মদ্যপান করত, তাতে ধর্মের বিধি-বিধান পালনে কোনো অসুবিধা হতো না। বাবরের অভিভাবক বাবা কুলি কখনো নামাজ পড়তেন না, রোজা রাখতেন না, বাবর নিজেই এই কথা বলেছেন। এই উদার ঐতিহ্যের মধ্যে বাবর পালিত হন। একথা ঠিক বাবর রাজপুতদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন, যুদ্ধে জয়ী হয়ে গাজি উপাধি নেন। এগুলি ছিল তাঁর রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। চান্দেরির মেদিনী রায়ের বিরুদ্ধেও তিনি জেহাদ ঘোষণা করেন। মোঙ্গল ও তৈমুর শাসকরা যুদ্ধে জয়ী হয়ে বিজিত মৃত সৈনিকদের কঙ্কাল একত্র করে বিজয় উৎসব পালন করত। এর আসল উদ্দেশ্য ছিল শত্রুদের মনে ভীতি ও ত্রাস সৃষ্টি করা, বাবর রাজপুত ও আফগানদের বিরুদ্ধে এই ঐতিহ্য অনুসরণ করেন।

বাবর হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছিলেন কি না জানা যায় না। তিনি হিন্দু তীর্থ মথুরার পাশ দিয়ে কয়েকবার গিয়েছিলেন কিন্তু কোনো মন্দির ধ্বংস করেননি । গোয়ালিয়র দুর্গে প্রবেশ করে তিনি মন্দির ও মূর্তি দেখেছিলেন কিন্তু ধ্বংস করেননি। উরবা উপত্যকায় কয়েকটি জৈন মূর্তি তিনি ভাঙার নির্দেশ দেন কারণ এগুলি ছিল সম্পূর্ণ উলঙ্গ। বলা হয়েছে যে তাঁর সময়ে সম্বল ও অযোধ্যায় হিন্দু মন্দির ভেঙে তাঁর প্রাদেশিক শাসকরা মসজিদ বানিয়েছিলেন। সম্বলের গভর্নর ছিলেন মীর হিন্দুবেগ, অযোধ্যার মীর বাকি। তাঁরা বলেছেন যে বাবরের নির্দেশে তাঁরা মসজিদ বানিয়েছেন,

মন্দির ভাঙার কোনো উল্লেখ নেই। সম্ভবত এই মসজিদগুলি সেখানে ছিল, বাবরের গভর্নররা অল্প সময়ের মধ্যে এগুলির সংস্কার করেছিলেন। বাবর ধর্মের ক্ষেত্রে নরমপন্থী ছিলেন, হিন্দুদের বিরুদ্ধে তাঁর কোনো বিদ্বেষমূলক মনোভাব ছিল না। হিন্দু রাজাদের অনেককে তিনি স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেন। পাঞ্জাবে তিনি হাতি গকখরকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেন। বাবর রাণা সঙ্গের উত্তরাধিকারীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করেন। বাবর মোগলদের সাংস্কৃতিক নীতির সূচনা করে যান। তিনি চিত্রকলা, সঙ্গীত, নৃত্য ও কবিতার অনুরাগী ছিলেন। হেরাতের চিত্রশিল্পী বিহাজাদের তিনি প্রশংসা করেন, তাঁর আত্মজীবনীতে বহু কবিতার চরণ ছড়িয়ে আছে। তুর্কি ভাষায় তিনি দিবান রচনা করেন। শেখ ওবায়দুল্লাহ অহররের *ওয়ালাদিয়া রিসালার* তিনি কাব্যানুবাদ করেন।

যেসুগের বিখ্যাত কবিদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, কবি আলিশের নাবইকে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন। আধুনিক উজবেগি তুর্কির তিনি হলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর আত্মজীবনী *তুজুক-ই-বাবরি* হলো বিশ্ব সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। এই গ্রন্থে তিনি শুধু রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিচয় দেননি, প্রকৃতিকে সমানভাবে তুলে ধরেছেন। প্রকৃতি প্রেমিক বাবর সবিস্তারে ভারতের ফল, ফুল, পশু-পাখি উৎপন্ন পণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। ভারতের মানুষের সামাজিক অবস্থা, আচার-আচরণের পরিচয় তুলে ধরেছেন। ফারগানা, সমরকন্দ, কাবুল ও অন্যান্য যেসব দেশ তিনি দেখেছেন তাদের প্রকৃতি ও মানুষজনের বর্ণনা আছে তাঁর আত্মজীবনীতে। মধ্য এশিয়ার ফল, ফুল, পাখি ও ঝরনার কথা আছে। তিনি তাঁর পরিচিত মানুষদের পরিচয় দিতে ভোলেননি। তিনি তাঁর পিতার পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে : 'ছোটখাটো বলিষ্ঠ দেহী, শ্মশ্রুমণ্ডিত গোল মুখ, মাথায় শক্ত করে পাগড়ি বাঁধা।' তাঁর প্রথম অভিভাবক শেখ মির্জা বেগ সম্পর্কে বলেছেন যে তার চেয়ে লোভী মানুষ আর হয় না। তাঁর বহু কুঅভ্যাস ছিল (he was a vicious person and kept catamites)। অনায়াসে বাবর তাঁর নিজের দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন, কিছুই গোপন করেননি।

বাবর রাজার কর্তব্যকে খুব গুরুত্ব দেন। জীবনের শেষদিকে পুত্র হুমায়ুনকে বলেছিলেন যে, রাজার দায়িত্বের মতো বন্ধন আর হয় না, রাজার অবসর নেই। বাবর নব রাজতন্ত্রের ধারণা ভারতে প্রবর্তন করেন। এর ভিত্তি হলো তুর্ক-মোঙ্গল সার্বভৌমত্ব, রাজতন্ত্রের কর্তৃত্ব ও মর্যাদা, ধর্মীয় সহনশীলতা, শিল্প ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা। তিনি প্রচলিত শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন করেননি কারণ তিনি ভারত ও ভারতবাসীকে জানার সুযোগ পাননি। তিনি তাঁর উত্তরাধিকারীদের জন্য নতুন রাষ্ট্রনীতি, শাসননীতি, সমরকৌশল ও সাংস্কৃতিক নীতির সূচনা করে যান।

মোগল-আফগান দ্বন্দ্ব ঃ হুমায়ুনের ভাগ্য বিপর্যয়

১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদিকে পরাস্ত করে বাবর দিল্লি দখল করে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন করেন। বাবর খানুয়ার যুদ্ধে (১৫২৭) রাজপুত ও আফগানদের পরাস্ত করেন। সিকান্দর লোদির পুত্র মাহমুদ লোদি রাজপুতদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। রাজপুতরা পরাস্ত হলেও উত্তরপ্রদেশ, বাংলা ও বিহারে আফগানরা শক্তিশালী ছিল। তারা মোগলদের আধিপত্য মেনে নিতে চায়নি, আফগানদের সামরিক ঐতিহ্য ছিল। দেশের বহু জায়গায় সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে আফগানরা আধিপত্য স্থাপন করেছিল। বাবর ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে ঘর্ঘরার যুদ্ধে পূর্ব ভারতের আফগানদের পরাস্ত করে মোগল শক্তিকে প্রতিষ্ঠা দেন। এরপর তিনি বিহার ও বাংলার আফগানদের সঙ্গে আপস করে চলার নীতি অনুসরণ করেন। বিহারের আফগান দলপতি এবং বাংলার শাসক নসরত শাহের সঙ্গে তিনি রাজনৈতিক বন্দোবস্ত করেন। ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে বাবর যখন মারা যান তখনো মোগল-আফগান দ্বন্দ্বের শেষ হয়নি। গুজরাট ও পূর্ব ভারতে আফগানরা শক্তিশালী রয়ে যায়, বাবরের পুত্র হুমায়ুন এই মোগল-আফগান দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছিলেন। বিহারের আফগান শাসক শেরশাহ্ শূর চৌসা (১৫৩৯) ও বিলগ্রামের যুদ্ধে (১৫৪০) তাঁকে পরাস্ত করেন।

বিলগ্রামের (কনৌজ) যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে হুমায়ুন ভারত ত্যাগ করে পালিয়ে যান। মোগলদের বিতাড়িত করে শেরশাহ্ দিল্লিতে শূর রাজবংশ স্থাপন করেন। এই রাজবংশ পনেরো বছর (১৫৪০-১৫৫৫) রাজত্ব করেছিল। হুমায়ুন পালিয়ে গিয়ে পারস্যে আশ্রয় নেন, ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারতে ফিরে আসেন। শূর শাসক আদিল শাহ্‌কে পরাস্ত করে তিনি পাঞ্জাব ও দিল্লি পুনরুদ্ধার করেন, এর অল্পকাল পরে ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর পুত্র আকবর আফগানদের পরাস্ত করে মোগল সাম্রাজ্যকে নিরাপদ করেন। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১৫৫৬) আদিল শাহের হিন্দু সেনাপতি হিমু তাঁর কাছে পরাস্ত ও নিহত হন। মোগল সম্রাট হুমায়ুন সারাজীবন প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। তাঁর জীবনীকার মির্জা হায়দর লিখেছেন যে তাঁর ওপরে কয়েকজন দুষ্ট ব্যক্তির প্রভাব পড়েছিল। তিনি নিজে কয়েকটি কুঅভ্যাসের শিকার হন। হুমায়ুন আফিম খেতেন, এটি ছিল তাঁর সর্বনাশের প্রথম কারণ। ব্রিটিশ ঐতিহাসিকেরা মির্জা হায়দরকে অনুসরণ করে তাঁকে আফিমসেবী, অদক্ষ, অকর্মণ্য সম্রাট হিসেবে চিত্রিত করেছেন। হুমায়ুনের রাজত্বকালের সমস্যা হলো তাঁর জীবনের সর্বসময়ের নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্য নেই। মধ্য বয়সে তাঁর গতিবিধি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে সন্দেহ ও মতভেদ আছে।

এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে, আফগান নেতা শেরশাহের সঙ্গে সংঘর্ষে তিনি পরাস্ত হন। আধুনিক ঐতিহাসিকরা তাঁর ব্যর্থতার জন্য দুটি কারণকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। একটি হলো তাঁর চারিত্রিক দুর্বলতা, হুমায়ুনের আত্মবিশ্বাস কম ছিল, প্রশাসনিক দক্ষতাও তেমন ছিল না। তাঁর ব্যর্থতার দ্বিতীয় কারণ হলো তাঁর ভ্রাতাদের শত্রুতা। হুমায়ুনের তিনজন ভ্রাতা ছিল—মির্জা কামরান, আসকারি ও হিন্দাল। তৈমুর বংশের প্রথা অনুযায়ী হুমায়ুন তাঁর ভ্রাতাদের মধ্যে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ বণ্টন করে দেন। হুমায়ুনের ভ্রাতারা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ করলেও তিনি তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারেননি। মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন আবেগপ্রবণ ও উদার। ঐতিহাসিকরা দেখিয়েছেন যে হুমায়ুন বিলাসপ্রিয় ছিলেন। গুজরাট জয়ের পর তিনি আমোদ-প্রমোদে অনেক সময় কাটিয়ে দেন, আফগানদের কাছ থেকে গৌড় দখল করে সেখানেও অনাবশ্যক সময় কাটান। শাসন ও সামরিক প্রস্তুতি নিতে তিনি অযথা কালবিলম্ব করেন। ড. আর. পি. ত্রিপাঠী হুমায়ুনের বিরুদ্ধে এসব অভিযোগকে গুরুত্ব দেননি। তিনি জানিয়েছেন যে হুমায়ুন ভ্রাতাদের মধ্যে সাম্রাজ্য বণ্টন না করলে গৃহযুদ্ধ হতো। তাঁর ভ্রাতারা শেষদিকে তাঁর প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন, সাম্রাজ্য শাসনে হুমায়ুনের যোগ্যতা নিয়ে তাঁরা প্রশ্ন তুলেছিলেন। কামরান ও আসকারি তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন, হিন্দাল তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন।

ভ্রাতাদের বিরোধিতা ও বিদ্রোহ হুমায়ুনের পতনের আসল কারণ নয়। বলা হয় যে হুমায়ুন আফিম খেতেন বলে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলেন, একথাও ঠিক নয়। বাবর নিজে আফিম ও মদ দুই-ই খেতেন। হুমায়ুন ছিলেন সাহসী যোদ্ধা। তাঁর ব্যর্থতার আসল কারণ হলো তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী শেরশাহ্ তাঁর চেয়ে যোগ্যতর সেনানায়ক ছিলেন। শেরশাহের অধীনে ছিল একটি সুশিক্ষিত গোলন্দাজ বাহিনী। হুমায়ুনের ব্যর্থতার অন্য কারণ হলো তাঁর আর্থিক দুর্বলতা। বাবরের মৃত্যুর সময় রাজকোষ প্রায় শূন্য ছিল। হুমায়ুনের বদান্যতার জন্য তাঁর আর্থিক সংকট বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি ছিলেন একজন ভাগ্যহীন রাষ্ট্রনায়ক, ভাগ্যদেবী তাঁর প্রতি সুপ্রসন্না ছিলেন না। গুজরাট জয়ের অল্পকাল পরেই তিনি ঐ প্রদেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিলেন। কনৌজের যুদ্ধের (বিলগ্রামের) পূর্বে প্রবল বর্ষায় মোগলদের সামরিক প্রস্তুতি বিপর্যস্ত হয়ে যায়। হুমায়ুনের দুর্বলতা হলো তিনি ব্যক্তি ও পরিস্থিতির যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারতেন না। বাবর ও শেরশাহের মতো তিনি দক্ষ কূটনীতিবিদ্ ছিলেন না।

অধ্যাপক ত্রিপাঠী জানিয়েছেন যে হুমায়ুন নিয়তির সহায়তা পাননি, প্রকৃতি তাঁকে অনেক গুণে বঞ্চিত করেন। মোগল সাম্রাজ্যের অজস্র সমস্যার সমাধান তিনি করতে পারেননি। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী শেরশাহ্ অনেক গুণে ভূষিত ছিলেন। অধ্যাপক শ্রীবাস্তব

তাঁর ব্যর্থতার কারণগুলি উল্লেখ করেছেন। হুমায়ুন রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিকে অবহেলা করেছিলেন, রাজপুতদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের সুযোগ এসেছিল তিনি তা গ্রহণ করেননি। গুজরাট ও মালব জয়ের পর প্রশাসনিক ও সামরিক ব্যবস্থা তিনি নেননি। শেরশাহের উত্থানের আগেই তাঁকে দমন করা উচিত ছিল, তিনি তা করেননি। তাঁর উদার, দয়ালু চরিত্র, সামরিক পরিস্থিতির মূল্যায়নে অক্ষমতা এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থতা তাঁর পতনকে অনিবার্য করে তুলেছিল। একথা অস্বীকার করা যায় না তাঁর মধ্যে নেতৃত্বদানের ক্ষমতার অভাব ছিল। সাম্রাজ্যের অসংখ্য জটিল সমস্যা এবং তাঁর চারিত্রিক দুর্বলতা তাঁর ভাগ্যবিপর্যয়ের জন্য দায়ী ছিল। তিনি মোগল সাম্রাজ্যের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপনে ব্যর্থ হন। লেনপুল এজন্য মন্তব্য করেছেন যে হুমায়ুন জীবনে বারবার হোঁচট খেয়েছেন, সাম্রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়েছেন।

মোগল-আফগান দ্বন্দ্বের শেষপর্ব—মোগলদের সাফল্যের কারণ

ভারতে মোগল ও আফগানদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াই চলেছিল তিনদশক ধরে (১৫২৬-১৫৫৬)। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের পরেও লড়াই শেষ হয়ে যায়নি। উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও বাংলায় আফগানদের শক্ত ঘাঁটি ছিল। আফগানরা এদেশে ছিল তিনশো বছরের অধিককাল, এদেশের জলবায়ু ও ভৌগোলিক পরিবেশের সঙ্গে তারা সুপরিচিত ছিল। মোগলরা ছিল নবাগত, এখানে তাদের কোনো উপনিবেশ ছিল না, মধ্য এশিয়ায় ব্যর্থ হয়ে বাবর ভারতবর্ষ জয়ের কথা ভেবেছিলেন প্রধানত আর্থিক কারণে। এদেশের পরিবেশ ও মানুষজনের সঙ্গে মোগলদের তেমন পরিচয় ছিল না। ঐতিহাসিকদের অনুমান মোগল-আফগান দ্বন্দ্বের শেষপর্বে কমপক্ষে পাঁচ লক্ষ আফগান পরিবার ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করত। অথচ ভাগ্যের পরিহাস হল ক্ষমতার দ্বন্দ্বে আফগানরা পরাস্ত হয়, জয়ী হয় মোগলরা। অধ্যাপক আর. পি. ত্রিপাঠী লিখেছেন যে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে আকবরের জয় হল ঈশ্বরের আশীর্বাদ আর হিমুর পরাজয় হল আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত (His [Himu's] defeat was accidental and the victory of Akbar providential)। শূর শাসনের শেষ পর্বেও আফগানদের অধীনে যথেষ্ট সম্পদ ও লোকজন ছিল। মোগলদের জয় একেবারে নিশ্চিত ছিল না। ঈশ্বরী প্রসাদ লিখেছেন যে মোগলদের জয়লাভ ছিল প্রায় অসম্ভব ব্যাপার (Even in the disruption of the Afghan empire, there were ample resources, both in men and leaders, to have made the reconquest of India by the Mughals a virtual impossibility)।

মোগল-আফগান দ্বন্দ্বের মধ্যে তিনটি পর্ব ছিল। প্রথম পর্বে ভারতের আধিপত্য নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন ইব্রাহিম লোদি এবং মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা

বাবর। ইব্রাহিম লোদী দুর্বল শাসক ছিলেন, তার আত্মীয়রা ছিল বিক্ষুব্ধ, তারাই বাবরকে ভারত আক্রমণ করার জন্য উৎসাহ জুগিয়েছিল। তাছাড়া ইব্রাহিম লোদীর সঙ্গে রাজপুতদের সম্পর্ক ভালো ছিল না, রাণা সংগ্রাম সিংহের সঙ্গে তাঁর সশস্ত্র সংঘর্ষ চলেছিল। রাণা নিজেই বাবরকে লোদী সাম্রাজ্য আক্রমণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। প্রথম পর্বের লড়াইয়ে মোগলরা জয়ী হয়েছিল কারণ বাবর ছিলেন একজন রণনিপুণ সেনাপতি। তাঁর নতুন রণকৌশল তুলঘুমার পাল্টা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা আফগান সেনাপতিরা করতে পারেননি। তাছাড়া তাঁর সঙ্গে ছিল উন্নততর কামান ও বন্দুক। বাবরের গোলন্দাজ বাহিনীর মোকাবিলা করার মতো গোলন্দাজ ও অশ্বারোহী বাহিনী আফগানদের ছিল না। এজন্য ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দের ২১শে এপ্রিল পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদী পরাস্ত হন। এই দ্বন্দ্বের দ্বিতীয় পর্বে প্রতিদ্বন্দ্বীরা হলেন বাবর-পুত্র হুমায়ুন এবং শূর বংশীয় শাসক শেরশাহ্। শেরশাহ হুমায়ুনের চেয়ে অনেক বেশি যোগ্য, দক্ষ শাসক ও সমরনেতা ছিলেন। অপরদিকে হুমায়ুন ভ্রাতাদের সহযোগিতা পাননি, তাঁর তিন ভ্রাতা কামরান, আসকারি ও হিন্দাল তাঁর বিরোধিতায় নেমেছিলেন। শেরশাহের সঙ্গে সংঘর্ষে পরাস্ত হয়ে (কনৌজ ১৫৪০) ভাগ্য বিড়ম্বিত, আশ্রয়হীন হুমায়ুন ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য হন। উত্তর-পশ্চিমে তাঁর ভ্রাতারা তার সঙ্গে শত্রুতায় নামলে তিনি পারস্যে পালিয়ে যান। পারস্যের শাহ তাহমাস্প হুমায়ুনকে আর্থিক ও সামরিক সাহায্য দিতে রাজী হন। তিনি হুমায়ুনের সঙ্গে ১৫৪৪ খ্রিস্টাব্দে একটি চুক্তি করেন। ঐ চুক্তিতে শর্ত ছিল যে হুমায়ুন শিয়া ধর্মমত গ্রহণ করবেন, ভারতে তা প্রচার করবেন এবং কান্দাহার পারস্যকে ফেরত দেবেন। বিপন্ন হুমায়ুন এই চুক্তি গ্রহণ করে পারস্যের শাহের সাহায্য নিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। প্রথমে তিনি কান্দাহার ও কাবুল দখল করে ভ্রাতাদের শাস্তি দেন, এর পর পাঞ্জাব দখল করে হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা করেন।

শূর সাম্রাজ্যের প্রথম দুজন শাসক যোগ্যতার সঙ্গে শাসন করেছিলেন কিন্তু ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর ঐ বংশে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব প্রবল আকার ধারণ করেছিল। সাম্রাজ্য পাঁচভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। আদিল শাহ, ইব্রাহিম শাহ ও সিকান্দর শাহ পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন। রাজ বাহাদুরের অধীনে ছিল মালব আর মহম্মদ খানের অধীনে ছিল বাংলা। ইব্রাহিম শাহ ও সিকান্দর শাহ উভয়ে দিল্লি অধিকার করে সুলতান হতে চেয়েছিলেন, আদিল শাহ চুনারগড়ে (আদালি) গিয়ে আশ্রয় নেন। আদিল শাহ দক্ষ শাসক বা যোগ্য সেনাপতি কোনোটাই ছিলেন না। তিনি বিলাসব্যসন নিয়ে থাকতে ভালোবাসতেন। তাঁর হয়ে প্রশাসনিক ও সামরিক কাজকর্ম সবকিছু দেখাশোনা করতেন তাঁর বিশ্বস্ত মন্ত্রী ও সেনাপতি হিমু। হিমু তাঁর হয়ে বাইশটি যুদ্ধে

জিতেছিলেন। তিনি উপাধি নেন রাজা বিক্রমজিৎ। রাজা উপাধি নিলেও তিনি আদিল শাহের প্রতি অনুগত ছিলেন, স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি।

১৫৫৫-৫৬ হল মোগল-আফগান দ্বন্দ্বের শেষ পর্ব। এই পর্বে হুমায়ুন ও মোগলরা সাফল্য পেলেন পাঞ্জাবের দুটি যুদ্ধে—মাছিওয়াড়া ও সরহিন্দ (১৫৫৫)। এই দুই যুদ্ধের পর মোগল বাহিনী দিল্লি ও আগ্রা অধিকার করেছিল। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে হুমায়ুনের আকস্মিক মৃত্যুর সময় ভারতে মোগল শক্তি যথেষ্ট সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল না। আদিল শাহের মন্ত্রী ও সেনাপতি হিমু মোগল সেনাপতি তারদি বেগকে পরাস্ত করে আবার দিল্লি ও আগ্রা অধিকার করে নেন। আকবর তখন বৈরাম খানের নেতৃত্বে পাঞ্জাবের জলন্ধরে ছিলেন। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৫ই নভেম্বর পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে বৈরাম খানের নেতৃত্বে মোগলরা জয়ী হয়ে মোগল সাম্রাজ্যকে নিরাপদ করেছিল। তবে আবুল ফজল লিখেছেন যে আফগানরা তখনো পরাজয় স্বীকার করে নেয়নি (The Afghans still carried in their brains the vapours of sedition)। আফগানরা সংঘবদ্ধ হয়ে তিনবার জৌনপুর অধিকারের প্রয়াস চালিয়েছিল, উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও বাংলায় তখনো আফগান শক্তি নিঃশেষিত হয়নি। আকবরকে বহুকাল ধরে কূটনীতি ও অস্ত্রের সাহায্যে আফগানদের দমন করতে হয়।

মোগলদের সাফল্যের কারণ

মোগল-আফগান দ্বন্দ্বে শেষপর্যন্ত মোগলরা জয়ী হয়েছিল। ঐতিহাসিকরা এর কারণ খুঁজেছেন, কয়েকটি কারণও উল্লেখ করেছেন। মোগলদের জয়ের প্রথম ও প্রধান কারণ হল আফগানদের মধ্যে অনৈক্য ও পরস্পর বিরোধিতা। আফগানদের মধ্যে উপজাতি ঐতিহ্য একেবারে শেষ হয়ে যায়নি, একজন শাসকের অধীনে ঐক্যবদ্ধ রাজতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠায় তারা ব্যর্থ হয়েছিল। শেরশাহ্ শক্তিশালী রাজতন্ত্র স্থাপন করেছিলেন ঠিকই কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর আফগানদের উপজাতি দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে উঠেছিল, শেরশাহের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বিরোধে তারা হস্তক্ষেপ করেছিল। ইসলাম শাহ্ ও আদিল শাহের মধ্যে দ্বন্দ্ব বহুকাল ধরে চলেছিল। শেরশাহের মনোনীত প্রার্থী ছিলেন আদিল শাহ্ কিন্তু চক্রান্ত করে সিংহাসন দখল করেন ইসলাম শাহ্। তখন থেকেই শূর সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়েছিল। ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর শূর সাম্রাজ্য পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এদের ঐক্যবদ্ধ করে মোগলদের সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব হয়নি। সম্পদ বা লোকজনের ঘাটতি না থাকলেও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জন্য আফগানরা সফল হতে পারেনি। আদিল শাহ্, সিকান্দর শাহ্ ও ইব্রাহিম শাহ্ উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব নিয়ে মেতে ছিলেন, তার সুযোগ নিয়ে হুমায়ুন বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত শূরদের পরাস্ত করে মোগল সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন।

পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে হিমুর পরাজয়ের একটি বড় কারণ হল আফগান অভিজাতরা তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র আফগান দলপতিদের হিমু বিরোধিতাকে তাদের পরাজয়ের একটি কারণ বলে উল্লেখ করেছেন (The defeat of Hemu at the battle field of Panipat was due in part to the disaffection of some of Afghan sardars against him)। মোগলদের সাফল্যের আরো কারণ ছিল। মোগলরা উন্নততর রণকৌশল অনুসরণ করেছিল যার খবর আফগান সেনানায়করা রাখতেন না। এই রণকৌশল (তুলঘুমা) মোগলরা মধ্য এশিয়া থেকে নিয়ে এসেছিল। এই পদ্ধতিতে যুদ্ধ করার জন্য পার্শ্বদেশ সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করতে হত পরিখা কেটে। সামনেও প্রতিরোধ ব্যূহ তৈরি করে গোলন্দাজ বাহিনীকে বাঁচানোর চেষ্টা হতো। তাছাড়া আফগানদের সঙ্গে ভালো গোলন্দাজ বাহিনী ছিল না। হিমুর সঙ্গে যে গোলন্দাজ বাহিনী ছিল তা মোগলরা আগেই দখল করে নিয়েছিল। গোলন্দাজ বাহিনী ছাড়াই হিমুকে পানিপথে যুদ্ধ করতে হয়েছিল (Hemu's disregard of artillery which he had earlier carelessly allowed the Mughals to capture)। গোলন্দাজ বাহিনী ছাড়া মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হওয়া ছিল অসম্ভব ব্যাপার।

মোগলদের সাফল্যের অন্য কারণ হল তারা দ্রুতগামী অশ্বারোহী বাহিনীর ওপর নির্ভর করেছিল। এই অশ্বারোহীরা ছিল দক্ষ তীরন্দাজ, এদের ছোঁড়া একটি তীরে হিমুর চক্ষু বিদ্ধ হয় এবং তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তিনি ধৃত ও বন্দী হন। যুদ্ধের গতি মোগলদের পক্ষে চলে যায়। আফগানরা হস্তিবাহিনীর ওপর বেশি জোর দিয়েছিল যা ফলপ্রসূ হয়নি। হাতি নিয়ে যুদ্ধ করে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে অনেক ভারতীয় রাজা পরাস্ত হয়েছেন। হিমুও হস্তিবাহিনীর ওপর অতিরিক্ত নির্ভর করে নিজের পতন ডেকে আনেন। মোগলদের গোলন্দাজ বাহিনী, ভারী কামান, নতুন রণকৌশল, দক্ষ অশ্বারোহী বাহিনী এবং সর্বোপরি বৈরাম খানের দক্ষ নেতৃত্ব তাদের জয় এনে দিয়েছিল। অস্বীকার করা যায় না নিয়তির সহায়তা মোগলদের পক্ষে ছিল। আবুল ফজলের মতে, আকবর হলেন ঈশ্বরের আশীর্বাদপুষ্ট শাসক। নিয়তির সহায়তা আফগানরা পায়নি।

সুলতানি যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। যে-কোনো দেশের ইতিহাসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। সবদেশে সর্বযুগে মানুষের জীবনযাত্রার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। এবিষয়ে পরিবর্তন বাইরের অভিঘাতে ঘটতে পারে অথবা অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন

স্থানীয়ভাবে গড়ে উঠতে পারে। সাম্প্রতিককালে দুখানি গ্রন্থ লিন হোয়াইটের *মিডাইভ্যাল টেকনোলজি এ্যান্ড সোস্যাল চেঞ্জ* এবং জে. নীডহামের *সায়েন্স এ্যান্ড সিভিলাইজেশন ইন চায়না* বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা চর্চার গুরুত্বকে তুলে ধরেছে। এই দুই গ্রন্থে সমকালীন পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির স্তর নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এসব বিষয়ে গবেষণা ও রচনা উৎসাহ লাভ করেছে। একাদশ শতকে ভোজের লেখায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কথা আছে, আলবেরুনি হিন্দুদের জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। এতে হিন্দুদের ব্রহ্মাণ্ডের ধারণা, গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান, দিন ও রাত্রির হিসেব ইত্যাদির কথা জানা যায়।

অধ্যাপক ইরফান হাবিব জানিয়েছেন যে সুলতানি যুগে চারটি প্রধান ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ঘটেছিল। এই চারটি ক্ষেত্র হলো বস্ত্রশিল্প, সেচব্যবস্থা, লিখন সামগ্রী ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং অশ্বারোহী সৈন্য। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকের ভারতে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ঘটেছিল, পুরনো প্রযুক্তি অনুযায়ী নতুন শাসকগোষ্ঠীর সব চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়নি। ইসলামি জগৎ থেকে সম্ভবত নতুন প্রযুক্তি ভারতে এসেছিল কারণ সেখানকার অভিজাতরা এমন সব ভোগ্যপণ্যের সঙ্গে পরিচিত ছিল যেগুলি ভারতে উৎপন্ন হতো না। এদেশের শিল্পী ও কারিগররা বিদেশী প্রযুক্তি গ্রহণ করতে অনীহা দেখায়নি। ভারতীয় ঐতিহ্যে বলা হয়েছে যে ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ ভারতে চরকার উৎপত্তি হয়েছিল। কিন্তু সমস্যা হলো এর কোনো প্রমাণ সাহিত্যে বা লেখতে পাওয়া যায়নি। ত্রয়োদশ শতকের শেষ দিকে ইউরোপে চরকার ব্যবহারের নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়। ইউরোপের একটি বস্ত্র ব্যবসায়ী সংঘ এই মর্মে বিধি প্রবর্তন করেছিল যে চরকায় কাটা সুতো দিয়ে দড়ি বানানো চলবে না। এই বিধি প্রবর্তনের কারণ হলো ঐ ধরনের সুতো যথেষ্ট শক্ত কিনা তা নিয়ে উৎপাদকদের মধ্যে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। ইউরোপে এর ব্যবহার হলো সাম্প্রতিককালের ঘটনা। চরকায় রয়েছে বেল্ট-ড্রাইভ, ফ্লাই-হুইল এবং পৃথকীকৃত ঘূর্ণনবেগের যন্ত্রনীতি। বিভিন্ন যন্ত্রে এসবের ব্যবহার হয়েছে পরবর্তীকালে, খ্রিস্টজন্মের আগে নয়। এসব তথ্য প্রমাণ বিশ্লেষণ করে লিন হোয়াইট জানিয়েছেন যে প্রাচীন ভারতে চরকার প্রচলন ছিল এমন কোনো নথিভুক্ত প্রমাণ পাওয়া যায় না। সম্ভবত পশ্চিম ইউরোপ হলো এর উৎপত্তিস্থল। অধ্যাপক নীডহ্যামও মনে করেন চরকার উৎপত্তি ভারতে হয়নি, এর সরলতম রূপটি পাওয়া যায় চীনে ১২৭০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ।

প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত যেসব নথিপত্র পাওয়া গেছে তাতে চরকার উল্লেখ নেই। সম্ভবত হাতে ঘোরানো নাটাই ও তকলি ভারতে ব্যবহৃত হতো। ভারতীয় কোনো ভাস্কর্যে ও চিত্রাবলীতে চরকার প্রতিরূপ নেই। সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারে

চরকার কোনো প্রতিশব্দ নেই, শব্দটি এসেছে ফার্সি চরখহ্ থেকে, তকলি শব্দটি দেশজ, এর ফার্সি প্রতিশব্দ হলো ফুক। সপ্তদশ শতকে মোগল চিত্রকলায় চরকার ছবি পাওয়া যায়, যন্ত্রটির প্রথম উল্লেখ আছে ইসামীর ইতিহাস গ্রন্থ *ফুতু-উস-সালাতিনে*। চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে ভারতীয় মহিলারা চরকার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। সম্ভবত ত্রয়োদশ শতকে যন্ত্রটির আবির্ভাব হয়, সাদির কবিতায় যন্ত্রটির উল্লেখ করা হয়েছে। চীনে ও পারস্যে যন্ত্রটির ব্যবহার শুরু হয়েছিল, মোঙ্গলদের মাধ্যমে যন্ত্রটি মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। চরকা দিয়ে দ্রুত সুতো কাটা যায় কিন্তু উৎকৃষ্ট মানের সুতো তৈরি করা যায় না। ভারতে উৎকৃষ্ট সুতো হাতে ঘোরানো নাটাই ও তকলিতে তৈরি হতো। সুবিখ্যাত ঢাকাই মস্লিনের সুতো এই পদ্ধতিতে তৈরি হতো। চরকায় মোটা সুতো কাটা হতো, তবে উৎপাদন বেড়েছিল গড়ে ছয়গুণ। অস্বীকার করা যায় না এটি ছিল একটি শ্রম সাশ্রয়কারী যন্ত্র।

বস্ত্র শিল্পের আরও দুটি যন্ত্রের কথা জানা যায়—প্রথমটি হলো কাঠের তৈরি একধরনের ফাঁদ, বিভিন্ন অঞ্চলে এর ছিল বিভিন্ন নাম—চরকি, বেলনা, রেস্তা ও নেওঠা। দুটো করে রোলার থাকত এবং সেগুলি দাঁতে দাঁতে এমনভাবে লাগানো যাতে একটি অন্যটির বিপরীত মুখে ঘুরতে পারে। হাতল ঘুরিয়ে চালানো হতো এদের মধ্যে একটিকে। রোলারগুলির মধ্যে বীজ ঢুকিয়ে দিলে তুলো আলাদা হয়ে যেত। দ্বিতীয়টি হলো একটি ধনুর্গুণ যার কম্পনের সাহায্যে তুলোর আঁশগুলিকে আল্গা ও আলাদা করা যেত। এই প্রক্রিয়াগুলিতেও শ্রমের কিছুটা সাশ্রয় হয়, চরকি ব্যবহার করে একজন শ্রমিক চার থেকে পাঁচগুণ বেশি তুলো ধুনতে পারত। চরকিতে দুটো গুরুত্বপূর্ণ যান্ত্রিক কৌশল ছিল সমান্তরাল প্যাঁচ এবং আগু-পিছু করার হাতল (ক্রাংক)। সমস্ত যন্ত্রটির মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল গিয়ার, এর সাহায্যে সমান্তরাল গতিকে ওপর ও নীচের দিকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো। ইউরোপ এই যন্ত্রটিকে জানলেও সেখানে বা মধ্যপ্রাচ্যে তার ব্যবহার হয়নি। রাজা ভোজের সময়ে প্রযুক্তিবিদরা এর মূল নীতিটি জেনেছিলেন যদিও তার ব্যবহার তেমন ছিল না। ইউরোপের বস্ত্র কারিগরেরা তুলো ধোনার কাজে ধনুকের ব্যবহার জানত না। ১৪০৯ খ্রিস্টাব্দে কনস্টান্সের পশম শ্রমিকরা তুলো ঝাড়াইয়ের কাজে যন্ত্রটিকে লাগানোর বিরোধিতা করেছিল। সম্ভবত যন্ত্রটির ব্যবহার ইউরোপে তখন সবেমাত্র শুরু হয়েছে। চতুর্দশ শতকে মধ্যপ্রাচ্যের ধুনুরিরা এই যন্ত্রটির ব্যবহার জানত। নীডহ্যাম মনে করেন যে এই যন্ত্রটি সম্ভবত ভারতে তৈরি হয়েছিল। ভারতে মুসলমানরা ধুনুরির কাজ করত। এজন্য অনুমান করা হয় যে সম্ভবত এই প্রযুক্তি মুসলমানরা মধ্যপ্রাচ্য থেকে ভারতে এনেছিল। চরকি ও ধুনুরি ব্যবহারের ফলে উৎপাদন বেড়েছিল, ব্যয় কমেছিল। সূক্ষ্ম সুতো উৎপাদন আগের মতো তকলিতে হতো, মাঝারি ও মোটা সুতো চরকাতে উৎপন্ন

হতো। বস্ত্রের উৎপাদন বেড়ে যাওয়ায় দাম কমেছিল, চাহিদা বেড়েছিল। তুলো চাষ ও সুতো উৎপাদন দুই-ই বেড়েছিল। চরকা ব্যবহারের ফলে মোটা ও মাঝারি বস্ত্র উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এমন অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে তাঁতিদের সংখ্যা বেড়েছিল। বস্ত্রের ব্যবহার বেড়েছিল, এক্ষেত্রে চরকা ও ধুনুরির ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার জাতপাতের ক্ষেত্রে খানিকটা গতিশীলতা এনেছিল, তাঁতি শ্রেণীর মধ্যে বহু জাতির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, কবীর এই সংমিশ্রণের উল্লেখ করেছেন।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে অরঘট্ট বা ঘটিযন্ত্রের উল্লেখ আছে। অনেকে একে পার্সিয়ান হুইল বলে উল্লেখ করেছেন (সাকিয়া)। নীডহ্যাম মনে করেন অরঘট্ট ঠিক সাকিয়া নয়, নোরিয়ার সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে। নোরিয়া হলো একটি ঘূর্ণমান চক্র, এর সাহায্যে নদী বা জলাশয় থেকে জল তুলে সেচের কাজ করা হতো। নোরিয়া ও সাকিয়ার মধ্যে পার্থক্য হলো নোরিয়া দিয়ে নদী বা জলাশয় থেকে জল তোলা যেত, গভীর কূপ থেকে জল তোলা যেত না। পার্সি চাকায় গিয়ারের ব্যবহার ছিল, পশুশক্তির সাহায্যে তা চালানো যেত, শিকলের বেগও নিয়ন্ত্রণ করা যেত। গিয়ার যুক্ত থাকায় অবিরাম চাকা ঘুরিয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জল সরবরাহ করা যেত। বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে পারসিক চক্রের কথা উল্লেখ করেছেন, সুজন রায় ভাণ্ডারির লেখায় এবং মোগল চিত্রকলায় এর নিদর্শন পাওয়া যায়। পারসিক চক্রের শিকলগুলি জোড়া কাছির হতো, এতে জল ধরে রাখা ও ছেড়ে দেওয়ার জন্য মৃৎপাত্রসহ কাঠের টুকরো বাঁধা থাকত। গিয়ার ব্যবস্থা ছিল পুরোপুরি কাঠের তৈরি, পশুশক্তি কাজে লাগিয়ে একটি পিন-ড্রাম ঘোরানো হতো যেটি আবার যুক্ত ছিল কূপের উপরিস্থ শিকলবাহী চাকাটির সঙ্গে একই অক্ষদণ্ডে অবস্থিত একটি পিন হুইলের সাথে। উনিশ শতকে ইংরেজ পর্যবেক্ষকরা এই যন্ত্রটির যে বর্ণনা দিয়েছেন তার সঙ্গে এটি মিলে যায়। বাবর জানিয়েছেন যে লাহোর, দিপালপুর ও সরহিন্দ অঞ্চলে যন্ত্রটির ব্যাপক চলন ছিল। পাঞ্জাব ও সিন্ধু অঞ্চলে এর বেশি ব্যবহার ছিল, গাঙ্গেয় অববাহিকায় এর ব্যবহার তেমন ছিল না। অগভীর জলাশয় থেকে জল তোলার কাজে পার্সি চাকা তেমন কার্যকরী ছিল না। এসব ক্ষেত্রে চামড়ার বালতি দিয়ে কপিকল লাগিয়ে জল তোলা হতো (চরস)। পূর্ব ভারতে পার্সি চাকার তেমন চলন ছিল না। প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যে এর ব্যবহার হতো। মধ্যপ্রাচ্য থেকে স্পেন হয়ে তা ইউরোপে প্রবেশ করেছিল। চতুর্দশ শতকে পারসিক চাকা ভারতে প্রবেশ করেছিল। এই প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে পাঞ্জাবের কৃষিতে উন্নতি ঘটেছিল, কূপ থেকে জল তুলে কৃষিকাজ করা হতো। জাঠ কৃষকরা এই যন্ত্রটির ওপর নির্ভর করত, জনশূন্য পাঞ্জাব ঘনবসতিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, পশুপালক জাঠরা কৃষিজীবীতে পরিণত হয়। সিন্ধু থেকে উত্তর ভারত

সর্বত্র কৃষির সম্প্রসারণে এই যন্ত্রটির ব্যবহার হয়, প্রযুক্তি জনবসতি ও কৃষি উৎপাদনের রূপান্তর ঘটিয়েছিল।

কাগজ তৈরির প্রযুক্তি দুটি ভিন্ন ধারায় পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। একটির উৎস হল চীনদেশ, আনুমানিক খ্রিস্ট্রীয় প্রথম শতকে চীনে প্রথম কাগজ তৈরি হয়। অষ্টম শতকে এই প্রযুক্তি পৌঁছেছিল সমরকন্দ ও বাগদাদে, নবম শতকে মিশরে এবং দ্বাদশ শতকে স্পেন ও ফ্রান্সে। জার্মানিতে কাগজের ব্যবহার চতুর্দশ শতকের আগে হয়নি। একাদশ শতকের আগে কাগজের প্রযুক্তিকৌশল ভারতে পৌঁছলেও এর কার্যকর ব্যবহার শুরু হয়নি। একাদশ শতকে আলবেরুনি জানাচ্ছেন যে মুসলমানরা কাগজের ব্যবহার জানলেও ভারতীয়রা তার ব্যবহার জানত না। তারা লেখে গাছের ছাল ও তালপাতায়। ত্রয়োদশ শতকের আগে ভারতে কাগজের ব্যবহার শুরু হয়নি। ঐ শতকের শেষদিকে আমীর খসরুর রচনায় কাগজের উল্লেখ দেখা যায়। ত্রয়োদশ শতকেও কাগজের ব্যবহার ছিল অত্যন্ত সীমিত। পারস্যে কাগজের দলিল পাওয়া গেছে যার রচনাকাল ৭১৮ খ্রিস্টাব্দ, ভারতের গুজরাটে যে দলিলটি পাওয়া গেছে তার রচনাকাল হলো ১২২৩-২৪ খ্রিস্টাব্দ। যে-কোনো সভ্যতায় কাগজের ব্যবহার যুগান্তকারী ঘটনা বলে স্বীকৃতি পায়। দামে সস্তা, হালকা, টেঁকসই এই উপকরণটি আবিষ্কারের ফলে জ্ঞান বিস্তার ও শিক্ষার প্রসার অবশ্যই দ্রুততর হয়ে উঠেছিল। নথি সংরক্ষণ, যোগাযোগ, হিসেব রাখার কাজও সহজ হয়েছিল। বাণিজ্যিক পত্র পাঠানো বা হুন্ডি কাটার কাজও সহজ হয়ে এসেছিল। মধ্যযুগের বাণিজ্যের ইতিহাসে কাগজের ব্যবহার অবশ্যই পরিবর্তনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছিল।

মধ্যযুগে প্রযুক্তির ইতিহাসে আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো কম্পাসের ব্যবহার। এই চৌম্বক কম্পাসের ব্যবহার নৌচালনায় অবশ্যই সহায়ক হয়েছিল। নীডহ্যাম দেখিয়েছেন যে একাদশ শতকের শেষে চীনদেশের নাবিকরা এর ব্যবহার করত। দ্বাদশ শতকে এই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ইউরোপে পৌঁছে যায়, ত্রয়োদশ শতকে ইসলামি জগতে চৌম্বক কম্পাসের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। আরব লেখক আওয়াফি ভারতের ক্যাম্বে বন্দরে পশ্চিমগামী জাহাজগুলিকে কম্পাস ব্যবহার করতে দেখেছিলেন। আরও একজন আরব লেখক এই কম্পাসের বিবরণ দিয়ে লিখেছেন যে ভারতীয় সাগরগুলি ও ভূমধ্যসাগরে এই কম্পাস ব্যবহার করা হতো।[৩] ভারত মহাসাগরে এই যন্ত্রটির ব্যবহারের তাৎপর্য ছিল প্রায় মৌসুমি বায়ু আবিষ্কারের সমান। এই কম্পাস ব্যবহার করার জন্য জাহাজগুলি নির্ভয়ে সমুদ্র পেরোতে পারত। অনুমান

৩. ইনি হলেন ত্রয়োদশ শতকের আরব লেখক বৈলাক কিবাজিকি।

করা যেতে পারে এই কম্পাস ব্যবহার করার ফলে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য বেড়েছিল। মধ্যযুগের ভারতে জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চা ছিল। আলবেরুনি ভারতের জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার কথা উল্লেখ করেছেন, কয়েকখানি জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চা সংক্রান্ত গ্রন্থের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। মধ্যযুগের শাসকরা জ্যোতিষে বিশ্বাস করতেন, অনেকে এনিয়ে চর্চাও করতেন। এমন একজন শাসক হলেন ফিরুজ তুঘলক। তিনি মানুষের ওপর গ্রহের প্রভাব নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন। সুলতানি আমলের ঐতিহাসিক হাসান নিজামী ও আফিফের লেখায় জ্যোতিষের কথা আছে। বারানি ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকের ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের একটি তালিকা দিয়েছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন যে হিন্দু ও মুসলমান জ্যোতিষীরা পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করত। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে গোঁড়া রক্ষণশীল উলেমারা জ্যোতিষ চর্চার বিরোধিতা করতেন।

জ্যোতিষ চর্চার জন্য যেসব যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হতো সেগুলিও বিদেশ থেকে ভারতে চলে এসেছিল। অর্থনৈতিক কার্যকলাপের জন্য সময়রক্ষক যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। মধ্যযুগের ইউরোপে অনেক শহরে ঘড়ি বসিয়ে নাগরিকদের সময় জানানোর ব্যবস্থা হয়। এ্যাস্ট্রোল্যাব যন্ত্রটি ছিল এরকম একটি বহুমুখী সূক্ষ্ম যন্ত্র। সুলতান ফিরুজ তুঘলক তাঁর প্রাসাদের ওপর একটি যন্ত্র বসিয়ে সময় নিরূপণের ব্যবস্থা করেন। মেঘাচ্ছন্ন দিনে সময় নিরূপণের জন্য তিনি একটি ক্রেপসিড্রাও বসিয়েছিলেন। তিনি যে ঘড়িটি বসিয়েছিলেন তা সম্ভবত ছিল সূর্যঘড়ি ও জলঘড়ির সমন্বয়। দ্বাদশ শতক থেকে এই ধরনের সময় নিরূপক যন্ত্র মধ্যপ্রাচ্যে সুপরিচিত ছিল, শহরের নাগরিকদের ঘণ্টাধ্বনি করে সময় জানিয়ে দেওয়া হতো। আফিফ বলেছেন যে ফিরুজ তুঘলকের এই ঘড়িটি ছিল সেযুগের বিস্ময়। দিল্লি ছাড়াও দেশের অন্যত্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার চর্চা চলেছিল। পঞ্চদশ শতকে বাহমনি সুলতান তাজউদ্দিন ফিরোজ ছিলেন একজন বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ। তিনি দৌলতাবাদের কাছে পাহাড়ের ওপর একটি মানমন্দির নির্মাণের কাজ শুরু করেছিলেন। জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কি একটি পানিমহল বানিয়েছিলেন যার নালীগুলি বাগানে গিয়ে জল সরবরাহের কাজ করত। তাঁর বসানো স্বয়ংক্রিয় ঘড়ি প্রতি চব্বিশ মিনিটে আওয়াজ করত, ঘড়িটিকে জল ও আগুন দিয়ে চালানো হতো। ভারতে প্রথাগত সময় নিরূপণের কাজে ব্যবহার করা হতো জলঘড়িকে, লোদিরা সূর্যঘড়ির ব্যবস্থা করেছিলেন। ষাট মিনিটে ঘণ্টা এবং চব্বিশ ঘণ্টায় দিনের ধারণা প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল।

তুর্কিদের ভারত জয়ে অশ্বারোহী বাহিনীর ভূমিকা সকলে স্বীকার করে নিয়েছেন। এইসব যুদ্ধে পদাতিক ও হস্তিবাহিনীর ভূমিকা ছিল গৌণ। তুর্কিদের সঙ্গে দুটি নতুন প্রযুক্তি ভারতে এসেছিল—একটি হলো ঘোড়ার জিনের সঙ্গে লাগানো লোহার

রেকাব এবং ঘোড়ার খুরে লাগানো লোহার নাল। লিন হোয়াইট জানিয়েছেন যে ঘোড়র জিনের রেকাব উদ্ভাবনে ভারতীয় কারিগরদের ভূমিকা রয়েছে। খ্রিস্ট জন্মের আগে থেকে রেকাবের চলন ছিল, দড়ির রেকাব ও বুড়ো আঙুল রাখার জন্য একটি ছোট রেকাব ছিল। ইরফান হাবিব মনে করেন এগুলি দড়ি দিয়ে তৈরি হতো, এরপর জিন থেকে ঝোলানো আঁকশির চলন হয়েছিল। তাতেও অশ্বারোহীদের তেমন সুবিধা হতো না। এগুলির ওপর দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করা যেত না। জুতসই লোহার রেকাবের ব্যবহার প্রথম চীনে শুরু হয়েছিল, পারস্য হয়ে তা ইসলামি দুনিয়ায় পৌঁছে যায়। একাদশ ও দ্বাদশ শতকে তুর্কিরা লোহার রেকাব ব্যবহার করতে থাকে, তুর্কিদের সঙ্গে লোহার রেকাব ভারতে পৌঁছেছিল। এতে অশ্বারোহী বাহিনীর ভেদক্ষমতা অবশ্যই বেড়েছিল, রেকাবের ওপর দাঁড়িয়ে অশ্বারোহীর ভারসাম্য বজায় রেখে যুদ্ধ করার সুবিধা হয়।

মধ্যযুগের সামরিক ব্যবস্থায় আরও একটি নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছিল। এটি হলো ঘোড়ার পায়ে লোহার নালের ব্যবহার। এই প্রযুক্তির ব্যবহার অশ্বারোহী বাহিনীর গতি ও ভেদক্ষমতা অবশ্যই বাড়িয়ে দিয়েছিল। ভারতীয়রা ঘোড়ার পায়ে নালের ব্যবহার জানত না, তুর্কিরা এই প্রযুক্তি ভারতে এনেছিল। সাইমন ডিগবি জানিয়েছেন বিদেশিরা ভারতে ক্রুশাকার ধনুকের ব্যবহার শুরু করেছিল। এই ধনুকের অঙ্গ ছিল একটি চোঙা যার মধ্যে দিয়ে তীর নিক্ষেপ করা হতো। এতে নির্ভুলভাবে লক্ষ্যভেদ করা সম্ভব হতো। আমীর খসরু এই নাভাকের উল্লেখ করেছেন, সম্ভবত এটি ছিল বন্দুকের পূর্বসূরি। আরবরা ভারতে ন্যাপথার ব্যবহার শুরু করেছিল, এর সাহায্যে শত্রু শিবিরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া যেত। আরবরা এধরনের ক্ষেপণাস্ত্র (মঞ্জানিক) ব্যবহার করেছিল সিন্ধুদেশে। মধ্যযুগে রকেটের ব্যবহার (বাণ) শুরু হয়েছিল, এর সঙ্গে বারুদ লাগানো থাকত। চীন থেকে রকেট প্রযুক্তি ভারতে এসে পৌঁছেছিল। চতুর্দশ শতকের শেষে ভারতে কামান নির্মাণের প্রযুক্তি পৌঁছে গিয়েছিল। সম্ভবত ইউরোপ থেকে অটোমান সাম্রাজ্য হয়ে কামান ভারতে এসেছিল। ভারতীয়রা ব্রোঞ্জের কামান বানাত। ষষ্ঠদশ শতকের শেষে ভারতে গাদা বন্দুকের ব্যবহার চালু হয়ে যায়।

সুলতানরা ছিলেন নির্মাতা, ভারতে তাঁরা প্রাসাদ, নগর, মসজিদ, মিনার ইত্যাদি নির্মাণ করেন। খিলান ও গম্বুজ নির্মাণের প্রযুক্তি তাঁরা ভারতে নিয়ে আসেন। চুন ও সুরকি দিয়ে ইট গাঁথার প্রযুক্তি ভারতীয়রা আয়ত্ত করেছিল। তুর্কিদের সঙ্গে মদ চোলাইয়ের প্রযুক্তিও ভারতে প্রবেশ করেছিল। চতুর্দশ শতকে ভারতের আলিগড় ও মীরাট অঞ্চলে সুগন্ধি মিষ্টি মদ আরাক তৈরি হতো। আখের রস দিয়ে ভারতীয় মদ তৈরি হতো। সুগন্ধি তৈল তৈরিও শুরু হয়ে যায়। আমীর খসরু গোলাপ জল তৈরির

কথা বলেছেন, চন্দন কাঠ থেকে সুগন্ধি তেল তৈরি হতো। এসব প্রযুক্তিগত পরিবর্তন অবশ্যই আর্থ-সামাজিক জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। বাণিজ্য বেড়েছিল কারণ উৎপাদন বেড়েছিল। কারিগরি ও কৃষি উৎপাদন বেড়েছিল। তবে নতুন কৃৎকৌশল যে শ্রেণী সম্পর্কের উন্নতি ঘটায় এমন আশা করা যায় না, বরং উল্টোটাই ঘটতে পারে। উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর অভিজাত ও বণিক শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ আরও কঠোর হতে পারে। ইউরোপে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন চলেছিল, ভারতে তাদের তেমন ব্যবহার হয়নি। সম্ভবত শাসকগোষ্ঠী কৃষি উৎপাদনের উদ্বৃত্ত নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল, প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সুযোগ নিয়ে উৎপাদন বাড়ানোর কথা ভাবেনি। কারিঁগররা তাদের পুরনো প্রযুক্তি নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল, বণিকরা নতুন প্রযুক্তির জন্য মূলধন লগ্নি করার কথা ভাবেনি। এজন্য ভারতীয় জীবনে পরিবর্তন ছিল অত্যন্ত মন্থর, গতিশীলতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়নি।

পরিশিষ্ট ১

চালুক্য, পল্লব ও রাষ্ট্রকূট রাজবংশের মধ্যে আধিপত্যের সংগ্রাম (৫৫০-৭৫০)

চালুক্য রাজবংশ

দক্ষিণে বাদামিকে (বাতাপি) কেন্দ্র করে চালুক্যদের রাজ্য গড়ে উঠেছিল।[১] প্রথম পুলকেশী হলেন (৫৩৫-৫৬৬) চালুক্য রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা (He may be considered as its real founder.)। তাঁর পুত্র মঙ্গলেশের লেখ থেকে জানা যায় পুলকেশী বহু শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন, অশ্বমেধ, হিরণ্যগর্ভ ও অন্যান্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং উপাধি নেন শ্রীবল্লভ। পুলকেশীর বাদামী লেখতে বলা হয়েছে যে তিনি বাদামি দুর্গের পত্তন করেন। তার উত্তরাধিকারী ছিলেন মহারাজ প্রথম কীর্তিবর্মন (৫৬৭-৫৯৮)। তিনি বাদামি নগরকে সুসজ্জিত করেন। পুত্র মঙ্গলেশের একটি লেখতে বলা হয়েছে যে তিনি বঙ্গ, অঙ্গ, কলিঙ্গ, বত্তুর, মগধ, মদ্রক, কেরল গঙ্গা, মুসক, পাণ্ড্য, দ্রামিল, চোল, অলুক ও বৈজয়নীর শাসকদের পরাস্ত করেন। সম্ভবত তিনি দক্ষিণের নল, মৌর্য ও কদম্বদের পরাস্ত করেন।[২] এসব সাফল্যের ফলে দক্ষিণের বিস্তৃত অঞ্চলে চালুক্যদের প্রভাব সম্প্রসারিত হয়। প্রথম কীতিবর্মনের মৃত্যুর পর তার ভ্রাতা মঙ্গলেশ চালুক্যদের রাজা হন (৫৯৮-৬১১)। পরম ভাগবত এই রাজা কলচুরিদের পরাস্ত করে রেবতী দ্বীপ জয় করেন। উত্তর ও মধ্য মহারাষ্ট্রীয় অঞ্চল তাদের অধীনে স্থাপিত হয়। নতুন বিজিত অঞ্চলে তিনি ইন্দ্রবর্মনকে শাসক নিযুক্ত করেন।

মঙ্গলেশের রাজত্বের শেষ দিকে চালুক্য রাজবংশে উত্তরাধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। এই গৃহযুদ্ধে জয়ী হয়ে চালুক্য বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা *দ্বিতীয় পুলকেশী* (৬১১-৬৪২) সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজা হিসেবে তার উপাধি হয় 'শ্রী-পৃথ্বী-বল্লভ' বা পরমেশ্বর। সম্ভবত তিনি বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। মঙ্গলেশ ও পুলকেশীর মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হলে অধীনস্থ নরপতিরা তার সুযোগ নিয়ে স্বাধীন হয়ে যায়। রাজ্যের সর্বত্র ছিল নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা। দ্বিতীয় পুলকেশীর আইহোল লেখতে বলা হয়েছে সমগ্র রাজ্য তমসাবৃত হয়ে পড়েছিল (the whole world was enveloped in the darkness that was the enemies)। অপ্যায়িক ও গোবিন্দ নামে দুজন রাজা ভীমা নদীর উত্তর তীর পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে তাদের রাজধানীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এসে

১. বর্তমানে এটি বিজাপুর জেলায় অবস্থিত।
২. কদম্বদের রাজধানী ছিল বনবাসী।

উপস্থিত হয়। পুলকেশীকে একই সঙ্গে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক আক্রমণের মোকাবিলা করতে হয়। পুলকেশী ভেদনীতি অনুসরণ করে গোবিন্দকে সপক্ষে টেনে নেন, অপ্যায়িক পরাস্ত হয়ে বিতাড়িত হন। অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দমন করে পুলকেশী রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। জৈন কবি রবিকীর্তি *আইহোল প্রশস্তি*-তে তাঁর রাজ্য জয়ের কাহিনী লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। দক্ষিণে তিনি কদম্বদের রাজধানী বনবাসী জয় করে তার অধীনে আনেন। এর পর তিনি মহীশূরের গঙ্গা ও আলুপদের পরাস্ত করেন। সম্ভবত এই সংঘাতের পর পুলকেশী গঙ্গা রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। কোঙ্কনের মৌর্যদের আক্রমণ করে তিনি তাদের রাজধানী পুরী অধিকার করে নেন। উত্তরে লতা, মালব ও গুর্জররা তাঁর কাছে পরাস্ত হয়, গুজরাট অঞ্চলে তিনি নিজের গভর্নর নিযুক্ত করেন।

আইহোল লেখতে কনৌজের রাজা হর্ষবর্ধনের সঙ্গে পুলকেশীর সংঘর্ষের কথা উল্লিখিত হয়েছে। পুলকেশী উত্তরে বিন্ধ্য ও নর্মদা পর্যন্ত অগ্রসর হন। হিউয়েন সাঙ এই সংঘর্ষের কথা উল্লেখ করেছেন। গুজরাটের ওপর অধিকার নিয়ে 'উত্তরাপথ নাথ' ও 'দক্ষিণাপথের অধীশ্বরের' মধ্যে লড়াই হয়েছিল। হর্ষের ভয়ে পশ্চিম ভারতের কয়েকজন শাসক পুলকেশীর পক্ষ নিয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। ৬১২ বা ৬১৩ খ্রিস্টাব্দে নর্মদা তীরে এই যুদ্ধ হয়, হর্ষকে পরাস্ত করে তিনি পরমেশ্বর উপাধি নেন। এই যুদ্ধের পর মহারাষ্ট্র অঞ্চলের ওপর পুলকেশীর প্রাধান্য স্থাপিত হয়। মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও কোঙ্কন তাঁর অধিকারে এসেছিল। এই যুদ্ধের পর পুলকেশী দাক্ষিণাত্যের পূর্বাঞ্চলে সামরিক অভিযান চালিয়ে কোশল ও কলিঙ্গদের পরাস্ত করেন। উপকূল বরাবর চালুক্য সৈন্যবাহিনী দক্ষিণে প্রবেশ করেছিল। গোদাবরী জেলার পিষ্টপুরে (পিথাপুরম) দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করে তিনি তার ভ্রাতা কুঞ্জ বিষ্ণুবর্ধনকে তার গভর্নর নিযুক্ত করেন। এই বিষ্ণুবর্ধনের উত্তরসুরিরা বেঙ্গির চালুক্য শাখার প্রতিষ্ঠা করেন। ১০৭০ খ্রিস্টাব্দে চোলরাজারা এই রাজ্যটি অধিকার করে তাদের সাম্রাজ্যভুক্ত করে নিয়েছিল। তার আগে অন্ধ্র অঞ্চলের ওপর চালুক্যদের নিরঙ্কুশ আধিপত্য স্থাপিত হয়েছিল।

দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে দ্বিতীয় পুলকেশী কাঞ্চীর পল্লবরাজা প্রথম মহেন্দ্রবর্মনকে আক্রমণ করেন। দুশো বছরের চালুক্য-পল্লব দ্বন্দ্বের সূচনা হয়েছিল এই সময়ে। পল্লবদের লেখগুলিতে এই দ্বন্দ্বের কথা আছে। প্রথম মহেন্দ্রবর্মন সম্ভবত পুলকেশীর আক্রমণ প্রতিহত করেন। এই যুদ্ধের পর পুলকেশী কাবেরী অতিক্রম করে চোল, কেরল ও পাণ্ড্যদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন। পল্লবদের বিরুদ্ধে তিনি জোট গঠন করেন। পল্লব শক্তি অল্পকালের জন্য দুর্বল হয়ে পড়েছিল। পুলকেশী দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ করে রাজধানী বাদামিতে ফিরে আসেন। লোহনের লেখতে বলা হয়েছে যে আরব সাগর

থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত সব অঞ্চলের ওপর তিনি কর্তৃত্ব করেন (lord of the eastern and western waters)।

৬৪১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ পুলকেশীর রাজ্য পরিভ্রমণে এসেছিলেন চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্। তিনি চালুক্যদের রাজ্যের বিস্তৃত বর্ণনা রেখে গেছেন। রাজা ছিলেন ক্ষত্রিয় এবং প্রজারা ছিলেন তার প্রতি খুবই অনুগত। পুলকেশী সম্পর্কে তিনি লিখেছেন যে রাজা ছিলেন একজন উদ্যোগী, প্রজাকল্যাণকামী শাসক (His plans and undertakings were widespread and his beneficent activities were felt over a great distance.)। রাজ্যটির আয়তন ছিল ৮৩৬ মাইল (৫০০০ লি.) এবং রাজধানী পাঁচ মাইল এলাকা জুড়ে, পশ্চিমে ছিল একটি বড় নদী। রাজ্যের কৃষি জমিতে নিয়মিতভাবে চাষবাস হতো, প্রচুর শস্য উৎপন্ন হতো (The soil was regularly cultivated and was very productive.)। হিউয়েন সাঙ্ বলেছেন এই অঞ্চলের জলবায়ু উষ্ণ, জনগণের দৈহিক গড়ন দীর্ঘ ও কঠোর প্রকৃতির, কিন্তু তারা ছিল সৎ ও সরল। এরা শিক্ষার ব্যাপারে ছিল আগ্রহী, উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ, কিন্তু শত্রুর প্রতি নির্মম। কোনো রকম সাহায্য চাইলে তা পাওয়া যায়, কিন্তু অপমানিত হলে এরা নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। শত্রু আত্মসমর্পণ করলে তার ক্ষতি করে না, যুদ্ধের সময় বাজনা বাজায়, নির্ভয়ে যুদ্ধ করে। যুদ্ধে বহু হাতি ব্যবহার করা হয়। পরাজিত সেনাপতিকে হত্যা করা হয় না, অসম্মানিত সেনাপতি সাধারণত আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

দ্বিতীয় পুলকেশী হলেন প্রাচীন ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ রাজা। তাঁর খ্যাতি শুধু দেশের মধ্যে নয়, দেশের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ঐতিহাসিক তব্‌রি জানিয়েছেন যে পারস্যের রাজা দ্বিতীয় খসরুর কাছে তিনি দূত পাঠিয়েছিলেন। রাজা পল্লবদের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের সূচনা করেছিলেন, কিন্তু পল্লবদের সঙ্গে এই শত্রুতা তাঁর পক্ষে ক্ষতিকারক হয়। সম্ভবত তিনি পল্লব রাজা প্রথম নরসিংহবর্মনের হাতে পরাস্ত ও নিহত হন। পল্লব রাজা রাজধানী বাদামি অধিকার করেন। সিংহলের ইতিহাস *মহাবংশে* এই দ্বন্দ্বের কথা আছে। সিংহলী রাজপুত্র মানবর্মন পল্লব রাজার আশ্রয় নিয়ে চালুক্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। চালুক্যদের এক লেখতে বলা হয়েছে পল্লব মহামল্ল প্রথম নরসিংহবর্মন বাদামি অধিকার করেছিলেন। বাদামি অধিকার করে তিনি '*বাতাপিকোণ্ড*' বা বাতাপি বিজয়ী উপাধি নেন।

পুলকেশীর মৃত্যুর পর সম্ভবত তাঁর রাজ্যের একাংশ পল্লবরা অধিকার করে রেখেছিল। সেজন্য তাঁর উত্তরাধিকারী প্রথম বিক্রমাদিত্য (৬৫৫-৬৮১) বেশ কিছুকাল পরে সিংহাসনে বসেছিলেন। মধ্যবর্তী সময়ে তিনি চালুক্য রাজ্যের পুনরুদ্ধারের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। চালুক্যদের সিংহাসন নিয়ে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব চলেছিল। ৬৫৫

খ্রিস্টাব্দে গঙ্গাদের সাহায্য নিয়ে প্রথম বিক্রমাদিত্য পল্লবদের হাত থেকে তাঁর পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। চালুক্যদের লেখগুলিতে বলা হয়েছে যে তিনি চালুক্যদের রাজ্য ও সার্বভৌমত্ব ফিরিয়ে আনেন। হায়দ্রাবাদ লেখতে বলা হয়েছে যে প্রথম বিক্রমাদিত্য তিনজন পল্লব রাজা প্রথম নরসিংহবর্মন, দ্বিতীয় মহেন্দ্রবর্মন ও প্রথম পরমেশ্বরবর্মনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন [Vikramaditya I obliterated the fame of Narasimhavarman, destroyed the power of Mahendra and surpassed Isvara (Paramesvaravarman) in statesmanship and thus crushed them.]। চালুক্যদের লেখতে আরো বলা হয়েছে যে তিনি পল্লবদের রাজধানী কাঞ্চী অধিকার করেছিলেন। গড়বল লেখতে বলা হয়েছে তিনি হলেন পল্লব রাজবংশের ধ্বংসকারী। পল্লব, চোল, পাণ্ড্য ও কেরলদের আনুগত্য তিনি আদায় করেছিলেন। তিন সমুদ্রবেষ্টিত—আরব সাগর, বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগর—সব ভূভাগের ওপর তিনি আধিপত্য স্থাপন করেন। এই পুনর্গঠনের কাজে তাঁর পুত্র বিনয়াদিত্য ও পৌত্র বিজয়াদিত্য তাঁকে সহায়তা দেন। দক্ষিণের কলভ্রদের পরাস্ত করে তিনি আনুগত্য আদায় করেন। পল্লবদের ক্ষমতা অল্পকালের জন্য বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল (the Pallava power was temporarily paralysed once again.)।

চালুক্যদের সঙ্গে পল্লবদের যে দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত চলেছিল তাতে পূর্ব চালুক্যরা যোগ দেয়নি, তারা কার্যত স্বতন্ত্রভাবে চলতে থাকে। প্রথম বিক্রমাদিত্যের পুত্র বিনয়াদিত্য (৬৮১-৬৯৬) পিতার মৃত্যুর পর চালুক্যদের রাজা হন। চালুক্যদের লেখগুলিতে বলা হয়েছে বিজয়াদিত্য পল্লব, কলভ্র, কেরল, কলচুরি, বিলা, মালব, চোল ও পাণ্ড্যদের পরাস্ত করেন। এই দাবির মধ্যে অতিশয়োক্তি আছে বলে মনে করা হয়। তবে অলুপ ও গঙ্গারা যে তাদের অধীনস্থ শাসক ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আরো দাবি করা হয়েছে কাবেরী উপত্যকা, সিংহল ও পারস্য থেকে তিনি কর আদায় করেন। সম্ভবত সিংহল ও পারস্যে গোলযোগপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য সেখানকার রাজপুত্ররা তাঁর আশ্রয় নিয়েছিল। বিনয়াদিত্য দাবি করেছেন তাঁর পিতামহ দ্বিতীয় পুলকেশীর মতো তিনি 'উত্তরাপথনাথ'কে পরাস্ত করেছেন। কিন্তু এই রাজার নাম উল্লেখ করেননি। সম্ভবত উত্তরের কয়েকজন রাজাকে তিনি পরাস্ত করেন। এক পারিবারিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে তাঁর রাজত্ব শেষ হয়েছিল। পরবর্তী রাজা হন তাঁর পুত্র বিজয়াদিত্য (৬৯৬-৭৩৩)। বিজয়াদিত্যের শাসনকালে চালুক্য রাজ্যে শান্তি ছিল, তবে পল্লবদের সঙ্গে আধিপত্যের লড়াই চলেছিল। তিনি পল্লবদের রাজ্য আক্রমণ করেন। যুবরাজ বিক্রমাদিত্য কাঞ্চী অধিকার করে পল্লবরাজা দ্বিতীয় পরমেশ্বরবর্মনকে কর দিতে বাধ্য করেন। চালুক্য রাজা দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য পল্লবদের বিরুদ্ধে তিনবার

সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। বিজাপুর জেলার পত্তদকলে তিনি বিজয়েশ্বর নামে একটি বিশাল শিব মন্দির নির্মাণ করেন। তিনি জৈনদের প্রতি সহিষ্ণুতা দেখান, এবং তাদের তিনি কয়েকটি গ্রাম দান করেন।

বিজয়াদিত্যের উত্তরাধিকারী হলেন দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য (৭৩৪-৭৪৫)। তাঁর রানী মহাদেবী লোকেশ্বর নামে একটি শিব মন্দির নির্মাণ করেন। পল্লবদের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ শুরু করেন। দুই রাজবংশের মধ্যে শত্রুতা এসময় স্থায়ী রূপ নিয়েছিল। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য আকস্মিক আক্রমণে পল্লব রাজা দ্বিতীয় নন্দীবর্মন পল্লবমল্লকে বিপর্যস্ত করেন। রাজধানী কাঞ্চীতে প্রবেশ করলেও তিনি তার কোনো ক্ষতি করেননি। চালুক্য রাজা এরপর একে একে পাণ্ড্য, চোল, কেরল কলভ্র ও অন্যান্যদের পরাস্ত করেন। দক্ষিণের সমুদ্র উপকূলে পৌঁছে তিনি একটি জয়স্তম্ভ নির্মাণ করেন। তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই সময় উত্তর দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূটরা শক্তি সঞ্চয় করে চলেছিল। চালুক্য রাজ্য আগের মতো শক্তিশালী ছিল না। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে তাদের গুজরাটের গভর্নর আরবদের অনুপ্রবেশ চেষ্টায় বাধা দিয়েছিল। রাষ্ট্রকূট বংশের দন্তিদুর্গ এই অঞ্চল দখল করে চালুক্য আধিপত্যের ওপর বড় আঘাত হেনেছিল। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের পর চালুক্যদের রাজা হন তাঁর পুত্র দ্বিতীয় কীর্তিবর্মন (৭৪৫-৭৫৭)। দ্বিতীয় কীর্তিবর্মনের রাজত্বকালে চালুক্য শক্তির দ্রুত পতন ঘটে। দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূটরা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। সম্ভবত ইলোরাতে তাদের রাজপাট স্থাপিত হয়, পরে মান্যক্ষেতে। সম্ভবত চালুক্যদের অধীনতাপাশ দন্তিদুর্গ ছিন্ন করেছিলেন। রাষ্ট্রকূটদের সমনগড় ও অন্যান্য লেখে বলা হয়েছে যে দন্তিদুর্গ ছিলেন স্বাধীন শাসক এবং তিনি চালুক্য রাজা দ্বিতীয় কীর্তিবর্মনকে পরাস্ত করেন। দন্তিদুর্গ শুধু চালুক্যদের পরাস্ত করে ক্ষান্ত হননি, তিনি চালুক্যদের শত্রু পল্লবদেরও আক্রমণ করেন। পল্লব রাজা দ্বিতীয় নন্দীবর্মন তাঁর কাছে পরাস্ত হন। চালুক্য রাজ্যের দক্ষিণ দিকে রাষ্ট্রকূটদের আধিপত্য সম্প্রসারিত হয়েছিল। চালুক্য রাজা দ্বিতীয় কীর্তিবর্মন বাতাপি ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন। সম্ভবত তিনি দন্তিদুর্গের সার্বভৌমত্ব মেনে নিতে বাধ্য হন। দন্তিদুর্গের মৃত্যুর পর তিনি হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু রাষ্ট্রকূট রাজা প্রথম কৃষ্ণ তাঁকে পরাস্ত করে তাদের 'বরাহ লাঞ্ছিত পালিধ্বজ' ছিনিয়ে নিয়ে যায় (forcibly carried away the fortune of the Chalukya family)। রাষ্ট্রকূটরা দাক্ষিণাত্যের নতুন অধীশ্বর হয়ে বসেছিল। প্রথম বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে চালুক্যদের রাজ্যের সর্বাধিক বিস্তৃতি ঘটেছিল। উত্তরে গুজরাট থেকে দক্ষিণে নেলোর পর্যন্ত তাদের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। পল্লবদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে তারা উত্তরের দিকে নজর দিতে পারেননি, দক্ষিণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। চালুক্য-পল্লব দ্বন্দ্বের কেন্দ্রস্থল

ছিল তুঙ্গভদ্রা নদীর দুই তীর। উত্তরের প্রাদেশিক শাসকরা স্বাধীন হয়ে যায়, তাদের উত্তরের প্রাদেশিক শাসক পরিবার রাষ্ট্রকূটরা তাদের পতনের জন্য অনেকখানি দায়ী ছিল।

পল্লব রাজবংশ

কাঞ্চীর পল্লব রাজবংশের উৎপত্তির ইতিহাস আজও রহস্যাবৃত হয়ে আছে। এরা দেশী না বিদেশী এই প্রশ্নের সন্তোষজনক মীমাংসা আজও হয়নি। ষষ্ঠ শতকের শেষদিকে সিংহবিষ্ণু এই রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন (with him begins the age of the great Pallavas, and to him belongs the honour of starting the Pallavas on their grand career of political and cultural achievement.)। তিনি চোলমণ্ডলম জয় করে পল্লব রাজ্য বিস্তার করেন। তিনি দক্ষিণের কলভ্র ও অন্যান্যদের পরাস্ত করে মাদ্রাজ থেকে কুম্ভকোনম পর্যন্ত রাজ্যকে সম্প্রসারিত করেন। কীরাতার্জুন নাটকের লেখক মহাকবি ভারবি তাঁর সভাকবি ছিলেন। তাঁর পুত্র প্রথম মহেন্দ্রবর্মন তাঁর *মত্তবিলাস প্রহসনে* রাজার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। মহাবলীপুরমের শিল্পকীর্তির তিনি সূচনা করেন। প্রথম মহেন্দ্রবর্মন (৬০০-৬৩০) হলেন এই রাজবংশের শ্রেষ্ঠ রাজাদের অন্যতম। তার সময়ে দীর্ঘস্থায়ী চালুক্য-পল্লব দ্বন্দ্বের শুরু হয়েছিল। চালুক্য ও পল্লবরা হলেন পরস্পরের শত্রু। আগ্রাসী সম্প্রসারণ এই দ্বন্দ্বের একমাত্র কারণ হয়। পুলকেশী তাঁর আইহোল লেখতে (৬৩৪ খ্রি.) বলেছেন যে পল্লবরা তাঁর উত্থানের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল (the Pallavas had opposed the rise of his power)। পল্লব ও কদম্বদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল, কদম্বরা ছিল চালুক্যদের শত্রু, এজন্য চালুক্য ও পল্লবদের মধ্যে চিরশত্রুতার সৃষ্টি হয়েছিল। পুলকেশী বেঙ্গি জয় করে পল্লবরাজা প্রথম মহেন্দ্রবর্মনকে আক্রমণ করেন, তিনি কাঞ্চী দুর্গে আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করেন। পল্লবদের লেখতে চালুক্যদের সঙ্গে কাঞ্চীর কাছে *পাল্লুর* যুদ্ধের কথা আছে। এই যুদ্ধের পর পল্লব রাজা তাঁর রাজ্যের উত্তরাঞ্চলের ওপর আধিপত্য হারিয়েছিলেন। মহেন্দ্রবর্মনের রাজ্য দক্ষিণে কাবেরী পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। মহেন্দ্রবর্মন প্রথম জীবনে জৈন ছিলেন, পরে শৈব সাধু অপ্পরের প্রভাবে শৈব হন। অনেকগুলি প্রস্তর মন্দির নির্মাণ করেন, তাঁর উপাধি ছিল 'বিচিত্রচিত্ত'। ধর্মের ব্যাপারে তিনি সহনশীল ছিলেন না। মহেন্দ্রবাড়িতে তিনি একটি বিশাল জলাশয় নির্মাণ করেন। তিনি নৃত্য ও সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, সঙ্গীতশাস্ত্রের ওপর একখানি গ্রন্থও রচনা করেন। তাঁর মত্তবিলাস প্রহসনে শৈব ও বৌদ্ধ সাধুদের ব্যঙ্গ করা হয়েছে। তিনি চিত্রশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তার বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় ধরা পড়েছে তার 'বিচিত্রচিত্ত' অভিধার মধ্যে।

পল্লব রাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা হলেন প্রথম নরসিংহবর্মন মহামল্ল (৬৩০-৬৬৮)। তিনি সমগ্র দক্ষিণ ভারতে পল্লবদের আধিপত্য স্থাপন করেন (He was the greatest of the Pallavas and his political achievements made him supreme in South India.)। তিনি চালুক্যদের শ্রেষ্ঠ রাজা দ্বিতীয় পুলকেশীকে তিনবার যুদ্ধে পরাস্ত করেন। প্রথম যুদ্ধটি ছিল কাঞ্চীর কাছে মণিমঙ্গলসে, পরের যুদ্ধ হয় চালুক্যদের রাজধানী বাতাপিতে। ৬৪২ খ্রিস্টাব্দে তিনি চালুক্যদের রাজধানী বাতাপি অধিকার করেন। দ্বিতীয় পুলকেশীর মৃত্যুর পর চালুক্য রাজ্যে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়, তার সুযোগ নিয়ে পল্লবরা তাদের রাজ্যের দক্ষিণ দিককার অঞ্চলগুলি দখল করে নিয়েছিল। নরসিংহবর্মন বাতাপি জয় করে শুধু ধনসম্পদ লাভ করেননি, পল্লবদের শত্রুকে শাস্তি দেন, কাঞ্চী আক্রমণের প্রতিশোধ নেন। বাতাপি জয় করে বাতাপিকোণ্ড বা 'বাতাপি বিজয়ী' উপাধি নেন। নরসিংহবর্মন রাজ্যে তাঁর অবস্থানকে শক্তিশালী করে সিংহল রাজপুত্র মানবর্মনের সমর্থনে ঐ দেশে একটি নৌ-অভিযান পাঠান। প্রথম অভিযান ব্যর্থ হয়, কিন্তু দ্বিতীয় অভিযান সফল হয়েছিল। নরসিংহবর্মন মহাবলীপুরমে রথাকৃতি সাতটি মন্দির নির্মাণ করেন।

নরসিংহবর্মনের রাজত্বকালে হিউয়েন সাঙ্ কাঞ্চীতে এসেছিলেন (৬৪০ খ্রি.)। তিনি পল্লব রাজ্য তোণ্ডমণ্ডলমের বর্ণনা রেখে গেছেন। কাঞ্চী নগরের পরিধি ছিল প্রায় ছয় মাইল ; এই রাজ্যে প্রায় একশ বৌদ্ধ বিহার ছিল, এগুলিতে বাস করত দশ হাজার থেরাবাদি বৌদ্ধ ভিক্ষু। দিগম্বর জৈনদের প্রায় আশিটি মন্দির ছিল, অন্যান্যদের কয়েকটি মন্দির ছিল। দক্ষিণ ভারতে বৌদ্ধধর্মের অবনতি দেখা দিয়েছিল, তবে তোণ্ডমণ্ডলমে তাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। এখানকার জনগণ শিক্ষার অনুরাগী ছিল, রাজধানীর দক্ষিণে একটি বিশাল শিক্ষায়তন ছিল। সেখানে দেশের পণ্ডিতরা মিলিত হতেন। এই প্রতিষ্ঠানটির নাম হলো *রাজবিহার*, মত্তবিলাস প্রহসনে মহেন্দ্রবর্মন এর উল্লেখ করেছেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মপাল ছিলেন কাঞ্চীর অধিবাসী, কাঞ্চীতে আরো বহু বিদ্বান ও পণ্ডিত ব্যক্তির সমাবেশ ঘটেছিল। নরসিংহবর্মনের পর পুত্র দ্বিতীয় মহেন্দ্রবর্মন মাত্র দুবছর রাজত্ব করেন (৬৬৮-৬৭০)। তাঁর প্রধান শত্রু ছিলেন চালুক্যরাজা প্রথম বিক্রমাদিত্য। তিনি পৈতৃক রাজ্য পুনরুদ্ধার করে পল্লবদের রাজ্য আক্রমণ করেন।

চালুক্যদের গড়বল (৬৭৪) লেখতে দাবি করা হয়েছে যে চালুক্য রাজা পল্লবদের রাজধানী কাঞ্চী দখল করে পল্লব রাজবংশকে ধ্বংস করেন। কাবেরী নদীর দক্ষিণতীর পর্যন্ত তার সৈন্যবাহিনী অগ্রসর হয়েছিল। পল্লবদের দলিলে বলা হয়েছে প্রথম পরমেশ্বরবর্মন (৬৭০-৬৯৫) প্রথম বিক্রমাদিত্যকে পরাস্ত করেন, ত্রিচিনোপলি জেলার *পেরুভালানাল্লুরে* এই যুদ্ধ হয়েছিল। এই পরস্পরবিরোধী দাবির মধ্য থেকে যে সত্যটি

বেরিয়ে আসে তাহল বিক্রমাদিত্য দক্ষিণের ত্রিচিনোপলি পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। সম্ভবত তিনি কাঞ্চী অধিকার করেন এবং তার বংশের অপমানের প্রতিশোধ নেন। পরমেশ্বরবর্মন ধর্মমতে শৈব ছিলেন এবং কাঞ্চীর কাছে তিনি একটি শিব মন্দির নির্মাণ করেন। মহাবলীপুরমে নির্মাণ কাজের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। পরমেশ্বরবর্মনের উত্তরাধিকারী ছিলেন দ্বিতীয় নরসিংহবর্মন রাজসিংহ (৬৯৫-৭২২)। কাঞ্চীর বিখ্যাত কৈলাসনাথ মন্দিরের তিনি হলেন নির্মাতা, মহাবলীপুরমের সমুদ্রতীরে তিনি একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তিনি বহুশাস্ত্রে পারঙ্গম, রুচিশীল রাজা ছিলেন (He was a man of varied tastes.)। সম্ভবত সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের লেখক দণ্ডিন তাঁর সভায় ছিলেন, ভাসের নাটকগুলি তার সময়ে অভিনীত হয়। দ্বিতীয় নরসিংহবর্মনের পুত্র দ্বিতীয় পরমেশ্বরবর্মন ৭২২-৭৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে চালুক্য যুবরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য পল্লব রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন।

পল্লব রাজবংশের পরবর্তী শাসক হলেন দ্বিতীয় নন্দীবর্মন পল্লবমল্ল (৭৩০-৮০০), সম্ভবত জনগণ পল্লব রাজপুত্রদের মধ্যে তাঁকে নির্বাচিত করেছিল। সিংহাসন আরোহণের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র বারো বছর। পল্লব, চালুক্য ও পাণ্ড্যদের লেখগুলিতে এই পল্লব রাজার কীর্তিকাহিনীর পরিচয় পাওয়া যায়। ৭৪০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ চালুক্য রাজা দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য পল্লব রাজ্য আক্রমণ করে কাঞ্চী অধিকার করেছিলেন। এই চালুক্য রাজা মন্দিরের সব লুণ্ঠিত সম্পদ ফিরিয়ে দেন। পল্লব-পাণ্ড্য যুদ্ধের সময় সম্ভবত চালুক্য আক্রমণের ঘটনাটি ঘটেছিল। নন্দীবর্মন কাঞ্চী পুনরুদ্ধার করেন। পাণ্ড্যরা পল্লবদের বিরুদ্ধে চালুক্যদের সঙ্গে জোট বেঁধেছিল, নন্দীবর্মনকে এই বিরোধী জোটের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। নন্দীবর্মন তাঞ্জোরে পাণ্ড্যদের পরাস্ত করেন, পূর্ব চালুক্যদের বেঙ্গি রাজ্যের একাংশ অধিকার করে নেন। রাষ্ট্রকূট শাসক দন্তিদুর্গ কাঞ্চী অধিকার করে নন্দীবর্মনের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করেন, তাঁর কন্যা রেবার সঙ্গে নন্দীবর্মনের বিবাহ হয়। পশ্চিমের গঙ্গারা দাবি করেছে তারা পল্লব রাজা নন্দীবর্মনকে পরাস্ত করেন। এই দাবির সমর্থন পাওয়া যায় না, বরং নন্দীবর্মন একজন গঙ্গা রাজাকে পর্যুদস্ত করেছিলেন এমন নজির আছে।

নন্দীবর্মন কাঞ্চীতে মুক্তেশ্বর ও বৈকুণ্ঠপেরুমল নামে মন্দির নির্মাণ করেন। তিনি বৈষ্ণব ধর্মমতে বিশ্বাসী ছিলেন। সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ধর্মের ক্ষেত্রে এই পল্লব রাজার বিশিষ্ট অবদান ছিল। তাঁর রাজত্বকালে তিরুমঙ্গল আলভার নামে একজন সন্ন্যাসী-পণ্ডিতের আবির্ভাব হয়। নন্দীবর্মন নিজে একজন পণ্ডিতরাজা ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র দন্তিবর্মন পল্লবদের রাজা হন। এই সময় থেকে দক্ষিণ ভারতে চোলদের উত্থান শুরু হয়। পল্লব, পাণ্ড্য ও চালুক্যদের লেখগুলিতে চোলদের রাজ্য, সৈন্যবাহিনী ও রাজপরিবারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ত্রিচিনোপলির কাছে য়ুরাইউর (Uraiyur)

ছিল তাদের আদি ক্ষমতার কেন্দ্র। পল্লব, চালুক্য ও পাণ্ড্যদের সংঘাতের যুগে তারা অধীনস্থ শাসকের মতো ছিল। বিভিন্ন রাজবংশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তারা নিজেদের অবস্থানকে শক্তিশালী করেছিল। শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল, তারা ছিল জৈন ও বৌদ্ধধর্ম বিরোধী। চোল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন বিজয়ালয়, তিনি তাঞ্জোরে চোল রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের প্রথম দিককার একটি লেখতে বিজয়ালয়কে 'চোলদেব' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

দুশো বছরের অধিককাল ধরে চালুক্য, পল্লব ও রাষ্ট্রকূটরা ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। এই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে চালুক্য ও পল্লব দুই পক্ষেরই প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। চালুক্য ও পল্লবদের পতনের কারণ হলো এই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ। চালুক্যদের প্রাদেশিক শাসকরা শক্তিশালী হয়ে উঠে কেন্দ্রীয় শক্তির পতন ঘটিয়েছিল। চালুক্য-পল্লব দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে রাষ্ট্রকূট বংশের প্রতিষ্ঠাতা দন্তিদুর্গ রাজ্য স্থাপনের পথে এগিয়ে যান। প্রথম কৃষ্ণ রাষ্ট্রকূট রাজ্যের সম্প্রসারণ ঘটান, চালুক্যরা তাদের বাধা দিতে পারেনি। দক্ষিণে পল্লবরা চালুক্যদের নিয়ে এত ব্যস্ত ছিল যে তারা পাণ্ড্য ও চোলদের বিরুদ্ধে যথাযথ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। চালুক্যরা বা তাদের গুজরাটের প্রাদেশিক শাসকরা আরবদের অনুপ্রবেশে বাধা দিলেও স্থায়ী প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। চালুক্য-পল্লব দ্বন্দ্ব আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্পের উন্নতি ব্যাহত হয়েছিল। দুশো বছরের এই যুদ্ধ না থাকলে দক্ষিণ ভারতের যে আরো উন্নতি হতো তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না। অবিরাম যুদ্ধ, নৈরাজ্য, লোকক্ষয় ও সম্পদের অপচয় কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের সহায়ক হয়নি। অর্থনৈতিক উন্নতির প্রাথমিক আবশ্যিক পূর্ব শর্ত হলো দীর্ঘস্থায়ী শান্তি। চালুক্য বা পল্লবরা এই শান্তি রক্ষা করেননি, এজন্য সামাজিক অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছিল।

পরিশিষ্ট ২

আজমীর ও দিল্লির চৌহান রাজা পৃথ্বিরাজ (১১৭৭-১১৯২)

ইতিহাস পরাজিত নায়ককে মনে রাখে না, বহুগুণের আধার হলেও না। বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে এর উদাহরণ পাওয়া যায়। আদি মধ্যযুগের ইতিহাসে এরকম একজন হতভাগ্য নায়ক হলেন পৃথ্বিরাজ চৌহান, ইতিহাস যাকে মনে রাখেনি। পৃথ্বিরাজের পিতা সোমেশ্বর ছিলেন সপাদলক্ষ দেশের রাজা (আজমীর ও দিল্লি), মায়ের নাম কর্পূরদেবী, তিনি ত্রিপুরীর কলচুরি পরিবারের রাজকন্যা ছিলেন। পৃথ্বিরাজের জন্ম তারিখ নিয়ে মতানৈক্য আছে, ১১৬২-৬৫ মধ্যে তার জন্ম হয়। ১১৭৭ খ্রিস্টাব্দে পিতা সোমেশ্বরের মৃত্যু হলে তিনি আজমীর ও দিল্লির রাজা হন। পিতা তাঁকে সাহিত্য ও সামরিক বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত করে তুলেছিলেন (Prithviraj was properly educated in letters and military science.)। প্রথম জীবনে মাতা তাঁর অভিভাবিকা ছিলেন। কর্পূরদেবী তাঁর পিতৃরাজ্যের ভুবনৈকমল্লকে তাঁর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন। তিনি পৃথ্বিরাজের রাজ্যকে সযত্নে রক্ষা করেন এবং চতুর্দিকে এই রাজ্যের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন (He is said to have guarded the six virtues of Prithviraj and sent the imperial armies in all directions to add to the glory of his sovereign.)। নাগ রাজবংশ ছিল চৌহানদের শত্রু, ভুবনৈকমল্ল তাদের পর্যুদস্ত করেন। কর্পূরদেবী একবছর পৃথ্বিরাজের অভিভাবিকা ছিলেন। এই সময় আজমীরের সমৃদ্ধি এসেছিল, শহরে উদ্যান, জলাশয় ইত্যাদি নির্মাণ করে সুসজ্জিত করে গড়ে তোলা হয়। ১১৭৮ খ্রিস্টাব্দে পৃথ্বিরাজ স্বহস্তে ক্ষমতা তুলে নেন।

পৃথ্বিরাজের সভাকবি জয়ানক ছিলেন কাশ্মীরের অধিবাসী। তিনি *পৃথ্বিরাজ বিজয়ে* তাঁর জীবনের ইতিহাস রেখে গেছেন। চাঁদ বরদাই পরবর্তীকালে পৃথ্বিরাজের ইতিহাস লিখেছেন *পৃথ্বিরাজ রসো* কাব্যে। *হাম্মীর মহাকাব্যে* পৃথ্বিরাজ সম্পর্কে অনেক তথ্য আছে। জৈন লেখক মেরুতুঙ্গ *প্রবন্ধ চিন্তামণিতে* পৃথ্বিরাজের কথা, সামরিক অভিযানের কথা উল্লেখ করেছেন। লেখক জীনপাল *খরতর গচ্ছ পত্তাবলীতে* অনেক তথ্য দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন যে পৃথ্বিভট্ট নামে রাজার একজন চারণ ছিলেন। জীনপাল আরো জানিয়েছেন যে কবি বিদ্যাপতিগৌড় ও বাগীশ্বর জনার্দন রাজা পৃথ্বিরাজের সভায় এসেছিলেন। পৃথ্বিরাজ প্রবর্তিত রুপো ও অন্যান্য ধাতুর কয়েকটি মুদ্রা পাওয়া গেছে। পৃথ্বিরাজের ইতিহাসের উৎস খুব দুর্বল নয়। এসব তথ্য থেকে উপাদান সংগ্রহ করে পৃথ্বিরাজ সম্পর্কে ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হয়েছে।

পৃথ্বিরাজ রসোতে বলা হয়েছে যে রাজার কয়েকজন রানী ছিলেন। তাঁর বড় রানী ইচ্ছানী দেবী ছিলেন পরমার জৈতার কন্যা, দেবগিরির যাদব বংশের কন্যা শশীব্রতা ছিলেন তাঁর আর একজন রানী। পৃথ্বিরাজ বিজয়ে বলা হয়েছে রাজা কনৌজের গহড়বল বংশীয় রাজা জয়চন্দ্রের কন্যা সংযুক্তাকে বিবাহ করেন। রাজা জয়চন্দ্র ছিলেন পৃথ্বিরাজের শত্রু, সম্ভবত সম্প্রসারণ নিয়ে কনৌজ ও আজমীরের মধ্যে বিরোধ চলেছিল। পৃথ্বিরাজ স্বয়ম্বর সভা থেকে সংযুক্তাকে অপহরণ করে বিবাহ করেন। সমকালীন উপাদানে এমন ইঙ্গিত আছে যে সংযুক্তা পৃথ্বিরাজের বীরত্বের কাহিনী শুনে তাঁকে মনে মনে বরণ করেছিলেন (The story runs that Samyogita entertained a keen desire to become the consort of Prithviraj when she heard of his prowess)। চাঁদ বরদাই এই রোমান্টিক প্রণয় কাহিনীর যে বর্ণনা দিয়েছেন তার সবটাই হয়তো সত্য নয়, তবে এর মধ্যে অবশ্যই কিছু সত্য আছে।

কদম্বভাস ছিলেন পৃথ্বিরাজের প্রধানমন্ত্রী। পৃথ্বিরাজের আরো কয়েকজন দক্ষ ও অনুগত মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ অফিসার ছিলেন। তাঁর পিতা সোমেশ্বররের যুদ্ধ ও শান্তি বিষয়ক মন্ত্রী ছিলেন সোধা। সোধার দুই পুত্র স্কন্দ ও বামন রাজার পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করতেন। পৃথ্বিরাজ স্কন্দকে তাঁর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন আর বামন ছিলেন তাঁর যুদ্ধ ও শান্তি বিষয়ক মন্ত্রী। গৌড়ের অধিবাসী উদয়রাজ ছিলেন পৃথ্বিরাজের একজন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার, সোমেশ্বর ছিলেন তাঁর একজন মন্ত্রী। সিংহাসনে আরোহণের পর পৃথ্বিরাজ চতুর্দিকে বিপদ লক্ষ করেছিলেন। ১১৭৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি সংবাদ পেয়েছিলেন মৈজুদ্দিন মহম্মদ নামে একজন তুর্কি সুলতান, উচ ও মরুভূমির মধ্য দিয়ে গুজরাটের দিকে এগিয়ে আসছেন। মৈজুদ্দিন জেনেছিলেন যে আজমীর ও দিল্লির অধীশ্বর পৃথ্বিরাজ হলেন মুসলমানদের শত্রু। তিনি পৃথ্বিরাজের কাছে দূত পাঠিয়ে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস চালিয়েছিলেন, তাঁর এই প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল। মৈজুদ্দিন মাড়োয়ার পৌঁছে সোমেশ্বর মন্দিরটি লুণ্ঠন করেন। তিনি চৌহানদের দ্বিতীয় শাখার রাজধানী নাদোল (নাদুলা) জয় করলে পৃথ্বিরাজ বিচলিত বোধ করেন। পৃথ্বিরাজ মৈজুদ্দিনের সঙ্গে ঐ সময়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হবার বাসনা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞ মন্ত্রী কদম্বভাস তাঁকে নিরস্ত করেন। তিনি পৃথ্বিরাজকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার পরামর্শ দেন। গুর্জরদের সঙ্গে লড়াই করে মৈজুদ্দিনের শক্তিক্ষয় তিনি চেয়েছিলেন। ঠিক এই সময়ে গুজরাট থেকে দূত এসে পৃথ্বিরাজকে জানিয়েছিল যে মৈজুদ্দিন যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে বিতাড়িত হয়েছেন। গুজরাটের চালুক্য শাসক দ্বিতীয় মূলরাজ মৈজুদ্দিনকে পরাস্ত করে বিতাড়িত করেন। মন্ত্রী কদম্বভাস তাঁকে সুপরামর্শ দিয়েছিলেন।

পৃথ্বিরাজ গৃহবিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর পিতৃব্য চতুর্থ বিগ্রহরাজের পুত্র নাগার্জুনের সঙ্গে তিনি বিরোধে লিপ্ত হন। নাগার্জুন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তিনি গুদাপুরা নামক একটি স্থান দখল করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পৃথ্বিরাজ নিজে বিদ্রোহীকে শাস্তিদানের জন্য এগিয়ে যান, নাগার্জুন পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন, তার পরিবার পৃথ্বিরাজের হাতে বন্দী হয়। বিজয়গৌরবে তিনি রাজধানী অজয়মেরুতে (আজমীর) ফিরে আসেন। ১১৮২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ পৃথ্বিরাজ আলওয়ার রাজ্যের ভিবানী অঞ্চল আক্রমণ করেন। এখানকার ভাগুনক বংশীয় শাসক তাঁকে বাধা দিয়ে পরাস্ত হন। জীনপাল তাঁর *খরতর গচ্ছ পত্তাবলীতে* জানিয়েছেন যে পৃথ্বিরাজ দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিলেন। তিনি কোন্ কোন্ রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন জীনপাল তার উল্লেখ করেননি। অন্য উপাদান থেকে জানা যায় তিনি জেজকভুক্তির (বুন্দেলখণ্ড) রাজা চান্দেল্ল বংশীয় পরমারদিকে (পরমাল) আক্রমণ করেন। রাজার দুই বীর সেনাপতি আলহা ও উদল যুদ্ধ করে পরাস্ত হয়। পৃথ্বিরাজ যুদ্ধে জয়ী হয়ে মাহোবা ও কালাঞ্জর লুণ্ঠন করেন। চাঁদ বরদাই এই যুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন, অন্যান্য নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকেও এই যুদ্ধের কথা জানা যায়। ১১৮২ খ্রিস্টাব্দের মদনপুর লেখতে এই যুদ্ধের উল্লেখ আছে। পৃথ্বিরাজ এই অঞ্চলের উপর তার আধিপত্য বজায় রাখতে পারেননি। কালাঞ্জর ও মাহোবার দুটি লেখতে বলা হয়েছে ১১৮৩ খ্রিস্টাব্দে চান্দেল্লরা এই অঞ্চলের শাসক ছিলেন।

পৃথ্বিরাজ গুজরাটের চালুক্য রাজা দ্বিতীয় ভীমের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। পৃথ্বিরাজের সঙ্গে চালুক্য রাজার সম্পর্ক ভাল ছিল না কারণ উভয়ে পার্শ্ববর্তী শাকম্ভরিতে সম্প্রসারণ চেয়েছিলেন। ১১৮৭ খ্রিস্টাব্দের কিছু সময় আগে পৃথ্বিরাজ গুজরাটের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান শুরু করেন। ভীমের প্রধানমন্ত্রী ধারাবর্ষ দাবি করেছেন যে তিনি জঙ্লিদেশের রাজা পৃথ্বিরাজের আক্রমণ প্রতিহত করেন। যুদ্ধে সম্ভবত জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়নি কারণ গুজরাটের রাজা দ্বিতীয় ভীম পৃথ্বিরাজের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করেন। এই যুদ্ধের পর গুজরাটে পৃথ্বিরাজের রাজ্যের বণিকদের ওপর অত্যাচার কমেছিল, রাজা ভীম সন্ধির শর্ত মেনে চলেছিলেন। এসব যুদ্ধবিগ্রহের ফলে পৃথ্বিরাজের রাজ্যের সম্প্রসারণ ঘটেনি। তাঁর রাজ্য পশ্চিমে হিসার থেকে দিল্লি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তার রাজ্যের দক্ষিণে ছিল মেবারের গুহিলরা ও নাদোলের চৌহানরা। এই চৌহানরা গুজরাটের শাসকের সামন্ত রাজা ছিল। পূর্ব দিকে ছিল বায়ানা-শ্রীপথের যদুবংশীয়রা, গোয়ালিয়রের কচ্ছপাঘটরা এবং কনৌজে গহড়বলরা। উত্তর-পশ্চিমে ছিল ইয়ামিনিদের লাহোর রাজ্য। পৃথ্বিরাজের রাজত্বকালের মোট ছটি লেখ পাওয়া গেছে, এগুলি থেকে তার রাজত্বের ১১৭৭-৮৮ পর্যন্ত সময়কালের ইতিহাস পাওয়া যায়।

পৃথ্বিরাজ নির্বিঘ্নে তাঁর রাজ্য দীর্ঘকাল ভোগ করতে পারেননি। গজনির ইয়ামিনি রাজবংশের পতন ঘটিয়ে ঘুররা ঘুর রাজ্য স্থাপন করেছিল। ঘুররা পশ্চিম পাঞ্জাব অধিকার করলে চৌহানদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। ঘুর রাজ্যের অন্তর্গত গজনির প্রাদেশিক শাসক মৈজুদ্দিন মহম্মদ হিন্দুস্তান জয়ের লক্ষ্য নিয়ে পৃথ্বিরাজের রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত তাবারহিন্দা অধিকার করেন। তাবারহিন্দা হলো পাতিয়ালা রাজ্যের সরহিন্দ। মৈজুদ্দিন তাবারহিন্দা দুর্গটি জয় করে তাঁর সেনাপতি মালিক জিয়াউদ্দিনের অধীনে স্থাপন করেন। তাবারহিন্দা অধিকৃত হলে পশ্চিমের সামন্ত রাজাদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল। পৃথ্বিরাজের দিল্লির গভর্নর গোবিন্দরাজের পুত্র চন্দ্ররাজ পশ্চিমের সামন্তদের নিয়ে পৃথ্বিরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শিহাবুদ্দিনের আক্রমণের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির বর্ণনা দেন। শিহাবুদ্দিন পশ্চিম অঞ্চলের শহরগুলি ধ্বংস করেছেন, মহিলারা অসম্মানিতা হয়েছেন, জনগণ দুর্দশার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন (Shihabuddin had pillaged and burnt most of their cities, defiled their women, and reduced them altogether to a miserable plight.)।

পৃথ্বিরাজ তাঁর পশ্চিমের সামন্ত রাজাদের দুর্দশার কথা শুনে দু লক্ষ অশ্বারোহী ও তিন হাজার হাতি নিয়ে মৈজুদ্দিনকে শাস্তিদানের জন্য বেরিয়েছিলেন। দিল্লির গভর্নর গোবিন্দরাজ সহ বেশ কয়েকজন সামন্ত রাজা তাঁর সঙ্গে ছিলেন। মৈজুদ্দিন পৃথ্বিরাজের অভিযানের সংবাদ পেয়ে তরাইনের রণক্ষেত্রে তাঁর সম্মুখীন হন (১১৯১)। যুদ্ধ শুরু হলে বামে ও দক্ষিণে তাঁর সৈন্যবাহিনী পরাস্ত হয়েছিল, মধ্যস্থলে সৈন্য সংখ্যা কমেছিল। তাঁর সহকর্মীরা মৈজুদ্দিনকে পশ্চাদপসরণের পরামর্শ দেন। ঘুরি এই পরামর্শ শোনেননি, যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। গোবিন্দরাজ বর্শা ছুঁড়ে ঘুরিকে আহত করেন, একজন খল্‌জি সৈনিক আহত সুলতানকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে যান, তাঁর প্রাণরক্ষা হয়। সুলতান যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে গেলে চৌহানরা তাঁর বাহিনীকে পরাস্ত করেছিল। পৃথ্বিরাজের সেনাপতি স্কন্দ এই যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। হাম্মীর মহাকাব্য অনুযায়ী মৈজুদ্দিন বন্দী হয়েছিলেন, পৃথ্বিরাজ তাঁকে মুক্তি দেন। সম্ভবত এর মধ্যে অতিশয়োক্তি আছে। তরাইনের যুদ্ধের পর পৃথ্বিরাজ তাবারহিন্দা দুর্গ অবরোধ করেন। দুর্গের তুর্কি অধিপতি মালিক জিয়াউদ্দিন তেরোমাস দুর্গ রক্ষা করে আত্মসমর্পণ করেন। পৃথ্বিরাজ তাবারহিন্দা অধিকার করে পাঞ্জাবে তাঁর অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। তরাইনের প্রথম যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে মৈজুদ্দিন অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করেন। এই সৈন্যবাহিনী নিয়ে পেশোয়ার ও মুলতান হয়ে তিনি লাহোরে প্রবেশ করেন। হাম্মীর মহাকাব্যে বলা হয়েছে যে মৈজুদ্দিন স্থানীয় রাজাদের সহায়তা নিয়েছিলেন। এদের নামধাম পাওয়া যায় না। মৈজুদ্দিন আজমীরে পৃথ্বিরাজের সভায় রুকনুদ্দিন হামজা নামক এক ব্যক্তিকে

দূত হিসেবে পাঠিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বলেন, অন্যথায় যুদ্ধ হবে বলে ভয় দেখান। পৃথ্বিরাজ যুদ্ধের পথ বেছে নিয়ে তিন লক্ষ অশ্বারোহী ও তিন হাজার হাতি নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। হিন্দুস্তানের রাজারা তাঁর সঙ্গে যোগ দেন, একশ পঞ্চাশ জন সর্দার তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

পৃথ্বিরাজ আগের বছর মৈজুদ্দিনকে পরাস্ত করেছিলেন, তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিল তুঙ্গে। তার দক্ষ সেনাপতি স্কন্দ অন্যত্র যুদ্ধে ব্যস্ত ছিল। অন্য সেনাপতি উদয়রাজাও পৃথ্বিরাজের সঙ্গে যোগ দিতে পারেনি। পথের মধ্যে দিল্লির প্রাদেশিক শাসক গোবিন্দরাজ তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। পৃথ্বিরাজ শত্রুর দিকে এগিয়ে গেলে তাঁর বিজ্ঞ মন্ত্রী সোমেশ্বর আর অগ্রসর না হওয়ার পরামর্শ দেন, রাজা তাঁকে সন্দেহ করে পদচ্যুত করেন। সোমেশ্বর অপমানিত হয়ে মুসলমানদের সঙ্গে যোগ দেন। ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে পৃথ্বিরাজ ও মৈজুদ্দিন তরাইনের রণক্ষেত্রে (থানেশ্বরের কাছে) দ্বিতীয়বার মিলিত হন। পৃথ্বিরাজ ঔদ্ধত্য দেখাননি, তিনি মৈজুদ্দিনকে তাবারহিন্দা সহ পাঞ্জাব নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে বলেন। এই মর্মে তিনি তাকে একখানি পত্র লিখেছিলেন। এই পত্র পেয়ে মৈজুদ্দিন সামরিক প্রস্তুতির জন্য একটি কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি উত্তরে পৃথ্বিরাজকে জানিয়েছিলেন যে তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঘুরের শাসক গিয়াসউদ্দিনের অনুমতি না পেলে পশ্চাদপসরণ করতে পারেন না। পৃথ্বিরাজের সৈন্যবাহিনী এই সংবাদ পেয়ে প্রস্তুতি খানিকটা শিথিল করে দেয়। মৈজুদ্দিন আকস্মিকভাবে আক্রমণ হানার জন্য প্রস্তুত হন। তিনি রাত্রিবেলা নদী পেরিয়ে শত্রুবাহিনীর পশ্চাতে গিয়ে হাজির হন। চৌহান বাহিনী এই আকস্মিক আক্রমণে খানিকটা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল। পৃথ্বিরাজ তাঁর অশ্বারোহী বাহিনী ব্যবহার করে শত্রুর পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেন। মৈজুদ্দিন তাঁর সৈন্য বাহিনীকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে আক্রমণ করেন। শত্রুর ডান, বাম, মধ্য ও পশ্চাদ্দেশ আক্রান্ত হয়। সারাদিন যুদ্ধের পর ক্লান্ত চৌহান সৈন্যের ওপর মৈজুদ্দিন নিজে আক্রমণ পরিচালনা করেন, এক লক্ষ চৌহান সৈন্য নিহত হয়। পৃথ্বিরাজ পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে বন্দী হন। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১১৯২) মৈজুদ্দিন মহম্মদ ঘুরি জয়ী হন। বিজয়ী মৈজুদ্দিন বন্দী পৃথ্বিরাজকে নিয়ে রাজধানী আজমীরে প্রবেশ করেন। আজমীরের মন্দির ধ্বংস করে তিনি মসজিদ নির্মাণ করেন, ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। বন্দী পৃথ্বিরাজ সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে তাঁর আদেশে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

প্রথম দিককার মুসলমান ঐতিহাসিকরা পৃথ্বিরাজের পরাজয় ও মৃত্যুর বিবরণ দিয়েছেন। সমকালীন একখানি সংস্কৃত গ্রন্থে পৃথ্বিরাজের করুণ পরিণতির কথা উল্লিখিত হয়েছে (The king was slaughtered by the Turushkas.)। মেরুতুঙ্গ *প্রবন্ধ চিন্তামণিতে* লিখেছেন যে রাজার অপমানিত মন্ত্রী সোমেশ্বর তুর্কিদের পথ দেখিয়ে

তার শিবিরে নিয়ে এসেছিলেন। এই বর্ণনার মধ্যে কতখানি সত্য আছে নিশ্চিত করে বলা যায় না। পৃথ্বিরাজ সম্পর্কে যা নিশ্চিত করে জানা যায় তা হলো সমরনায়ক হিসেবে তাঁর দক্ষতা ছিল, কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির অভাব ছিল (Prithviraj was evidently a general of high order, but he lacked political foresight.)। মুসলমানদের সঙ্গে সংঘর্ষে ভারতীয় রাজারা সব সময় আত্মরক্ষার ওপর জোর দিয়েছেন, পরাজিত শত্রুকে ধ্বংস করার কথা ভাবেননি। পৃথ্বিরাজ এই ত্রুটি থেকে মুক্ত ছিলেন না। প্রথম তরাইনের যুদ্ধে জয়ের পর পৃথ্বিরাজ পাঞ্জাব থেকে ঘুরিদের বিতাড়িত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। উত্তর-পশ্চিমে তাঁর সীমান্তদুর্গ তাবারহিন্দার সুরক্ষার কোন ব্যবস্থা তিনি করেননি। প্রথম যুদ্ধের পর তিনি রাজধানী আজমীরে ফিরে আসেন যার পরিণতি হয়েছিল ভয়ঙ্কর।

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের পর (১১৯২) শুধু চৌহানরা ক্ষমতা হারিয়েছিলেন তা নয়, সমগ্র উত্তর ভারত বিপর্যের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। অধীনস্থ শাসক ও জনগণ আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল, সর্বত্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল। অনেক উত্তর ভারতীয় পরিবার উত্তর ভারত ছেড়ে দক্ষিণ ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। জৈনগুরু অসাধর জানিয়েছেন যে আজমীরের পতন হলে (সপাদলক্ষ) তিনি পরিবার নিয়ে মালবে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মৈজুদ্দিনের পক্ষে বিজয়ের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। সমকালীন তথ্যসূত্র থেকে জানা যায় পৃথ্বিরাজের মৃত্যুর পর তাঁর সেনাপতি স্কন্দ তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিরাজাকে শাকম্ভরির সিংহাসনে বসিয়ে দেন। হাসান নিজামী জানাচ্ছেন যে পৃথ্বিরাজের মৃত্যুর পর মৈজুদ্দিন তাঁর শিশুপুত্রকে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। আজমীর থেকে মৈজুদ্দিন দিল্লিতে আসেন, সেখানে গোবিন্দরাজের পুত্র তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে বার্ষিক কর দিতে রাজী হন। দিল্লিতে কুতুবুদ্দিন আইবককে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে রেখে সুলতান গজনিতে ফিরে যান। আইবক হরিরাজার বিদ্রোহ দমন করে রণথম্ভোরের ওপর তার অধিকার স্থাপন করেন। হরিরাজা পৃথ্বিরাজের পুত্রকে আজমীর থেকে বিতাড়িত করে তা দখল করেন। ১১৯৪ খ্রিস্টাব্দে একটি লেখতে হরিরাজাকে আজমীরের শাসক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই হরিরাজা উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির শাসক ছিলেন, তিনি জনগণের আনুগত্য হারিয়ে ছিলেন। কুতুবুদ্দিন আজমীর দুর্গ আক্রমণ করলে রাজা সপরিবারে আত্মবিসর্জন দেন, শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। কুতুবুদ্দিন আজমীরে নিজের গভর্নর নিয়োগ করে দিল্লিতে ফিরে আসেন, চৌহান রাজত্বের অবসান ঘটে।

পরিশিষ্ট ৩

রাজা গণেশ (দনুজমর্দনদেব)

বাংলার সুলতানি যুগের দুশো বছরের ইতিহাসে একটি অভিনব ও আশ্চর্যজনক ঘটনা হলো গণেশের সিংহাসন লাভ। পঞ্চদশ শতকের গোড়ারদিকে তিনি সিংহাসন লাভ করেন এবং সব সাক্ষ্যপ্রমাণ অনুযায়ী তিনি সাতবছর রাজত্ব করেছিলেন (হিজরি ৮১৪-৮২১)। গণেশ সম্পর্কে আকরের উৎস হলো *রিয়াজ-উস-সালাতিন*, ফিরিস্তার ইতিহাস, *সঙ্গীত শিরোমণি*, লেখ, মুদ্রা এবং সমকালীন দুজন সুফি দরবেশের চিঠিপত্র। এঁরা হলেন বাংলার নূর কুতুব-উল-আলম এবং উত্তরপ্রদেশের দরবেশ আসরাফ সিমানি। বুকাননের রিপোর্ট এবং চিনা পর্যটকদের বিবরণীতে গণেশের রাজ্য লাভের কথা আছে। গণেশ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য খুবই কম। তাঁর অতীত কার্যকলাপ সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করা যায় নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। গণেশ সম্ভবত দিনাজপুরের ভাতুড়িয়ার জমিদার ছিলেন (অন্যমতে রাজশাহীর ভাতুড়িয়া পরগণা)। সমকালীন চিঠিপত্রে তাঁকে একজন প্রভাবশালী জমিদার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মুসলিম ঐতিহাসিকরা তাকে কানস বলে উল্লেখ করেছেন। আবুল ফজল আইনে এই শক্তিশালী বাংলার জমিদারের কথা উল্লেখ করেছেন। এদের পরিবার চারশো বছরের পুরনো অভিজাত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সিংহাসন দখল করে তিনি উপাধি নেন রাজা গণেশ দনুজমর্দনদেব।

পঞ্চদশ শতকের গোড়ারদিকে ইলিয়াস শাহী বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য শাসক গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ মারা যান। এরপর দুজন অপদার্থ শাসক সিংহাসনে বসেন। সৈফুদ্দিন হামজা শাহ বা আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ কেহই যোগ্য শাসক ছিলেন না। সেই যুগে বাংলার প্রভাবশালী হিন্দু জমিদাররা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। রাজনীতি, যুদ্ধ, শাসন সববিষয়ে ইলিয়াস শাহী শাসকরা হিন্দুদের পরামর্শ নিতেন, এদের উচ্চপদে বসিয়েছিলেন। বারানি জানিয়েছেন যে বাংলার হিন্দু জমিদাররা সুলতানদের পক্ষ নিয়ে লড়াই করত। ইলিয়াস শাহী বংশের শেষ পর্বে দেশে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল কারণ অভিজাতরা উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বে হস্তক্ষেপ করেছিল। অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে ইলিয়াস শাহী বংশ দুর্বল হয়ে পড়লে সেই সুযোগে প্রভাবশালী ভাতুড়িয়ার জমিদার গণেশ ক্ষমতা দখল করে সিংহাসনে বসেন এবং সাতবছর ধরে রাজত্ব করেন। রাজা গণেশকে নিয়ে একটি বড় ধরনের বিতর্ক আছে। বাংলার সেই সময়কার প্রভাবশালী দরবেশ নূর কুতুব আলম হিন্দু গণেশ রাজা হয়ে বসাতে উৎকণ্ঠিত হন। তিনি জৌনপুরের শর্কি শাসককে বাংলা আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান।

ইব্রাহিম শর্কি তখন দিল্লির সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত ছিলেন, তাঁর সহায়ক ছিলেন উত্তরপ্রদেশের হিন্দু জমিদাররা। রিয়াজের মতে, দরবেশের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি বাংলা সীমান্তে আসেন। গণেশ ভয় পেয়ে পুত্র যদুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন, তার হাতে শাসনভার তুলে দেন। শর্কি জৌনপুরে ফিরে গেলে গণেশ পুত্রকে বন্দী করে আবার রাজা হয়ে বসেন। এই কাহিনীর সত্যতা নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন। অনেকে মনে করেন দরবেশ নূর কুতুব আলমের চিঠিখানি হয়তো প্রক্ষিপ্ত। এমন সম্ভাবনা বাতিল করা যায় না যে বাংলার শক্তিশালী হিন্দু অভিজাতদের নেতা গণেশ হিন্দু পুনরুত্থান আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন কিন্তু তার পরিবারের মধ্যেই বিরোধ দেখা দেওয়ায় তিনি ব্যর্থ হন। ড. সুকুমার সেন জানিয়েছেন যদু পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন মুসলিম অভিজাতদের সমর্থন লাভের আশায়। *সঙ্গীত শিরোমণিতে* বলা হয়েছে যে সুলতান ইব্রাহিম শর্কি যদুকে ধর্মান্তরিত করে সিংহাসনে বসিয়ে দেন।

গণেশের চরিত্র নিয়ে আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নেই। ফিরিস্তা লিখেছেন যে গণেশ একজন সুশাসক ছিলেন, তাঁর শাসনকালে জনগণ সুখে ও শান্তিতে ছিল। সুখময় মুখোপাধ্যায় *বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর* গ্রন্থে লিখেছেন, "বাংলাদেশের মধ্যযুগের ইতিহাসে যাঁদের নাম ভাস্বর অক্ষরে লেখা রয়েছে, রাজা গণেশ তাঁদের অন্যতম। একক কৃতিত্বের দিক দিয়ে গণেশের সঙ্গে খুব কম লোকেরই তুলনা চলতে পারে। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা ছিল মুসলমানদের অধিকারে। এরমধ্যে কোন কোন সময় অঞ্চলবিশেষে হিন্দুদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছে বটে, কিন্তু সমগ্র বাংলার সিংহাসন অধিকার এই একটিমাত্র হিন্দুর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে গণেশ বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের মতো আবির্ভূত হয়ে অসাধ্য সাধন করেছিলেন, প্রবল বিরুদ্ধ শক্তির বাধাকে জয় করে বাংলায় হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গণেশের কীর্তি সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে দ্বিমত নেই।"

অধ্যাপক আবদুল করিম গণেশের চক্রান্তকে তার ক্ষমতা দখলের আসল কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। গণেশ বীর ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন সুযোগসন্ধানী চক্রান্তকারী ষড়যন্ত্রকারী। তবে তিনিও স্বীকার করেছেন যে "বাংলাদেশের পাঁচশত বৎসর ধরিয়া একটানা মুসলমান শাসনের মধ্যে তিনি ছেদ টানিয়াছিলেন এবং স্বল্প সময়ের জন্য হইলেও হিন্দু শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইহা তার কূটনীতি জ্ঞানের পরিচায়ক। রাজনৈতিক দলাদলিতে তিনি নিপুণ ছিলেন।" গণেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে যে তিনি মুসলমানদের ওপর অত্যাচার করেছিলেন, নূর কুতুব আলমের আত্মীয়দের ওপর অত্যাচার করেন। এসব অভিযোগের কোনো অকাট্য প্রমাণ নেই। বাংলার অভিজাতদের একাংশ ছিল অবশ্যই মুসলমান। তাদের স্বধর্মীদের

চটিয়ে তিনি ক্ষমতালাভ করবেন বা ক্ষমতায় টিকে থাকবেন এমন আশা করা যায় না। *সঙ্গীত শিরোমণি* থেকে অধ্যাপক করিম যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা অবশ্যই অতিরঞ্জিত। মুসলমান ঐতিহাসিকরা হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের কাহিনী যেভাবে অতিরঞ্জিত করেছেন, সঙ্গীত শিরোমণির লেখকও সেভাবেই বিষয়টি উত্থাপন করেছেন—'গণেশের আগুনে মুসলমানরা পতঙ্গের মত পুড়ে মরেছিল'। *তারিখ-ই-ফিরিস্তায়* বলা হয়েছে, "যদিও রাজা কানস মুসলমান ছিলেন না, তাহলেও তিনি মুসলমানদের সঙ্গে এতখানি বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতার সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর পরে কোনো কোনো মুসলমান তাঁকে মুসলমান বলে ঘোষণা করে ইসলামের প্রথা অনুযায়ী কবর দিতে চেয়েছিলেন।" আবদুল করিম মন্তব্য করেছেন যে এই উক্তিটি অতিরঞ্জন দোষে দুষ্ট। ফিরিস্তা কখনো মুসলমানদের ওপর হিন্দু রাজাদের আক্রমণ ও অত্যাচারকে গোপন করেননি, বরং অনেক বাড়িয়ে লিখেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আহম্মদনগরের ওপর বিজয়নগরের আক্রমণ ও অত্যাচার। সেই বর্ণনা যদি সত্যি বলে ধরা হয়, এক্ষেত্রে নয় কেন? আবদুল করিমের শেষ মন্তব্য হল গণেশ উচ্চস্তরের কূটনীতিক ছিলেন এবং তিনি যেভাবে হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা প্রশংসার যোগ্য। বাংলার আধুনিককালের প্রথম সারির ঐতিহাসিকরা গণেশের কৃতিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন।

ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন যে অল্প সময়ের জন্য রাজত্ব করলেও বাংলার অধিকাংশ অঞ্চলের ওপর তিনি তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গের প্রায় সবটা এবং মধ্যবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের কতকাংশ তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল। রাজা গণেশ প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, নিষ্ঠাবান হিন্দুও ছিলেন। তবে পরধর্ম বিদ্বেষ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি। রাজনৈতিক কারণে তিনি দরবেশ ও মুসলমান অভিজাতদের একাংশকে দমন করেন, কয়েকটি মসজিদ ও মাদ্রাসা ধ্বংস করেন। তবে মুসলমানদের সম্পর্কে তাঁর দমননীতিকে অতিরঞ্জিত করে দেখানো হয়েছে বলে মনে হয়। ফিরিস্তা জানিয়েছেন অনেক মুসলমানের আন্তরিক ভালোবাসাও তিনি পেয়েছিলেন।

পরিশিষ্ট ৪

বাংলায় হাবসি শাসন (১৪৮৭-৯৩)

মাহমুদ শাহী বংশের শেষ শাসক ফতে শাহকে হত্যা করে হাবসিরা বাংলায় রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছিল এবং ছ'বছর ধরে বাংলায় হাবসি শাসন টিকে ছিল। হাবসিরা হল আফ্রিকার কৃষ্ণকায় ক্রীতদাস। এরা ক্রীতদাস হিসেবে বাংলায় এসেছিল, সুলতানদের দেহরক্ষীর কাজ করত, প্রাসাদ ও হারেম পাহারা দিত, কেউ কেউ যুদ্ধে যোগ্যতা দেখিয়ে উচ্চ অভিজাতপদে উন্নীত হয়েছিল। ফতে শাহর সময় হাবসি সর্দাররা অত্যাচারী হয়ে উঠেছিল, জনগণের ওপর এরা অত্যাচার ও উৎপীড়ন চালাত, জবরদস্তি করে অর্থ আদায় করত। বাংলায় হাবসিদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল, বারবাক শাহ অধিক সংখ্যায় এদের নিয়োগ করেন, পরবর্তী সুলতানরা এই নীতি বজায় রেখেছিলেন। এরা উদ্ধত, দাম্ভিক ও ক্ষমতালোভী হয়ে উঠেছিল। প্রাসাদের মধ্যে নানা ষড়যন্ত্রমূলক কাজের সঙ্গে এরা যুক্ত হত। ফিরিস্তা লিখেছেন যে হাবসিদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ফতে শাহ এদের কঠোর শাস্তি দেন। এদের প্রধান সর্দাররা অসন্তুষ্ট হয়ে সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে, এরই ফল হল ফতে শাহর মৃত্যু এবং হাবসি শাসনের প্রতিষ্ঠা।

প্রধান খোজা গিয়াসউদ্দিন বারবাক শাহ ফতে শাহকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করেন। সিংহাসন অধিকার করে তিনি উপাধি নেন সুলতান গিয়াসউদ্দিন বারবাক শাহ। ইনি সুলতান শাহজাদা নামেও পরিচিত ছিলেন। ফিরিস্তা জানিয়েছেন যে এই হাবসি সুলতান রুচিহীন নীচ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, নীচ প্রকৃতির মানুষকে তিনি উচ্চপদে বসিয়েছিলেন। এতে হাবসিদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং অন্য হাবসি নেতা মালিক আন্দিল একে সরানোর পরিকল্পনা করেন। আন্দিল গৌড়ে এসে রাজধানী আক্রমণ করে বারবাককে হত্যা করেন। তিনি মাত্র কয়েকমাস রাজত্ব করেন। ফিরিস্তা একে বাঙালি বলেছেন, আসলে তিনিও একজন হাবসি সর্দার ছিলেন, প্রাসাদে খোজা হিসেবে কাজ করতেন। হাবসিদের দ্বিতীয় শাসক হলেন সৈফুদ্দিন ফিরোজ শাহ (১৪৮৭-৯০)। সুলতান শাহজাদাকে হত্যা করে অমাত্যদের অনুরোধ অনুযায়ী তিনি সিংহাসন গ্রহণ করেন। রিয়াজে বলা হয়েছে যে হাবসি মালিক আন্দিল বাংলার সার্বভৌম শাসক হয়ে ফিরোজ শাহ উপাধি নেন। গৌড়ে তিনি নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি প্রজাদের শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করেছিলেন। যখন তিনি অমাত্য ছিলেন, সেইসময় তিনি অনেক মহৎ ও বীরত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন। তাঁর সৈন্যরা ও প্রজারা তাঁকে ভয় করত এবং তার বিরুদ্ধাচারণ করতে সাহস করত না। উদারতা

ও মহত্ত্বের দিক দিয়ে তাঁর তুলনা হয় না। তিনি গৌড়ে একটি মসজিদ, একটি মিনার ও একটি জলাধার নির্মাণ করেন। তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ফতে শাহর মৃত্যু থেকে দেশে যে গোলযোগ শুরু হয়েছিল তিনি তা বন্ধ করতে পারেননি। সম্ভবত তিনবছর রাজত্ব করার পর তাঁর পাইকদের হাতে তিনি নিহত হন। হত্যা ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি চলতে থাকে।

হাবসি শাসনকালের তৃতীয় সুলতান হলেন কুতুবুদ্দিন মাহমুদ শাহ (১৪৯০-৯১)। সুলতান হলেও তাঁর হাতে বিশেষ ক্ষমতা ছিল না। তাঁর শিক্ষক এক হাবসি নেতা সব ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল। সিদি বদি নামক এক হাবসি সর্দার তার শিক্ষককে হত্যা করে সুলতানকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। তিনি এই প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে সফল হয়ে সিংহাসন অধিকার করেন, সুলতান মাহমুদ এর হাতে নিহত হন। হাবসি শাসনকালের শেষ সুলতান হলেন সামসুদ্দিন মুজাফ্ফর শাহ (১৪৯১-৯৩)। মুজাফ্ফর শাহ বিশ্বাসঘাতকতা করে মাহমুদ শাহকে হত্যা করেন। সিংহাসন দখল করে তিনি বেপরোয়া হয়ে ওঠেন, সমকালীন ঐতিহাসিকরা তাকে নৃশংস ও নিষ্ঠুর বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বহুবিদ্বান, ধার্মিক ও অভিজাত ব্যক্তির প্রাণনাশ করেন। সৈয়দ হুসেন নামক এক ব্যক্তিকে তিনি উজির নিযুক্ত করেন। তিনি প্রজাদের শোষণ করে অধিক কর আদায় করতেন, সৈন্যদের বেতন কমিয়ে দেন। এর ফলে প্রধান অভিজাত, সৈন্যবাহিনীর অফিসার এবং সাধারণ মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। এমনকি সৈয়দ হোসেনও সুলতানের বিরুদ্ধাচারণ করেন, সম্ভবত এই উজিরের হাতে তিনি নিহত হন। অন্যমতে, বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু হয়। বাবরের আত্মজীবনীতে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। চারজন হাবসি রাজা ষড়যন্ত্র করে ক্ষমতা দখল করেন আবার ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে তাঁরা নিহত হন। এই অরাজক পর্বের অবসান ঘটিয়ে আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ক্ষমতা দখল করে হোসেন শাহী রাজবংশের পত্তন করেন। হাবসিরা বাংলা থেকে বিতাড়িত হয়। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার জানিয়েছেন যে হাবসি শাসকদের সকলে অত্যাচারী ছিলেন না। সৈফুদ্দিন ফিরোজ শাহ মহৎ, দানশীল ও নানাজ্ঞানে ভূষিত ছিলেন, তিনি বাংলার শ্রেষ্ঠ সুলতানদের অন্যতম। হাবসি সুলতানদের মধ্যে মুজাফ্ফর শাহ ভিন্ন অন্য কেউ অতাচারী ছিলেন না। বাংলার দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী ছিল এযুগের বিশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনী। বিদেশী হাবসিরা নয়, স্বদেশী পাইকরা ষড়যন্ত্র ও গুপ্তহত্যার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাংলায় নৈরাজ্য ডেকে নিয়ে এসেছিল।

পরিশিষ্ট ৫

কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় (৭২৪-৭৬০)

কাশ্মীরের নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক হলেন কলহণ। তাঁর *রাজতরঙ্গিণীতে* দ্বাদশ শতক পর্যন্ত কাশ্মীরের ইতিহাস পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন যে গোনানডা রাজবংশের পতন ঘটলে সপ্তম শতকের গোড়ারদিকে কারাকোটা বা নাগ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন দুর্লভবর্ধন। এই দুর্লভবর্ধনের রাজত্বকালে হিউয়েন সাঙ্ কাশ্মীর পরিদর্শন করেন। তিনি বলেছেন যে কাশ্মীরের পার্শ্ববর্তী পাঁচটি রাজ্য ঐ দেশের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এই পাঁচটি রাজ্য হল তক্ষশীলা, সিংহপুর, উরসা, পুঞ্চ ও রাজপুরা। দুর্লভবর্ধন শুধু কাশ্মীর নয়, পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাবের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এই কারাকোটা বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা হলেন ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে সারাজীবন তিনি সম্প্রসারণবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সর্বদা সামরিক অভিযান নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন (He was eager for conquests and passed his life chiefly on expeditions)। যুদ্ধবিগ্রহে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়।

রাজত্বের গোড়ারদিকে ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় কনৌজের শাসক যশোবর্মনের সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্র ধরে তিব্বতের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে সাফল্য লাভ করেন। ৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি চিনের সম্রাটের কাছে দূত পাঠিয়ে তিব্বতের বিরুদ্ধে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন। চিনের সম্রাট এই কূটনৈতিক মিশনকে স্বীকার করে নেন এবং কাশ্মীরের রাজাকে তাঁর বন্ধু বলে স্বীকৃতি দেন। তবে চিনের সম্রাট মুক্তাপীড়কে কোনো সামরিক সাহায্য দেননি। চিনের সাহায্য না পেলেও মুক্তাপীড় সামরিক অভিযান থেকে বিরত হননি। তিনি তিব্বতকে পরাস্ত করে তাঁর রাজ্যের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমের উপজাতিদের দমন করেন। এইসব উপজাতির নাম হল দর্দ, কম্বোজ ও তুর্কি। কনৌজের রাজা যশোবর্মনের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বেধেছিল, তিনি কনৌজের রাজাকে পরাস্ত করে শুধু কনৌজের অধীশ্বর হয়ে বসেননি, ঐ রাজ্যটির সার্বভৌম প্রভু হয়ে বসেন। এইসব যুদ্ধে জয়ী হয়ে ললিতাদিত্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে ওঠেন এবং দিগ্বিজয়ের স্বপ্ন দেখতে থাকেন। কলহণ তাঁর দিগ্বিজয়ের বিস্তৃত বিবরণ রেখে গেছেন। যশোবর্মনকে পরাস্ত করে তিনি পূর্বদিকে অগ্রসর হন এবং কলিঙ্গে গিয়ে পৌঁছান। গৌড়ের রাজা তাঁর আগমন বার্তা পেয়ে বিনাযুদ্ধে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন এবং যুদ্ধহস্তী উপঢৌকন হিসেবে পাঠান।

কর্নাটের মধ্য দিয়ে তিনি দক্ষিণে অগ্রসর হন। কর্নাটের রানী রট্ট তার কাছে নতিস্বীকার করেন, কোনো বাধা দেননি। বিনাবাধায় মুক্তাপীড় কাবেরি পর্যন্ত অগ্রসর

হন এবং আশপাশের কয়েকটি দ্বীপ জয় করেন। পশ্চিমদিকে অভিযান চালিয়ে তিনি কোঙ্কন অঞ্চল জয় করে দ্বারকায় গিয়ে হাজির হন। অবন্তী ও অন্যান্য রাজ্য তাঁর আগ্রাসনের শিকার হয়, উত্তর-পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চলেও তিনি অভিযান চালিয়েছিলেন। উত্তর-পশ্চিমে তিনি জয় করেন কম্বোজ, তুর্কি, তিব্বত, দর্দ ও মাম্মুনি নামক এক রাজাকে। কলহণের বর্ণনায় প্রাগ্-জ্যোতিষ, স্ত্রীরাজ্য ও উত্তর কুরুর নাম আছে। কলহনের এই বর্ণনা কতখানি ঐতিহাসিক তা নিয়ে মতভেদ আছে। সম্ভবত তিনি পূর্বে বাংলা পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন কারণ তিনি মগধ থেকে একটি বৌদ্ধ মূর্তি কাশ্মীরে নিয়ে যান। তাছাড়া কলহন অন্যত্র বাংলার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি যে দাক্ষিণাত্য বা দক্ষিণ ভারত জয় করেছিলেন তার অন্য কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। অন্য কোনো তথ্য না থাকায় ঐতিহাসিকরা তাঁর দক্ষিণ ভারত বিজয়ের কাহিনী মেনে নিতে চান না। মাম্মুনি নামে যে শাসকের কথা কলহন উল্লেখ করেছেন তিনি হলেন সম্ভবত আরব শাসক। আরবরা কাশ্মীরের সীমান্ত অঞ্চলে পৌঁছেছিল এবং কাংড়া দখল করে নিয়েছিল। এটা খুবই স্বাভাবিক যে ললিতাদিত্য আরব আগ্রাসন প্রতিরোধ করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন। আরবরা এই অঞ্চলে স্থায়ী অধিকার স্থাপন করতে পারেনি। অনুমান করা যায় ললিতাদিত্য আরবদের পরাস্ত করে পাঞ্জাবে তাদের লুটপাট বন্ধ করেছিলেন। কাশ্মীরের চার পাশে ছিল উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল। সম্ভবত কম্বোজ, তুর্ক, দর্দ ও তিববতের বিরুদ্ধে তিনি সাফল্যলাভ করেন।

একথা ঠিক কলহণ ছিলেন রাজসভার ঐতিহাসিক। তিনি হয়তো ললিতাদিত্যের বিজয় কাহিনী নিয়ে অতিরঞ্জন করেছেন, তবে তিনি ইতিহাসের পদ্ধতি ও আদর্শ সম্পর্কে খুব সজাগ ছিলেন। সত্যের প্রতি তাঁর অবিচল নিষ্ঠা ছিল, ইতিহাসকে বিকৃত করার ইচ্ছা তাঁর একেবারেই ছিল না। ললিতাদিত্যের চারশো বছর পরে তিনি তাঁর ইতিহাস লিখেছেন। তাঁর লেখায় হয়তো কোনো ভ্রান্তি ঢুকে পড়তে পারে, ইচ্ছাকৃতভাবে তিনি ভুল তথ্য পরিবেশন করেননি। এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় একজন মহান বিজেতা ছিলেন। তার রাজ্যজয়ের ফলে কাশ্মীর একটি বড় সাম্রাজ্যে পরিণত হয়, গুপ্ত সাম্রাজ্যের পর সম্ভবত এতবড় অঞ্চল আর কোনো শাসক জয় করেননি (His extensive conquests made the kingdom of Kashmir, for the time being, the most powerful empire that India had seen since the days of the Guptas)।[১] কাশ্মীরের জনগণের গৌরবলিপ্সা পূর্ণ হয়, তারা তাঁকে সমগ্র জগতের অধীশ্বর বলে উল্লেখ করেছেন, তাঁর জয়গান করেছেন।

১. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *ক্ল্যাসিক্যাল এজ*, পৃ. ১৩৫।

ললিতাদিত্য শুধু বিজয়ী বীর ছিলেন না। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের সম্পদ দেশ গঠনের কাজে ব্যয় করেন। অনেকগুলি নগর নির্মাণ করে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা, বিহার, মন্দির ও দেবদেবীর মূর্তি দিয়ে সাজিয়েছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তির মধ্যে রয়েছে মার্তণ্ড মন্দির। ঐতিহাসিক কলহণ এই রাজার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁর চরিত্রের দুটি কলঙ্কের কথা কলহণ উল্লেখ করেছেন। একটি হল মদমত্ত হয়ে তিনি একবার প্রবারপুর শহরটি ধ্বংস করার জন্য তার মন্ত্রীদের নির্দেশ দেন। মন্ত্রীরা তাঁর আদেশ পালন করেননি, এতে তিনি পরে সন্তোষ প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় কলঙ্ক হল তিনি গৌড়ের রাজাকে মিথ্যা নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ডেকে এনে হত্যা করেন। গৌড়ের রাজার অনুচররা যে বিষ্ণু পরিহাস কেশবের নামে ললিতাদিত্য প্রতিশ্রুতি দেন সেটি ভেঙে ফেলেন। এই বাঙালি বীররা সকলে নিহত হন কিন্তু কলহণ এদের প্রভুভক্তি ও বীরত্বের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। এই দুটি কলঙ্ক ছাড়া ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়ের জীবনে অন্য কোনো ত্রুটি ছিল না। তাঁর শাসনকালে কারাকোটা রাজবংশ গৌরবের উচ্চশিখর স্পর্শ করেছিল। তাঁর মৃত্যুর পর এই বংশের পতন ঘটতে থাকে, আরো একশ বছর তাঁর বংশ কাশ্মীরে রাজত্ব করেছিল।

পরিশিষ্ট ৬

পালযুগে বৌদ্ধধর্ম

বাংলাদেশে পাল রাজারা চারশো বছর ধরে রাজত্ব করেছিলেন (৭৫০-১১৪৫)। বাংলার পাল, চন্দ্র, খড়্গ ও দেব বংশীয় রাজারা সকলে মহাযানী বৌদ্ধ ছিলেন। পাল রাজাদের লেখগুলিতে পরম সৌগত বলে রাজাদের উল্লেখ করা হয়েছে। হিউয়েন সাঙ্ বাংলাদেশে সত্তরটি বৌদ্ধ বিহার দেখেছিলেন, প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান থেকে মনে হয় এদের সংখ্যা আরো বেশি ছিল। পূর্বভারতে তিনটি প্রধান বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র হল বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী ও সোমপুর বিহার। এদের সবার ওপরে ছিল প্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। বিক্রমশীলা ও নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন দুজন বাঙালি পণ্ডিত শীলভদ্র ও অতীশ দীপঙ্কর। আরো অনেকগুলি বৌদ্ধ বিহারের কথা জানা যায়, এগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ত্রৈকূটক, দেবীকোট (উত্তরবঙ্গ), পণ্ডিতা (চট্টগ্রাম), সন্নগর (পূর্বভারত), ফুল্লহরি (মুঙ্গেরের কাছে), পত্তিকেরা (ত্রিপুরা) বিক্রমপুরী (বিক্রমপুর) এবং জগদ্দল (বরেন্দ্রী)। বৌদ্ধ পণ্ডিতরা এসব বিহারে ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চায় নিযুক্ত ছিলেন। ভারতের মধ্যে কাশ্মীর, নেপাল, ভুটান ও পূর্বভারতে বৌদ্ধধর্ম তার প্রভাব বজায় রেখেছিল। ভারতের বাইরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে—যবদ্বীপ, মালয়, সুমাত্রা ও সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রাধান্য বজায় রেখেছিল। শুধু বাংলা ও বিহারের মধ্যে এর প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল না, বাংলার রাজবংশগুলি এর আন্তর্জাতিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

পাল যুগে বৌদ্ধধর্মের ধ্যানধারণা, আচার-অনুষ্ঠান ও বৌদ্ধ দেব-দেবীর মূর্তি ইত্যাদিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছিল। রাজাদের সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে তার প্রভাব পড়েছিল। বজ্রযান, মন্ত্রযান, কালচক্রযান ও সহজযান মতবাদে, সিদ্ধাচার্যগণের গান ও দোহায় এবং এযুগে রচিত বৌদ্ধ শাস্ত্র গ্রন্থাদিতে এই পরিবর্তনের পরিচয় বিধৃত হয়ে আছে। পাল, চন্দ্র ও কম্বোজ বংশীয় রাজারা মহাযান মতবাদের অনুগামী হয়েও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। অনেকে ব্রাহ্মণ্য রাজবংশীয় রাজকুমারীদের পত্নী রূপে গ্রহণ করেন। পাল রাজারা সকলে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য মূর্তি ও মন্দিরের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ধর্মপাল ও দেবপাল মন্দিরের জন্য ভূমিদান করেছেন। নারায়ণপাল বৌদ্ধ হয়েও একসহস্র দেবায়তন প্রতিষ্ঠা করেন। রামপাল রামাবতী নগরীতে শিব, সূর্য, স্কন্দ ও গণপতির মন্দির নির্মাণ করেন। পাল, চন্দ্র, খড়্গ ও অন্যান্য রাজপরিবারে ব্রাহ্মণ্য আচার-অনুষ্ঠানও পালিত হত। রাজা জয়পাল পিতার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেছিলেন যা বৌদ্ধধর্ম অনুমোদিত নয়। এযুগে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম পরস্পরের কাছে এসেছিল,

উভয়ের মধ্যে ব্যবধান কমে এসেছিল। এযুগে শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার প্রধান কেন্দ্র হল বৌদ্ধ মহাবিহার ও বিহারগুলি। বিক্রমশীলা মহাবিহারের প্রতিষ্ঠাতা হলেন ধর্মপাল। ধর্মপালের চেষ্টায় নালন্দা মহাবিহার নতুন জীবন লাভ করেছিল। সোমপুর মহাবিহারের নামই হল শ্রীধর্মপালদেব মহাবিহার। অষ্টম শতকের দ্বিতীয় পাদে শৈলেন্দ্র বংশসম্ভূত বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি বিহার নির্মাণ করেন এবং ঐ বিহারের ব্যয় নির্বাহের জন্য দেবপাল পাঁচটি গ্রাম দান করেন। আচার্য হরিভদ্র, বীরদেব, বোধিভদ্র, রত্নাকর, শান্তি ও আচার্য সর্বজ্ঞশান্তি এসব পীঠস্থানে জ্ঞানচর্চায় নেতৃত্ব দেন। বিক্রমশীলা ও সোমপুর বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চায় শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল, এসব শিক্ষাকেন্দ্রে ধর্মগ্রন্থ রচনা, অনুবাদ ও অনুলিপি তৈরির কাজ হতো। কাশ্মীর, তিব্বত, সিংহল ও অন্যান্য স্থান থেকে বহু বৌদ্ধ শ্রমণ এসব কেন্দ্রে শিক্ষালাভের জন্য আসত। রামপাল সম্ভবত জগদ্দল বিহারটি প্রতিষ্ঠা করেন। তারনাথ জানিয়েছেন যে ধর্মপাল পঞ্চাশটি ধর্মবিদ্যায়তন স্থাপন করেন। চিনের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বজায় ছিল, একজন বাঙালি শ্রমণ সংস্কৃত পুঁথি নিয়ে চিনে গিয়েছিলেন।

এই যুগে মহাযানী মতবাদের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছিল। হিউয়েন সাঙ্, ই-সিং প্রমুখ পর্যটকেরা যে মহাযান ধর্মমতের বিবরণ রেখে গেছেন তার সঙ্গে পাল যুগের বৌদ্ধধর্মের অমিল অনেকখানি। অষ্টম ও নবম শতকে মহাযান মতবাদের মধ্যে তান্ত্রিক ধ্যানধারণা প্রবেশ করেছিল এবং তার ফলে দশম শতক থেকে এই ধর্মের মধ্যে রহস্যময় গুহ্য সাধনতত্ত্ব, নীতিপদ্ধতি ও পূজাচারের প্রসার লক্ষ করা যায়। এই গুহ্য সাধনার ধ্যান-কল্পনা কীভাবে মহাযান দেহে প্রবেশ করেছিল তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। হয়তো মহাযান মতবাদের মধ্যে এর বীজ সুপ্ত অবস্থায় ছিল। বৌদ্ধ ঐতিহ্য অনুযায়ী আচার্য অসঙ্গ বহু ধরনের মানুষজনকে বৌদ্ধধর্মে আকৃষ্ট করার জন্য প্রচলিত ভূত, প্রেত, যক্ষ, রক্ষ, ডাকিনী-যোগিনীকে এবং মাতৃকাতন্ত্রের নানা দেবীকে মহাযান মতবাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। নানা গুহ্য মন্ত্র, যন্ত্র, ধারণী, বীজ, মণ্ডল সব আদিম কৌম সমাজের জাদুশক্তিতে বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত। অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন যে অষ্টম ও নবম শতকে বৌদ্ধধর্মে এই রূপান্তরের কাজ শুরু হয়েছিল। এর একটি সম্ভাব্য কারণ অধ্যাপক রায় নির্দেশ করেছেন। হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত জাতিসমূহ তাদের আদিম সংস্কার ও সংস্কৃতি নিয়ে বৌদ্ধধর্মে প্রবেশ করেছিল। বৌদ্ধ দর্শনের জটিল তত্ত্ব (সম্মতীয়বাদ, সর্বাস্তিবাদ বা মহাসাংঘিক বাদ) সাধারণের বোধগম্য ছিল না। এদের কাছে জাদুশক্তি, মন্ত্র, মণ্ডল, ধারণী ও বীজ অনেক বেশি সত্য ও সহজ বলে মনে হয়েছিল। একশ্রেণীর বৌদ্ধ আচার্যরা মহাযানের নতুন ধ্যানকল্পনা গঠনের দিকে মন দেন। মন্ত্রই হল এদের মূল প্রেরণা, মন্ত্রের সঙ্গে ছিল ধারণী (গূঢ়ার্থক অক্ষর) ও বীজ। এই মন্ত্রযান হল মহাযানের বিবর্তনের প্রথম স্তর। দ্বিতীয় স্তর হল বজ্রযান।

বজ্রযানের ধ্যানকল্পনা গভীর ও জটিল। নাগার্জুনের শূন্যবাদকে আশ্রয় করে বজ্রযানের দার্শনিক তত্ত্ব নির্মাণ করা হয়। তাঁর মতে, দুঃখ, কর্ম, কর্মফল, সংসার সমস্তই হল শূন্য, শূন্যতার পরমজ্ঞান হল নির্বাণ।

বৌদ্ধধর্মে দেবীর ধারণা প্রবেশ করেছিল, দেবীরা হলেন প্রকৃত শক্তির অধিকারী। মহাসুখ লাভ হল বজ্রযান মতবাদের অন্বিষ্ট। শক্তি হল বজ্র, শক্তিকে আয়ত্ত করে মহাসুখ লাভ হয়। বজ্রযান হল তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম। বজ্রযানীরা মনে করেন নর-নারীর মিলনে যে পরম আনন্দময় ভাব তা হল বোধিচিত্ত। বোধিচিত্তের বজ্রভাব উপস্থিত হলে বোধিজ্ঞান লাভ হয়। চিত্তের এই বজ্রভাবকে আশ্রয় করে যে সাধনা তা হল বজ্রযান। বজ্রযানীরা মনে করেন ইন্দ্রিয় দমন করতে হলে আগে তাকে জাগাতে হয়, মিথুন হল সেই জাগরণের উপায়। এই আনন্দকে স্থায়ী করা যায় মন্ত্রশক্তির সাহায্যে। বজ্রযান হল তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম কারণ সাধনা ও আচার-আচরণ সবই গোপন রহস্যময়তায় ভরা। গুরুর নির্দেশ ছাড়া এই সাধন পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। বজ্রযানে গুরু হলেন অপরিহার্য, বজ্রযানে প্রজ্ঞার সার যে বোধিচিত্ত ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে তা হল শক্তি। বজ্রযানী বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্র হল 'ওম মণিপদ্মে হুম', যার মধ্যে সম্ভবত মহাসুখতত্ত্ব নিহিত আছে। সম্ভবত এই বজ্রযানী মতবাদের উদ্ভব হয়েছিল বাংলাদেশে, পরে তা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই ধর্ম আন্দোলনের নেতারা হলেন সিদ্ধাচার্যগণ, ঐতিহ্য অনুযায়ী এদের সংখ্যা হল চুরাশি। বৌদ্ধধর্মের এক রহস্যময় রূপ হল বজ্রযান, এর অন্য দুটি শাখা হল কালচক্রযান ও সহজযান। বজ্রযান শুধু সেসব অনুষ্ঠান পছন্দ করেছিল যাদের রহস্যময় দিক ছিল। তিব্বতি ঐতিহ্য অনুযায়ী কালচক্রযান হল বিদেশাগত, পাল রাজাদের সময় তার সূচনা হয়েছিল। কালচক্রযান যোগকে গুরুত্ব দিয়েছিল, মাস, তিথি, মুহূর্ত ইত্যাদি হিসেব করে গুহ্য সাধনার ব্যবস্থা করা হতো।

তিনটি যানেরই লক্ষ্য ছিল মহাসুখ লাভ, এই তান্ত্রিক আচার-আচরণ গ্রহণ করার ফলে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হয়। সিদ্ধাচার্যগণ একাজে সহায়ক হন। ধরে নেওয়া হয় দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ ছিলেন। এদের মধ্যে বিখ্যাত নামগুলি হল সরহ, নাগার্জুন, তিল্লোপাদ, নারোপাদ, ভুসুকপাদ, অন্বয় বজ্র ও কাহ্নপাদ। এই সিদ্ধাচার্যগণ হলেন আদি বঙ্গভাষার স্রষ্টা, তাদের গাথা ও দোহায় বঙ্গভাষার আদি রূপ ধরা পড়েছে।

বজ্রযানের অন্যরূপ হল সহজযান। বজ্রযান মূর্তি, দেবায়তন, মন্ত্র, পূজাচার, অনুষ্ঠান ইত্যাদিকে গুরুত্ব দিয়েছিল। সহজযান দেব-দেবী, মন্ত্র, পূজা, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদিকে বাতিল করেছিল। এদের বক্তব্য হল কাঠ, মাটি বা পাথরের দেব-দেবীর কাছে প্রণত হওয়া বৃথা। বাহ্যানুষ্ঠানের কোনো মূল্য তাদের কাছে ছিল না। তারা ব্রাহ্মণদের নিন্দা করতেন, যেসব বৌদ্ধ তপ, জপ, পূজার্চনা নিয়ে থাকত তাদেরও

সমালোচনা করা হতো। এদের মতে, এভাবে বৌদ্ধত্বলাভ করা যায় না। সহজযানী সিদ্ধাচার্যগণের ধ্যানধারণা ও মতবাদ তাদের দোহাকোষের অনেকগুলি দোহায় ধরা পড়েছে। সকলে বুদ্ধত্ব লাভের অধিকারী, এই বুদ্ধত্বের অধিষ্ঠান হল দেহের মধ্যে। দেহবাদ বা কায়সাধন হল একমাত্র সত্য। সহজিয়াদের মতে, শূন্যতা হল প্রকৃতি, করুণা পুরুষ, এদের মিলনে বোধিচিত্তের যে পরমানন্দাময় অবস্থায় সৃষ্টি হয় তাহাই মহাসুখ। এই মহাসুখ হল একমাত্র সত্য, এপথেই বুদ্ধত্ব লাভ হয়। যোগ বা সন্ন্যাসে এরা বিশ্বাসী ছিল না। সহজযানের আদর্শের মধ্যে রয়েছে সাম্যভাবনা ও শূন্যতা। ধ্যান করে মোক্ষলাভ হয় না, সহজ ছাড়া নির্বাণ লাভ হয় না, কায়সাধন ভিন্ন অন্য পথ নেই। আগম, বেদ, পুরাণ সবই বৃথা। সহজপথে সিদ্ধিলাভ করলে জরা-মরণ থাকে না। পাপপুণ্য বোধ থাকে না। মধ্যযুগের মরমীয়া সাধক বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কবীর, দাদু, তুলসীদাস সকলে এই সহজযানী ভাব দ্বারা প্রভাবিত হন। সহজযানে প্রত্যেক মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা অনুযায়ী (কুল) সাধনার পথ অনুসরণ করতে হয়। মস্তিষ্কের উচ্চতম স্থানে মহাসুখস্থান রয়েছে, বত্রিশ নাড়ির মধ্য দিয়ে গুহ্য সাধনার পথ ধরে সেখানে পৌঁছোতে হয়।

বজ্রযানের আর এক সাধনপন্থার নাম কালচক্রযান। এদের মতে, শূন্যতা ও কালচক্র এক ও অভিন্ন। ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যত অবিরাম প্রবহমান কালস্রোতে চক্রাকারে ঘুরছে। এই কালচক্র সর্বদর্শী, সর্বজ্ঞ, আদি বুদ্ধ এবং সকল বুদ্ধের স্রষ্টা। কালচক্র প্রজ্ঞার সঙ্গে মিলে সৃষ্টি করেন। কালচক্রবাদীরা মনে করেন এই কালচক্রের ওপর প্রাধান্য স্থাপন করে নির্বাণ লাভ করা যায়। এজন্য দরকার যোগ সাধনার মাধ্যমে পঞ্চবায়ুকে আয়ত্ত করার। এজন্য তারা তিথি, দিন, নক্ষত্র, মুহূর্ত ইত্যাদি নিয়ে চর্চা শুরু করেছিল। গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা প্রাধান্য পেয়েছিল। প্রসিদ্ধ কালচক্রযানী অভয়াকর গুপ্ত এই সাধন পদ্ধতি সম্পর্কে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি ছিলেন পাল রাজা রামপালের সমসাময়িক। বজ্রযান, সহজযান ও কালচক্রযান হল যোগ-নির্ভর, এই তিন যান একই ধ্যানকল্পনা থেকে উদ্ভূত। ব্যবহারিক সাধনার ক্ষেত্রে এদের মধ্যে পার্থক্য বিশেষ ছিল না। একই সিদ্ধাচার্য একাধিক যানের ওপর গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই তিন যানের উদ্ভব যেখানে হোক না কেন বাংলাদেশে এদের লালন ও বর্ধন হয়েছিল। বাঙালি সিদ্ধাচার্যগণ সম্ভবত এই তিন যানের ধ্যানকল্পনা ও গুহ্য সাধন পদ্ধতির স্রষ্টা। পাল, চন্দ্র ও কম্বোজ পর্বের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস এদের নিয়ে তৈরি হয়েছিল। এই তিন যানের নির্ভর হল হঠযোগ, মানবদেহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শারীর জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। শরীরের নাড়ি প্রবাহ, ঊর্ধ্বমুখী গতি, বিভিন্ন নাড়ির সংযোগ কেন্দ্র, তাদের উৎপত্তিস্থল নাড়িচক্র সব এই শারীর জ্ঞানের অন্তর্গত। ললনা, রসনা ও অবধূতী এই তিনটি হল প্রধান নাড়ি প্রবাহ। নাড়ী প্রবাহের গতিকে সাধক স্বেচ্ছায় চালনা করতে

পারেন এবং সেই চালনার শক্তি অনুযায়ী বোধিচিত্তের ধ্যান দৃষ্টি উন্মিলিত ও প্রকাশিত হয়। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের যোগ-সাধনায় ললনা-রসনা-অবধূতী ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্নাতে বিবর্তিত।

বজ্রযান ও কালচক্রযানে ধর্মানুষ্ঠান, আচার-আচরণ কিছু ছিল, কিন্তু পরে এই ব্যবহারিক অনুষ্ঠানগুলি ক্রমশ কমতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে গুহ্য সাধনা প্রবল ও প্রধান হয়ে ওঠে। সহজযান লৌকিক বা লোকোত্তর কোনো বুদ্ধকে স্বীকার করেনি। বজ্রযানের দেব-দেবী সবকিছু তারা বিসর্জন দেয়। প্রব্রজ্যা, বিনয়শাসন সব পরিত্যক্ত হয়। রয়ে যায় শুধু কায়সাধন ও দেহাশ্রয়ী হঠযোগ। বাংলার ব্রাহ্মণ্য শক্তি ধর্মেও অনুরূপ পরিবর্তন ঘটে চলেছিল, সেখানেও শক্তি ধর্মের আচার অনুষ্ঠান সব বাতিল হয়ে যায়। গুহ্য সাধন পন্থাই প্রধান হয়ে ওঠে। বৌদ্ধ মহাসুখবাদ এবং গুহ্যসাধন পন্থার সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য শক্তি ধর্মের পার্থক্য প্রায় মুছে যায়। পাল পর্বের শেষদিকে এই মিলন পর্ব শুরু হয়ে চতুর্দশ শতক নাগাদ তা পরিপূর্ণতা লাভ করে। এই সময়ের মধ্যে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভুত্ব মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। এই সমন্বয় থেকে পরবর্তীকালে লোকায়ত নাথ, অবধূত, সহজিয়া ও বাউল সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। এরা ব্রাহ্মণ্য শক্তি ধর্মের বর্ণাশ্রম ও পুরোহিত তন্ত্রকে স্বীকার করেনি।

পরিশিষ্ট ৭

আদিমধ্য ও মধ্যযুগে নারীজাতির অবস্থা

একাদশ শতকের গোড়ার দিকে আলবেরুনি ভারতে এসে এদেশের সমাজ ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে বেশকিছু তথ্য রেখে গেছেন। চতুর্দশ শতকে মরোক্কোর অধিবাসী ইবন বতুতা ভারত দর্শন করে এদেশের সমাজব্যবস্থা ও নারীজাতির দুর্দশার কথা উল্লেখ করতে ভোলেননি। ভারতের স্মৃতিকাররা এবং তাদের অসংখ্য ভাষ্যকার নারীর অধিকার নিয়ে লিখেছেন। বিবাহ ব্যবস্থা ও সম্পত্তির অধিকার, পরিবারে নারীর মর্যাদা ইত্যাদি নিয়ে তাঁরা লিখেছেন। কিন্তু স্মৃতিকারদের ব্যাখ্যা খুব পরিষ্কার নয়, এদের বক্তব্যের মধ্যে অনেক স্ববিরোধিতা ও অস্পষ্টতা আছে। আলবেরুনি জানাচ্ছেন যে হিন্দুদের মধ্যে নিকট আত্মীয়রা বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয় না। এখানে বিবাহ বিচ্ছেদ হয় না, একবার বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হলে মৃত্যুদিন পর্যন্ত তা বজায় থাকে। তিনি আরো জানিয়েছেন হিন্দু শাস্ত্রকাররা বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা রাখেননি। অসবর্ণ বিবাহ হতো, উচ্চবর্ণের মানুষ নিম্নবর্ণের মহিলাকে বিবাহ করতে পারত (অনুলোম বিবাহ) কিন্তু উচ্চবর্ণের মহিলা নিম্নবর্ণের পুরুষকে বিবাহ করলে সমাজ তা মেনে নিত না। আলবেরুনির লেখা থেকে আরো জানা যায় দুশ্চরিত্রা স্ত্রীকে কঠোর শাস্তি পেতে হতো, স্মৃতিতে যে শাস্তির ব্যবস্থা আছে তার চেয়ে বেশি শাস্তি তাকে পেতে হতো, এমন দুশ্চরিত্রা স্ত্রীকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করা হতো।

সমকালীন লেখ ও মার্কোপোলোর সাক্ষ্য থেকে জানা যায় রাজন্যবর্গ বহু স্ত্রী গ্রহণ করতেন। মার্কোপোলো লিখেছেন যে মেবারের রাজার (পাণ্ড্যরাজ্য) পাঁচশো স্ত্রী ছিল, ঐ অঞ্চলের আরো একজন রাজা তিনশো স্ত্রী নিয়ে সংসার করতেন। আদিমধ্য যুগে স্বয়ম্বর প্রথা একেবারে লোপ পায়নি। সমকালীন সাহিত্যে স্বয়ম্বরের উল্লেখ পাওয়া যায়। পশ্চিমের চালুক্যরাজা ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য শিলহার (বিদ্যাধর) রাজকন্যাকে এভাবে বিবাহ করেন। রাজন্যবর্গের মধ্যে প্রচলিত এই প্রথা সাধারণ মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করেনি। সাধারণ মানুষ একপত্নী গ্রহণ করত, তাদের মধ্যে বহু স্ত্রী গ্রহণের প্রথা ছিল না। স্মৃতিশাস্ত্রে ও ভাষ্যে মহিলাদের স্বাধীনতাদানের বিরোধিতা করা হয়েছে। স্ত্রী মনে ও প্রাণে শুদ্ধতা বজায় রাখবে এটি ছিল আদর্শ। অন্য একটি ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে স্ত্রীকে সবসময় কাজের মধ্যে ব্যস্ত রাখতে হবে যাতে সে পরপুরুষের কথা চিন্তা করার সময় না পায়। স্বামী স্ত্রীকে অলংকার, পোশাক-পরিচ্ছদ উপহার দেবেন এবং ভালো আহারের ব্যবস্থা করবেন। স্বামী বিদেশে গেলে তার স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবেন। *স্মৃতিচন্দ্রিকায়* বলা হয়েছে এক স্ত্রী থাকতে বিশেষ

অবস্থায় স্বামী দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করতে পারে। স্ত্রী যদি অসুস্থ হয়, পুত্র সন্তান জন্মদানে অক্ষম হয় বা মৃতবৎসা হয় তাহলে স্বামী অন্য পত্নী গ্রহণ করতে পারে। তবে এসব ক্ষেত্রে প্রথম পত্নীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তাকে নিতে হবে। স্ত্রী যদি দুশ্চরিত্রা হয় তবে তাকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করার অধিকার স্বামীর রয়ে যায়। স্বামী যদি সতী সাধ্বী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে তবে তাকে শাস্তি পেতে হবে। রাজা তাকে কঠোর শাস্তি দেবেন যেমন তিনি অন্য অপরাধীকে শাস্তি দেন। এরকম ক্ষেত্রে রাজা তার স্ত্রীকে সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ দিতে বাধ্য করতে পারেন।

শাস্ত্রকাররা ধর্মাচরণ ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারীজাতির নিম্নস্তরে অবস্থানের কথা উল্লেখ করেছেন। হারিত মহিলাদের দু'ভাগে ভাগ করেছেন—ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যবধূ। ব্রহ্মবাদিনী হলেন সংস্কৃতিবান, শিক্ষিতা মহিলা যিনি ধর্মীয় কাজকর্মে অংশ নেন, সদ্যবধূ সংসারের কাজ কর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। তবে *স্মৃতিচন্দ্রিকা* জানাচ্ছে যে এব্যবস্থা ছিল আগের যুগের। পিতা কন্যার বয়োপ্রাপ্তির আগে বিয়ে দেবেন। কন্যা অপহৃতা হলে তিনি সমাজচ্যুতা হবেন। এধরনের মহিলা শুধু সমাজচ্যুতা হবেন না, বিচারব্যবস্থায় তার সাক্ষ্যও অগ্রাহ্য হবে। এযুগের শাস্ত্রকাররা সমাজে নারীর অধিকার নিয়ে লিখেছেন। শাস্ত্রকাররা পিতা ও স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীলোককে অধিকার দিতে চেয়েছেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রী তার পুত্রদের সঙ্গে সম্পত্তির একাংশ পাবেন। যদি পারিবারিক কারণে বিধবা সম্পত্তির অধিকার না পান তার ভরণপোষণের জন্য আর্থিক সাহায্য পাবেন। শাস্ত্রকাররা স্ত্রীধনের কথা সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। একজন মহিলা সারাজীবন যেসব উপঢৌকন পান সেগুলি তার নিজস্ব সম্পত্তি, এতে স্বামীর অধিকার নেই। তিনি ইচ্ছে করলে এই সম্পত্তি তাঁর কন্যাদের বা পুত্র-কন্যাদের দিতে পারেন। আদিমধ্য যুগের ইতিহাসে অনেক বুদ্ধিমতী প্রভাবশালী মহিলার নজির পাওয়া যায়। এদের অনেকে রাষ্ট্র পরিচালনায় বুদ্ধিমত্তা ও কূটকৌশলের পরিচয় দেন। কাশ্মীরে রানি সূর্যমতী শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারতেও অনেক বিদুষী মহিলা প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত হন। চালুক্য বংশের রানিরা অনেক সময় প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা করতেন। ত্রয়োদশ শতকের শেষদিকে কর্ণাটকের এক রানি বল্লমহাদেবী মহারাজাধিরাজ উপাধি নিয়ে শাসন করেন। কাকতীয় রাজ্যে রানি রুদ্রাম্বা রুদ্রদেব মহারাজ উপাধি নিয়ে প্রায় চল্লিশ বছর শাসন করেছিলেন।

ভারতে তুর্কি শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে ভারতীয় নারীর সামাজিক অবস্থানেও পরিবর্তন ঘটে যায়। হিন্দুরা তুর্কি মহিলাদের মত পর্দা প্রথার আশ্রয় নিয়েছিল, মহিলাদের বাইরে ঘোরাফেরা অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত হয়। *মদন পারিজাত* ও *পরাশর মাধবে* সমকালীন সমাজে নারীর অবস্থানের অনেক খুঁটিনাটি বিষয় ধরা পড়েছে। অপরাধের ক্ষেত্রে কাত্যায়ন বলেছেন পুরুষের অর্ধেক শাস্তি নারীর প্রাপ্য। মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্রে নারীর শুধু

অঙ্গচ্ছেদ হবে, মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে না। *প্রায়শ্চিত্তসার* গ্রন্থে বিভিন্ন অপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেওয়া হয়েছে। মহিলার সম্পত্তির ওপর অধিকার সম্পর্কে এযুগে বিস্তৃত বিধি-বিধান তৈরি হয়েছে। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে মহিলা পিতা ও স্বামীর সম্পত্তির কতখানি পাবেন তা নির্দিষ্ট করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। পুত্রহীন কোনো স্বামী মারা গেলে তার সম্পত্তির প্রথম দাবীদার হবেন তার বিধবা স্ত্রী। তবে এক্ষেত্রে স্বামীর সব পারলৌকিক কাজকর্ম তাকে সম্পন্ন করতে হবে। বৃহস্পতির উদ্ধৃতি দিয়ে এযুগের শাস্ত্রকার ও টীকাকাররা নারীর পক্ষ নিয়েছেন। নারীজাতির প্রতি তাঁরা সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে উঠেছেন। কাত্যায়ন বলেছেন যে মৃত স্বামীর সম্পত্তি প্রয়োজন হলে বিধবা সৎকার্যে ব্যয় করতে পারবেন। যাজ্ঞবল্ক্য থেকেও উদ্ধৃতি দিয়ে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালানো হয়। ধর্মশাস্ত্রে স্ত্রীধন ও যৌতুক (সৌদায়িক) নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। স্ত্রীধন সীমিত রাখার প্রয়াসও লক্ষ করা যায় ; স্থাবর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার স্বীকৃতি লাভ করেছিল। বেশিরভাগ টীকাকার স্ত্রীধনের ওপর স্ত্রীর একাধিপত্য স্বীকার করে নিয়ে বিধি-বিধান তৈরি করেছেন। স্বামী কোনো অবস্থাতে স্ত্রীধনের ওপর কর্তৃত্ব করতে পারেন না। মিতাক্ষরায় এই স্ত্রীধন কীভাবে বণ্টন করা হবে তারও ইঙ্গিত আছে। তুর্কি শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে ভারতের নারীজাতির অবস্থারও কিছু পরিবর্তন ঘটে। মধ্যযুগের ভক্ত সাধকরা (যেমন কবীর, নানক, চৈতন্যদেব) নারীজাতিকে অসাম্য ও অবিচার থেকে মুক্তি দিতে বলেছেন। ইসলামের সাম্যের আদর্শ সম্ভবত ভক্তিবাদীদের চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করেছে। বঞ্চিত, শোষিত, অত্যাচারিত, অধিকারহীন এই মানবগোষ্ঠীর অবস্থা অনেক সংস্কারককে বিচলিত করেছিল। এরাই ভারতে আধুনিককালের নারীমুক্তি আন্দোলনের পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করেন।

প্রায় একহাজার বছরের সময়কালে (৬৫০-১৫৫৬) ভারতের সর্বত্র নারীজাতির অবস্থা একরকম ছিল না। সর্বত্র এবং সব সমাজে নারীজাতি সম্মান ও মর্যাদা পেত না। উচ্চবর্ণের হিন্দু ও মুসলমান সমাজে নারীরা যে সম্মান ও মর্যাদা পেত, নিম্নবর্ণের সমাজে তা পেত না। তবে নিম্নবর্ণের সমাজের মহিলারা অনেক বেশি স্বাধীনতা পেত, পুরুষের সঙ্গে খেতে ও কারখানায় তারা কাজ করত। উৎপাদন্ন ব্যবস্থার সঙ্গে ভারতীয় মহিলারা যুক্ত ছিল। কুটির ও হস্তশিল্পের উৎপাদন ব্যবস্থায় মহিলাদের ভূমিকাকে কোনোমতেই অস্বীকার করা যায় না। তবে তুর্কি শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে ভারতে নারী দাসদের সংখ্যা বেড়েছিল। ইবন বতুতা তাঁর রচনায় ভারতের নারী দাসদের কথা একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। সুলতান বা রাজন্যবর্গ কোনো সম্মানীয় ব্যক্তিকে যেসব উপহার দিতেন তাদের মধ্যে নারী দাসরা অবশ্যই থাকত। দিল্লির উজির ইবন বতুতাকে দশজন দাসী উপহার দেন, এরা ছিল অপরিচ্ছন্ন, অশিক্ষিত এবং রুচিহীন।

বতুতা এদের অন্যদের মধ্যে বিলিয়ে দেন। নারী দাস প্রথা বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল বলে তিনি জানিয়েছেন। তিনি বাংলার বাজার থেকে আসুরা নামী এক সুন্দরী ক্রীতদাসকে অল্প টাকায় কিনেছিলেন। ইবন বতুতা এই ক্রীতদাসী প্রথার অকাট্য প্রমাণ রেখে গেছেন, একে অগ্রাহ্য করার মত কোনো তথ্য নেই।

ইবন বতুতা ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত সহমরণ প্রথার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি নিজে তিনটি সহমরণের ঘটনা দেখেছিলেন, সরকারি অনুমোদন নিয়ে সহমরণের ব্যবস্থা করতে হতো। তিনি জানিয়েছেন যে অনেক বিধবা স্বেচ্ছায় সহমরণে যেত, অনেকে আবার শেষ মুহূর্তে ভয় পেয়ে যেত। তিনি নিজে এই বীভৎস, অমানবিক প্রথা দেখতে দেখতে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যান। সহমরণের সঙ্গে স্বামীর প্রতি আনুগত্য ছাড়াও আরো অনেক মনোভাব যুক্ত হতো। সামাজিক খ্যাতিলাভ হল এদের একটি, অন্যটি হল আত্মীয়দের সম্পত্তির লোভে চক্রান্ত। নির্ভেজাল ধর্মীয় অনুষ্ঠান এটি ছিল না। তুর্কি শাসকগোষ্ঠী জোর করে এই অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেয়নি, একে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াস চালিয়েছিল। বারানি আলাউদ্দিনের বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার যে পরিচয় দিয়েছেন তাতে দাসদের সঙ্গে দাসীদের বাজার দরের কথা উল্লেখ করেছেন। শুধু দাসী নয়, বারানি উপপত্নীদের বাজার দরের কথাও জানিয়েছেন। সম্পন্ন পরিবারে উপপত্নী রাখার প্রথা ছিল, সেজন্য বাজারে উপপত্নী বিক্রি হত। আদিমধ্য যুগের তুলনায় মধ্যযুগে যে নারীজাতির অবস্থার অবনমন ঘটেছিল তাতে সন্দেহ থাকে না।

মধ্যযুগের নারীদের মধ্যে অনেকে বিদুষী ও মহীয়সী ছিলেন, এরা সামাজিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নামগুলি হল মীরাবাঈ, অন্ডাল,, দয়াবাঈ, সহজোবাঈ ও ক্ষেমা।[১] মুসলিম সমাজের অভিজাত মহিলারা অনেকে বিদুষী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। রাষ্ট্রবিপ্লবে এরা নেতৃত্বও দিয়েছেন। সুলাতানা রাজিয়া হলেন এধরনের এক চরিত্র। উচ্চবর্গের মুসলমান মহিলারা লেখাপড়া শিখতেন, এদের যুদ্ধবিদ্যাও শেখানো হত। বিজয়নগরের মহিলারা নানা বিদ্যা শিক্ষা করত, নৃত্য, সঙ্গীত ও যুদ্ধবিদ্যায় তারা পারদর্শিনী হ্‌তো। বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে মধ্য এশিয়ায় স্ত্রী-পুরুষ সকলে নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নিত, সামাজিক জীবন ছিল ভারতের চেয়ে অনেক বেশি আনন্দময়। ভারতে এদেশি মুসলমানরা পর্দানশীন ছিল না, এদেশীয় আচার-আচরণ তারা অনুসরণ করত। স্বামীর সহযোগী হিসেবে এরা খেতে ও কারখানায় কাজ করত। হিন্দু ও মুসলমান নারীদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। সুফি দরবেশরা নারী ও পুরুষের সাম্যের কথা প্রচার করতেন।

---

১. অমর্ত্য সেন, *তর্কপ্রিয় ভারতীয়*, পৃ. ১০।

শব্দার্থ

আমিল	রাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারী।
আমির-ই-আখুর	অশ্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত আমির।
আমির-ই-হাজিব	রাজদরবারের ভারপ্রাপ্ত অফিসার।
আমির-উল-মোমিনিন	খলিফার উপাধি।
আরজ-ই-মামালিক	যুদ্ধ মন্ত্রী।
ইক্‌তা	ভূমিরাজস্বের বরাত।
ইজারাদার	ভূমিরাজস্বের কন্ট্রাক্টর।
ইনাম	উপঢৌকন, পুরস্কার।
ইমাম	ধর্মের প্রধান, যিনি প্রার্থনা পরিচালনা করেন।
ইস্টাডো ডা ইন্ডিয়া	পর্তুগিজ নৌসাম্রাজ্য।
উজির	প্রধানমন্ত্রী।
উমরা	আমিরদের (আমিরের বহুবচন)।
উলেমা	ইসলামী ধর্মশাস্ত্রে পণ্ডিত।
উসর	লবণাক্ত জমি।
ওয়াঝ	বেতন।
ওয়াঝদার	বেতন পান এমন কর্মচারী।
ওয়ালি	গভর্নর, ইক্‌তার বা বিলায়েতের প্রধান।
ওয়ালি আহাদ	ওয়ালির উত্তরাধিকারী।
কসবা	শহর।
কবুলিয়ত	কৃষক রাষ্ট্রকে তার দায়িত্ব স্বীকার করে যে দলিল দিত।
কাজী	মুসলমান বিচারক।
কানকুত	শস্য বণ্টন করে রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতি।
কার্তাজ	পর্তুগিজদের প্রদত্ত বাণিজ্যের লাইসেন্স।
কাফির	অমুসলমান।
কারকুন	রাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারী।
কারখানা	রাষ্ট্রের অধীনে শিল্পপণ্য উৎপাদন কেন্দ্র বা পণ্য সংগ্রহ কেন্দ্র।
কালান্দর	ভ্রাম্যমাণ ভিক্ষাজীবী দরবেশ সম্প্রদায়।
কিসমত-ই-খোতি	খোতির স্থাপিত স্থানীয় কর।
কুফর	অবিশ্বাস।

খরিফ	শীতকালীন কৃষিজ ফসল।
খলিফা	মুসলিম রাষ্ট্র ও ধর্মের প্রধান।
খানকা	দরবেশদের আস্তানা।
খারাজ	ভূমিকর।
খালিসা	সুলতানের খাস জমি, এই জমি থেকে আয় সরাসরি রাজকোষে জমা হতো।
খিলাফত	খলিফার শাসন ও কর্তৃত্ব।
খেলাত	রাজকীয় সম্মান, উপঢৌকন।
খুত	গ্রামীণ সম্পন্ন ভূস্বামী ও রাজস্ব আদায়কারী।
খোদকস্ত	অস্থায়ী কৃষক।
খোম	সুলতানের প্রাপ্য লুণ্ঠিত দ্রব্যের এক-পঞ্চমাংশ।
গজ-ই-সিকান্দরি	সুলতান সিকান্দর লোদির মাপকাঠি।
গোমস্তা	এজেন্ট, কর্মচারী।
ঘরি	আলাউদ্দিন স্থাপিত গৃহকর।
ঘারুহল	রাজস্থানের সম্পন্ন কৃষক।
চরাই	পশুকর।
চাতর	রাজছত্র।
চৌথ বা চৌথাই	উৎপন্ন শস্যের এক-চতুর্থাংশ, শিবাজী স্থাপিত কর।
জমা	ভূমিরাজস্বের বন্দোবস্ত।
জমাহাসিল	আদায়ীকৃত রাজস্ব।
জাকাত	ধনী মুসলমানদের দেয় কর।
জাগির	সরকারি কর্মচারীকে বেতনের পরিবর্তে প্রদত্ত ভূমিরাজস্বের অধিকার।
জাবতি	পরিমাপ, রাজস্ব ধার্য পদ্ধতি।
জাবাবিত	রাষ্ট্রীয় আইন।
জামাতখানা	দরবেশদের বাসস্থান।
জিতল	সুলতানি যুগের তাম্রমুদ্রা।
জিজিয়া	মুসলমান রাষ্ট্রে অমুসলমানদের দেয় কর।
জিম্মি	মুসলিম রাষ্ট্রে সংরক্ষিত অমুসলমান।
তঙ্কা	রুপোর টাকা।
তৌহিদ	একেশ্বরবাদী ধারণা।
দাগ	ঘোড়ার গায়ে সরকারি ছাপ মারার ব্যবস্থা।

দাম	আকবরের তাম্রমুদ্রা।
দারুল-মুলক	রাজধানী।
দারোগা	ছোট অফিসের প্রধান।
দালাল	মধ্যস্থতাকারী, কমিশন এজেন্ট।
দেবদান	দেবতার উদ্দেশে দান করা সম্পত্তি।
দেশমুখ, দেশপাণ্ডে	দক্ষিণের জমিদার।
দোয়াব	গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চল।
নবিসন্দা	করণিক।
নবুবত	পয়গম্বরত্ব।
নায়েব	ডেপুটি।
পাইকস্ত	অস্থায়ী কৃষক।
পাইবস	প্রভুর পদচুম্বন।
পাট্টা	রাষ্ট্র কৃষককে তার অধিকার স্বীকার করে যে দলিল দিত।
পাটোয়ারি	গ্রামে ভূমিরাজস্বের হিসাব রক্ষক।
পাতিল	দক্ষিণের রাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারী।
পীর	মুসলিমদের ধর্মগুরু।
প্যাগোডা	দক্ষিণ ভারতের মুদ্রা।
ফারমান	রাজার আদেশ।
বানজারা	শস্য ব্যবসায়ী। এরা দলবদ্ধভাবে পণ্য নিয়ে যাতায়াত করত।
বারিদ	গুপ্তচর।
বালাহর	নিম্নশ্রেণীর কৃষক।
বাঁটাই	শস্য ভাগ করে রাজস্ব আদায় পদ্ধতি।
ব্রহ্মদেয়	ব্রাহ্মণকে দান করা ভূসম্পত্তি।
মহল্লা	শহরের একটি অংশ।
মাদাদিমাস	ধর্মজ্ঞ ও বিদ্বান ব্যক্তিকে প্রদত্ত নিষ্কর জমি।
মাদ্রাসা	মুসলিম বিদ্যায়তন।
মামলুক	ক্রীতদাস অফিসার।
মালিক-উৎ-তুজ্জর	বণিকশ্রেষ্ঠ।
মাহমুদি	গুজরাটের সুলতানদের মুদ্রা।
মিরাসী	মহারাষ্ট্রের সম্পন্ন কৃষক।
মুক্তি	ইক্তার প্রধান।

মুজারি	কৃষক।
মুজারিয়ান	ভাগচাষী।
মুশরিফ-ই-মামালিক	হিসেব রক্ষক।
মুহতাসিব	শহরের তত্ত্বাবধানকারী।
মোকাসা	শিবাজী প্রদত্ত জাগির।
মোকাদ্দম	গ্রামীণ ভূস্বামী ও রাজস্ব আদায়কারী।
মোল্লা	মুসলিম শাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তি।
যজমানি	সেবার পরিবর্তে উৎপন্ন ফসলের অংশীদার।
রবি	শীতকালীন শস্যের চাষ।
রায়	হিন্দু প্রধান।
রায়ত	প্রজা কৃষক।
রায়ান	রায়দের প্রধান।
রাবাত	হিন্দু প্রধান।
রুপিয়া	রৌপ্যমুদ্রা।
শরিয়ত	শাস্ত্র অনুমোদিত মুসলিম আইন।
শহর	নগর।
শাহ্না	পুলিশ বিভাগের প্রধান, মেয়র।
শাহানা-ই-মাণ্ডি	শস্য বাজারের পরিদর্শক।
শিকদার	সৈন্যবাহিনীর অফিসার, শিকের বা একটি অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত
সদর-ই-জাহান	ধর্ম ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানের প্রধান।
সদা	একশো গ্রামের মালিক।
সম	দরবেশদের গান।
সয়ুরঘল	নিষ্কর সম্পত্তি।
সরদেশি	শিবাজী স্থাপিত উৎপন্ন ফসলের এক-দশমাংশ কর।
সরফ	মুদ্রার বিনিময়কারী, ব্যাঙ্কার।
সরাই	পান্থশালা।
সিজ্দা	আভূমি নত হয়ে সম্মান প্রদর্শন।
সুফি	দরবেশ।
সেরাই আদল	আলাউদ্দিন প্রতিষ্ঠিত দিল্লির বস্ত্র বাজার।
হান	দক্ষিণ ভারতের মুদ্রা।
হাদিস	হজরত মহম্মদের সংকলিত বাণী।
হুলিয়া	সরকারি দপ্তরে সৈনিকদের বিবরণ নথিবদ্ধ করার ব্যবস্থা

রাজবংশ ও শাসকদের তালিকা

রাষ্ট্রকূট বংশ

১.	দন্তিদুর্গ	৭৩৩-৭৫৮	খ্রিস্টাব্দ
২.	প্রথম কৃষ্ণ	৭৫৮-৭৭৩	”
৩.	দ্বিতীয় গোবিন্দ	৭৭৩-৭৮০	”
৪.	ধ্রুব	৭৮০-৭৯৩	”
৫.	তৃতীয় গোবিন্দ	৭৯৩-৮১৪	”
৬.	অমোঘবর্ষ	৮১৪-৮৭৮	”
৭.	দ্বিতীয় কৃষ্ণ	৮৭৮-৯১৪	”
৮.	তৃতীয় ইন্দ্র	৯১৪-৯২৭	”
৯.	চতুর্থ গোবিন্দ ও তৃতীয় অমোঘবর্ষ	৯২৭-৯৩৯	”
১০.	তৃতীয় কৃষ্ণ	৯৩৯-৯৬৭	”

প্রতিহার বংশ

১.	প্রথম নাগভট্ট	৭৩০-৭৫৬	খ্রিস্টাব্দ
২.	বৎসরাজ	৭৭৮-৭৯৩	”
৩.	দ্বিতীয় নাগভট্ট	৭৯৩-৮৩৩	”
৪.	ভোজ	৮৩৩-৮৮৫	”
৫.	মহেন্দ্রপাল	৮৮৫-৯০৭	”
৬.	মহীপাল	৯০৮-৯৩৩	”
৭.	বিনায়ক পাল	৯৩৩-৯৪২	”

পাল বংশ

১.	গোপাল	৭৫০-৭৭০	খ্রিস্টাব্দ
২.	ধর্মপাল	৭৭০-৮১০	”
৩.	দেবপাল	৮১০-৮৫০	”
৪.	বিগ্রহপাল	৮৫০-৮৫৪	”
৫.	নারায়ণ পাল	৮৫৪-৯০৮	”

চোল রাজবংশ

১.	প্রথম রাজরাজ	৯৮৫-১০১৪	খ্রিস্টাব্দ
২.	প্রথম রাজেন্দ্র	১০১৪-১০৪৪	”

৩.	প্রথম রাজাধিরাজ	১০৪৪-১০৫২	”
৪.	দ্বিতীয় রাজেন্দ্র	১০৫২-১০৬৪	”
৫.	প্রথম বীর রাজেন্দ্র	১০৬৩-১০৭০	”
৬.	প্রথম কুলোত্তুঙ্গ	১০৭০-১১২০	”

ইলবারি বংশ

১.	কুতুবুদ্দিন আইবক	১২০৬-১২১০	খ্রিস্টাব্দ
২.	আরাম শাহ্	১২১০-১২১১	”
৩.	ইলতুৎমিস	১২১০-১২৩৬	”
৪.	রুকনুদ্দিন ফিরুজ	১২৩৬	”
৫.	রাজিয়া	১২৩৬-১২৪০	”
৬.	মুইজুদ্দিন বাহ্‌রাম	১২৪০	”
৭.	আলাউদ্দিন মাসুদ	১২৪২	”
৮.	নাসিরুদ্দিন মামুদ	১২৪৬-১২৬৫	”
৯.	বলবন	১২৬৫-১২৮৭	”
১০.	মুইজুদ্দিন কায়কোবাদ	১২৮৭-১২৯০	”
১১.	সামসুদ্দিন কায়মুরস	১২৯০	”

খল্‌জি বংশ

১.	জালালউদ্দিন ফিরুজ	১২৯০-১২৯৬	খ্রিস্টাব্দ
২.	আলাউদ্দিন	১২৯৬-১৩১৬	”
৩.	কুতুবুদ্দিন মুবারক	১৩১৬-১৩২০	”

তুঘলক বংশ

১.	গিয়াসউদ্দিন	১৩২০-১৩২৫	খ্রিস্টাব্দ
২.	মহম্মদ	১৩২৫-১৩৫১	”
৩.	ফিরুজ	১৩৫১-১৩৮৮	”
৪.	গিয়াসউদ্দিন (দ্বিতীয়)	১৩৮৮	”
৫.	আবুবকর	১৩৮৯	”
৬.	মহম্মদ ফিরোজ	১৩৯০-১৩৯৪	”
৭.	সিকান্দর	১৩৯৪	”
৮.	মাহমুদ	১৩৯৫-১৪১৩	”

সৈয়দ বংশ

১. খিজির খান	১৪১৪-১৪২১	খ্রিস্টাব্দ
২. মৈজুদ্দিন মুবারক শাহ্	১৪২১-১৪৩৪	”
৩. মহম্মদ শাহ্	১৪৩৪-১৪৪৫	”
৪. আলাউদ্দিন আলমশাহ্	১৪৪৫-১৪৫১	”

লোদি বংশ

১. বহলুল লোদি	১৪৫১-১৪৮৯	খ্রিস্টাব্দ
২. সিকান্দর লোদি	১৪৮৯-১৫১৭	”
৩. ইব্রাহিম লোদি	১৫১৭-১৫২৬	”

শুর বংশ

১. শেরশাহ্	১৫৪০-১৫৪৫	খ্রিস্টাব্দ
২. ইসলাম শাহ্	১৫৪৫-১৫৫৩	”
৩. আদিল শাহ্	১৫৫৩-১৫৫৬	”

মুঘল বংশ

১. বাবর	১৫২৬-১৫৩০	খ্রিস্টাব্দ
২. হুমায়ুন	১৫৩০-১৫৪০	”
	১৫৫৫-১৫৫৬	”